মানসী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩২১-২২)

নাটোরাধিপতি

মাননীয় মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্র নাথ রায়

সম্পাদিত

প্রকাশক

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(হপ্‌সিং কোম্পানী)

৪নং চৌরঙ্গি, কলিকাতা

৭ম বর্ষ—১ম খণ্ড

ফাল্গুন—শ্রাবণ, ১৩২১-২২

ষাণ্মাসিক সূচী

[লেখকগণের নামানুক্রমে]

চিত্র সূচী



মানসী

৭ম বর্ষ | ফাল্গুন ১৩২১ সাল | ১ম খণ্ড
১ম খণ্ড | | ১ম সংখ্যা

[আগা]মী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী পঞ্জিকা" প্রকাশিত হইবে।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে নব বসন্তের এমনই এক শুভমুহূর্ত্তে কাহার মধুর আহ্বানে 'মানসীর' প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল। তার সর্ব্বাঙ্গ তখন নবপ্রস্ফুটিত কুসুমদাম-সজ্জিত, বসন্তোদয়ে প্রফুল্লকাননের ন্যায় তার প্রাণ তখন ললিত-কোমল-কান্ত পদাবলী-মুখরিত। 'মানসী'র লীলানিকেতন ছিল যদিও ফকীরের কুটীরে, তবুও সে তখন ফকীরের যত্নে তার প্রাণপণ পরিশ্রমের ভিক্ষালব্ধরত্নে আপনাকে রাজৈশ্বর্য্যে প্রতিমণ্ডিত করিতেছিল। মানসী আপনার বড় মেজাজ লইয়া পুণ্য-প্রাণ ফকীরের কষ্টসঞ্চিত ধনরত্নে আপনাকে মশ্‌গুল করিয়া রাখিতে পারিতে-ছিল না,—তার বাসনা আরও মহৎ—তার আকাঙ্ক্ষা আরও উচ্চ আদর্শের দিকে আপনার অজ্ঞাতে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। একদিন যখন সে স্বর্গীয় বিলাসবিভ্রমমানসে আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া মাতোয়ারা—আত্মহারা, তখন সহসা সে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল যে, সে রাজসম্মানের যোগ্য। আজ 'মানসীর' নববর্ষের এই আনন্দের দিনে দশের নিকট বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, 'মানসী' এই নবীন সম্পাদকের চেষ্টায় আপনার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রভূত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সাহিত্য-বৎসল মহারাজ ও 'মানসীর' উপর ভগবানের করুণা চিরবর্ষিত হউক।

'মানসীর' বর্ষারম্ভ ফাল্গুনে। বিগত মাঘে মানসীর বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। ঐ বর্ষে বঙ্গদেশে ২৬২ খানি বাঙ্গলা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। দশ বৎসরের পূর্ব্বের তুলনায় সাময়িক পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে অনেক মাসিকপত্র জন্মিয়াছিল, তাহার কতক বিলুপ্ত হইয়াছে, কতক স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে। যাহারা স্থায়ী হইয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল না, একথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র। আজকাল কেহ কেহ নবপদ্ধতিতে মাসিকপত্র প্রচারের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যাঁহারা নূতন প্রণালীতে মাসিকপত্র পরিচালনের উপায় উদ্ভাবন করিতে বলেন, তাঁহাদের একটু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখা উচিত। সময় ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, সমাজ তাহার উপায় আপনিই করিয়া লয়, আর তাহা স্থায়ী হইয়া যায়; অন্যথা কোন বিষয়ের চেষ্টামাত্র করিলে তাহা অসাময়িক বা প্রয়োজনের বহু অগ্রবর্ত্তী বলিয়া নষ্ট হইয়া যায়! দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইলে কথাটা পরিস্ফুট হইবে;—দেখুন, সেকালে 'বঙ্গবাসীতে' ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের "বিবিধার্থ সংগ্রহের" অনুকরণে যে সমস্ত কাষ্ঠখোদিত মোটা কাজের শিল্পকৌশলহীন ছবি প্রকাশিত হইত, তাহা দিয়া 'জন্মভূমি'র কলেবর সুশোভিত করা হইত এবং মাঝে মাঝে জন্মভূমির জন্যই নূতন ছবির ব্যবস্থা করা হইত। ইহা দ্বারা আলেখ্যময়ী মাসিকপত্রিকা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং অভাব নিবারণের এক উপায় করা হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু তখনও ঠিক জিনিষ না পাওয়ায় এবং প্রয়োজনের তীব্রতা না থাকায় ৯বৎসর পরে 'বঙ্গবাসী'র অধিকারীকে 'জন্মভূমি' প্রচারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার পর 'সাহিত্য' প্রতি সংখ্যায় বাঙ্গালার সাহিত্যরথীদিগের এক এক জনের হাফটোন ছবি ছাপিতে আরম্ভ করেন। কেবল মূর্ত্তিদর্শনের আগ্রহ ব্যতীত তাহাতে আর কোনও প্রয়োজনীয়তা বাড়াইতে পারে না। তাহার পর 'প্রদীপে'র জন্ম হয়। নানা ধরণের উৎকৃষ্ট ছবি লইয়া 'প্রদীপ' দেখা দেওয়াতে তাহার দিকে লোকের দৃষ্টি পড়ে। এই সময়ে চিত্রকলার অনুশীলন জাগিয়া উঠে। উৎকৃষ্ট উপায়ে রঙ্-বিরঙে ছবি ছাপিবার প্রণালী ও যন্ত্রাদির আয়োজন হইতে থাকে। এখন এমন হইয়াছে,—ভারতী, মানসী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সঙ্কল্প, বিজয়া, যমুনা, প্রতিভা, ঢাকা রিভিউ প্রভৃতি সমস্ত প্রধান মাসিক পত্রেই উপযুক্ত, সুন্দর, শিল্পকৌশলসম্পন্ন বহুচিত্রের সমাবেশ হইতেছে। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র চেষ্টায় তাহাতে এবং তদনুসরণে অন্যান্য পত্রিকায় শিলালেখ,তাম্রশাসনাদির প্রতি-লিপি, ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোএরি, এসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকা প্রভৃতির ন্যায় সুন্দর হইয়া ছাপা হইতেছে। এখন ছবি মাসিকপত্র-প্রকাশের একটা অবশ্য-প্রয়োজনীয়

অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তত্ত্ববোধিনী, নব্যভারত, হিন্দুপত্রিকা, বামাবোধিনী প্রভৃতি প্রাচীন পত্র-পত্রিকাগুলি এই ছবির অঙ্গটি গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া, তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নবীন সহযোগীদের ঠেলিয়া ঠুলিয়া ততটা সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছেন না; অথচ ছবি না দেওয়ার জন্য যে অঙ্গহীনতা ঘটিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহারা নূতন উপায়ও কিছু অবলম্বন করিতেছেন না। সময়ের গতি, সমাজের আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া পরিবর্ত্তন অবলম্বন করা যে উন্নতি ও সফলতার জন্য আবশ্যক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিষয়ভেদে বিশিষ্ট পত্র পত্রিকা প্রকাশের দিন আসিয়াছে—যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা এখনও তাহা পরীক্ষা করিবার অবসর পান নাই। পূর্ব্বে সে পরীক্ষা একেবারে হয় নাই, এমন বলা যায় না;—তবে তখনও তাহাদের সময় আসে নাই, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ও অভাব ততটা তীব্রভাবে অনুভূত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, সঙ্গীতপ্রবেশিকা, বীণাবাদিনী, ক্রীড়াকৌতুক, কমলা, কৃষিদর্পণ, বৈষয়িকতত্ত্ব, কৃষিগেজেট, রঙ্গালয়, রঙ্গভূমি, রঙ্গমঞ্চ, আয়ুর্ব্বেদসঞ্জীবনী, চিকিৎসক, চিকিৎসা-সম্মিলনী, বিজ্ঞানদর্পণ, জ্যোতিষদর্পণ, অদৃষ্ট এবং সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বপ্রধান ঐতিহাসিক চিত্রের কথা ধরিতে পারা যায়। অবশ্য এখনও দুএ'ক খানি বিষয়গত বিশিষ্ট পত্রিকা যে নাই তাহা নহে; তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন"কৃষকে"র নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়, তৎপরে শিল্প ও সাহিত্য, কাজের লোক, আর ধর্ম্মসম্বন্ধে হিন্দুপত্রিকা। পন্থা, ব্রহ্মবিদ্যা, ধর্ম্ম-প্রচারক, বৈষ্ণব পত্রিকা অনেক বাহির হইয়াছিল, কিন্তু কোনখানিই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই;—এখন যে দুইচারিখানি বাহির হয়, সেগুলি সকলেই শিশু। বৌদ্ধদের 'জগজ্জ্যোতিঃ' কয়েক বর্ষ চলিতেছে, কিন্তু এখনও নবীন এবং এখনও বিষয়গৌরবে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলেও অচিরে উন্নত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জৈনদিগের কোন বাঙ্গালা পত্রিকা নাই। মুসলমান সম্প্রদায় হইতে একসময়ে কোহিনুর, নবনুর, ইসলাম-প্রচারক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র বাহির হইত, এখন একখানিও নাই; কেবল 'কোহিনুর' কখন কখন ধূমকেতুর মত দর্শন দেন। এতদ্ভিন্ন বিষয়ের বিশিষ্টতা-বিশিষ্ট বহু বিষয়ের মাসিক পত্রিকার অবসর আছে; কিন্তু সেগুলি প্রকাশ করিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয়তাকে স্থায়িত্ব দিয়া তাহাদিগকেও স্থায়ী করিতে পারেন, এমন লেখক ও সম্পাদক দেশে থাকিলেও আজিও দেখা দেন নাই। বিজ্ঞানের বহুবিভাগে কেবল পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রচারার্থই বহু পত্রিকা প্রকাশিত হইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

বিজ্ঞানশাখার সদস্যেরা বিগত কয়টি সাহিত্য-সম্মেলনে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে 'এদেশের বিজ্ঞানের ছাত্রেরাও মৌলিক গবেষণায় এক বৎসরে যে পরিমাণে কার্য করিয়া তুলিতেছেন, তাহা দ্বারাও দু'একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা চলিতে পারে চিকিৎসা-বিভাগে আয়ুর্ব্বেদ বা হোমিওপ্যাথী প্রণালীতে মাসিকপত্র প্রকাশের চেষ্টা বহু হইয়াছে, এবং এখনও বহু হইতেছে ; তবে কিসে যে এগুলির স্থায়িত্ব হইবে, অনুষ্ঠাতৃবর্গ এখনও তাহার উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। চিত্র কলার আলোচনা দেশে জাগিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অতি অল্পদিনের মধ্যে পাঁচ সাত খানি-উৎকৃষ্ট পুস্তকও বাহির হইয়াছে, কিন্তু এই নব উদ্ভাসিত চিত্রশিল্পের বিশিষ্টতা প্রচারের জন্য ইংরেজদিগের মধ্যে ইংরেজি পত্রিকার প্রচারের প্রয়োজনীয়ত অনুভূত হইলেও ভারতবাসীর মধ্যে ভারতবর্ষীয় কোন ভাষায় এখনও ইহার বিশিষ্টতা আলোচনার অভাব অনুভূত হইতেছে না ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এখনও মাসিক পত্রিকা জন্মগ্রহণ করে নাই। অদৃষ্টবাদী, গ্রহফলবিশ্বাসী, পঞ্জিকাতন্ত্রী বাঙ্গালীর মধ্যে কি গণিতজ্যোতিষ, কি ফলিতজ্যোতিষ—কোন বিভাগেরই বিশিষ্টতা আলোচনার জন্য মাসিকপত্র নাই। দৃগ্‌গণিত ঐক্য করিয়া একখানি পঞ্জিকা বাহির হয় বটে, কিন্তু দৃগ্‌গণিত আলোচনা করিবার স্থান এখনও সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালীর কীর্ত্তন, বাঙ্গালীর ঢপ, বাঙ্গালীর হাফ-আখড়াই, বাঙ্গালীর কবি, বাঙ্গালীর পাঁচালী প্রভৃতি কত প্রকার সঙ্গীত-ভেদ থাকিতে, বাঙ্গালীর একখানি সুষ্ঠু সঙ্গীত-পত্রিকা নাই, ইহা কম আক্ষেপের কথা নয়। সঙ্গীত-কলার ভারতবাসীর যত প্রকারভেদ আছে, পৃথিবীতে তত আর কাহারও নাই। দর্শনের আলোচনা বন্ধ নাই ; কিন্তু কেবলই বিশিষ্টভাবে দর্শনালোচনার বিশিষ্ট পত্রিকা কই বেদের দোহাই সকলেই দিয়া থাকি, কিন্তু কেবল বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ,আরণ্যক ও বেদাঙ্গগুলির আলোচনার্থ এতদিন বাঙ্গালায় কোন পত্রিকা ছিল না ; পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'মন্দারমালা' একা কেবল সে দিকে অতি ক্ষীণ হস্তে কার্য্য করিতে নামিয়াছে,—'লগতু লগতু কণ্ঠে' বলিয়া সম্পাদক সাদরে আহ্বান করিলেও সাধারণে সে মালার আদর করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এইরূপ কত বলিব ? যে দিকে চাহিয়া দেখিবেন, অভাব সেই দিকেই,—অথচ দেশে সে সকল অভাব মোচনের কোন প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে না! কেন হইতেছে না, অনুসন্ধান করিতে গেলে বলিতে হয়,—দেশের লোক, দেশের সমাজ, কৃতবিদ্যশ্রেণী কেহই তেমন তীব্রভাবে সে অভাব বোধ করিতেছেন না।

মাসিকপত্রের অবস্থা এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে,

সকলেই পাঁচফুলে সাজি সাজাইয়া পাঠক-দেবতার সেবায় লাগাইতেছেন; আর যাহার সাজিতে সুদৃশ্য ও সুগন্ধ ফুলের যত ঘন-সন্নিবেশ হইতেছে, তাহার ততই কৃতিত্ব জাহির হইতেছে। একটা ধুয়া উঠিয়াছে, লোকে গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাসে মশ্‌গুল হইয়া পড়িয়াছে, তাই গভীর বিষয়ের আলোচনা পড়িতে চায় না;—মাসিকপত্রের পরিচালক আমরা—আমরা কিন্তু সে কথা মানি না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে কেবল গল্পময়ী পত্রিকা প্রাচীন "উপন্যাস-রত্নাবলী" "উপন্যাসমঞ্জরী," "আদরিণী" এবং সে দিনের "নন্দনকানন" "দারোগার দপ্তর" প্রভৃতি উঠিয়া যাইত না; কেবল কবিতাময়ী পত্রিকা বীণা, লহরী প্রভৃতি লোপ পাইত না। সত্য বটে, এখনকার কালেও গল্প-কবিতা-উপন্যাস না দিলে "হাটে নাহি বাট মিলে"—কিন্তু হাটে বল করিয়া দাঁড়াইতে হইলে, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, সমালোচনা প্রভৃতি কোন বিষয়ই ত বাদ দিতে পারা যায় না।

কেহ কেহ গল্প ও উপন্যাস বাদ দিয়াছেন, কবিতা রাখিয়াছেন; কিন্তু কই, তাঁহাদের যে বিশেষ কিছু সম্ভ্রম বাড়িয়াছে, তাহাত' অনুভূত হইতেছে না। কেহ কেহ নাটক দিয়া আসর জমাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের বিশেষ কিছু সফলতা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় 'মানসী'র পূর্ব্বেও মাসিক-পত্রিকার হাটের যে অবস্থা ছিল, যেমন মালের কেনাবেচা হইত, যে শ্রেণীর খরিদ্দার যাতায়াত করিত, আলোচ্য বর্ষেও ঠিক সেই অবস্থা গিয়াছে, কোন কিছুরই পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। তবে কয়েক বর্ষ হইতে শিশুপাঠ্য পুস্তকের মত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রের কিছু প্রাবল্য হইয়াছে। কিন্তু কোনখানিই সেকালের 'বালক-বন্ধু,' 'সখা', 'সাথী'র ন্যায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। 'মুকুল' মধ্যকালে যে প্রতিপত্তি বা আদর পাইয়াছিল, নবীন শিশু-সঙ্গীদের কেহই সে আদর পাইতেছেন না। কেন, তাহা ঠিক খুলিয়া বলা চলে না;—কিন্তু একটা কথা বলা চলে,—আজকাল শিশু-সঙ্গীরা শিশুদের জন্য যে ভাষা ও প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা যাহাদের সঙ্গ চাহিতেছেন, তাহাদের কাছেই পৌঁছিতে পারিতেছেন না।—এই ত গেল মাসিকপত্রের হাটের অবস্থা।

কেবল কি মাসিক পত্রের বাজারই এইরূপ? সাহিত্যের হাটেও আলোচ্য বর্ষে এমন কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়ে'র বেচাকেনা চলিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ফাল্গুন হইতে মাঘ পর্য্যন্ত অন্যূন ১১২২খানি নূতন বা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা ১৪ তন্মধ্যে যে সকল পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১ এগুলির সংখ্যা আমরা ধরি নাই। উল্লিখিত ১১২২খানি পুস্তকের মধ্যে,—

বিশুদ্ধ বাঙ্গালায়—	৮১২
মুসলমানী বাঙ্গালায়—	১৬
বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে—	৮৭
বাঙ্গালা ও ওড়িয়ায়—	২
আরবি ও মুসলমানি বাঙ্গালায়—	৪
বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে—	১৬৭
পারসী ও মুসলমানী বাঙ্গালায়—	৫
বাঙ্গালা, ইংরেজি ও হিন্দীতে—	২
বাঙ্গালা, ইংরেজি ও সংস্কৃতে—	২২
বাঙ্গালা, পালি ও সংস্কৃতে—	৩
বাঙ্গালা ও উর্দ্দূতে—	২

মোট—১১২২খানি

পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও সং বাঙ্গালা ও ইংরেজি, বাঙ্গালা ইংরেজি ও সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পালি প্রকাশিত ১৬ খানি পুস্তকের বিষয়-ভেদে শ্রেণী-বিভাগ করিলে দেখা যায়;—

আলোচ্যবর্ষে,—

কলা-বিদ্যায়—	১২
জীবন-বৃত্তান্তে—	৩৮
নাটকাদিতে—	৮৭
উপন্যাসে—	৬৮
ইতিহাস-ভূগোলে—	৪৫
সাহিত্যে—	২২৫
আইনে—	১১
চিকিৎসায়—	৪০
দর্শনে—	৫

কাব্য ও কবিতায়—	১০২
ধর্ম্মবিষয়ে—	১০৮
ভ্রমণে—	১৮
বিজ্ঞান বিষয়ে—	১০২
বিবিধ বিষয়ে—	৬০

মোট ১০১৬খানি পুস্তক

প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার্ষিক সাহিত্য-বিবরণের রীত্যনুসারে ধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তকগুলির মধ্যে খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-পুস্তিকাগুলি তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত বিভাগের মধ্যে—

ইতিহাস ও ভূগোলের ৪৫খানির মধ্যে—	৩২ খানি
সাহিত্যের ২২৫ খানির মধ্যে—	১৮১ „
কাব্য ও কবিতার ১০২ খানির মধ্যে	২৮ „
বিজ্ঞান বিষয়ক ১০২ খানির মধ্যে—	৮২ „
বিবিধ বিষয়ক ৬০ „ „—	২৫ „

এই মোট ৩৪৮ খানি পুস্তক স্কুল-পাঠ্য।

আলোচ্যবর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত অন্ধ-কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল ও চণ্ডীদাসের পদাবলী ব্যতীত প্রাচীন সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আর কেহ কোন রত্ন প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। উপন্যাস, নাটক, কাব্য, কবিতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির মধ্যে তেমন চটক্দার চমৎকার-প্রদ গ্রন্থ কিছু বাহির হয় নাই,—নূতন বা ভাল গ্রন্থ সকল-রকমে বিশ ত্রিশখানি যে বাহির হয় নাই, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। সে সকল গ্রন্থদ্বারা বঙ্গবাণীর পুষ্টি যে হয় নাই, এমন কথা আমরা ভাবিও নাই; বরং কোন কোন গ্রন্থের জন্য তাঁহার গৌরব বাড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। তেমনতর দুইচারিখানি গ্রন্থের নাম আমরা না করিয়া পারিতেছি না।

সেকালে "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন" নাম দিয়া যে ধরণে দেশ-ভ্রমণকাহিনী কোনও কৌশলী লেখক লিখিয়া গিয়াছিলেন,—তদপেক্ষা সুন্দর উপায়ে এক

নূতন প্রণালীতে অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত, অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিভাণ্ডার আলোড়ন করিয়া কত অপূর্ব্ব কথা "বিচিত্র প্রসঙ্গ" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ এরূপ প্রণালীতে প্রকাশ বাঙ্গালা ভাষায় এই নূতন। বিষয়-গৌরবে ও নূতনত্বে এখানি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বাড়াইবে।

ইতিহাস বিভাগে এবার একখানি অতি সুন্দর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালায় দেখিতে দেখিতে অনেক জেলারই ইতিহাস বাহির হইয়া গেল। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার যতগুলি প্রাদেশিক ইতিহাস বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে "খুলনা ও যশোহরের ইতিহাস" শীর্ষস্থান অধিকার করিবার উপযোগী, সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক কাহিনী হিসাবে এ বৎসর আর একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ এ বিভাগের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিশ্রমলব্ধ ঐতিহাসিক মালমশলা গুলি অতি সুন্দরভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া তাঁহার কাহিনীর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এরূপ নীরস বিষয় লইয়া ইহার পূর্ব্বে আর কেহ কাহিনী লেখেন নাই। এই গ্রন্থে প্রতিছত্রে কৃতি-হস্তের নিপুণ রেখার নিদর্শন রহিয়াছে। উপন্যাস ও গল্প বিভাগের মধ্যে "বিন্দুর ছেলে" সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বহুদিন বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। এ খানিকে প্রকৃত প্রস্তাবে উপন্যাস বা ছোট গল্প বলিতে পারা যায় না।

নাটক-বিভাগে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের আহেরিয়া ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু-লিখিত "ক্লিওপেট্রা" অতীব সুন্দর হইয়াছে। অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "গীতগোবিন্দ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতা-পুস্তকের মধ্যে অষ্টোত্তর-শত কবিতা-বিশিষ্ট রবীন্দ্রনাথের "গীতালী" কাব্য-বিভাগের শিরোমণি।

সাহিত্যের হাটে আলোচ্য বর্ষে এই কয়খানি মাত্র একটু বড় গলায় পরিচয় দিবার মত গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। কাজেই সকল দিক দিয়াই এই বৎসরটি সাহিত্য-সংসারে বিশেষ কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

মধুমাসে।

দক্ষিণ আশার পথে অই আসে মলয় বাতাস,
চন্দনের স্নিগ্ধ গন্ধে বহি লয়ে শান্তির আশ্বাস।
মঙ্গল অরুণ পুষ্পে অশোকের আজিকে উৎসব
তোরণ-রচনা বাঁধে চূতশাখে তরুণ পল্লব,
পিককণ্ঠে হুলুধ্বনি ব্যক্ত আজি করে চরাচরে,
মাধবের আগমন বসুধার বিবাহ-বাসরে।

ম নন্দসখার সনে ধরণীর আজি স্বয়ম্বর,
প্রণয়ের নেত্রপাতে স্নিগ্ধালোকে প্লাবিত অম্বর,
প্রস্ফুট অজস্র পুষ্প বরমাল্য রচনার তরে,
দূর্ব্বার কোমল পথ নিখিলের শ্যামল প্রান্তরে,
সৌরভে দিগন্ত ভরে নব আম্রমুকুলের বাসে,
উৎসে বাজে নহবৎ, স্রোতস্বিনী নাচিছে উল্লাসে।

বাসাভাঙা পাখী করে কুলায়ের নব আয়োজন,
দিকে দিকে কলগীতি আনন্দের নব আবাহন।
বিরহ বিলুপ্ত ব্যর্থ আকাশের ধূসরের সনে,
আশার অপরাজিতা হাসে স্বচ্ছ সুনীল গগনে,
আবীর কুঙ্কুমছায় তরু-শাখে দোলে ফুল-ডোর—
দোললীলা, বিশ্ব আজি মিলনের মাধুরী-বিভোর।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভাস

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্বপ্রস্তাবপাঠের পর কোনও বন্ধু একটী প্রমাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমি বলিয়াছি সুঙ্গবংশের শেষ রাজা নন্দ। এটী ভ্রম। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত তুল্যকাল। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর প্রায় ১০০ বৎসর পরে মগধে সুঙ্গশাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ শাসনকালে কালিদাসের শকুন্তলা সমাজে পরম সমাদর লাভ করিয়াছিল। লোকে যেমন এক্ষণে রাধাকৃষ্ণের বা হরপার্ব্বতীর

চিত্র অবলম্বনে কারুকার্য্য করিয়া থাকে, তৎকালে দুষ্মন্তের মৃগয়া প্রভৃতি শকুন্তলার দৃশ্য অবলম্বনেও সেইরূপ করিত। ঈদৃশ প্রচার ও সমাদর লাভ করিতে ১০০ বৎসরের অধিক সময় লাগিবে মনে করা কিছুই অন্যায় নহে। তাহা হইলে চাণক্য ও কালিদাস একই সময়ের লোক, ইহাই দাঁড়াইল। এতেও চাণক্য অপেক্ষায় ভাসের পূর্ব্ববর্ত্তিতা অব্যাহত থাকিয়া যাইতেছে। আর পূর্ব্বপ্রবন্ধের মূল সিদ্ধান্তগুলির কোনও রূপ সঙ্কোচ হইতেছে না। এই ভ্রম দেখাইয়া দেওয়ার জন্য প্রদর্শকের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

প্রথম প্রস্তাবে ভাসের আবিষ্কার, যোগ্যতা, দাবী ও কাল সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। তৎপ্রতি একটী আপত্তি, আর ভাসের দেশ ও কাল সম্বন্ধে দুইটি মন্তব্য, উপস্থাপিত হইয়াছে। অদ্য প্রথমে সেই গুলির চর্চা করিব।

আপত্তিটী এই—চাণক্যের উদ্ধৃত 'নবং শরাবম্' ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোক ভাসের 'প্রতিজ্ঞা' নাটকে রহিয়াছে; অথচ ভাস উহাকে উদ্ধৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। তবে সে শ্লোক ভাসের নিজের। কাজেই পূর্ব্বপ্রস্তাবে উভয় শ্লোক একই স্থান হইতে উদ্ধৃত দেখাইয়া আমি যে প্রতিবাদের অবতারণা করিয়াছি, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ভাসের গ্রন্থে উভয় শ্লোকই ছিল, কিন্তু কদাচিৎ কোনও লেখকের দোষে একটী স্খলিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী লেখকেরা যথাদৃষ্ট একটী শ্লোকই লিখিয়া গিয়াছেন।

এ আপত্তি গুরুতর না হইলেও উপেক্ষার যোগ্য নহে। উত্তরে বলি—মনে করুন আপত্তির সদুত্তর হইল না। তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কার? "ভাস চাণক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী" শাস্ত্রিমহাশয়ের এ সিদ্ধান্তে আমার বিবাদ নাই। তিনি যে প্রণালীতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমি শুদ্ধ তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছি। আমাদের উভয়ের লক্ষ্য একই, পথ বিভিন্ন এই মাত্র প্রভেদ। তবে অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ প্রণালী নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে পারিলে শাস্ত্রিমহাশয়ের মুখরক্ষা তো হইলই, অধিকন্তু ভাসের পূর্ব্ববর্ত্তিতা দুইটী স্বতন্ত্র ভিত্তির আশ্রয়ে দ্বিগুণ দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইল।

দুঃখের বিষয় সংস্কৃতগ্রন্থকারেরা সব সময় উদ্ধৃত অংশের মূল নির্দ্দেশ আবশ্যক মনে করেন না, কাজেই মূলের উল্লেখ নাই বলিয়া, শ্লোকটী ভাসের নিজের একথা বলা যায় না। তত্ত্ববোধিনী ও মনোরমা সিদ্ধান্তকৌমুদীর দুইখানি প্রসিদ্ধ টীকা। তত্ত্ববোধিনীকার প্রতিপত্রে মনোরমার বিচার উদ্ধৃত করিয়াও দুইচারিটী স্থল ভিন্ন বড় একটা ঋণস্বীকার করেন নাই। আমাদের বাল্যে সংস্কৃতকালেজে

৺ভরত শিরোমণি মহাশয় স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। শুনিয়াছি কোনও একটা বড় মোকদ্দমায় তাঁহাকে জজ-পণ্ডিতরূপে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হাইকোর্টে যাইতে হইয়াছিল। Sir Barnes Peacock তখন প্রধান বিচারপতি। মোকদ্দমায় ৺দ্বারকানাথ মিত্র এক পক্ষের উকীল। শিরোমণি মহাশয় বচনের পর বচন উদ্ধৃত করিয়া অর্থ করিয়া যাইতেছেন, সবই মিত্র মহাশয়ের সপক্ষে। প্রতি-পক্ষের উকীল আর সহিতে পারিলেন না। তিনি Peacock সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ধর্ম্মাবতার, ইনি বচনের মূল বলিতেছেন না। শিরোমণি মহা-শয়কে প্রশ্ন করা হইল—আপনার কথার প্রমাণ কি ? ব্রাহ্মণের অভিমানে আঘাত লাগিল, তিনি মনে করিলেন, কথাগুলি প্রমাণিক নহে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। অমনি সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া বুক চাপড়াইয়া বলিলেন "প্রমাণ আমি" !! প্রতি-পক্ষ পাইয়া বসিলেন, বলিলেন—হুজুর এঁর প্রমাণ নাই, বলিতেছেন নিজেই প্রমাণ। বেগতিক দেখিয়া মিত্র মহাশয় বলিলেন—ধর্ম্মাবতার, স্মৃতিশাস্ত্রে ইঁহার যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্ব অধিকার, তাহাতে 'ইনি নিজে প্রমাণ' এ অন্যায় উক্তি নহে। তথাপি এঁর কথার মূল নাই এ অসম্ভব। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। তখন বুঝাইয়া বলা হইল—হুজুর জানিতে চান আপনার কথাগুলি ঋষিবাক্যের অনুকূল কি প্রতিকূল। "ও ! তাই !!" বলিয়া "যাজ্ঞবল্ক্য এই বলেন" "আপস্তম্বের মত এই" "আশ্বলায়নে এই আছে" ইত্যাদিক্রমে কয়েকটী নাম করিতেই Peacock সাহেব বলিলেন "Enough." বলা বাহুল্য মিত্র মহাশয়ের জয় হইল। এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝুন মূলনির্দ্দেশে ভারতবাসীর আগ্রহ কত দূর। সীতাহরণের পর রাম তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে মুমূর্ষু জটায়ুর দেখা পাইলেন। রামায়ণে আছে জটায়ু বলিলেন—

যামোষধিমিবায়ুষ্মন্ বিচিনোষি মহাবনে।
সা সীতা মম চ প্রাণা রাবণেনোভয়ং হৃতম্॥

ভবভূতি তাঁহার বীরচরিত গ্রন্থে এই শ্লোকটী অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু বাল্মীকির নাম করেন নাই। কণ্বশিষ্যগণের আগমনে রাজা দুষ্মন্ত বিনয়ের সহিত আসনত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিয়া শার্ঙ্গরবের মুখে কালিদাসের সর-স্বতী বলিয়া উঠিলেন—

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈর্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্॥

শ্লোকটী ভর্ত্তহরি স্বকৃত নীতিশতক গ্রন্থে কোনও মূলের উল্লেখ না করি গ্রহণ করিয়াছেন। বিদুরের গৃহে ভগবান্ অতিথি হইলে ভক্ত বলিয়াছিলেন-

যা মে প্রীতিঃ পুষ্করাক্ষ ত্বদাগমনসম্ভবা।
সা কিমাবেদ্যতে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্॥

আর কালিদাস সপ্তর্ষিগণকে মহাদেবের সম্মুখে আনিয়া তাঁহাদের মু বলাইতেছেন—

যা নঃ প্রীতির্বিরূপাক্ষ ত্বদনুধ্যানসম্ভবা।
সা কিমাবেদ্যতে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্॥

সপ্তর্ষির ও ভক্তের উক্তি ঠিক্ এক না হইলেও এতই সরূপ যে কালিদা ব্যাসের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন বলা যাইতে পারে, অথচ তিনি ব্যাসে নাম করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ দেখুন "নবং শরাবম্" ইত্যাদি শ্লোকে যদি মূলের উল্লেখ করিতে হয়, কে করিবেন? কবি স্বয়ং উল্লেখ করিতে পারেন না, কারণ নাটকে র যোজনা (Stage-direction) ভিন্ন কবির উক্তি থাকিতে পারে না। পাত্র উল্লেখ করিতে পারেন না, কারণ তখন তাঁহার অবসর নাই। কিসে তি অনবসর জানিবার জন্য তৎকালের ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। বৎসরা অবন্তির কারাগারে। তাঁহার মুক্তির জন্য, সেবকগণ অনেকে ছদ্মবেশে অব রাজের অধীনে নিয়োগ গ্রহণ করিয়াছেন। একদিন সুযোগক্রমে বৎসরা অবন্তিরাজকন্যা বাসবদত্তাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। চারিদিকে ঘোর কোল হল উঠিল। এক ছদ্মবেষ সেবক কোলাহলের মর্ম বুঝিয়া গর্জন করিয়া বলি উঠিলেন—"ভো ভোঃ সুহৃদঃ শৃণন্তু ভবন্তঃ নবং শরাবং সলিলৈঃ সুপূর্ণম্" ইত্যাদি দেশ ও কাল ভাবিলে তখন কার্য্যের সময়, বাক্যব্যয়ের সময় নহে। সে সম ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফে প্রভুর পদবীর অনুসরণ অথবা প্রভুর পশ্চাৎ ধাবিত বিপক্ষগণে আক্রমণ, ইহাই সেবকের কাজ। এই কার্য্যের অনুকূলে কোন্ কোন্ মুনি দিয়াছেন সে কথা তাঁহার মনেও আসিবে না, উল্লেখ দূরের কথা।

অতএব মূলের উল্লেখ নাই বলিয়া শ্লোকটি ভাসের রচিত মনে করিতে পা না।

পক্ষান্তরে, ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যেন চাণক্যের উদ্ধৃত উভয় শ্লোক এখানে ছিলই না, অধিকন্তু যে শ্লোকটী এখন আছে, তাহাও ভাস লিখিয়া

নাই, পরবর্ত্তী কোনও পাঠককর্ত্তৃক এস্থলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রমাণে প্রকরণ দেখুন। শ্লোকের বক্তা বৎসরাজের একজন চর। ছদ্মবেষে হাতীর মাহুত সাজিয়া গাত্রসেবক নামে এতদিন অবন্তিতে পরিচিত আছেন। বৎসরাজের পলায়ন-কালে তিনি মদমত্ততার ভান করিতেছিলেন। কোলাহল শুনিয়া ব্যাপার বুঝিয়া বলিতেছেন—অবিঘ্নমস্তু স্বামিনঃ। বয়ং খলু আর্য্যযৌগন্ধরায়নেন স্বেষু স্বেষু স্থানেষু স্থাপিতাশ্চারপুরুষাঃ। যাবদহমপি সুহৃজ্জনস্য সংজ্ঞাং করোমি। এতে তে সুহৃদো নিরোধমুক্তা ইব কৃষ্ণসর্পাঃ ইতস্ততো নির্ধাবন্তি। ভো ভোঃ সুহৃদঃ শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ। নবং শরাবম্ ইত্যাদি। সার এই—প্রভুর মঙ্গল হউক। আমরা আর্য্য যৌগন্ধরায়নের চর, যথাস্থানে নিযুক্ত হইয়াছি। আমি সুহৃদ্‌গণকে সঙ্কেত করি। এই যে সুহৃদেরা কারামুক্ত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। ওহে সুহৃদেরা শুন—নবং শরাবম্ ইত্যাদি।

এখানে "নবং শরাবম্" ইত্যাদি শ্লোকের প্রয়োজন কি? সুহৃদ্‌গণকে উপস্থিত ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়াই একমাত্র প্রয়োজন। কিন্তু এই সুহৃদেরা সকলেই কৌশাম্বীর লোক, বৎসরাজে পরম প্রীতিমান্। প্রভুর বিপদে বিপন্ন ও প্রপীড়িত হইয়া ইহারা স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি স্বজনের মমতা ত্যাগ করিয়া কৌশাম্বী ছাড়িয়া ছদ্মবেষে শত্রুনগরে নানাবিধ ক্লেশে দিন কাটাইয়া প্রভুর অপমানের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে। ইহাদিগকে এই মুহূর্ত্তে এই একটী শ্লোকে কর্ত্তব্য আর কি বুঝাইয়া দিবে? ইহারা কর্ত্তব্য পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছে, আর বুঝিয়াছে বলিয়াই আজ ইহারা অবন্তিতে প্রাণসংশয়ে প্রবাসী। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহাদের উত্তেজনার জন্য শ্লোকের প্রয়োজন একথাও বলা যায় না। সে সময়ে বরং বক্তারই কতকটা উত্তেজনার অভাব দেখা যায়। সুহৃদেরা যারপরনাই উত্তেজিত একথা বক্তার "নিরোধমুক্তা ইব কৃষ্ণসর্পাঃ" এই উপমা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুধু উত্তেজিত নয়, উত্তেজনার বশে ইহারা "ইতস্ততো নির্ধাবন্তি" —দংশন করিবার জন্য ইতস্ততঃ অপকারীর অন্বেষণে ধাবিত হইতেছে। চির-প্রার্থিত শুভযোগ অদ্য ইহাদের সমীপে উপস্থিত। তদ্দর্শনেই ইহারা উত্তেজিত। তৎকালে ইহাদের উৎসাহ চন্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগর-জলের ন্যায় উদ্বেল। ইহাদের জন্য শ্লোকের আবৃত্তি, আর অরণ্যে বৃক্ষোত্তমগণের বিমর্দ্দে প্রবৃত্ত প্রবল প্রভঞ্জনের বেগবৃদ্ধির জন্য ফুৎকার-প্রদান, তুল্যরূপে হাস্যকর সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ উদ্ধৃত "ভো ভোঃ সুহৃদঃ" এই কথার পর "শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "নবং শরাবম্" ইত্যাদি শ্লোকের শেষ পর্য্যন্ত, যেন প্রকরণের সহিত সঙ্গত

হইতেছে না। এই অংশ ছাড়িয়া দিলে বাক্যের শেষ ভাগের আকার এই হয়—"এতে তে সুহৃদো নিরোধমুক্তা ইব কৃষ্ণসর্পা ইতস্ততো নির্ধাবন্তি। ভোঃ সুহৃদঃ, ক নু খলু আর্য্যযৌগন্ধরায়ণঃ" ইত্যাদি—এই যে সুহৃদেরা সর্পের এদিকে সেদিকে ধাবিত হইতেছে! ওহে সুহৃদ্বর্গ,বলি,আর্য্য যৌগন্ধরায়ণ কোথা ইত্যাদি। ইহাতে বাক্যের স্বাভাবিকতা অক্ষত থাকিতেছে। এ সাঙ্ঘাতিক মু 'নেতা কোথায়' এ প্রশ্ন সর্বাগ্রে মনে হওয়ার কথা। সুহৃদ্বর্গের এ নিতান্ত অনাবশ্যক কতকগুলি উপদেশবাণী বর্ষণ করিয়া পরে নেতার অনুস অস্বাভাবিক সন্দেহ নাই। ভাস মহাকবি, তাঁহার চক্ষে এ অস্বাভাবিকতা পড়িল না এ মনে করা অন্যায়। তাই বলি শ্লোকটী এখানে প্রক্ষিপ্ত।

কবির দেশ ও কাল সম্বন্ধে মন্তব্য দুইটী এই—(১) ভাস খ্রীষ্টের পরবর্ত্তী তৃ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন। (২) সম্ভবতঃ তিনি দাক্ষিণাত্যের লোক

এই দুই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে উপস্থাপক মহাশয়ের দৃঢ়প্রতীতি নাই; তবে উভ আলোচনার যোগ্য এইমাত্র তাঁহার ধারণা। তিনি বলেন প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরা স্বপ্নবাসবদত্ত, পঞ্চরাত্র, অবিমারক, বালচরিত, অভিষেক এই কয়খানি নাটক অন্তেস্থিত শ্লোক এই উভয় সিদ্ধান্তের অনুকূল। স্বপ্নবাসবদত্ত ও বালচরি শ্লোকের শেষার্দ্ধ এই—

মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ।

অপর কয়খানি নাটকে আছে—

ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ।

অর্থ দুয়েরই এক—আমাদের রাজসিংহ সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন।

শ্লোকার্দ্ধে রাজসিংহ শব্দের বার বার আবৃত্তি দেখিয়া মন্তব্যের উপনেতা ম করেন ভাস রাজসিংহ নামক কোনও রাজার অধিকারে বাস করিতে নাটকান্তে শ্লোকচ্ছলে কবি স্বপ্রভুর শ্রীবৃদ্ধিকামনা করিতেছেন। অনুসন্ধা পাওয়া যায় খ্রীষ্টের পর তৃতীয় শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যবংশে রাজসিংহ না এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব ভাস ঐ সময়ে ঐ দেশে আবির্ভ হইয়াছিলেন একথা অসম্ভব নহে।

ইহার উত্তরে বলা যায় উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধের রাজসিংহ শব্দ কাহারও নাম নহে সিংহশব্দ এখানে শ্রেষ্ঠার্থবাচক। অর্থাৎ রাজসিংহশব্দ মহারাজ অর্থে প্রযু হইয়াছে। প্রমাণে পঞ্চরাত্র নাটকের শেষ বাক্য দেখুন। সেখানে বক্তা দ্রো তিনিও বলিতেছেন—ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ। এখা

দ্রোণের লক্ষ্য রাজা দুর্য্যোধন। রাজসিংহ শব্দ তৃতীয় শতাব্দীর রাজবিশেষের নাম হইলে দ্রোণ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া ঐ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন না।

তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে—দ্রোণকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি স্বপ্রভুর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। আর, পঞ্চরাত্রে না হয় দ্রোণবাক্য বলিয়া রাজসিংহ শব্দে মহারাজ অর্থ হইল, অন্য গুলিতে শেষ শ্লোক ভরতবাক্য, সেগুলিতে রাজসিংহ শব্দ কবির স্বপ্রভুর নাম মনে করায় দোষ নাই। উত্তর—নাটকের শেষে ভরতবাক্যে তাৎকালিক কোনও রাজার নাম করার রীতি নাই। না থাকার কারণও রহিয়াছে। কবি গ্রন্থ লিখিয়া উহার প্রচার অবিচ্ছিন্ন থাকুক ইহাই কামনা করেন, এজন্য যাহাতে প্রচারের বিঘ্ন হইতে পারে এমন কোনও কাজ তিনি করিতে পারেন না। কিন্তু তদানীন্তন কোনও রাজার নাম ভরতবাক্যে থাকিলে প্রচারবিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী, কেননা ঐ রাজার অভাবে সে নাটক আর অভিনীত হইতে পারিবে না। রাজসিংহের পুত্রের রাজত্বকালে "রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ" এই ভরতবাক্য নিতান্ত অসংলগ্ন হইবে, কাজেই ভাসের নাটকের অভিনয় রহিত হইবে, নাটকগুলির প্রচার বন্ধ হইবে।

বলিতে পারেন, ভাসের নাটকগুলির অপ্রচারই তো ঘটিয়াছিল, অতএব রাজসিংহ যে নাম সেই কথারই পোষকতা হইতেছে। কিন্তু অপর দিকে দেখুন সে কালে রাজারই সম্মুখে নাটকের অভিনয় হইত। ভাসের নাটকের অভিনয়-কালেও দেখা যায় স্বয়ং রাজা রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলেন। স্বপ্নবাসবদত্তে সূত্রধার প্রবেশ করিয়াই আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—

উদয়নবেন্দুসবর্ণাবাসবাদত্তাবলৌ বলস্য ত্বাম্।
পদ্মাবতীর্ণতীর্ণৌ বসন্তকম্রৌ ভুজৌ পাতাম্॥

অর্থাৎ—"বলদেবের দুই বাহু আপনাকে রক্ষা করুক"—বলস্য ভুজৌ ত্বাং পাতাম্। আশীর্ব্বাদ সমগ্র পরিষদের প্রতি হইল না, বাছিয়া একটী মাত্র লোককে করা হইল। সে লোক রাজা ছাড়া আর কেহ হইতে পারে না। 'ত্বাম্' এই একবচন হইতে রাজা উপস্থিত বুঝা যাইতেছে। অবিমারকে একথা আরও স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। তত্রত্য আশীর্ব্বাদ-শ্লোকটী এই—

উৎক্ষিপ্তাং সানুকম্পং সলিলনিধিজলাদেকদংষ্ট্রাগ্ররূঢ়াম্
আক্রান্তামাজিমধ্যে নিহতদিতিসুতামেকপাদাবধূতাম্।
সম্ভুক্তাং প্রীতিপূর্ব্বং স্বভুজবশগতামেকচক্রাভিগুপ্তাং
শ্রীমান্ নারায়ণস্তে প্রদিশতু বসুধামুচ্ছ্রিতৈকাতপত্রাম্॥

অর্থাৎ "ভগবান্ নারায়ণ আপনাকে সমগ্রপৃথিবীর অধীশ্বর করুন"। রা ভিন্ন আর কেহ এ আশীর্ব্বাদের পাত্র হইতে পারেন না। অপরের প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলে রাজদ্রোহ হইবে। উভয় স্থলেই রাজাকে রঙ্গাল উপস্থিত বলিতেছি কারণ শ্লোকোক্ত 'ত্বাম্' ও 'তে' এই যুষ্মচ্ছব্দের নির্দে অনুপস্থিতের প্রতি হইতে পারে না।

এই উভয় নাটকের ভরতবাক্যে আছে "রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ"—আমাদে রাজসিংহ সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। রাজা বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখে উপর নাম উচ্চারণ করা হইতেছে, অথচ সম্মানসূচক বা প্রশংসাবোধক এক বিশেষণও দেওয়া হইতেছে না। 'আমাদের দীনপালক রাজসিংহ', 'আমাদে শরণাগতবৎসল রাজসিংহ' ইত্যাদির কোনও একটী বলিলেও এক প্রক চলিত। উচিত সম্বোধন করিতে হইলে বলিতে হয়—আমাদের দীনপাল রাজাধিরাজ শ্রীরাজসিংহ দেব ইত্যাদি। আছে সুধু "আমাদের রাজসিংহ"। অসহ্য বেয়াদবী। এযে বেয়াদবী তাহা ভাস বিলক্ষণ জানিতেন। রাজা (রাজাই, মন্ত্রীর নাম ও সম্মানসূচক বিশেষণ বিনা লোকে উচ্চারণ করুক ভ তাহাতে রাজি নহেন। দৃষ্টান্ত দেখুন—বৎসরাজ শত্রুকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছেন আপ্তভৃত্য হংসক আসিয়া অমাত্য যৌগন্ধরায়ণকে এই সংবাদ জানাইল। ন কথার পর যৌগন্ধরায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"অথ মামন্তরেণ স্বামী ন কিঞ্চিদা —আচ্ছা আমার সম্বন্ধে প্রভু কিছু বলিলেন না?

হংসকঃ—অয্য, অত্থি। পদক্খিনীকরঅন্তো ভট্টারং অন্তজ্জলাবগাঢ় দিট্‌ঠীএ বহুকং সন্দট্‌ঠুকামেণ বিঅ ক্ষি ভট্টিনা উত্তো গচ্ছ জোঅন্ধ— মহাশয় তাহাও বলিবার আছে। যখন জলভারাক্রান্ত চক্ষে প্রভুর প্রদ কিরি, তখন প্রভু যেন কত কিছু বলিবেন মনে করিয়া, বলিলেন—যাও যৌগন্ধ

যৌগন্ধরায়ণঃ—স্বৈরমভিধীয়তাং স্বামিবাক্যমেতৎ—স্বচ্ছন্দে বলিয়া য এযে প্রভুর বাক্য।

হংসকঃ—জোঅন্ধরায়ণ পেক্‌খেহি ত্তি—যৌগন্ধ রায়ণের সঙ্গে দেখাকর এইমা

এখানে দেখুন হংসক "যাও যৌগন্ধ—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পা না। বুঝিল সম্ভ্রমসূচকপদবিরহিত কেবল যৌগন্ধরায়ণ শব্দ তাহার মু আসিলে সে অপরাধী হইবে। অনুক্ত বাক্যার্দ্ধ তাহার মুখেই র গেল, দেখিয়া যৌগন্ধরায়ণ বুঝাইয়া দিলেন—প্রভুর বাক্য তুমি বলিতে এতো তোমার নিজের কথা নহে। অতএব নিরুপপদ যৌগন্ধরায়ণ ন

উচ্চারণ এক্ষেত্রে তোমার দোষের নহে। তখন হংসক প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "যাও যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে দেখা, কর প্রভু এই কথা বলিলেন"। যে কবি শিষ্টাচার রক্ষার এত দূর পক্ষপাতী তিনি এ শ্লোকে নির্ব্বিশেষণে রাজার নাম ব্যবহার করিয়াছেন, একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

আবার রাজসিংহ শব্দ নাম হইলে, "নঃ" শব্দটীও এখানে ক্ষমার যোগ্য নহে। 'নঃ রাজসিংহ'ঃ—আমাদের রাজসিংহ—একথা রাজার সম্মুখে রাজপিতা রাজমাতা প্রভৃতি গুরুজনের মুখে শোভা পাইতে পারে, একজন অভিনেতার মুখে দণ্ডনীয় বলিয়া মনে হয়। এই সকল কারণে উল্লিখিত শ্লোকসমূহে রাজসিংহ শব্দে উপমিতকর্ম্মধারয় মনে করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলে পাণ্ড্যবংশের রাজসিংহের সহিত ভাসের কোনও সংশ্রব রহিল না, আর কবিকে দাক্ষিণাত্যের বা খ্রীষ্টের পরবর্ত্তী তৃতীয় শতাব্দীর লোক মনে করার কারণ উপস্থিত হইল না।

ভাসকে দাক্ষিণাত্যের লোক মনে করার পক্ষে আরও দুইটী কারণের উল্লেখ হইয়াছে। প্রথম, ভাস বৈষ্ণব। দ্বিতীয়, বর্ত্তমানে ভাসের গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যেই আবিষ্কৃত হইল।

ভাস বৈষ্ণব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার পুস্তকের বহুস্থলে নারায়ণের স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। শিব বা অন্যদেবতার মাহাত্ম্যবর্ণন একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। কিন্তু ভাসের এই আত্যন্তিক বিষ্ণুভক্তি দেখিয়া আমাদের মনে হয়, তিনি দক্ষিণাত্যের লোক নহেন। দাক্ষিণাত্য এক কালে লঙ্কেশ্বর রাবণের অধিকার ছিল। খর, দূষণ ত্রিশিরা এই তিনটী রাজপ্রতিনিধি মিলিয়া সে দেশ শাসন করিতেন। শৈবকুলচূড়ামণি রাবণ শ্রীবিষ্ণুর চিরশত্রু ও বিষ্ণুভক্তের দারুণ বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার অধিকারে বৈষ্ণব থাকিতে পারিত না। মুনিগণ লুকাইয়াও যাগাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। দাক্ষিণাত্য তখন শৈবের আবাস ছিল, বৈষ্ণবগণ আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির বিজয়াভিযানের পর ক্রমে বৈষ্ণবেরা দক্ষিণাত্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখনও বোধ করি সে অঞ্চলের লোকের বারো আনা ভাগ শৈব, আর, শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে মিলিয়া বাকী চারি আনা। মহারাষ্ট্রীয়েরা এখনও "শিব হর হর মহাদেও" বলিয়া জয়ধ্বনি করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে একদা Carnatic Infantry নামক সৈন্যদল রণবাদ্য বাজাইয়া গান করিতে করিতে কলিকাতা হইতে বারিকপুরের দিকে যাইতেছিল। দাঁড়াইয়া শুনিলাম "শঙ্কর

শঙ্কর শঙ্কর শঙ্কর শঙ্কর মহাদেওআ” এই তাহাদের প্রয়াণসঙ্গীত। অতএ বৈষ্ণব বলিয়া ভাসকে দাক্ষিণাত্যের লোক মনে করা সঙ্গত হইবে না।

'ভাসের লুপ্ত গ্রন্থগুলি সে দিনে দাক্ষিণাত্যেই পাওয়া গেল ইহাতেও কিছু প্রমাণিত হয় না। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি মহাভাষ্য আর্য্যাবর্ত্তে লুপ্ত হইয়া গিয়াছি দাক্ষিণাত্য হইতে পুঁথি আনিয়া উহার পুনরুদ্ধার করা হয়। বাক্যপদীয় গ্র ভর্ত্তৃহরি বলিতেছেন—

যঃ পতঞ্জলিশিষ্যেভ্যো ভ্রষ্টো ব্যাকরণাগমঃ।
কালে স দাক্ষিণাত্যেষু গ্রন্থমাত্রে ব্যবস্থিতঃ॥
পর্ব্বতাদাগমং লব্ধ্বা ভাষ্যবীজানুসারিভিঃ।
স নীতো বহুশাখত্বং চন্দ্রাচার্য্যাদিভিঃ পুনঃ॥

ভাল, ভাষ্যকারের লুপ্ত গ্রন্থ দাক্ষিণাত্য হইতে আহৃত হইল এই ভাবিয়া ভাষ কারকেও দাক্ষিণাত্যের লোক বলিতে হইবে কি? বলিলে ভুল হইবে, ভাষ্যকারে জন্মভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। দেখুন, কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিলেন— “লোকতঃ অর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম্মনিয়মঃ, যথা লৌকিকবৈদিকেষু”। ইহার বিচারে ভাষ্যকা পতঞ্জলি দেখিলেন বার্ত্তিকে অকারণ 'লৌকিক' ও 'বৈদিক' এই দুইটী জটিল শ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের পরিবর্ত্তে 'লোক' ও 'বেদ' বলিলে সূত্রও সংক্ষি হয় অর্থবোধেরও ব্যাঘাত হয় না। বার্ত্তিককার এই সুগমতা উপেক্ষা করিয় 'লোক' ও 'বেদ' শব্দে 'ঠঞ্' 'ঠক্' ও দুই তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া গ্রন্থগৌর কেন করিতে গেলেন তাহার হেতুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ভাষ্যকার দু প্রকারে মীমাংসা করিলেন। প্রথম মীমাংসা এক কথায় হইল—'এ তদ্ধিতপ্রয়ো বার্ত্তিককারের খামখেয়ালি মাত্র। কাত্যায়ন দাক্ষিণাত্যের লোক, আর সে দেশে লোক তদ্ধিত বড় ভালবাসেন, স্থানে অস্থানে তদ্ধিত যোগ করিয়া থাকেন এখানে বার্ত্তিককার অস্থানে তদ্ধিত যোগ করিয়াছেন”—“প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষি ণাত্যাঃ। যথা লোকে বেদে চ ইতি প্রযোক্তব্যে যথা লৌকিকবৈদিকেষু ইতি প্রযুঞ্জতে।” এইরূপে যিনি পরকে দাক্ষিণাত্য বলিয়া অনুযোগ দেন, তিনি স্বয় দাক্ষিণাত্য নহেন এ নিশ্চিত। তাই বলি, ভাসের পুঁথি দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গে বলিয়া ভাস দাক্ষিণাত্যের লোক এ তেমন কাজের কথা নহে।

তারপর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। আপনার ধরিয়া নিন যে ভাসের নাটকের দেশ ও পাত্রগণ, একটীও খাঁটি দাক্ষিণাত্যে নহে। এতেও ভাসকে আর্য্যাবর্ত্তের লোক বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু ভাসকে আর্য্যাবর্ত্তের লোক বলিবার পক্ষে এতদপেক্ষায় প্রকৃষ্টতর যুক্তি রহিয়াছে। স্বপ্নবাসবদত্ত ও বালচরিত নাটকের ভরতবাক্য এই—

ইমাং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাম্।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ॥

অর্থাৎ— যে পৃথিবীর দুইকর্ণে হিমালয় ও বিন্ধ্য দুই কুণ্ডলরূপে বিরাজমান, আমাদের মহারাজ সেই সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হউন। শ্লোকে হিমালয় ও বিন্ধ্যকে দেবী ধরিত্রীর কর্ণের কুণ্ডল কল্পনা করা হইল। কর্ণদ্বয় একটী দক্ষিণে ও একটী বামে থাকে। ভাসের চক্ষে পৃথিবীর দক্ষিণে ও বামে বিন্ধ্য ও হিমালয় এই দুই পর্ব্বত রহিয়াছে। অতএব ভাসের পৃথিবী পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত, তাহার দেহ হিমালয়ের উত্তরেও নাই বিন্ধ্যের দক্ষিণেও নাই। পৃথিবী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত মনে করিলে হিমালয় ঊর্দ্ধে ও বিন্ধ্য তাহার নিম্নে আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে আর এই দুইটীকে কর্ণের কুণ্ডল মনে করা যায় না (কারণ কর্ণদ্বয় সমসূত্রে অর্থাৎ পাশাপাশি থাকে, ঊর্দ্ধাধোভাবে থাকে না), শ্লোকের রূপকে গুরুতর দোষ পড়ে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরবসাগর এই চতুঃসীমায় বদ্ধ ভূখণ্ডকে ভাস 'মহী' বলিয়া জানিতেন। এই সীমার মধ্যে কোথাও তাঁহার বাস ছিল। অতএব তাঁহাকে উত্তর ভারতের লোক মনে করা অন্যায় নহে।

আবার দেখিতে পাই, অবিমারক নাটকে পুত্রের বিবাহের জন্য কাশির ও সৌবীর দেশের রাজা শ্যালক কুন্তিভোজের কন্যা প্রার্থনা করিতেছেন। ঐ কন্যা আবার সৌবীর-রাজের ভাগিনেয়ীও বটেন। শ্যালক এ প্রার্থনা অনুচিত মনে করিতেছেন না। অপর সকলেও ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কারণ দেখিতেছেন না। রাজমন্ত্রী কৌঞ্জায়ন রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন— "স্বামিন্, বহুষপি ক্ষত্রিয়েষু পূর্ব্বসম্বন্ধবিশেষৌ সৌবীররাজকাশিরাজৌ স্বামিনো ভগিনীপতিত্বে তুল্যৌ অস্মৎসম্বন্ধযোগ্যৌ ইতি স্বামিনা চিন্তিতৌ। তত্র পূর্ব্বমেব সৌবীররাজেন পুত্রস্য কারণাৎ দূতঃ প্রেষিতঃ…"—স্বামিন্, ক্ষত্রিয় অনেক উপস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে সৌবীররাজ ও কাশিরাজ পূর্ব্বসম্বন্ধ আছে বলিয়া বিশিষ্ট। উভয়েই আপনার ভগিনীপতি—আপনার নিকট সমান। আপনিও ইঁহাদের সঙ্গেই সম্বন্ধ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সৌবীররাজ পূর্ব্বে পুত্রের জন্য দূত পাঠাইয়াছিলেন…। অপর মন্ত্রী ভূতিক বলিতেছেন— "স্বামিন্ সৌবীররাজকাশিরাজৌ স্বামিনো ভগিনীপতিত্বে তুল্যৌ, অথ দেব্যা-ভ্রাতা ইতি

সৌবীরেন্দ্রো গুণাধিকঃ”— স্বামিন্, সৌবীররাজ ও কাশিরাজ আপনার ভগিনীপতি বলিয়া তুল্যগৌরব, কিন্তু দেবীর ভ্রাতা বলিয়া সৌবীররাজ শ্লাঘ্যতর। সৌবীরকুমারের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ হইল। দেবর্ষি নারদ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। বর্ত্তমানে অনেক স্থানেই এরূপ বিবাহে ঘোরতর আপত্তি হইবে। কিন্তু মহাভারতের সময়ে এরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। যুধিষ্ঠিরাদির মাতুল বসুদেব। অর্জ্জুন বসুদেবকন্যা সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দীতে মগধরাজ অজাতশত্রু কোসলাধিপতি মাতুল প্রসেনজিতের কন্যা বিবাহ করেন। কালে এ প্রকার বিবাহ উত্তর-ভারত হইতে উঠিয়া যায়। বাঙ্গালায় এক্ষণে বর-কন্যায় পাঁচ কন্যার ব্যবধান না থাকিলে বিবাহ হয় না। শুনিয়াছি দক্ষিণ ভারতে এখনও মাতুল-কন্যা বিবাহ প্রচলিত আছে। অতএব যে কালে সমগ্র ভারতে মাতুল-কন্যা বা পিতৃস্বসার কন্যা বিবাহে লোকে দোষ মনে করিত না, ভাস সেই কালে উত্তর-ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, একথা বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য এতদ্দ্বারা ভাস খ্রীষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে মগধেশ্বর অজাত-শত্রুর অধিকারে, বা কোসলে প্রসেনজিতের শাসন কালে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, একথা বলা হইতেছে না।

এই পর্য্যন্ত লেখার পর ভাস সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল মহাশয়ের টিপ্পনী ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ হস্তগত হইল। দেখিলাম ইঁহারা উভয়েই ভাসের নাটক হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব কি পাওয়া যায় প্রধানতঃ তাহারই চর্চ্চা করিয়াছেন। আমার প্রধান উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। দুর্ব্বুদ্ধির বশে আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তি ভাস ও কালিদাসের কবিত্বের তুলনার প্রয়াসী। আমার পক্ষে কবির কালবিচার আনুষঙ্গিক মাত্র। অতএব তাঁহাদের কালবিচারে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া-ছেন, তাহার সহিত আমার সিদ্ধান্তের অনেক প্রভেদ, এজন্য সামান্য ভাবে যৎ-কিঞ্চিৎ বলিতে চাই।

১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসের Modern Review নামক পত্রে চৌধুরী মহাশয় বলেন—

"Mr K. P. Jayaswal, following the clue afforded by the Bharat-vakya of his dramas, has come to the conclusion that Bhasa was the court poet of Narayana the Kanva. In my opinion Mr Jayaswal's

theory must stand, until and unless evidence of a conclusive character comes forth to disprove it."

ইহার সার এই— "ভাসের নাটকের ভরতবাক্যে শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল মহাশয় সূত্রবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া তদবলম্বনে স্থির করিয়াছেন যে, ভাস কণ্ব-বংশীয় রাজা নারায়ণের সভাপণ্ডিত বা রাজকবি ছিলেন। আমার মতে, বিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত না হওয়া পর্য্যন্ত জয়সোয়াল মহাশয়ের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হইবে"। ইতিহাস বলে, রাজা নারায়ণ খ্রীষ্টের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ইঁহাদের উভয়ের মতে ভাসেরও ঐ কাল।

যে সূত্র অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, তাহা ১৯১৩ সালের জুলাই মাসের Journal of the Asiatic Society নামক পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল মহোদয় বলিয়াছেন—

"In the Madhyama-vyayoga, the Bharata-vakya, or, to be more accurate, the last verse (for the expression Bharata-vakya is not to be found there) runs thus :—"As the Samudra is the lord of rivers, as fire is the lord of offerings, as even mind is the lord of the organs of senses, so our lord (lit. master) is the majestic Upendra". This Upendra seems to be alluded to quite in the opening line in the manuscript of Mr. Ganapati Sastri. A more pointed *slesha* may be found in the first verse of the *Avimaraka* where Upendra is replaced by *Narayana* :

"May the majestic Narayana rule for you this earth under lofty one umbrella &c" Upendra and Narayana are equivalent terms; which of the two is the proper name of the 'master' of Bhasa ? I am inclined to identify the Kanva Narayana with Bhasa's Upendra and Narayana (about 53—41 B. C.)"

ইহার তাৎপর্য্য এই—"মধ্যমব্যায়োগের শেষ শ্লোকে আছে—সমুদ্র যেমন নদীর প্রভু, অগ্নি যেমন আহুতির প্রভু, মন যেমন ইন্দ্রিয়গণের প্রভু, তেমনই ভগবান্ উপেন্দ্র আমাদের প্রভু। গণপতি শাস্ত্রি মহাশয় যে পুঁথি খানিতে কোনও নাম পান নাই, তাহার প্রারম্ভশ্লোকেই এই উপেন্দ্রের প্রতি আবার লক্ষ্য করা হইয়াছে। অবিমারক নাটকের নির্দ্দেশ আরও স্পষ্ট। সেখানে উপেন্দ্র নাম তুলিয়া দিয়া স্পষ্টই নারায়ণ বলা হইয়াছে। যথা—আশা করি শ্রীমান্ নারায়ণ আপনার হইয়া একচ্ছত্রভাবে এই পৃথিবীর শাসন করিবেন। উপেন্দ্র ও নারায়ণ একই অর্থ। এই দুইটীর কোন্‌টী ভাসের প্রভুর প্রকৃত নাম ?...আমার মনে হয় খ্রীষ্টের পূর্ব্বে

৫৩ হইতে ৪১ বৎসর মধ্যে কণ্ববংশে নারায়ণ নামে যে রাজা ছিলেন, তিনি ভাসের উপেন্দ্র ও নারায়ণ।"

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণবকবি নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি উপেন্দ্র, নারায়ণ, দামোদর প্রভৃতি নাম অবশ্য ব্যবহার করিবেন। তাহা দেখি যদি মনে করা হয় যে, ঐ ঐ নামের ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইতেছে, তা হিন্দুর পক্ষে শুদ্ধ ভগবানের নাম করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকল দেবতার না আমরা মানুষের নাম করিয়া লইয়াছি। কালীশঙ্কর, হরিহর, ইত্যাদিরূ হিন্দুর নাম করা হইয়া থাকে। অতএব শাক্ত কবি কালীনাম করিলেই ব হইবে, ও পাড়ার কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তাঁহার উদ্দিষ্ট। বৈষ্ণব কবিও হরিন করিয়া পার পাইবেন না। কুক্ষণে কবি কালিদাস তাঁহার কাব্যে গুপ্ ধাতু গুটিকতক প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, আর ঐ সূত্রে ইউরোপীয় প্রত্নবিৎ তাঁহাকে গুপ্তবংশের রাজকবি বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া বসিয়াছেন! এ নূতন প্রকারে গবেষণা। প্রণালীটী এই—কবির গ্রন্থে কোন্ কোন্ ধাতুর প্রয়োগ আছে, তাহা একটা তালিকা করুন। তালিকায় কোন্ ধাতুর বাহুল্য তাহাও দেখুন। এক্ষ ভারতের রাজাবলীর মধ্যে কাহার বা কোন্ বংশের নাম ঐ ধাতু হইতে নিষ্প তাহা দেখিলেই হইল। কবি ঐ রাজা বা রাজবংশের স্তাবক না হইয়া যান্ না এমন সহজ প্রণালীর অনুকরণ হইবে না তাও কখন হয়? আমরা ইহার সুধু অনু করণ ধরিয়াছি নয়, অনুকরণে আদর্শ ছাড়াইয়া বহু ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছি। ধাতু প্রত্যয় গোলমেলে জিনিশ, নামের প্রয়োগ দেখা আরও সহজ। আমরা তাহা করিতেছি। আমাদের প্রযত্নে প্রত্নবিদ্যার পথ অচিরে নরকের পথ অপেক্ষায় সুগম হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই! এই অভিনব প্রণালীর প্রসাদেই ভাস আ উপেন্দ্র নাম উচ্চারণ করিতে যাইয়া রাজা নারায়ণের চাটুকবি বলিয়া ধরা পড়িতে চলিয়াছেন। একটি গল্প মনে পড়িল। বাদশাহ পীড়িত, পথ্য ব্যবস্থা হইয়াছে— উষ্ট্রমাংস। শীকারীরা উট-শীকারে বাহির হইয়া বনের দিকে চলিয়াছে। পথে দেখিল এক খরগোস বন ছাড়িয়া মহালম্ফে মাঠ পার হইয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাস করিল—ও ভাই খরগোস, এত ব্যস্ত যে? খরগোস না দাঁড়াইয়া ছুটিতে ছুটিতেই বলিল—ভাই সব, বাদশাহের লোক উট ধরিতে বনে আসিতেছে। শীকারীর ভাব না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল—তাতে তোমার ভয়টা কি? খরগোস হাসিয়া কহি —আরে ভাই, শত্রু অনেক। জানি কি, কে কোথা হইতে চেঁচাইয়া উঠিবে 'এট উটের ছানা' তবেই তো গেলাম!! খরগোস পলাইতে পারিয়াছিল,

উপেন্দ্র ধরা পড়িয়াছেন, আর দেখিতেছি ভাসকেও ধরাইয়া দিতে বসিয়াছেন।

উপেন্দ্র-ঘটিত শ্লোকটী এই—

যথা নদীনাং প্রভবঃ সমুদ্রো যথাহুতীনাং প্রভবো হুতাশঃ।

যথেন্দ্রিয়াণাং প্রভবং মনোঽপি তথা প্রভুর্নো ভগবানুপেন্দ্রঃ॥

এই শ্লোকে উপেন্দ্র শব্দে রাজা নারায়ণকে লক্ষ্য করা অভিপ্রেত হইলে কবি 'ভগবান্' এই বিশেষণটি দিতেন না। মুনি, ঋষি বা দেবতার বিশেষণে 'ভগবান্' বসিতে পারে, রাজার প্রতি এ বিশেষণ চলিত নাই। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি তৎকালে রঙ্গভূমিতে রাজা উপস্থিত থাকিয়া অভিনয় দেখিতেন। এই নাটকের অভিনয় কালে রাজা নারায়ণ সম্মুখে বসিয়া আছেন মনে করিতে পারি। যদি যথার্থই এই শ্লোকে পুরোবর্ত্তী রাজাকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তবে শ্লোকটী চাটুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কথাগুলি আত্মবিষয়ক বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলে চাটুবাক্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কিন্তু "তথা প্রভুর্নো ভগবানুপেন্দ্রঃ" এই কথা উচ্চারণ করিলে রাজা নারায়ণ কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না যে তিনি স্বয়ং এই শ্লোকের বিষয়। বস্তুতঃ রাজা নারায়ণকে লক্ষ্য করা যদি অভিপ্রেত হইত, তবে কবি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে 'নারায়ণ' শব্দেরই উচ্চারণ করিতেন। "নারায়ণো নঃ প্রভবস্তথৈব" বলিলে সর্ব্বাভিপ্রায় সিদ্ধ হইত। অধিকন্তু প্রভু শব্দের পরিবর্ত্তে প্রভব শব্দ থাকাতে পূর্ব্ববর্ত্তী তিন চরণের সহিত চতুর্থ চরণ অধিকতর সুশ্লিষ্ট হইত। 'প্রভব' বলাতে অর্থের দোষ হয় মনে করা অনুচিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ভীম এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনেক শত্রুর নিপাত ঘটাইয়াছেন, শত্রুযোজিত বহুবিধ বিপজ্জাল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। অতএব 'প্রভবতি শত্রুভ্যঃ অনেন' এই বুৎপত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে পাণ্ডবগণের 'প্রভব' বলা চলে। যদি বলেন "শ্লোকটী ভরতবাক্য, ভীমের উক্তি নহে, অতএব চতুর্থ চরণে রাজাকে লক্ষ্য করা আবশ্যক; অথচ রাজা অর্থে প্রভব শব্দের প্রয়োগ নাই, কাজেই ঐ শব্দদ্বারা চতুর্থপাদ পূরণ করা অনুচিত", তাহা হইলে "নারায়ণো নোঽধিপতিস্তথৈব" এই পাঠ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল মহাশয় শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। চতুর্থ চরণের 'প্রভু' শব্দে রাজাকে বুঝিয়া তিনি অন্য তিন চরণের 'প্রভব' শব্দেরও রাজা অর্থই ধরিয়া লইয়াছেন। ফলে এখানে 'প্রভব' শব্দের অর্থ তো রাজা নয়ই, প্রভুশব্দেও

রাজাকে বুঝা উচিত হইবে না। কিন্তু এ বিচার আমার পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্যে মধ্যে নহে। আমার পক্ষে এক্ষণে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, নারায়ণ শ শ্লোকে সুপ্রবেশ হইলেও যখন কবি তাহা ব্যবহার করেন নাই, তখন তিনি ইচ্ছ পূর্ব্বক এ স্থলে ঐ শব্দ ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব এ শ্লোকে লোকে উপে শব্দে রাজা নারায়ণকে বুঝুক ইহা কবির অভিপ্রায় নহে।

অবিমারকের শ্লোকটী এই—

উৎক্ষিপ্তাং সানুকম্পং সলিলনিধিজলাদেকদংষ্ট্রাগ্ররূঢ়াম্
আক্রান্তামাজিমধ্যে নিহতদিতিসুতামেকপাদাবধূতাম্।
সন্তুক্তাং প্রীতিপূর্ব্বং স্বভুজবশগতামেকচক্রাভিগুপ্তাং
শ্রীমান্ নারায়ণস্তে প্রদিশতু বসুধামুচ্ছ্রিতৈকাতপত্রাম্॥

শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল মহাশয় চতুর্থ চরণের অর্থ করিয়াছেন—'নারায়ণ আপনা হইয়া পৃথিবীর শাসন করুন'। এ অর্থ কিরূপে আইসে বুঝিতে পারিলাম না। শ্লোকে আছে 'বসুধাং প্রদিশতু'। 'প্রদিশতু' শব্দ প্রপূর্ব্বক দিশ্ ধাতুর প্রয়োগ। 'শাসন করা' অর্থে প্রপূর্ব্বক দিশ্ ধাতুর প্রয়োগ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভাল মানিলাম যেন 'শাসন করা' অর্থ হয়, তথাপি 'নারায়ণ আপনার হইয়া পৃথিবীর শাসন করুন' একথার তাৎপর্য্য বুঝা সহজ নহে। কথাটা অবশ্য রঙ্গালয়ে উপবিষ্ট পুরোবর্ত্তী রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে। অতএব 'আপনার হইয়া' অর্থ 'রাজার হইয়া'। 'নারায়ণ রাজার হইয়া' বলিলে নারায়ণ ও রাজা বিভিন্ন ব্যক্তি হইয়া পড়িল। তাহা হইলে জয়সোয়াল মহোদয়ের ইষ্টসিদ্ধি হইল না। শ্লোকের 'তে' শব্দটীতে আট্‌কাইতেছে। এটীকে অপপাঠ মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়া 'নারায়ণঃ বসুধাং প্রদিশতু' এরূপ পাঠ ধরিলেও জয়সোয়াল মহাশয়ের সিদ্ধান্তের পোষকতা হয় বলিয়া বোধ হয় না। 'শ্রীমান্' এই বিশেষণটী উহার প্রতিকূল। 'শ্রীমান্ নারায়ণঃ' এই কথায় কবি যেন বলিতে চান 'শ্রীসনাথো নারায়ণঃ' অর্থাৎ 'লক্ষ্মীর সহিত এক যোগে নারায়ণ'। কিন্তু দেখুন লক্ষ্মী স্বয়ং কখনও রাজত্ব প্রভৃতি পার্থিব ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন না। তিনি এগুলির প্রদাত্রী বলিয়া পরিচিত, ইহাদের উপভোক্ত্রীরূপে কেহ তাঁহাকে জানে না।

বস্তুতঃ, 'প্রদিশতু' শব্দ এখানে 'দদাতু' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রমাণে শ্লোকের কবিত্বের বিচার আবশ্যক। কবিত্বচর্চ্চা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলেও প্রয়োজনের অনুরোধে আপনাদের অনুমতি লইয়া করিতে

চেষ্টা করিব। শ্লোকটী কাব্যাংশে উত্তম। কবি সমর্থ ব্যক্তির দানের প্রকার বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—“নারায়ণস্তে বসুধাং প্রদিশতু”—মহারাজ, আপনি নারায়ণের পরম ভক্ত। আশা করি ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া পার্থিব দানের সারভুত, রত্ন ও মণিনিচয়ের আকর, এই বসুধাই আপনার ন্যায় সেবককে অর্পণ করিবেন। আপত্তি—কবিবর, এ তোমার দুরাশা। লক্ষ্মীর অনুগ্রহ না হইলে কেহ পার্থিব সম্পদের অধিকারী হইতে পারে না। খণ্ডন—‘শ্রীমান্ নারায়ণঃ’—লক্ষ্মী চিরকাল নারায়ণের অনুগামিনী। যেখানে নারায়ণ তুষ্ট সেখানে লক্ষ্মীও তুষ্ট ; অতএব আশা অযুক্ত নহে। প্রশ্ন—ব্রহ্মার রচনা বসুধা বিষ্ণু দিবেন, এ কিরূপ দান? উত্তর—‘সলিলনিধিজলাৎ সানুকম্পম্ উৎক্ষিপ্তাং বসুধাং’—ভগবান্ নারায়ণ পরের ধনে পোদ্দারী করেন না। ব্রহ্মার সৃষ্ট বসুধা সাগর জলে ডুবিয়া নষ্টই হইয়া গিয়াছিল। বরাহমূর্ত্তিতে নারায়ণ তাহার উদ্ধার করেন, অতএব বসুধা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি, উহার দানে তাঁহারই অধিকার। আপত্তি—কিন্তু তুমি দেখিতেছ না যে সর্ব্বাগ্রে সেবককে দান, স্বার্থসংসৃষ্ট হইয়া, অধম দানে পরিণত হইল। খণ্ডন—‘নিহতদিতিসুতাম্ আজিমধ্যে আক্রান্তাং বসুধাম্’—অধম দান হইবে কেন? প্রথমেই দেবতার উদ্দেশে দান হইয়া গিয়াছে। দিতিপুত্র বলি ইন্দ্র হইতে বসুধা কাড়িয়া লইলে, নারায়ণ বামনমূর্ত্তিতে দৈত্যকে অভিভূত করিয়া ইন্দ্রকে বসুধা অর্পণ করেন। প্রশ্ন—মানিলাম এ অধম দান নহে, তথাপি যে দ্রব্য প্রভুর ভোগে আসিল না সেবক তাহা ভোগ করিবে কিরূপে? বসুধার দান আমি করূপে গ্রহণ করিব? উত্তর— ‘স্বভুজবশগতাং প্রীতিপূর্ব্বং সন্তু বসুধাম্’—ক্তাং নারায়ণ বসুধাকে বরাহাবতারে ন্যায়তঃ অর্জ্জন করিয়া, বামনাবতারে সৎপাত্রে বিতরণ করিয়া, রামাবতারে স্বয়ং ভোগ করিয়াছেন। অতএব প্রভুর প্রসাদই আপনার ভোগে আসিতেছে, আপনি ইতস্ততঃ করিবেন না॥ প্রশ্ন—ভাল, প্রভুর সেবক অনেক, সকলকেই তিনি কিছু কিছু দিবেন, আমার বিশেষত্ব কিসে হইল? উত্তর—উচ্ছ্রিতৈকাতপত্রাং বসুধাং প্রদিশতু’—আশা করি প্রভু আপনাকে ইতরবিলক্ষণরূপে একচ্ছত্র রাজা করিবেন। প্রশ্ন—বসুধায় রাজচ্ছত্রের বাহুল্যসত্ত্বেও একত্বে নারায়ণের আগ্রহ হইবে কেন? উত্তর—একদংষ্ট্রাগ্ররূঢ়াম্ উৎক্ষিপ্তাং বসুধাম্’—সকল ক্রিয়ায়ই নারায়ণের একত্বে আগ্রহ। দেখুন বসুধার উদ্ধারে, দুই দন্ত থাকিতেও এক দন্তেই তিনি উৎক্ষেপণ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। আপত্তি—ভাল, উৎক্ষেপণ ক্রিয়ায় না হয় একত্বযোগ হইল।

কিন্তু ক্রিয়া যে নানা প্রকার। উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ, ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়াভেদ আছে তো? খণ্ডন— 'একপাদাবধূতাম্ আক্রান্তাং বসুধাম্,'—দৈত্যরাজ যখন পাতালে অবক্ষিপ্ত হইলেন তখন এক পাদেই নারায়ণ পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এটী অবক্ষেপণ ক্রিয়ায় একত্ব। প্রশ্ন—বেশ, ধারণ-ক্রিয়ায় একত্ব কোথায়? উত্তর—'একচক্রাভিগুপ্তাং সম্ভুক্তাং বসুধাম্' ভোগের সময়ও নারায়ণ একচক্রের অর্থাৎ সূর্য্যদেবের বংশকে আশ্রয় করিয়া রামরূপে বসুধা ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে যিনি সর্ব্বক্রিয়ায় একত্বের পক্ষপাতী, তিনি ছত্রসমুচ্ছ্রয় ক্রিয়ায়ও একত্বেরই আদর করিবেন আশা করিতে পারি।

উদ্ধৃত শ্লোকের যদি ইহাই প্রকৃত অর্থ হয় তবে শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল মহাশয়ের অবলম্বিত সূত্র ছিন্ন হইবে, তাঁহার সিদ্ধান্তও ভূমিসাৎ হইবে।

এই সূত্রের দৃঢ়তাসম্পাদনমানসে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত ভাষায় ইহাতে তন্তুসংযোগ করিয়াছেন—

"Our theory is that Bhumimitra and Narayana were respectively the eldest and the second son of Vasudeva...The peculiar fact about Balacharit is, that in this play the hero has not once been mentioned by the name Krishna—but always as Narayana—a very unusual thing in Sanskrit literature. That Vishnu in his Krishna incarnation was quite different from Narayana is stated by Bhasa himself in the introductory verse of this very play—

শঙ্খক্ষীরবপুঃ পুরা কৃতযুগে নাম্না তু নারায়ণ-
স্ত্রেতায়াং ত্রিপদার্পিতত্রিভুবনো বিষ্ণুঃ সুবর্ণপ্রভঃ।
দূর্ব্বাশ্যামতনুঃ স রাবণবধে রামো যুগে দ্বাপরে
নিত্যং যোঽঞ্জনসন্নিভঃ কলিযুগে বঃ পাতু দামোদরঃ॥

The natural inference is that Bhasa deliberately used the name Narayana to indicate that his patron and master was the real hero of the play...We also find in this drama that Vasudeva's eldest son is always called Sankarsana instead of Balaram—the better known and the more commonly used name of Krishna's eldest brother. Our idea is that Sankarsan was the real name of Vasudeva the Kanva's eldest son and Bhumimitra was a descriptive title".

ইহার তাৎপর্য্য এই—"আমার মনে হয় কণ্ববংশীয় বসুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র ভূমিমিত্র, কনিষ্ঠ নারায়ণ। বালচরিতে নায়ককে কৃষ্ণনামে মোটেই উল্লেখ করা হয় নাই, সর্ব্বত্র নারায়ণ নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। এ আশ্চর্য্য। বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতার ও

নারায়ণ অবতার পৃথক্ একথা ভাস এই নাটকেরই মঙ্গলশ্লোকে স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ভাস রাজা নারায়ণকেই নাটকের নায়ক কল্পনা করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম পরিত্যাগে নারায়ণ নাম ব্যবহার করিয়াছেন। বলরামকেও আগাগোড়া সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় কাণ্ব বসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রকৃত নাম সঙ্কর্ষণ, ভূমিমিত্র তাঁহার উপাধিমাত্র, আখ্যা নহে।"

এগুলির একটীও উচিত কথা বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজের নাম বলরাম নয়। ইঁহার নামের পর্য্যায়ে অমরসিংহ 'বলভদ্র', 'বলদেব,' 'বল' ও 'রাম' এই চারিটী শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, 'বলরাম' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরশুরাম ও শ্রীরাম হইতে প্রভেদ দেখাইবার জন্য স্থলবিশেষে বলরাম বলা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ অমর হইতে উদ্ধৃত চারিটী নামেরই ভূরি প্রয়োগ। বালচরিতের পঞ্চম অঙ্কে 'বল' ও 'রাম' এই উভয় নামই পাওয়া যায়। "দামোদরং সহ বলেন সমাচরন্তম্", "রামেণ সার্দ্ধমিহ মৃত্যুরিবাবতীর্ণঃ", "পূর্ব্বজোঽস্য রাম ইতি শ্রূয়তে" ইত্যাদি প্রয়োগ দেখুন। দ্বিতীয়তঃ, ভাস বালচরিতের নায়ককে দামোদর নামে অভিহিত করিয়াছেন, নারায়ণ নাম তিনি তাঁহাকে দেন নাই। আবার কৃষ্ণনামে নায়ককে মোটেই লক্ষ্য করা হয় নাই একথাও বলা যায় না। প্রথম অঙ্কে হরিচক্র সুদর্শন মূর্ত্তিমান্ হইয়া বলিতেছেন "চক্রোঽস্মি কৃষ্ণস্য করাগ্রশোভী"। অতএব "the hero has not once been mentioned by the name Krishna but always as Narayana"—"কৃষ্ণনাম একবারও করা হয় নাই সর্ব্বত্র নারায়ণ"—চৌধুরী মহাশয়ের ইত্যাদি উক্তিগুলি সম্পূর্ণ নির্মূল।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, সর্ব্বলোকপ্রিয় কৃষ্ণনাম পরিত্যাগেরই বা তাৎপর্য্য কি? কবি স্বয়ং মঙ্গলশ্লোকে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আমার মনে হয় চৌধুরী মহাশয় শ্লোকটীর অযথা অর্থ বুঝিয়াছেন, তাই কবি যে এ ক্ষেত্রে কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিতে বাধ্য একথা তাঁহার মনে আইসে নাই। "That Vishnu in his Krishna incarnation was quite different from Naaryana is stated by Bhasa himself" চৌধুরী মহাশয়ের এই কথা হইতে আমার এ সন্দেহ স্থিরতর হইতেছে। ভাস মঙ্গলশ্লোকে কৃষ্ণকে মোটেই অবতার বলেন নাই। কৃষ্ণ ও দামোদর অভিন্ন, আর বিষ্ণু ও নারায়ণ উভয়েই দামোদরের অবতার ইহাই ভাসের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। অনুমতি হইলে শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়া একথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণবগণ মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং, রামাদি তাঁহারই অংশাবতার মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের এই পূর্ণতাই শ্লোকটির প্রতিপাদ্য। নৈতিক পূর্ণতা (moral perfection) শ্লোকে উপেক্ষিত হইয়াছে। কবির লক্ষ্য দৈহিক পূর্ণতা। দেহের ও উন্নতি, সারবত্তা প্রভৃতি গুণকে অন্তরে রাখিয়া বর্ণমাত্রকে শ্লোকের বিষয় করা হইয়াছে। কবি আশীর্ব্বাদ করিলেন 'দামোদরঃ বঃ নিত্যং পাতু'—দামোদর আপনাদিগকে রক্ষা করুন। দামোদর কে? 'যঃ কলিযুগে অঞ্জনসন্নিভ,ঃ—' যিনি কলিযুগে বর্ণসম্বন্ধে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া দেখিতে অঞ্জনের ন্যায় হইয়াছেন॥ কবে ইনি বর্ণবিষয়ে অপূর্ণ ছিলেন? 'শঙ্খক্ষীরবপুঃ পুরা কৃতযুগে'—সত্যযুগে ইহার কোনও বর্ণ ছিল না। তখন ইনি সর্ব্ববর্ণের অভাবে অথবা তুল্যসদ্ভাবে বর্ণহীন হইয়া দেখিতে শঙ্খ বা দুগ্ধের ন্যায় ছিলেন। সে ছিল নিতান্ত অপূর্ণ অবস্থা॥ তখন নাম ছিল কি? 'নাম্না তু নারায়ণঃ'- ঐ অবতারে দামোদর নারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন। বর্ণের পরিবর্ত্তন কখন্ হইল? 'সুবর্ণপ্রভঃ ত্রেতায়াম্'—পূর্ণতা হইতে অনেককাল লাগিয়াছিল। সম্পূর্ণ সত্যযুগ শুভ্রবর্ণে কাটাইয়া কিঞ্চিৎ কৃষ্ণগুণের উপচয়ে ত্রেতায় দামোদর স্বর্ণমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইলেন॥ তখন কি নাম ছিল? 'ত্রিপদার্পিতত্রিভুবনো 'বিষ্ণুঃ'— ঐ অবতারে দামোদর তিন পাদে তিন ভুবন পরিব্যাপ্ত করিয়া 'বিষ্ণু' অর্থাৎ 'ব্যাপক' এই অন্বর্থ নামে পরিচিত হইলেন॥ স্বর্ণবর্ণ ছাড়িয়া কতদিনে কৃষ্ণবর্ণ হইলেন? 'দ্বাপরে যুগে দূর্ব্বাশ্যামতনুঃ—আবার এক যুগ স্বর্ণবর্ণে থাকিয়া আরও কিঞ্চিৎ কৃষ্ণগুণাধান হইলে দ্বাপরে শ্যামদেহ হইলেন॥ কি নাম হইল? 'রাবণবধে রামঃ'—এই অবতারে ত্রিভুবনের রাবণ অর্থাৎ শোকপ্রদ যে লঙ্কেশ্বর রাবণ তাহাকে বধ করিয়া দামোদর 'রাম' অর্থাৎ 'লোকরমণ' এই যথার্থ নামে পরিচিত ছিলেন॥ তারপর যুগান্তে কৃষ্ণত্বের পূর্ণতা ঘটিল। তিনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেন। শ্লোকের প্রথম তিন চরণে একটী একটী নাম আছে। কারণ, সমুদায় হইতে অংশ পৃথক্ করিলে দুইভাগ হয়, প্রত্যেক ভাগের পৃথক্ নাম আবশ্যক হয়। এইজন্য দামোদর ও নারায়ণ সত্যে, দামোদর ও বিষ্ণু ত্রেতায়, দামোদর ও রাম দ্বাপরে। চতুর্থ চরণে দামোদরই কৃষ্ণবর্ণ হইলেন, অংশ পৃথক্ হইল না, পৃথক্ কৃষ্ণনামের আবশ্যক হইল না। দামোদর নামের পরিবর্ত্তেও কৃষ্ণনাম এখানে চলিবে না। কারণ যে বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আবেশ কল্পনা হইতেছে সে বস্তু স্বয়ং বর্ণহীন, অতএব বর্ণ পুরস্কারে তাহার নাম হইবে না! এইজন্য এখানে পরব্রহ্মের নাম দামোদর রাখা হইল, কৃষ্ণ, শ্যাম, প্রভৃতি করা হইল না। বস্তুতঃ

চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত তন্তু এতই ক্ষীণ যে তদ্দ্বারা জয়সোয়াল মহাশয়ের অবলম্বিত সূত্র কিয়ৎ পরিমাণেও ভারসহ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অবান্তর কথার বাহুল্য বিরসই হইয়া থাকে। অতএব এই স্থলেই প্রস্তাবের উপসংহার করিয়া এ প্রবন্ধের প্রতিপাদিত বিষয়গুলির প্রতি পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করিব। আমরা প্রধানতঃ দুইটি কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি—

(১) ভাস উত্তর ভারতের অধিবাসী।

(২) ভাস কোন্ কালের লোক জানা যায় নাই, কিন্তু খ্রীষ্টের ৩০০ বৎসরেরও অধিক পুর্ব্ববর্ত্তী একথা কতকটা দৃঢ়তার সহিত বলা যায়।

শ্রীসারদারঞ্জন রায়।

হারা।

তারই চুলের গোলাপ ফুলের
শুষ্ক ধূসর পাপ্‌ড়ি এই—
এই উপাধান, শয়ন-শিথান,
শূন্য আধেক—সে আজ নেই।
চক্ষে আমার, বক্ষে আমার,
মুখখানি সেই লুকিয়ে রাখা!—
এই বালিশের ঝালরগুলি,
তারই কালো অলক-ঢাকা;
যেখানটিতে রাখ্‌ত মাথা,
চাইলে পরে পরাণ ফাটে—
আধেকখানি, শূন্য আজি,
দীর্ঘ নিশীথ একলা কাটে।
এম্‌নিতরই চাঁদ্‌নী রাতে
বালির বালিশ-শয্যা 'পরি
শুইয়ে দিলাম শেষ প্রতিমা—
অধর মম নিলাম ভরি'।
এই হৃদয়ের আধেকখানি
পুড়্‌ল ধূধূ চিতার বুকে,
আধ্‌খানিতে, দারুণ ব্যথা,
শোণিত ছোটে ক্ষতের মুখে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিবাদন। *

রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, হতাদর, হতাশ্বাস পলে পলে এই আর্ত্ত, পীড়িত বসুন্ধরার জীর্ণ কঙ্কাল টানিয়া বাহির করিতেছে, যে আনন্দের ভিখারী হইয়া মানবের অশ্রু-অন্ধ কাঙ্গাল নয়ন চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া কামনার ধন হারা-নিধি খুঁজিয়াই মরে, সন্ধান আর কিছুতেই পায় না, সেই সঞ্জীবন সুধারসের অমৃত আস্বাদ কবে এই পীড়িত মূৰ্চ্ছিত বসুন্ধরার আদিপুরুষগণ পাইয়াছিলেন জানি না; কবে জ্ঞান আসিয়া অজ্ঞানের চক্ষে অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছিল, কবে বিশ্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভারতের শান্তিময় শান্ত তপোবন হইতে "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ;" বলিয়া গম্ভীর মন্দ্রে মন্ত্রোচ্চারণ হইয়াছে, কবে কোন বসন্তের প্রথম সমাগমদিনে বাগ্দেবতার মানসী মূর্ত্তি মানবের মনে উদ্ভাসিত হইয়া তাহাকে আনন্দে আত্মহারা উন্মাদ করিয়া দিয়াছিল, ইতিবৃত্ত তাহার সত্য সন্ধান দেয় না। কবে কোন সুদূর অতীতে স্বর্গের নন্দনবনের নিত্য অধি-বাসিনী বসন্তরাণী তাঁহার প্রার্থিত পদপল্লবস্পর্শে বসুন্ধরার জীর্ণ কলেবর পত্র পুষ্পে পুলকাঞ্চিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সেই দিন হইতে বর্ষে বর্ষে স্বর্গের বাতায়ন খুলিয়া একবার করিয়া তাঁহার স্নেহদৃষ্টি এই ক্লিষ্ট ধরার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া পড়ে। মল্লী, মালতী মাধবী, তখন পর্য্যাপ্তপুষ্পসম্ভারে হাস্যময়ী হইয়া উঠে, অশোক আসিয়া স্নেহকাতর বসুন্ধরার হৃৎপিণ্ডের শোণিমা মানবের চক্ষের সম্মুখে ধরে, হৃদয়ের চিরারাধ্যা শ্রীমতীর বর্ণানুকরণে চম্পক আসিয়া মনবের মন হরণ করিয়া লয়, বিভূম মকরন্দ বসন্তারবিন্দের নয়না-ভিরাম শোভাসৌন্দর্য্যে প্রাণমন আকুল করিয়া তোলে, তখন এই দৈন্যপীড়িত শূন্য শুষ্ক জীবনের উপর আনন্দধারার অভিষিঞ্চন করিবার নিমিত্ত আমরা "কৈ প্রিয়, কোথা প্রিয়তম," বলিয়া আমাদের প্রসারিত আলিঙ্গনের মধ্যে কাহাকে ধরিতে চাই কে জানে? কামনার স্পর্শমণি, চিরপ্রার্থিত ধনকে পাইবার সৌভাগ্য সকলের সব সময়ে হয় কি না বলা কঠিন, আমাদের সময় অল্প, আশা বৃহৎ, সব অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া গৃহ মার্জ্জনা করিয়া রত্নদীপ জ্বালাইয়া বাসরশয়ন বিছাইবার পূর্ব্বেই হয়তো নিরুদ্দেশযাত্রার দূর আহ্বান আমাদের কাণে আসে, সাধের অনুষ্ঠান অসমাপ্ত রাখিয়াই, অসীম যাত্রায় তখনি বাহির হইয়া পড়িতে হয়, জন্মমুহূর্ত্তে যে অশ্রুনীর লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, বিদায়ের ক্ষণেও তাহার শেষ হইল না,

* সাহিত্য সঙ্গতের ৪র্থ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

নয়নজলের কুয়াশার মধেই আবার যাত্রা আরম্ভ হয়, কবে কোথায় কেমন করিয়া শেষ হয় কে বলিবে? বুকের মধ্যে অসীম আশা লইয়া যখন মুদ্রিত নয়নে সুখের কল্পনায় বিহ্বল হইয়া আছি, হঠাৎ চাহিয়া দেখি, আমার সমীরণে কল্পিত সুবর্ণসৌধ ভূলুণ্ঠিত; আশার আশ্রয় আমার জ্বালাময় শ্মশান-বহ্নিশিখায় নিঃশেষে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। বিনিদ্র নয়নে বহুনিশা জাগরণ করিয়া যাহার অমৃতচ্ছবি বার বার করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিতেছি, কেমন করিয়া শিথিল পরিরম্ভের অবকাশে বুকের মাণিক হারাইয়া ফেলিয়াছি জানি না, চাহিয়া দেখি বক্ষের মণিহার আমার বুকের কাছে আর নাই, যে সকলের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, আমার এ কণাটুকুও সে ফেলিয়া যায় নাই। নিয়তির নিদারুণ পরিহাসে দুর্ব্বল মানবের আনন্দের অপরিহার্য্য বিঘ্ন এই। তাহার পর দুষ্প্রাপ্যের দুরাশা ত্যাগ করিয়া, যাহারা গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যে ভালবাসিয়া কাছে আসিয়াছে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া, যে দু'দণ্ডের জন্য প্রীতি-পরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড়টি রচনা করিব তাহারও পক্ষে শত বিঘ্ন সহস্র বাধা, লক্ষ অন্তরায়! যেটুকু আছে তাহাও আমরা ভাল করিয়া ভোগ করিবার অবসর পাই না। আনন্দের পরম বিঘ্ন, শান্তির চরম উৎপাত, মানব মনের হিংসা, বিদ্বেষ, বিগ্রহ, সৃজন করিয়া যুগে যুগে প্রলয় তাণ্ডবে মত্ত হইয়া উঠিতেছে। আজ গগনের পশ্চিম কোনে যে প্রলয়কালের কালো মেঘ উদিত হইয়াছে, যে প্রাণসংহারী বিদ্যুৎবহ্নি নয়ন ধাঁধিয়া দিতেছে, যে ঘোর বজ্ররবে ভয়ভীত বসুন্ধরা মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছে, এ কেন, কে বলিবে? দিগ্বিজয়াকাঙ্ক্ষী জিগীষুদিগের মধ্যেই এ প্রলয়নৃত্য সীমাবদ্ধ হইয়া নাই; দূরদূরান্তরবাসীর ক্ষুধার শাকান্নের মধ্যেও বারুদগন্ধকের রেণু আসিয়া মিশিতেছে—ইচ্ছা থাকিলেও নিবারণের উপায় করে কার সাধ্য? ইতিহাস বলিতেছে, বর্ব্বর তৈমুর একদিন মনুষ্যমুণ্ডে মিশরের পীরামিড রচনা করিয়াছিল, আজ সুসভ্য ইউরোপ অসংখ্য নরমুণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া শোণিতকর্দ্দমাক্ত ধরিত্রীর বুকে জয় পতাকা প্রোথিত করিবার বীভৎস উদ্যমে যদি মাতিয়া উঠে, তবে শ্রী, সম্পদ, শান্তি, শোভা, মিলন, আনন্দ কোথায় কাহার আশ্রয় খুঁজিবে ভাবিয়া পাই না।

যুগ যুগ ধরিয়া ধর্ম্ম যাহা শিক্ষা দিয়াছে, দর্শন যে দৃষ্টি দান করিয়াছে, ভাস্কর তাহার মানস-প্রসূত যে শ্রীমূর্ত্তি গড়িয়া ধরণীর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে, শিল্পী যে চিত্রে মনমোহনের প্রয়াস পাইয়াছে, স্থপতি যাহা গড়িয়া ধরিত্রীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে, সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, গণ সব যদি এক নিমেষে

মানবমনের বিদ্বেষ-প্রসূত সমরানলে জ্বলিয়া ছাইভস্ম হইয়াই গেল, বিংশতি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক সবগুলি সুস্থকায় মানব যদি এক দিনে নিঃশেষ হইয়া যায়, ধরণীর যৌবনসম্পদ, লক্ষ্মীশ্রী, যদি মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়াই পড়ে, তবে জয়শ্রী-জনিত আনন্দ উপভোগ করিবে কে? বিধবার অশ্রুজলের উপর, বৎসহারা জননীর দুঃসহ হৃদয়বেদনার উপর রাজছত্রের মহিমা প্রচার করিয়া, রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া, সুখ ও আনন্দ হয় কিনা তাহা বলা আমার সাধ্যের আয়ত্ত নহে। যে বিশ্বব্যাপী আনন্দধারা, সূর্য্যচন্দ্র, গ্রহনক্ষত্র, জলস্থল, অন্তরীক্ষ, পত্রপুষ্পপল্লব হইতে নিরন্তর অজস্র ধাবায় ক্ষরিত হইয়া সকলেরি জন্য ঝরিয়া পড়িতেছে, সকলকে বঞ্চিত করিয়া বুঝি তাহার উপভোগ সম্ভব হয় না; তাই বুঝি ভারতের বনস্থলী যখন যজ্ঞধূমে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, আর্ত্তবলির ভীত চিৎকারে করুণা যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন একদিন কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ হইতে বরাভয়ের আশীর্ব্বাদবাণী, আর্ত্ত বসুন্ধরার কাণে গেল। ভীতি-বিকম্পিত ধরণী আশ্বস্ত হইল। আজ এই পূর্ণাভিষেকী কুলাচারীদিগের মনুষ্যমেধ যজ্ঞে ধরিত্রীর কলেবর কম্পান্বিত; প্রবুদ্ধকারী বুদ্ধের জন্ম যাচিয়া কোন তপোবনে কে একমনে তপস্যানিরত হইয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে জানি না, প্রবল ঝঞ্ঝার পর শান্তি অসিবেই এ আশা দুরাশা নহে।

এ জগৎ কবে স্বার্থপর হইয়া ইহাকে নানা প্রকারে হত্যাশালা করিয়া কে গড়িয়া তুলিয়াছিল জানি না, তাপতপ্ত মানবমনে আনন্দের বিমলধারার প্লাবন আনিয়া দিবার জন্যই বুঝি ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্যান-নিবিষ্ট তপস্বীর মনে তরুণেন্দুকান্তিমতী স্তনভরনমিতাঙ্গী সিতাব্জে সন্নিষন্না বীণাবাদিনীর অমৃত-চ্ছবি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ এই রোগশোক, হত্যা, অন্নকষ্টের দিনে ভারতের পূর্ব্বোপান্তে বসিয়া যাঁহারা যুগযুগান্তের আরাধ্যা বাগ্দেবতার অমৃত নিষ্যন্দী বীণার ক্ষীণতম ঝঙ্কারও শুনিতে ও শুনাইতে এই আনন্দের মহামেলার সৃজন করিয়াছেন, এই মহোৎসবপঙ্গতে সমবেত সজ্জনের হৃদয়পাত্রে সরস্বতীর পাদপীঠকমলের বিন্দু মধুও দিবার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি বার বার নমস্কার করি।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

কেশ সমস্যা ।

প্রথম যখন যৌবনেতে কর্‌লাম পদার্পন,
চুলটা নিয়ে বড় বেশী হ'ল সন্তর্পন ।
অবশ্য সে মাথার চুল, কারণ গোঁফ দাড়ি
উঠ্‌তে তারা করেনিকো বেশী তাড়াতাড়ি ।
আর হ'লো এক বিষম চিন্তা—কি প্রকারে চুল
মাথার পরে রাখ্‌বো, কারণ নাইক এতে ভুল
চুলটা রাখা আবশ্যক সবারি একান্ত,
বিজ্ঞানেতে ইহার নাকি হয়েছে সিদ্ধান্ত ।
আর তা ছাড়া ইতিহাসেও প্রমাণ আছে ঢের,
চুলের ভিতর শক্তি থাকে, যথা স্যাম্‌সনের ।
　　যদি বল পশ্চিমেতে যারাই পালোয়ান,
　　(মাঘ মাসেতে গায়ে যারা না দেয় আলোয়ান)
　　তারাই আরো একেবারে ছোট চুল ছাঁটে ;
　　তা হ'লে বলি যে তারা ধারেই বেশী কাটে
　　ভারের চেয়ে, অর্থাৎ তাদের এতই ঘন কেশ,
　　বাড়্‌তে দিলে একেবারে ভ'রে যেত দেশ ।
　　কিম্বা তাদের চুলের গোড়া এত বেশী পুরু,
　　বাড়্‌তে দিলে মাথা হ'ত বুরুষের গুরু—
　　অর্থাৎ কি না একেবারে সজারুর গাত্র
　　সন্দেহ নাহিক তাতে জেনো তিলমাত্র ।
শক্তিশালী নাই যে কিছু চুলের সমান ;
পুচ্ছাকারে কেশ-গুচ্ছ তাহারি প্রমাণ ।
বৈদ্যুতিকী শক্তি আর চৌম্বক-প্রবাহ
টিকী দিয়া চলে যেন ধরি পরীবাহ ।
কবিরাও চুল ও দাড়ি রাখিতেন লম্বা ;
তাইতে ছিলেন তাঁদের প্রতি প্রীত জগদম্বা ।
নেড়ামাথা হরিদাস দেখ্‌তেও অতি বিশ্রী,
যেমন ধারা ওপাড়ার ওই গদাধর মিশ্রী ।

চুলটা রাখা অতএব বিশেষ দরকারী
মানুষের পক্ষে, যেমন ঝোলে তরকারী।
চুলই হ'ল মানুষের মাথার বাহার
ভাতই যথা:তাহাদের প্রকৃত আহার।
আর তা ছাড়া চুলের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ
দেহের ও মনের ; যারা একেবারে অন্ধ,
তারা ভিন্ন কেউ না ইহা করবে অবিশ্বাস,
সত্য ইহা যথা মোরা টানিগো নিঃশ্বাস।
যদি বল, তবে কেন বুদ্ধি ভরা থাকে
টাকের মধ্যে, মধু যথা মৌমাছির চাকে ?
তা হ'লে বলি যে তাহা শুধুই কূট-বুদ্ধি,
খুঁজে যাহা পরচ্ছিদ্র, পরের অশুদ্ধি।
বিসমার্ক চাণক্য আর গ্লাড্‌ষ্টোন্ মন্ত্রী,
কূট-নীতি-বিশারদ ছিলেন কূট-যন্ত্রী।
ব'লে রাখি কিন্তু পাছে হয় অবিচার
বিদ্যাসাগর, সেকস্‌পিয়ারে জেনো ব্যভিচার।
এখন হ'ল ইহাই কিন্তু সমস্যা প্রধান,
কি প্রকারে চুল রাখা উচিত বিধান।
চুলটা দেখে মানুষের ধরণ ধারণ
প্রায়ই লোকে অনুমান করে, এ কারণ
চুলটা নিয়ে হওয়া চাই বড়ই সতর্ক,
এবম্বিধ মনে মনে করি নানা তর্ক,
দেখ্‌লাম যে বেণী রাখা নহে সমীচিন ;
কারণ তাতে হ'তে হয় নারী কিম্বা চীন ;
কিম্বা বড় ক'রে যদি রেখে দিই জটা.
ভণ্ড ব'লে সবাই হবে আমার পরে চটা।
আর যদি খুব ছোট ক'রে ছেঁটে ফেলি চুল,
তেড়ী কাটার সখটা হবে সমূলে নির্ম্মূল।
আরো ভেবে দেখলাম্, যদি রাখি এক টিকী,
কলেজেরি ফেণ্ড গুলো হবে টিকটিকী ;

অর্থাৎ সেটা কেটে দেবার করবে তারা চেষ্টা,
টিকী নিয়েই দেশটা ছাড়া হ'তে হবে শেষটা।
তার চেয়ে কোঁকড়ানো চুল নয়কো কিছু মন্দ,
যে কারণ কেউ না সেটা করে অপছন্দ।
কিন্তু তারো ভারি এক গণ্ডগোল আছে,
আট আনা দক্ষিণা মাসে নরোত্তমের কাছে।
আর যদি চুল সমান ক'রে ছাঁটি আগাগোড়া,
বল্‌বে সবাই মাথা যেন কদমের তোড়া।
যদি বা সুমুখে চুল রাখি কিছু বড়,
বুড়োরা সব বল্‌বে ঘোড়ার পিঠে গিয়ে চড়।
এ হেন মুস্কিলে পড়ি উপায় কি করি—
ভাবতেছিলাম, এমন সময় বন্ধু ভজহরি
বল্লে "দেখ, বাবরী রাখা বড়ই প্রশস্ত ;
বাবরী রাখ, হবে তুমি কবিবর মস্ত।
বাবরী 'পরে সরস্বতী হবেন অবতীর্ণ,
গঙ্গা যথা হর-শিরে ঘন জটাকীর্ণ।
কিন্তু তারও চাই আগে প্রচুর সাধনা,
তাইতে হ'ল নাক আর বাণীর আরাধনা।
অগত্যা শেষেতে আমি করিলাম ঠিক,
সম্ভাবনা বুঝে আর ভেবে চারিদিক,
নূতন প্রকারেতে চুল রাখাই বিহিত,
পিছন দিকে বড় আর সাম্‌নে বিপরীত।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

রামপাল।

সে দিন পৌষের এক অতি সুন্দর প্রভাত—বিহগকূজন-মুখরিত, শিশির-সিক্ত, কুয়াসা-বিমুক্ত, বালরুণ-কিরণে সমুজ্জ্বল। যেরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ হৃদয়ে লইয়া ভক্ত দেব-দেউলে যাত্রা করে, আমিও সেদিন তেমনি বাঙ্গলার এক স্বপ্নময় রহস্যময় তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম।

সেই সুমহান অতীতের বিরাট দৃশ্যাবলী যেন মূর্ত্তি লইয়া সে দিন আমাকে দেখা দিয়াছিল। যেন দেখিতে লাগিলাম, সৌধের পর সৌধের সারি, তড়াগের পর তড়াগ—যেন মন্দিরের পর মন্দির হইতে ধূপ ধূম-গন্ধ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দেবচরণে ভক্তের পূজার বার্ত্তা নিবেদন করিতে স্বর্গের সিংহদ্বারে যাত্রা করিয়াছে। দেউলে দেউলে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে। যেন দেখিলাম, বিস্তৃত রাজপথ কোলাহল-চঞ্চল। কোথাও বঙ্গবীর বর্ম্মে চর্ম্মে সুশোভিত হইয়া অশ্বারোহনে সেনানিবাসে যাইতেছে—হস্তীর পর হস্তী চলিয়াছে, রথের পর রথ। যেন বিজয়ী বাহিনী জয়স্কন্ধাবার হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। তুরী বাজিতেছে। জয়ডঙ্কার বিপুল নিনাদে গগন পরিপূর্ণ হইয়াছে।

এমন সময় একজন বন্ধু বলিলেন—"এই গ্রামের নাম পঞ্চসার।"

দেখিলাম অগণিত কদলীবৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন একখানি গণ্ডগ্রাম। মুসলমান কৃষকের হাল তাহার প্রতি ক্ষেত্র বিদীর্ণ করিয়া নানা শস্য উৎপন্ন করিয়াছে। পথিপার্শ্বে কয়েকখানি ক্ষুদ্র কুটীর পঞ্চসারের বাজার নামে পরিচিত হইয়া অনুসন্ধিৎসুর কৌতূহল উদ্দীপিত করিতেছে।

কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের চরণপূজা: করিয়া আদিশূর তাঁহাদিগকে যে পঞ্চ গ্রাম দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, এই কি তাহার একখানি? আমরা কি তবে সেই সুরসরিদবিধৌতপাদ গৌড় নগরের* উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইলাম?

কালপ্রভাবে কি না হয়? শ্মশানে কুসুম ফোটে, সাগর শুষ্ক হয়, পর্ব্বতচূড়া ধ্বসিয়া যায়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সামগান-মুখরিত পুণ্যক্ষেত্র যে এখন নৃতশীল গৃহপালিত কুক্কুট কুক্কুটীর ক্রীড়াভূমি হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু ইহাই কি সেই গৌড়-জনপদ? তবে সে সুরসরিৎ কৈ? তাহার চিহ্নই বা কৈ? কোন দিন কি তাহা রামপালের সন্নিকটে বর্ত্তমান ছিল? তবে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কৈ?

সত্যই কি তবে পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন? "বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" কি তবে ঠিক? ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তির

*সকল গুণ সমেতাঃ সা গ্নকা ব্রহ্মনিষ্ঠা।
... ...ব্রাহ্মণাঃ কাণ্যকুব্জাৎ॥
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং।
... ...বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

তবে অর্থ কি? তবে তাহাতে ভবদেবকে আদিশূরের আমন্ত্রণে সমাগত পরাশরের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত করা হয় নাই কেন? কোন্ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে সাহসী হইব যে "বেদবাণাঙ্ক শাকে" সমগ্র বঙ্গদেশে ধর্ম্মশীল বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণও বর্ত্তমান ছিলেন না? বৌদ্ধধর্ম্ম কি বঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ্যকে একেবারেই বিলুপ্ত করিয়াছিল? সকল প্রশ্নের একমাত্রই উত্তর আছে—নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ। কিন্তু জনশ্রুতি এতই পল্লব-বহুল যে, শুধু তাহার ছায়ায় আশ্রয় লইয়াই নিজেকে নিরাপদ বলিয়া মনে করা যায় না।

যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই মনে হইতে লাগিল, আদিশূর কি সত্যই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি? যদি তাহাই হইবেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে এখন পর্য্যন্তও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া অশংসয়ে বলা যাইতে পারে—আদিশূরের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। জনশ্রুতি বহুদিন হইতে আদিশূরের নাম বহন করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং কে অশংসয়ে কহিবে—আদিশূর কবিকল্পনামাত্র। ইনি তবে কে? দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের বংশধর? না বীরসেন? না অন্য কেহ? বাঙ্গালার ইতিহাস এখনও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! কতদিনে সে অন্ধকার বিদূরিত হইবে? কতদিনেই বা সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া ঐতিহাসিক সারসত্য আবিষ্কৃত হইবে? বাঙ্গালী এ চেষ্টা না করিলে কে আর তাহা করিবার জন্য অগ্রসর হইবে? ইংরাজ লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাসে এবং কেবল তদ্দৃষ্টে রচিত বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক নিবন্ধে প্রবাদ-প্রসঙ্গও সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক প্রমাণের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে!

সেই অল্প পরিসর ইতস্ততঃ ভগ্ন কাষ্ঠসেতুর দ্বারা সংযুক্ত গ্রাম্যপথে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলাম। সেনবংশের গৌরব-কাহিনী তখন হৃদয় মধ্যে জাগিতেছিল। সেন ও পাল রাজগণের সমর-দুন্দুভি যেন তখন শুনিতেছিলাম। হায় রে! কোথায় বা সেই মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্ম্ম-পাদানুধ্যাত-পরমবৈষ্ণব-পরমেশ্বর—পরমভট্টারক—মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মদেব যিনি বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে ভূমি দান করিয়া তাম্রফলকে সে কাহিনী উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন! শ্রুতিও কি ইহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে? কোথায়ই বা সেই বিজয়সেন, লক্ষ্মণসেন, আর কোথায়ই বা সেই গর্গ-যবনান্বয় কালরুদ্র?

যাঁহাদের অমিত বিক্রমে বহুদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের বিজয়কেতন

উড্ডীন হইতে পারে নাই* এই কি, তাঁহাদের সেই বিশাল রাজধানীর বিলুপ্ত শ্মশান? একদিন হয় ত এই স্থানে কত বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হইয়াছে, কত বীরসেনা "হর হর বম্ বম্ মহা কলরবে" দশদিক বিকম্পিত করিয়া বিজয়-মাল্যে বিভূষিত বীরনৃপতির অনুগমন করিয়াছে। আজ আর সে নগরী নাই, সে রাজপথ নাই। ভূগর্ভে নিহিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক দেখিয়া এখন তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইতে হয়। ইষ্টকরাশিও এখন ভূপৃষ্ঠে স্তূপের ন্যায় বর্ত্তমাণ থাকিয়াও অট্টালিকাদির অবস্থান সূচনা করে না! কৃষকদের হল ক্ষেত্র-গুলিকে ধূলিতে পরিণত করিয়াছে। যেখানে উদ্যানবাটিকায় ফুল্ল মল্লিকা মালতী হাসিত, এখন সেখানে নিরবিচ্ছিন্ন রামপালের সুবিখ্যাত কদলীকুঞ্জ বর্ত্তমান!

অনুসন্ধান করিলে "বল্লাল বাড়ীর" নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্তও প্রচুর পরিমাণে ইষ্টক পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রামের ভূগর্ভ হইতে জীর্ণ কক্ষাদির চিহ্ন, ধাতব দেব দেবী মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বিক্রমপুরের সেই প্রাচীন রাজধানীর বিস্তার প্রায় ১০।১২ মাইল ছিল! বহু লোক মৃত্তিকা খননকালে স্বর্ণ রৌপ্য ও মূল্যবান প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এক যুবক সপ্ততি সহস্র মুদ্রা মূল্যের একখানি হীরক প্রাপ্ত হইয়াছিল।*

বিক্রমপুরের অনেক গ্রামই—সকল গ্রাম বলিলেও অন্যায় হইবে না—পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া গ্রাম-বাসীরা এরূপ করিয়া থাকেন। না করিলে বর্ষা সমাগমে গৃহাদি ভাসিয়া যাই-বার সম্ভাবনা থাকে। রামপালেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কোন প্রাকৃতির নিয়মে রামপাল এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কে তবে এরূপ করিয়াছিল—কোন্ যুগে এরূপ করিয়াছিল—কি কারণেই বা করিয়াছিল, স্বতঃই এই সকল প্রশ্ন মনে উদিত হইতে লাগিল। আমরা অনুমান করিলাম,

* The Bengal territory conquered in 1203-4 by the Mahomedans did not comprise the Eastern District. The *Bangadesh* was still under Ballal's descendants till the end of the 13th century, when Sonargaw was occupied by the second son of the Emperor Bulban.

—Blochman's History and Geography of Bengal.

* A few years ago a Raiyat while ploughing a field in this place found a diamond of the value of Rs. 70,000 (£7000). It afterwards gave rise to a law Suit before the Provincial Court of Appeal.

Topography of Dacca—Taylor.

মুন্সীগঞ্জ অপেক্ষা বল্লালবাড়ীর উচ্চতা প্রায় মুন্সীগঞ্জের সরকারি গৃহগুলির ছাদের সমান হইবে!

এই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আরো কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম পার্শ্ববর্ত্তী তরুরাজির উপর শির তুলিয়া একটী প্রাচীন মহীরুহের প্রেতমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে—উহা শাখাহীন, পত্রহীন, রসহীন। শুনিলাম উহাই বিক্রমপুরের সুবিখ্যাত গজারি বৃক্ষ (শাল বৃক্ষ)—কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের তপঃ প্রভাবের স্মৃতি বহিয়া আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে! যখন উহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, উহার মৃত্তিকানির্ম্মিত বেদী পরিক্রমণ করিলাম, তখন হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু তখনই মনে হইল বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন প্রমাণ করিতে কি এখন ইহাই আমাদের অন্যতম প্রধান সম্বল? ইহার উপর নির্ভর করিয়াই কি এখন বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অপরিজ্ঞাত অংশ অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

এই কি সেই শুষ্ক মল্লকাষ্ঠ যাহা একদিন নবাগত ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ-দিগের করচ্যুত আশীর্ব্বাদবারি বা আশীষ-কুসুম শিরে ধারণ করিয়া মুহূর্ত্তে নবজীবন লাভ করিয়াছিল? সেই ইন্দ্রজালই কি এখন বাঙ্গালার এক অতি প্রাচীন ও অতীত সমৃদ্ধিগৌরবে গরীয়সী বীরপ্রসবিনী পণ্ডিতজননী শস্যশ্যামলা নদী-মেখলা প্রদেশের ইতিহাস রচনার প্রধান পাদপীঠ!

যেমন আর সে রাজধানী নাই, রাজপ্রাসাদ নাই, যেমন আর সে ব্রাহ্মণ নাই, যজ্ঞভূমি নাই—যেমন ছিল তেমন যখন আর কিছুই নাই, সেই মহামহীরুহই বা থাকিবে কেন? উহা জীর্ণ হইয়াছে, উহার রসাল বক্ষ বহু স্থানে বিদীর্ণ হইয়াছে, উহার পত্র-পুষ্পের চিহ্ন পর্য্যন্ত আর নাই! আছে কেবল মসীবর্ণ দুইটী সুদীর্ঘ শাখা ও তাহাদের একটীর শিরে একটী জীবন্ত বৃদ্ধ শকুনি! কিন্তু বিক্রমপুরের নরনারীর হৃদয়ে আজিও উহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগ্রত রহিয়াছে, হিন্দু মুসলমান উভয়ের নিকটেই উহা আজিও যেরূপ দেব-ভাবে পূজিত, তৈল ও সিন্দূরের অনুলেপেই তাহার পরিচয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। শুনিলাম আজিও কত রমণী বন্ধ্যাত্ব দূর করিবার জন্য ভক্তিভরে এই বৃক্ষকে স্পর্শ করিয়া থাকে। সংসর্গে বাসের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী আম্র পনস ও খর্জ্জুর বৃক্ষাদিও পূজা লাভ করিতেছে। বৃক্ষগুলি একটী ক্ষুদ্র দেব-পরিবারের ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া প্রবাদের দোহাই দিয়া নিত্যপূজা আদায় করিয়া লইতেছে!

ঐন্দ্রজালিক গজারি বৃক্ষের নিকট হইতে অনুমান ২৪½ হস্ত দূরে দেখিলাম

আর একটী গজারি বৃক্ষ দুইটী শাখা বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। উহাও ভক্তির অর্ঘ্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই। শুনিলাম তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার প্রাচীন গজারি বৃক্ষের নবীন পল্লব দেখা দিয়াছিল—শুষ্ক তরু মুঞ্জরিয়াছিল। কিন্তু আশ্বিন মাসে অকস্মাৎ একদিন পল্লবগুলি শুষ্ক হইয়া উঠিল এবং একে একে ঝরিয়া পড়িল। শুনিতে পাওয়া যে, ঢাকা জেলার এক ভাওয়াল ব্যতীত বিক্রমপুরের অন্য কোন স্থানেই গজারি বৃক্ষ নাই। ঢাকার নূতন নগর রমনায় আমরা গজারিকুঞ্জ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। রামপালের প্রাচীন গজারি বৃক্ষের সর্ব্বনিম্ন স্থানের পরিধি প্রায় ৪½ হস্ত হইবে। উচ্চতা ৫০ হইতে ৬০ হস্তের ভিতর। ৩½ কি ৪ হস্ত ঊর্দ্ধ হইতে দুইটী শাখা বহির্গত হইয়াছে। নবীন বৃক্ষটীর পরিধি ১½ কি ১¾ হস্ত হইবে।

যে ভূভাগ পূর্ব্বে পদ্মানদীর পূর্ব্ব তীরে, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে, বুড়ীগঙ্গার দক্ষিণে ও ইদিল্‌পুরের উত্তরে অবস্থিত ছিল, তাহাই সেকালে বিক্রমপুর নামে পরিচিত ছিল। এই ভূভাগের রাজার নাম বিক্রম ছিল বলিয়াই না কি স্থানের নামও বিক্রমপুর হইয়াছিল। ইহাই দিগ্বিজয়-প্রকাশের সিদ্ধান্ত। 'বিপ্রকল্প-লতিকা'কার বলেন যে এই নৃপতির পিতৃপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। Hunter সাহেব তাঁহার Statistical Accountএ লিখিয়াছেন যে, হিন্দু নরপতি সুবিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের রাজসভা কিছুদিন ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশে বর্ত্তমান ছিল! এ সকলই অনুমান মাত্র।

পদ্মানদীর তরঙ্গ-তাড়ণে বিক্রমপুরের পূর্ব্বশোভা ও সম্পদ সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। শৌর্য্য বীর্য্য সম্পদ সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র-বৈভবও বুঝি গত হইয়াছে। নতুবা এখন যেমন দেখিতেছি, বিক্রমপুরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এরূপ কেন? কলহ স্বার্থপরতা ঈর্ষ্যা প্রভৃতি এখন যেন বিক্রমপুরকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে! বিরাট অতীতের গৌরবোজ্জলস্মৃতি এখন একখানি দীর্ণ নগ্ন অপবিত্র কাঠামকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র!

মোগলদিগের শাসন সময়ে বিক্রমপুর সোনারগাঁর অন্তর্গতঃ ৫২টী পরগণার একটী ছিল! সোনারগাঁর রাজস্ব ২৫৮২৮৩৪ মুদ্রা নির্দ্ধারিত ছিল। তন্মধ্যে কেবল বিক্রমপুর হইতে ৮৩৩৭৭ মুদ্রা আদায় হইত।

যখন পাল-নরপালগণ বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন বঙ্গদেশেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেই সময়েই বিক্রমপুরেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম আশ্রয় লাভ করিয়া রাজ-সিংহাসনের ছায়াতলে পরিপুষ্ট হইয়াছিল বলিয়া

কথিত হয়। এই বিক্রমপুরই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি, হলায়ুধের ক্রীড়াক্ষেত্র।

পাল ও সেন রাজদিগের শাসনকালই বিক্রমপুরের গৌরবের যুগ! জ্ঞানে কর্ম্মে, রণে ধর্ম্মে, শিল্পে বাণিজ্যে, ধনে জনে সেই সময়েই বিক্রমপুর এরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছিল যে, কোনও ঐতিহাসিক কবি তাঁহার একখানি অমুদ্রিত কাব্যে কহিয়াছেন—"দেবের নৈবেদ্য সম শ্রীবিক্রমপুর।" রামপাল সেই শ্রীবিক্রমপুরের অন্যতম রাজধানী।

মহম্মদ তোঘলক্ যখন পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা হরণ করিলেন, তখন দেখিলেন, শাসন-সৌকর্য্যার্থ এই বিস্তৃত জনপদকে বিভক্ত করা আবশ্যক। তাঁহারই আদেশে পূর্ব্ববঙ্গ নিম্নলিখিত তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিল—(১) লক্ষ্মণাবতী (২) সাতগাঁও এবং (৩) ঢাকা ও সুবর্ণগ্রাম একত্রে।

বর্ত্তমান ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ এখন বিক্রমপুর নামে পরিচিত।

রামপালের নামকরণ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিক ভিত্তির অভাবে তাহাদের কোনটীর উপরেই সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করা উচিত কি না, বিবেচনার বিষয়। কেহ বলেন পালবংশীয় নরপতি রামপালের নামানুসারেই রাজধানীর নাম হইয়াছিল। লঘুভারতকার বলেন, রাম নামক একজন, "মহা ধনী" নরপতির রাজধানী বলিয়াই উহার নাম রামপাল। কাহারও মতে রাজা বল্লালের রাজবাড়ীর মুদী রামানন্দ পালের নামের সহিত রামপালের সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে!

যেমন রামপালের নামকরণ সম্বন্ধে, তেমনি আদিশূরের আমন্ত্রণে গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন সম্বন্ধেও নানাবিধ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস একেবারেই মূক হইয়া শুধু প্রবাদ-প্রসঙ্গের দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে। স্বয়ং আদিশূরও যেমন কুহেলিকাময় অতীতের অন্ধ আবরণে সমাচ্ছাদিত থাকিয়া কবির কল্পনাকে মূর্ত্তি গড়িবার অবসর দিয়াছেন, তাঁহার ব্রাহ্মণ-নিমন্ত্রণ-ব্যাপারও তেমনি অনুকূল ও প্রতিকূল নানা প্রসঙ্গের সহিত বিজড়িত হইয়া সত্য নির্ণয়ের পথ একান্ত দুরূহ করিয়াছে।

ক্ষিতীশ-বংশাবলীর চরিতকার বলেন যে, একবার রাজপ্রাসাদের উন্নতশীর্ষে একটী গৃধ্র দর্শনে মহারাজ তাহার ব্যবস্থা নির্ণয়ের জন্য সভাসদ্গণকে আদেশ করিয়াছিলেন। তখন নাকি সমগ্র বঙ্গদেশে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ একজনও

ছিলেন না! সেই জন্য কাণ্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণপঞ্চকে আনয়ন করা আবশ্যক হইয়াছিল। ইহা হইতেই ইংরাজ ঐতিহাসিক অনুমান করিয়াছেন যে, তখন এদেশে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল! ঢাকা জেলার ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মহীন হইয়াছিলেন। সাধারণ্যে ধর্ম্মপ্রচার ও সকলকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই কাণ্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করা আবশ্যক হইয়াছিল। ইতিহাস যখন শুধু প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে, তখন এইরূপেই বিকৃত হয়! * কেহ কেহ বলেন বাজপেয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য আদিশূর ব্রাহ্মণদিগকে বিক্রমপুরে আনাইয়াছিলেন। কাহারও মতে আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞই সাগ্নিক বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কল্পনা লীলাময়ী। দেবীবর বলিতেছেন—ব্রাহ্মণগণ আসিলেন, কিন্তু সকলেরই শক্তিবেশ—খড়্গ চর্ম্মাদি সুশোভিত! মহারাজ আদিশূরের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি হয়ত ভরসা করিয়াছিলেন যে, জটাবল্কলধারী কৌপীন-পরিহিত তেজঃপুঞ্জকান্তি পঞ্চ ব্রাহ্মণ পদরজ দানে তাঁহার রাজ্যকে পবিত্র করিবেন। মহারাজ বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই আসিলেন না। ব্রাহ্মণগণ আশীষ পুষ্প হস্তে সিংহদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে রাজঅতিথি, অতিথি-সৎকার যে পরম ধর্ম্ম—ইহাও কি রাজা বিস্মৃত হইয়াছিলেন? ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাই যাঁহার কামনা ছিল, তিনি একথা যে বিস্মৃত হইবেন, ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, মহারাজ যখন নিতান্তই আসিলেন না, তখন তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব প্রদর্শন বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণ হস্তস্থিত আশীষপুষ্প নিকটবর্ত্তী একটী শুষ্ক হস্তিবন্ধন-কাষ্ঠের শিরে বর্ষণ করিলেন—অমনি "তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লব-সংযুতং"— সেই ফলপল্লব-সংযুক্ত গজারি বৃক্ষের প্রেতমূর্ত্তিই এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে! কবে যে এই অলৌকিক ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই! সম্বন্ধ-নির্ণয়কারের মতে আদিশূরের রাজত্বকাল ৯০০ হইতে ৯৫২ খৃষ্টাব্দ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, গজারি বৃক্ষের বয়স প্রায় সহস্র বৎসর! বিশেষজ্ঞগণ অনুসন্ধান করিলে বৃক্ষ দেখিয়া একবার বিচার করিতে পারিবেন। রামপালের নিকটে কোনো স্থানেই (একটি তিন্তিড়ী বৃক্ষ ভিন্ন) খুব বেশী প্রাচীন বৃক্ষ

---

* He sent to Kanauj for Brahmans *to teach the people the religion* which even the priestly class in *the district* (ইনিও সমগ্র বঙ্গদেশের কথা বলেন না) had forgotten and five Brahmans accompanied by five Kayasthas in due time arrived. Allen's Gazetteer.

দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দুইটী বৃক্ষের (সিপাহী পাড়ায় একটী তিন্তিড়ী ও বল্লাল বাড়ীতে একটী আম্র) প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু উহারাও দুই তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি নাই!

গজারি বৃক্ষের অতি সন্নিকটেই দক্ষিণে বল্লাল দীঘির উত্তর তীর। বৃক্ষ হইতে তীর বোধ হয় ২০ হস্তের অধিক ব্যবধান হইবে না। দীঘিকা বিশালায়তন। দীর্ঘে প্রায় ¾ মাইল এবং প্রস্থে ¼ মাইল। * উহার তলদেশে এখন পাট ও ধান্যের চাষ হয়! কোন কোন স্থানে এখনও জল আছে। তাহা ঘন শৈবালে ও সুদীর্ঘ ঘাসে সমাচ্ছাদিত। দেখিলাম দীর্ঘিকার দক্ষিণাংশে একজন কৃষক অতি কষ্টে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বহিয়া ঘাস কাটিতে যাইতেছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যদিগকে লইয়া বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার সীমান্তে জগদ্দল নামক গ্রামে অনতিদূরে যে দীর্ঘিকা দেখিতে গিয়াছিলাম, উহা এই বল্লাল দীঘি বা রামপাল দীঘির সহিত তুলিত হইতে পারে—এ সংবাদ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির নিকট আবশ্যক বোধ হইতে পারে বিবেচনায় একথা লিখিলাম। সেই উদ্দেশ্যে ইহাও লিখিতেছি যে, অনেক করিয়াও রামপালের জগদ্দল নামক কোনো গ্রামের পরিচয় পাইলাম না! এখানে জোড়াদেউল নামে একটী গ্রাম আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ভ্রম সংশোধন (?)

অসি ও কিরীট ধ'রে
মহীর শাসন করেছে কৃষ্ণ সিংহাসনের পরে"

*　　*　　*

"মহী কা'রে বল, অহির শাসন করেছে, সে মিছে কিরে;
সিংহ-আসন নহেত, তবে সে কালীয় ভুজগ শিরে;
দেখিতে ভুলেছ অসি নহে সেট, বাঁশী বটে৷ প্রাণচোরা,
কিরীট বলিবে বলগে তোমরা, শিখি-চূড়া কই মোরা।"

* The Site of the old capital of Vikrampur is pointed out near the large tank called Rampal Dighi, which is three quarters of a mile long by a quarter of a mile broad.—Allen's Gazetteer.

(২)

"রক্ত প্রবাহ মাঝে,
শিশুপাল সহ যুঝিলেন তিনি বীর-কেশরীর সাজে"

*   *   *

"সেটা একরূপ যুদ্ধ বই কি ? রক্ত নয়ত, রঙ,
হোলীর দিনে সে পিচকারী খেলা, যুদ্ধেরি মত ঢঙ্।
শিশুপাল নহে পশুপাল বল,—গোপালগণের সহ
বীর কেশবের ফাগকুঙ্কুম কেলিরণ তাহে কহ।"

(৩)

"কুরুক্ষেত্র'পরে,
রথের রশ্মি ধরিলেন প্রভু ধর্ম্মের জয় তরে।"

*   *   *

"রথের রশ্মি কোথা পেলে, তবে তরীর কর্ণ বটে,
নর্ম্মের লাগি বাহিতেন তরী যমুনার তটে তটে ;
কুরুক্ষেত্র মাঠ কোথা পেলে, মথুরার পার ঘাটে,
পার হয়ে যেত গোপ গোপী যত দুধ বেচিবারে হাটে।"

(৪)

"বিজয় রক্ত-কেতু
রথের উপর গাহিলেন গীতা ভূভার হরণ হেতু।"

*   *   *

"রথ নয় সেত ঝুলন দোলায়, গীতা নয়, সেত গীত।
পতাকার কথা বলিতেছ যাহা, রক্ত নহেত, পীত।
ভূভার হরণ সে কথা আবার পেলে তুমি কোন্‌খানে ?
গোপীজন মনোহরণের লাগি' গাহিলেন বেণু তানে।"

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রশংসা-প্রসঙ্গ । *

অনুপ্রাস মাফ করিবেন। বস্তুতঃ অনুপ্রাসের খাতিরে আমি প্রশংসার পশ্চাতে "প্রসঙ্গ" প্রয়োগ করি নাই। "প্রসঙ্গ" কথাটির বহুল প্রচলনই আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। আমার একজন বন্ধু এক অতি অপূর্ব্ব নূতন জিনিষ "পুরাতন প্রসঙ্গ" নাম দিয়া বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এমন একটা প্রকাণ্ড প্রতারণা আপনারা ধরিতে পারিলেন না, ইহাই আমার সে গুপ্ত-বন্ধুর বাহাদুরি। আমার এই প্রশংসা প্রসঙ্গে সেরূপ কোনও লুকোচুরী থাকিবে না, ইহা আমি পূর্ব্ব হইতে নিঃসংশয়ে বলিয়া রাখিতেছি।

"প্রশংসা"র স্বরূপ নির্ণয়ে আমি আপনাদিগের সময় অপহরণ করিতে চাহি না। প্রশংসার প্রভাবে ব্যুৎপত্তির অনেক সময় লোপ হয়, সুতরাং ইহার ব্যুৎপত্তি আর কি বলিব? তবে, "প্রশংসা"য় উপসর্গের বড় বাড়াবাড়ি। মূল ধাতু 'শংস' সম্বন্ধে আপনাদের যে কোনও সংশয় থাকিতে পারে, সেরূপ আমার মনে হয় না। ধাতু প্রত্যয় ধরিতে গেলে ইহার বেশী কিছু নিষ্পন্ন হওয়া কঠিন। তবে আমাদের 'ধাতু' আবার এমনই 'অদ্ভুত' যে, সহজে 'প্রত্যয়' হওয়া দুর্ঘট। তোমাকে যখন কেহ প্রশংসা করিল, তখন ইহা প্রত্যয় করিতে তোমার মোটেই প্রবৃত্তি হয় না যে তাহার পশ্চাতে একখানি লঘু মেঘখণ্ডের মত বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অপর কোনও দিক হইতে একটু বাতাসের সাহায্য পাইলেই তাহা নিন্দার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে। দুর্ব্বাক্যের তীব্র জ্বালাময়ী অশনিও তাহাতে চকিতে চমকিয়া উঠিতে পারে।

আমার এক বন্ধু গ্রন্থকার একদিন তাঁহার গ্রন্থখানি দেখিবার জন্য আমাকে তাহার ভবনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ছাত্র জীবনে এরূপ আহ্বান পাইয়া আমি যে সুখী হইলাম, সে কথা বলা বাহুল্য। তিনি আমাকে পাইয়া তাঁহার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার আয়োজন করিয়া বসিলেন। আমার ত চক্ষুঃ স্থির! তবে সাহিত্যিক বন্ধুগণের সাহচর্য্য লাভে যাঁহারা ভাগ্যবান, তাঁহারা স্বভাবতঃই কিছু সহিষ্ণু; মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে এরূপ স্নেহের অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। কেহ একটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা আপনাকে না শুনাইলে তাঁহার কবিতা সার্থক হয় না; কেহ একটি ছাপায় পৃষ্ঠাব্যাপী ছোট গল্প লিখিয়াছেন, তাঁহার খানিকটা অন্ততঃ (অর্থাৎ আগাগোড়া) আপ-

* সাহিত্য-সভ্যের ৪র্থ অধিবেশনে পঠিত।

নাকে শুনিতেই হইবে; কেহ একটি সমালোচনা লিখিয়াছেন, তাহা আপনার ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি একবার না শুনিলে, তাহা ছাপিতে দিতে লেখকের কেমন কেমন বোধ হয়! (অথচ সে সমালোচনা যে বহুপূর্ব্বে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন)। আপনাকে এ সকল শুনিতেই হইবে এবং শ্রবণ কালে আপনি আপনার পারলৌকিক চিন্তায় লিপ্ত থাকুন, আর ভাল করিয়া ভাব গ্রহণ-ব্যপদেশে একটু তন্দ্রালু হইয়াই পড়ুন—তাহাতে তত আসিয়া যায় না। পাঠশেষে আপনি যদি বলেন! "বাঃ এরই মধ্যে শেষ হইল! কি চমৎকার! কবিতাটি রবীন্দ্রবাবুরও যোগ্য, গল্পটি প্রভাতবাবুকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, সমালোচনাটি সমালোচ্য পুস্তক অপেক্ষাও প্রতিভার পরিচায়ক—"ইত্যাদি বা এইরূপ ধরণের কিছু—তাহা হইলেই আপনার বন্ধু খুব খুসী হইবেন। ইহার পরে যদি আপনার ভাগ্যে মাঝে মাঝে জলযোগের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে আপনি বিস্মিত হইবেন না। তবে দুঃখ এই যে, এ দেশে সাহিত্যিকগণ বড় গরীব। দুই একজন ভাগ্যবান লেখক যাঁহারা ধনী, তাঁহারাও দুর্ভাগ্যের বিষয়, সস্তায় সারিতে চান।

আমার সেই বন্ধু—যিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—তিনি ধনী নহেন। তিনি যখন তাঁহার দেড়শত পৃষ্ঠার কেতাবখানি খুলিয়া বসিলেন, তখন গ্রীষ্মমধ্যাহ্নের সূর্য্য পশ্চিমে ঈষৎ হেলিয়াছে। ক্রমে সূর্য্য অস্তমিত হইল। তখন আমরা উঠিয়া ছাতে গেলাম। সেখানেও পুস্তকপাঠ চলিতে লাগিল। পরে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার পাঠে বাধা জন্মাইতে লাগিল, তখন পুনরায় আমরা দীপালোকিত কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে পাঠ সমাপ্ত হইলে, জলখাবার আসিল। সেগুলি উদরসাৎ করিতে করিতে গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বলা বাহুল্য, তৃপ্তিকর জলযোগের মত, তাহাও সরস হইয়াছিল।

অদৃষ্টের পরিহাস এইখানেই সমাপ্ত হইল না। আর একজন সাহিত্যরসিক বন্ধুর হাত এড়াইতে না পারিয়া ঐ পুস্তক খানিরই সমালোচনা করিতে হইল—আমাকেই। বন্ধুবরও আমার সহিত যোগদান করিলেন। সমালোচনায় অনেক কথা বলিলাম। কিন্তু সেগুলি, গ্রন্থকারের গৃহে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা হইতে সম্পূর্ণ অন্য রকমের। কিছু বেশী তীব্র হইয়া গেল। অনেকেই তাহা উপভোগ করিলেন—করিলেন না কেবল লেখক! অবশ্য

ইহার পরে সেই গ্রন্থকার বন্ধু বা তাঁহার পুস্তকের নাম জানিতে চাহিয়া আমাকে কেহ লজ্জা দিবেন না, ইহা আমার কৃতাঞ্জলিসহ অনুরোধ।

অনেকে হয়ত আমাকে কপটতার জন্য দোষী করিতেছেন। যেটুকু কপটতা শিষ্টাচারের জন্য অনুমোদিত, আমি তাহারও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছি বলিয়া কেহ কেহ নিশ্চয়ই মনে করিতেছেন। তৎ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তখন আমি নিতান্ত অপরিণত-বয়স্ক, জলযোগের মহিমায় মুগ্ধ এবং সে দিন গ্রীষ্মের কিছু প্রাখর্য্য ছিল।

প্রশংসা জিনিষটি বড় মুখরোচক। প্রশংসায় বদ্‌হজম হইতে মাঝে মাঝে শুনা গিয়া থাকে—কিন্তু অরুচির কথা বড় একটা শুনা যায় না। বরং সত্য মিথ্যায়, কর্ম্মে অকর্ম্মে অরুচি হইলে প্রশংসার পূর দিয়া তাহাকে বেশ মুখরোচক করিয়া তুলা যায়। এমন কি বশাকরণের মন্ত্র পর্য্যন্ত প্রশংসার উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিতে গ্রথিত। ঋগ্বেদের স্তবস্তুতির যুগ হইতে বল্লালসেনের রজত-শাসনের কৌলিন্য যুগ পর্য্যন্ত বশীকরণের মন্ত্রে প্রশংসার একাধিপত্য সূচিত হইতেছে। যিনি বলেন খ্যাতির বিড়ম্বনা আমি চাহি না, তোসামোদকে আমি ঘৃণা করি—তিনি গভীর জলে নোঙর করিয়া রহিয়াছেন। তিনি মনে করেন প্রশংসার ছোট ছোট লালডিঙ্গীগুলি পাল তুলিয়া তাঁহারই দিকে ছুটিবে। তিনি মুখ ফিরাইয়া অপর দিকে চাহিয়া থাকিলেও তাঁহার অপাঙ্গের লোলদৃষ্টি এক একবার চকিতে পশ্চাদ্দিকের সন্ধান জানিয়া লইতেছে। এত লোকের মধ্যে কেবল তাঁহারই যে প্রশংসা ভাল লাগে না—অন্ততঃ এই প্রশংসাটুকুর কাঙ্গাল তিনি!

তবে একটা কথা বলিয়া রাখি—প্রশংসাটা ভরাপেটেই লাগে ভাল। সেই জন্য বাস্তবিকই আমার ভয় হইতেছে যে, এই জলবিয়োগ-বিধুর অর্থাৎ নির্জ্জল-যোগ সুতরাং অসঙ্গত সাহিত্য-সঙ্গতে আমার এই প্রশংসা আপনাদের তৃপ্তিকর হইবে কি না। চায়ের ছলকে, চুরুটের ধূমে, তাম্বুলের রাগে প্রশংসার নেশা পাছে ছুটিয়া যায়, এই ভয় মনে বাসি।

প্রশংসার নেশা খুব জমে। প্রথমটা সব নেশার মত এ নেশাও ধরাইতে কিছু কষ্ট। অন্য নেশার শত্রু—অর্থাভাব। এ নেশার শত্রু—বিদ্রূপ। প্রথমটা মাত্রা ঠিক না রাখিয়া প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে মনে হয় যেন ঠাট্টা। তখন নেশা ধরিতে চাহে না। একবার প্রত্যয় হইয়া গেলে, শেষে প্রশংসার ফোয়ারা ছুটাইয়া দাও। নেশায় ভরপুর হইয়া যাইবে।

শেষে কা কা রবে চঞ্চু নড়ে
মিঠাই মাটীতে পড়ে,
শৃগাল পলায় লয়ে মনের হরষে।

নিন্দার একটা গুণ এই যে, ইহাতে প্রায়ই আন্তরিকতা থাকে, প্রশংসায় প্রায়ই থাকে না। তাহা বলিয়া একেবারে আন্তরিকতাশূন্য নির্লজ্জ প্রশংসা সব যায়গায় চলে না। অনেক স্থলে পাতায় ঢাকা ফুলের মত, ঘোমটায় ঢাকা মুখের মত প্রশংসার মধ্যে একটু সংকোচের ভাব থাকে। এই সংকোচের ভাব ঢুকাইয়া দেওয়াই প্রশংসার আর্ট (art)। প্রশংসা দিতেও সংকোচ, নিতেও সংকোচ। বেবারসী সিল্কে শলমাচুমকীর কাজের মত এই সংকোচটুকু বেশ সাজাইয়া মানাইয়া মিশাইয়া দিতে অনেক কারিগরী চাই। সময়ে সময়ে একটি কথা, একটি ইঙ্গিত, একটুখানি যতি, সুরের একটু কম্পনে এত প্রশংসা প্রকাশ করা যায় যে, প্রশংসার দীর্ঘছন্দে একখানি বিরাট পর্ব্ব রচনা করিলেও তেমন লাগসই হয় না। এই মনে করুন, আপনি একটি কবিতা পাঠ করিতেছেন, আর আমি নির্ণিমেষে আপনার মুখের দিকে চাহিয়া এমনই গদগদ ভাব প্রকাশ করিলাম যে, সহস্র বাক্যযোজনার অপেক্ষা আপনি তাহাতেই গলিয়া গেলেন।

প্রশংসা অতি সস্তা হইলেও দুর্মূল্য। অর্থনীতির হিসাবে কথাটা ঠিক না হইলেও, অনেক সময়ে এমন অনর্থও ঘটে। নদী খাল বিল সব সাগরে গিয়া মিশে। সাগরের জলের লোণা তাহাতে কাটে না। অভিমানের রৌদ্র-করে সে সব জল টানিয়া শুষিয়া ধোয়ার মত কোথায় উড়াইয়া লইয়া যায়। আর স্বচ্ছ নির্ম্মল পূতোদক সীতাকুণ্ডের সঙ্গে একটি ধারাও আসিয়া সঙ্গত হয় না। এমন অনেক স্থলে দেখা যায়।

প্রশংসা পাইতে যদিও সকলেরই খুব আগ্রহ আছে, কিন্তু দিতে তেমন আগ্রহ বড় দেখা যায় না। অনেকের প্রশংসাই দেখিবেন—সযত্নে ওজন করা বিন্দু বিন্দু কৃপা। সাময়িকপত্র-সম্পাদক এমনই এক তুলাদণ্ড হস্তে তাঁহার জীর্ণ, মসীলিপ্ত টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছেন। গল্প প্রবন্ধ কবিতা—ত্রিপদী চতুষ্পদী চতুর্দ্দশপদী—ভারে ভারে আসিতেছে। তিনি নিদ্রালু চোখে সেগুলি একবার তাঁহার তুলাদণ্ডে আছাড়িয়া ফেলিতেছেন। অধিকাংশই ঝরিয়া টেবিলের নীচে ঝুড়িতে পড়িয়া পচিতেছে; অবশিষ্ট ছাপাখানার মসী কর্দ্দম অতিক্রম করিয়া দিনের আলোক দেখিয়া জন্মসার্থক করিতেছে। ইহাই প্রশংসার সম্পাদকীয় রীতি। আজ যাহাকে তাঁহার পত্রে স্থান দিয়া সম্পাদক

সুমেরুশৃঙ্গে তুলিয়া দিলেন, কাল আবার সমালোচক হিসাবে তাহাকে বৈতরণীতে ভাসাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহার কোনওটির জন্য "সম্পাদক দায়ী নহেন।" সম্পাদকীয় প্রশংসার একটি নমুনা দিতেছি।

"মরীচিকা" একখানি কাব্য। আধুনিক কবিতা যেরূপ দুর্ব্বোধ অথচ লঘু, অর্থশূন্য অথচ মিষ্ট, সুন্দর বাঁধাই অথচ সুলভ, এখানিও সেইরূপ। গীতি, অবসর, নির্ঝর, শেফালি প্রভৃতি কবিতা বাজে, রাবিশ। অপর কবিতাগুলিতে মৌলিকতার লেশ নাই। কবিতার মধ্যে যেটুকু আর্ট, লেখক তাহা ধরিতে পারেন নাই। তবে মোটের উপর গ্রন্থখানি মন্দ নয়, আমরা সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি।"

বলা বাহুল্য, সম্পাদক দায়ী নহেন।

অধিকাংশ লোকই প্রশংসার সম্পাদকীয় রীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন। কেমন যেন একটু কৃপণতা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। আমাকে কেহ মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসা করে না, সে জন্যই হউক, অথবা আমি নিজের অভিমান লইয়া ব্যস্ত বলিয়াই হউক, অপরকে মন খুলিয়া সুখ্যাতি করিতে যেন কুণ্ঠিত। সকলেই যে এইরূপ ভাবাপন্ন, তাহা বলিতেছি না। কেহ কেহ এমন আছেন যাঁহারা নিঃসংকোচে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া প্রশংসা করিতে পারিলেই সুখী হন। যেখানে বার আনা প্রাপ্য, সেখানে ষোল আনা দিয়াও তৃপ্ত হন না।

প্রশংসার আর একটি বিপত্তি এই যে, কেহ কেহ অপরকে প্রশংসা করিবার উপলক্ষে নিজের প্রাপ্য আদায় করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করেন। আপনারা হয়ত দেখিয়াছেন যে, অনেক প্রশংসাপত্রের ভাষা যেন জ্বল জ্বল করিতেছে। তাহার মধ্যে কত ভাব, কত কাব্য, কত রস প্রবেশ করাইবার চেষ্টা হইয়াছে! আমাদের মধ্যে দেখিয়াছি অনেকে প্রশংসাপত্র লিখিবার সময়ে, পাত্রের গুণাগুণ অপেক্ষা English Composition-এর দিকে বেশী মনোযোগ দিয়া ফেলেন। যেখানে আর একটি adjective না বসাইলে finish ভাল হয় না, একটা superlative না দিলে style জমাট হয় না, সেখানে চোখ কাণ বুজিয়া দিয়া ফেলা যাক্—কে আবার ভাবে?

প্রশংসাপত্রের ভাষায় আর একটি লক্ষ্য করিবার জিনিস আছে। কোনও কোনও প্রশংসাপত্রে প্রকৃত অর্থ গোপন করিবার বেশ একটি প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। বাধ্য হইয়া যেখানে কোনও বস্তু বা ব্যক্তির প্রশংসা করিতে হয়, সেখানে অর্থের একটু আধটু গোলযোগ থাকা মন্দ নহে। একজন ম্যালেরিয়া

মিকশ্চার অথবা বকুল-কুসুম তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন; তাঁহাকে একটা ভাল সার্টিফিকেট দিতে হইবে। কি করা যায়? "নিয়মিত ব্যবহার করিলে ম্যালেরিয়া রোগে অথবা কেশাল্পতায় উপকার দর্শিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।" ইত্যাদি প্রকারে প্রশংসা করা চলে। কোনও কোনও প্রশংসাপত্রে দ্ব্যর্থ-বোধক বাক্যও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। একটি কেশ-তৈলের প্রশংসায় একজন লিখিয়াছিলেন "কেশ উঠিতে আরম্ভ করিলে এ তৈল ব্যবহারে আর উঠে না।" প্রশংসা করিবার বিশেষ কিছু যেখানে থাকে না, সেখানে আমরা "এই ব্যক্তির উন্নতির কথা শুনিলে সুখী হইব, এই ঔষধের বহুল বিক্রয় কামনা করি" ইত্যাদি লিখিয়া পাদপূরণ করিয়া থাকি।

পাদপূরণের পরিবর্ত্তে যেখানে প্রশংসা উদর পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা নানা ভাবে, নানা আকারে দেখা দেয়। আপনি আপনার ছেলের শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পটলা, কেমন পড়িতেছে?" মাষ্টার মহাশয় অকপটচিত্তে বলিলেন, "পড়ে ভাল; কিন্তু মনোযোগ তাদৃশ নাই। যদি মনোযোগ দিত, তবে ক্লাসে ফাষ্ট, সেকেণ্ড হ'তে বাধা ছিল না।" ঐ "যদি", তাঁহাকে এ যাত্রা বাঁচাইয়া দিল। এইরূপ যত্যাত্মক প্রশংসা অনেকের আত্মপ্রসাদের মূল। অমুক যদি উকীল হইতেন, তবে আজ ডাঃ ঘোষকে পলায়ন করিতে হইত। অমুক যদি চাকরীর পরিবর্ত্তে লেখনী ধরিতেন, তবে বঙ্গ সাহিত্যের শ্রী অন্যরূপ হইত, ইত্যাদি অতি নিরাপদ রকমের প্রশংসা।

প্রশংসার ফল যেখানে ফলে—সেখানে প্রত্যক্ষ। আপনার বই বাজারে চলে না, কবিবর পরমানন্দকে অথবা বাগ্মিবর শ্যামানন্দকে উৎসর্গ করুন। কিছু কাটিবে। পাঠ্য-পুস্তক করিতে চান, শ্রীল শ্রীযুক্ত মহোদয়কে নানা বিশেষণ ও উপাধি সংযুক্ত পুষ্পাঞ্জলির দ্বারা উৎসর্গ করুন। অব্যর্থ। গায়ককে সুখ্যাতি করুন, দুই একবার বাহবা দিন্, গায়কের চক্ষু আপ্নাকে অন্বেষণ করিবে। গায়ক, বাদ্যকর, শিল্পী কিছু প্রশংসার প্রত্যাশী। বাহবা ব্যতীত গান জমে না।

শুধু গায়কের দোষ দিব কেন? প্রশংসার সুযোগ পরিত্যাগ করা সকলের পক্ষেই কঠিন। যাহারা প্রশংসা লাভের অধিকারী, তাঁহারা এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে চাহেন না কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যাঁহারা অধিকারী নহেন, তাঁহারাও এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। এমনই দুরন্ত নেশা। যিনি বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনি বক্তৃতা করিবার লোভ

সামলাইতে পারেন না। যিনি গান করিতে পারেন, তাঁহাকে অনুরোধ করিবার পূর্ব্বেই তিনি সুর ভাঁজিতে থাকেন। আর যিনি বক্তৃতায় তেমন অভ্যস্ত নন, তিনি অন্ততঃ সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার প্রসঙ্গে দশমিনিট বলিতে চান। গান না করিতে পারিলেও পাখোয়াজের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাইয়া সোমে তাল হাঁকড়াইবার জন্য ব্যগ্র।

প্রশংসার এক অভিনব সুযোগ আজকাল দেখা যাইতেছে—অপরকে দিয়া গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া লওয়া। এ প্রথাটি মন্দ নয়—ইহাতে আহার ঔষধ দুই-ই হয়। যাঁহাকে ভূমিকা লিখিবার জন্য অনুরোধ করা হয়, তাঁহাকে বেশ আর্টের সহিত প্রশংসা করিয়া লওয়া হইল। তিনিও সস্তায় কিস্তী পাইয়া গভীর গবেষণা জুড়িয়া দিয়া নিজের প্রশংসাপ্রাপ্তির সুযোগ করিয়া লইলেন, এবং গ্রন্থের সম্বন্ধে অবান্তর ভাবে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে গ্রন্থকারেরও হয়ত সুখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে একটু চৈতন্য হইল। আমার ইচ্ছা আছে, একখানি গ্রন্থ লিখিয়া উঠিতে পারিলে বড় বড় লোকের Symposium, জুটাইয়া, জবাকুসুমের প্রশংসাপত্রের আকারে একটি ভূমিকা লেখাইয়া লইব।

প্রশংসা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি, কিন্তু আমার এই বাক্যজালে সেত ধরা পড়িল না। কতবার জাল ফেলিয়াছি ও ফেলিতেছি, কিন্তু সে শফরী একবার সূর্য্য কিরণে বিদ্যুৎ খেলিয়া জালের ফাঁক দিয়া পলাইয়া যায়। জালে বাধিয়া আসে, গুল্ম, শম্বুক ও কর্দ্দম।

জাল না ফেলিয়া যখন কমলাকান্তের মত চক্ষু মুদিয়া নিরীক্ষণ করি, তখন দেখি প্রশংসা ফুলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। আমরা যেন প্রশংসাকে ফুল বলিয়াই মনে করি। ফুলে পৃথিবীর কোনও কাজই হয় না। বালক বৃদ্ধ যুবা ধনী দরিদ্র সকলেই কিন্তু ফুলের লোভে মুগ্ধ। ফুলে সন্তুষ্ট হয় না কে? কিন্তু ফুল দেবপূজায় লাগিলেই তাহার ফুলজন্ম সার্থক। তাই বলিতেছি, ঐ প্রশংসার ফুলরাশি ঘরে লইয়া গিয়া কাজ নাই। উহা ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া বিদায় লই।

উপসংহারে একটি কথা বলিতে চাহি; প্রশংসাসূত্রে ভুলক্রমে যদি কাহারও নিন্দা করিয়া ফেলিয়া থাকি, তবে তাহা ব্যাজস্তুতি বলিয়া সহৃদয় বন্ধুগণ গ্রহণ করিবেন এই অনুরোধ।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

সঙ্গী।

একা ঘরে নিশিদিন বসতি আমার,
তবু শুধু ফিরে ফিরে চাই,
অঙ্গের চন্দন গন্ধ আসে যেন কার,
পদধ্বনি শুনিবারে পাই!
বাতাসে চঞ্চল হয় অঞ্চল আমার,
সূর্য্য করে রাঙা হয় মুখ,
মনে জানি ছুঁয়ে গেল পরশ কাহার,
কে আমার ভরে' দিল বুক!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সত্যকাম জাবাল

(বৈদিক চিত্র)

বৈদিক যুগে একদিন, সত্যকাম নামক একটি কিশোর বালক, তাহার জননী জবালকে বলিল—'মা, এরূপভাবে ক্রীড়া কৌতুকে অনর্থক সময় নষ্ট করিতে আমার আদৌ প্রবৃত্তি হইতেছে না—আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আমি ঋষি-আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালাভে জীবন সার্থক করি।"

জবাল দাসীবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে—তাহার পুত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে—একথা স্বপ্নের হইলেও মহা আনন্দের বিষয়। সুতরাং তাহার পুত্র স্বইচ্ছায়, অপরাপর গ্রাম্য বালকের ন্যায় বৃথা সময় অতিবাহিত না করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

জবালার নয়নযুগল আনন্দে ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। পুত্রকে প্রগাঢ় স্নেহ সহকারে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিল।

তদনন্তর জবালা কহিল—'বৎস সত্যকাম, তোমার যে মহৎ আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ

হইয়াছে—আশীর্ব্বাদ করি—তুমি নিজ কৃতিত্ববলে সেই চির আকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ বস্তুর সন্ধান লাভ করিতে সমর্থ হও—আমার এই ঘৃণ্য দাসীজীবন সার্থক হউক—তোমার অসাধারণ সত্য-নিষ্ঠা, অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় এবং প্রবল জ্ঞানলিপ্সার কথা, অনন্তকাল ধরিয়া জগতের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হউক।'

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তৎকালে গুরুগণ, জাতিব্যবসায়-নির্ব্বিশেষে শিষ্যপদা-কাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রকেই বিদ্যাদান করিতেন না। প্রত্যেক শিষ্যের বংশ-পরিচয় ও অধিকারের তারতম্য বিবেচনা করিয়া এবং তাহাদের স্বভাবজাত মনোবৃত্তির গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শিক্ষাদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। যে কেহ আসিয়াই শিষ্যত্বের গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইত না। এই নিমিত্ত তখন গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ, পিতা পুত্রের সম্বন্ধ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না—গুরুর আশ্রমে তাঁহার নিত্য সতর্ক তত্ত্বাবধারণ ও পর্য্যবেক্ষণ গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত রহিয়া তাহার পূত চরিত্রের পুণ্যপ্রভাব, শিষ্যের স্বভাব ও চরিত্রের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে সঞ্চারিত হইয়া যাইত।

সত্যকাম, আশৈশব জননীর তত্ত্বাবধারণে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করিয়া নিজ বংশের বিশিষ্ট পরিচয় অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। এখন, সত্যকাম জননীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ চলিয়াছি—গুরু অপরিচিত শিষ্য গ্রহণ করেন না—আমি নিজ গোত্র-পরিচয়-অবগত নহি—আপনি কৃপা করিয়া আমার গোত্র-পরিচয় প্রদান করুন—আমি গুরুগৃহে প্রস্থান করি।"

সত্যকামের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া জবালার চিরমলিন আনন সমধিক প্রফুল্ল ও সমুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন সত্যকামের প্রশ্ন শুনিয়া যেন ততোধিক বিমলিন ও ম্রিয়মান হইয়া গেল—তাহার সদ্য গর্ব্বোন্নত হৃদয় অচিরে অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

জবালা, সত্যকামের প্রশ্নের পর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিল—এ জীবনে যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, তাহারই সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত শত শত জীবনে ঘটিয়া উঠিবে না—আবার কেন মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া পাপের ভার বর্দ্ধিত করি। জবালা, এইরূপ সত্যের আশ্রয় গ্রহণে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলে পুনরায় অপূর্ব্ব প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে তাহার প্রাপ্তজ্ঞান পুত্রের সমক্ষে নিজ কলঙ্কের কথা প্রকাশিত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ না করিয়া অসঙ্কোচে স্পষ্ট ভাষায় বলিল—"বৎস, তুমি

কোন্ গোত্র, তাহা আমি যথার্থরূপ অবগত নহি। আমি যৌবনাবস্থায় বহু গৃহে পরিচারিকার কর্ম্ম করিতে করিতে তোমায় লাভ করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত, কাহার ঔরসে তোমার জন্ম হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে, আমার নাম জবালা—তোমার নাম সত্যকাম—তুমি 'সত্যকাম জাবাল'—এই মাত্র বলিয়া গুরু সমীপে আত্মপরিচয় প্রদান করিও।"

সে দাসীপুত্র ও জারজ—একথা সত্যালোক নিবদ্ধদৃষ্টি সত্যকামের মনে স্থানলাভ করিয়া তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। সত্যের বিমল জ্যোতিঃ যাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সে দৃঢ় পদক্ষেপে স্থির লক্ষ্য হইয়া গন্তব্যপথে দ্রুত অগ্রসর হইবে—অবান্তর বিষয় তাহার গতি প্রতিরোধ করিতে কথনই সমর্থ হইবে না।

সত্যকাম মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া আশ্রম উদ্দেশে যাত্রা করিল।

(২)

বহুবিস্তৃত অরণ্যমধ্যে, বৃক্ষবিরল একটি নিভৃত প্রদেশ। তথায় স্বচ্ছতোয়া নাতিবৃহৎ এক স্রোতস্বিনী কুলুকুলু শব্দে সদাই প্রবাহিত হইতেছে।

অদূরে এক বৃহৎ বনস্পতি অগণিত লতায়মান সুদীর্ঘ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দিব্য এক ছায়াশীতল মনোরম স্থান রচনা করিয়া দণ্ডায়মান। ছায়াতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র কুঠীর, বৃক্ষমূলে একটি মৃন্ময় ক্ষুদ্র বেদী।

বেদীর উপর কুশাসনে উপবিষ্ট রহিয়া মহর্ষি গৌতম উপদেশ প্রদান করিতে-ছেন—আর নিম্নে শিষ্যগণ মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট রহিয়া একাগ্রচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া তৎসমুদয় শ্রবণ করিতেছে। অদূরে কুটীরে বিভিন্ন অধিকারের শিষ্যগণ মধ্যে কেহ কেহ বা অনুচ্চকণ্ঠে নিজ নিজ পাঠ আবৃত্তি করিতেছে—কেহ কেহ বা ত্বরিৎ উদাত্ত স্বরে বেদগান করিয়া সেই নিভৃত আশ্রম মুখরিত করিয়া তুলি-তেছে। কোন শিষ্য বৃক্ষবীথিকায় জলসেচনে নিযুক্ত—কোন শিষ্য পুষ্পচয়নে—কেহ বা কুটীর-মার্জ্জনে—কেহ বা সমিধ্ আহরণে—কেহ বা কৃষিকর্ম্মে—কেহ বা গোপালনে—এইরূপ দলে দলে শিষ্যগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে লিপ্ত রহিয়া একাগ্রমনে তৎসমুদয় সম্পাদনে যত্নপর রহিয়াছে।

সত্যকাম, কল্পনায় যে সত্যের আলোক-রেখা-সম্পাতের আভাষ মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই বিজন প্রদেশে কল্পনার অগোচর মনোহর স্থান ও সত্যের সন্ধা-

নাকাঙ্ক্ষী অগণ্য শিষ্য ও সারসত্যের অধিকারী মহর্ষি গৌতমকে নেত্রগোচর করিয়া, তাহার মস্তক সম্ভ্রমভরে স্বতই লুটাইয়া পড়িল।

সত্যকাম, সেই পুণ্য আশ্রমের বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান রহিয়া একদৃষ্টে গৌতম ঋষির অপূর্ব্ব দীপ্তোজ্জ্বল স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল—'আহা, এই ঋষি যাহাদিগকে তাঁহার সেবাধিকার প্রদান করিয়া শিষ্যত্বের গৌরব প্রদান করিয়াছেন—তাহারা ধন্য, কত ভাগ্যবান! এ বৃথা আকাঙ্ক্ষা আমি কেন করিতেছি—আমার এমন কি সুকৃতি আছে!" সত্যকামের গণ্ডযুগ বহিয়া প্রবল ধারায় অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল—সে অশ্রুসিক্ত লোচনে দূরে দণ্ডায়মান রহিয়া আশ্রমের ক্রিয়াকলাপ নয়নগোচর করিয়া নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল।

অধ্যাপনা সমাপন হইলে মহর্ষি গৌতমের নবাগতের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—তিনি তাহাকে তাঁহার নিকটস্থ হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

সত্যকাম, দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তথা হইতে যোড়করে সসঙ্কোচে ধীরপদে অগ্রসর হইয়া অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইলে পুনরায় প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল। মহর্ষি গৌতম, তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সত্যকাম বলিল—"ভগবান্, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আপনার নিকট অবস্থান করিয়া সেবাধিকার প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষায় আমি এখানে আগমন করিয়াছি—আপনি এ অধমের প্রতি সদয় হউন।"

তখন মহর্ষি গৌতম, সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বংশ-"পরিচয় কি?—তুমি কোন গোত্র-সম্ভূত?"

সত্যকাম বলিল—"ভগবান্, আমি কোন্ গোত্র-সম্ভূত, তাহা অবগত নহি। জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তিনি বলিয়াছেন যে যৌবন কালে তিনি বহু স্থানে বহু লোকের পরিচারিকার কার্য্য করিতে করিতে আমায় প্রাপ্ত হইয়াছেন সুতরাং আমি কোন গোত্র-সম্ভূত, তাহা তিনি নির্দ্দিষ্ট ভাবে বলিতে পারেন না। আমার মাতার নাম জবালা—আমার নাম সত্যকাম। এই নিমিত্ত, আমি 'সত্যকাম জাবাল' এই মাত্র আমায় কহিয়া দিয়াছেন—এতদতিরিক্ত আমি নিজের বংশ-পরিচয় অবগত নহি।"

মহর্ষি গৌতম সত্যকামের অসাধারণ সত্যপরায়ণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। যে বালক সত্যের জন্য, জননীর ও নিজের গ্লানিকর বৃত্তান্ত অসঙ্কোচে লোকসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলিতে দ্বিধা বোধ করে না, তাহার হৃদয় কত মহান্—তাহার চরিত্র ও নৈতিকবল কত দৃঢ়—তাহার আদর্শ কত উচ্চ!

উদারহৃদয় সমুন্নতমনা মহর্ষি, সত্যকামের প্রতি সদয় ও প্রসন্ন হইলেন—দাসীর জারজ সন্তান বলিয়া তাহার প্রতি ঘৃণার পরিবর্ত্তে তাহার অপূর্ব্ব সত্য-নিষ্ঠায় বিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন—"বৎস, তুমি আপনাকে জারজ দাসীপুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও আমি দিব্য দেখিতে পাইতেছি, তুমি অ-ব্রাহ্মণ নহ—প্রকৃত ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহ এরূপ ভাবে নিঃসঙ্কোচে সত্য বলিতে সমর্থ হয় না। তুমি সমিধ আহরণ কর—আমি এখনই তোমায় উপনীত করিয়া হৃষ্টচিত্তে শিষ্যাধিকার প্রদান করিব। তুমি সত্য হইতে কণামাত্রও বিচলিত হও নাই, তুমিই আমার শিষ্যত্ব গ্রহণের প্রকৃত অধিকারী।"

সত্যকাম মহর্ষি গৌতমের অত্যুন্নত উদার ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল—জারজ দাসীপুত্র, সত্যের কাঙ্গাল হইলে—প্রকৃত সত্যান্বেষী হইলে, ব্রাহ্মণের গৌরব দান করিতে উদ্যত—এতদপেক্ষা আর মহত্তর ভাব কি হইতে পারে?

সত্যকাম, মহর্ষি গৌতমের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

আজ্ঞানুযায়ী সমিধ্ আহরণ করিলে মহর্ষি গৌতম, সত্যকামকে তৎক্ষণাৎ উপনীত করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করিলেন। সত্যান্বেষী সত্যকাম, অভিজ্ঞ পরিচালকের অভয়-আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ও আশ্বস্ত হইল।

(৩)

যথারীত উপনীত করিয়া মহর্ষি গৌতম সত্যকামকে বলিলেন—"বৎস সত্যকাম, তুমি এই আশ্রমের দুর্ব্বল ও কৃশ গো-পাল হইতে চারিশত গাভী মোচন করিয়া চারণা ও পরিচর্য্যার জন্য তাহাদের অনুগামী হও।"

সত্যকাম, গুরু আদেশ লাভে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়া চারিশত দুর্ব্বল ও কৃশ গাভী, তৎক্ষণাৎ গো-গৃহ হইতে মোচন করিয়া চারণার্থ বহির্গত হইলে মহর্ষি কহিলেন—"এই চারিশত গাভী যাবৎ সংখ্যায় পূর্ণ-সহস্র না হয়, তাবৎ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।" সত্যকাম ঋষির চরণ বন্দনা করিয়া গো-পাল সহ প্রস্থান করিল।

মানবের স্বভাবতঃ প্রবুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তির সম্যক্ বিকাশ সাধনই বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দিব্যজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতি লাভই ইহার চরম পরিণতি।

এই প্রবুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এবং এই বিকশিত বা উদ্বোধিত বুদ্ধিবৃত্তির

সহায়তায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার জন্য, গ্রন্থবদ্ধ জ্ঞানই একমাত্র অবলম্বনীয়” আশ্রয় নহে। সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যাপিয়া প্রকৃতির প্রতি ঠাঁই, জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত রহিয়াছে—ক্ষুদ্র কক্ষ মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়া গ্রন্থাভ্যাস অপেক্ষা প্রকৃতির লীলানিকেতন মধ্যে সতর্কদৃষ্টি হইয়া অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন পক্ষে অল্প কার্য্যকরী নহে।

অনন্ত নীল আকাশতলে শ্যামায়মান জনশূন্য বিশাল বনভূমি, রৌদ্রদগ্ধ বিপুল প্রান্তর, চঞ্চলগতি তটিনী—মুক্ত প্রকৃতির এ সকল বিচিত্র বিকাশ যে প্রকৃত ভাবুকের হৃদয়ে, ধ্রুবসত্যের স্বর্গীয় মহিমা প্রকটিত করে, তাহার তুলনা কোথায়? তবে, এই ভাবে প্রকৃতির জগদ্ব্যাপী ক্ষেত্র হইতে ভাব বা জ্ঞানবিত্ত সঞ্চয় করিবার মত প্রবল অনুসন্ধিৎসা, সূক্ষ্ম বিভাবনা ও গভীর পর্য্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। নচেৎ, নিরক্ষর ব্যক্তির সমক্ষে অক্ষরময় গ্রন্থের ন্যায়, অনবহিত ব্যক্তির পক্ষে, উন্মুক্ত প্রকৃতির বিরাট নিকেতন চিররুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

মহর্ষি গৌতম, সত্যকামকে উপনীত করিয়া, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা তাহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তি উন্মেষিত করিয়া দিলেন। প্রবল জ্ঞানলিপ্সু সত্যকামের এখন দিব্য দৃষ্টি লাভ হইল—সমগ্র জগত তাহার সমক্ষে এখন এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রকটিত হইল।

কি অরণ্য প্রান্তর, কি গিরিগুহা নদীকন্দর, কি তরুগুল্ম, কি লতাবিতান, কি তড়াগ সরোবর, কি পক্ষীর কূজন—পশুর গর্জ্জন—বজ্রের নির্ঘোষ, কি পদ্মের পরিমল—শ্মশানের ধূম—প্রকৃতির সকলেই সর্ব্বত্র জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিল। সত্যকাম, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া—তাহা ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিল। বুভুক্ষু, প্রচুর খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল! যেমন অসীম জ্ঞানলিপ্সা, তেমনি জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার!—যেমন দাতা, তেমনি গৃহীতা—আদান প্রদানের বিচিত্র লীলা!

সত্যকাম, শয়নে স্বপনে—আহারে বিহারে—অহরহঃ অনন্যমনে, প্রকৃতির অনন্ত রূপ চিন্তা করিয়া—চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র—গিরিবন, নদী সমুদ্র প্রভৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাব অনুভব ও উপলব্ধি করিয়া ক্রমেই সারসত্যের সমীপস্থ হইতে চলিয়াছে—ক্রমেই বহিঃপ্রকৃতি হইতে অন্তঃপ্রকৃতির চিন্তায় আত্মস্থ হইয়া চরম সত্যের দিব্য স্নিগ্ধ জ্যোতির সন্ধানলাভে কৃতার্থ হইতে চলিয়াছে।

মহর্ষি গৌতম দ্রষ্টা। তিনি সত্যকামকে শিষ্যাধিকার প্রদান কালেই বুদ্ধি-

য়াছিলেন, এ বালক জারজ দাসীপুত্র হইলেও ইহার অন্তর মধ্যে এমন কিছু নিহিত ও প্রচ্ছন্ন আছে, যাহার অধিকারী হইলে, জাতি বা ব্যবসায় নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে অ-ব্রাহ্মণ কহা সঙ্গত নহে। এই বুঝিয়াই তিনি তাহার অর্দ্ধ-প্রবুদ্ধ শক্তি জাগ্রত বা বিকশিত করিবার সহায়তা-কল্পে উপনয়ন-সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন এবং তাহার ধারণাশক্তির প্রাখর্য্য ও পরিমাণ নির্ণয় করিয়া প্রকারান্তরে তাহার দিব্যজ্ঞান লাভের কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

সত্যকাম যখন চরম সত্য উপলব্ধি করিবার প্রকৃত অধিকারী হইয়া উঠিল, তখন সে দেখিতে পাইল—তাহার চারিশত গো-পাল, সহস্রে পরিণত হইয়াছে!

(৪)

সত্যকাম আচার্য্য-আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

এমন সময়, দিক্ সমূহের দেবতা বায়ু, সেই গো-পালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গো আশ্রয় করিয়া সত্যকামকে বলিলেন—"হে সৌম্য, আমরা এখন সংখ্যায় সহস্র হইয়াছি, আমাদিগকে আচার্য্যের আশ্রমে লইয়া চল। আমি তোমায় ব্রহ্মের অংশ চতুষ্টয়ের মধ্যে একাংশ বর্ণন করিব।"

এইকথা শ্রবণ করিয়া জাবাল অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া বলিল—"ভগবান্, কৃপাপূর্ব্বক বর্ণন করুন—আমি চরিতার্থ হই।" তখন ঋষভরূপী বায়ুদেবতা বলিলেন—

"এই পূর্ব্ব দিক্, এই পশ্চিম দিক্, এই দক্ষিণ দিক্, এই উত্তর দিক্—এই দিক্চতুষ্টয় ব্রহ্মের অবয়ব স্বরূপ। এই প্রকাশমান অবয়ব চতুষ্টয় হইতে ব্রহ্ম প্রকাশময় নামে অভিহিত হইয়াছেন। বিদ্বান ব্যক্তি, এই প্রকাশময় রূপের উপাসনা করেন; তিনি ইহকালে খ্যাতি অর্জ্জন করেন এবং পরকালে অমৃত-লোক প্রাপ্ত হন। অগ্নি, তোমায় ব্রহ্মের অপর একপাদ বর্ণন করিবেন।"

এই দুর্লভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া জাবাল, বায়ুদেবতার আশ্রয়ভূত ঋষভকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, তাহা ধ্যান ও ধারণাগত করিয়া লইল। তদনন্তর সত্যকাম, পরদিন গো-পাল সহ আচার্য্য আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিল। পথিমধ্যে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, সেই স্থানে গাভী সকলকে রক্ষা করিল এবং সমিধ্ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তৎ পশ্চাতে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করিল।

তখন অগ্নি-দেব বলিলেন—"হে সৌম্য, আমি তোমায় ব্রহ্মের অংশ চতুষ্টয় মধ্যে অপর একপাদের কথা বর্ণন করিব।" সত্যকাম করজোড়ে প্রার্থনা করিয়া

বলিল—"হে ভগবন্, কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মের অপর একপাদ বর্ণন করিয়া আমায় ধন্য করুন।" অগ্নিদেব বলিলেন—

"পৃথিবী ব্রহ্মের অবয়ব, অন্তরীক্ষ ব্রহ্মের অবয়ব, স্বর্গ ব্রহ্মের অবয়ব, সমুদ্র ব্রহ্মের অবয়ব। এই অবয়ব চতুষ্টয় হইতে ব্রহ্মের নাম অনন্তময় হইয়াছে। যে ব্যক্তি, ব্রহ্মের এই অনন্তময় চতুরবয়ব রূপের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তময় হন এবং পরলোকে অনন্তময়-লোকপ্রাপ্ত হন। হংস তোমায় ব্রহ্মের অপর এক পাদ বর্ণন করিবেন।"

এই বলিয়া অগ্নিদেব নিরস্ত হইলেন।

জাবাল পরদিন প্রাতে গাভী সকলকে পুনরায় আচার্য্য আশ্রমাভিমুখে লইয়া চলিল। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া আছে, এমন সময় হংসরূপী আদিত্য-দেব উড়িয়া আসিয়া বলিল—"হে সৌম্য, আমি তোমায় ব্রহ্মঅবয়বের অপরাংশের কথা বর্ণন করিব—

"অগ্নি ব্রহ্মের অবয়ব, সূর্য্য ব্রহ্মের অবয়ব, চন্দ্র ব্রহ্মের অবয়ব, বিদ্যুৎ ব্রহ্মের অবয়ব—এই অবয়ব চতুষ্টয় হেতু ব্রহ্ম জ্যোতিস্মৎ নামে অভিহিত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি এই জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া বিরাজ করেন এবং পরলোকে জ্যোতির্ম্ময়-লোক প্রাপ্ত হন। মদ্গু পক্ষী তোমায় ব্রহ্মের শেষপাদ বর্ণন করিবেন।" এই বলিয়া হংসরূপী আদিত্য-দেব নিরস্ত হইলেন।

জাবাল পুনরায় গাভীসকল পরিচারণা করিয়া আচার্য্য গৃহাভিমুখে আসিতে আসিতে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। সে পূর্ব্বের ন্যায় অগ্নিকে সম্মুখে রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট আছে, এমন সময় এক মদ্গু পক্ষী উড়িয়া আসিয়া সত্যকামকে বলিল—"আমি তোমায় ব্রহ্মের শেষাংশের কথা বর্ণন করিব।"

সত্যকাম বলিল—"হে ভগবন্, বর্ণন করুন—আমার জীবনধারণ সার্থক হউক—আপনাদের সদুপদেশ গৌরবমণ্ডিত হউক।"

তখন মদ্গুরূপী বরুণদেব বলিলেন—"হে সৌম্য, প্রাণ ব্রহ্মের অবয়ব, চক্ষু ব্রহ্মের অবয়ব, শ্রোত্র ব্রহ্মের অবয়ব, মন ব্রহ্মের অবয়ব—এই অবয়ব চতুষ্টয় হেতু ব্রহ্ম আয়তনবান বা আশ্রয়বান। যে ব্যক্তি ব্রহ্মের আশ্রয়বান রূপের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে আশ্রয়বান হন এবং পরলোকে আশ্রয়বানলোক প্রাপ্ত হন।"

এই বলিয়া বরুণ-দেবরূপী মদ্গু পক্ষী নিরস্ত হইলেন।

পরদিন, সহস্র গাভী লইয়া সত্যকাম, মহর্ষি গৌতমের চরণ বন্দনা করিল।

(৫)

প্রথম দর্শনে মহর্ষি গৌতম সত্যকামকে, ঊষার ক্ষীণ আভায় প্রকাশমান ধরণীর ন্যায়, আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকট-মূর্ত্তির ন্যায় অবলোকন করিয়াছিলেন। এখন প্রখর সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণীর ন্যায় অপূর্ব্ব প্রভায় সমুদ্দীপ্ত দেখিয়া তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না—জারজ দাসীপুত্র জাবাল, যথার্থই 'সত্যকাম' হইয়াছে —তাহার অন্তরে স্নিগ্ধ প্রখর বিমল রশ্মি প্রতিভাত হইয়া তাহাকে অপূর্ব্ব মহিমোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

মহর্ষি বলিলেন—"বৎস, আমি তোমায় এখন দর্শন করিয়া যথার্থই প্রীতিলাভ করিলাম—তুমি প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির ন্যায় শোভা পাইতেছ। তোমার নিশ্চিন্ত সহাস্য বদন, প্রসন্নেন্দ্রিয় ও বিশিষ্ট বাহ্যাকৃতি দেখিয়া আমার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে—তুমি যাবতীয় বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছ—তুমি চরম সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার অন্যবিধ কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন নাই।"

মহর্ষির চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া সত্যকাম বলিল—'ভগবন্, আপনার শুভাশীর্ব্বাদে আমি মনুষ্যেতর দৈবীশক্তি দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু দেব, আমি সে শিক্ষাকে তাদৃশ ফলদায়ক বিবেচনা করি না। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমায় শিক্ষাধিকার প্রদান করিয়াছেন, আপনার আদেশ প্রতিপালনের সুফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন এই অধমকে আপনার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত করিবেন না। আপনার শুভানুগ্রহে, এই কয়বৎসর ধরিয়া প্রকৃতির নিকট আমি যে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা আপনার অঙ্গন-স্পর্শে মহীয়ান্ হইয়া উঠুক —আপনার সদুপদেশ লাভে তাহা সংহত ও সংযত হইয়া গৌরবান্বিত হউক, শিষ্যের একনিষ্ঠ যত্ন ও চেষ্টার উপর, আচার্য্যের কীর্ত্তি-বৈজয়ন্তী চির প্রতিষ্ঠিত হউক।"

মহর্ষি গৌতম এইবার জারজ দাসীপুত্রকে আলিঙ্গন দান করিলেন। তাঁহার আনন্দাশ্রুধারায় জারজ দাসীপুত্রের গোত্র-কলঙ্ক স্খলিত ও বিলুপ্ত হইয়া গেল!

মহামনা মহর্ষি ক্রমে সত্যকামকে ষোড়শকলা ব্রহ্মবিদ্যা সমগ্র দান করিলেন। তদনন্তর তিনি জাবালকে আচার্য্য পদে ব্রতী করিয়া জগতে সত্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা ও গুরুশিষ্যের নিত্য মধুর সম্বন্ধের গৌরবস্তম্ভ চিরপ্রোথিত করিয়া গেলেন।*

শ্রীশিবরতন মিত্র।

* ছান্দোগ্য উপনিষৎ—৪র্থ খঃ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ খণ্ড।

উৎসবে

হে উৎসব হে আনন্দ, তোমার অতীত ইতিহাস
কোন্ কল্পলোক হ'তে বহি' আনে কিসের আভাস ?
কোন্ পূর্ব্বে কোন অমরায়
কবে কোন্ পূর্ণিমানিশায়
প্রথম বাসর তব যাপিয়াছ বাসব-সভায় ;
অশ্রুহীন অমর নয়ন
অনিমেষ চাহি' অনুক্ষণ
তোমারে বরিয়া নিল ত্রিলোকের কামনার ধন ;
নন্দন বিলাল ফুলবাস
বসন্তের বহিল নিশ্বাস
তারি সাথে তাল রেখে মন্দাকিনী তুলিল উচ্ছ্বাস ;
মধুমাস মধুবাস চারিপাশে ফুটে মধুহাস—
এই তব জন্ম-ইতিহাস !

তারপরে ফিরে' কোন্ বৈদিকের শান্ত তপোবনে,
দেবকল্প ঋষিদের যজ্ঞসমাগম শুভক্ষণে—
অরুণের প্রথম ইঙ্গিতে
সামচ্ছন্দে মিলিত সঙ্গীতে
স্রোতস্বতী সরস্বতী-তীরতলে ছিলে তরঙ্গিতে !
হোমধূপে হবিগন্ধভারে
স্বর্গগামী অর্ঘ্যউপচারে
স্বাহা স্বধা মন্ত্রভরা রিষ্টিহরা ইষ্টমন্ত্রাগারে,
শান্ত মুখে শুচিশুভ্র হাসি—
স্বর্ণপাত্রে কুন্দফুলরাশি
তেজস্বী তাপসকণ্ঠে স্বস্তিবাণী উঠিল উচ্ছ্বাসি' ;
মহোৎসবে মুখরিত স্বল্পভাষী তপোবনবাসী—
স্বভাবতঃ আনন্দে উদাসী।

হায়রে কোথায় স্বর্গ কোথা বা সে পুণ্যতপোবন,
কোথায় এ চির আর্ত্ত মর্ত্ত্যলোকে উৎসবের ব্যর্থ আয়োজন ;
ইন্দ্রের নন্দনে যাহা রাজে
সে কি সাজে পথপঙ্কমাঝে
চিরবিধবার বীণে সুখের সাহানা সে কি বাজে !
রোগ শোক যুদ্ধ আর জরা
শ্মশানের হরিধ্বনিভরা
লক্ষশত বেদনায় নিয়ত কাতরা বসুন্ধরা ;
চক্ষে যেথা অশ্রু জেগে রহে
হাহাকার নিত্য চিত্ত দহে
হাসি কি তাহার কাছে নিদারুণ পরিহাস নহে ?
উৎসব সে কোথা পাবে—সাহারায় সুরধুনী বহে ?
কার সাধ্য এত মিথ্যা কহে !

এই যে কহিল কথা, এই যে ডাকিল প্রিয়নামে,
সে সুর মিলাল কোথা স্বরহীন কোন তিনগ্রামে !
কিসের আশ্বাস নিয়া তবে
বীণা বেঁধে আনিব উৎসবে,
'নাই' ও 'হারাই' নিয়ে হেথাকার অভিনয় যবে !
নিরালায় নিভৃত সন্ধ্যায়
সাজাইছ যে প্রাণসখায়
জান কি তাহারি ডাক পড়িয়াছে সুদূরে কোথায় ?
বিরহের যে ভয়ের লাগি
কত নিশি যাপিয়াছ জাগি'
শতবার দিব্য দিয়া এক-ই কথা লইয়াছ মাগি',
ব্যথা বুঝিবার আগে জন্মশোধ সে গেছে তেয়াগি'।
আনন্দ কোথায় অনুরাগি ?

কোন্ উপাদানে হায়, তোমার গঠন ওরে মন !
নাই শান্তি নাই তৃপ্তি দিবারাত্রি ঝরিছে নয়ন !

হাস যবে প্রাণপণ হাঁসি—
তারও যে গোপন বক্ষোবাসী
কাঙাল কঙ্কালসার রুদ্ধদ্বার হিয়া উপবাসী।
চক্ষে ভাসে আনন্দ তরল,
বক্ষ বেয়ে উঠে অশ্রুজল—
বিন্দু অমৃতের তলে পানপাত্রপূর্ণ হলাহল!
এই নিয়ে জীবনের খেলা,
এই নিয়ে মিলনের মেলা—
এই নিয়ে কুয়াসায় মেঘচ্ছায় বেড়ে যায় বেলা;
কে কোথায় ডুবে যায়, শেষে হায় তুমি সে একেলা—
পারাবারে ভেসে চলে ভেলা।

ঐ যে প্রলয় ঝঞ্ঝা উঠিয়াছে পশ্চিমের কোণে—
কি করিতে পার তুমি—সে কি কারো অনুযোগ শোনে!
বৈষ্ণব সে তুলসীতলায়
নিজ মনে জীবে দয়া চায়,
বিশ্ব জুড়ি' তান্ত্রিক যে বসিয়াছে শব-সাধনায়!
কোথা মন্ত্র কোথা জপমালা,
কোথায় বা বংশীধর কালা,
চেয়ে দেখ লোলজিহ্বা খড়্গহস্তা ভৈরবী করালী!
কমলা সে লুকাল কোথায়,
জীবতরা তারা নাহি হায়!
রক্তাম্বরা ছিন্নমস্তা আপনার বক্ষরক্ত খায়!
ভয়ে বিশ্ব মুদে আঁখি, শান্তি লাজে শিহরি লুকায়—
তবু হায় আনন্দ যে চায়!

সত্যই যে আনন্দই চাই, গান চাই, চাই আলো—
মরণের কোলে বসে দণ্ড দুই তবু বাসি ভালো।
বিরহের চিন্তাচিতা জাগে
তবু হায় অন্ধ অনুরাগে
বক্ষমাঝে চেপে ধরি প্রাণপণে যারে ভাললাগে।

তাই—এই আনন্দের মেলা,
তাই—এই উৎসবের খেলা,
তাই—এই মিলনের অভিনয়, যতক্ষণ নাহি পড়ে বেলা।
ডাক 'প্রিয়' ডাক 'প্রিয়তম',
ডাক 'বন্ধু' ডাক 'সখা মম'—
বল 'ক্ষমা করিলাম', বল 'ক্ষম অপরাধ মম,
মিলনেরে বরি' লও জীবনের চিরসঙ্গী সম।
উৎসব তোমায় নমোনমঃ।

কিন্তু হায়, কতক্ষণ,—পথ যে ফুরায়, দিন যায়—
গোধূলির স্বপ্নালোক মিলায় যে নেত্রতারকায়!
ওরে পান্থ, ওরে রে পথিক,
অন্ধকারে ঢেকে আসে দিক—
তন্দ্রা আসিবার আগে চক্ষু তোর বাসা চিনে নিক্।
অনন্তের প্রশান্ত পন্থায়
কি পাথেয় সাথে নিলি ভাই,
কোন্ অনুনয় নিয়ে কার কাছে দাঁড়াবি সন্ধ্যায়?
মৃত্যুমাঝে অমৃত যাঁহার,
দুই নেত্র আলো অন্ধকার—
দুঃখসুখ হর্ষামর্ষ সমান প্রসাদ পুরস্কার;
রূপ ও অরূপ যিনি, যিনি পার, যিনি পারাবার!
তাঁরে মন কর নমস্কার।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

মন্‌—বুলবুল্‌।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার পিতৃব্য নবাব ইম্‌দাদ্‌ আলিখাঁ বাহাদুর সে বৎসর গভর্ণমেণ্ট হইতে সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় দরবার, মহামান্য বড়লাট সাহেব বাহাদুর উপাধিধারিগণকে সনদ বিতরণ করিবেন। পিতৃব্য মহাশয় আমায় বলিলেন—"চল আহম্মদ্‌, কলিকাতা বেড়াইয়া আসি।"

কয়েকমাস পূর্ব্বে আমার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। প্রথমটা শোকে একান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলাম ;—এখনও আমার চিত্তবিকার উপশমিত হয় নাই ;—দেশভ্রমণে যদি আমার মন ভাল হয়, সম্ভবতঃ এই আশাতেই পিতৃব্য মহাশয় আমায় সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমি সম্মত হইলাম।

আমাদের সংসারে একজন বৃদ্ধা ধাত্রী আছে ; আমার পিতাকে, পিতৃব্যকে এবং আমাকেও সে মানুষ করিয়াছিল। সে বলিল—"বাপজান্‌! এই দিল্লী সহরেই জীবন কাটিল, কলিকাতা কেমন তাহা কখনও চক্ষে দেখিলাম না। শুনিতে পাই ইংরাজেরা নাকি কলিকাতাকে এক আজব সহর তৈয়ারী করিয়াছে। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, আরও অনেক অনেক আশ্চর্য্য জিনিষ সেখানে আছে শুনিয়াছি। বুড়া হইয়াছি, কবে আছি কবে নাই—একবার চক্ষু সার্থক করাইয়া দাও বাবা! তোমার কলিকাতার খালীসাহেবাকেও অনেক দিন দেখি নাই ; তাঁহার সঙ্গেও একবার শেষ দেখাটা করিয়া আসি।"—পিতৃব্য মহাশয়কে বলিয়া তাঁহার অনুমতি লইলাম,—ধাত্রীও আমাদের সঙ্গে চলিল।

আমার খালাসাহেব (পিসেমশায়) কলিকাতার একজন অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ছোটলাট বাহাদুরের সদস্য-সভার সভ্য। চৌরঙ্গি অঞ্চলে আমাদের জন্য একখানি ভাল বাড়ী এবং দুইখানি হাওয়াগাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিতে তাঁহাকে ভার দেওয়া হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

মাসখানেকের মধ্যেই দরবারের অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গেল। পিতৃব্য মহাশয় বলিলেন—"চল আহমদ্‌, এবার দেশে ফেরা যাউক্‌।"

কলিকাতাটা আমার বড়ই ভাল লাগিয়া গিয়াছিল। আমার স্বাস্থ্যের ও

মনের এ সময় বেশ উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। আমি বলিলাম "হজরৎ যদি অনুমতি করেন—আমি আরও মাসখানেক এখানে থাকি।"—সম্মতি দিয়া পিতৃব্য মহাশয় দেশে ফিরিলেন। ধাত্রী আমার কাছেই রহিল।

কয়েক দিন পরে রাত্রে আহারের পর শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে ড্রয়িংরুমে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে একখানি পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছিলাম—এমন সময়ে দরজাটি আস্তে আস্তে কে খুলিল! চাহিয়া দেখি—ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা, কর্দ্দমাক্ত একটি চৌদ্দ পনেরো বৎসরের বালিকা দরজায় দাঁড়াইয়া। ইহার বেশ পশ্চিমদেশীয়া মুসলমান রমণীর মত। বালিকাটি অসামান্যা সুন্দরী—তাহার রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।—দেহখানি শীর্ণ—রূক্ষ চুলগুলি স্কন্ধের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার বড় বড় কাল চোখদুটি আমার পানে কাতর ভাবে চাহিয়া আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে তুমি?"

মেয়েটি পরিষ্কার উর্দ্দুতে তাড়াতাড়ি বলিল—"মাফ্ করুন—ঘরের মধ্যে আলো দেখিয়া প্রবেশ করিয়াছি। নবাব ইম্‌দাদ্ আলি খাঁ সাহেবের সঙ্গে একটিবার দেখা করিতে চাই—এটা কি তাঁহারই বাড়ী?"—তাহার কণ্ঠস্বরটি মৃদু ও অত্যন্ত মিষ্ট।

আমি বলিলাম—"হাঁ—তাঁহার কাছে তুমি কি চাও?"

"শুনিয়াছি তিনি বড় দয়ালু—সকলেই তাহা বলে।—আমি—আমি কোথাও যাইবার আর স্থান না পাইয়া—আমি এখানে আসিয়াছি।"

বেশ বুঝা গেল, বালিকা বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়াই আসিয়াছে। বলিলাম—"ঘরের মধ্যে এস—বস—তোমার কি হইয়াছে, বল।"

মেয়েটি আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি যদি কিছু মনে না করেন,—তাহা হইলে আমি নবাব সাহেবের নিকটেই বলিব।"

"তিনি এখানে নাই—সপ্তাহখানেক হইল তিনি দিল্লী গিয়াছেন। আমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র—তোমার কি বলিবার আছে বল?"

আশ্চর্য্য হইয়া মেয়েটি বলিল—"এখানে নাই?" বলিয়াই মুখখানি দুই হাতে ঢাকিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম—"তিনি এখানে না থাকাতে তুমি কি অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছ?—আমার দ্বারা যদি তোমার কোনও উপকার হয় ত বল?"

"আপনার দ্বারা হইবার নহে, সাহেব!"

"কেন ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া, মুখ হইতে হাত নামাইয়া, সে বলিল—"আমি মনে করিয়াছিলাম নবাব সাহেব আছেন—তাই আসিতে সাহস করিয়াছিলাম। আমি এখন যাই। আমাকে মাফ করিবেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"পিতৃব্য মহাশয়ের নিকট তোমার যাহা বলিবার ছিল—তাহা আমাকে সব না বলিলে তুমি যাইতে পাইবে না। ছেলেমানুষ তুমি—এই রাত্রে—"

মেয়েটি তিরস্কারচ্ছলে বলিল—"আমার বয়স পঞ্চদশ বৎসর।"

"আচ্ছা যাক্—তোমার নাম কি বল।"

"আগে আমার কাহিনী অনুগ্রহপূর্ব্বক শুনিবেন কি ?—আপনি যদি আমাকে সাহায্য করিতে না পারেন—বোধ হয় আপনি পারিবেন না—তাহা হইলে আমার নাম জানিয়া আপনার ফল কি ?"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা, তোমার কাহিনীই আগে বল, শুনি।"

মেয়েটি বসিল। কোলের উপর হাত দুটি রাখিয়া আনত নেত্রে বলিতে লাগিল—"আমার পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন—দিল্লীর চাঁদনি চকে তাঁহার দোকান ছিল।—মা আমার শৈশবেই মারা যান। আমি যখন পাঁচ বৎসরের, সে আজ দশ বৎসরের কথা—বাবাও মারা গেলেন। আমার এক চাচা আছেন, তিনিই আমার ভার লইলেন। আমার চাচা ও চাচানী আমাকে বেশ যত্নই করিতেন। তাহার পর আমার চাচানীর মৃত্যু হইল। আমার চাচাও সরাব ধরিলেন সব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সামান্য একটি চাকরী করিতেন—চাকরীটি তিনি হারাইলেন। তাহার পর অন্নাভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। চারি বছর তিনি এইরূপ পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি ও আমি দুজনেই ভিক্ষা করি—আমি যে ভিখারিণী তাহা বোধ হয় আমার চেহারা ও ছিন্নবস্ত্র দেখিয়াই আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহার উপর তিনি আমার প্রতি বড়ই রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকেন।"

মেয়েটি আমার দিকে চাহিল—দেখিলাম, তাহার চক্ষুযুগল অশ্রুপূর্ণ।

বাম হস্তে আঙিয়ার আস্তিন একটু তুলিয়া সে আমাকে দেখাইল। দেখিলাম, তাহার সেই অঙ্গে কাল একটা দাগ পড়িয়াছে—আঘাতের চিহ্ন। মেয়েটি বলিয়া যাইতে লাগিল—"তাঁহাকে দেখিলে এখন আমার ভয় করে। এ

জীবন আমার অসহ্য। আমাকে যদি কেহ কায দেয়, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই—আমি এখন দাসীপণা করিতেও প্রস্তুত আছি।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তুমি কি পলাইয়া আসিয়াছ?”

মেয়েটি বলিল—“হাঁ—চাচা মাতাল হইয়া পড়িয়াছেন। এই দিক দিয়া আমরা যাইতেছিলাম; পথে একজন খানসামা যাইতেছিল—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এ বাড়ীতে দিল্লীর বিখ্যাত ধনী নবাব ইমদাদ্ আলি সাহেব বাস করিতেছেন। দিল্লীতেও বাল্যকালে আমি তাঁহার নাম ও যশ শুনিয়াছিলাম। এখান হইতে কিয়দ্দূরে একটা গলির ভিতর যে কয়লার গুদাম আছে, সেই গুদামে শুইয়া চাচা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমি সুযোগ বুঝিয়া সরিয়া পড়িলাম। প্রথমে কিয়ৎক্ষণ রাস্তার ওপারে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে এই বাটীর আলোকের পানে চাহিয়া নবাব সাহেবের কথা মনে করিতেছিলাম—এই এত বড় বাড়ীটাতে বৃদ্ধ মানুষ একলা বাস করেন —যদি আমি যাই, তাহা হইলে হয়ত আমার প্রতি তিনি একটু দয়া প্রকাশ করিবেন—আমার একটা উপায় করিয়া দিবেন। তা তিনি ত এখানে নাই।”

মেয়েটির করুণ, কাতর কণ্ঠস্বরে, ততোধিক তাহার সরল চোখের আর্ত্তদৃষ্টিতে আমি বড় ব্যথিত হইলাম। বলিলাম—“তোমার চাচা তোমার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করেন?”

প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত বালিকা কথা কহিতে পারিল না। ছিন্ন মলিন ওড়নার প্রান্ত দিয়া চক্ষু মুছিয়া শেষে বলিল—“হাঁ, তিনি আমাকে এখনও ছেলেমানুষটি মনে করেন। কিন্তু আমি ত তাহা নই। আমরা কি কষ্টে যে জীবন কাটাইতেছি, তাহা আমরাই জানি।”

আমি বলিলাম—“আমি তোমার চাচাকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি। কোনখানটায় সে পড়িয়া আছে বলত।”

মেয়েটি শঙ্কিত হইয়া বলিল—“আবার চাচাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন? তাঁহাকে সব বলিবেন?—সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে তিনি কি আর আমায় রাখিবেন? কোর্ব্বানী করিয়া ফেলিবেন। আপনি বোধ হয় মনে করিয়াছেন আমি বাড়াইয়া বলিতেছি?—তা ত ঠিকই—আপনি আমায় বিশ্বাস করিবেন কেন?”—বলিয়া মেয়েটি চোখে অঞ্চল দিল।

আমি দেখিলাম মহা বিপদ। বলিলাম—

“তবে আমি কি করিব তাহাই আমায় বল না কেন?”

সে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"আপনাকে কিছু করিতে হইবে না—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম আপনি কিছু করিতে পারিবেন না।"—বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বৃদ্ধ নবাব সাহেব হইলে আমাকে তুমি তোমার জন্য কি করিতে বলিতে ?"

"সবই।"

"আমি তাহা কি করিতে পারি না।"

"সবই।"

ভাবিলাম, আশ্চর্য্য লোক ত! কখন কি বলে কিছুরই স্থিরতা নাই। আসলে উহার মাথার ঠিক নাই। একটু চিন্তা করিয়া শেষে বলিলাম—"তোমার মনে কি হইতেছে আমি বুঝিতে পারিতেছি। আমি যদি তোমাকে সাহায্য করি—তাহা হইলে লোকে জানিতে পারিলে তুমি লাঞ্ছিত হইবে। তা—কাহারও জানিবার প্রয়োজন কি ?"

মেয়েটি বলিল—"আমি যদি এখানে থাকি—সে কথা কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই ?"

আশ্চর্য্য হইয়া আমি বলিলাম—"তুমি যদি এখানে থাক !"—বলিয়া আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া তাহার মনের ভাব পাঠ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

মেয়েটি বলিল—"এখানে না থাকিলে আপনি আমাকে কি করিয়া তাঁহার হাত হইতে রক্ষা করিবেন ? আপনারা বড়লোক, আপনাদের শক্তি বল আছে—তিনি আপনাদের অনিষ্ট করিতে সাহস করিবেন না। কিন্তু অন্য লোকের কাছে আমায় যদি পাঠা —" বলিয়া মেয়েটি থামিল।

আমি এতক্ষণ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে তাহার মুখের পানে চাহিয়াছিলাম। সে চক্ষুযুগলে সরলতা ও পবিত্রতা ছাড়া আর কিছু দেখিলাম না। আমি যে অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম, সেজন্য মনে মনে লজ্জানুভব করিলাম।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বালিকা আবার বলিল—"আমি তাহা হইলে এত লোক থাকিতে এখানে আসিলাম কেন ? যে কোনও লোক ত আমাকে সাহায্য করিতে পারিত। কিন্তু যদি চাচা তাহাদের কাছে গিয়া আমাকে দাবী করিতেন—তাহা হইলে চাচার বিরুদ্ধে কেহ কি কথা কহিতে পারিত ?—আপনারা শক্তিশালী—তাই আমি আপনাদের কাছে আসিয়াছি।"

কি উত্তর দেয় দেখা যাউক ভাবিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার কি মনে হয় আমি তোমাকে এ বাড়ীতে থাকিতে দিব ?"

"আমি জানি আপনি দিতে পারিবেন না। আমি ত আগেই "

ক্ষমা-প্রার্থীর মত আমি বলিলাম—"হাঁ—আগেই বলিয়াছিলে বটে। তুমি গোড়া থেকেই এই কথা বলিতেছ। বৃদ্ধ নবাব সাহেবের সঙ্গে আমার এই খানেই প্রভেদ, না ?"—বলিয়া মৃদু হাস্য করিলাম।

মেয়েটির চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমাকে কিছু টাকা দিব ?"

বিরক্তির সহিত সে তীব্রস্বরে বলিল—"কেন ? চাচার সরাবের খরচ যোগাইবার জন্য ?"

বুঝিলাম. এ বালিকার অবস্থা নিতান্তই সঙ্কটাপন্ন। ইহার কি উপায় করা যায় ? যদি ইহাকে এ অবস্থায় বিদায় করি, তাহা হইলে—ইহার ভবিষ্যৎ দারুণ অন্ধকারময়। আহা, এমন ফুলটি পথকর্দ্দমে লুটাইয়া কলঙ্কিত ও পদদলিত হইবে ? ভাবিতে আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে বলিলাম—"আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন—তাঁহাদের কাহারও গৃহে—"

বালিকাটি ঘাড় নাড়িতে লাগিল। এমন সময়ে অর্দ্ধ-মনুষ্য—অর্দ্ধ পশুবৎ আকারের এক ব্যক্তি হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া স্খলিতপদে আসিয়া প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আগন্তুকের আকার দীর্ঘ, মস্তকের রুক্ষ কেশগুলা সজারুর কাঁটার মত দণ্ডায়মান, দাড়িতে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে,—অঙ্গে স্থানে স্থানে তালি দেওয়া এক ওভারকোট, হস্তে যষ্টি। টলিতে টলিতে আসিয়া বালিকাটীর হাত ধরিয়া সে টানিতে লাগিল। বালিকা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

লোকটা, তাহার রুক্ষ মুখখানা, মেয়েটির মুখের কাছে লইয়া গিয়া বলিল—"কি হারামজাদী ? পলায়ন করিয়াছিলি ? আচ্ছা—আচ্ছা—এর শোধ লইব।" বলিয়া আমার দিকে ফিরিয়া, আমায় সেলাম করিয়া বলিল—"মাফ্ করিবেন হুজুর ! এই মেয়েটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে একটা অলীক উপন্যাস সুরু করিয়া দিয়াছিল—আমার কোনও সন্দেহ নাই। ওর রোগই ঐ। মনে করিবেন না যে, লোককে ঠকান এই উহার প্রথম। ভারী মিথ্যাবাদী—ভারী মিথ্যাবাদী !—আমার নামে অনেক বদনাম আপনার কাছে করিয়াছে বোধ

তয় ?”—তাহার পর বালিকাটির দিকে তাকাইয়া কঠোর স্বরে বলিল—“যে চাচা তোকে বাল্যকাল হইতে মানুষ করিয়াছে—তাহার নিকট হইতে পলাইতেছিস্ ? আমি না থাকিলে তোর দুর্দ্দশা কি হইত বল্ দেখি ? কোথায় তোর দাঁড়াইবার স্থান মিলিত ?”

মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—“যেখানে এতদিন রাখিয়াছ সেখানেই থাকিতাম—পথে পথে—লোকের দুয়ারে দুয়ারে।”

লোকটা মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—“গুরুজনের মুখের ওপর খুব কথা কহিতে শিখিয়াছিস্! যা, এই ভদ্রলোকটির কাছে মাফ্ চা।”—আমার দিকে ফিরিয়া সে বলিল—“হুজুর, ও ছেলেমানুষ, ওকে মাফ্ করুন। আপনাকে নিশ্চয়ই বিরক্ত করিয়াছে। আমার নিজের কোনও দোষের জন্য আমি এ অবস্থায় পড়ি নাই—আর আমার এই অবস্থা বলিয়াই ও পলাইতে চায়। কিন্তু আমার মৃত্যুর এক মিনিট পূর্ব্বে পর্য্যন্ত উহাকে কোথাও নড়িতে দিতেছি না। শিশুকাল হইতে উহাকে বড় করিয়া তুলিয়াছি—নিজে না খাইয়া উহাকে খাওয়াইয়াছি—এই তার পুরস্কার ? উঃ—দুনিয়া কি বেইমান্!”

লোকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। তাহার বড় বড় মোটা মোটা অঙ্গুলিগুলি বালিকাটির বাহু দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিতেছিল। মেয়েটি আমার দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—“মহাশয়, আমাকে মাফ্ করুন।”

লোকটা মেয়েটিকে জোর করিয়া নিজের সম্মুখে টানিয়া আনিল—সে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল ; জড়িত স্বরে বলিল “হাঁ, ভাল করিয়া মাফ্ চা।”

মেয়েটি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—“মহাশয়, তবে আমি এখন যাই। আপনাকে বিরক্ত করিয়াছি, কিছু মনে করিবেন না। চাচা, চল।”

আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। কিছু না ভাবিয়াই বলিয়া ফেলিলাম—“তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী আমার এখানে থাকিবে।”

লোকটা কঠোর স্বরে বলিল—“কি ?—কি বলিতেছেন ?”

আমি বলিলাম—“যুবতী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইবার মত অবস্থা তোমার এখন নয়।”

“কি ?”

আমি পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলাম—“তুমি এখন মাতাল।”

লোকটা গর্জ্জন করিয়া বলিল—“তুমি কে ?”

আমি উত্তর করিলাম—“আমি দিল্লীর সৈয়দ আহমদ্ আলি খাঁ—নবাব

ইমদাদ্ আলি খাঁ বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র—আমার সঙ্গে চালাকী চলিবে না।"

"আ—আপনি—নবাব সাহেবের ভ্রা—ভ্রাতুষ্পুত্র ?"

"হাঁ,—শোন। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী আজ রাত্রে এখানে থাকিবে—আমার বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট তাহাকে রাখিয়া দিব। কাল সকালে তাহাকে কোনও একটা কায দিব।"

"আমাকে এ কথা বলিতেছেন ?"

"হাঁ, তোমাকেই বলিতেছি—আর যদি ভাল চাও, তাহা হইলে আমার কথা শুন। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী নিজে ইচ্ছা করিয়া তোমার নিকট না গেলে, তাহাকে পাঠাইব না। অদ্য হইতে উহাকে নিজের ভগ্নীর মত যত্ন করিব।"

লোকটা বালিকার হাত ছাড়িয়া দিয়া, একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বলিল—"উহাকে একটা কায দিবেন বলিতেছেন ? কি কায ?—চাকরাণীর কায ত ?—আপনি উহাকে ভগ্নীর মত দেখিবেন বলিতেছেন—আপনার ভগ্নী থাকিলে তিনি কি চাকরাণীর কায করিতেন ? মহাশয়, আমার সঙ্গে মিথ্যা চালাকী করিবেন না। মনে করিয়াছেন আমার অবস্থা মন্দ বলিয়া আমার সহিত যাহা ইচ্ছা সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। ভুল—ঐটি আপনার ভুল।"—সঙ্গে সঙ্গে তাহার বদ্ধমুষ্টি সশব্দে টেবিলের উপর আসিয়া পড়িল।

আমি হাসিয়া বলিলাম "আমার সঙ্গেও চালাকী খাটিবে না। আবার বলিতেছি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী আজ এ বাড়ীতে থাকিবে।"

"যদি বলি, আমি উহাকে ছাড়িব না ?"

"যাহা খুসী বলিতে পার। তোমার নাম কি ?"

"তসদ্দুক হোসেন—আমার নাম তসদ্দুক হোসেন। দিল্লীতে আমার গরীবখানা। আমি সোজা লোক নহি। দেখি আমার ভাইঝিকে আমার নিকট হইতে কে লয় ? দেখি ত একবার !"

আমি বলিলাম—"দেখ তোমাকে আবার বলিতেছি, যুবতী স্ত্রীলোক তোমার সহিত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার উপযুক্ত নহে।"

তসদ্দুক চক্ষু বুঝিয়া সেই কর্দ্দমাক্ত দাড়ীর ভিতর হইতে দুই পাটী দন্ত বাহির করিয়া, হি হি করিয়া হাসিল। শেষে বলিল—"এ কথা আপনি কি করিয়া জানিলেন ?"

"কেন, স্বচক্ষে দেখিতেছি তুমি অপ্রকৃতিস্থ, তোমার মুখ হইতে সরাবের দুর্গন্ধ

বাহির হইতেছে। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী এখন আর বালিকা নাই—ও যুবতী হইয়াছে!"

লোকটা বলিল—"আপনার যেমন কথা!" কে বলিল আপনাকে যে ও যুবতী হইয়াছে? কবে আবার যুবতী হইল?"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—"ও বয়সের মেয়েকে লোকে যুবতী বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকে।"

লোকটা তখন বালিকার দিকে ফিরিয়া বলিল—"তোর বয়স কত?"

"পনের।"

লোকটা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"প—নে—র?"

আমি বলিলাম—"তবেই তুমি বুঝিতে পারিতেছ ও সেয়ানী হইয়াছে—সঙ্গে লইয়া পথে পথে বেড়াইবার অবস্থা উহার আর নাই! এখন তবে আমার ধাত্রীকে ডাকি, সে আসিয়া ইহাকে অন্দরে লইয়া যাউক—তাহার পর আমরা দুইজনে বসিয়া এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিব।"

তসদ্দুক আমার ধূমায়িত আলবোলার প্রতি লুব্ধনেত্রে চাহিয়া একটু হাস্য করিল। আমি ধাত্রীকে ডাকিলাম—সে আসিয়া মেয়েটিকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। যাইবার সময় মেয়েটি তাহার চাচার দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

লোকটা তখন পকেট হইতে একখানি ছেঁড়া রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। বলিল—"দেখুন, মেয়েটাকে ছাড়িয়া থাকিতে আমার বড় কষ্ট হইবে। আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য—অদৃষ্ট আমার নিতান্ত মন্দ। মেয়েটাকে আমি আপনার সন্তানের মত ভাল বাসিতাম।"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম—"তোমার কথা বিশ্বাস করা শক্ত।"

লোকটা একমিনিটকাল কোনও কথা কহিল না, ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া চাহিয়া রহিল। শেষে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ইয়া আল্লা!"

আমি বলিলাম—"তুমি যে কথা বলিতেছ, তাহা যদি সত্য হয়—বাস্তবিকই উহাকে যদি তুমি নিজ সন্তানের তুল্য ভাল বাস—তাহা হইলে বরং আল্লাকে ধন্যবাদ দাও যে, তোমার ঘৃণিত সংস্পর্শ হইতে ও মুক্তিলাভ করিল।"

তসদ্দুক বলিল—"উহার সঙ্গে আমাকে আর দেখা করিতে দিবেন না?"

"নিশ্চয় না, ও তোমাকে দেখিলে ভয় পায়।"

অন্তদিকে চাহিয়া তসদ্দুক কয়েকবার ঘাড়টি নড়িল। তাহার পর দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল! হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—

"আপনি কি আমার ভাইঝিকে জোর করিয়া আপনার কাছে রাখিবেন? 'মনে করিয়াছেন এটা মগের মুল্লুক? জানেন, আমি আদালতে নালিশ করিয়া আমার ভাইঝিকে আপনার কাছ হইতে উদ্ধার করিতে পারি?"

আমি বলিলাম—"বেশ ত! তাহাই করিয়া দেখ না! তুমি ত' একমুষ্টি অন্নের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াও; মোকর্দ্দমার খরচ চালাইবে কি প্রকারে? আর সাক্ষীই বা পাইবে কোথা? আমি লক্ষ টাকা খরচ করিব। তুমি আমার সহিত লড়িবে এমন হিম্মৎ তোমার আছে?"

তসদ্দুক কিয়ৎক্ষণ ভাবিল।—শেষে বলিল "সত্য। আমি কি করিয়া আপ—নার সহিত মোকর্দ্দমা লড়িব? কিন্তু দেখুন—আমার ভাইঝির সহিত আমাকে দেখা করিতে না দেওয়াটা আপনার অন্যায়।"

আমি বলিলাম—"কিছুই অন্যায় নহে।"

"হাজার হউক আমি তাহার চাচা ত' বটে! আমি কি উহাকে চাকরাণী হইতে দিতে পারি? আমার ভাইঝির সম্বন্ধে আমারও ত' কিছু বলিবার অধিকার আছে! ওর বাপ শরীফ আদমি ছিলেন।"

আমি কহিলাম—"সে কথা বরং বিশ্বাস করিতে পারি।"

তসদ্দুক কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল—"বেশ—আপনি যদি আমাকে তাহার পিতৃব্যের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে সে দায়িত্ব আপনাকেই লইতে হইবে। আপনার নিজের ভগ্নীর মত তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে।"

"তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ভদ্রলোকের কন্যার মতই প্রতিপালন করিব।"

"নিজের ভগ্নার মত?"

"হাঁ, নিজের ভগ্নীরই মত। উহাকে এখন লেখাপড়া শিখাইব,—যথাসময়ে কোন পরিবারের সচ্চরিত্র ও বিদ্বান যুবকের সহিত উহার বিবাহ দিব।"

তসদ্দুক খুসী হইয়া হাতদুটি ঘসিতে ঘসিতে বলিল,—"বেশ, কিন্তু একটা কথা আমার ভাল লাগিতেছে না। আমার ভাইঝি—যে এত বড়লোকের ভগ্নী-স্থানীয়া, তাহার চাচা কিনা রাস্তায় রাস্তায় মাতলামি করিয়া বেড়ায়, যাহা পায় তাহাই খাইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়—এটা কেমন দেখায়?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার মৎলবটা যে না বুঝিয়াছিলাম এমন নয়।"

লোকটা দুই হাত নাড়িয়া বলিল—"টাকা—টাকা—কিছু টাকা চাই। আপনার ও আপনার ভগ্নীর সুনাম বজায় রাখিবার জন্য কিছু টাকা চাই। বেশী নয়, এই পাঁচশত টাকা পাইলেই আমি ভাইঝির উপর নিজের দাবী দাওয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইব?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"টাকাটা ফুরাইয়া গেলে আবার আসিবে ত?"

"আল্লার কসম্, না।—আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি—আমি আর আসিব না।"

"তোমার কথায় বিশ্বাস কি?"

তসদ্দুক ধীরস্বরে বলিল—"কথা ছাড়া আমার দিবার আর কি আছে? আমি বলিতেছি—পবিত্র কোরাণের দিব্য করিয়া বলিতেছি—পাঁচশত টাকা পাইলে ওলিয়তির দাবী করিয়া বা অন্য কোনও দাবীতে কোনও প্রকার নালিশ করিব না।"

আমি ভাবিলাম—ইহা একটা আশঙ্কার কথা বটে। লোকটা যেরূপ প্রকৃতির—টাকা না পাইলে ওরূপ একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া দিতে পারে। বালিকার যতদিন অষ্টাদশবর্ষ বয়ক্রম না হইতেছে, ততদিন আইন অনুসারে ওই তাহার ওলি বা অভিভাবক। ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"মেয়েটির নাম কি?"

"ওর নাম বরকৎ-উন্নিশা—কিন্তু সে নাম ব্যবহার নাই। উহাকে মন্-বুলবুল্ বলিয়াই সবাই জানে।"

"ও কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে?"

"দিল্লীতে থাকিতে দুই তিনখানা উর্দ্দু বহি পড়িয়াছিল। করিমা-ববক্সাও ধরিয়াছিল। চিঠিপত্র লিখিতে পারে।"

"তুমি ছাড়া উহার আর কে আছে?"

"আর কেহই নাই।"

একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম—"আচ্ছা—আমি ৫০০৲ দিব। তুমি এই মর্ম্মে একটা একরারনামা লিখিয়া দাও যে ৫০০৲ পাইয়া আজ হইতে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর ওলিয়তির দাবী ত্যাগ করিলে। লিখিয়া দিবে কি?"

তসদ্দুক সম্মত হইল।

বলিলাম—"আচ্ছা, তবে এইখানে বস। আমি টাকা আনিতেছি।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। হস্তে হস্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল—"হুজুর—যদি মেহেরবাণি হয়—"বলিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে আমার আলবোলার পানে তাকাইয়া একটু হাসিল।

তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলাম—"তামাক খাইবে?—তা বেশ ত—খাওনা।"—বলিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

লোহার সিন্দুক খুলিয়া পাঁচখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া আনিলাম। বেহারাকে বলিলাম কাগজ ও কলমদান আনিতে। ড্রয়িংরুমে ফিরিয়া দেখি লোকটা আরামে চক্ষু বুজিয়া ধূমপান করিতেছে। আমাকে দেখিয়া বলিল—"হুজুর, এ অতি উৎকৃষ্ট তামাকু—একবারে লা—জাওয়াব। বহুকাল এমন তামাক অদৃষ্টে জুটে নাই।"

আমি বলিলাম—"ইহা লক্ষ্ণৌর তামাক।"

ভৃত্য কাগজ প্রভৃতি লইয়া আসিল। আমার আদেশ অনুযায়ী একরারনামা লিখিয়া, নোট পাঁচখানি পরীক্ষা করিয়া তসদ্দুক বলিল—"হুজুর, এ সব নম্বর-ওয়ারী নোট—যদি আমায় চোর বলিয়া ধরে?"

আমি বলিলাম—"প্রত্যেক নোটের পশ্চাতে আমার নাম দস্তখত করা আছে, দেখিয়া লও।"

তসদ্দুক বলিল—"আজ্ঞে হাঁ—তা ত আছে। তবু কি জানি, ভাঙ্গাইবার সময়ে যদি আমায় সন্দেহ করে? আপনি বরং দয়া করিয়া একটা রসীদের মত লিখিয়া দিন।"

দেখিলাম লোকটা মাতাল হইলেও, চালাক কম নহে। একটা কাগজে নোটের নম্বরগুলা সহ দুইছত্র লিখিয়া তাহাকে দিলাম। সেগুলা পকেটে পুরিয়া, অন্য পকেট হইতে তসদ্দুক একটা বোতল বাহির করিল। "গোস্তাফি মাফ্ করিবেন"—বলিয়া, ছিপি খুলিয়া খানিকটা মদ্য হড়্ হড়্ করিয়া মুখে ঢালিয়া দিল। বোতল বন্ধ করিয়া, পকেটে রাখিয়া, সেই ছেঁড়া রুমালখানি দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"যদি এজাজৎ হয় তবে এখন: উঠি। অনেক রাত হইল। বান্দার অপরাধ লইবেন না। সেলাম হুজুর!" বলিয়া, ওভার-কোটের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে স্খলিতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

আমি তখন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এক যুবতীকে আশ্রয়দান করিলাম—কথাটা কিরূপ হইল জানি না। যদিও ধাত্রী এখানে রহিয়াছে, তথাপি সে দাসীমাত্র—আমার আত্মীয় বা অভিভাবক নহে। আমারও এমন

কিছু বয়স হয় নাই—সবে ত্রিশ বৎসর। এ অবস্থায় অমন সুন্দরী যুবতী মেয়েটিকে ঘরে রাখিলে লোকাপবাদ অবশ্যম্ভাবী। কোথায় মেয়েটিকে রাখি? কাহার সঙ্গেই বা পরামর্শ করি? ভাবিতে ভাবিতে তখন আমার খালী সাহেবার (পিসীমাতার) কথা মনে পড়িল। কাগজ কলম লইয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলাম। অনুরোধ করিলাম, কল্য প্রাতে যেন একবার দয়া করিয়া এখানে তশ্রিফ লইয়া আসেন। হাওয়াগাড়ীর শোফারকে ডাকিয়া পত্রখানি তাহার জিম্মা করিয়া হুকুম দিলাম—কল্য প্রাতেই পত্রসহ যেন ইটালীতে কার লইয়া যায় এবং খালি সাহেবাকে লইয়া আসে।

শয়ন করিতে গিয়া ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মন-বুলবুলকে কিছু খাইতে দিয়াছ?"

"দিয়াছি। খালি একটু গরম দুধ খাইয়াছে। আর কিছু খাইল না।"

"সে কি ঘুমাইয়াছে?"

"না, এখনও জাগিয়া আছে।"

"তবে তাহাকে গিয়া বল, তাহার চাচাকে আমি নগদ ৫০০৲ দিয়া বিদায় করিয়াছি। আর আসিবে না। মন-বুলবুল যেন নিশ্চিন্ত থাকে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শয্যায় শয়ন করিলাম বটে কিন্তু নিদ্রা আসিল না। বালিকার সেই অশ্রু-সিক্ত সরলতামাখা সুন্দর মুখখানি কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। উহাকে লইয়া কি করি?

ভোরের দিকে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, প্রভাতের আলো আসিতেছে। একজন দাসী শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"হুজুর, শীঘ্র উঠুন। কাল রাত্রে যিনি আসিয়াছেন, তাঁহার শয়নকক্ষ ভিতর হইতে বন্ধ—অনেক ডাকাডাকিতে তিনি দ্বার খুলিতেছেন না।"

আমি ভাবিলাম—"কি সর্ব্বনাশ! আত্মহত্যা করিল না কি?"

চট করিয়া আমার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। উঠিয়া পড়িয়া, যে ঘরে সে শয়ন করিয়াছিল—তাহার দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া একবার—দুই-বার—তিনবার ডাকিলাম—কোনও সাড়া পাইলাম না। দুয়ারে ধাক্কা দিলাম—কোনও উত্তর নাই। শেষে বলিলাম—দুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেল। পাঁচমিনিটের

মধ্যে আমার আদেশ প্রতিপালিত হইল! ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—কেহই নাই, ঘর খালি।

আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছি এমন সময়ে বাহিরের জানালার নীচে চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখি—নিম্নে একজন মালী ঝুঁকিয়া কি দেখিতেছে! আমাকে দেখিবামাত্র সে বলিল—"হুজুর! এখানে একটি মেয়ে পড়িয়া আছে - বোধ হয় মরিয়া গিয়াছে।"

আমরা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। মেয়েটি আর কেহ নয়—মন্‌-বুলবুল মাটীতে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুকে হাত দিয়া দেখিলাম—ধুক্‌ধুক্ করিতেছে—খোদা রক্ষা করিয়াছেন—বালিকা সংজ্ঞাহীন হইয়াছে মাত্র।

একটা চাকরকে বলিলাম—"হাওয়াগাড়ী খালীসাহেবাকে আনিতে গিয়াছে—তুই টম্‌টম্‌খানা লইয়া গিয়া শীঘ্র ডাক্তার সাহেবকে ডাকিয়া আন।"

ডাক্তার ডাকিতে আদেশ দিয়া বালিকাকে উঠাইয়া বাড়ীর ভিতর আনিলাম। সে যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিল—একেবারে সেইখানে তাহাকে লইয়া গেলাম। নিজের বিদ্যামত মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য স্মেলিং সল্টসের শিশিটা তাহার নাসিকার কাছে ধরিলাম।

ডাক্তার সাহেব আসিয়া বলিলেন—ভয়ের কারণ কিছুই নাই—পায়ের কাজী মঠকাইয়া গিয়াছে মাত্র—অস্থি ভাঙ্গে নাই। ঔষধাধি দ্বারা তিনি শীঘ্রই বালিকার চেতনা সম্পাদন করিলেন। যাইবার সময় ডাক্তার আমাকে বলিয়া গেলেন যে রোগিনীকে তিনি একটা ঘুমের ঔষধ দিয়াছেন।

খালীসাহেবা আসিয়া পেঁাছিলেন। কার হইতে নামিবামাত্র সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। শুনিয়া তাঁহার যেন মনঃপুত হইল না।—তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"তুমি—উহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তোমার এই অল্প বয়স—দুনিয়ার হাল্ তুমি কিছুই জান না। তুমি না ভাবিয়া চিন্তিয়া উহাঁকে আশ্রয় দিলে কেন? তোমার অগাধ সম্পত্তি; ও যদি খারাপ মৎলবে আসিয়া থাকে?"

আমি বলিলাম—"না না—মোটে পনের বৎসরের বালিকা। জগতের ও কি জানে?..আপনি উপরে গিয়া তাহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।"

খালীসাহেবা চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে তিনি উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। দেখিলাম তাঁহার মুখ গম্ভীর। বলিলেন—"আহমদ, ও মেয়েটা ফন্দীবাজ।"

আমি বলিলাম—"খালীসাহেবা! আপনি কি বলিতেছেন? উহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—ডাক্তার বলিয়াছে—একথা অবিশ্বাস করেন না ত?"

তিনি বলিলেন—"না আমি সে কথা বলিতেছি না। মেয়েটা ঘুমের ঘোরে অনেক কথা বলিয়াছে—সে বলিতেছিল—'চাচা, আমি যাব না—না না আমি যাব না—কি বলছ—তিন দিন পরে ধর্ম্মতলার মসজিদের কাছে? হঁা হঁা মনে পড়েছে—'এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।"

আমি বলিলাম—"নিশ্চয়ই ওর চাচা আসিয়া উহাকে মারিয়া গিয়াছে।"

পিসীমা বলিলেন—"দেখ আহম্মদ, নিশ্চয়ই একটা ষড়যন্ত্র হইয়াছে! ওর চাচা তোমার নিকট উহাকে রাখিয়া টাকা লইবে,আর ও তিন দিন পরে পলাইয়া ধর্ম্মতলার মসজিদের কাছে গিয়া চাচার সহিত জুঠিবে, নিশ্চয় এইরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছে। দেখিতেছ না?"

"না না আপনি কি বলিতেছেন?—ষড়যন্ত্র? অসম্ভব।"

পিসীমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারিলাম না।

তিনি বলিলেন—"দেখ, তুমি উহার জুয়াচুরী ধরিয়া ফেলিবে বলিয়া উহার ভয় হইয়াছিল—নহিলে দুয়ার বন্ধ করিয়া জানালা দিয়া পলাইবার চেষ্টা কেন?"

"কি করিয়া জানিলেন—ও পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল?"

"তা না হইলে ঠিক জানালার নীচে পড়িয়া থাকিবে কেন? ওর চাচা মাতাল হইয়া আসিয়াছিল বলিতেছ—ও ত আর মাতাল হয় নাই?"

"দেখুন খালীসাহেবা! আপনি উহার নামে মিথ্যা দোষ দিতেছেন। আমার ত মনে হয় না যে, স্বপ্নেও ও ষড়যন্ত্রের কথা মনে স্থান দিতে পারে!"

খালীসাহেবা বলিলেন—"তবে মেয়েটা জানালা দিয়া পড়িল কি করিয়া, সেইটে আমায় বুঝাইয়া দাও না।"

আমায় স্বীকার করিতে হইল যে ইহার কারণ নির্ণয়ে আমি অসমর্থ। তিনি বলিতে লাগিলেন—"ছেলেমানুষ তুমি—কলিকাতার জুয়াচোর চেন না—এক জুয়াচোর আসিয়া তোমার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা ঠকাইয়া লইয়া গিয়াছে। সে আসিবে না বলিয়াছে—ঠিকই বলিয়াছে—সে আর কেন আসিবে? যাহার নিকট হইতে ঠকাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার মত বোকা সে নয়।"—বলিয়া খালীসাহেবা উপরে চলিয়া গেলেন।

আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এমন সুন্দর রূপ বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে এত কুটিলতা দিয়াছেন—তাহাও কি সম্ভব? লোকে বলে

চাঁদে কলঙ্ক আছে—কিন্তু এ চাঁদ দেখিলে কি মনে হয় যে তাহাতে কলঙ্ক থাকা সম্ভব ?

এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে খালীসাহেবা একখানি পত্র হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমার সম্মুখে টেবিলের উপর পত্রখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—"ধাত্রী এই পত্রখানা মেয়েটার বিছানায় কুড়াইয়া পাইয়াছে। উপরে তোমার ঠিকানা রহিয়াছে—পলাইবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে তোমাকে লিখিয়াছে—সন্দেহ নাই।"

চিঠিখানা খুলিয়া দেখি, তাহার মধ্যে পাঁচখানা একশত টাকার নোট ও একখানি পত্র। দেখিয়া বুঝিলাম এই নোট কখানাই আমি তসদ্দুককে দিয়াছিলাম। পত্রখানাতে উদ্দুতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"আমরা আপনাকে ঠকাইয়াছি। চাচা আপনার নিকট হইতে টাকা লইবেন ও আমি এখানে তিন দিন থাকিয়া পলায়ন করিব এবং ধর্ম্মতলায় মসজিদে চাচার নিকট গিয়া পৌছিব—এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। চাচা আমাকে ভয় দেখাইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। আমি আপনার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি—তাহাতে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও লজ্জাবোধ করি। আজ আপনার দয়া দেখিয়া—আমার প্রতি আপনার ব্যবহার দেখিয়া—আর একটা কথা বলিব কি ?—আর বা দোষ কি ? আপনার সহিত এ জন্মে আর ত দেখা হইবে না—আপনার দেবোপম মূর্ত্তি দেখিয়া আমার নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়াছে। জানালার ধারে যে গাছটা আছে, সেই গাছ দিয়া নাচে নামিয়া গিয়া কয়লার গুদামে পৌছিয়া দেখি যে চাচা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার পকেট হইতে নোট কয়খানি বাহির করিয়া লইয়া আসিলাম। সেই বৃক্ষের সাহায্যে আবার জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। নোট কয়খানিও এই সঙ্গে দিলাম। পত্র শেষ করিয়াই চলিয়া যাইব। কি করিব, কোথায় যাইব কিছুই জানিনা—কিন্তু চাচার নিকট আর ফিরিব না। এবার হইতে সৎপথে চলিবার চেষ্টা করিব। আপনার দয়া এ জীবনে ভুলিব না। এ পৃথিবীতে আপনার মত লোক যে আছে, তাহা জানিতাম না। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ঘৃণা করিবেন—ঘৃণা ছাড়া আমি আর কিছু পাইবার প্রত্যাশা করি না। আমার সম্বন্ধে আপনাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম—তাহা সবই সত্য। আমার ইচ্ছা যে এই খানেই থাকিতে পাই, কিন্তু তাহা হইল না। আপনি আমার জন্য যাহা যাহা করিয়াছেন ও যাহা যাহা করি-

বেন বলিয়াছিলেন—তাহা আমার মনে থাকিবে ও আমি প্রত্যহ আল্লার নিকট আপনার মঙ্গল কামনা করিব। আমার কথা ভুলিয়া যাউন। শুধু এইটুকু মনে রাখিবেন যে আপনার টাকা অমি চাচাকে লইতে দিলাম না। চোখের জলে কি লিখিতেছি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—আমার কেবলই মনে হইতেছে—আমি জুয়াচোর, আমি পাপী, আমি বিশ্বাসঘাতক। হতভাগিনী মন্-বুলবুল্।"

* * * * * *

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যেদিন মন্-বুলবুল্ খালীসাহেবার সহিত তাঁহার বাড়ীতে চলিয়া গেল—সেই দিন হইতে আমি তহাকে ভুলিতে পারি নাই। দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলাম—কিন্তু বেশীদিন থাকিতে পারিলাম না। আবার বাক্স বিছানা বাঁধিয়া কলিকাতা রওণা হইলাম। খালীসাহেবার গৃহে অতিথি হইয়া কিছুদিন যাপন করিলাম। এইরূপ দুই তিন বার কলিকাতা ও দিল্লী করিবার পর—খালীসাহেবা একদিন আমাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওরে আহমদ্—তুই আর কত দিন এরূপ ফকিরী করিয়া বেড়াইবি বাছা?—তোর আম্মাজী যদি জীবিত থাকিতেন—তাহা হইলে তুই কি এরূপ করিতে পারিতিস্?—আমাদের সকলেরই ইচ্ছা—তুই আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হ।"

আমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোনও পাত্রী কি ঠিক করিয়াছেন?"

খালীসাহেবা হাসিয়া বলিলেন—"সেটা ঠিক না করিয়াই কি আমি বলিতেছি?"

শুভদিনে, যথাশাস্ত্র মন্-বুলবুলের সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল।

চা-গ্রন্থ।

ভূমিকা।

জাপানী লেখক ৺কাকুজো ওকাকুরার পুস্তক গুলির সহিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের পরিচয় আছে কিনা জানি না। তিনি স্বীয় মাতৃভাষায় কি রচনা করিয়াছিলেন সে বিষয় আমরা জ্ঞাত নহি; তবে তাঁহার প্রথম ইংরাজী পুস্তক "Ideals of the Eastএর" ভূমিকায় আর্য্যা নিবেদিতা তাঁহাকে পাঠক সমাজে পরিচিত করাইয়া

দিয়াছিলেন। এই প্রাচ্য লেখকের ইংরাজী রচনা-ভঙ্গী বড়ই সুন্দর। চায়ের অনুষ্ঠান তাঁহাদের মধ্যে শুধু একটি দৈনিক জাতীয় অনুষ্ঠান নহে, ইহার সহিত তাঁহাদের সমাজ ধর্ম্ম শিল্প সকলেরি সংযোগ আছে। এই সম্বন্ধে তিনি একখানি বড় মনোরম ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাই আমরা 'মানসীর' জন্য অনুবাদ করিয়া দিলাম। ইহাতে মূলের রচনা-কৌশল রক্ষিত হইল কিনা সন্দেহ, তবু ও ইহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় সুধীসমাজ যদি মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র আভাষ লাভ করেন, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

চা-গ্রন্থ।

১

বিশ্বমৈত্রীর পেয়ালা।

চা অনুপানে জন্মগ্রহণ করিয়া পানীয়ে পরিণত হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দীতে চীনে সুভদ্র আমোদ স্বরূপে কাব্য-রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাপান তাহাকে চারু রুচিধর্ম্ম, চা-ধর্ম্মের মহিমায় উন্নীত করিয়াছে। দৈনিক জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে বাস করিয়াও সৌন্দর্য্য উপাসনাই চা-ধর্ম্মের সাধনা। ইহার মন্ত্রবলে মানবমনে পবিত্রতা এবং সাম্য প্রবেশ লাভ করে, একের প্রতি অপরের সমবেদনার, দয়া ধর্ম্মের রহস্য ব্যক্ত হয়, সমাজ-নিয়ম কাব্যের ন্যায় সুমধুর হইয়া উঠে। ইহা বিশেষ করিয়া অপূর্ণেরি পূজা, কেন না জীবন স্বরূপ অসম্ভব ব্যাপারে কোন কিছু সম্ভব করিবার জন্যই এই সুকুমার প্রয়াস।

সাধারণতঃ সৌন্দর্য্য উপাসনা বলিলে যাহা বোঝায়, চায়ের দর্শন কিন্তু শুধু তাই নয়। কেন না ইহা ধর্ম্ম এবং নীতিবিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদিগের (অর্থাৎ জাপানীদিগের) মানবপ্রকৃতি এবং বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা প্রকাশ করে। ইহা স্বাস্থ্য-নীতি, কেন না শুচিতা ইহার অনতিক্রমনীয় বিধান; ইহা অর্থশাস্ত্র, মিতব্যয়িতা ইহার বিশেষত্ব; জটিল ও মহার্ঘের প্রত্যাহার, এবং সরলতার মধ্যে আরাম সঞ্চয় করাই ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য। ইহা নৈতিক জ্যামিতি বলিলেও চলে, কেন না ইহারি মধ্য দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের এবং ব্যক্তিগত পরিমাপ বুঝিতে পারি। ইহা প্রাচ্য গণতন্ত্রের যথার্থ পরিকল্পনা, কেন না এই উপায়ে, চা-ধর্ম্ম-দীক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুরুচির আভিজাত্য প্রদান করা হয়।

পৃথিবীর আর সকল দেশ হইতে বহু বৎসর ধরিয়া জাপানের এককাবস্থান ধ্যান ধারণার সহায় হইয়া, চা-ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। আমাদের গৃহ এবং অভ্যাস, আমাদের বেশবিন্যাস এবং রন্ধন-বিলাস, আমাদের শঙ্খের মত শুভ্র, ঝিনুকের যত সুকুমার, চন্দ্রালোকের মত নিরাময় দীপ্তি চীনা-মাটির তৈজস পত্র, কাষ্ঠে লাক্ষার বিচিত্র কারুকার্য্য, চারুচিত্র-লিখন এমন কি আমাদের সাহিত্য পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব গ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে। জাপানী সভ্যতা বুঝিতে হইলে কিছুতেই ইহাকে উপেক্ষা করা চলিবে না, কেন না ইহা যেমন ধনাঢ্যের সুসজ্জিত অট্টালিকায়, তেমনি দরিদ্রের নিরলঙ্কার কুটীরেও স্থান লাভ করিয়াছে। আমাদের কৃষকগণ ফুল সাজাইতে শিখিয়াছে, আমাদের দীনতম শ্রমজীবিগণ ইহারি প্রসাদে পর্ব্বতের মহিমা এবং নদীধারায় সৌন্দর্য্যের সম্মুখে ভক্তিনম্র হৃদয়ে প্রণতি জানাইয়া থাকে। আমাদের মধ্যে যে লোক মানব-জীবনের দুঃখ সুখের লীলায় একেবারেই চঞ্চল হয় না, যে বড় বিজ্ঞ তাহার কথা বলিতে, আমরা বলি, বেচারীর মধ্যে এতটুকুও, চা নাই। আবার যে পাগল সৌন্দর্য্য-প্রেমিক পার্থিব নাটকের বিয়োগান্ত পরিণাম ভুলিয়া, যৌবন-বসন্তে উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া ফেরে, তাহার মধ্যে চায়ের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক বলিয়াই সন্দেহ করিয়া থাকি। বাহিরের লোক যথার্থই মনে করিতে পারে, এ আমাদের একটু বেশী বাড়াবাড়ি, ধান ভানিতে শিবের গীত। ছোট্ট চায়ের পেয়ালায়:মাগো, এ কি ঝড়, সেত বলিবেই। কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখি, অসহায় মানবের আনন্দ উপভোগের পেয়ালাটি কত ছোট, কত অল্প সময়ের মধ্যে অশ্রুতে ভরিয়া ওঠে, অনন্ত পিপাসায় কাতর আমরা কত সত্বর তাহার সমস্ত মধুরতাটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলি, তখন, যদি চায়ের পেয়ালাটিকে একটু অধিক আদর করি তবে এমনি কি দোষ হয়? মানুষ তো এর চেয়ে আরো অনেক বেশী অন্যায় করিয়াছে। বারুণী সেবায় আমরা কতই না বলিদান করিয়াছি, রণনিপুন দেবসেনাপতিকেও মদমত্ত হলধরে পরিণত করিতে ত্রুটি করি নাই। তবে ক্যামেলিয়ার রাণীর উদ্দেশে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিতে বাধা কি? সেই সুন্দর পুষ্পবেদিকা হইতে সহানুভূতির সুখোষ্ণ আনন্দধারা নিরন্তর প্রবাহিত, তাহাতে একেবারে মস্‌গুল হইয়া যাই না কেন? দ্বিরদ-রদ-চিক্কন পানপাত্রে উজ্জ্বল কাঞ্চনধারায় দীক্ষিত সৌভাগ্যবান, কন্‌ফুসিয়োর মৌনমাধুর্য্য, লোৎসের কশায় স্বাদ এবং শাক্যমুনির স্বর্গীয় সৌরভের স্পর্শ লাভ করিতে পারেন।

যাহারা আপনার মধ্যে বৃহত্ত্বের তুচ্ছতা অনুভব করে না, তাহারা প্রায়ই অপরের মধ্যে ক্ষুদ্রতমের মহত্ব বুঝিতে অক্ষম। পান ভোজনে দিব্য পরিতৃপ্ত, পরিপুষ্ট সাধারণ পাশ্চাত্য জীব, এই চা-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাচীবাসী আমাদিগের অনেক অদ্ভুত খেয়াল, ছেলেমানুষি এবং বৈচিত্র্যপ্রিয়তার পরিচয় পাইবে সন্দেহ নাই। জাপান যতাদন শান্তিপ্রিয় ছিল, চারুশিল্পের চর্চ্চা করিত, ততদিন তাহারা আমাদিগকে বর্ব্বর বলিয়া জানিত; মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য জীবনের সর্ব্বনাশ করিয়া যে দিন রক্তনদী বহাইয়াছি, সেই দিন হইতেই আমরা সুসভ্য বলিয়া গণ্য হইতেছি। সামুরাইগণের রণসংহিতার অনেক ভাষ্যই আজকাল প্রতীচ্যে প্রচারিত হইয়াছে; আমাদের সে মৃত্যু অনুশাসন কাব্যের মতই মনোহর, তাহার মহিমায় মুগ্ধ প্রত্যেক সৈনিক আত্মত্যাগের উৎসাহে প্রাণ বিসর্জ্জন করা মহানন্দ স্বরূপ জ্ঞান করে। কিন্তু জীবন-কাব্যস্বরূপ চাধর্ম্মের প্রতি কোনও মনোযোগই দেওয়া হয় নাই। যুদ্ধজয়ের ঘোর রক্তাক্ত গৌরবই যদি আমাদিগকে সভ্য মনে করিবার একমাত্র দাবী হয়, তবে আমরা চিরদিনই যেন অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হই। যতদিন আমাদের আদর্শ, আমাদের কাব্য-সৌন্দর্য্য এবং চারুশিল্প সমুচিত সম্মান লাভ না করে, তত দিন অসভ্য আমরা প্রতীক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।

কবে প্রতীচ্য প্রাচ্যকে বুঝিবে—কিম্বা বুঝিবার চেষ্টা করিবে? আসিয়া-বাসী আমাদিগের সম্বন্ধে যে অদ্ভুত সত্য এবং কল্পনার জাল রচিত হয়, তাহা দেখিয়া আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যাই। হয় আমরা পদ্মসুগন্ধ সম্ভোগে অথবা ছুছুন্দরী এবং তৈলপায়িকা ভোজনে জীবনধারণ করিয়া থাকি, এমনি জনশ্রুতি শুনিতে পাই। হয় আমরা অদৃষ্টবাদের প্রভাবে অক্ষম জর্জ্জরীভূত, নয় ত নীচ ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় তন্ময়। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মভাব অজ্ঞান বলিয়া উপেক্ষিত, প্রাচীন চীনের চিরস্তর সংযম এবং গাম্ভীর্য্য বুদ্ধিহীনতা এবং জাপানী স্বদেশপ্রীতি অদৃষ্টবাদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আমরা যে শান্ত ভাবে অস্ত্রাঘাত, বেদনা, দৈন্য, প্রিয়জনবিচ্ছেদ সহ্য করিয়া থাকি, জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যেও বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, তাহা কেবল আমাদের শক্তির স্বল্পতা, স্নায়ুজালের হীনতার প্রভাবে হইয়া থাকে; তাহার সম্যক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে, শুনিলাম।

আমাদের লইয়া একটু আমোদ, তা করনা কেন? তাহাতে আপত্তি নাই, আমাদেরও আমোদ করিবার স্বাধীনতা আছে? যদি জানিতে পারিতে তোমাদের

সম্বন্ধেও আমরা কত কথা, কেমন বানাইয়া বর্ণনা করি, তবে হাসির কারণের অভাব হইত না। সে পরিকল্পনায় গোধুলি-ছায়াচ্ছন্ন রহস্য সম্পূর্ণ বিদ্যমান, বিস্ময়ের সহজ ভক্তি, অনিশ্চয়ের ক্ষুব্ধনিস্তব্ধতারও অভাব নাই। এমনি পরিপাটী সূক্ষ্ম মার্জ্জিত অতীন্দ্রিয় গুণ সমূহে তোমাদের অলঙ্কৃত করা হইয়াছে যে ঈর্ষা করিবারও অবসর নাই, এমনি সুন্দর ললিত চারু চমৎকার বসনে অভ্যস্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নিন্দা করা অসম্ভব। আমাদের অতীত কালের লেখকগণ সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ বলিয়া গিয়াছেন, তোমাদের পরিচ্ছদ অন্তরালে বেশ সুন্দর এক একটি পরিপুষ্ট রোমশ লাঙ্গুল আছে—আর তোমরা প্রায়শঃই নবজাত শিশুর দেহের কাবাব ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া থাক। শুধু তাই নয়, ইহার অধিক নিন্দাবাদও শোনা গিয়াছে। তোমাদের আমরা নিতান্ত বিষয়বুদ্ধি বলিয়াই জানিতাম; কেন না শুনিয়াছি, তোমরা যাহা প্রচার কর, তাহার অনুযায়ী কার্য্য কখনই কর না।

কিন্তু এসব ভুল ভ্রান্তি ক্রমশঃই অন্তর্ধান হইতেছে। বাণিজ্য প্রভাবে অনেক প্রাচ্য বন্দরেই ইউরোপীয় ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। আসিয়াবাসী যুবকগণ, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা আয়ত্ব করিবার জন্য দলে দলে প্রতীচ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রবেশ করিতেছে। আমাদের অন্তর্দৃষ্টি তোমাদের সভ্যতার মর্ম্মভেদ করিতে পারে না সত্য, তবুও আমরা শিখিতে অনিচ্ছুক নহি। আমার স্বদেশবাসী-দিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের ধরণ ধারণ, ভাব ভঙ্গী অত্যধিক পরিমাণে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে; বিশ্বাস কঠিন কলার (collar) এবং সমুচ্চ হ্যাট (Hat) হস্তগত হইলেই, তোমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম পদবীতে উন্নীত হইব। এ ভ্রান্তি যতই শোচনীয় এবং দুঃখজনক হউক না কেন, ইহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রতীচ্যের দরবারে আমরা বিনয়াবনত-জানু হইয়া অগ্রসর হইতে সম্মত। আক্ষেপের বিষয় প্রাচ্যপরিচয় গ্রহণ ব্যাপারে প্রতীচ্যের ভাবটি এমন প্রীতিমধুর নহে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচারকগণ শিক্ষাদান, করিতেই আইসেন, আদৌ গ্রহণ করিতে নহে। আমাদের বিশাল সাহিত্য-বারিধির পরিচয় হয় অনু-বাদের গণ্ডুষে, নয়ত পর্য্যটকের আজগুবি গল্প হইতেই তোমরা গ্রহণ করিয়া থাক। স্বর্গগত লাফ কার্ডি ও হার্ণ কিম্বা আর্য্যা নিবেদিতার মত এমন মহানুভব ব্যথার ব্যথী লেখক লেখিকা আর পাওয়া যাইবে? তাঁহারা যে আমাদের ধর্ম্মবল, এবং প্রীতি-অনুভূতির দীপ্তি বিস্তার করিয়া, ঘনীভূত প্রাচ্য অন্ধকারে জাগরণের জীবন সঞ্চার করিয়াছেন।

এমন অসংযতবাক হইয়া হায় আমি চা-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার প্রকাশ করিলাম সন্দেহ নাই। কেন না চা-ধর্ম্মের মর্ম্ম-শক্তি আমাদিগকে সেই কথা বলিতেই বাধ্য করে, অপরে যাহা আমাদের নিকট শুনিবে বলিয়া প্রত্যাশা করিয়া আছে; তাঁহার অধিক আর একটি কথাও বলিবার অধিকার থাকেনা। আমি কিন্তু ভাই সে অনুশাসন মানিব না। ইউরোপ এবং আসিয়া উভয়তঃ আপনাদিগকে ভুল বুঝিবার নিমিত্ত এক শত অনাসৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছে; এত অনর্থ সংঘটন হইয়াছে যে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি যদি দুচারিটি কথা বেশী করিয়াই বলিতে চাই, তবে তাহার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতে আমি কোন ক্রমেই বাধ্য হইব না। রুশিয়া যদি জাপানকে বুঝিবার জন্য তিলমাত্র অনুগ্রহ-চেষ্টা করিত, তবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্ববাসীকে এমন লোমহর্ষণ, রক্তপ্লাবন সমরাভিনয় দেখিতে হইত না! প্রাচ্য সমস্যা সকল উপেক্ষা করিবার পরিণাম কি ভয়ানক, তাহার ফলে বিশ্বপরিবারের নিমিত্ত কেমন অনর্থের বীজ নিহিত থাকে, তাহা সহজে অনুমেয় নহে। ইউরোপীয় ইম্পিরিয়ালিজম হাস্য-জনক "পাণ্ডু" বিপদের আশঙ্কার হুঙ্কারে দিক্‌বিদিক মুখরিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই, আসিয়ার পক্ষে অকস্মাৎ দুরোরোগ্য ধবল-বিভাধিকা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তোমরা হয়ত আমাদের মধ্যে চায়ের মাত্রা কিঞ্চিদধিক দেখিয়া বেশ একটু হাসিতে পার; কিন্তু আমরাও কি তোমাদের শুষ্ক কাষ্ঠ তিষ্ঠত্যগ্রে ভাবিয়া একেবারেই অগ্নিশর্ম্মা হইতে পারি না?

আইস, আমরা উভয় মহাদেশকে পরস্পরের প্রতি তূর্ণ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্রয়োগ ব্যাপার হইতে নিরস্ত করি; উভয়তঃই আপনাদিগকে কেবলমাত্র অৰ্দ্ধ গোলকের অধিকারী জানিয়া, জ্ঞানী যদিও নাই হইতে পারি, তবু বিষাদ সৌম্য বৈরাগ্য অর্জ্জনের চেষ্টা করায় ক্ষতি কি? আমরা ভিন্ন উপায়ে, স্বতন্ত্র চেষ্টায় জাতীয় পরিণতি লাভ করিয়াছি; তাই বলিয়া একে অপরের সহায় হইবার পথে কোনও ব্যাঘাত দেখিতে পাই না। তোমরা শান্তি-বিযুক্ত, চাঞ্চল্য-পরিণাম ঐশ্বর্য্য-বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছ, আর আমরা যে তাললয় রাগ সংযুক্ত সঙ্গীতের মত নির্ব্বিরোধ অনাহত শান্তির সৃজন করিয়াছি, তাহা নিতান্ত সুকুমার বলিয়াই একান্ত আত্মরক্ষা-অসমর্থ। তবুও বলিলে প্রত্যয় যাইবে কি, অনেক বিষয়েই প্রাচী প্রতীচি অপেক্ষা আছে ভাল।

আশ্চর্য্যের কথা, আজ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত বিশ্ব পরিবারই ক্ষুদ্র চায়ের পেয়ালাটির মধ্যে আত্মীয়তার আনন্দস্বাদ পাইয়াছে। আসিয়ার এই একমাত্র অনুষ্ঠানই

সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছে। ইউরোপীয় গৌরাঙ্গগণ আমাদের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবেধে করে নাই; কিন্তু এই পাটল পানীয়টির সন্ধান পাইবামাত্র সাদরে স্বাগত জানাইয়াছে। বৈকালীন চা প্রতীচ্য ভদ্র সমাজের বিশেষ একটি অপরিহার্য্য অনুষ্ঠান'। চায়ের চামচ পীরিচের মৃদুনিক্কণে সুকুমারী গৃহস্বামিনীর ক্ষৌম পরিচ্ছদের চিক্কণ শব্দে ক্ষীর শর্করা সম্বন্ধে মধুরপ্রশ্নের নিরতিশয় মাধুর্য্যে চায়ের পূজা যে স্থির-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। নকলের নাকাল নিশ্চিত জানিয়াও নিমন্ত্রিত অতিথি যে প্রকার সাধু ঔদাস্যের সহিত প্রস্তুত পানীয়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, সেই নম্র বৈরাগ্যই প্রাচ্য প্রভাবের অগ্রগণ পরিচয়।

ইউরোপীয় সাহিত্যে চা সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ ৮৭৯ খৃষ্টাব্দের পরে একজন আরবীয় পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, চীন রাজধানী ক্যাণ্টনে রাজস্বের প্রধান আমদানী চা এবং লবণের শুল্ক হইতেই হয়। মার্কো পাওলো লিখিয়াছেন—১২৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান কোনও চীন রাজস্বসচিব স্বেচ্ছায় চায়ের শুল্ক বৃদ্ধি করা অপরাধে, পদচ্যুত হইয়াছিলেন। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারকালে ইউরোপীয়গণ দূরান্ত পূর্ব্বের সংবাদ জানিতে আরম্ভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ওলন্দাজগণ সংবাদ আনিলেন যে, প্রাচ্য দেশে কোনও গুল্মবিশেষের পাতা হইতে বড় চমৎকার পানীয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরিব্রাজক Giovanni ১৫৫৯, আলমিড ১৫৭৬, মাগিনো ১৫৮৮, এবং তারিরা ১৬১০ খৃ অব্দে চায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত বৎসরে ডচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজ ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম চায়ের আমদানী করে। ফ্রান্সে ১৬৩৬ খৃঃঅব্দে চায়ের পরিচয় হয়, ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে রুশদেশে তাহার আবির্ভাব দেখা যায়। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড তাহাকে স্বাগত জানাইয়া বল্লে "সর্ব্ব ভিষক অনুমোদিত চমৎকার পানীয়, চীনবাসীগণ তাহাকে, চা, নামে অভিহিত করিয়াছেন, ভিন্ন দেশবাসীগণ তাহাকে টে, কিম্বা "টী" বলিয়া থাকে।"

পৃথিবীর সব ভাল কিছুর মতই চায়ের প্রচারপথে অনেক বাধা ঘটিয়াছিল। নিসন্দিগ্ধ নিন্দুকের ন্যায় হেনরী স্যাভিল ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে চায়ের অনুষ্ঠান অতি অপরিচ্ছন্ন ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করেন। জোনাস হ্যানওয়ে বলেন চা পান করিলে পুরুষের শরীরের আয়তন ও সৌষ্ঠব হ্রাস হইয়া যায়, রমণীর রমণীয় লাবণ্য আর থাকে না। সেকালে আধসের চায়ের দাম আট দশ টাকার অধিক ছিল;

কাজেই জনসাধারণের পক্ষে তাহা সম্ভোগ করিবার সৌভাগ্য হইত না। রাজকীয় কিম্বা সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের উৎসব অনুষ্ঠানে চায়ের ব্যবহার হইত; দূরান্তর হইতে রাজদর্শনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ ইহা উপঢৌকন স্বরূপ আনয়ন করিতেন। দুর্ম্মূল্য হওয়া সত্বেও আশ্চর্য্য এই যে, চায়ের ব্যবহার অত্যল্প কালের মধ্যেই সাধারণ্যে প্রসর লাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে লণ্ডনের বাহিরের আড্ডাগুলি ক্রমে চায়ের দোকানে পরিণত হয়। সাহিত্য-রসরসিক Addison এবং Steele প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সেই সকল স্থানে প্রকাণ্ড পাত্রে চা লইয়া, দিবা রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত করিতেন। এই পানীয়টি বিলাস-সামগ্রী হইতে ক্রমে জীবনের দৈনিক অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য হইয়া উঠিল। শুধু তাহাই নয়, ইহার উপরে আবার লবণ আর অহিফেনের মত শুল্কও ধার্য্য হইয়া গেল। এই পানীয়টি অধুনাতন ইতিহাসগঠনে কতখানি সাহায্য করিয়াছে, তাহা এই সংস্রবে স্মরণ না করিয়া থাকা যায় না। যতদিন পর্য্যন্ত চায়ের শুল্ক উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া মানব সহ্য-শক্তির সীমা অতিক্রম না করে, ততদিন পর্য্যন্ত ঔপনিবেশিক আমেরিকা অত্যাচারের হস্তে আপনাকে একান্ত ভাবেই সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছিল। বোষ্টন বন্দরে চায়ের সিন্দুকগুলি যেদিন সিন্ধুর গ্রাসে নিক্ষেপ করা হয়, সেই দিন হইতেই আমেরিকান স্বাধীনতার সূত্রপাত।

চায়ের স্বাদে এমন একটি চতুর মাধুর্য্য আছে যে, ইহার মোহে অভিভূত না হইয়া থাকা যায় না এবং কল্পনার সাহায্যে ইহাতে কল্পলোকের সৌন্দর্য্য আরোপ করিতেই হয়। রসিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহার মৃদু সৌরভের সহিত আপন আপন চিন্তার পরিমল মিলাইতে বড় অধিক বিলম্ব করেন নাই। এই পানীয়ের সুগন্ধে সুরার মদগর্ব্ব, কফির আত্মম্ভরিতা এবং কোকোর আত্মবিশেষত্ব-বর্জ্জিত দুর্ব্বল নির্দ্দোষিতা নাই। ১৭১১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই spectator পত্রিকায় দেখিতে পাই "যে সকল সুনিয়মিত পরিবারে প্রতি প্রভাতের প্রহরেক কাল চায়ের সহিত রুটি মাখনের সদ্ব্যবহারে ব্যয়িত হয়, তাঁহাদের আমি একান্ত নির্ব্বন্ধানুসারে এই অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন এই সংবাদপত্রখানিকে সেই চা-অনুষ্ঠানের অভিন্ন অঙ্গ স্বরূপ জ্ঞান করেন।" Samuel Johnson আপন চরিত্র-চিত্র অঙ্কন করিতে লিখিয়াছেন; "একজন নিলর্জ্জ চা-খোর আজ বিশ বৎসর ধরিয়া এই সুন্দর মোহকর পানীয়ের সাহায্যে আহার্য্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি চায়ের সহায়তায় সায়াহ্ন রমণীয়, নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহর

রাত্রি সান্ত্বনাময় এবং প্রভাতের প্রথম আলোককে স্বাগত জ্ঞাপন করিতেন। চার্লস ল্যাম্ব যখন বলিয়াছিলেন স্বকৃত সৎকার্য্য সঙ্গোপনে রাখিয়া এবং অপরের সুকৃত সহসা প্রচার করিয়া দিয়া তাঁহার আনন্দ লাভ হয়, তখনি তিনি চাধর্ম্মের বীজমন্ত্র আবিষ্কার করেন। কেন না লুক্কায়িত সৌন্দর্য্যের আবিষ্কারই চাধর্ম্মের শিল্প; সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির অপেক্ষা আভাষের প্রকাশই তাহার নীতি। স্বীয় স্বভাবের অক্ষমতা কিম্বা দুর্ব্বলতা দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিতে পারাই ইহার সাধনা, ইহার রহস্য, ইহার রসবোধ এবং ইহার ন্যায় ও দর্শন। যথার্থ রসজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই চা-দার্শনিক বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ থ্যাকারে একজন, আর সেক্ষপীয়র অবশ্যই প্রথম এবং প্রধান। Decadence কালের কবিগণ (হায় পৃথিবীর অবস্থা Decadence ভিন্ন আর কবেই বা কি ছিল?) পৃথিবীতে বিষয়-বিষ বিস্তারের বিরুদ্ধে যখনি কোনও কিছু বলিয়াছেন, তখনি চাধর্ম্মের অগ্রসর হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি অসম্পূর্ণের অর্থাৎ জীবন-ব্যাপারের চিন্তা করিতে করিতে আমরা একটি ক্ষীণ আশা পোষণ করি যে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য হয়ত একই সান্ত্বনা স্থলে সম্মিলিত হইবে। 'তাও' ধর্ম্মীগণ বলেন, সেই অনাদি কালের বিশাল প্রারম্ভে আত্মা এবং পরমাণু বিষম সংগ্রাম-নিরত হইয়াছিল। অবশেষে পীত সম্রাট আকাশের সূর্য্যদেব অন্ধকার এবং পৃথিবীর দানবকে পরাভব করেন। মৃত্যু-যন্ত্রণায় অধীর এই অসুর মস্তকের আঘাতে চন্দ্রকান্তমণি-নির্ম্মিত আকাশ-গম্বুজ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়। নক্ষত্রেরা আপন আপন কুলায় আশ্রয় হারাইয়া ফেলিল, লক্ষ্যভ্রান্ত চন্দ্রমা অন্ধকারের দুর্গম গিরিদরীতে ঘুরিয়া মরিতে লাগিল। নিরাশা-কাতর বিপদগ্রস্ত পীত সম্রাট আকাশ-সৌধের পুনঃ সংস্কারের জন্য দূর দূরান্তরে স্থপতি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাকুল অনুসন্ধান ব্যর্থ হইল না। পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে স্বর্গীয় দেবী রাজ্ঞী নিউকা উত্থিত হইলেন। তাঁহার ললাটদেশে চন্দ্রকলার দীপ্তি, সর্ব্বাঙ্গ সমুজ্জ্বল অগ্নিরাগ বর্ম্মে আচ্ছাদিত। তিনি তাঁহার দিব্য কটাহে পঞ্চ বর্ণের সংমিশ্রণে বাসব-ধনুর সৃষ্টি করিয়া ভগ্ন আকাশ আবার সুনির্ম্মিত করিলেন। কিন্তু হায়, দেবতার কার্য্যও ভ্রমবর্জ্জিত নহে; ক্ষুদ্র দুইটি ছিদ্র সম্পূর্ণ রোধ করিয়া দিতে তিনি ভুলিয়া গেলেন। সেই হইতে প্রেমের দ্বৈত-ভাবের সৃষ্টি হইল। দুইটি আত্মা অন্তহীনের দেশে কেবলি ভাসিয়া চলিয়াছে; যত দিন উভয়ের একত্র সম্মিলনে বিশ্বের সম্পূর্ণতা সাধন না হয়, তত দিন, এ গতির আর নিবৃত্তি নাই। আমাদিগের প্রত্যেককেই তাই ত জন্মে জন্মে নুতন করিয়া আপন আপন আশা ও শান্তির আকাশ গড়িয়া তুলিতে হয়।

বর্ত্তমানে হায়, বিশ্বমানবের স্বর্গলোক ক্ষমতা এবং অর্থ এই দুই অসুর শক্তির সংঘর্ষে বারম্বার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তাই আজ নিখিল বিশ্ব আত্মম্ভরিতা এবং রুচিহীনতার অন্ধকার ছায়ায় উদ্‌ভ্রান্ত, ভ্রাম্যমান। বিকারগ্রস্ত বিবেকের বিনিময়ে আমরা জ্ঞানার্জ্জন করিতেছি। দয়াধর্ম্ম স্বার্থচেষ্টার নামান্তর মাত্র। প্রাচী এবং প্রতীচি ফেনোদ্বেল সমুদ্রে ভীষণ দুইটি গ্রহের ন্যায়, জীবনের স্পর্শমণির সন্ধানে উদ্দাম হইয়া ফিরিতেছে। এই মহাধ্বংসের সংস্কার করিবার জন্য আবার যে দেবসম্রাজ্ঞী নিউকার আবশ্যক; আমরা বিশ্বপালক বিষ্ণুর অবতারের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। এস, ততক্ষণ একটু চা পান করিয়া লই; আকাশে সূর্য্যাস্তের স্বর্ণরাগ বংশপত্রের চঞ্চল চামরের উপরে পড়িয়া আলোছায়া মায়ার খেলা সৃজন করিতেছে, উৎসরাজিতে আনন্দের গদ গদ ভাষা ক্ষরিত হইতেছে, পল্লববহুল দেবদারু-বীথিকার মর্ম্মর-গান চায়ের উষ্ণ জলের পাত্রের মধ্যে অব্যক্ত মধুর শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এস ওগো বন্ধু এস, আমরা এই অবসরে নশ্বরতার আনন্দের স্বপন দেখিয়া লই, অবোধ সুন্দর ঘটনা সমাবেশের মধ্যে বিভোর হইয়া থাকি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুৎসব।

যে কৃষ্ণপক্ষে আমরা আজ মিলিত হইয়াছি ইহার নাম পিতৃপক্ষ। হিন্দুরা এই পক্ষে পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিয়া থাকেন। পিতৃপুরুষ বলিলে যে কেবল পিতা, পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষই বুঝায়, তাহা নহে। বেদে সকল বংশেরই পূজ্য এক শ্রেণীর পিতৃপুরুষের উল্লেখ আছে। তাঁহারা অঙ্গিরস, অথর্বন, ভৃগু, বশিষ্ঠাদি বংশীয় ঋষি। এই সকল প্রাচীনকালের ঋষিগণের পিতৃরূপে পূজিত হওয়ার কারণ ইঁহারা "পথকৃৎ" বা পথপ্রদর্শক ছিলেন। আজ আমরা ভক্তি-কৃতজ্ঞতারূপ তিলোদক দ্বারা যে মহাপুরুষের তর্পণ করিতে সমবেত হইয়াছি, তিনি নবভারতের প্রধান "পথকৃৎ"। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, রাষ্ট্রনীতি-সংস্কার, সাহিত্য প্রভৃতি সকল প্রকার সদনুষ্ঠান-ক্ষেত্রেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আমাদের পথপ্রদর্শক। কেহ কেহ বলিতে পারেন, "হলেন ইবা রামমোহন রায় পথপ্রদর্শক—তিনি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সেই

সময়ে এ দেশের জনসাধারণ অশিক্ষিত অন্ধ ছিল, তাদের তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন; আমরা বিংশ শতাব্দীর সুশিক্ষিত চক্ষুষ্মান লোক, আমরা কেন সময় নষ্ট করিয়া বৎসর বৎসর তাঁহার স্মৃতির আরাধনা করিব। আমাদের বিংশ শতাব্দের হিসাবে তিনি এমন কি অসাধারণ লোক! রামমোহন রায় যে অভিনব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সংস্থাপক, সেই সম্প্রদায়ের লোকের তাঁহার স্মৃতির প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখাইবার কারণ থাকিতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের সময়ে যে সকল শুভানুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছিল তাহা তাঁহার একার চেষ্টার ফল নহে। তাঁহার রচনাই বা এখন কয় জনে পড়ে? আজকার উৎসবের মত উৎসবের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা কি?"

রামমোহন রায় যে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখনকার লোকের মধ্যে কেহ কেহ তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শের সন্ধান পাইয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। রামমোহন রায়ের মত লেখক এবং পণ্ডিত হয়ত এখন বিরল নহে। কিন্তু তাঁহার উচ্চ-আদর্শ-নিষ্ঠার, বিজ্ঞতার, এবং যোগ্যতার পশ্চাতে এমন একটি শক্তি ছিল, যাহা এদেশে অত্যন্ত বিরল—সেই শক্তি চরিত্রশক্তি (vigour of character)। আমরা চরিত্র বলিতে সাধারণতঃ একটা স্থিতিশীল (static) জিনিষ মনে করি; দোষলেশশূন্য ব্যক্তিই আমাদের হিসাবে চরিত্রবান। এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা সমাজের অপকার হয় না বটে, কিন্তু ইহাদের লইয়া সমাজ যে উন্নতির পথে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে তাহা মনে হয় না। চরিত্র একটা গতিজননশীল (dynamic) শক্তি। এইরূপ চরিত্র-শক্তিসম্পন্ন পুরুষ সমাজ ও সেবাব্রত গ্রহণ করিলে সমাজে গতিশীলতা সঞ্চারিত হইতে পারে। কিন্তু যে কারণেই হউক, আমাদের দেশে সমাজসেবার ক্ষেত্রে এইরূপ চরিত্র-শক্তিসম্পন্ন পুরুষের সংখ্যা অতি অল্প। আমরা অনেকেই অবসর মত সমাজের হিতচিন্তা করি, উপস্থিতমত দুচারিটা কথাও বলি; কিন্তু কাযে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারি না, এবং আর কাহাকেও কিছু করিতে দেখিলে তাহার ভিতরে একটা অভিসন্ধি আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া নিজের যে সদিচ্ছা তাহাও একরূপ গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলি। আমাদের এইরূপ আচরণের কারণ বিদ্যা বুদ্ধির বা সদভিপ্রায়ের অভাব নহে, চরিত্র-শক্তির অভাব। আমাদের দেশে যে চরিত্র-শক্তিসম্পন্ন পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইতেছেন না, এমন নহে। এক নিঃশ্বাসে আমরা হয়ত ৫।৬ জনের নাম করিয়া ফেলিতে পারি—যথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

বিবেকানন্দ স্বামী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। কিন্তু স্রোত-হীন, পঙ্কিল, আগাছা-আচ্ছন্ন জলাশয়ের তুল্য আমাদের এই গতিহীন সমাজ দেহকে নাড়িতে হইলে বহু কর্ম্মীর প্রয়োজন। চরিত্র-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ-গণের এই প্রকার বার্ষিক তর্পণ চরিত্র-শক্তিমান্ কর্ম্মী, গড়িবার একটা উৎকৃষ্ট উপায়। আমাদের শাস্ত্র বলে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন। আমরাও মহাপুরুষগণকে যতই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব, জানিতে পারিব, ভাল বাসিতে পারিব, ততই তাঁহাদের মহদ্গুণের কিছু কিছু অংশ আমাদের চরিত্রে সঞ্চারিত হইবে। আজিকার উৎসবের মত উৎসবে যোগদান করার উদ্দেশ্য এই প্রকারে শক্তিলাভ করা।

যে সকল চরিত্র-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বঙ্গদেশে প্রাতুর্ভূত হইয়া জনসমাজের অশেষ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের স্থান অতি উচ্চ, এবং সময় সামগ্রী হিসাব করিয়া বোধ হয় বলা যাইতে পারে, বর্ত্তমান যুগের সমাজসেবক কর্ম্মবীরগণের মধ্যে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ। রামমোহন রায়ের অসাধারণ-চরিত্রশক্তি কি প্রকারে তাঁহাকে এতগুলি সৎকার্য্য সাধনে সমর্থ করিয়াছিল এখানে তাহার একটু মাত্র পরিচয় দিব। ষোল বৎসরের সময় তিনি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এই সূত্রে আত্মীয়দিগের সহিত রামমোহনের মনান্তর উপস্থিত হয়। মনান্তরের ফলে তিনি গৃহপরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশভ্রমণে বহির্গত হয়েন। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটি দেশ এমন কি তিব্বতেও ভ্রমণ করেন। পরে তাঁহার বিংশতি বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করেন। স্বভাবতঃ স্বাধীনচেতা যুবক রামমোহন রায়ের এই দেশ বিদেশ ভ্রমণ অসমসাহসের পরিচায়ক হইলেও, ইহাকে অনেকটা যুবজনসুলভ ঝোঁকের ফল বলিতে হয়; ইহাতে আমরা রামমোহনের প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় পাই না। কিন্তু ৩০ বৎসর বয়সের সময় যে দিন রাম-মোহন চাকুরী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া একরূপ স্থাণু হইয়া বসিলেন, সেই দিনই আমরা তাঁহার মহত্ত্বের বৃহত্ত্বের যথার্থ পরিচয় পাই। রামমোহন রায়ের জীবনচরিতকার লিখিয়াছেন—

"রামমোহন রায় ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃষ্টাব্দে) চল্লিশ বৎসর বয়সে কলি-কাতায় আসিয়া বাস করিলেন। এখন হইতেই তাঁহার জীবনের কার্য্য প্রকৃত রূপে আরম্ভ হইল। তাঁহার সমুদয় অবকাশ ও অর্থ, শরীর ও মন, জন্মভূমির

হিতসাধনব্রতে উৎসর্গ করিলেন। যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, তাঁহার অন্য কার্য্য ছিল না, অন্য চিন্তা ছিল না। ধর্ম্মসংস্কার সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি সকল প্রকার শুভকর কার্য্যেই তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পরিশ্রমেও কাতর ছিলেন না।”

এই যে “অন্য কার্য্য অন্য চিন্তা ছাড়িয়া অবকাশ, অর্থ, শরীর ও মন জন্মভূমির হিতসাধনে উৎসর্গ করিলেন” ইহা তিনি দায়িত্বহীন প্রথম যৌবনের ঝোঁকের মাথায় যখন বেশী কিছু দিবার ছিল না তখন করিলেন না। চল্লিশ বৎসর বয়সে, সংসার-বৃক্ষের সুখদুঃখরূপ সকল প্রকার ফলের স্বাদ গ্রহণ করিয়া, স্ত্রীপুত্র পরিজনের ভার পৃষ্ঠে লইয়া রামমোহন রায় কলিকাতায় লোকারণ্য মধ্যে এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাস-আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। ষোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগের দিন যে চরিত্র-শক্তির প্রথম উন্মেষ দেখা দিয়াছিল, চল্লিশ বৎসরে তাহার পূর্ণ পরিণতি। ২০ বৎসরব্যাপী গৃহস্থ-জীবনের বাধা বিপত্তি, ১০ বৎসরব্যাপী কলেক্‌টরীর সাধারণ আমলাগিরি চাকুরী, রামমোহনের চরিত্র-শক্তিরূপ বৃক্ষের ক্রমবৃদ্ধির কোনরূপ বাধা জন্মাইতে পারে নাই। চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় ফলফুলে ভরা সেই বৃক্ষ কলিকাতায় শিকড় গাড়িয়া বসিল। শত ঝঞ্ঝাবাত, সমাজের শত তাড়না, তাহাকে টলাইতেও পারিল না, তাহার শীতল ছায়ায় দেশের উন্নতির নানা পথ খুলিয়া গেল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় যে দিন কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, সেই দিন ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। ১৭ বৎসর কাল কলিকাতায় থাকিয়া এবং ৩ বৎসরকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া মহাত্মা রামমোহন কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, আশ্চর্য্য ত্যাগ এবং অতুলনীয় নির্ভীকতার সহিত স্বীয় মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিবার জন্য আপনাদের সকলকেই সানুনয় অনুরোধ করি। আমরা যখন ষোল হইতে বিশ বৎসরের যুবক, তখন আমরা স্বদেশের কত হিতানুষ্ঠানের কল্পনা করিয়া থাকি, সমাজের উন্নতির কত স্বপ্ন দেখিয়া থাকি. কিন্তু আর বিশ বৎসরের পরে সেই সকল কল্পনা, সেই সকল স্বপ্ন কোথায় বিলীন হইয়া যায়। আসুন, এই পুণ্যদিনে সকলে প্রার্থনা করি ৪০ বৎসর বয়সে যেন সমাজসেবাব্রতানুষ্ঠগণের উপযোগা চরিত্র-শক্তি আমরা লাভ করিতে পারি। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

গৌরী

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সরোজকুমার কলিকাতায় শিবনারায়ণ দাসের গলীতে একটি মেসে বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর একখানা কলিকাতা গেজেট, তাহাতে এম, এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমেই লাল পেন্সিলে চিহ্নিত নিজের নামটির পানে চাহিয়া মাঝে মাঝে তিনি ভবিষ্যতে কি করিতে হইবে তাহারই ভাবনায় তন্ময় হইয়া পড়িতেছেন।

পিতা ছিলেন ধনী, ইচ্ছা করিলে পুত্র কোন কাজকর্ম্ম না করিয়াও জীবনের কয়টা দিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিতে পারিতেন। তবুও কোন বিষয়ে পরের গলগ্রহ না হইয়া আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার জন্য তিনি মেসে থাকিয়াই আইন পড়িবার সঙ্কল্প করিলেন।

গ্রামে থাকিতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। মাঝে মাঝে গ্রামের নিরক্ষর সংকীর্ণচিত্ত লোকগুলির কথা তাঁহার মনে পড়িত। তাহাদের অজস্র নিন্দাবাদ করিয়াও তিনি তৃপ্ত হইতেন না। তাহারা দলাদলি, বিবাদ ও হিংসাদ্বেষ লইয়াই আছে; তাহারা মাথা তুলিয়া গ্রামের বাহিরের বৃহৎ জগতটির পানে চাহিতে জানে না, কতকগুলা অপ্রয়োজনীয় দুষ্ট সমাজনীতি মানিয়া আপনাদের ও সমগ্র হিন্দু জাতিকে তাহারা ধ্বংসের পথে প্রেরণ করিতেছে এই সব কথা মুখে বলিয়া যখন তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহাকে মাসিক পত্রের সম্পাদকগণের দ্বারস্থ হইতে হইত।

বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার দখল ছিল না। সেই জন্য প্রথমে ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিত হইল। দুই একজন বন্ধু সরোজকুমারকে বলিল—কোন বাঙ্গালী তাঁহার মত ইংরাজী লিখিতে পারে না।

এইরূপে সাহস পাইয়া সরোজকুমার একদিন একখানা মাসিকপত্রে "হিন্দুর ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলেন। অন্য পত্রে তাহার সমালোচনা বাহির হইল। সরোজকুমার তাহা পাঠ করিয়া বুঝিলেন সমালোচক তাঁহার যুক্তির দোষ দেখাইতে পারেন নাই; কেবল তাঁহার ভাষার নিন্দা করিয়াছেন।

সরোজকুমার কালবিলম্ব না করিয়া "বাংলা ভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে সমালোচকের চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কেহ কোন দিন ভাষার আদ্য অক্ষর পর্য্যন্ত

লিখিতে পারে নাই এ কথা সপ্রমাণ করিয়া তুলিলেন। বন্ধু বলিল—"তাঁহার ভাষা অতি সুন্দর, তিনি আড়ষ্ট বঙ্গভাষাকে একটা গতি ও বেগ দান করিয়াছেন।

দৃপ্ত শিক্ষিত যুবক—কেহ তাঁহাকে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না, কোন প্রকার বন্ধন এখন তাঁহার কাছে শিথিল, সুখভেদ্য।

রাত্রি সাতটা বাজিল। বেয়ারা একখানি পত্র আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। পত্র পাঠ করিয়া তিনি বুঝিলেন—তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, দশদিন পরে তাঁহার বিবাহ।

সরোজকুমার একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। পিতা যে উপযুক্ত পুত্রের মত না লইয়া বিবাহ জিনিষটাকে একটা তুচ্ছ সম্পর্ক মনে করিয়া সহসা যে কোন একটি কন্যাকে মনোনীত করিবেন ও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে, এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

সরোজকুমার স্থির করিলেন—তিনি পত্রের জবাব দিবেন না; বাড়ীও যাইবেন না, কিন্তু যেদিন পিতার দ্বিতীয় পত্র আসিল, সেদিন বঙ্গের ভবিষ্যৎ সংস্কারক তাহা অগ্রাহ্য করিলেও তাহার অন্তরের বালকটি পিতার ডাকে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিল না।

বাড়ীতে আসিয়া তিনি দেখিলেন—বিবাহের উৎসব-আয়োজন চলিতেছে। সকলের মুখেই একটা আনন্দের চিহ্ন বর্ত্তমান। সরোজকুমার মুখখানা গম্ভীর করিয়া আপনার কক্ষে আসিয়া বসিলেন।

অপরাহ্নে ফাল্গুনের অসংযত বাতাস নহবতের ইমন্ ভূপালী সুরের সঙ্গে সঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় পাশের বাড়ীর কিরণ দিদি আসিয়া বলিলেন "সরোজ, তোর সঙ্গে কার সম্বন্ধ হইয়াছে জানিস?"

সরোজকুমার বলিলেন "কই, এ বিবাহের কোন কথাই ত আমি জানি না।"

কিরণ দিদি বলিলেন "ও পাড়ার নন্দখুড়োর মেয়ে গৌরীকে দেখিয়াছিস ত?"

সরোজকুমার বলিলেন "না দেখিলেও চলিত, বিবাহ ত বন্ধ থাকিত না।"

কিরণ দিদি বুঝিলেন—বিবাহের সম্বন্ধ-ব্যাপারে সরোজের সহিত কোন পরামর্শ করা হয় নাই বলিয়া তিনি একটু চটিয়াছেন।

কিরণদিদি কোন কথা চাপিয়া রাখিতে পারেন না। কাজেই কথাটা ক্রমশঃ কর্ত্তার কাণে উঠিল।

কর্ত্তা গ্রামের জমিদার, পূর্ব্বপুরুষের ধনরাশি সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে

না পারিলেও তাঁহার বংশের মর্য্যাদা তিনি কথনও একটুও ক্ষুন্ন হইতে দেন নাই। নয়নপুরের চৌধুরীবংশ দাতা ও ভয়ানক ক্রোধী বলিয়া বিখ্যাত; কর্ত্তাও দানশীল ছিলেন, কিন্তু একবার রাগিলে কেহ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিত না।

সরোজকুমার, তাহার ছোট ছোট ভাইভগ্নী ও পাড়ার দুই একজন বর্ষীয়সী একটি কক্ষে বসিয়া আছেন, এমন সময় খড়মের শব্দে সকলকে চকিত করিয়া কর্ত্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন, গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন "সরোজ।"

সরোজ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কর্ত্তা বলিলেন "দেখ সরোজ, আমারই ব্যবস্থানুসারে তুমি আজ এম, এ পাশ করিয়াছ, এখন আমার ব্যবস্থামতে তোমার বিবাহও হউক ইহাই আমার ইচ্ছা; শুনিলাম—আজ তোমার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছার মিল হয় নাই বলিয়া তুমি দুঃখিত। যাই হোক, এখন তোমার বিবাহ দিবার ভার হইতে আমাকে মুক্ত থাকিতে বল কি?"

সরোজকুমার বলিলেন "আমি ত আপনাকে কোন কথাই বলি নাই।"

কর্ত্তা বলিলেন "আমি সে অধিকার এখনও তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি না। তুমি অন্য কাহারও নিকট আপনার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছ।"

সরোজকুমার বলিলেন "আমি কাহাকেও কোন কথা বলি নাই।"

কর্ত্তা বলিলেন "মিথ্যা কথা; যাহার নিকট আমি শুনিয়াছি, তাহার কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই নাই, তাই তোমার নিকট আসিয়াছি, নচেৎ আসিতাম না।"

সরোজকুমার চুপ করিলেন। কর্ত্তা বলিলেন "বল, তোমার বিবাহের সম্বন্ধ কি ভাঙ্গিয়া দিব?"

সরোজকুমার বলিলেন "আপনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "ভাবিয়া দেখ, তোমাকে দুই দিন সময় দিলাম—আমি একটা যা তা কথা শুনিতে চাই না।

খড়মের শব্দে স্তব্ধ স্থানটিকে মুখরিত করিয়া কর্ত্তা চলিয়া গেলেন।

২

সরোজকুমার বিবাহে আপত্তি প্রকাশ করিলেন না। যথাসময়ে বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

গৌরী দরিদ্রের কন্যা; তাহার পিতা শ্বশুরেরই জমীদারীতে কাজ করিতেন।

কিন্তু বিবাহের পর কর্ত্তা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ রামমোহন, তোমার সঙ্গে আর প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা রাখিতে চাই না। লক্ষ্মীপুরের উত্তরদিকের জমীটা তোমাকে দিলাম, তবে ভাই এক একবার দয়া করিয়া আমার জমীদারীটা দেখিতে হইবে।" সেই অবধি রামমোহন আর কর্ত্তাকে মুখে মনিব বলিয়া স্বীকার করিতেন না বটে, কিন্তু কার্য্যে তাঁহার দাসানুদাস হইয়া রহিলেন।

দরিদ্রের কন্যা হঠাৎ জমীদারের গৃহে আসিয়া প্রথমটা ত্রস্ত চকিত হইয়া উঠিল। তারপর শ্বশুরের স্নেহ, দেবর ও ননদের ভালবাসা তাহাকে জমীদারঘরের বড় বধু করিয়া তুলিল।

বিপুল সংসারকে কর্ত্রীহীন করিয়া যেদিন গৃহিণী ঠাকুরাণী মৃত্যুতরঙ্গে ভাসিয়া গেলেন, সেইদিন হইতে কর্ত্তা একটি উপযুক্ত পুত্রবধুর অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

নিজের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করিতেন না, থান কাপড় ও নামাবলী পরিধান করিয়া অবসরের অধিকাংশ সময়টুকু ঠাকুরদেবতার পূজা আরাধনা লইয়াই থাকিতেন ; এই সময়ে গৌরী শ্বশুরের সেবাশুশ্রূষা আরম্ভ করিল। আর তাঁহার যত্নের ক্রুটী রহিল না ; শ্বশুরের আহারের সময় সে কন্যার মত কাছে বসিয়া থাকিত, যাহাতে শ্বশুরের কোন বিষয়ে সামান্য অসুবিধাটুকু না হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিত। এই জন্য শ্বশুর মাঝে মাঝে বলিতেন " ... জন্মে আমার মা ছিল।"

গৌরী বিপুল চৌধুরী পরিবারের কর্ত্রীর পদটী অধিকার করিয়া ফেলিল ; কাহারও ভগ্নী, কাহারও অভাব পুরণ করিয়া সংসারের মধ্যে আপনাকে টুকরা দিয়া, সকলের মন সে আকর্ষণ করিল, কেবল সরে সম্পর্কটা কেমন শিথিল হইয়া গেল।

দাস, দাসী, ভ্রাতা, ভগ্নী, সকলেই কথায় কথায় তাহার সেও তাহাদের যত্ন করিয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশি স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিতেছে—এই সব দেখিয়া শুনি ভাবিলেন – পিতা তাঁহার বিবাহ দিয়া কন্যাটিকে সংস করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার চক্ষে বধু অপেক্ষা সংসা প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, তাহার স্বা রাখিয়াছেন, তাহার প্রতি মাঝে মাঝে যে যত্ন প্র অবলাটিকে সংসারের যুপকাষ্ঠে বলি দিবার জন্য।

তাঁহার শয্যা রচনায়
সরোজকুমার পূর্ব্বে গৃহ-
আজ অল্পক্ষণ অপেক্ষা
নকক্ষে উপস্থিত হইল।
শ করিত, তখন এক
বকাশ নাই। আজ
খানি পরিধান করিয়া
কুসুমের মাল্যে কেশ-
চিত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া
র অন্তরতম কথাগুলি
নায় ভরিয়া রাখিয়াছিল,
পত্তির মধ্যেও আপনাকে
ও তাহার আস্বাদ গ্রহণ
নোনিবেশ করিল। শয্যা

শুধু সুরোজকুমার একথা বুঝিল না। একদিন পূর্ণিমার অম্লান-শুভ্র জ্যোৎস্নায় পরিপ্লুত উঠানের প্রান্ত হইতে হেনারে গন্ধ যখন তাহার অন্তরে একটা আকস্মিক চঞ্চলতা আনিয়া দিল, তখন গৌরীও বুঝিল—এত আনন্দ, এত প্রতিপত্তির মধ্যেও তাহার অন্তরে কি একটা অভাবের বেদনা সঞ্চিত রহিয়াছে।

দরিদ্রের কন্যা জমীদারঘরের বড় বধূ ও গৃহিনী হইয়া প্রথমে যে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, সহসা তাহার গতি প্রতিহত করিয়া অন্তরের কোনখানে এই বেদনা কখন জাগিয়া উঠিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু বিচক্ষণ শ্বশুর মহাশয় তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেন, পুত্র ও পুত্রবধূর চালচলন দেখিয়া তিনি কতকগুলা কথা ভাবিয়া লইলেন।

একদিন ঠাকুরপূজা শেষ করিয়া গৃহকর্ত্তা কক্ষের বাহিরে একখানা আসনের উপর উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় বধূ তাঁহার জলযোগের জন্য কিছু মিষ্টান্ন সম্মুখে রাখিয়া গেল। শ্বশুর মহাশয় জলযোগের পর বধূকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন "বউমা, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।"

বধূ মাথাটি নীচু করিয়া বলিল "কি বাবা ?"

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন "দেখ মা, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, চৌধুরী পরিবা[illegible] মা হই[illegible]। তুমি দীর্ঘজীবী হও, ভগবানের কাছে ইহাই আমার

[illegible]া বধূ একটু চকিত হইল। শ্বশুর মহাশয় বলিতে
[illegible]মাকে একটা কথা বলিব।"

[illegible] বাবা ?" শ্বশুর মহাশয় বলিলেন "দেখমা, শুধু
[illegible] স্ত্রীর ধর্ম্ম নয় ; মা, তুমি এতবড় সংসারটিকে বশে
[illegible] হতভাগা ছেলেটিকে বশে আনিতে পারিলে না ?"

[illegible] করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। একটা সঙ্কোচ ও
[illegible]খ মলিন হইয়া গেল।

[illegible]। বধূ আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া চৌধুরী পরি-
[illegible] বালিকার মত শয্যায় মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া
[illegible]ল আবেগ দমন করিয়া যখন সে বাহিরে আসিল তখন,
চৌধুরী পরিবারের জন্য প্রাণপন পরিশ্রম করার
[illegible]য় তাহার আছে। সে কাজ পরের জন্য নয়, সে
[illegible]নার সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য !

এতদিন সে চৌধুরী পরিবারের মধ্যে আপনার আসনটিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নেশায় মাতিয়া উঠিয়া এদিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পায় নাই, আজ সে বুঝিল—সে সত্য সত্যই একটা ভুল পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, এখন এমন একটা স্থানে উপনীত হইয়াছে যেখান হইতে তাহার অন্তরের ঈপ্সিত জিনিসটি মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় না। বিবাহরাত্রের কথা মনে পড়িল। জমিদারের বাড়ী বিবাহ এই কথাটাই তাহার অন্তরে এমন একটা ঝটিকা আনিয়া দিয়াছিল, যাহাতে তাহার বিবাহের পরবর্ত্তী জীবনের সুখস্বপ্নটুকু শরতের ক্ষীন শুভ্র মেঘখানির মত একটুও স্থির হইতে পারে নাই। আজ সে বিপুল পরিবারের মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া নববধূর ভাবনা ভাবিয়া-ভাবিয়া দেখিল—বিবাহের পর দীর্ঘ তিন বৎসর ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

(৪)

সরোজকুমার গ্রীষ্মের ছুটির সময় বাড়ী আসিয়া দেখিলেন—তখনও বসন্তের শেষ চিহ্ন বর্ত্তমান—তবে পৃথিবীর উপর যে পূজার উপকরণগুলি সজ্জিত ছিল, তাহার গন্ধপুষ্প পূজান্তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া হোমানলে মলিনশ্রী ধারণ করিয়াছে।

রাত্রে শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি দেখিলেন—তাঁহার শয্যা রচনায় একটু নুতনত্ব রহিয়াছে—আজ ঘর সুগন্ধে পরিপূর্ণ। সরোজকুমার পূর্ব্বে গৃহকর্ম্মরতা গৌরীর সাক্ষাৎ বড় একটা লাভ করিত না। আজ অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিতে-না-করিতেই সে গৃহকর্ম্ম শেষ না করিয়াই শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে কর্ম্মক্লান্ত শরীরে সঙ্কোচনত মুখে সে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিত, তখন এক দিনও বেশের পরিপাট্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ নাই। আজ সরোজকুমার দেখিলেন—সে তাহার বিবাহবাসরের কাপড়খানি পরিধান করিয়া গৃহসংলগ্ন উদ্যানের বসন্তসম্ভারের অবশিষ্ট কয়েকটি শীর্ণ কুসুমের মাল্যে কেশবন্ধন যথাসম্ভব শোভিত করিয়া চিরাগত অতিথির মত সঙ্কুচিত হৃদয়ে দাঁড়াইয়া আছে। সরোজকুমার তাহার নীরব অবনত মুখে অন্তরের অন্তরতম কথাগুলি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। গৌরী যাহা এতদিন শুধু কল্পনায় ভরিয়া রাখিয়াছিল, যাহা না পাইয়া এত সমৃদ্ধি, এত গৌরব, এত প্রতিপত্তির মধ্যেও আপনাকে দীনদরিদ্র ভাবিয়াছিল, সেই স্বামীর আদর লাভ করিয়াও তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিল না।

পরদিন সে সংসারের কাজে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোনিবেশ করিল। শয্যা

রচনা ও বেশভূষায় আর তাহার নূতনত্ব দেখা গেল না। আবার (কর্ম্মের স্রোতে আপনাকে অসহায় ভাবে ভাসাইয়া দিতে দ্বিধা করিল না।

যথাসময়ে সরোজকুমার কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। গৌরীরও সংসা কর্ম্মের নেশা কাটিয়া গেল। সরোজকুমার তাহা দেখিতে আসিলেন না, তি ভাবিলেন—সে চৌধুরী পরিবারের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া তাহা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনার সমস্ত চেষ্টাযত্নকে আবদ্ধ করিয়া আত্মঘাত হইয়াছে।

সরোজকুমার আবার গৃহে আসিলেন, তখন গৌরী আবার উৎফুল্ল হইয় উঠিল। কিন্তু তারপর যখন স্বামী স্ত্রীর নিকট আসিল, তখন স্ত্রীর প্রত্যাশি উৎফুল্লতা সহসা বিলীন হইয়া গেল।

কেন না সেদিন রাত্রে সরোজকুমার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন "তোমাকে মাটী পুতুল বলিয়া বোধ হয়, তোমার প্রাণ নাই, তেজ নাই, কোন বিষয়ে কো মতামত নাই, আমার একটি স্ত্রী-বন্ধু আছেন তিনিত এমন নন্?"

স্ত্রী-বন্ধুটা কিরূপ তাহা গৌরী বুঝিতে পারে নাই, কাজেই কথাটা তাহা একটা স্ত্রীসুলভ আকুলতা আনিয়া দিয়াছিল।

সরোজকুমার কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, সে ভাবিল—সে দরিদ্রের কন্যা কোন মতেই জমীদারপুত্রের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত নয়। স্বামী যে তাহাকে পছন্দ করিবে না একথা ত অসম্ভব নয়। পিতামাতা বলিয়াছেন—গৌরী ভাগ্যবতী, কিন্তু আজ সে মনে করিল—জমীদারঘরের বধূ হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলেই সে আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতে পারিত।

দিনকতক সে খুব বিমর্ষ ভাবে পরের মত বাড়ীর এদিকে-সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, এক দিন গৃহকর্ত্তা তাহাকে বলিলেন "বৌমা, তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?"

বৌমা "কিছু ত হয়নি বাবা" বলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, তারপর আর সে অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিল না।

অনেক দিন কাটিয়া গেল, তবুও সরোজকুমার বাড়ী ফিরিলেন না। পিতা পত্র লিখিলেন, পুত্র উত্তর দিল—আমি পড়াশুনায় ব্যস্ত আছি; দিন কতক পরে পিতা লিখিলেন—বড় হইয়াছ, পড়াশুনা ছাড়াও অন্য কাজ আছে, তুমি বাড়ী আসিবে। পুত্র লিখিল—বাড়ী গেলে আমার কতকগুলা কাজের ক্ষতি হইবে। দিনকতক পরে পিতা একখানি রেজেষ্টারী খামে পুত্রকে লিখিলেন—আগামী

১লা আশ্বিন তুমি যদি বাড়ীতে না আস, জানিয়া রাখিও ভবিষ্যতে আমার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক থাকিবে না ।

(৪)

সরোজকুমার কলিকাতায় নব্য সম্প্রদায়ের সঙ্গলাভ করিয়া শান্ত গ্রাম্য জীবনকে খুবই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। আচারনিষ্ঠ পিতাকে দেখিয়া অনেক সময়ে তাঁহার মনে হইত—তিনি একটা ভুল পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা ছিল, পিতা যখন নামাবলী পরিয়া ঘণ্টা নাড়িতে-নাড়িতে তাঁহার আরতি করিতেন, তখন সরোজকুমার ভাবিতেন—শালগ্রামের আরতি করিয়া কোন লাভ নাই, শিলাখণ্ড কখনও ভগবান হইতে পারে না—এ সব কথা জানিয়া শুনিয়াও লোকে সত্যের চেয়ে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয় কেন ? পিতা গোঁড়া হিন্দু ; শূদ্রের বাটীতে আহার করেন না ; ভগবান ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ভিন্ন করিয়া গড়েন নাই, তবুও মানুষ এমন বাঁধাধরা নিয়ম প্রস্তুত করিয়া সমাজকে নিষ্পেষিত করিতে চায় কেন ?

দৃপ্ত অদূরদর্শী যুবক—যাহা ভাবে তাহাই কাজে পরিণত করিতে চায়। পিতার উপর যখন তাহার একটা ক্রোধ ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, পিতা যখন তাহার অমতে তাহারই জন্য একটা বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া নিজের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিলেন, তখন তিনি যথাসময়ে বাধা না দিতে পারিয়া এমন একটা কাজ করিতে চাহিলেন, যাহাতে পিতার অব্যাহত অসংযত শক্তি নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিহত হয়।পিতা যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন, তাহাকে তিনি গ্রাহ্য করিলেন না, বাড়ী না আসিয়া পিতার অবাধ্য হইলেন, তারপর আরও একটা এমন কাজ করিয়া বসিলেন, যাহার জন্য পিতার সহিত তাঁহার চিরবিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা হইল।

বালেশ্বর জেলার একটি গ্রামের এক দরিদ্র পরিবার সহসা কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের নব্য তন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পুরাতন সমাজের খোলস ছাড়িয়া সবে মাত্র নূতন সমাজের পরিচ্ছদ মাঝে মাঝে পরিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনুকরণের পালা এখনও শেষ হয় নাই, এমন সময় হঠাৎ সরোজকুমারের সহিত তাহাদের আলাপ হইল। পরিবারের সকলের চেয়ে দৃষ্টি আর্কষণ করিল—একটি কন্যা। সে সুবর্ণরেখার কূলে কূলে বালি জড় করিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, হঠাৎ কলিকাতার জাঁকজমক অথবা তাহার বয়স সর্ব্বশরীরে একটু অনুভবযোগ্য ধীরতা আনিয়া দিয়া-

ছিল। সরোজকুমার তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন, তারপর স্ত্রীলোকের যে ভাবে শিক্ষিত হওয়া উচিত, সেই ভাবে তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

সরোজকুমারের পড়াশুনা একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল, সে দিনে ও রাত্রে মুরলার শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইল।

এই সময় একদিন সে গৃহে যায় নাই বলিয়া পিতার পত্র পাইল সেই দিন সে যে কন্যার পাণিপ্রার্থী একথা মুরলার পিতাকে জানাইয়াছে, মুরলার পিতাও তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। ক্রমশঃ ১লা আশ্বিন বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

মুরলার পিতা অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিতে পারিলেন—তাঁহার ভাবী জামাতা বিবাহিত, তখন তিনি বিবাহ বন্ধ করিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। ১লা আশ্বিন সরোজকুমার ও মুরলা অদৃশ্য হইয়া গেল। মুরলার পিতা এই সব কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া পড়িলেন, ঘটনাটা যথাসম্ভব গোপন রাখিয়া কন্যার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই তিন দিন পরেই তিনি পত্র পাইলেন—সরোজকুমার ও মুরলা তাঁহার গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ও প্রচার করিয়াছে তাহারা পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ। এই দুর্দ্দান্ত দুঃসাহসিক যুবকের কার্য্যে ভীত হইয়া ও কন্যার অন্যত্র বিবাহ হইলে গ্রামে যে কথা প্রচার হইয়াছে তাহাতে সকলেই মুরলাকে নিন্দনীয় মনে করিবে স্থির করিয়া মুরলার পিতা কন্যার সহিত সরোজকুমারের বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

১০ই আশ্বিন বিবাহ শেষ হইয়া গেল। ১২ই আশ্বিন সরোজকুমার পিতাকে অপমানিত করিবার জন্যই নববধূর সহিত পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন।

(৬)

তখন রাত্রি দশটা ; বাহিরে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, দরজায় অবিরত ঘা পড়িতে লাগিল।

ঝি আসিয়া দ্বার খুলিল। কর্ত্তা খাটের উপর বসিয়া উপনিষৎ আবৃত্তি করিতেছেন, তিনি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আসে ?"

ঝি বলিল "দাদাবাবু"। কর্ত্তা বলিলেন "দরজা বন্ধ করিয়া দাও, আসিতে দিও না।"

ঝি বলিল "সঙ্গে একটি মেয়ে।"

কর্ত্তা চাপা গলায় বলিলেন "কন্যাটি কে জিজ্ঞাসা কর।"

ঝি বলিল "বউ গো, বাবা, তোমার বউ।"

কর্ত্তা দৃঢ়স্বরে বলিলেন "আমার বউ ঘরে আছে, উহারা চলিয়া যাক্।"

এরূপ ঘটনা যে একটা নিশ্চয়ই ঘটিবে তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়া সরোজকুমার একটা আশ্রয় ঠিক করিয়াছিলেন। গাড়ী সেইখানে চলিয়া গেল। কর্ত্তা শাঙ্করভাষ্যে মনোনিবেশ করিলেন।

গৌরী সব কথাই শুনিল। যন্ত্রচালিতের মত গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে সে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না।

মুরলাকে লইয়া দিন কতক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বাস করিয়া সরোজকুমার কলিকাতায় একটি স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এখন মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লেখাই তাঁহার বিশেষ কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল।

এই সময়কার সাংসারিক জীবনের ইতিহাসটা আমরা ভাল করিয়া জানিতে পারি নাই। তবে এটুকু শুনিয়াছিলাম—সরোজকুমার যদি পিতার উপর না রাগিত, তাহা হইলে বোধ হয় এই কন্যাটিকে বিবাহ করিত না। মুরলা সুন্দরী ছিল—কিন্তু হিন্দুঘরের বাঙ্গালী মেয়ের মত সেও কতকটা পুত্তলিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল।

তবে গৌরীর মত সে নীরব, শান্ত ও ধীর ছিল না। কথায়, হাস্যে ও চালচলনে তাহার এমন একটু বিশেষত্ব ছিল, যাহাতে সরোজকুমার নব্যতার এতটা অন্ধ পক্ষপাতী না হইলে মুগ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু মুরলা যখন আসিল, তখন সরোজকুমারের অন্তরে যে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রশমিত করিয়া স্বামীর উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবার উপযোগী গুণ তাহার ছিল না, অথবা সে গুণ থাকিলেও তাহা কার্য্যে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাহার অল্পই ছিল; কেননা রুগ্ন পিতামাতার সন্তান বলিয়া তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, বিবাহের পর সহসা তাহার দেহে যে লাবণ্য পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, কিছুদিন কাটিতে-না-কাটিতেই তাহা ক্রমশঃ মলিন হইতে আরম্ভ করিল।

মাতার ছিল যক্ষ্মারোগ; সেই জন্য কন্যা থাকিয়া থাকিয়া প্রায়ই বুকের রোগে কষ্ট পাইত; ক্রমশঃ সে কৃশ হইতে লাগিল। সরোজকুমার প্রথম প্রথম তাহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন; কিন্তু যত দিন কাটিতে লাগিল, ততই নূতন পত্নীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিল।

মুরলা সপত্নীকে দেখিতে ইচ্ছা করিত; সেও যে তাহারই মত অনাদৃতা তাহার ইতিহাস সে কতকটা শুনিয়াছিল। সে বুঝিল—শীঘ্রই তাহাকেও গৌরীর দশায় উপনীত হইতে হইবে। তবে গৌরীর আশ্রয় আছে; তাহার যে পিতামাতা

দরিদ্র ; হায়, পুড়িয়া দগ্ধ হইলেও তাহার জতুগৃহ ছাড়া আর আশ্রয় নাই।

একদিন শীতের রাত্রে মোটর গাড়ীতে চড়িয়া স্বামী-স্ত্রী সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন মুরলার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, তিনি বলিলেন "সামান্য শীতে এত কাঁপিতেছ, কিরূপ তোমার শরীর ?" মুরলা বলিল "গাড়ীতে বড়ই ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।"

পরদিন মুরলার জ্বর হইল ; কাশীর সঙ্গে সঙ্গে সে বুকে একটা বেদনা অনুভব করিল। সরোজকুমার দেখিলেন—মুরলাকে যত্ন করিবার লোক তিনি ছাড়া আর কেহই নাই। অথচ তাহাকে রীতিমত দেখিতে হইলে সকল কাজ পরিত্যাগ করিতে হয়। পিতা খরচ পাঠাইতেন না ; কাজেই তিনি কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি একবার গৌরীকে আনিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তখনই মনে হইল—পিতা তাহাকে পাঠাইবেন না।

কেন পাঠাইবেন না ? আমার স্ত্রীকে ঘরে বন্দিনী করিয়া রাখিবার কি অধিকার তাঁহার আছে ? এই কথাগুলি হঠাৎ একবার সরোজকুমারের অন্তরের ক্রোধবহ্নি দ্বিগুণ প্রজ্জলিত করিয়া দিল।

মুরলার জ্বর বাড়িতে লাগিল ; বাড়ীতে একটি ঝি ; সে মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া যাইত ; সন্ধ্যার পর সরোজকুমার তাহার কাছে আসিয়া বসিতেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিবার পর সরোজকুমার রোগীর সেবা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। একদিন মুরলা একটু সুস্থ ছিল, সে দিন কথায়-কথায় তিনি তাহাকে বলিয়া ফেলিলেন—তোমাকে বিবাহ করিয়া অবধি একদিনও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না।

কথাটা মুরলার অন্তরে দারুণ আঘাত করিল, সে বলিল "আমি বুঝিতেছি—আমাকে লইয়া তুমি কষ্ট পাইতেছ ; ভগবান যদি একটু শীঘ্র আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করেন, আমি সুখী হই।"

সরোজকুমার বলিলেন "আমি সে কথা ভাবিতেছি না, তবে তুমি সুস্থ হইলে আমার আর কোন দুঃখই থাকে না।

মুরলার শুষ্ক মুখমণ্ডলে চক্ষু দুটি উজ্জলতর হইয়া উঠিল, সে বলিল "যদি সুস্থ না হই"—

সরোজকুমার বলিলেন "তুমি নিশ্চয়ই সুস্থ হইবে।" আর একদিন অপ-

রাহ্নে মুরলার কক্ষের বাহিরে ছাদের উপর একটি আম্রবৃক্ষের নিবিড় ছায়া প্রসারিত হইয়াছে; কোথা হইতে বাতাসের সঙ্গে একটা সুগন্ধ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরে যাইবার পথ পাইতেছে না, এমন সময় মুরলা স্বামীর পাদুটি জড়াইয়া বলিল "দেখ, আমি বাঁচিব না, আমার একটা কথা রাখিবে ?"

সরোজকুমার বলিল "কি ?"

মুরলা বলিল "সপত্নীকে আমি দেখি নাই, তাহার সহিত যাহাতে আমার দেখা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পার ।"

সরোজকুমার বলিলেন "কেন ?"

মুরলা বলিল "কেন বলিতে পারিব না, বোধ হয় তাহাকে দেখিলে আমার যন্ত্রনা কমিবে ।"

সরোজকুমার বলিলেন "তুমি দুঃখ করিও না ; আমি তোমার ইচ্ছা পুর্ণ করিব ।"

তখন অপরাহ্নের সূর্য্য পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া: রুধিরাপ্লুত আসন্নমৃত্যু অবসন্ন সেনাণীর মত ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল । সরোজকুমার জানালার পাশে দাঁড়াইয়া নিস্পন্দভাবে অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন ।

(৭)

প্রভাতে ঝি একখানি পত্র আনিয়া দিল । গৌরী তাহা পাঠ করিয়া বুঝিল —স্বামী তাহাকে বিস্তর অনুনয় করিয়া জানাইয়াছেন—কোন উপায়ে শ্বশুরের অনুমতি লইয়া তাহাকে কলিকাতায় স্বামিগৃহে আসিতে হইবে ।

স্বামীর নিকট তীব্র অপমান লাভ করিয়াও সে তাঁহার অভাবে দুঃখ অনুভব করিত, তবুও এই নিমন্ত্রণপত্রটি সে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিল না । সামান্য একটু কাগজে কয়েকটা অক্ষর তাহার অন্তরসঞ্চিত নিবিড় বেদানকে চঞ্চল করিয়া তুলিল ।

গৌরী পত্রটি লইয়া একমনে পড়িতেছে, সহসা তাহা কর্ত্তার নজরে পড়িল ; তিনি বলিলেন "কে পত্র দিল, বৌমা ।"

গৌরী কোন কথা বলিতে পারিল না । কর্ত্তা বলিলেন "কে মা ? সরোজ কি কিছু লিখিয়াছে ।"

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল "হাঁ, বাবা ।"

কর্ত্তা বলিলেন "কি লিখিয়াছে বল ত মা ।"

গৌরী বলিল "আমাকে কলিকাতায় যাইতে বলেন।"

কর্ত্তা বলিলেন "তোমার যাইতে ইচ্ছা করে, জমিদারপুত্রের খোষামোদ করিতে রাজী আছ ?"

গৌরী চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখে একটা তেজ, একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কঠোরতা ফুটিয়া উঠিল।

কর্ত্তা বলিলেন "আমি ইচ্ছা করি মা, তুমি যাও ; কিন্তু সেই হতভাগা ছেলের কাছে যে অপমান তুমি মাথা পাতিয়া লইয়াছ, তাহার পর, তোমাকে আবার তাহার কাছে যাইতে বলিবার সাহস নাই।

গৌরী স্থিরভাবে অনেকক্ষণ মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বলিল "বাবা, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

পরদিন প্রভাতে কর্ত্তা লোকজন সঙ্গে দিয়া বধূকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

স্বামী কেন ডাকিয়াছেন, গৌরী তাহা বুঝিতে পারে নাই ; তবুও শ্বশুরের ইচ্ছায় মনের সমস্ত কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া যখন সে পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন প্রতি মুহূর্ত্তে একটা পুলকের আবেগও অন্তরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সেদিন শরতের আকাশে একটিও মেঘ ছিল না। সূর্য্যের আলোকে, বৃক্ষলতার শ্যামল আভায়, ধূলিহীন বাতাসে যে প্রসন্নতা প্রকাশ পাইতেছিল, ক্রমশঃ তাহা গৌরীর অন্তরেও প্রসারলাভ করিতে লাগিল। গাড়ীর ফাঁক দিয়া সে দেখিল —দুই দিকে দিগন্তচুম্বী হরিৎশস্যক্ষেত্র বায়ুভরে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে ; মাঝে মাঝে এক একটি দীর্ঘ সরল বাঁশের বন ; দেখিতে দেখিতে তাহার অন্তরে কি একটা ভাব জাগিয়া উঠিল—মুখ অঞ্চলে আবৃত করিয়া সে চোখ বুজিল ; সে মনে করিল—স্বামী যদি তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা না কয় তাহা হইলেত তাহার দুঃখের অবধি থাকিবে না।

স্বামীর জন্য তাহার প্রাণ বহুদিন হইতেই ব্যাকুল হইয়া আছে। কেবল তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহার স্মরণ করিয়া সে মাঝে মাঝে মর্ম্মের বেদনাকে দমন করিতে চেষ্টা করিত। মাঝে মাঝে স্বামীর প্রতি একটা দারুণ ক্রোধও তাহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিত।

হঠাৎ সে একটু রাগিয়া গেল, ভাবিল স্বামী যদি তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা না কয়, তাহা হইলে দুঃখের কোন কারণ নাই। সেত চিরকালই অনাদৃতা, আজ ত সে স্বামীর আদর পাইবে বলিয়া কলিকাতায় যাইতেছে না। স্বামী

ডাকিয়াছেন, তাঁহার কাজ আছে, সেই কাজ—শুধু কর্ত্তব্যটুকু করিতে যাইতেছে ; কর্ত্তব্য শেষ হইলে আবার ফিরিয়া আসিবে।

গাড়ী সরোজকুমারের গৃহদ্বারে থামিল। গৌরী সাহসে ভর করিয়া নিঃসঙ্কোচে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, কেহ তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে বা কেহ পথ দেখাইয়া কক্ষে লইয়া যাইবে এ সব বিষয় একটুও ভাবিল না।

সরোজকুমার যে ঘরে রুগ্ন পত্নীর শিয়রে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিলেন, গৌরী সহসা তপঃপ্রসন্না বরদাত্রীর মত তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল "আমায় ডাকিয়াছ কেন ?"

সরোজকুমার চকিতের মত বলিয়া ফেলিল "তোমার এই ভগ্নীটির শুশ্রূষা করিতে হইবে।"

গৌরী শীর্ণ শবাকার ভগ্নীটির তপ্ত ললাট স্পর্শ করিল, তাহার জীর্ণ বক্ষ-পঞ্জরে হাত বুলাইয়া দিল। তারপর তাহার দুর্ব্বল শিশুটিকে অপর ঘরে দুধ খাওয়াইল। সে পূর্ব্ব কথা সব বিস্মৃত হইয়া, কোন বিষয়ে স্বামীর অপেক্ষা না করিয়া আপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সরোজকুমার বসিয়া-বসিয়া গৌরীর কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, গৌরীর নিকট তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

গৌরী শ্বশুরকে একখানি পত্র লিখিল—"বাবা, আপনি একবার এখানে না আসিলে একটী স্ত্রীলোক ও তাহার পুত্রটির প্রাণনাশের সম্ভাবনা।"

দুই দিন পরে "বৌমা কোথায় গা" বলিতে বলিতে দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ, তেজস্বী ব্রাহ্মণ উপরে উঠিয়া আসিলেন। গৌরী গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পুত্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। গৃহকর্ত্তা মুরলার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ ভাল ডাক্তারের বন্দোবস্ত হইল। তিনি অনেকক্ষণ মুরলার নিকট বসিয়া ডাক্তারের কথাও শুনিলেন। একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারীর হতে অর্থাদি রাখিয়া, রোগিনীর সকল সংবাদ যথাসময়ে পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সরোজ আপনার ঘরে পরের মত বসিয়া-বসিয়া সব ব্যাপারই দেখিতে পাইলেন।

ঘরে আপনার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় শায়িত—যে সে স্ত্রী নয়—কেহ তাহাকে পছন্দ করিয়া সরোজকুমারের অনুমতি না লইয়া, শুধু কতকগুলা মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেয় নাই, ইহাকে সরোজকুমার নিজে পছন্দ করিয়াছেন, নিজে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার সহিত বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব নিজের

উপর। আজ স্বামী বর্ত্তমান থাকা সত্বেও সে আজ অনাথা, অন্যলোকে তাহার সেবা করিতেছে—একজন সপত্নী, একজন শ্বশুর—যাহাদের সহিত এই বিবাহের কোন সম্পর্কই নাই। সরোজকুমার নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, অথচ তাহার পত্নীর কোন সেবাশুশ্রূষার ত্রুটি হইল না।

গৌরী মুরলার শুষ্ক মুখ ও স্পন্দিত বক্ষপানে চাহিয়া যখন স্বামীকে মাঝে মাঝে সে ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতে দেখিত, যখন মুরলা কখন-কখন বহু কষ্টে মাথা তুলিয়া একজনকে দেখিতে পাইবে বলিয়া এদিকে-সেদিকে চাহিত ও নিরাশ হৃদয়ে আবার মস্তক উপাধানে রক্ষা করিয়া দুই হাতে গৌরীর কণ্ঠ বেষ্টন করিত, তখন গৌরী একবার আপনার কথা ভাবিত না এমন নয়। তাহার অন্তরে যে বেদনা সঞ্চিত ছিল, তাহা সম্মুখের বেদনার স্তূপ-টিকে দুই হাতে সময়ে সময়ে জড়াইয়া ধরিয়া সে কিয়ৎ পরিমাণে ভুলিয়া যাইত। একদিন মুরলা বিকারের ঘোরে সহসা গৌরীর পাদুটি ধরিয়া তাহার মুখপানে শূন্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কি একটা কথা বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না।

আর একদিন অন্তরের কথাটা তাহার প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে দিন সে গৌরীকে বলিল "দিদি, আমার ছেলেটিকে তোমার হাতে দিলাম।"

সেই দিন রাত্রে মুরলা পৃথিবীর সকল দুঃখবেদনার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিল।

দুই চারি দিন পরে গৌরী স্বামীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "বাবা আমাকে বাড়ী যাইতে বলিয়াছেন, আমার একটা কথা রাখিবে?"

সরোজকুমার বলিলেন "বল।"

গৌরী বলিল, "আমি তোমার ছেলেটিকে লইয়া যাইব, তুমিত উহাকে পালন করিতে পারিবে না।"

সরোজকুমার অনেকক্ষণ চুপ করিয়াও কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না, তারপর হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন "বেশ, লইয়া যাইও।"

পরদিন গৌরী শ্বশুরালয়ে চলিয়া আসিল।

(৮)

প্রভাতে স্নান সমাপন করিয়া গৃহকর্ত্তা উদাত্ত সুরে স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় মুরলার শিশুটি সূর্য্যের আলোক দেখিয়া অধীর আনন্দে কক্ষের বাহিরে আসিয়া কোন মতে শিথিল পদদ্বয়ের উপর দেহভার রাখিয়া দাঁড়াইয়া

উঠিল, প্রভাতের আলোকের মতই তাহার হাসিটুকু ওষ্ঠে, গণ্ডে বিকশিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল, গৃহকর্ত্তা তাহাকে কোলে তুলিয়া লাইলেন।

গৌরী বলিল "বাবা আমার কাজ শেষ হইয়াছে, আমি খোকাকে কোলে লইতেছি।"

গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "বউমা, আমি খোকাকে কোলে করিলে তুমি অত ব্যস্ত হও কেন মা?"

গৌরী উত্তর দিতে পারিল না, কর্ত্তা জানিতেন—খোকা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত নয়, তারপর মুরলার সহিত সরোজকুমারের যে বিবাহ হইয়াছে, তাহাকে তিনি শাস্ত্রসম্মত বিবাহ বলিতে রাজী নন। তিনি বুঝিলেন—গৌরী সেই জন্যই খোকাকে কোলে করিতে দেয় না।

তিনি বলিলেন, "না মা, তুমি ভাবিও না, আমি যে দেবতার পূজা করি তিনি সব প্রাণীকেই সমভাবে দেখেন, আমাদের শাস্ত্রও এত নিষ্ঠুর নয় যে সে নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দানে বাধা দিবে।"

গৌরী আশ্বস্ত হইল। মুরলার শেষ কথাগুলি তাহার অন্তরে কেবলই দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার কথামত খোকাকে লালন পালন করিয়া এই নিঃসন্তান যুবতী তাহার অন্তরের কোষবদ্ধ মাতৃত্বটুকু কখন ফুটিয়া উঠিল, কখন্ তাহা গন্ধে বর্ণে তাহার সমস্ত মন-প্রাণ, অন্তর-বাহির পরিপূর্ণ করিয়া নূতন জ্ঞান, নূতন দৃষ্টিক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে নাই। আজ সে বুঝিল—এত দিনে খোকাকে ভাল বাসিয়া অন্তরে অন্তরে সে একটু স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল; যাহার ধনে সে ধনী, যাহার জ্ঞানে তাহার জ্ঞান, তাহার শক্তিতে সে শক্তিমতী, যাহার অস্তিত্বে তাহার অস্তিত্ব বিলীন, সেই আরাধ্য পিতৃপ্রতিম শ্বশুরকে ছাড়িয়া সে একটা স্বতন্ত্রতা অনুভব করিয়াছিল; এই ভাবে আর দিনকতক কাটিলে খোকাটি পুত্রবধূ ও শ্বশুরের মধ্যে একটা দারুণ ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু আজ গৌরী বুঝিতে পারিল—তাহার স্বাতন্ত্র্য শ্বশুরের ব্যক্তিত্বে প্রতিহত হয় নাই, বরং তাহাতেই বিলীন হইয়া গিয়াছে।

কর্ত্তা পূজা করিতে চলিয়া গেলেন। গৌরী খোকাকে বুকে করিয়া নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার অন্তরে একটা পুলকের চাঞ্চল্য ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সে বুঝিল—তাহার স্বামী একটা অন্যায় অসত্য স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া ব্যর্থতার অসহ বেদনা সহিতেছে—আর তাহার স্বাতন্ত্র্য পরতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও সার্থক।

তারপর গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া শ্বশুরের মধ্যদিনের ক্রিয়াকর্ম্মের আয়োজন করিয়া গৌরী যখন পট্টবস্ত্রে লক্ষ্মীর মত সাজিয়া ঠাকুরঘরে শালগ্রাম শীলার সম্মুখে প্রণত হইল, তখন তাহার দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল। কেন তাহার প্রাণে এ আবেগ আসিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

আহারান্তে খোকাকে কোলে করিয়া যখন সে বিশ্রামশয্যায় শয়ন করিল, তখন খোকা হাসিতেছিল, দালানের বাতাস পাশের নেবু গাছটির পুষ্পগন্ধ বহিয়া বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া তাহার কেশগুচ্ছ ঈষৎ চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। হঠাৎ সে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, খোকা হাসিল, মাতিল, হাত পা ছুঁড়িয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল; গৌরীর নয়নপ্রান্ত হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল—তাহার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে কে যেন বলিয়া দিল—সে স্বামীর অনাদৃতা, তাহা না হইলে ভগবান্ তাঁহার :আশীষস্বরূপ এমন একটি শিশুই তাহাকে দান করিতেন।

গৌরী তৎক্ষণাৎ অশ্রু মুছিয়া ফেলিল, ভাবিল—কেন আমার ত পুত্র আছে। একটা চিন্তা সে দূর করিয়া দিল; কিন্তু সে যে স্বামীর অনাদৃতা একথা সে ভুলিতে পারিল না।

এমন সময় কর্ত্তা দ্রুতপদে ভিতরে আসিয়া বলিলেন "বউমা, আমি চলিলাম ফিরিতে বিলম্ব হইবে।

গৌরী বলিল "কেন বাবা?"

কর্ত্তা বলিলেন "বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তী কাল রাত্রে মারা গিয়াছে, এখনও তাহার শব বাহির করা হয় নাই।"

গৌরী জানিত—বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিয়াছিল বলিয়া পাড়ার লোকেরা তহোকে এক ঘরে করিয়াছিল; সেই জন্য তাহার শব কোন লোক স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না। আজ আচারনিষ্ঠ শ্বশুরকে সেই কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া গৌরী অন্তরে একটা গর্ব্ব অনুভব করিল। শ্বশুরের প্রতি তাহার ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া গেল। অন্ধকারে নক্ষত্রখচিত অমাবস্যার আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া সে ভক্তি-বিহ্বল হইয়া কাহাকে প্রণাম করিল সেই জানে।

(৯)

সমস্ত রাত্রি শ্মশানঘাটে কাটাইয়া গৃহকর্ত্তা যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন আকাশের পূর্ব্ব প্রান্তে আলোক দেখা দিয়াছে। ডাকাডাকি করিয়া ঝি চাকরদের

নিদ্রা না ভাঙ্গিয়া তিনি চণ্ডীমণ্ডপে আসনশূন্য হইয়াই উপবেশন করিলেন; সম্মুখের বটগাছে পাখীর দল জাগিয়া উঠিল, দূরে ধান্যক্ষেত্রের সীমায় একটা নারিকেল গাছের পাশে সূর্য্যের অর্দ্ধখণ্ড পরিদৃষ্ট হইল।

গৃহকর্ত্তা কিসের ভাবনায় তন্ময় হইয়াছিলেন জানি না, সহসা তিনি দেখিতে পাইলেন—একটি যুবক সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

গৃহকর্ত্তা সে দিকে চাহিতেই যুবক দুইহাতে তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন।

কর্ত্তা দেখিলেন—সরোজকুমার শুষ্ক শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহার কেশ রুক্ষ, বসন মলিন, দর্প ও স্বাধীনতার উজ্জ্বলতা আর তাহার মুখে নাই। কখন্ যে তাহার এ পরিবর্ত্তণ হইয়াছে, কখন্ যে তাহার স্বাতন্ত্র্য একটা দুর্ব্বহ ভারের মত তাহাকে অবিরত নিষ্পেষিত করিয়াছে; কখন্ তাহার অন্তরের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাব তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহাকে দমিত করিয়া প্রতিমূহূর্ত্তে তাহাকে তাহাকে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্য হইতে মুক্তি লইতে আদেশ করিয়াছে তাহা তিনি নিমেষে ভাবিয়া লইলেন। পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া পার্শ্বে বসাইলেন; সরোজকুমার বলিলেন "আমি আজ হইতে আপনার কাছেই থাকিতে চাই।"

কর্ত্তা অবনত মুখে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, সরোজ নীরবে তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তখন প্রভাতের আলো পল্লবে-পল্লবে, সুদূর ধান্যক্ষেত্রে আনন্দের হিল্লোল তুলিয়াছে। গাছে গাছে পাখীরা কলরব জুড়িয়া দিয়াছে। সর্ব্বত্র একটা পুলকের অধীরতা। কেবল কর্ত্তার চণ্ডীমণ্ডপে দুইটি ব্যাকুল প্রাণী অনেকক্ষণ নিঃশব্দে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর কর্ত্তা ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"সরোজ তাহা অসম্ভব। তবে তুমি বৌমা ও তাহার পালিত পুত্রকে লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

কর্ত্তা ভিতরে চলিয়া গেলেন। আপনার কক্ষে বসিয়া কিসের ভাবনায় নিবিষ্ট হইলেন।

মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল। সূর্য্যের আলোক বসন্তের নবপল্লবপুষ্পে বিকীর্ণ হইয়া একটি অপূর্ব্ব শ্রী প্রতিফলিত করিয়াছে। আজিকার এই সময়টি যেন বহুদিনের পরিচিত—তাই আজ গৃহকর্ত্তার অনেক পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হইতে লাগিল। দূরে একটা শিমুল গাছ রক্তপুষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া বাতাসে দুলিয়া উঠিতেছিল, কর্ত্তা তাহার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময় গৌরী আসিয়া ডাকিল "বাবা।"

কর্ত্তা মাথা তুলিয়া কাঁপা গলায় উত্তর দিলেন "কেন মা?"

গৌরী বলিল "বাবা, আমাকে কি যাইতে বলিয়াছ?"

শ্বশুর বলিলেন "হাঁ মা, তোমার বিবাহের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিয়াছি, এত দিন তোমাকে স্বামিগৃহে যাইতে বলি নাই, আজ বলিতেছি তুমি যাও।"

চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে স্বামিস্ত্রী কর্ত্তাকে প্রণাম করিল। কর্ত্তা দুজনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুদূর।

তোমারি লাগিয়া কত না যামিনী
চোখে ঘুম নাহি মোর,
শূন্য শয়ন ছুঁইয়া ছুঁইয়া
ঝরে নয়নের লোর!
ওগো পরবাসী, দয়িত সুদূর
এস এ বুকের কাছে,
অতনু বাতাস যেমন করিয়া
জীবন জড়ায়ে আছে!
চাঁদের আলোক উত্তরী হয়ে
ঘেরিয়াছে ধরণীরে,
অমনি করুণ-কোমল পরশে
আমারে লহগো ঘিরে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

ভারতী, মাঘ—

অধিকাংশ ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনা ও সাময়িক সংবাদে পরিপূর্ণ। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আধুনিক ভারত" ম্যাজ্‌লিয়েরের ফরাসী হইতে গৃহীত; বিবিধ তথ্যে পূর্ণ। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি" সুপাঠ্য। শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরীর "পিপীলিকাদের যুদ্ধপ্রণালী" নানা বিদেশী লেখকদিগের রচনা হইতে সঙ্কলিত।

প্রতিভা, মাঘ—

শ্রীকামিনীকুমার সেনের "পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাবকবি গোবিন্দদাস" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে গোবিন্দ দাসের ও তাঁহার কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সমালোচনার অংশে অন্ত-র্দৃষ্টির পরিচয় না থাকিলেও আমরা এ রচনাটির আদর করি। গোবিন্দদাস প্রকৃত কবি—বাঙ্গালার দেশী সুর তাঁহার কবিতায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আজকালকার প্লাবনের দিনে নানা দিক হইলে যে ভাব স্রোতের ধারা ছুটিয়া আসিতেছে তাহা দেখিতে গিয়া দেশের নদীটির কথা আমরা ভুলিয়া যাই। যাহা দেশবাসীর তৃষ্ণা দূর করিয়া আসিয়াছে, আসিতেছে ও ভবিষ্যতে আমাদের অভাব পূর্ণ ও স্বাস্থ্য উন্নত করিবে, তাহাকে বিস্মৃত হইতে যিনি যে ভাবেই নিষেধ করুন না কেন, তাঁহার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গুহ "কর্ম্ম ও চিন্তার স্বাধীনতা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—ভারতে মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে যেরূপ সমাজনিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, চিন্তা-প্রবৃত্তিকে সেরূপ করা হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। তথায় কর্ম্মের স্বাধীনতা অল্প। স্বাধীনচিন্তকগণ (Freethinkers) সে দেশের সমাজে হেয়। ভারতের সমাজ চিন্তাবীরের এবং ইউরোপের সমাজ কর্ম্মবীরের আবির্ভাবের সহায়তা করে। আজকাল আমরা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া ইউরোপের রীতিনীতি মানিতেছি, ইহা আমাদের স্বাধীনতার পরিচায়ক মনে করি; কিন্তু এক প্রভুর পরিবর্ত্তে অপর প্রভুর প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন আমরা আর কিছুই করিতে পারিতেছি না। ফলে আমাদের মানসিক স্বাধীনতাটুকু বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইতেছি। প্রবন্ধটি সুলিখিত, যুক্তিপূর্ণ ও সময়োপযোগী। এরূপ আলোচনার দিন আসিয়াছে। হিন্দু সমাজে কর্ম্মের স্বাধীনতাও আছে; কিন্তু যেরূপ স্বাধীনতা ইউরোপে আজ আগুণ জ্বালাইয়া দিয়াছে, সেরূপ স্বাধীনতার আমল দেওয়া হয় নাই। এ সব কথার আলোচনা যত অধিক হয়, ততই ভাল।

"কবিতার কথা" শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসের প্রবন্ধ। লেখক বলিতেছেন—সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই লইয়া আমাদের জীবন। ইহাদের কোনটাকেই আমরা একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুধু সংসার ও প্রত্যক্ষ অথবা পরমার্থ ও পরোক্ষ লইয়া মনুষ্যজীবন নয়। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যক্ষের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের মধ্যে একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। আমরা সকলেই অন্তঃপ্রকৃতির সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই।

আমাদের জীবন মহামিলনমন্দির। এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই, শুধু ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন কল্পনাও নাই। যাহা আছে তাহা দুয়ের মিলন; তাহাই জীবনের স্বরূপ; এই জীবন লইয়াই কবিতা। যে শুধু ছোবড়া খায়, সে কখনও ফলের স্বাদ পায় না। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায়, সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোবড়া না ছাড়াইয়া ফল খাইতে চায়, সেও ফলের স্বাদ পায় না। সে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিত লোক সৃজন করে মাত্র। এই কল্পিত লোকের কোন সত্তা নাই। বৈষ্ণব কবিতাগুলি রীয়েলিষ্টীক নয়, আইডীয়েলিষ্টীকও নয়; এগুলি মহামিলনমন্দির জীবনের ধ্বনি। ইহাই হিন্দুর আন্তরিক ভাব, বাঙ্গালীর কবিতার প্রাণ। আমরা বলিতে চাই—দেশ বিদেশ হইতে কবিতার উপকরণ-সংগ্রহ, লেখক তাহা নিন্দনীয় মনে করিলেও, একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাতে বাঙ্গালা কবিতার প্রসার বাড়িতে পারে। তবে শুধু তাহাতেই মাতিয়া উঠিলে চলিবে না। লেখক প্রবন্ধের প্রারম্ভে বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতির মিলনেও কবিতা হয় এ কথা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু শেষে সংসার ও পরমার্থের মিলনের উপর বাঙ্গালা কবিতার প্রতিষ্ঠা করিতে চান্। বাঙ্গলায় এমন অনেক কবিতা আছে যাহাতে পরমার্থের গন্ধ নাই, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতির রেখা বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত; এগুলি কি বাঙ্গালার রত্ন নয়?

প্রবাসী, মাঘ—

"গান" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা। প্রভাতে কবি তরুণ যাত্রীদলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"দশদিক অঙ্গনে দিগঙ্গনাদল
ধ্বনিল শূন্য ভরি শঙ্খ সুমঙ্গল
চল রে চল চল তরুণ যাত্রীদল
তুলি নব মালতী মঞ্জরী"

কবিতার ছন্দ ও গতি ভাব নূতন না হইলেও পাঠককে মুগ্ধ করে। বর্ষার ঝড়-বাতাস মেঘ-বিদ্যুতের মধ্যে পাগলের কথা কবির মনে উদিত হইয়াছে;তখন তিনি লিখিয়াছেন"আকাশ জুড়ে জাগ্‌ল পাগল;"প্রভাতের পল্লবকম্পন দেখিয়াও তিনি এ স্থলে বলিতেছেন "পল্লবে পল্লবে পাগল জাগল"; এ দুটি পাগল এক রকমের নয়। "পাগল" বলিতে মহাদেবের বাহ্যিক ভাবটি পরিস্ফুট হয়। বর্ষার প্রকৃতিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভাতের পল্লবকম্পনে তাহা নাই। আনন্দচিত্ত শিশুকে কখন কখন আদর করিয়া "পাগল" বলা হয়"—কথাটি এখানে গৌণ অর্থে প্রযুক্ত। এই কবিতায় "পাগল" শব্দটিও তাই। এ কথার প্রয়োগ বিশেষ স্থলে বিশেষ অবস্থায় হইয়া থাকে। পাগলের সহিত যে ভাব জড়িত, কবিতাটি পড়িলে এখানে কথাটিকে সে ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার শ্রম স্বীকার করিতে হয়।

এখানে কবি আহ্বানের সুরটিকে প্রকৃতির মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। কবিতার ধ্বনিটুকু ভাবের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিশেষ মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

"কবরের দেশে দিন পনর" নাম দেখিয়া এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়। রচনায় মিশর দেশের বিবরণ যথাসাধ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এ সব রচনাতে লেখকের প্রাণের ছাপ প্রয়োজনীয়, মনুষ্যজীবন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে কোন রচনাই আমাদের আনন্দ দান করিতে পারে না,—শুধু বিশেষ বিবরণ লিখিলে চলিবে না, যাহাতে তাহাদের প্রতি পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহার উপায়ও করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ, মাঘ—

"কবি কেশবদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরসিকলাল রায় হিন্দী সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র কবি কেশবদাসের ও তাঁহার প্রচলিত পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দী সাহিত্য ভারতবর্ষের, বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকিলেও পরিচয় এখনও বিশেষভাবে হয় নাই। লেখক যদি সে কার্য্যের ভার লন, তাহা হইলে তিনি যে কাজ করিবেন তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করা কঠিন। শুধু সংক্ষিপ্ত বিবরণে কাজ হইবে না। হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির বিশেষ পরিচয় তাঁহাকে দিতে হইবে। হিন্দী সাহিত্যের প্রাণ কোনখানে তাহাও নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। এইরূপে ভারতের ভিন্ন ভাষার সহিত পরিচয় হইলে ভারতবাসীর অন্তরে কোন্ সুরটি ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সকলেই জানিতে পারিবে।

"সন্ধ্যা" শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা—শান্ত, স্নিগ্ধ, প্রসাদগুণসমন্বিত। কবি সন্ধ্যার ভাবটি কবিতায় সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

হিংসা দীপ্ত রণোল্লাস নির্ব্বেদ নিবৃত্তি মাঝে
যাক্—ডুবে যাক্,
গম্ভীর মরণমত আসুক নীরবে সন্ধ্যা
পরম নির্ব্বাক।

* * * * * *

দিবসের ভেদরেখা লুপ্ত দেখ অন্ধকারে
নাহি আত্মপর
যুগযুগান্তের সাক্ষী অসংখ্য নক্ষত্ররাজি
মাথার উপর।
টুটিছে—ফুটিছে কত, অনন্তের নাহি ক্ষতি,
নাহি তার ত্রাস ;
তুমি কেন আপনারে দীন পরাজিত ভাবি'
ফেলিছ নিঃশ্বাস।
উত্থানপতন মাঝে তুমি ক্রীড়নক নর,
কারে বল ক্ষতি ?
সেই বিজয়ের বীজ, তুমি যারে পরাভব
ভাবিছ সম্প্রতি।

অনন্তের মধ্যে সান্তের স্থাননির্দ্দেশ, দৈনন্দিন জীবনকে অনন্ত জীবনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লেখক কবিতা ও দর্শনের মিলন-সাধন করিয়াছেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোমের "মধুস্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

"সভ্যতা বণাম বর্ব্বরতা" শ্রীবিপিনবিহারি গুপ্তের প্রবন্ধ। ভাষা মার্জ্জিত, শ্রুতিমধুর। লেখক বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি সুচারুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রচনা চিত্তাকর্ষক। ঐতিহাসিক অংশগুলি বেশ সরস করিয়া লেখা, পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইতে হয়।

শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভূদেববাবু ও ছেলেদের শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে ভূদেব সম্বন্ধে যে কথাগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহা সুখপাঠ্য। প্রবন্ধের বাহুল্য অংশ পরিবর্জ্জিত হওয়া উচিত ছিল। "য়ুরোপে তিনমাস" শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর ভ্রমণ কাহিনী—প্রকাশিত অংশে বিলাতের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভাষাটি বেশ সরল, মার্জ্জিত, কোথাও বাহুল্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

"বিজ্ঞান-বিদ্যার বাহ্যজগৎ" শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ; ত্রিবেদী মহাশয় বহুদিন পরে যে রচনায় হাত দিয়াছেন তাহা বঙ্গসাহিত্যের একটা অভাব পূরণ করিবে বলিয়া মনে হয়। লেখক বলিতে চান—বিজ্ঞান প্রত্যক্ষবাদী; প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রমাণ; কিন্তু এ প্রত্যক্ষ কার প্রত্যক্ষ? জনসাধারণের প্রত্যক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে। সব জনসাধারণ নয়—প্রকৃতিস্থ জনসাধারণ। এ জগতে প্রকৃতিস্থ কেহই নয়। Bain সাহেব যে বলিয়াছেন— In regard to object properties all minds are affected alike"—এই কথাটা কিছুতেই বলা চলে না, তাহা হইলে observation এর art খুব সহজ হইয়া যাইত। যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি কোন একজনের সাক্ষ্য না লইয়া, সকলেরই সাক্ষ্য মিলাইয়া, একটা average করিয়া লইয়া মাঝারি রকমের বর্ণনা দেন। যাহার প্রত্যক্ষ ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা একটি মাঝারি মানুষ বা mean man এর এই mean man কল্পনার জিনিস, পৃথিবীতে তাহার অস্তিত্ব নাই। রাস্তার লোকেরাই এই mean man এর। কাছাকাছি। বাস্তবিক তাহাদের লইয়াই এই জগৎ। তাহাদের জীবন উচ্চ অঙ্গের psychological বা religious জীবন নয়। তাহাদের জীবন biology'র life অর্থাৎ চলাফেরা secretion, excretion digestion assimilation ইত্যাদি। তাহাদের রাজ্যের সত্য ব্যবহারিক সত্য, জীবনের দায়ে তাহাকে মানিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য সত্য আছে, তাহা প্রাতিভাসিক। সত্যকে এই দুই বিভাগে বিভক্ত করিয়া লেখক এবারের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও বিশেষ আলোচনা তাঁহার নিকট আমরা আশা করি। রচনা প্রাঞ্জল, দুরূহ বিষয় সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকালকার বিজ্ঞানের রাজত্বের দিনে তাঁহার কথাগুলি অনেক ভাবিবার বিষয় উপস্থাপিত করে। আমরা সকলকে এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

"দর্পচূর্ণ" শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প, ইন্দু স্বতন্ত্র নায়িকা; বিমলা স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, শেষে বিমলার জয়, ইন্দুর পরাজয়, তবে এ পরাজয় অনেকটা জয়েরই মত। শরৎবাবু



স্বর্গীয় ৺গোপালকৃষ্ণ গোখলে



স্বর্গীয় ডাক্তার ৺ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বলিতে চান—ইন্দুর পরাজয়টা দুঃখের নয়; পরের একটা সুখময় ভবিষ্যতের দিকেও তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি ইন্দুকে প্রথমে স্বতন্ত্র তারপর স্বেচ্ছায় পরতন্ত্র করিয়া সবুজ পত্রের নায়িকা যে সোপানে উঠিয়াছে তাহারই একপাশে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গল্পটি অত্যন্ত দীর্ঘ, স্থানে স্থানে দু একটা কথা অন্তরে রেখাপাত করে, কিন্তু মোটের উপর জিনিসটা মনোরম হয় নাই।

শোক-সংবাদ।

ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ডাক্তার ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে জানিবার সৌভাগ্য যাহারই ঘটিয়াছে তিনিই আজ তাঁহার অভাবে শোক না করিয়া পারিবেন না। পরকে আপন করিবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল, দুচারদিনের দেখাশোনায় চির-পরিচিতের মত হইয়া যাইতেন। তাঁহার মত অসামান্য পণ্ডিত, উৎসাহী কর্ম্মবীর অতি অল্পই এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণসন্তান ভারতবর্ষের প্রধানতম মুসলমানরাজ্য হাইদ্রাবাদে যে অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার বিদ্যাবত্তার জন্য নয়; হৃদয়ের ঔদার্য্য, সহানুভূতি, শিশুর ন্যায় সরল ব্যবহার গুণেই তিনি সকলকে মুগ্ধ করিতেন। সংস্কৃত, পারস্য, ইংরাজী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, রসায়নবিদ্যা তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহার নানাবিধ বিচিত্র পরীক্ষা করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার স্বনামখ্যাত কন্যা সরোজিনী নাইডুর একখানি কবিতাপুস্তকের ভূমিকা লিখিতে প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক এডমণ্ড গস্ (Edmund Gosse) লিখিয়াছেন—তিনি যে রসায়নবিদ্যার মধ্য দিয়া সকল পদার্থকেই স্বর্ণে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেন, তাঁহার এই কল্পনাপ্রবণ উদ্ভাবনী শক্তি কন্যার জীবনে কাব্যসৌন্দর্য্যে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার পারিবারিক জীবন বড় সুন্দর ছিল; সন্তানদিগের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা, স্নেহ, সহৃদয় সহানুভূতি, তাহাদের চরিত্র গঠনের জন্য সম্যক স্বাধীনতা দান করিতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হইতেন না। ব্যবহারে যেন তিনি তাঁহাদের সমবয়সী বন্ধু ছিলেন। আর তাঁহার একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য।

উনপঞ্চাশ বৎসর স্থায়ী তাঁহাদিগের বিবাহিত জীবনে সুখের পরিপূর্ণতা ছিল, এই পত্নীর উদ্দেশে তিনি যে কত গান ও কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। রোগের কষ্ট তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই—হাসিতে হাসিতে মুহূর্ত্তের মধ্যেই জীবনলীলার অবসান হইয়াছিল, নিকটে সেই পত্নী ভিন্ন তখন আর কেহই উপস্থিত ছিল না। আজ দেশজননীর ভক্ত সন্তান চলিয়া গিয়াছেন। নিয়ত উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, সত্যকে আয়ত্ত করিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার নিকট জাতি, বর্ণ, বয়স ভেদ ছিল না, স্বদেশীমাত্রেই তাঁহার বন্ধু—তা সে হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, পার্সী, স্ত্রী, পুরুষ, বালক যিনিই হোন না কেন। শিক্ষা ও সাহচর্য্য দানে কত অপরিণত বয়স্ক বালকের চরিত্র তিনি যে গঠন করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। পরিশ্রমে তিনি অক্লান্ত ছিলেন, নিজের কালেজের নিয়মিত দৈনিক কাজ করিয়াও অবসরকালে শিক্ষার্থীদিগকে সানন্দে সাহায্য করিতেন। তাঁহাকে একক কখনো দেখি নাই, সর্ব্বদাই সঙ্গীপরিবৃত থাকিতেন। প্রাণপূর্ণ বাক্যালাপ ও উচ্চ সরল হাস্যে তাঁহার গৃহ সর্ব্বদাই আনন্দময় ছিল। আজ সব নীরব হইয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহার বন্ধুদিগের মন হইতে সেই ভোলানাথের মত সদানন্দ মূর্ত্তি কখনই মুছিয়া যাইবে না। মৃত্যু যে ধ্বংস, বিনাশ—ইহা তিনি কখনই স্বীকার করিতেন না, মরণ জীবনেরই পর্য্যায়ভেদ, এক পান্থশালা হইতে আর একটিতে আশ্রয়গ্রহণমাত্র বলিয়া জানিতেন। তিনি আজ এ পৃথিবীর ক্ষণিক আবাস ছাড়িয়া গিয়াছেন; তাঁহার অভাবে আত্মীয় বান্ধববর্গের জীবন নিরানন্দ হইয়াছে—কিন্তু তবু মনে হয় তিনি যে নবজীবনের মধ্যে গিয়াছেন সেখানে, আবার সেই আনন্দের কলহাস্য উৎসারিত হইয়া চারিদিক সুন্দর ও সুখময় করিয়া তুলিতেছে।

৺গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে

ভারতের সুসন্তান স্বনামখ্যাত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বিদ্যা বুদ্ধি, দেশহিতৈষণা কর্ত্তব্যপরায়ণতায় গোখ্‌লের মত ভারতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একনিষ্ঠ হইয়া—সংসারের কর্ম্মপথে নির্লোভ থাকিয়া অবিচলিত ভাবে আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন গোখ্‌লের মত অতি কম লোকেই করিয়াছেন। সংসারের যে কোন কর্ম্মক্ষেত্রেই গোখ্‌লে প্রভৃত ধনো-

পার্জ্জন করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারিতেন, কিন্তু নির্লোভ ব্রাহ্মণ যাবজ্জীবন কেবলমাত্র অন্নাচ্ছাদনের সংস্থান স্বরূপ ৭০টি টাকায় ফারগুসান কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যের ব্রত গ্রহণ করেন এবং বিংশবর্ষব্যাপী অধ্যাপনার পর স্বদেশবাসীগণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বড়লাটের সদস্যসভায় বোম্বাইয়ের প্রতিনিধিরূপে বসিতে স্বীকৃত হন। তদবধি অনন্যকর্ম্মা হইয়া নিজ কর্ত্তব্য অনন্য দক্ষতার সহিত করিয়াছেন; আজ তাঁহার আকস্মিক অকালমৃত্যুতে দেশজননী সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী সন্তান হারাইয়াছেন বলিলে পরলোকগত মহাত্মা গোখ্‌লের অসত্য স্তুতিবাদ হইল এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না। তাঁহার মৃত্যুতে যে স্থান আজ শূন্য হইয়াছে কবে সে স্থান পূর্ণ হইবে তাহা সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর ভগবানই জানেন।

সাহিত্য-সমাচার

মুসলমানসমাজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক মৌলভী শেখ আবদুল জব্বর সাহেব প্রণীত—"মক্কা শরীফের ইতিহাস" ও "জিরুসালম বা বয়তুল মোকাদ্দসের ইতিহাস" অভিনব সাজে সজ্জিত লইয়া বর্ত্তমান মাসে প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। এইবার ইতিহাস দুই খানিতে বহু নূতন তথ্য ও অনেক ছবি থাকিবে।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নবীন সন্ন্যাসী মনোরঞ্জন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিট্ঠল সীতারাম গুর্জ্জর কর্ত্তৃক মারাঠী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। ইহাতে ৮খানি ছবি আছে, তাহা ছাড়া প্রভাতবাবুর চিত্র ও ৩১২০পৃষ্ঠা ব্যাপী জীবনচরিত আছে। সুতরাং এক হিসাবে মারাঠী পাঠকগণেরই জিৎ।

Home University Library Series এর অন্তর্গত "Evolution of Industry" নামক পুস্তক অবলম্বনে রচিত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা প্রবন্ধের জন্য, চৈতন্য লাইব্রেরির কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি, "বিশ্বম্ভর সেন পারিতোষিক" হিসাবে, এক শত টাকা পুরস্কার দিবেন। আগামী ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে, চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্রবন্ধ প্রেরিতব্য।

"প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাবলী" নামক ধারাবাহিক গ্রন্থমালা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্, এ, বি, এল্, সরস্বতী কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালিভাষায় রচিত দুরূহ প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের মূল, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, ভূমিকা, টীপ্পনী সহ প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ড "বেদান্ত পরিভাষা" যন্ত্রস্থ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ড "মীমাংসা-পরিভাষা" মুদ্রাঙ্কণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। পরবর্ত্তী খণ্ড সমূহে যাস্কের নিরুক্ত, মীমাংসা-দর্শনের অন্যান্য গ্রন্থ, প্রভৃতি প্রকাশিত হইবে।

আগামী গুড ফ্রাইডের অবকাশ সময়ে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং তিনিই সাহিত্য-শাখার ও সভাপতি হইবেন। শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় দর্শন শাখার, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ইতিহাস শাখার ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হইবেন।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নূতন গল্পপুস্তক 'বুদ্ধির যুদ্ধ' এই মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়ের 'রাণীভবানী' 'বেলুনে তিন সপ্তাহ' ও '৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ' নামক তিন খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

মানসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'শশাঙ্ক' নামক ধারা বাহিক ঐতিহাসিক গল্প পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

মানসী



মানসী

৭ম বর্ষ ১ম খণ্ড	চৈত্র ১৩২১ সাল	১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা

অভিভাষণ *

যে বিজয়-বল্লাল-লক্ষ্মণাদির কীর্ত্তিকলিত বরেন্দ্রভূমিতে আজ সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে আমি স্বাগত জিজ্ঞাসা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছি, সে সিদ্ধস্থানের প্রসিদ্ধি আজ আর নাই, তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি অস্তমিত, চিরদিনের জন্য সে তীর্থসদৃশ পুণ্যভূমির পূতমহিমা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাজধানী বিজয়পুরীর সৌধশিখর আজ চীনাংশুক-পতাকায় পরিশোভিত নহে; দেবপাড়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরচূড়া আজ আর দিন-দেবতার বিশ্রামার্থ উচ্চশির ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরে না। চিরপ্রোষিত অগস্ত্যকে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য উমাপতির উদ্দাম কল্পনা আজ আর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ঊর্দ্ধে উধাও হয় না। হরিহর প্রদ্যুম্নেশ্বরের প্রাহ্ন-মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নের পূজারতির শঙ্খঘণ্টারব ভক্তজনের শ্রবণে মাধুর্য্যময় সঙ্গীতের মত আজ আর বাজিয়া উঠে না, মন্দিরসন্নিহিত সরোবরে সহস্রাংশুর আনন্দবর্দ্ধনার্থ সহস্রারবিন্দ তাহার বিভ্রম মকরন্দ লইয়া দিনারম্ভে আজ আর নয়ন উন্মীলন করে না, "গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূর" অঙ্গস্খলিত কুঙ্কুমপঙ্কে সরোবরের স্বচ্ছ সলিল আজ আর পীত শোভায় প্রতিভাত নহে। কমলকুঙ্কুমের সংমিশ্রিত সৌরভ আজ দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইয়া দূরদূরান্তর হইতে নলিনী-বন-বল্লভ অলিকুলকে আদরামন্ত্রণে আহ্বান করিবার কোন উদ্যমই আজ আর করিতেছে না। ভক্তমুখোচ্চারিত স্তুতি-গীতমুখরিত দেবধানী আর নাই, তোয়-তরঙ্গ-ভঙ্গচপলা লক্ষ্মী বিজয়পুরী

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে পঠিত।

চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, বিজয়সেনের বিজয়োদ্ধত সেনানীর গর্ব্বিত পাদক্ষেপ-প্রপীড়িত বরেন্দ্রভূমি আজ শ্মশান অপেক্ষাও নীরব, নিস্তব্ধ; বিগত-ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসুর আকুল অন্বেষণ ভূগর্ভ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াও অক্লান্ত শ্রমের কিঞ্চিন্মাত্রও সার্থকতা সম্পাদন করে কি না সন্দেহ। বিক্রমসভার প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মণের স্বারস্বত সভার পঞ্চ মহারত্ন আজ আর নাই, রাজপ্রেমার্থিনী অপ্সরীর প্রেমাকুল বিলাপগীতি উৎস-মুখনিঃসৃত নির্ম্মল বারিধারার ন্যায় ধোয়ীর লেখনীমুখে আজ আর অজস্র ধারায় প্রবাহিত হয় না, বিলাসকলা-কুতূহলী হরিস্মরণে সরস মনকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য পদ্মাবতী-রমনের রসভার-মন্থর গোবিন্দগীতাবলী আজ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মোগলের দিল্লীসিংহাসন-ছায়ায় যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ "রাজসাহী" নামে অভিহিত ছিল, যার অতুল সম্পদ, অসীম ক্ষমতা এবং অপার মহিমার কথা পারাবারের পরপার পর্য্যন্ত একদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, আজ সে রাজসাহীও নাই এবং রাজসাহীবাসী জন-গণ-নায়ক বলিয়া যাঁহারা একদিন সর্ব্বপ্রকারের খ্যাতিপ্রতিপত্তির আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারাও আজ পূর্ব্বভাবে বিদ্যমান নহেন। আজ যাহার উপরে এই সমবেত সজ্জনমণ্ডলী ও মনীষিবৃন্দের অভ্যর্থনার ভার অর্পিত হইয়াছে, সে সর্ব্বতোভাবে ইহার অনুপযুক্ত। বৎসরের সকল দিনগুলিই যাহার নিকট শ্রীপঞ্চমীর অনধ্যায়ের দিন ছিল, সে কেমন করিয়া বাগ্দেবতার সেবকবৃন্দকে স্বাগত প্রশ্ন করিবে, ভাবিয়া পাইতেছে না।

এ বৎসর যে দুর্ব্বৎসর, একথা সকলেই জানেন—বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের পক্ষে মহা মন্বন্তরের বৎসর বলিলেও অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জনের দোষে দোষী হইতে হয় না। এই সঙ্কট-সময়ে রাজসাহী এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে।

সারস্বত-কুঞ্জের কলবিহঙ্গ-সমাগমে রাজসাহী আজ মুখরিত। হৃতবৈভবা রাজসাহীর হৃদয়ে আনন্দ নিরানন্দ উভয়েরই আজ একত্র সমাবেশ হইয়াছে। বীণাবাদিনী বাগ্দেবতার পাদপীঠ-কমলের বিমল মধুস্বাদী মনীষিসমাগমে তাহার আনন্দের সীমা নাই; আবার কেমন করিয়া দীন আয়োজন তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়া আতিথ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না; দীন দেশের দীন আয়োজনের অপূর্ণতা যদি হৃদয়ের অভ্যর্থনায় পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তবে রাজসাহীবাসীর ভয় করিবার কোন কারণই আজ নাই। "কাঞ্চন

থালি নাহি আমাদের” কিন্তু কদলীপত্রের শ্রদ্ধাদত্ত শাকান্ন হৃদয়বানের পরিত্যজ্য নহে; সেই সাহসে সাহিত্য-যজ্ঞের দীন অনুষ্ঠান করিয়া রাজসাহী আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছে; বাহ্যপূজা অপেক্ষা মানসপূজার মাহাত্ম্য শুনিয়াছি সমধিক—আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব আশায় দীন আয়োজনের লজ্জা আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে পারিতেছে না।

পূর্ব্বাপর নিয়মানুসারে যে স্থানে সাহিত্য-সভা আহূত হয়, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পরিচয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতির দেয়। মুখের কথায় সে পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা পূর্ব্বগৌরবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে পারিলে, তাহা অধিকতর আহ্লাদের কারণ হয়। আজ আনন্দের সহিত বলিতে পারিতেছি, এই সভাস্থানের অনতিদূরে যে সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পূর্ব্ববৈভবের স্মৃতিস্বরূপ শ্রীমূর্ত্তি, তাম্রশাসন, প্রস্তরফলক, যাহা সংগৃহীত হইয়া সেখানে সংরক্ষিত আছে, তাহা দেখিলে অতীতগৌরবের আভাস পাইতেই হইবে সন্দেহ নাই।

যে রাজ্য কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, যে রাজধানী কালের হস্তাবলেপে বিলুপ্ত হইয়াছে, যে দেউলের দেবতার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির পর্য্যন্ত কালসাগরের জলে নিমজ্জিত হইয়াছে—সে প্রাচীনকালের ভ্রমপ্রমাদশূন্য ইতিহাস বিদেশী-লিখিত মুদ্রিত পুস্তকে এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই পাওয়া যায় না। অসীম ধৈর্য্যসহকারে, অপরিমেয় অধ্যবসায়ের সহিত, অরণ্যকান্তারে ভূধরে ভূগর্ভে সফল নিষ্ফল নানা প্রকার অনুসন্ধানে তাহার অস্তিত্বের ক্ষীণসূত্র বাহির করিতে হয়। এ চেষ্টা আজ বাঙ্গলার অনেক স্থানেই দেখা যাইতেছে। তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য—কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি, হেতমপুরের মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জনপ্রতিষ্ঠিত বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতি এবং মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতির পৃষ্ঠপোষিত এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নেতৃত্বাধীন রাঢ় অনুসন্ধান-সমিতি। কিঞ্চিৎ গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দের সহিত আজ উল্লেখ করিতে পারি যে, এই রাজসাহীতে রাজসাহীর সুসন্তান সোদরপ্রতিম কুমার শরৎকুমারের জ্ঞান, বিদ্যা, অনুসন্ধানস্পৃহা ও অর্থানুকূল্যে বরেন্দ্রের বিগত-বিস্মৃত-বৈভবের ইতিহাস অন্বেষণ আরম্ভ হয়; এবং সেই অক্ষয়রমার রম্য নিকেতন বরেন্দ্রের বিলুপ্ত গরিমার ভগ্নাবশেষ অক্ষয়রমার সাহায্যেই শ্রীমান্ শরৎ ধীমানের কলাবিদ্যার সহিত সংগ্রহালয়ে সযত্নে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

আজ ফাল্গুন পূর্ণিমা। মেঘলেশহীন কুজ্ঝটিবিহীন সুনির্ম্মল নভঃ আজ দিক-চক্রবাল পর্য্যন্ত অনন্ত নীলিমায় পরিপূর্ণ, দক্ষিণের মৃদুমন্দানিল চূতমুকুল ও মাধবী-মঞ্জরীর মনোমুগ্ধকর আকুল গন্ধ বহিয়া দিগদিগন্ত আমোদিত করিয়াছে; অশোক, চম্পক, কিংশুক, কাঞ্চনের বর্ণবিভায় বসুন্ধরার আজ বাসকসজ্জা সমুপস্থিত। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জানি না বসন্তের এই মনোমোহন আয়োজনের দিনে বৃন্দাবিপিনচারী রাধাহৃদ্‌বিহারী নব নটবর শ্রীশ্যামসুন্দরের ফল্গুলীলার মহামহোৎসব হইয়াছিল। আবার প্রায় পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে এই দিনে শচীমাতার অঞ্চলের নিধি, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়তম ধন, প্রেমের তুফান তুলিবার জন্য, প্রেমময় নবদ্বীপচন্দ্র—শ্রীচৈতন্যদেবের নদীয়ায় আবির্ভাব হয়। আজ কয় শতাব্দী পূর্ব্বে এই রাজসাহীর অনতিদূরে বরেন্দ্রভূমির খেতুরীগ্রামে—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর কর্ত্তৃক সোণার গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়। বরেন্দ্র-ভূমিতে শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ব্যাপার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ইতিহাসে চিরন্তন স্মরণীয় ঘটনা। এই উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া তদানীন্তন পরমভাগবৎ বৈষ্ণব মহাজনগণের মহামিলন এই খেতুরীগ্রামে সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনধাম, নীলাচল, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ প্রভৃতি যাবদীয় বৈষ্ণব-নিবাসের তীর্থভূমি হইতে সাধু সজ্জনগণের সমাবেশ হয়।

বৃন্দাবনধাম হইতে সমাগত শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। অবধূতাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুর তখন তিরোভাব হইয়াছে; তাঁহার অবর্ত্তমানে তদীয় সহধর্ম্মিণী ঈশ্বরী জাহ্নবী দেবী খড়দহ হইতে খেতুরীগ্রামে শুভাগমন করিয়া এই বৈষ্ণব মহাসম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নির্দেশানুসারে দেববিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ও তদঙ্গীয় যাবদীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল; বৈষ্ণব গ্রন্থপাঠে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে তৎকালে যোগ্যতানুসারে ধর্ম্মজগতে এবং বিদ্বজ্জনসমাজে স্ত্রীলোকগণ নিজ নিজ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন, ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত অনুমান না হইতেও পারে। নরোত্তম কর্ত্তৃক সোণার গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এতদ্দেশে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্বের প্রচার হয় এবং সেই জন্য খেতুরীর এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপার বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মজগতে চিরস্মরণীয় ঘটনা এবং সেই ঘটনা এই রাজসাহীর কয় মাইল মাত্র দূরেই ঘটিয়াছিল। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত দিবসে বৎসর বৎসর সেই বৈষ্ণব-মহাসম্মিলনী এই খেতুরীগ্রামে হইয়া থাকে। সেই, মিলনক্ষেত্রে হরিভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব নরনারীর ভক্তিপরিপ্লুত

সম্মিলিত সমস্বরের নামসঙ্কীর্ত্তন, বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরির মহিমাময় সিংহাসন তলে সমুপস্থিত হয় কি না জানি না, তবে কীর্ত্তনানন্দের উন্মাদ পুলকে আত্মহারা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরাভক্তি এবং প্রেমসাগরের উচ্ছ্বসিত রসতরঙ্গ যে দেখিয়াছে, তাহার নয়ন সার্থক, জন্ম ধন্য, জীবন সফল এবং দেহমন পবিত্র। ঋষিকোপানলে ভস্মীভূত ষষ্টিসহস্র সগরসন্তান উদ্ধারের জন্য তপঃসিদ্ধ ভগীরথ যেমন মন্দাকিনীর পাবনী ধারায় ধরণী পবিত্র করিয়াছিলেন, প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহের অর্চ্চনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তপ্রবর নরোত্তম তেমনই বরেন্দ্রভূমি পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। নরোত্তম ঠাকুরের, জীবনবৃত্তান্ত এবং সোণার গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠার আনুসঙ্গিক কাহিনী অতি অপূর্ব্ব। রাজৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তির সন্তান নরোত্তম শিশুকাল হইতেই ধর্ম্মপিপাসু; যৌবনে সুযোগ পাইয়া গৃহত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যান এবং লোকনাথের মন্ত্রশিষ্য হইয়া বালব্রহ্মচারী নরোত্তম, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শাস্ত্রানুশীলন শেষ করিয়া পরমভাগবত সন্ন্যাসী নরোত্তম প্রেমভক্তি বিতরণমানসে দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সোণার বিগ্রহ সর্পসঙ্কুল ধান্যাগারে প্রাপ্ত হইয়া, পরম সমারোহে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। শাস্ত্রদর্শী ভক্ত নরোত্তম, শাস্ত্রানুশীলন ও হরিগুণানুকীর্ত্তনে জীবনাতিপাত করিয়া যান এবং জীবিতকালে হরিভক্তিবিষয়ক গ্রন্থাদি যাহা বাঙ্গলা ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা এবং সারবত্তা কম নহে, সুতরাং নরোত্তম বরেন্দ্রভূমে প্রেমভক্তিই কেবল বিলাইয়া গিয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহার দ্বারা মাতৃভাষাও যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। রাজসাহীবাসী বাগ্দেবতার চরণনিষ্যন্দী মধু স্বাদের জন্য চিরদিনই লোলুপ। অতি অল্পকাল পূর্ব্বেও এই জেলায় অসংখ্য চতুষ্পাঠী ছিল। প্রতি গ্রামে একাধিক চতুষ্পাঠী ছিলই, কোন কোন স্থানে একই গৃহে এক সময়ে কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রের অনুশীলন হইতে পারিত। গৃহস্থ সকলেই পণ্ডিত,—এমন গৃহ এই রাজসাহীতে বিরল ছিল না। জীনেন্দ্রবুদ্ধিকৃত "কাশিকা বিবরণ পঞ্জিকা" বা "ন্যাস" মৈত্রেয়রক্ষিতকৃত "তন্ত্রপ্রদীপ", পুরুষোত্তমকৃত "ভাষাবৃত্তি" প্রভৃতি এই রাজসাহীতে আজও পাওয়া যায়। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-অঙ্কিত শ্রীহরির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আভীর রমণীর চিরপ্রার্থিত দয়িতরূপী ভগবদন্বেষণ-কাহিনী, যাহা "পদাঙ্কদূত" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে, সেই ললিতকান্ত শ্লোকাবলী এই রাজসাহীর

রাজকবি শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মাকৃত। অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এখানে দেশকালোপযোগী বিদ্যার অনুশীলন অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে। বেণ্টিঙ্ক এবং মেকলে প্রবর্ত্তিত নবশিক্ষানীতির প্রথম ফলস্বরূপ জেলায় জেলায় যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, বোয়ালিয়া জেলা স্কুল সেই সমস্ত প্রাচীন বিদ্যালয়ের একতম। দুবলহাটীর সৎকর্ম্মশীল রাজা হরনাথ রায় অর্থসাহায্যের দ্বারা সেই স্কুলকে হাইস্কুল করিয়া দেন; তৎপর দিঘাপতিয়ার সুপণ্ডিত বিদ্যোৎসাহী দেশহিতৈষী পুণ্যশীল রাজা প্রমথনাথ সেকেণ্ড গ্রেডে কলেজে বি এ ক্লাস স্থাপনের সহায়তা করিয়া উত্তরবঙ্গে আধুনিক উচ্চশিক্ষার পরম সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তৎকালে সমগ্র উত্তরবঙ্গে আর কলেজ ছিল না। এই রাজসাহী কলেজই সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান। কলেজ এবং এই বিদ্যালয় সেই প্রাচীন খ্যাতি আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। যে বিদ্যালয় সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসী বিদ্যার্থী-দিগের শিক্ষার একমাত্র স্থান, এক সময়ে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল; বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, দিঘাপতিয়ার সর্ব্ববিষয়ে সুযোগ্য আমার পরম বান্ধব বিদ্যোৎসাহী রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুরের সহায়তায় অপরিসীম ধৈর্য্য ও অক্লান্ত শ্রমের ফলে তাহাকে কেবল রক্ষামাত্র করিয়াছেন, তাহাই নহে, সে বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রকার গৌরব এমন করিয়া বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন যে, ইহার সমকক্ষ কলেজ আর নাই বলিলে কৈতববাদের দোষ কেহ দিতে পারিবেন না। আমার সোদরপ্রতিম রাজা প্রমদানাথ এবং আমার অধ্যাপক রায় বাহাদুর কুমুদিনীকান্ত সমগ্র রাজসাহীবাসীর একান্ত কৃতজ্ঞতাভাজন। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারিণী দানশীলা পুণ্যবতী শ্রীযুক্তা রাণী হেমন্তকুমারী দেবী একটী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করতঃ বরেন্দ্রে মৃতকল্প সংস্কৃতানুশীলনে নবজীবন সঞ্চার করিয়া, জনসাধারণের চির-কৃতজ্ঞতার পাত্রী হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মার পদাঙ্কদূত এবং নরোত্তমের কোমলকান্ত বৈষ্ণবপদাবলীর মধুর ঝঙ্কারের পর বাগ্‌দেবতার বীণার তন্ত্রী স্তব্ধ হইয়া যায় নাই, আরও অনেক কবি, অনেক লেখক এই রাজসাহী ভূমিতে জন্মলাভ করিয়া তাঁহাদের কৃতিত্বের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও মাতৃভাষার ভাণ্ডারে মূল্যবান রত্নরাজি উপঢৌকন দিয়া সমৃদ্ধ করিতে নিরলস যত্নের যাহাদের ত্রুটী নাই, এমন লোকও বিরল নহে। কান্তকবি রজনীকান্ত আপনাদের সকলেরই সুপরিচিত ছিলেন,

তাঁহার জীবন-সূর্য্য মধ্যগগনে না আসিতেই অস্তশিখরীর পরপারে চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল; বঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্যের কথা, কিন্তু অল্পদিনেই প্রকৃতির এই কলবিহঙ্গ মধুর-কাকলীর স্বরলহরীতে বঙ্গের কাব্যকানন ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল।—সে মধুর ঝঙ্কার বঙ্গবাসী শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার কূজনে শিষ্টজনাস্বাদিত শুভ্র কলহাস্য ছিল। কন্যাদায়গ্রস্তের হৃদয়বেদনা তাঁহার মত করিয়া কেহ প্রকাশ করিয়াছে কি না জানি না; আবার 'কেন বঞ্চিত হব চরণে' যখন শুনিয়াছি, মনে করিয়াছি যে, এমন করিয়া যে চাহিতে জানে, সে চিরপ্রার্থিতের চরণকমলের রত্নরেণুকায় কখনই বঞ্চিত হয় না। রজনীকান্তের বিমলশুভ্র কাব্যকৌমুদী আজ আর নাই; রাজসাহী আজ সত্যসত্যই রজনীর অন্ধকারে আবৃত হইয়া আছে। কান্তকবির স্বাগত-সঙ্গীতের স্বরে ও শব্দে আজ সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছি না, রাজসাহীবাসীর ইহা পরম দুর্ভাগ্যের কথা।

আজ যাহাকে আপনারা পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া বীণাবাদিনী বাগ্দেবতার অর্চনা আরম্ভ করিতেছেন, ইনি আপনাদের সকলের নিকট সুপরিচিত; কুলমর্য্যাদায় তিনি রামদেব দেওয়ান চৌধুরীর বংশধর, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের কাপকুলচূড়ামণি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের এম্ এ পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; লবণাম্বুরাশির পরপার হইতে নানা রত্নরাজি আহরণ করিয়া আনিয়াছেন; বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক, অর্দ্ধশত "সনেটের" শিল্পচতুর কবি, বঙ্গসরস্বতীর সর্ব্বাঙ্গ দিব্যাভরণে ভূষিত করিয়াও তাঁহার কর্ণে "বীরবৌলী"টি পর্য্যন্ত দিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় "তেল নূন লকড়ী" পর্য্যন্ত যাহার যাহা প্রয়োজন, সবই পাওয়া যায়। এই স্বারস্বত-সম্মিলন আজ তাঁহাকে সভাপতিস্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

কোন্ নবীন প্রভাতের মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে তরুণেন্দু-কান্তিমতী সিতাব্জে সন্নিষণ্ণা বীণাবাদিনী বাগ্দেবতার মানসী মূর্ত্তি মানবের মনে প্রথম উদ্ভাসিত হইয়া দুঃখভারপ্রপীড়িত জরাজীর্ণ জীবনে নন্দনের 'হরিচন্দন-শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল জানি না—তারপর যুগযুগান্ত ধরিয়া সেই অমৃতচ্ছবি বিশ্বের মানসস্বর্গে চিরন্তনী হইয়া রহিয়াছে; তাঁহারই সিন্দূরচন্দনাঙ্কিত পাদপীঠের অনুধ্যানে ভারতের নব্য কবিসম্প্রদায়ের চিরবরেণ্য অদ্বিতীয় মনীষাসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ—

জগতের কাব্যসভায় বঙ্গ-স্বরস্বতীর রত্নময় সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন। আমরা সিদ্ধিসবিতার প্রথমারুণদীপ্তি দেখিতে পাইয়াছি মাত্র, তপোলভ্য সম্পূর্ণফল আজও আমাদের হস্তগত হয় নাই। বিধিনির্দ্দিষ্ট এই সাহিত্যের পথেই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির অন্বেষণ করিতে হইবে। বাগ্দেবতার চরণারুণ-কিরণোদ্ভাসিত এই পথেই আমাদের সর্ব্ব প্রকার সার্থকতার সন্দর্শন আমরা লাভ করিতে পারিব। এই সাহিত্যের উদার উন্মুক্ত পথেই বিগত-বৈভবা বঙ্গজননীর ষড়ৈশ্বর্য্যের বিকাশ সম্ভব হইবে।

সমাগত সাহিত্যিক সুধীসজ্জনগণকে আমি বারংবার অভিবাদন জানাইতেছি।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

ভ্রমর

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্,
ওরে অলি, একি মন্ত্র বলি,
পতঙ্গেরে নাচাইলি, চম্পকেরে হাসাইলি,
রসাইলি রসালের কলি!
নবকেরে কাঁপাইলি, নবতীরে জাগাইলি,
রে রসিক চূড়ামণি অলি,
না জানি কি কথা বলি, দিলি তার অঞ্চল চঞ্চলি!

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্,
পরী-রাজ্যে বাজায়ে মুরলী,
মেতেছিস্ কি উৎসবে, ও তোর আনন্দ-রবে,
ভরি গেল কুঞ্জ আর গলি!
গোলাপেরে রাগাইলি, কাণে তার কি কহিলি?
পরশে খসিল মুক্তাবলী!
একি শোভা মনোলোভা, হাসিয়া উঠিল বনস্থলী।

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্,
শঠ-চূড়ামণি ওরে অলি,
ওই সুন্দরীর মুখে, গুঞ্জরিলি কি কৌতুকে,
ভয়-ত্রস্তা উঠিল উছলি!
ওই বিরহিনী ধনী, দিন গণি, দিন গণি,
ছিল চুপে আপনারে ছলি,—
ও তোর চরণ-চাপে আহা, তার বুক দিলি দলি।

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্
পূর্ব্বজন্মে ছিলি কি সুবেশা
নটী, গীত বাদ্যে ভোর, এ জনমে তাই তোর
ঘুচিল না আনন্দের নেশা?
ছায়ানট আলাপিয়া, মেঘরাগ আলাপিয়া,
ঝঙ্কারিয়া ললিত বেহাগ,
কোন্ বরে কোন্ শাপে, হয়েছিস মূর্ত্তিমান রাগ?

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্,
উর্ব্বশীর বিরহের সুর,
প্রাণে পশিয়াছে বুঝি? কণ্ঠ-মালো মাথা গুঁজি
ছিলি!—তাই আনন্দে আতুর?
বিরহান্তে মিলনের আস্বাদ পাইলি টের,
কোন্ দেব-দম্পতির গেহে?
উদ্বেল আনন্দে মগ্ন হলি অলি কোন্ মাতৃ-স্নেহে?

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্,
ওরে ভৃঙ্গ, বুঝি কোন কালে,

রমার নুপূর-শব্দ, শুনি হয়েছিলি স্তব্ধ ?
আনন্দে নাচিলি তালে তালে !
বুঝি হরি-স্তুতি-গান চুপে করেছিলি পান,
নারদের বীণায় বসিয়া ?
রে রসিক ! সেই রসে চিরদিন আছিস্ রসিয়া ?

৭

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্,
আনন্দের ঝরণা অদ্ভুত,
এ বিশ্বের মধ্য ভাগে ঝর্ঝর গুঁকারে জাগে,
তুই বুঝি তাহারি বুদ্বুদ ?
শোক তাপ মৃত্যুভয়, সে আনন্দে পায় লয় ;
লয়ে তারি বারতা অদ্ভুত,
এসেছিস্ বুঝি তুই, চিরানন্দ তরে দেবদূত ?

৮

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্,
"হেন বস্তু নাহি রে মহীতে !"
সেই পূর্ণ মাধুর্য্যের, আস্বাদ পাইয়া টের,
তাই বুঝি বলিস্ ইঙ্গিতে ?
তাই তুই ফুল চাস্, মধু পাস্ বার মাস !
সৌন্দর্য্যের একি আরাধনা !
প্রাণপণে মরি, মরি, মাধুর্য্যের এ কি উপাসনা !

৯

গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্,
আমরাও করি অহর্নিশ,
ঝঙ্কারিয়া ঝঙ্কারিয়া, মায়াবৃক্ষে বসি গিয়া,
মধু-ভ্রমে পান করি বিষ !
তোর মত একাগ্রতা, তোর মত তন্ময়তা,
নাই ! নাই ! তাইরে ভ্রমর,
বসন্তেও দুঃখী মোরা নিরন্তর, কাতর জর্জ্জর !

বকুলঝরা শিথিল কেশে   হৃদয়-হরা ফুলের বেশে
সেজেছ আজ হে লাবণ্য-রাণী,
মাতিয়ে দিয়ে বিশ্বপ্রাণে   গন্ধে রূপে স্পর্শে গানে
স্বরগ হ'তে প্রেমের সুরা আনি'
মরাল ডাকে বনের মাঝে   যেন তোমার কাঁকণ বাজে
মধুর সুরে ছুটিয়ে কণকণি
সন্ধ্যাবেলা তারার রাশি   আকাশতলে উঠ্‌ছে ভাসি
যেন তোমার মুকুটঝরা মণি,
ফুটিয়ে দিয়ে লাল করবী   এসেছ আজ অয়ি গরবী
আফিম ফুলে আল্‌তা ঢালি দিয়া,
তোমার সিঁথের সিঁদূর ঝরি,   ডালিম ফুলে দিচ্ছে ভরি'
হোরির খেলা রঙ্গে মাতাইয়া,
কোকিল ডাকে আমের শাখে,   নিবিড় ঘন পাতার ফাঁকে
তোমার চোখে কাজল সম কালো,
গোলাপ গাছে ফুলের রাশি   যেন তোমার আঁখির হাসি
যেন তোমার বুকের রাঙা আলো!
তুলেছ আজ ঝায়ু তুফান   জুড়িয়ে দিয়ে ক্লান্ত পরাণ
মুছিয়ে দিয়ে শ্রান্ত চির দুখ,
ব্যথিত কোন্ জীবনখানি   কোলের পরে নিলে টানি
শান্ত করি ঢেউদোলান বুক!
এসেছ আজ আকাশ ভরে'   এসেছ আজ বাতাস ভরে'
এসেছ আজ কানন ভরে' তুমি,
এসেছ আজ ফুলের মাঝে,   এসেছ আজ আজ ঊষায় সাঁজে
ভ্রমররূপে ফুলের কলি চুমি'—
এসেছ আজ বায়ুর দোলে   এসেছ আজ ধরার কোলে
প্রবাস-ফেরা মেয়ের মত হেসে,
মা'র বক্ষ করে খালি   দুদিন পরে মা'র দুলালি,
কাঁদিয়ে যারে অজানা কোন্ দেশে।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

পদাবলী সাহিত্য

সংগ্রহ ও প্রচার

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী বহুস্থান অধিকার করিয়া ইহাকে সাহিত্য-জগতে অপূর্ব্ব মহিমোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। পদাবলী-সাহিত্য আমাদের অপূর্ব্ব সম্পদ। আমরা শুদ্ধ ইহাই মাত্র সম্বল করিয়া জগত-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলে, আমাদিগকে কেহ দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। পদাবলী-সাহিত্য আমাদের শিরোমণি—ইহারই অপূর্ব্ব প্রভায় আমাদের মলিন বদন প্রদীপ্ত রহিয়াছে।

পদাবলী সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যে ইহার স্থান।

অগণিত কীটের যুগযুগান্তব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণপাত দ্বারা যেমন সমুদ্রগর্ভে একটি দ্বীপ বা ভূমিখণ্ড জাগিয়া উঠে, তদ্রূপ বহুশতবর্ষব্যাপী অগণিত ভক্তবৃন্দের জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা ও প্রাণপাত দ্বারা ধীরে ধীরে অপূর্ব্ব পদাবলী-সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সাময়িক উচ্ছ্বাসের পরিত্যক্ত নিদর্শন নহে। ইহা বঙ্গবাসীর রক্তে মাংসে, জীবনে মরণে, ইহকালে পরকালে, ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। পদাবলী, সাহিত্য হিসাবে গঠিত হয় নাই—হইলে বুঝি এরূপ হইত না। পদাবলী-সাহিত্য আমাদের জীবন-সঙ্গী ও প্রাণারাম—মানব-জীবনের চরম সঙ্গতি লাভের সোপান ও বিরামস্থল। আমাদের পদাবলী-সাহিত্য তাই এত অপূর্ব্ব, এত উজ্জ্বল, এত মধুর! বঙ্গ-সাহিত্য এই পদাবলীকে আপনার অন্তর্ভূত করিতে পাইয়া ধন্য হইয়াছি—আমরা বঙ্গভাষাকে মাতৃ-ভাষারূপে প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভব—ইহার বৈশিষ্ট

পদাবলী, সাহিত্য, সঙ্গীত ও ভগবৎ সাধনার ত্রিবেণী-সঙ্গম। যাহা কিছু সত্য সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু পবিত্র—সমস্তই অত্যদ্ভুত বিভাবনা ও দুরধিগম্য সূক্ষ্ম বিচারণা দ্বারা অনুস্যূত হইয়া এক অপূর্ব্ব অমৃত রসের উদ্ভব হইয়াছে। অল্পাধিক পরিমাণে ইহার রসাস্বাদনে কখন না কখন চরিতার্থ না হইয়াছিল, এরূপ বঙ্গবাসীর সংখ্যা নিতান্তই বিরল।

তিল তিল করিয়া নহে—জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যই লুণ্ঠন করিয়া পদ-কর্ত্তৃগণ, পদাবলী-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদিন আমরা একক, ইহার

বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন—আমাদের সযত্ন-সমাহৃত বিপুল রত্নরাশি, যক্ষের মত আকড়িয়া বসিয়াছিলাম। এতদিন আমরা, আমাদের সাধনা-লব্ধ প্রেম ও ভক্তি-রচিত সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত-নিকেতন, নিজেই অবলোকনকরিয়া স্বর্গীয় বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম—ভগবৎ কৃপালব্ধ বিচিত্র দান, জগতের সর্ব্বত্র, সকলে সমভাবে উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হউক—এ কল্পনা এতদিন আমাদের মনে উদিত হয় নাই। ভিক্ষালব্ধ ধন বণ্টন করিয়া মহোৎসব করাই বৈষ্ণবের কার্য্য—ভগবানের কৃপা-লব্ধ আশীর্ব্বাদও যে জগতের সকলকেই সমভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইতে, তদ্বিষয়ে আমরা একবারে অনবহিত ছিলাম। দরিদ্র-কুটীরে স্যমন্তকমণি থাকিতে পারে, একথা কেহ অনুমান করে নাই—আমরাও কাহাকে আমাদের সঞ্চিত রত্নরাশির সন্ধান কহিয়া দিতে অগ্রসর হই নাই।

পদাবলীর সংস্করণ ও প্রচার।

এখন, আমাদেরই এক ভাগ্যবান কবি, জগত সমক্ষে আমাদের ঘরের সন্ধান প্রচার করিয়াছেন—ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন, আমাদের পর্ণকুটীরে কুটীরে অমৃতের কত ছড়াছড়ি, কোহিনুরের কত গড়াগড়ি, ও সৌন্দর্য্যের কত বাড়াবাড়ি পাশ্চাত্যজগত এই সুন্দরের সন্ধান—সন্ধান কেন, কেবল আভাষমাত্র—পাইয়াই বিমুগ্ধও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! এখন আমাদের দরিদ্রের পর্ণকুটীরের প্রতি পাশ্চাত্য জগত, উদ্‌গ্রীব সোৎসুক ও লোলুপ-দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের সঠিত সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত-নিকেতন দেখিতে ও উপভোগ করিতে পাশ্চাত্যগণ কিয়ৎ পরিমাণে চঞ্চল হইয়াছেন। এখন আমরা কৃপণতা না করিয়া আমাদের রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিই—তাহারা আমাদের সম্পদ উপভোগ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হউক।

পাশ্চাত্যগণের ইহার রসাস্বাদ।

কিন্তু আমরা যে পদাবলী-সাহিত্যের অধিকারী বলিয়া বিশ্ব সাহিত্য-সংজ্ঞে বিশিষ্ঠ স্থান সঞ্চয় করিবার প্রয়াসী হইয়াছি, সেই পদাবলী-সাহিত্যের দুরবস্থা ও অনাদরের কথা স্মরণ করিয়া আমরা নিতান্তই মর্ম্মাহত ও সঙ্কুচিত হই।

পদাবলী-সাহিত্য সমুদ্র বিশেষ। ইহা দুই এত শত বৎসরের সঞ্চয় নহে। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি কবিযুগলের অপূর্ব্ব পদাবলী সমগ্র সাহিত্য-জগতকে এখনও গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাস্বর দীপ্তালোকের রশ্মিরেখা সম্পাতে প্রেম সরোবরে অগণিত

শতদল যুগপৎ প্রস্ফুটিত হইয়া সমগ্র ভুবন আলোকিত এবং অপূর্ব্ব সৌরভে ক্ষুদ্র মানবচিত্রকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নিতাইচাঁদের স্নিগ্ধরশ্মির সুখস্পর্শে একবারে শত শত কুমুদ দিগ্‌দিগন্ত সমুদ্ভাষিত করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনন্তর গৌর নিতাইয়ের প্রেমপীযূষধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া ক্ষীণপ্রাণ ও হীনবুদ্ধি মানবের মুগ্ধচিত্ত স্ফূর্ত্তিলাভ করিল—দেশময় গ্রামে গ্রামে একাধারে ভক্ত, কবি ও প্রেমিকের উদ্ভব হইল। সেই সময় হইতে বৈষ্ণব কবিগণ তারস্বরে যে গান ধরিলেন, বহুকাল ধরিয়া তাহার আর বিরাম হয় নাই।

পদাবলী-সাহিত্যের প্রসার।

"পদকল্পতরু", "পদামৃত সমুদ্র", "পদকল্পলতিকা", "পদচিন্তামণিমালা", "গীতচন্দ্রোদয়" প্রভৃতি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ-নিচয়ে এইরূপ বহু সংখ্যক প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বিরচিত পদাবলী সংগৃহীত হইলেও, প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিমধ্যে এমন সুন্দর সুন্দর অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব পদাবলী আবিষ্কৃত হইতেছে, যাহা সাধারণ মধ্যে প্রচলিত পদাবলী অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। পদ-সংগ্রহ গ্রন্থমধ্যে সংগ্রহকার রসপর্য্যায়ানুসারে এক এক বিভাগের কতকগুলি করিয়া সমভাবাপন্ন পদাবলী চয়ন করিয়া পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন—সুতরাং, সেই সকল গ্রন্থে যাবতীয় পদকর্ত্তৃগণের সমগ্র রচনা একত্র সংগৃহীত হওয়া সম্ভবপর নহে।

পদাবলী সংগ্রহের অসম্পূর্ণতা।

এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, পদকর্ত্তা গ্রন্থকারগণের রচনা, তত শীঘ্র প্রচারলাভ করিতে পাইত না। ইহার ফলে হইয়াছে এই যে, এই সকল পদসংগ্রহ গ্রন্থধৃত পদাবলী ব্যতীত অসংখ্য উৎকৃষ্ট প্রাচীন পদাবলী অচিরে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন পদসংগ্রহে গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ে আমরা তিন সহস্রের অধিক পদাবলীর পরিচয় প্রাপ্ত হই না। এখন প্রাচীন পুথির উদ্ধার কালে প্রায়ই নব নব পদকর্ত্তা ও তাঁহাদের রচিত বহু সংখ্যক পদাবলীর সন্ধান প্রাপ্ত হইতেছি।

অসম্পূর্ণতার কারণ ও ফলাফল

অপ্রকাশিতনামা পদকর্ত্তা ব্যতীত অনেক প্রখ্যাতনামা মহাজনগণের যাবতীয় পদাবলীই সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান লাভ করে নাই। সঙ্কলয়িতার ধৈর্য্য, সুবিধা ও প্রবৃত্তি অনুসারে, পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংগ্রহ-গ্রন্থ নিচয়ে পরবর্ত্তীকালের মহাজন পদাবলীর কথা দূরে থাক, সঙ্কলয়িতার সমকালে বা পূর্ব্ববর্ত্তীকালে রচিত অনেক সুপ্রচারিত পদাবলী এই সমস্ত সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থানলাভ করে নাই।

সমগ্র পদাবলী সংগ্রহের আবশ্যকতা

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা চণ্ডীদাস, জগদানন্দ, নয়নানন্দ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের নামোল্লেখ করিতে পারি। এখন, এই অপ্রকাশিত প্রাচীন মহাজন রচিত পদাবলী যথাস্থানে রসপর্য্যায়ানুসারে সন্নিবেশিত করিয়া একখানি স্বতন্ত্র পদাবলী-সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সংগ্রহ কার্য্যের তৎপরতা

আমরা আপনাদের মাতৃভাষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও মাতৃভাষার উন্নতি-কল্পে আপনাদের প্রাণপণ যত্নের কথা স্মরণ করিয়া আপনাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—আশা করি আপনারা বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই প্রস্তাবটির প্রতি যথোচিত মনোযোগ প্রদান করিতে বিরত হইবেন না। কালের করাল গ্রাস হইতে অপ্রকাশিত গ্রন্থরাজি অচিরাৎ উদ্ধার করিতে আপনারা কালবিলম্ব না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। উপযুক্তরূপ অনুসন্ধান-কার্য্য আরব্ধ হইলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অল্পকাল মধ্যে পদাবলী সাহিত্যের একটি বিরাট সংগ্রহ সাধিত হইতে পারে। এরূপ সংগ্রহ যে আমাদের বঙ্গসাহিত্যের একটি মহা গৌরবের বস্তু হইবে, তাহা আমরা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক আছে মনে করি না।

পদসমুদ্র'

আমরা বহুকাল অবধি 'পাদসমুদ্র' নামক বিরাট পদাবলী সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম শুনীয়া আসিতেছি—ইহাতে নাকি দশ পনর সহস্র মহাজন পদাবলী 'রসপর্য্যায়ানুক্রমে' সংগৃহীত আছে। এই গ্রন্থ কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত শিক্ষিত সাধারণের নয়নগোচর বা আয়ত্তাধীন হয় নাই—অনেকে আবার এই গ্রন্থের অস্তিত্বেই সন্দিহান! আমাদের বিশ্বাস, এরূপ গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিবারই কথা। এইরূপ গ্রন্থের সন্ধান করিতে পাইলে, আমাদের প্রস্তাবিত সংগ্রহ-কার্য্য অনেক সহজ হইতে পারে—হয়ত আপাততঃ নূতন করিয়া পদসংগ্রহের আর আবশ্যক হইবে না। এই রূপ গ্রন্থের সন্ধানে অবিলম্বে নিযুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বিলম্বে হয় ত, সত্য-সত্যই নিরাশ হইতে হইবে। তখন আমাদের অবহেলাজনিত পাপের ভার রক্ষা করিবার স্থান রহিবে না।

প্রাচীন পুথি ওপদাবলী

আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষীণতম চেষ্টায় সহস্রাধিক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে—এই গ্রন্থনিচয় মধ্যে বহুতর প্রাচীন পদ ও পদকর্ত্তার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে আমরা মাত্র কয়েকখানি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি।—সেইগুলি ব্যতীত, ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও অনেকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র' পদসংগ্রহ-গ্রন্থ আমাদের নিকট

রহিয়াছে। উপযুক্ত সহকারীর সহায়তায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া রীতিমত তৎপরতার সহিত কিছু দিনকাল এই সংগ্রহকার্য্য চালাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে, অচিরে যে আমাদের ঈপ্সীত পদসংগ্রহ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইতে পারিবে, তাহা যথেষ্টরূপ দৃঢ়তার সহিতে বলিতে পারা যায়।

এখন আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, আপনারা এই কার্য্যটি আবশ্যক ও সঙ্গত বিবেচনা করিলে, ইহার সুসম্পাদনের বিহিত ব্যবস্থা করুন। আপনারা ইহার ব্যয়ভার সংগ্রহ করিয়া দিলে, কোন বিশিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করিয়া আবশ্যক মত বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ দ্বারা এই সংগ্রহ ও সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে।

কার্য্যভার গ্রহণের প্রার্থনা

মাতৃভাষার কল্যানে নিঃস্বার্থ ভাবে ব্যয় করিতে আজকাল লক্ষ্মীবন্ত মহানুভাবগণ তাদৃশ কুণ্ঠিত নহেন—বাণীর সেবায় লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ যে এখন মুক্তহস্ত হইয়াছেন, ইহা আর কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু, তাঁহাদিগকে এই সুমহৎ কার্য্যে প্রণোদিত করিবার উপযুক্ত মন্ত্রণাদাতা আবশ্যক। আমরা সম্মিলনকেই তদ্রূপ কর্য্যে যথাযোগ্য রূপ উপযুক্ত স্থির করিয়া সম্মিলনের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি—আপনারা সম্মিলন হইতে কোন ধনীসন্তান দ্বারা এই পুণ্যময় কার্য্য সম্পাদন করিতে অগ্রসর হউন। এরূপ কার্য্য একক ভক্তি অপেক্ষা সম্মিলিত শক্তির তত্ত্বাবধারণে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে আরব্ধ কার্য্যের গুরুত্ব এবং সম্পাদিত কার্য্যের প্রামাণিকতা সূচিত হইবে।

সম্মিলনের কার্য্য ধনীর সাহায্যলাভ।

আমাদের মনে হয়, "উত্তর বঙ্গ" কেন, যে কোন সম্মিলনই এইরূপ একটি কার্য্য গড়িয়া তুলিতে পারিবেন, তাঁহাদের সম্মিলিত-জীবন সার্থক হইবে, মাতৃভাষার উন্নতি কল্পে তাঁহাদের অদম্য চেষ্টা, বিজয় ও গৌরবমুকুট বিভূষিত হইবে। যে ভাগ্যবান ধনীসন্তান, মাতৃভাষার সেবকগণের এই সাধু চেষ্টার সহায় হইবেন, তাঁহার অর্থের সদ্ব্যবহার জীবনের সদ্ব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার বিবেকবুদ্ধির সদ্ব্যবহার করা হইবে। তিনি জননী বীণাপাণির শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন—মাতৃমুকুট গঠনের সহায়তা করিতে গিয়া তিনি নিজেই অক্ষয় গৌরব মুকুটে সুশোভিত হইবে। *

দানের সার্থকতা

* ১৩২১ সালের (ফাল্গুন) উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন সম্পাদকের আহ্বানে লিখিত ও সাহিত্য-বিভাগের অধিবেশনে পঠিত বলিয়া গৃহীত।

শ্রীশিবরতন মিত্র।



তারকেশ্বরের পালা।

আমাদের প্রাচীন কবিগণ সাহিত্যের আসরে ধর্ম্মের জন্য অতি উচ্চ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সে জন্য প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যকে এক হিসাবে ধর্ম্মের সাহিত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম্ম-কথার যেমন ছড়াছড়ি, এমন আর কিছুরই নয়। প্রাচীন সাহিত্যের এই দিকটা বড় সুন্দর। এক দিকে কাব্যরস, অন্যদিকে ধর্ম্মামৃত। যিনি যাহার অভিলাষী, তিনি তাহা সহজেই পাইতে পারেন।

প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ কেবল ধর্ম্মালোচনার জন্যই সাহিত্যালোচনা করিতেন, এ কথা এখন আর বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন কালের রচনাগুলিতে তাহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্ম-চর্চ্চা তাঁহাদের প্রেয় বস্তু না হইলে প্রাচীন সাহিত্যে ধর্ম্মপ্রসঙ্গের এমন বাহুল্য কদাপি থাকিত না। প্রাচীন সাহিত্যের এক এক যুগে এক এক দেবতার অল্পবিস্তর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এরূপ প্রভাবের ফলে অসংখ্য দেবতার অসংখ্য লীলাকাহিনী বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে শুধু ঐশ্বর্য্যশালী নয়, বিলক্ষণ ধর্ম্ম-ভাব-মূলক হইবারও সুযোগ প্রদান করিয়াছে। ইতিমধ্যে প্রাচীন সাহিত্যে বহু দেবতারই মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গ্রন্থাদি যে কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। চণ্ডী, মনসা ও সত্যপীরের প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যের কলেবর বহু পরিমাণে পরিপুষ্ট হইলেও অন্যান্য দেবতাদেরও আপন আপন যুগে অল্পাধিক প্রতিপত্তি ও প্রভাব ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপে বহু দেবতার আবির্ভাবে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বহু যুগের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল যুগ-ভেদে বঙ্গভাষার ইতিহাস লিখিবার এখনো সময় আসে নাই। সুখের বিষয় সেইরূপ ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের দিকে এখন বাঙ্গালী লেখকদিগের অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের অসীম বিস্তারের কথা বিবেচনা করিয়া বলিতে গেলে আরো অধিক সংখ্যক লোকের এই কার্য্যে যোগদান করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

আমার সংগৃহীত অসংখ্য প্রাচীন পুথির মধ্যে নানা দেবতার মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক বহু ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। সে সকল পুথি হইতে বাঙ্গালার লৌকিক ধর্ম্মের ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া

আজ এখানে তারকনাথ দেবের মাহাত্ম্য-প্রকাশক একখানি ক্ষুদ্র পুথির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বিগত ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "জন্মভূমি" পত্রিকায় জনৈক লেখক কর্ত্তৃক "তারকনাথ দেবের ছড়া" শীর্ষক প্রবন্ধে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। একজন অশীতিপরা বৃদ্ধার মুখ হইতে লেখক মহাশয় উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছি, এই প্রবন্ধের সমালোচ্য পুথি আর উক্ত ছড়া পরস্পরের মধ্যে স্থানে স্থানে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই একই জিনিষ। একই জিনিষ হইলেও কিন্তু পদ-বিন্যাসের ব্যতিক্রম নিবন্ধন উভয়ই আবার পৃথক জিনিষের আকার ধারণ করিয়াছে। পাঠান্তর দিয়া এক একটার পূর্ণাঙ্গতা বিধান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে উভয়ের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে, তাহা দূরীভূত করা যায় না। এই কারণে তাহাদের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা না করিয়া আমরা উভয় নিবন্ধই এখানে প্রকাশ করিয়া দিতেছি। পাদটীকায় যাহা প্রকাশিত হইল, তাহাই "জন্মভূমির" প্রকাশিত ছড়া বুঝিতে হইবে।

আমাদের প্রাপ্ত পুথিখানি আকারে অতি ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ। মোট ৩টি পত্রে উহা সমাপ্ত। ১৬×৮ অঙ্গুলি পরিমিত বাঙ্গালা কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। শেষ পত্রটি স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। উহা সন ১২২৮ সালে লিখিত ও দ্বিজ মহাদেব কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া জানা যায়। "জন্মভূমির" প্রকাশিত ছড়াতে স্পষ্ট কোন ভণিতা পাওয়া যায় না। তবে রচয়িতা যে জলগড় পরগণার অন্তর্গত নন্দনবাটী-নিবাসী ছিলেন, তাহা উল্লিখিত আছে।

তারকনাথ দেব সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় আর কোন প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। আমাদের প্রাপ্ত পুথি খানিই এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়। সেই হিসাবে ইহা বিশেষ সমাদর লাভের উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। এ স্থলে পুথিখানি অবিকল উদ্ধৃত করা গেল :—

শ্রীশ্রীসিবদুর্গাঃ ভরসাঃ।

নম গনেসায় নমঃ।

অথো তাড়কেস্বরের বন্দনা লিক্ষতে।
বন্দিব বোনের (বনের) মধ্যে ক্ষেপা পষুপতি।
চারিদিগে উলু খাগড়া বেনার বসতি॥

চৌদিগে জঙ্গল জলা গহন কানন ।
মধ্যেতে সিঙ্গল দীপ অতি রম্য বোন (বন) ॥
কপিলা দিতেছেন দুগ্ধ একচিত্র হয়্যা ।
দেখিল মুকুন্দ ঘোষ কাননে য়াসিয়া ॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর ।
মৃত্তিকা খুলিয়া দেখে অপূর্ব্ব পাথর ॥
হস্তে খোদে মাটি কেহ দিয়া কেহ বাড়ি ।
পাষাণ দেখিয়া বনে হইল ছেয়াগাড়ি ॥ ১
কৃসানে কাটয়ে ধান্য রাখালে কুড়ায় ।
য়ানন্দে সম্ভুর সিরে ধান্য ভেনে খায় ॥
এইরূপে গেল দিন দ্বাদষ বৎসর ।
বিঘাত প্রমান গর্ত্ত মস্তক উপর ॥
মস্তকের বেদনায় সম্ভু হইয়া কাতর ।
কহেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তাড়কেস্বর ॥
তাড়কেস্বর আমি কাননে নিবাসি ॥
মোর সেবা কর বাছা হইয়া সন্যাসি ॥
ভক্তি করি দিবে মোরে এক বিল্বদল ।
অন্তকালে চরণ কমলে দিব স্তল (স্থল) ।

১ বন্দিব বিলের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি ।
চারিদিকে উলু খাকড়া বেনার বসতি ॥
চৌদিকে জঙ্গল জল গহন কানন ।
মধ্যেতে সিংলল দ্বীপ অতি আম্রবন ॥
কৃষাণে কাটয়ে ধান্য রাখালো কুড়ায় ।
আনন্দে শম্ভুর শিরে ধান্য ভেনে খায় ॥
কপিলায় দিচ্ছে দুগ্ধ একচিত্ত হইয়ে ।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে বসিয়ে ॥
মস্তকের বেদনায় শম্ভু হইলেন কাতর ।
কহিলেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেশ্বর
তারকনাথ শিব আমি কাননে বসতি ।
অবনী ভেদিয়া বাছা আমার উৎপত্তি ॥
কপিলায় দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর ।
মৃত্তিকা খুলিয়া দেখে অপূর্ব্ব পাথর ॥

তবে আঙ্গা (আজ্ঞা) করিলেন দেব ত্রিপুরারি।
রায় ভারামল্ল রাজা পাইল সমাচারি॥
কাননে সিবের লিঙ্গ শুনিঞা শ্রবনে। ২
ভারামল্ল জাত্রা কৈল সিব দরসনে॥
রাহুত মাহুত ঘোড়া সাজিল লস্কর।
ভারামল্ল প্রবেসিলা বোনের (বনের) ভিতর॥
জটাধারি ত্রিপুরারি দেখিয়া নিগড়ে।
রাজা বলে রাখ লয্যা রামনগড়ের গড়ে॥
সত কোড়া নিজজিল কাটিবারে মাটি।
জত কোড়ে তত বাড়ে পুস্কর্ণির জাটি॥
বাহো দিন কোড়ে তবু অন্ত নাহি পায়।
জত কোড়ে সম্ভুয়ে পাতাল পানে চায়॥
ভক্ত দুঃখ দেখি তখন ভাবিয়া অন্তরে।
নিসি জোগে বসিলেন রাজার সিয়রে॥ ৩

২ হস্তে খোঁড়ে মাটী কেহ খোঁড়ে দিয়া বাড়ি।
পাষাণে দেখিয়া বলে হৈল ছিয়াগাড়ী॥
রাহুত রাহুত ঘোড়া সাজিল লস্কর।
তারা সব প্রবেশিল জটার ভিতর॥
জটাধারী ত্রিপুরারি দেখিয়ে নিজে রড়ে।
রাজা বলে লয়ে রাখি রামনগরের গড়ে॥

৩ শত কোড়া নিয়ে দিল কাটিবারে মাটী।
যত কোড়ে শম্ভু বাড়েন পুষ্কর্ণীর বাঁটী॥
বারমাস কোড়ে শম্ভুর অন্ত নাহি পায়।
তবু শম্ভু নিয়ত পাতাল দিকে ধায়॥
ভক্তের দুঃখ পাইয়া ভব জানিয়া অন্তরে।
নিশিরাত্রে গিয়ে বসেন রাজার শিয়রে॥
সন্ন্যাসী হইয়া মূর্ত্তি কহেন তখন।
শুন রাজা ভবরাম আমার বচন॥
অকারণে দুঃখ পাইয়া মোরে কেন খোঁড়।
গয়া গঙ্গা বারাণসী এখানে সে জড়॥

হইয়া সন্ন্যাসি মুক্তি কহেন সপন ।
ষুন রাজা ভারামল্ল আমার বচন ॥
তাড়কেশ্বর সিব আমি কাননেতে বসতি ।
অবনি তেজিয়া বাছা জগতে উৎপতি ॥
অকারনে দুঃখ্য পায় মোরে কেন কোড় ।
গয়া গঙ্গা বারানসি আদি মোর জড় ॥
ষুনি এগা নৃপতি হইলা আনন্দে অস্তির ।
জঙ্গল কাটিয়া দিল অপূর্ব্ব মন্দির ॥
আম জাম রূপীলা গোবাক নারিকেল ।
ডানিভাগে স্বরবর সিদ্ধিমাখা জল ॥
পাথরের বান্দিয়া দিল মন্দিরের গোড়া ।
জলের কুম্ভির আইসে ডাকি নোকড়া ॥
হেন মতে বিশ্বনাথ হইল অবতার ।
নিলের দিল স্বরবর গঙ্গার জুয়ার ॥ ৪
বিচিত্র মন্দির মাঝে মহাচক্র সঙ্গে ।
প্রমাদ বেতাল ভূত নাচে কত রঙ্গে ॥
মাথায় জটার ভার প্রকাণ্ড স্বরির ।
চারি পাসে চারি মুক্তি ধরে পঞ্চ (সির ?)

৪ শুনিয়া নৃপতি হইলা আনন্দে অস্থির ॥
জঙ্গল কাটিয়া দিল অপূ মন্দির ॥
আম জাম রুহিলেন গুয়া নারিকেল ।
ডান ভাগে সরোবর সিদ্ধিমাখা জল ॥
পাথরে বান্ধিয়া দিলেন মরীচির গড়া ॥
জলেতে কুম্ভীর ভাসে ডাকে কড়া কড়া ।
বিচিত্র মন্দিরের মাঝে মহামায়ার সঙ্গে ।
প্রেমভরে তাল লয়ে নাচে কত রঙ্গে ॥
নীল দিনে সরোবর গঙ্গার জোয়ার ।
পাতকী তারিতে ভবে হৈলা অবতার ॥
মধ্যিখানে তারকনাথ চারিদিকে জল ।
ভক্তগণে দিয়ে পূজা কালা ফুলের মালা ॥
মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় হইলেন এক চল্লিশ সালে ।
বৃষধ্বজে পূজিলেন গিয়ে শ্রীফলের মূলে ॥

মনহর স্থান জে × × ।
× তপ করে জটিলা সন্ন্যাসি ॥
× তাড়কেশ্বর চারি × ।
পূজে দিয়া কানা ফুলের মালা ॥
আলিগড় পরগণাতে × × ।
পাতকি তরাইতে প্রভু তাড়কেশ্বর নাম ॥
মোণে (মনে) হয় মৃত্যুঞ্জয় এক × × ।
বৃষধ্বজ বসিলেন শ্রীফলের মূলে ॥*
বাঘছাল আসন ভুসন মাথায় ।
কিবা সে আনন্দ ছটা কহনে না জায় ॥
পঞ্চম অক্ষয় মন্ত্র প্রভু দিলে ।
× × বাণি তথির কারণে ॥
গান দ্বিজ মহাদেব সম্ভুর ভাবনা ।
নিবাস × × র পরগনা ॥
ইতি তাড়কেশ্বরের পালাঃ সমাপ্ত ॥
ইতি ১২২৮ সাল ।

ছড়ায় আছে, ৪১ সালে তারকনাথ দেবের আবির্ভাব বা লোকে প্রকাশ। এই ৪১ সাল লইয়া বহু মতভেদ আছে। কেহ বলেন,—১১৪১ সাল ; আর কেহ বলেন,—১০৪১ সাল। বহুদিন পূর্ব্বে তারকেশ্বর ধাম হইতে একখানি ইতিবৃত্ত-মূলক গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, কিন্তু তাহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই। শুনা যায়, সেই পুস্তকেও মাত্র ৪১ সালে তারকনাথের আবির্ভাব বলিয়া লিখিত আছে। তাহা সত্য হইলে সমস্যা আরো গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। ১০।১৫ জন মাত্র মোহান্তের অধীনে এত শত বৎসর অতীত হইল কিরূপে, বুঝা দুষ্কর। এই বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মনোযোগ প্রার্থনীয়।

আবদুল করিম।

বাঘছাল আসন বিভূতি মাখা গায় ॥
নিবাসী নন্দন বাটী কখন না যায় ॥
গাহিল সকল দ্বিজ শঙ্কর ভাবনা ।
নিবাসী নন্দন বাটী জলগড় পরগণা

স্বগত।

আমার অভাবের প্রভাব এক এক সময় এমনি দুর্ব্বার হইয়া ওঠে যে, মনে হয় যেন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এই অগণ্য গ্রহ চন্দ্র তারকা সূর্য্য সঞ্চিত আকাশ, এই অন্ত-হীন নিরন্তর প্রবাহিত বাতাস, এই উদ্দাম তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, আর এই বিপুলা পৃথিবী সব লইয়া যদি বুকে পুরি, তবুও তাহার শূন্য পরিপূর্ণ হয় না। তবুও মন কাঁদে, তবুও আরো চায়;—আবার এক এক সময় সব অভাব এমনি সামান্য হইয়া যায়, আমি যেন পৃথিবী-আঁকড়ে-ধরা ক্ষুদ্র গুল্মটির বুকে ক্ষুদ্রতম ফুলের মতন হইয়া যাই। আকাশের আলোতে একটি দিন ভাল করিয়া চোখ খুলিয়া চাওয়া, বাতাসে ভর দিয়া খানিকটা দুলিয়া দুলিয়া আনন্দ করা, তারপর রাত্রির অন্ধকারে শিশিরে অভিষিক্ত হইয়া একেবারে ঘুমাইয়া পড়া, প্রাণ এর অধিক কোনও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। কিন্তু দেখিতে পাই ব্রহ্মাণ্ড বুকে পুরিয়া লওয়া তবু সহজ কিন্তু ফুলের মতটি হওয়া সাধ্যায়ত্ত নয়, কেন না ফুলের মত যদি স্বভাব-জন্ম না হয়, তাহা হইলে কে তাহাকে তেমন করিতে পারে?

বার বার কি কথা বলিতে গিয়া হতাশ হইতেছি, কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিতেছি না; দিনের শেষ আর প্রভাতের আরম্ভ, আমার সমস্ত মনে যে কি ব্যাকুলতার সঞ্চার করে, তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতেই পারি না, প্রকাশ করিব কি করিয়া? একান্ত প্রিয়জনকে নিতান্তই ছাড়িয়া যাইতে হইলে মানুষ মনে যে বেদনা পোষণ করে, মুখে বলিতে পারে না, এ যেন তেমনিতর কিছু! আমার একলা ঘরটিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকি, দেশ কাল বোধ আমার লোপ হইয়া যায়, আমি ভুলিয়াই যাই আমার শরীরি কোনও অস্তিত্ব আছে; আমি যেন শুধু একটি মন, অথচ সে মন যাহা অনুভব করিতেছে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। ব্যথা বোধ করিয়াও মূকের অব্যক্ত বেদনায় যে কাতরতা চোখে মুখে ভাবে ছড়াইয়া পড়ে, এ সেই বেদনা। এমন নিবিড়, এমন গভীর, অথচ এমন জীবন্ত, জাগ্রত, তীব্র যে আমি একেবারে অধীর হইয়া পড়ি। যখন আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসি—মনে হয় কতদূর কোন্ লোকান্তর হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আমার মনে, শরীরে, জীবনে কেমন যেন খাপ খাচ্ছেনা!—

মনটি আমায় ছাড়াইয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। অর্দ্ধেক রাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়া যায় আর আসেনা, নিস্তব্ধ পৃথিবী মৃতের মত আমার কাছে কেবলি অনন্তের কথা বলে। আমাকে যে পথে ডাকে সে পথের সন্ধান আমি কোন্ সাধনায় পাইব। প্রতি প্রাতে আমি কিসের আশায় থাকি? কোন অপূর্ব্ব মিলনের—যাহার অভাবে আমার এই আকাশের আলো ম্লান, এই বাতাসের স্পর্শ উদাস, আর এই পত্র পুষ্পের লীলা, পাখীর গান আমার মনকে স্পর্শ করে না। আমার এত দিনের ভালবাসার বন্ধু সব আমায় ছাড়িয়া কোথায় গেল? একেলা যে পথের মাঝে আমায় দাঁড় করাইয়াছে, সেখানে সবই অস্পষ্ট, রহস্যময়, সেই কারণেই নিরন্তর ব্যাকুলতাকে কেবলি উদ্রেক করে, অথচ শান্ত করে না! আবার সন্ধ্যা আসে সমস্ত দিবসের আশা অন্ধকারের অন্তরে বিসর্জ্জন হইয়া যায়, তবুও নিরাশা আসেনা। বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের মধ্যে যেমন সম্মুখ বৎসরের আবাহন সঙ্গোপন থাকে, আমার মনের আশাও তেমনি আছে। প্রতিদিনের ব্যর্থতা এখন পর্য্যন্ত তাহাকে নিরাশায় পরিণত করিতে পারে নাই, এ অপূর্ব্ব রহস্যের অর্থ যে কি, আমিও কিছুই বুঝিতে পারি না!

মৃত্যু আর প্রেম ভিন্ন নয়, মৃত্যু ইন্দ্রিয়ের ব্যবধান লুপ্ত করিয়া দিয়া যায়, প্রেম স্বার্থের সব ভার দগ্ধ করে, ভালবাসিলে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই মরিতে আরম্ভ করি, আত্মসুখের সব বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া প্রিয়জনের সুখের মধ্যে স্থান পাইতে চাই, আর সেই ত্যাগ সেই মৃত্যুতেই অমর হইয়া উঠি। প্রেম মৃত্যুরি মত রহস্যময়, তাহার সবটুকু কে কবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে? আভাষ তাহার ভাষা, তাহার প্রকাশ ক্ষণিকের বিদ্যুদ্দীপ্তির মত, মুহূর্ত্তের শুভদৃষ্টিতে চির জীবনের পরিচয়, তার পরের আর সব অনুষ্ঠানই বাহুল্য।

চোখে চোখে যাহার সঙ্গে মালা বদল হয়, তাহাকে না পাইলে চির জীবনই বৃথা; ভাষায় ভালবাসি বলিবার আবশ্যক হয় না, যদি মনে মনে বোঝা পড়া হইয়া যায়, সে যে দূরান্তর লোকান্তরে থাকিয়াও বুকের মধ্যে স্থান পায়, চোখ না চাহিয়াও অবিরত দেখা হয়।

মানসী।

চৈত্র।

হের অই চৈত্র আসে
বিচিত্র পুষ্পের রথে,
তারাদীপ্ত ছায়াপথে,
হেরিবার আশে,
চিত্রা আর চন্দ্রমার
মিলনের মাধুরীসম্ভার—
বসন্তের বৈজয়ন্তী অনিবার দুলিছে পবনে
কুসুমের আস্তরণ বিস্তারিত সমস্ত ভুবনে,
আকাশ-মণ্ডপে আলো অহরহ আজি অনির্ব্বাণ
চম্পকের তীব্র গন্ধে বাসনার বিহ্বল আহ্বান !

হের অই চৈত্র আসে,
চৈতালির আলিম্পন
স্বর্ণ বর্ণ সুশোভন
প্রান্তরে বিকাশে,
স্বচ্ছ সরোবর জলে
স্নেহদৃষ্টি ফুল্ল শতদলে !
গোধূলির শুভলগ্নে সন্ধ্যাকাশে কণক-অঙ্গনে,
ক্ষীণকলা শশধর, পরিপূর্ণ সুমঙ্গল ক্ষণে,
তারি বক্ষোলগ্ন স্থির হাস্যভরা চিত্রা রাজে আজি
পূর্ণ বরষের আশা, মাঙ্গলিক উঠিয়াছে বাজি।

২৭শে ফাল্গুন ১৩২১। শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

রামপাল।

(২)

নৃপতির দুর্ব্বলতার জন্য গৌড়রাজ্যে বহুবার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার অন্যতম নিদর্শন আজিও দিনাজপুরে এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দীর্ঘিকাবক্ষে জয়গর্ব্বে দণ্ডায়মান আছে। মদনপালের রাজ্যকালে যে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, তাহার সুযোগে বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমে একটী নবরাজ্য সংগঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার

"উত্তুঙ্গ দেবমন্দির" ও অগণিত "বিতত তল্প" একদিন বরেন্দ্রের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। তাঁহার সমরবিজয়-কাহিনী, গৌড়েন্দ্র পরাজয়, মিথিলাপতির সহিত সংঘর্ষ কবিকল্পনা নহে। তাম্রে এবং শিলায় সে পরিচয় বর্ত্তমান আছে। উমাপতিধরের প্রশস্তি তাহার লিখিত ইতিহাস। প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরাবশেষ তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্নের মধ্যে একটী। আভ্যন্তরীণ অবস্থাদি বিচার করিয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বিজয়নগরেই বিজয়সেনের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে বিজয়নগর রামপালে বা তন্নিকটে নহে। উহা ঢাকা জেলাতেও নহে। উহার অবস্থান উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলায়।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াই পাল নরপালদিগকে উৎখাত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেক তবে কোথায় হইয়াছিল? পূর্ব্ব বঙ্গে, না উত্তর বঙ্গে? * তাঁহার অমিত বিক্রম বর্ম্মরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বঙ্গে এবং রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কাটোয়ার নিকটে † প্রাপ্ত তাম্রশাসনে এ পরিচয় লাভ করা যায়। সেই তাম্রশাসন বল্লাল রাজত্বের ১১ সংবতে বৈশাখমাসের ১৬ই তারিখে শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারে সম্পাদিত হইয়াছিল।

বল্লালসেন বঙ্গবিশ্রুত বীর নরপতি। তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী বাঙ্গালীর ইতিহাসে ও সমাজে সুপরিচিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিতেও ইংরাজ ঐতিহাসিকের কল্পনা বল্লালকে ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়া তাঁহাকে অবতারত্ব প্রদান করিয়াছে! ‡

বল্লালসেন বিদ্বান বুদ্ধিমান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রচিত অদ্ভুতসাগর ও দানসাগর ইহার পরিচয়। বল্লালের রাজত্বকাল দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ ব্যাপী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার অধিককালই গৌড়রাজ্যের বিভিন্ন অংশ

* বিজয়পুর নামক রাজধানীতেই বিজয়সেনের পৌত্র লক্ষ্মণসেনের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল ধোয়ী কবির পবনদূতে এরূপ লিখিত আছে। রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ী থানায় দেবপাড়া গ্রামে সেন-রাজবংশের প্রথম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বল্লালসেন দানসাগরে বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতা বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেবও বরেন্দ্রমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

† সম্প্রতি Herald পত্রিকা লিখিয়াছে যে কাটোয়া বিক্রমপুরের রাজধানী ছিল। এ সংবাদ কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই।

‡ Ballal Sen is fabled to have been the son of the Bramaputra river, which took the form of a Brahmin—Marshman.

জয় করিবার চেষ্টাতেই ব্যয়িত হইয়াছিল। বিক্রমপুরে দুইজন বল্লালসেন রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এই দ্বিতীয় বল্লালসেন কে? কবে কোথায় বর্ত্তমান ছিলেন? কিরূপেই বা বিক্রমপুরের রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন? প্রবাদ ইঁহাকে বেদসেন বা বিশ্বকর্তাতের পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছে। বেদসেন এবং বিশ্বকতার্ত একই ব্যক্তি, কি অভিন্ন ব্যক্তি তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা জানা নাই। বেদসেন বা বিশ্বকতাতই যে কোথা হইতে কিরূপে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না!

আর কিছু না হউক, বাঙ্গালীর কল্পনাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে নাই। সেই কল্পনার বলে নানারূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আবশ্যকমত শব্দ বা বাক্যবিশেষের অর্থান্তর গ্রহণ করিয়া আমরা কখন যে কাহাকে আনিয়া কোন্ রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া গ্রন্থরচনা করিতেছি, তাহা অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমরাই বুঝিতে পারি না! ইংরাজ ঐতিহাসিককে কল্পনাপ্রিয় বলিয়া দোষ দিলে কি হইবে? আমরা আদিশূরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে পরিচিত করিবার জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে কহিয়াছি তৎকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় ছিল না বলিয়া পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া দেশে ধর্ম্মসংস্থাপন করা প্রয়োজন হইয়াছিল! লোকনাথের ত্রিপুরা-তাম্রশাসন শীর্ষক প্রবন্ধে সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় বন্ধু রাধাগোবিন্দ বাবু দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্ব বঙ্গেই সেকালে (সপ্তম শতাব্দীতে) বেদবিৎ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। "চতুর্ব্বিদ্য" ব্রাহ্মণ ও আর্য্যগণের বাসস্থানের জন্য মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মা রাজসমীপে ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। * ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক শীর্ষক † প্রবন্ধে পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের নব প্রকাশিত রাজন্য কাণ্ড নামক সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের সমালোচনকালে কহিয়াছেন—"উহা রচনা-কৌতুকের আধার!" সকলগুলির ব্যাখ্যা করা দূরে থাকুক, উল্লেখ করিতে হইলেও এক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। 'কায়স্থ সমাজের বিশাল ইতিহাসের, মুখবন্ধ যে এইরূপ রচনা-কৌতুকের আধার হইয়াছে, ইহা যথার্থই অনুশোচনীয়।" দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই সকল গ্রন্থ বাঙ্গালার ইতিহাসরূপে

* লোকনাথের ত্রিপুরা—তাম্রশাসন—শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

† ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সমাদৃত হইবার জন্য দাবী করিতেছে ; কালে হয়ত ইহা হইতেই মতামত উদ্ধৃত হইয়া কত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচিত হইবে এবং বঙ্গের ঐতিহাসিকদিগের কল্পনা মার্শম্যানের কল্পনাকেও পরাজিত করিয়া কত নূতন নূতন তথ্য প্রচার করিবে!

বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক কহিয়াছেন—"এই খ্যাতনামা রাজার [বল্লাল সেনের] রাজত্ব সময়েই বিক্রমপুর ধনে, মানে, জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে জগতের এক শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। বিক্রমপুরের প্রতি মৃত্তিকাকণায় বল্লালের পদ-চিহ্ন একদিন অঙ্কিত হইয়াছিল, কৌলীন্যের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্তও বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে ইঁহার পবিত্র স্মৃতি বিরাজমান। অজ্ঞান শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এই মহানুভব রাজার কীর্ত্তিকাহিনী উপকথার ন্যায় বলিয়া থাকে।"

এ রচনা অতিশয়োক্তির নিদর্শন হইলেও ইহার মূলে সত্যের অভাব নাই। বল্লাল যে কীর্ত্তিমান নরপতি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু সে কালের সমৃদ্ধি ও গৌরবের আর কোন বিশেষ চিহ্ন এ অঞ্চলে বর্ত্তমান নাই। আছে কেবল দুইটী সুদৃঢ় সেতু। একটি মিরকাদিমের খালের উপর এবং অপরটী তালতলার খালের উপর। ইহাদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, বহুকাল পূর্ব্বেও বঙ্গের স্থাপত্যকলা সেতুনির্ম্মাণ বিষয়েও সমুন্নত ছিল। *

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণিত গজারি বৃক্ষের সন্নিকটেই ২০০ ফিট প্রশস্ত বিপুল পরিখায় পরিবেষ্টিত বল্লাল প্রাসাদের অবস্থান চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান আছে। অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ নাই, দেব-দেউলের ভগ্ন-স্তূপ নাই। এ রাজধানী হয়ত কেবল প্রথম বল্লালের অথবা উভয় বল্লালের যত্নে হর্ম্যে, তোরণে, দেউলে, উদ্যানে সুশোভিত হইয়াছিল। কোথায় প্রাসাদ, কোথায় প্রাকার, কোথায় উদ্যান, কোথায় রাজসভা ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করিবার এখন আর কোন উপায় নাই! আছে কেবল তিন সহস্র বর্গফিট আয়তনের একটী প্রকাণ্ড উচ্চ ভূমি। এখন উহার সকল অংশই কর্ষিত হইয়াছে। ইহাই এখন বাঙ্গালার সেন রাজবংশের অন্যতম

* It is said to have been built by Raja Ballal Sen before the conquest of Bengal by Mahomedans—List of Ancient Monuments.

Ibid.—There are 2 bridges in the neighbourhood which tradition ascribes to Ballan Sen. One is over the Mirkadim khal and is called the Ballal Bridge ; it has 3 arches and the piers are six feet thick. The other is a little further to the west and spans the Taltola Khal ; this also has 3 arches, but was blown up in the early days of British rule to enable large boats with troops to pass to and from Dacca.

অবস্থান-চিহ্ন—ইহাই এখন বিক্রমপুরের কীর্ত্তি ও গৌরবের শ্মশানভূমি! এই শ্মশান কি বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের কর্ম্মক্ষেত্র নহে? কে ইহার গর্ভ হইতে রত্ন আবিষ্কার করিবার জন্য অগ্রসর হইবে? যে এখন এই চিতাভস্ম লইয়া মূর্ত্তি গড়িবে—কে এখন সেই মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে? কে এখন অন্ধকার যবনিকা উত্তোলন করিয়া, সেই সুমহান বিরাট বিশাল জ্যোতির্ম্ময় অতীতকে মুগ্ধ নরনারীর নয়ন সমক্ষে আনিয়া ধরিবে? কোন্ ভক্তের অর্ঘ্য আবার পুরা-তত্ত্বের মন্দিরতলে নবীন পাদপীঠ রচনা করিবে? ঢাকার সাহিত্য-পরিষৎ কি এদিকে বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন?

এ অঞ্চলে বল্লালসেনের নামের সহিত একটী কলঙ্ককাহিনী বিজড়িতরহিয়াছে। কোন ডোমকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন। দেশের হিন্দু সমাজ যাহাতে রাজার এই কার্য্য অনুমোদন করেন সে জন্য রাজা উৎপাত করিতে ত্রুটী করেন নাই! উৎপাত এত অধিক হইয়াছিল যে দেশের লোক "স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষে!" হিন্দু সমাজের সহিত কলহ করি-য়াই রাজা ক্ষান্ত হন নাই, পিতার সহিত এই বিষয়ের ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি ডোম কন্যার রূপলালসায় পিতার সহিত কলহ করিয়াছিলেন!

ইনি কি সেই বল্লালসেন যিনি গোবিন্দপাল দেবকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া, বর্ম্মরাজকে পরাজিত করিয়া বঙ্গে এবং রাঢ়ে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন? ইনি কি সেই বল্লাল সেন যিনি শুধু বঙ্গ-বিজয়ে পরিতৃপ্ত না হইয়া কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন? এই কি সেই বল্লালের চরিত্র-কাহিনী যিনি দানসাগরের মঙ্গলাচরণে আপনাকে গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন?

বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক বলিতেছেন—"মহারাজ বল্লাল যে ১০৫০ শকাব্দ হইতে ১০৯০ শকাব্দ অর্থাৎ ১১১৮—১১৬৮ খৃষ্টাব্দ এই পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।" শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বল্লালের অদ্ভুতসাগর হইতে দেখাইয়াছেন, বল্লাল-রাজত্বের প্রথম বৎসর ১১৫৯ খৃঃ অব্দ বা ১০৮১ শক। বল্লালের দানসাগর রচনায় কাল ১০৯১ শক বা ১১৬৯ খৃঃ অব্দ। ইহারই পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১০৯০ শক বা ১১৬৮ খৃঃ অব্দে তিনি অদ্ভুতসাগর রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উহা শেষ না হইতেই স্বর্গারোহণ করিয়া-ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে বল্লালের রাজত্বকালে কোন ক্রমেই "পঞ্চাশ বৎসর" ব্যাপী ছিল না।

বিক্রমপুরের ইতিহাস হইতে জানা যাইতেছে—"ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম প্রভৃতির দত্ত মহাশয়দিগের কুর্ছিনামার উপরও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হইয়া থাকে—

চন্দ্রর্ত্তু শূন্যাবনিসংখ্যশাকে বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন, শ্রীমাননন্তস্ত জগাম বঙ্গং॥"

অর্থাৎ ১০৬১ শাকে বা ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমান্ অনন্ত দত্ত বল্লালের ভয়ে আপন গুরু শ্রীকণ্ঠ শর্ম্মাকে সহ বঙ্গে পলায়ন করেন।"

বল্লালের কলঙ্কটীকা সম্বন্ধে ইহাই কেহ কেহ বিশেষ প্রমাণরূপে ব্যবহার করিতে চাহেন। এই সঙ্গে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" ও "বৈদ্য কুলপঞ্জিকা" হইতেও শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়া থাকে যে, বল্লাল সত্যই চরিত্রহীন ছিলেন! কিন্তু দেখা যাইতেছে ১১৩৯ খৃঃ অব্দে বল্লাল আদৌ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন নাই! বল্লালের পিতা বিজয়সেনের রাজ্যকাল সম্বন্ধে যতই কেন মতভেদ থাকুক না, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে ১১৩৯ খৃঃ অব্দে তিনি গৌড়সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে রাজকুমার বল্লালের এতদূর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা ছিল না, যে অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দেশের লোক স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল! বল্লালের সমগ্র জীবন গৌড়রাষ্ট্র গঠন করিতেই ব্যয়িত হইয়াছিল। নিত্য রণকোলাহলে মত্ত থাকিয়া জন্মভূমির গৌরবরক্ষাই তাঁহার ব্রত ছিল। পিতৃদেবের উত্তুঙ্গ দেবমন্দির সমূহ এবং বহু বিতততন্ত্র যাহাকে সর্ব্বদা লোকহিতকর কার্য্যে উৎসাহিত করিত—ডোম কন্যার রূপমোহে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি আপন সমাজকে নিগৃহীত করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন কিনা তাহাও চিন্তার বিষয়। রূপতৃষ্ণার শান্তি বিধান করিবার জন্য যাঁহার চিত্ত অস্থির, অসিধারণ করিয়া জন্মভূমির উদ্ধার সাধন ও গৌরব-বর্দ্ধন তাঁহার ধর্ম্ম নহে!

বন্ধুদিগের সহিত বল্লাল-চরিত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে 'বল্লাল-ভিটায়' চতুঃসীমা মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কল্পনা সেই সুমহান অতীতকে জাগ্রত করিয়া দিল। দেখিলাম বল্লালের জয়স্কন্ধাবার পত্রে পুষ্পে সুশোভিত হইয়াছে। রক্ত পীত নীল শ্বেত জয়পতাকা ধীর পবনে দুলিতেছে, বঙ্গবীরের করধৃত অসি জ্বলিতেছে, জয়ঢক্কার বিপুল নিনাদে দিঙমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপতলে বহুমূল্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজ বল্লাল সেন রাঢ়-জয়কারী সেনাকুলকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিতেছেন, "শ্রীবর্দ্ধমান ভুক্ত্যন্তঃপাতী উত্তর রাঢ়া-মণ্ডলের" ভূমি দান করা হইতেছে।

ডাক্তার-বন্ধুর আহ্বানে চমক ভাঙ্গিল। দেখিলাম আমরা একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ের নিকট আসিয়াছি। শুনিলাম ইহারই নাম অগ্নিকুণ্ড! দ্বিতীয় বল্লালের রাজান্তঃপুরচারিকারা ভ্রমে পতিত হইয়া, মুসলমান শত্রুর হস্ত হইতে সতীধর্ম্ম রক্ষার জন্য এই কুণ্ড মধ্যে নাকি অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন!

দ্বিতীয় বল্লাল যখন শুনিলেন যে একদল মুসলমান সৈন্য রামপালের নিকট-বর্ত্তী আবদুল্লাপুরে সেনা সমাবেশ করিয়াছে এবং তাঁহার দুর্গ মধ্যে গোমাংস নিক্ষেপ করিয়াছে, তখন রাজাজ্ঞায় হিন্দু সৈন্য যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল। রাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে জননীর চরণ বন্দনা করিলেন, রোরুদ্য-মানা পত্নীদিগের সিক্ত বদনে চুম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা রোদন করিতে করিতে কহিলেন, 'নাথ, যুদ্ধে যদি অমঙ্গল ঘটে তবে আমাদের গতি কি হইবে?" রাজা গদ্‌গদ্ হইয়া পুনর্ব্বার চুম্বন ও আলিঙ্গনান্তর তাঁহাদিগকে অভয় দিলেন। স্থির হইল যে, রাজা যুগল কপোত লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিবেন। যদি তাঁহার পূর্ব্বেই কপোত প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তবে বুঝিতে হইবে যুদ্ধে অমঙ্গল ঘটিয়াছে—স্বধর্ম্মরক্ষার সময় নিকট হইয়াছে। পুরনারীরা তখনই যবন-স্পর্শকলঙ্ক হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্বপ্রস্তুত চিতায় আরোহণ করিলেন!

দ্বিতীয় বল্লালের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়গ্রাহী সন্দেহ নাই এবং আধুনিক বঙ্গবীরদিগের উপযুক্ত। তবে যে যুগের রমণীদিগের ব্রত কথায় "ঘোড়ায় আসি, দোলায় যাই" প্রভৃতি বীরনারীর উক্তি বর্ত্তমান ছিল, সে যুগের বীর রাজসহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। কিন্তু কবি গোপালভট্ট এইরূপই লিখিয়াছেন—

প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্ত্বালিঙ্গনচুম্বণাৎ।
স্ত্রিয়োঽব্রুবংস্ত রাজানং বাষ্পাকুলিতলোচনৈঃ॥
যদিস্যাদশিবং যুদ্ধে কিং নো নাথ গতিস্তদা।
ততো গদ্‌গদসৌ রাজা সংচুম্ব্যালিঙ্গ্যাৎ তাঃ পুনঃ॥

* * * *

কপোতযুগলং দূতং মমাঙ্গলসূচকং।
পূর্ব্বপ্রস্তুতচিতায়াং দৃষ্টৈব মরণং ধ্রুবং॥

বল্লাল যুদ্ধে গমন করিয়া অরাতি নিধন করিলেন। কিন্তু সে যুদ্ধ বীরের যুদ্ধ নহে, কাপুরুষের যুদ্ধ!

শত্রুর নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি দেখিলেন, বাবা আদম উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। নিরস্ত্র অরির শির ছিন্ন করিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বল্লাল সেন বাবা আদমের দেহে অস্ত্রাঘাত করিলেন! তাঁহার ছিন্ন শির ভূমিতলে লুটাইল। ইতিমধ্যে রাজার শিথিল বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তাঁহার অজ্ঞাতে কপোত-যুগল উড়িয়া গিয়া রাজপ্রাসাদে উপনীত হইল! রাজরমণীগণ অমনি কাল-বিলম্ব না করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নিমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন!

কপোত যুগল পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া বিজয়ী বল্লাল ক্ষিপ্রগতিতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, ধূ ধূ অনল জ্বলিতেছে—চিতাধূমে চারি-দিক সমাচ্ছন্ন—তাঁহার সকল সুখ সকল সন্তোষ ভস্ম হইয়া গিয়াছে! বল্লাল নিজেও সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন!

শুনিতে পাওয়া যায় কিছুদিন পূর্ব্বে মৃত্তিকা খনন কালে এই কুণ্ড হইতে অনেক অঙ্গার উঠিয়াছিল। ধনরত্নের লোভে অনেকে এই স্থান খনন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই! শুনা যায় কিয়দ্দূর খনন করিলেই জুইয়া নামক এক শ্রেণীর বিষাক্ত পিপীলিকা শাতে সহস্রে বহির্গত হইয়া খননকারীকে আক্রমণ করে?

ডাক্তার বন্ধু স্বয়ং এইরূপ দেখিয়াছেন বলিয়া আমরা খনন করিতে বিরত হইলাম।

অগ্নিকুণ্ডের নিকটেই একটী জলাশয় দেখিলাম। শুনিলাম ইহার নাম মিঠাপুকুর। পুষ্করিণীর জল ভাল বলিয়া বোধ হইল। অগ্নিকুণ্ড এবং মিঠা-পুকুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী ক্ষুদ্র স্তূপ দেখিলাম। অভ্যন্তরে ইষ্টক আছে বলিয়া বোধ হইল। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া একটু খনন করিতেই এক খানি ইষ্টক বাহির হইল। দেখিলাম উহার গাত্রে তক্ষণ-শিল্পের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। অনুমান হয় এখানে একটী মন্দির ছিল।

দুইটী পরিখার মধ্যভাগ দিয়া বল্লালবাড়ীর মতই উচ্চ যে প্রশস্ত ভূখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, ঐস্থানে পুরপ্রবেশের সিংহদ্বার ছিল বলিয়া কথিত হয়। এখন সেখানে সিংহদ্বারের কোন নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। সেই ভূখণ্ডের পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র খাল কাটা আছে। শুনিলাম উহা মুন্সীগঞ্জের কাটাখালি নামক খাল পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে যে পরিখা ছিল তাহা এখন বর্ত্তমান আছে। উহা সুবিস্তৃত। উহার কোন কোন স্থান শুষ্ক হইয়াছে। যেখানে জল আছে তাহাও

ঘন শৈবালে সমাচ্ছন্ন। উত্তর দিকের পরিখার অপর পারেই যে স্থান আছে তাহাকে এখন সিপাহীপাড়া বলে। পুররক্ষীদিগের বাসের জন্য ঐ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এখন সেখানে সারিবিন্যস্ত কদলীবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। নিকটবর্ত্তী পাইকপাড়া গ্রামও হয়ত সেকালে সেনানিবাস ছিল।

নিকটেই একটী দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে। উহা 'কোদাল-ধোয়া' দীঘি নামে পরিচিত। ইহার সহিতও একটী প্রবাদ জড়িত রহিয়াছে। যাহারা বল্লালদিঘি খনন করিয়াছিল, দিনের কার্য্য শেষ করিয়া তাহারা প্রতিদিন একই স্থান হইতে এক কোদাল করিয়া মাটী কাটিয়া পরে আপন আপন কোদাল ধুইয়া ফেলিত। এইরূপে মাটী কাটিতে কাটিতে একটী নাতিদীর্ঘ দীর্ঘিকা খণিত হইয়াছিল। এখন উহার অনেক অংশেই চাষ হইতেছে। মধ্যস্থলে একটী গোলাকার কাষ্ঠ প্রোথিত রহিয়াছে। পল্লীবালকগণ বলিল উহার নাম "নাগযষ্টি"। তীরের নিকটেই একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ তরণী ছিল। কৌতূহলী হইয়া মুন্সেফ-ভায়ার সহিত সেই তরণীযোগে নাগযষ্টির নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ডেপুটীভায়া এবং ডাক্তার-বন্ধু তখন শ্রান্তদেহে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া তাম্রকূট ও কমলালেবুর রস গ্রহণ করিতেছিলেন এবং যাহাতে আমাদের ভগ্ন জীর্ণতরী নিমজ্জিত হয় ভগবানকে ডাকিয়া তাহাই বলিতেছিলেন!

নাগযষ্টির নিকটে যাইয়া দেখিলাম উহা একটি গোলাকার সালকাষ্ঠ। যতই ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে ততই অল্পে অল্পে সরু হইয়াছে। উহা এখন জীর্ণ হইয়াছে। মাপিয়া দেখিলাম জলের উপর প্রায় দুই হস্ত এবং জলের মধ্যে চার হস্ত পরিমাণ বর্ত্তমান আছে। শিরোদেশের পরিধি প্রায় ১৷৷০ হস্ত হইবে। উহার গাত্রে কোনরূপ কারুকার্য্য নাই। শিরোদলের কিয়দংশ এরূপ ভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে দূর হইতে দেখিলে মনে হয়—কিছু যেন ছিল। অনুমান হয় পুররক্ষী ও অন্যান্য সৈনিকদিগের ব্যবহারের জন্য এই দীর্ঘিকা খনন করা হইয়াছিল।

কোদাল-ধোয়া দীঘি হইতে অল্পদূরেই বাবা আদমের মস্‌জেদ ও সমাধি। বাবা আদম আদম সহিদ নামেও আখ্যাত। তাঁহার ঠিক পরিচয় পাইবার কোন উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিম্বদন্তী—বাবা আদমের কাহিনী নানা ভাবে লোকসমাজে প্রচলিত করিয়াছে। উপাসনাকালে দ্বিতীয় বল্লাল-সেনের হস্তে তাঁহার হত্যা, তন্মধ্যে একটি। এরূপ প্রবাদও আছে যে তাঁহার সহিত বল্লালের চতুর্দ্দশ দিবসব্যাপী দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। সে সময়ে কেহ কাহাকেও

পরাজিত করিতে পারেন না। অবশেষে একদিন সায়ংকালে বাবা আদম উপাসনা-নিরত হইলে বল্লাল পশ্চাত হইতে তাঁহাকে আঘাত করেন।

বল্লালের অসি ব্যর্থ হইল। বাবা আদমের উপদেশে বল্লাল তখন তাঁহারই অসি দ্বারা তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করিলেন।

বাবা আদম কেন যে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন তাহার কোন বিশ্বাস-যোগ্য কারণ জানিতে পারা যায় না। এরূপ প্রবাদ আছে যে, দ্বিতীয় বল্লালের আদেশে রামপালের গো-হত্যা নিবারিত হইয়াছিল। কিন্তু একজন মুসলমানের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল সে তাহার পুত্র হইলে সে গোবধ করিয়া জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করাইবে। কালক্রমে পুত্র জন্মিলে সে গোহত্যা করিয়াছিল, কিন্তু একটী চিল একখণ্ড গোমাংস আনিয়া রাজপ্রাসাদে নিক্ষেপ করিলে পর বল্লাল অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই মুসলমানের শিশুটীকে পিতার সম্মুখেই নিহত করিয়াছিলেন।

পিতা শোকার্ত্ত হইয়া মক্কায় গমন করিলে পর বাবা আদমের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। প্রতিহিংসা সাধনের জন্য তিনি পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া যেরূপে নিহত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মৃত্যুর পর বাবা আদমের দেহ রামপালে এবং শির শ্রীহট্টে সমাহিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

বাবা আদমের মস্‌জেদটী এক সময়ে দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। কক্ষ, প্রাচীর ও বহির্ভাগ যে কারুকার্য্যময় ছিল, সে পরিচয় এখনও বর্ত্তমান আছে। এখন মস্‌জেদটীর জীর্ণ দশা। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৩ ফিট এবং প্রস্থে ৩৬ ফিট। কক্ষপ্রাচীরের বেধ ৬॥০ ফিট। ছয়টী গম্বুজে ইহার ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মসজেদগাত্রে যতগুলি ইষ্টক আছে, সমস্তই খোদিত লতাপুষ্পে সজ্জিত। ভিতরে পলতোলা দুইটী প্রস্তর স্তম্ভ আছে। উহারাই ছাদের খিলানগুলিকে রক্ষা করিতেছে। স্তম্ভ দুইটী বাবা আদমের গদা নামে পরিচিত! মস্‌জেদের শিরে আরব্যভাষায় যে প্রস্তর-ফলকলিপি আছে তাহা হইতে জানা যায়—মহম্মদসাহের পুত্র সুলতান জালালুদ্দীন আবুল্ মোজাফ্যর সাহ সম্রাটের পুত্র সুলতানের সময়ে ৮৮৮ হিজরীতে এই মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মস্‌জেদের নিকটেই বাবা আদমের জীর্ণ সমাধি বর্ত্তমান আছে। মস্‌জেদের চতুর্দ্দিকে গুবাক আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ এবং বাঁশঝাড় আছে বলিয়া স্থানটী শীতল ও অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। পূর্ব্বকথিত সিপাহীপাড়ার পর হইতেই ভূমি ক্রমেই নিম্ন হইতে নিম্নতর হইয়া নদীর দিকে আসিয়াছে। বাবা আদমের মস্‌জেদ হইতে ধলেশ্বরীর তীর ১॥০ মাইলের অধিক হইবে না।

রামপালে অন্য আর কিছুই দ্রষ্টব্য নাই। কিন্তু ঐ নামের সহিত বহু-কীর্ত্তি কাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেকাংশ ঐ নামের সহিত সংযুক্ত। রামপালের নাম শুনিলেই বরেন্দ্র কবি কলিকাল-বাল্মিকী সন্ধ্যাকর নন্দীর কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সেই "কলিযুগ রামায়ণ" রামচরিতের কথা; মনে পড়ে বঙ্গের বিপুল কৈবর্ত্তবিদ্রোহ। সেই বিগত-গৌরবের অতীত শৌর্য্যের, প্রথিত জ্ঞান-বৈভবের—সেই শিল্পসৌন্দর্য্যের, ধনৈশ্বর্য্যের, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের কত কথাই মনে পড়ে!

মনে পড়ে একদিন কারাক্লিষ্ট মহারাজ রামপাল তাঁহার জনকভূমি বরেন্দ্র ত্যাগ করিয়া শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অঙ্গ, মগধ এবং রাঢ় জনপদ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহার মাতুলমহলের নেতৃত্বে সামন্তগণে মিলিত হইয়া বিদ্রোহের দমন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। হৃত রাজ্য উদ্ধৃত হইলে পর রামপাল বরেন্দ্রভূমে যে নব রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ রামপালকেই সেই রামাবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। যাহা দেখিলাম তাহাই কি তবে সেই রামাবতীর চিতাভস্ম!

উত্তরবঙ্গে পাল রাজন্যবর্গের কীর্ত্তিচিহ্ন এখনও যেরূপ সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান—তল্লের পর তল্ল, কোথাও সোপানসম্বলিত ঘাট, স্তূপের পর স্তূপ, কোথাও ইষ্টক মণ্ডিত বাট—কোন স্থানে বিপুল গৃহভিত্তি, কোথাও চারুকারুমণ্ডিত প্রস্তরস্তম্ভ, কোথাও আবার ভাস্করের কঠিন হস্তে গঠিত নবনীতসদৃশ কোমল জীবন্তবৎ মূর্ত্তিনিচয়, আথৈর প্রভৃতি রাজনগরের ধ্বংসাবশেষ, জগদ্দল নামক গ্রাম—তথায় বৃত্তাকারে বৃহৎস্তূপ, স্তূপাভ্যন্তরে পাষাণস্তম্ভ—স্তম্ভগাত্রে চাকচিক্যময় কাচ—গ্রাম হইতে কিঞ্চিত দূরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল বিশাল দীর্ঘিকা—কোথাও আবার শীর্ণকায়া পুণ্যতোয়া তরঙ্গিণী, কোথাও বা তাহার প্রাচীন খাত—রামপালে এ সকলের কিছুই দেখিলাম না!

এই রামপালেই কি তবে অধুনা-বিলুপ্ত মহাতীর্থ অপুনর্ভবা—এইখানেই কি জাগদ্দল মহাবিহার—ইহাই কি পালরাজবংশের শেষ রাজধানী? অথবা ইহা রামপাল হইতেও বহু প্রাচীন অন্য কোন পরাক্রান্ত নৃপতির রাজনগর কিম্বা প্রথম বল্লালের একটী অন্যতম জয়স্কন্ধাবার মাত্র?

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

বিরহে।

ওগো কেমনে পরাণ ধরি ?
সবাই হেথায় তোমারি কথায় আছে বাড়ী ঘর ভরি !
বেড়ের বাগানে কোন্ কোন্ গাছ
রোপিয়াছ তুমি বলে সবে আজ,
কবে শৈশবে পাঠশালা হ'তে
লুকায়ে পলায়ে আসি—
যেপেছিলে সারা দিন আম পাড়ি
আরক্ত মুখে সাঁজে ফেরা বাড়ী
জননীর তা'য় কঠোর শাসন—
ক'ন তিনি হাসি হাসি !
আমি, আন্‌মনা ভাণে শুনে শুনে হই তন্ময় চিন্তায়,
ওরা, এক ডাকে কেউ জবাব না পেয়ে করে মোরে নিন্দাই।

ডাগর বড়ির অম্বল হ'লে
ভাল বাসিতে যে তুমি সবে বলে'—
সে দিন আমার কি যে দশা হয়—
কেমনে বলিব নাথ !
দেখিতে না পাই জল ভরা আঁখে
যেমন খাবার তেমনিটি থাকে,
সুধালে ননদী ঝালের অছিলা
করি ধুই মুখ হাত !
সব ; পড়শীরা ক'য়, বউটি দেখায় রোগা কেন দিন-দিন ?
ওগো, মুখের আহারে কিবা ফল হবে ? বুক যে খাদ্য হীন !

সংসারটির সব কায করি
দিন রাত খাটি তবু থাকে পড়ি,
তবু মনে হয় কোন কায নাই
দিন যেন নাহি যায় ;—

মাথার কাপড় খসে' পড়ে আজ
তুলিতে তাহারে নাহি আওয়াজ,
উঠানে দাঁড়ায়ে চুল শুকানোতে
　　　　নাহিও অন্তরায়!
রান্নাঘরের কানাচেতে যেথা আগে শুকাতাম মাথা,
এখন সেখানে যাবার যো নেই এত জমা ঘাস পাতা!
খিড়্কি দ্বারের পেয়ারার গাছে
এবার প্রথম ফল ধরিয়াছে,
যার তলে আসি নেয়ে এসে নিতি
　　　　শুকানো কাপড় লাগি
দাঁড়াতাম, তুমি চকিতে চাহিয়া
যাইতে সরিয়া উঠান ছাড়িয়া—
সেখানে এখন হইয়াছে জড়'
　　　　বাড়ীর ঝাঁটান' মাটি!
বন্ধুরা তব এই পথে যায় সুধায়ে কুশল তব,—
তাদেরে এখন এত ভাল লাগে—কেমনে তা' আমি ক'ব?
দাওয়ায় বসিয়া এবে চুল বাঁধি,
গৃহকোণ মোর মরিতেছে কাঁদি,
দেখে আরসীতে এই পোড়া মুখ'
　　　　চোখ ফেটে পড়ে জল;—
সেই পালঙ্ক সেই সে শয্যা,
সেই ঘরে ঢুকা নাহি সে লজ্জা—
নাহিক আবেশ বাধ' বাধ' ভাব
　　　　ঘোমটা টানার ছল!
নাহি দুরু দুরু পুলক বক্ষে,—সঙ্কোচ সুমধুর,
নাহি শিহরণ প্রীতির বেপথু, শুধু হাহা পরিপুর!
নাহি সঙ্কোচ ভয় ও ভাবনা
এবে কোন' কায খারাপই হোক্ না,—
কেউ নাই মোরে করিতে নিন্দা,—
　　　　কেমনে এখানে থাকি?

আনারে লক্ষ্যি হাসি মুখে কার'
সরস ঠাট্টা হয়নাক' আর ;
সেই জড় সড় ভাব ঘুচে গিয়ে
উড়ু উড়ু প্রাণ-পাখী !
চির পরাধীনে স্বাধীনতা কি গো এ কেন যাতনা ঘোর ?
কেড়ে লও তবে, দাও বন্ধন—মুছাও নয়ন-লোর !

সারাদিন তুমি থাকিতে ভিতরে
রাগিতাম তা'য় মিছে ছল করে—
'ও দিদি বারেক যেতে বল সরে'
বলিতে কি ছিল সুখ।
প্রাণের কথাটি বুঝিতে দয়িত
আর' কাছে-কাছে ঘুরিতে নিয়ত,
আনাতে কি আমি থাকিত তখন ?
হ'ত নানা ভুল চুক !
ওগো অকারণে হ'ত অপচয় কত শুনিতাম শত গালি—
সেই গালি যে আমার জীবনের সুখ—দেবতার বড় ডালি।

সারাদিন পরে নিশুতি রাত্র,
সেই যে মিলন ক্ষণিক মাত্র
তাই যে আমার সব-সেরা সুখ
সেইটুকু নাই বলি,—
এ জীবন আজি গুরুভার মম
নব যৌবন অভিশাপ সম,
সব সুখ মোরে করে পরিহাস—
রস-হীন এ সকলি !
তোমা ছাড়া এই জগত তিক্ত তোমারি পথটি চাওয়া—
এই কি বিরহ ? এযে অহরহ বেঁচে থেকে মরে' যাওয়া !

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু?

(কোন ফরাসী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।)

আমি তাহাকে পাগলের মতই ভাল বাসিতাম, হায় মানুষে ভালবাসে কেন বলিতে পার?

কেন ভালবাসে, কেমন করিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সৌন্দর্য্য একটিমাত্র মানবের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া অত্যুজ্জ্বল আলোকে আর সবই বিলুপ্ত করিয়া দেয়, জীবনের অশেষ চিন্তা পুঞ্জীভূত হইয়া কেবলমাত্র একটিমাত্র চিন্তায় তন্ময় করিয়া রাখে, একটিমাত্র কামনায় হৃদয় ভরপূর হইয়া যায়, একটিমাত্র প্রিয়নাম ইষ্টমন্ত্রের মত অন্তরে জাগরূক থাকিয়া, বিগলিত নির্ঝর ধারার ন্যায় নিরন্তর কল মধুর সঙ্গীতে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চাহে। অহোরাত্র সে জপ সাধনার আর অন্ত থাকে না, এ আরাধনার আর বিরতি নাই, এ পূজার অনুষ্ঠানে দেশ কাল পাত্র সকলই পবিত্র হইয়া যায়।

আমি আমার এ ভালবাসার কাহিনী তোমায় বলিব, একটি বারের এ কথা আমার চির জীবনের চিরদিনেরই কথা। আমি তাহাকে দেখিবামাত্রই ভাল বাসিয়াছিলাম, এ কথার এই সূচনা, আবার এই সমাপ্তি। একটি সম্পূর্ণ বৎসর ভরিয়া আমি তাহার স্নেহে, সমাদরে, তাহার দিব্য স্পর্শে, তাহার কমনীয় লাবণ্যে, তাহার বেশবিন্যাস, বিলাস বিভ্রমে, তাহার সেবা শুশ্রূষার সুধারসে সঞ্জীবিত ছিলাম। তাহারি মধ্যে আমার জীবনের সীমা আপনাকে সাঙ্গ করিয়াছিল। আমি তাহার স্বেচ্ছাবন্দী ছিলাম, দিবারাত্রির ভেদ আমার বুদ্ধি হইতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। ওগো আমি একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে, এই প্রাচীনা বসুমতীর মাতৃবক্ষের আশ্রয়ে আমি তখনও জীবিত আছি, না স্বর্গের চিরনবীন নন্দনোদ্যানের অভিনন্দিত অতিথি হইয়াছি।

তাহার পর সে মরিয়া গেল, কিসে, কেমন করিয়া, আমিও বলিতে পারি না। আমি যে এখনও সে কথা জানি না, কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় সে ভিজিয়া বাড়ী আসিয়াছিল, সেদিন বড়ই বৃষ্টি হইতেছিল। তাহার পরদিন হইতেই তাহার কাশী হইল, এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে সে শয্যাধরা হইয়া পড়িল। কি যে হইয়াছিল এখনও মনে করিতে পারি না। ডাক্তার আসিতেন, ঔষধ লিখিয়া দিয়া যাইতেন, ঔষধ আসিত, প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকেরা জোর করিয়া তাহাকে তাহা খাওয়াইয়া দিত। তাহার হাত দুখানি, কপালটুকু সর্ব্বদাই যেন পুড়িয়া

যাইত, জ্বরের তীব্র জ্বালায় বিষণ্ণ চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ত... কথা বলিলেই সে উত্তর করিত, কিন্তু মনে ত নাই কি কথা আমরা বলি... ছিলাম, আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি, একেবারেই ভুলিয়াছি। সে মরিয়া গে... তবু তাহার শেষ ক্ষীণ শ্রান্ত নিশ্বাসটুকু এখনও মনে পড়ে। শুশ্রূষাকারি... মাথা নাড়িয়া একবার বলিল, আমি বুঝিয়াছিলাম, আমি ত আগেই বলিয়াছিলাম।

তাহার পর আর কিছুই জানিনা, শেষ সৎকারের জন্য ধর্ম্মযাজককে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রমণী, এ কি তোমার বিবাহিতা পত্নী? আমার মনে হইল পুরোহিত যেন তাহাকে অপমান করিতেছেন। সে ত মরিয়াই গিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার আর কাহার কি অধিকার আছে? আমি সে পুরোহিতকে দূর করিয়া দিলাম। আর একজন আসিলেন, তাঁহার মনটি অতি কোমল, কথাগুলি বড়ই মধুর। তাহার সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলিলেন, আমি আর চোখের জল সামলাইয়া রাখিতে পারিলাম না। কতই কাঁদিলাম। কেমন করিয়া শেষ কাজ সমাধা করিবে, সে বিষয় তাহারা আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। কি শুনিয়া কি যে বলিয়াছিলাম, কিছুই আর ত মনে নাই, তবে তাহারা যখন তাহার কফিনের ডালা হাতুড়ি দিয়া পেরেক ঠুকিয়া, বন্ধ করিয়া দিল, সে শব্দ এখনও ভুলিতে পারি নাই। সেই ছোট্ট একটুকুখানি সিন্ধুক, তাহারই মধ্যে তাহাকে চিরদিনের মত বন্দী করিয়া রাখিল। হায় ঈশ্বর, একি ভবিতব্যতা! তাহার কবর হইল, কাহার? —সেই সুকুমারী তন্বী, লাবণ্যময়ী ললিতা তরুণীর! পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতিকার মত; মৃদু সুন্দর সেই ক্ষীণ দেহবল্লী মাটির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তাহারা পুতিয়া রাখিল। দুচারিজন স্ত্রীলোক বন্ধু তাহাই দেখিতে আসিয়াছিল। আমি পলাইয়া গেলাম, যতদূর পারি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলাম, তাহার পর সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়া হাঁটিয়া বাড়ী পৌছিলাম। পরদিনই বহুদূরে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

সবে মাত্র কাল আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। যখন আবার আমার ঘরখানি, আমার কেন, আমাদের সেই ঘর বিছানা তৈজসপত্র, মৃত্যুর পর মানব জীবনের যাহা কিছু অবশেষ পড়িয়া থাকে, তাহাই সব দেখিলাম, তখন আমার মনে দুঃখের বৃশ্চিক এমনি সুতীব্র দংশন করিল যে, আমি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িলাম, ইচ্ছা হইল ত্রিতলগৃহের সমুচ্চ বাতায়ন হইতে ফুটপাথের উপর ঝাঁপাইয়া

পড়িয়া আত্মঘাতী হই। সে দৃশ্যের মধ্যে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না, ঘরের সেই সঙ্কীর্ণ চারখানি প্রাচীর, যাহার মধ্যে তাহার সুখের আশ্রয়-নীড়টী রচিত হইয়াছিল, এখনও সেখানে তাহার অঙ্গ সৌরভ, কেশের সুবাস বসতি করিতেছিল, যাহার প্রত্যেক অণু পরমাণু তাহারই স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত, সেখানে আমার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল, আমি পলাইয়া আসিলাম। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে আসিতে বড় আয়নাখানির উপর আমার দৃষ্টি পড়িল, সম্মুখে দাঁড়াইলে তাহাতে আপাদমস্তক দেখা যায়, সাজিয়া গুজিয়া নিমন্ত্রণ সভায় যাইবার সময় কতবার সে ঐ খানির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া হাসিয়াছে। ফুলের মত অনুপম মুখখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কত ভঙ্গীতেই আপনাকে দেখিত। আয়না খানির সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম। কত বার বার তাহার ছায়া যে ইহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন, তবুও কি কোনই স্মৃতি রাখিয়া যাইতে পারে নাই? এও কি কখনও হয়, আয়নাখানি যে আমারই মত মুগ্ধ বিহ্বল আলিঙ্গনে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া ধরিত, তবে কেমন করিয়া তাহার ছবি মুছিয়া গেল? আমি একবার সেই অবিচলিত দর্পণখানি স্পর্শ করিলাম, মনে হইল যেন তাহাকে ভালবাসি; কিন্তু হায় তাহার মধ্যে জীবনের স্ফুলিঙ্গ মাত্রও অবশেষ নাই। একেবারে হিমার্ত্ত শীতলতা, সম্পূর্ণ জীবন-বর্জ্জিত। হায় স্মৃতির ছায়াবাজি, হায় আমার অতীতের মায়ামুকুর, তদ্গত আমার মন, কোন ছবিই ত মুছিয়া গেল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সবই কেবলই চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়, আর আমি যমযাতনা ভোগ করি। যাহারা ভুলিতে পারে তাহারাই সুখী। স্নেহপ্রীতি, স্মৃতিস্বপ্ন সবই যাহাদের অন্তঃকরণ হইতে তিরোহিত হয়, ঐ দর্পণখানির মত সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া হৃদয় যাহাদের স্বচ্ছ অনাবিল, তাহারা কতই না সুখী। ভুলিতে পারিলাম না বলিয়াই আমার দুঃখের আর অন্ত নাই।

আপনার অজ্ঞাতসারে কখন যে বাড়ীর বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম বুঝিতে পারি নাই। আমি সমাধি ক্ষেত্রের অভিমুখে চলিলাম। সেখানে তাহার সমাধি খুঁজিয়া লইতে কষ্ট হইল না। শ্বেত মর্ম্মর ক্রুশ চিহ্নিত নিরাভরণ সে সমাধি। তাহারই গাত্রে, এই কয়টি কথা খোদিত ছিল—"ভালবাসিয়া, ভালবাসা পাইয়া, তবে সে মরিয়া গিয়াছে।" আমি সেই স্মরণ-স্তম্ভের পাদদেশে মাথা রাখিয়া মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম—কতক্ষণ যে অতীত হইয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না। যখন বুঝিলাম তখন মনে স্থির করিলাম যে, সে রাত্রি সেখানেই

কাটাইব। একরাত্রি তাহারই সমাধির পার্শ্বে, সেই হিম-কঠিন পাষাণ ব্যবধানকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাটাইব। তাহার পর যেদিকে দুই চোখ যায় সেই দিকে চলিয়া যাইব। কিন্তু কেহ যদি আমায় দেখিতে পায় তবে ত থাকিতে দিবে না; তাই উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, সেখানকার রক্ষক মনে করিবে আমি বুঝি চলিয়া যাইতেছি। জীবিতের আবাস জনকোলাহলবিক্ষুব্ধ বিশাল নগরীর তুলনায়, মৃতের এই নিস্তব্ধ পল্লীখানি কতই ক্ষুদ্র; কিন্তু হায় তাহাদের সংখ্যাত জীবিতের অপেক্ষা অধিক বই অল্প নয়।

বংশপরম্পরায় যাহারা এই পৃথিবীর দিবালোকের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের জন্য কত সুবৃহৎ অট্টালিকা; কেমন প্রশস্ত রাজপথ সকলের আবশ্যক হয়, উৎসধারার স্বচ্ছ স্বাদু সলিল, দ্রাক্ষাপুঞ্জের মধুর রসধারা তাহাদের পানীয়, বসুমতীর বক্ষোজাত স্বর্ণ শস্যের অন্ন তাহাদের খাদ্য।

কিন্তু যাহারা মরিয়া গিয়াছে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া যাহারা ইহপরকালের সোপান সৃজন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জন্য কোন আয়োজনই নাই। কোথায় বা ক্ষেত্রের শস্য, কোথায়ই বা স্রোতস্বিনীর শীতল পানীয়—ধরিত্রী তাহাদের বক্ষে করিয়া লয়েন, তাহার পর অনন্ত বিস্মৃতি স্থির অন্ধকারের আচ্ছাদনে চির আবৃত করিয়া রাখে। আকাশে বাতাসে চারিদিকে, 'বিদায়' চিরবিদায়ের ক্লান্ত বাণী অবিরত ধ্বনিত হইতে থাকে।

সেই সমাধি-ক্ষেত্রের এক প্রান্ত একেবারে পরিত্যক্ত, মৃত-বসতি-বিহীন, স্মরণচিহ্ন সকল অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা ভগ্ন শিথিল অবস্থায়, বিস্মৃত স্নেহের বিষন্ন সাক্ষ্য সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ইহারই পার্শ্বে পতিত জমি সবুজ দুর্ব্বায় করুণ কোমল, দুদিন পরে নবাগত মৃত অতিথি সকল সেখানে আশ্রয় লাভ করিবেন। নূতন, পুরাতনের এই সন্ধি ক্ষেত্রে অনেকগুলি গাছে শোণিতোজ্জ্বল গোলাপ ফুটিয়া চারিদিক রঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে; তাহারই আশে পাশে সরল উন্নত দুচারিটি শিশু দেবদারু তরু, মৃতদেহের অবশেষ আহার করিয়াই তাহারা এমন সরস, সতেজ, জীবন্ত।

অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসিল, আমি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মৃতের চিরনিদ্রা তাহাও যদি ভাঙিয়া যায়, আমার অনবধানতায় যদি তাহারা ক্ষণিকের জন্যও দুঃখের পৃথিবীতে আবার জাগিয়া ওঠে, এই ভাবিয়া আমি বড়ই সাবধানে চলিতে লাগিলাম। কিছুই দেখা যায় না। চলিতে চলিতে আমি সর্ব্বাঙ্গে আঘাত পাইতে লাগিলাম, কই তাহার সমাধি ত খুঁজিয়া পাই না।

অন্ধের মত হাঁতড়াইয়া চলিলাম, প্রত্যেক ক্রুশ প্রতি লৌহ-রেলিং, প্রস্তর-স্তম্ভ স্পর্শ করিয়া করিয়া চলিলাম, অঙ্গুলি চালনা করিয়া খোদিত অক্ষরের লেখা নাম পড়িতে লাগিলাম। অহো, সে কি রাত্রি গিয়াছে, কি শোকগ্রস্ত বিভীষিকা-পূর্ণ, দীর্ঘ নিশীথিনী। আমি আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।

চন্দ্রহীন রাত্রি, অন্ধকার আর ঘুচিল না, চারিদিকে নিস্তব্ধ মূক সমাধি-চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহাদের সমবেত পাষাণ ভার যেন আমার বুকের উপর চাপিয়া পড়িল, আমি যেন অন্ধকারের মধ্যে প্রোথিত হইয়া যাইতে লাগিলাম। কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম বুঝিতে পারি নাই; হঠাৎ মনে হইল আমি যে সমাধির প্রস্তরাসনে বসিয়া ছিলাম, সেই নিশ্চল পাষাণ যেন নড়িতেছে। আমি একলম্ফে সে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলাম; দেখিতে পাইলাম সম্মুখে, আশে পাশে, চারিদিকেই সমাধিদ্বার সকল উদ্ঘাটিত; তাহা হইতে নর কঙ্কালগণ বাহির হইয়া আসিয়াছে—আমার সম্মুখের সমাধির ক্রুশের উপর লেখা ছিল "এইখানে—চির নিদ্রায় সমাহিত, ৫১বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি পরিবারবৎসল, সাধুপ্রকৃতি ছিলেন, তাঁহার প্রতি দেবানুগ্রহ নিয়ত বর্ষিত হইয়াছিল।" স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম সেই মাংসপেশীবর্জ্জিত নরকঙ্কাল ঝুঁকিয়া পড়িয়া এই লেখাটি পাঠ করিল, তাহার পর অস্থিসার অঙ্গুলি দিয়া খোদিত অক্ষরগুলি অতি যত্নে, দীর্ঘ অধ্যবসায় সহকারে মুছিয়া লিখিয়া দিল, "এইখানে—বিশ্রাম করিতেছে, ৫১বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়, সত্বর বিষয়াধিকারলাভ করিবার জন্য নিষ্ঠুর ব্যবহারের দ্বারা স্বীয় পিতার মৃত্যু ত্বরান্বিত করিয়াছিল, স্ত্রীকে নিয়ত যন্ত্রণাদানু, সন্তান গণকে উৎপীড়িত, প্রতিবেশীদিগকে প্রতারিত করিত; অশেষ কষ্টের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।" লেখা হইয়া গেলে মৃত ব্যক্তি একবার আপনার হস্তাক্ষর ভাল করিয়া দেখিল। আমি ফিরিয়া দেখিলাম. চারিদিকেই এই অত্যদ্ভূত ঘটনা ঘটিতেছে। তখন আমার ভয় দ্বিধা ঘুচিয়া গেল, আমিও দৌড়িয়া খুজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম—মনে নিশ্চয় জানিলাম যে তাহাকে আবার দেখিতে পাইব—আমার আশা ব্যর্থ হইল না। তাহাকে কঙ্কালাবশেষ দেখিতে পাইলাম, মুখখানি নিবিড় বস্ত্রাবৃত ছিল, তাহা দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিল না। যেখানে লেখা ছিল "সে ভালবাসিয়া, ভালবাসা পাইয়া তবে মরিয়াছে," তাহার স্থানে দেখিলাম লেখা রহিয়াছে "কোনও বর্ষার দিনে সে তাহার

প্রিয়জনকে প্রতারণা করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিল—বৃষ্টিতে ভিজিয়া আসিয়া কাশরোগে, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।"

শুনিলাম পরদিন প্রভাতে, তাহার সমাধির নিকট আমার আত্মীয় বান্ধবগণ আমাকে মৃতকল্প মূর্চ্ছাপন্ন অবস্থায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

উদ্দেশে

নীলমণি তুই কোথায় গে'লি ব'ল ;
আমি বেড়াই ডেকে, দিস্‌না সাড়া
(ও তুই) করিস্ কেন ছল !
কোন্ দেশে, তুই কোন্ প্রবাসে,
ভুলে আছিস্ কার আবাসে,
(আমার) হিয়ার মাঝে জ্বল্‌ছে অনল,
(আর) নয়নভরা জল।
যেথায় তুমি গেছ যাদু, ক'র্‌লে কি কেউ তোমায় যাদু,
ননী, ছানা, মিষ্টি মধু, দিয়ে রসাল ফল ?
দিন কয়েকের জন্যে ক্ষণিক,
দেখা দিয়ে গে'লে মাণিক,
(এত) রাগরাগিনী বাজিয়ে শেষে,
ভাঙ্গ্‌লি বাঁশীর কল।
ফেলে সকল গেছিস্ একা,
আর যদি তুই না দিস্ দেখা,
আমি কেমন করে আঁধার ঘরে,
(তবে) রইব একা বল্ !
আর কতদিন এমন ক'রে,
রব আমি পরাণ ধরে'
সেই মরণ দূতে পাঠিয়ে দিয়ে
আমায় নিয়ে চল্।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়।

সংস্কৃত নাটকের জন্ম-কথা *

[সার-সংগ্রহ—

মূল নির্দ্দেশের দুরূহতা—অভিনয়-প্রবৃত্তির বিকাশ, কর্ম্ম ও ভাবের অনুকীর্ত্তন—সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধীয় প্রধান মতসমূহের আলোচনা—নাচ হইতে নাটক 'নৃত্য' 'নৃত্ত' ও 'নাট্য'—আদিম অধিবাসিগণ ও নাট্যপ্রয়োগ—পুতুল খেলা ও নাটক—সংস্কৃত নাটকে বিদূষক চরিত্র—ভরতের মত জর্জ্জরোৎসব মহাঃ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের ব্যাখ্যা—মত সমূহের ত্রুটি-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস—নাট্যাচার্য্যগণের ধারা—ঋগ্বেদীয় সংবাদসূক্ত নাটকের বীজ ইন্দ্ররুদ্ধ বৃত্র ব্যাপার কর্ম্মকাণ্ডের যুগে অভিনয়ের প্রয়োগ; গদ্যের সন্নিবেশ—সূত্রবীর শব্দের অর্থ—নাট্য ও 'নটসূত্র'—ভরত ও ভরতপুত্র—ইন্দ্রপূজা ও 'ত্রৈগুণ্যোদ্ভব' নাট্যের মর্ত্ত্যে প্রচার—(আর্য্য) মার্গনাট্য সাহিত্য ও (প্রাকৃত) 'দেশী নাট্য সাহিত্য—মহাভাষ্যের কংসবধ ও বলিবন্ধ—সট্টক গোষ্ঠী, মূর্ত্তি প্রভৃতি—অভিনীত নাটকের সূত্রপাত—রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা—নাট্যশাস্ত্রের 'নাট্যশাপ' ও রাজসভায় নাট্যপ্রয়োগ—সংস্কৃত নাটকের বিকাশ—অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস—বহু শতাব্দীর পরিণতির ফল—কালগত মূল নির্দ্দেশের অসম্ভবতা—সংস্কৃত নাটকের প্রাচীনতা—সংস্কৃত নাট্যের উপর গ্রীক নাট্যের প্রভাবের কথা—উপসংহার]

যে কোন বিষয়েরই আদি নির্ণয় বা মূল নির্দ্দেশ করা যে কত সমস্যার কথা, তাহা মানবমাত্রেই অল্পবিস্তর বুঝিয়া থাকেন; তথাপি মানবের অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল এত প্রবল যে, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ব্রহ্ম হইতে তৃণগাছটী বা পাষাণখানির পর্য্যন্তও জন্মকথা মনের মতন করিয়া প্রকাশ করিতে না পারিলে মানব তৃপ্ত হইতে চাহেন না। জগতের দর্শন, বিজ্ঞান যুগে যুগে মানবের এই সনাতন প্রবৃত্তিরই সাক্ষ্য দিতেছে। স্থূল জগতের পদার্থসম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সূক্ষ্ম জগৎ বা মনোজগতের পদার্থ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অধিকতর সমস্যার কথা; কিন্তু শেষোক্ত বিষয় সমূহেও মানব-মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া সংশয় অন্ধকারের মধ্য হইতেও সিদ্ধান্তের দীপ্তি প্রকাশ করিবার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। মানবজাতির মধ্যে নাট্যসাহিত্যের আদিনির্ণয়ের চেষ্টাও এইরূপই চিন্তার ফল। আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে, ক্রিয়া ও চেষ্টাকে, নাম ও রূপ দ্বারা

* উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহীর অধিবেশনে পঠিত।

ব্যাক্ত করিবার আকুল পিপাসা হইতেই নাট্যের উৎপত্তি—ভরতের ভাষায়, ভাব এবং কর্ম্মের অনুকীর্ত্তন হইতেই নাটকের জন্ম। তাই মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে মানবজাতির মধ্যে গীতি-সাহিত্য মহাকাব্য এবং নাট্য সাহিত্য ক্রমপরম্পরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নাট্য-সাহিত্যে কবির কৃতিত্ব, কৌশল ও সংযমের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়—প্রতীচীর কবিসম্রাটের ভাষা "কল্পনায় ভরপূর" (of imagination all compact) নাটককার সম্বন্ধে যেমন অনবদ্যভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে এমন অন্য কোনও রাজ্যের কবিসম্বন্ধে নহে।

মানবপ্রকৃতি মূলতঃ একং কাজেই ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের আদিতত্ত্বের ভিত্তি ও এই পূর্ব্বোক্ত সার্ব্বজনীন প্রবৃত্তি। তথাপি দেশকালাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভেদে ভারতে যে নাটক প্রবর্ত্তনের চেষ্টা, এবং তদুপযোগী অনুষ্ঠান অন্যত্র হইতে বিভিন্ন হইতে পারে তাহা একেবারে অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান কালে আমরা যে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের প্রাচীনতম নমুনাও পাইয়া থাকি, বলা বাহুল্য তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নাটকের পরিণতি ও উৎকর্ষের যুগের পরিপুষ্ট জিনিষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে *। সর্ব্বাঙ্গে শাস্ত্রাবৃত গ্রীক দেবী মিনার্ভার মত সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যও আমাদের নিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আমাদিগকে এই পরিণতির ক্রমিক ধারা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, আর্য্য সাহিত্যের বর্ত্তিকা সাহায্যে এই রহস্যান্ধকার বিদূরিত করিতে হইবে, রূপকের ঘনঘটা হইতে সত্যের বিজলী-রেখার আভাস লক্ষ্য করিয়া নাটকের পরিপুষ্টির পথ বাহির করিতে হইবে। এরূপ ব্যাপারে মতের অনৈক্য। থাকা বিচিত্র নহে—সুতরাং আমাদের বক্তব্য নিবেদন করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত মতবাদের ভিতর প্রধান তিনটী মতের উল্লেখ করিব।

অধ্যাপক বেবার, মিঃ উইলিয়ম্‌স্‌ ম্যাক্‌ডোনেল প্রমুখ পাশ্চাত্য সুধীগণের মতে নৃত্য বা নাচ হইতেই ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি †। তাঁহাবা বলেন নাটক সংজ্ঞাই তাঁহাদের মতের প্রকৃষ্ট পরিপোষক। সংস্কৃত নৃত্‌ ধাতু হইতে প্রাকৃত নট্‌

* We see the full-blown without a trace of the bud—S. M. Mitra, Anglo-Indian Studies.

† অধ্যাপক ডনাল্‌ডসন্‌ জর্ম্মান সাহিত্যিক হার্ডারের মতের অনুসরণ করিয়া সাধারণ ভাবেই বলেন—Dramatic poetry arose not at the altar but in wild merry dances.

ধাতুর উৎপত্তি, তাহা হইতে নট, নাটক প্রভৃতি কথা আসিয়াছে। প্রথমে আমোদ প্রমোদের জন্য কতকটা অভব্য শ্রেণীর অঙ্গবিক্ষেপ (তাণ্ডব), পরে তাললয়ের সহিত সবিলাস "লাস্য" সঙ্গীত, অবশেষে হাবভাবের প্রকাশক কথোপকথনের বিন্যাস—প্রথম "নৃত্য", পরে "নৃত্ত" শেষে "নাট্য"*, এই হইল নাটক অভিব্যক্তির ধারা। অতি প্রাচীনকালে ভারতের আদিম অধিবাসিগণ তাহাদের ভাষায় (অপভ্রংশ ভাষায়) এই সকল নাটকের অভিনয় করিত। অথর্ব্ব বেদসংহিতায় এইরূপ নৃত্যগীতাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক সিল্‌ভান্ লেভি, বার্থ, শ্রীযুক্ত গ্রিয়ারসন্ প্রভৃতির মতে এই লোক-নাট-সাহিত্যের অনুকরণে শিষ্টজন-সংস্কৃত-সাহিত্যে নাটক অভিনয় প্রবর্ত্তিত হইল †। অধ্যাপক কীথ মহোদয়ও এই পক্ষের সমর্থনকারী বলিয়া মনে হয়। ‡ সম্প্রতি অধ্যাপক হরউইট্‌জ * বলিতেছেন যে, বেদের সংবাদসূক্ত সমূহের রচনার পূর্ব্বেও আদিম অনার্য্য অধিবাসিগণের মধ্যে তাহাদের দেবতা শিব প্রভৃতির উৎসব উপলক্ষে এইরূপ তাহাদের অভিনয়ের প্রথা বর্ত্তমান ছিল।

সুপণ্ডিত অধ্যাপক পিশেল মহোদয় বলেন, পুতুলের সং খেলাই (puppet pl y) হইল নাটকের পূর্ব্ব নিদর্শন †। অনাবৃত বিস্তৃত প্রাঙ্গনে সাধারণতঃ

---

* গাত্রবিক্ষেপমাত্রন্তু সর্ব্বাভিনয়বর্জ্জিতং।
আঙ্গিকোক্ত প্রকারেণ নৃত্যং নৃত্যবিদো বিদুঃ॥
দশবিধা প্রতীতো যস্তালমানলয়াশ্রিতঃ।
সবিলাসাঙ্গবিক্ষেপো নৃত্তমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য নানাবস্থান্তরার্থকঃ।
সাঙ্গাভিনয় নৈর্যুক্তো নাট্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ সঙ্গীত রত্নাকর।

† Dr. Grierson on M. Barth's Review of Leri's theatretde Indian (Indian Antiquary

‡ Dr. A. B. Keith—The Vedic Akhyana and the Indian Drama—J. R. A. S.—1911 pp. 1008-09.

* E. P. Horrwitz—The Indian Theatre.—"The Vedic dialogues reflect the afterglow rather than the first morning flush of the rude representations staged in the vulgar tongue of Kreshna' sand Siva's ancient mysteries."

† It in not improbable that the puppet is in reality everywhere the most ancient form of dramatic representation. Without doubt this is the case in India "Mrs. Vyvyan's Translation of Pischel's the Home of the Puppet Play."

দাসশ্রেণীর লোকেরা নানারূপ পুতুলের সং লইয়া আত্মবিনোদন করিত। পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে (মহাভারত, ৪।৩৭।২৯, দশকুমারচরিত, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, প্রিয়দর্শিকা) পাঞ্চালিকা, দারুস্ত্রী শালভঞ্জিকা, পুত্তলিকা প্রভৃতি কথা এই লুপ্ত প্রায় প্রথার স্মৃতি অটুট রাখিয়াছে। শ্রীযুক্ত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত মহোদয়েরও * ধারণা এইরূপ। ক্রমে এই সং সকল কথা কহিতে লাগিল—একগাছি সূত্রের সাহায্যে এইরূপ এক একটী সং রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত হইত। নীচ হইতে বা পার্শ্ব হইতে মানুষে কথা কহিত। এইরূপে প্রথম অবস্থায় নাট্য অভিনয় চলিত। হর্ষচরিত ও বাসবদত্তা প্রভৃতিতে এইরূপ পুত্তলিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে এইরূপ "সূত্র প্রোত" "দারুময়ী যোষার" উপস্থাপন "পুরাতন ইতিহাস" (৩।৩০।২১,২৩) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন প্রয়োগ সমূহে যে ব্যক্তিকে সূত্র ধরিয়া সকল সংয়ের সময়মত সন্নিবেশ করিতে হইত, তাহার নাম ছিল সূত্রধার এবং যাহাকে সং উত্থাপিত করিতে হইত, তাহার নাম ছিল "উত্থাপক" (হরবিজয় ৪০।৩৮) বা "স্থাপক।" পরবর্ত্তী সভ্যতর যুগে এই দুই ব্যক্তির কার্য্য একজনের দ্বারাই চলিত—তাই অলঙ্কারশাস্ত্রে † দুইটি নাটকীয় পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ থাকিলেও এক সূত্রধারের দ্বারা কার্য্য সমাহিত হইতে পারে বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। রাজশেখরের বালরামায়ণ ‡ ও জয়দেবের প্রসন্নরাঘব * নাটক হইতেও এইরূপ পূর্ব্বতন প্রথার আভাষ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের আর্য্যগণ এই প্রথার অনুকরণ † করিয়াই তাঁহাদের কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে গান ও কথোপকথনের সন্নিবেশ করেন; কালক্রমে উন্নততর হইলে উহা হইতেই পরবর্ত্তী শিষ্টজন সাহিত্যে নাটকের সৃষ্টি হইল। পিশেল মহোদয়ের মতে সংস্কৃত

---

* Vide Notes, Vikramorvasi (Page 4)

† বালরামায়ণ— সূত্রধারচলদ্দারুগাত্রে যং যন্ত্র জানকী
বক্তু শারিকালাপা লঙ্কেন্দ্রং বঞ্চয়িষ্যতি॥

‡ প্রসন্নরাঘব— নরকরাগ্র সূত্রলগ্নাশ্লিষ্টবৃত্তীঃ।

* যথা বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে ধনঞ্জয়ের দশরূপকে।

† "On solemn occasions such as that of the sacrifice of a horse it was the custom in vedic times to recite old histories and songs, and the performers, the priests of the Rig-Veda and the Yajur-veda spoke turn about These are no doubt (?) characteristics which remind us of popular performances –" Pischel's Home of the Peppet play (Transln).

নাট্য-সাহিত্যে বিদূষক চরিত্রের সন্নিবেশই * পূর্ব্বতন অনার্য্য প্রয়োগসমূহের সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগেও জাভাদ্বীপপ্রবাসী হিন্দুদের মধ্যে নাকি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে নাটকের অভিনয় হইত †। অতি প্রাচীন কালে গ্রীস্, পারস্য ও রুষ দেশেও এই উপায়ে রূপকের অভিনয় হইত বলিয়া অনেকের ধারণা ‡।

ভরত মুনির "নাট্যশাস্ত্রে" "বেদসম্মিত" নাট্য-বেদের উৎপত্তির অথবা মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রচারের কথা বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা "সার্ব্ববর্ণিক" পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্ম, অর্থ, যশ প্রভৃতির উপদেশ, ইতিহাস ও শাস্ত্রার্থের নির্দ্দেশ এই নব্য বেদে লোকশিক্ষার্থ নিবদ্ধ হইল। চারি বেদ হইতে ইহার উৎপত্তি।

জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্ব্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্ব্বনাদপি॥
বেদোপবেদৈঃ সম্বদ্ধো নাট্যবেদো মহাত্মনা।

(নাট্যশাস্ত্র ১।১৭।১৮)

ঋগ্বেদ হইতে কথোপকথনের অংশ, সামবেদ হইতে গীত, যজুর্ব্বেদ হইতে অনুকরণাত্মক ক্রিয়াকলাপ এবং অথর্ব্ববেদ হইতে রসের সংগ্রহ করিয়া নবীন নাট্য উৎপন্ন হইল। উপস্থিত "ইন্দ্রধ্বজ মহোৎসবে" ভরতমুনির নেতৃত্বে পৃথিবীতে প্রথম নাটকের অভিনয় হইল—সেই নাটকের উপজীব্য বিষয় ছিল দেবতাগণের নিকট দৈত্যগণের পরাজয়। দেবগণের কৃপাদৃষ্টিসত্ত্বেও প্রয়োগ সুসম্পন্ন হইল না—বিরূপাক্ষপ্রমুখ দৈত্যগণ মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিল। নাটকের উদ্যোক্তৃগণের সহিত এই দৈত্যগণের তুমুল কলহ বাধিয়া গেল—অনন্যশরণ

* "Literature in India early came into the hands of the priests and it is quite incredible that they would have adopted a figure such as the Vidusaka into the artistically developed drama, had it not been so closely connected with the stage in the minds of the people that its exclusion was impossible"—Mrs. Vyvyan's Transln of Pischell's The Home of the Puppet- play.

† Encyloopaedia Brittanic 11th Edn—Drama

‡ "Of a marionette theatre, at all events, we must not think, though the Javanese puppet-shows might tempt us to do so"—Prof Weber's History of Indian Literature (Trans) Footnote.

হইয়া উদ্বোক্তৃগণ ইন্দ্রধ্বজরূপ প্রহরণ দ্বারা দৈত্যগণকে "জর্জ্জরীকৃতদেহ তাড়িত ও নিহত করিলেন। সেই হইতে ইন্দ্রধ্বজের নাম হইল "জর্জ্জর" উদ্বোক্তৃগণের সেদিন কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইল। অভিনয়ের সহিত রঙ্গ-পূজা (জর্জ্জরপূজা, প্রবর্ত্তিত হইল, নাট্যমণ্ডপ যথাবিধি নির্ম্মিত হইল এবং এখন হইতে ভরত সুত নটগণের অনুরোধে পাঁষণ্ড কষায় বসনগণ উৎসারিত হইলেন। "অমৃতমন্থন" ও "ত্রিপুরদাহ" এইরূপে প্রযুক্ত নাটকসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেবদেব শিবের অনুরোধে অঙ্গহার (নৃত্য) * নাটকের মধ্যে নিবদ্ধ হইল। দেবগণ ভরত ও ভরতসুতগণের এই সকল প্রয়োগে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন। ভরত ব্রহ্মার নিকট এই বেদ বিষয়ে উপদিষ্ট হন—ব্রহ্মা আবার শঙ্করের নিকট শিক্ষালাভ করেন (নাট্যশাস্ত্র,) ৩৬।২২)। কালক্রমে এই নাট্যবেদ মানব-সমাজে বহুল প্রচার হইয়া পড়িল, লোকের বিনোদন ও উপদেশ সাধনকল্পে ইহা এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল।

এই হইল নাট্য-শাস্ত্রের মতে নাটকপ্রচারের ইতিবৃত্ত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় নাট্য-শাস্ত্রের এইরূপ উক্তি হইতে "জর্জ্জরাৎসব" † হইতেই নাট্যের উৎপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। এই রূপ মতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। যে দেশে "যোগীশ্বর পুণ্য পরশে মূর্ত্তরাগ উদিল হরষে," সে দেশে ইন্দ্রপূজা হইতে নাট্যের উৎপত্তি হওয়া একেবারেই কল্পনার কথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু "জর্জ্জরোৎসব" যে অভিনয়, প্রয়োগের প্রথম অবস্থা সে বিষয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্র অসন্দিগ্ধভাবে সাক্ষ্য দিতেছে না—বরং ইহার পূর্ব্বে স্বর্গে নাট্য অভিনীত হইত, এ কথা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নাটকের অবতারণা—(যাহা ভরত ও ভরতসুতগণের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে)—রূপকব্যতীত কিছু নহে। এই বিষয় বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা নাট্যশাস্ত্রে ও অন্যত্র যে নাট্যাচার্য্যের সম্প্রদায়ের নির্দ্দেশ পাইত তাহার উল্লেখ করিব। আমাদের ধারণা, এই ধারায় নির্দ্দিষ্ট ক্রম হইতে নাট্যোৎপত্তি সম্বন্ধে কতক কথা বাহির হইবে।

* নাট্যশাস্ত্র ৪।১২-১৬

†. R. A. S. B. October 1909. বন্ধুবর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ও(প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২১) শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহোদয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে শিব ব্রহ্মা ভরত ভরতসুতগণ—এই হইল নাট্যাচার্য্যগণের ধারা। শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরেও পাই,

সদাশিবঃ শিবো ব্রহ্মা ভরতঃ কশ্যপো মুনিঃ।

* * * *

ব্যাখ্যাতারো ভারতীয়ে—

শুভঙ্করও বলিতেছেন,

ইহানু শ্রূয়তে ব্রহ্মা শক্রেনাভ্যর্থিতঃ পুরা।
চকারাকৃষ্য বেদেভ্যো নাট্যবেদন্তু পঞ্চমম্॥
তত্রোপবেদো গান্ধর্ব্বঃ শিবেনোক্তঃ স্বয়ম্ভুবে।
তেনাপি ভরতায়োক্তস্তেনমর্ত্ত্যে প্রচারিতঃ॥
শিবাজ্জযোনি ভরতাস্তস্মাদস্য প্রয়োজকাঃ।

সুতরাং তিনখানি তালিকা হইতেই প্রথম তিন জনের নাম অবিসম্বাদিত ভাবে মিলিয়া যাইতেছে। শিব শুধু নাট্যশাস্ত্র কেন, শব্দশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রের আদিম প্রযোক্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন *। তিনিই নটরাজরাজ,† নটেশ্বর, মহানট ‡ আদিনট, নাট্যপ্রিয় †। এই প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত মতের সমর্থকগণ বলিবেন, শিব হইতে তাণ্ডব নৃত্যের কথা স্বতঃই আসে—তণ্ডু, তাণ্ডব নৃত্যের প্রবর্ত্তয়িতা শিবেরই অনুচর। যাঁহারা দ্বিতীয় মতের পক্ষে, তাঁহারা বলিবেন, শিব আদিম অধিবাসিগণের দেবতা—সুতরাং আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে যে নাট্যের প্রথম বিকাশ হয়, নাট্যাচার্য্য সম্প্রদায়ের এই ধারাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নাট্যকের অবতারণার বিষয় (যাহা স্পষ্টই ভরত ও শুভঙ্কর কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে) কোনও মতেই সহজবোধ্য নহে; পক্ষান্তরে, স্বর্গ ও বৈদিকযুগের দেবতার সহিত নাটকের জন্মকথা জড়িত, নাট্যবেদ "বেদবেদাঙ্গসম্ভব" এরূপ প্রমাণও বর্ত্তমান। লেভিপ্রমুখ সুধীগণও

* নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্।
উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদি সিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালং॥
† গুহাশিল্পেও শিবের 'নটরাজরাজ' আকার পরিলক্ষিত হয়।
নন্দিকেশ্বরকৃত কাশিকা ও বালমনোরমায় উদ্ধৃত।
Vide Archaeological Report, 1903-04. Page 67.
†† ত্রিকাণ্ডশেষ।
††† হেমচন্দ্রকৃত অভিধানচিন্তামণি। † আদিনটঃ সুরাণাং—সঙ্গীতবিদ্যাবিনোদ॥

সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের বেদের সহিত অল্প বিস্তর সম্বন্ধ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। বেদের সূক্তসমূহ হইতে ধারাবাহিকরূপে অভিনয় ও নাট্য-সাহিত্যের বিকাশ কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল, তাহারই পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

ঋগ্বেদসংহিতার সংবাদসূক্ত (বৃহদ্দেবতা) সমূহই * ভাবী নাটকের বীজ বলিয়া অনেকের ধারণা। এই সকল সূক্তে বৈদিক যুগের দেবতায় দেবতায় কথোপকথন, অথবা দেবতা এবং তাঁহার ভক্ত ঋষির মধ্যে কথোপকথন নিবদ্ধ আছে। ইহার মধ্যে কোনও কোনও সূক্তে † মরুৎগণ, রুদ্র ও ইন্দ্রকে তুষ্ট করিবার জন্য বৈদিক ঋষিগণের আকুল প্রার্থনা সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের শিব বৈদিকযুগের রুদ্রের প্রতিনিধি। ‡

এই রুদ্র বৈদিকযুগের শেষভাগে মরুৎগণের স্থানাভিষিক্ত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগের ব্রহ্মা বৈদিকযুগের উত্তরকালের দেবতা ব্রহ্মনস্পতি—তিনিই প্রার্থনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। পরবর্ত্তী যুগের ইন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের দেবতার সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও শুধু "কামবর্ষী পর্জ্জন্য" ভাবেই অর্চ্চিত হইয়াছেন। কাজেই পূর্ব্বে যাহা প্রাকৃতিক শক্তির স্তুতি ও আনুকূল্যার্থে ঋক্‌সংহিতায় স্থান পাইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী সাহিত্যে রূপকছলে অন্য আকার ধারণ করিয়া

---

* এগুলি কখন কখন বৈদিক সাহিত্যে ইতিহাস নামেও উল্লিখিত হয়। অধ্যাপক ডাঃ ওল্‌ডেন্‌বার্গ আবার এগুলিকে আখ্যান নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা এই কথোপকথনের অংশগুলি পূর্ব্বে গদ্যাত্মক রচনার দ্বারা সংযুক্ত ছিল, কিন্তু কালক্রমে ঐ গদ্যাংশগুলি বিশ্লিষ্ট ও লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মত উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এ মতের প্রতিবাদী ডাঃ কীথ্ মহোদয়ের যুক্তি প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত Windisch মহোদয় একটু ভিন্ন সুরে এই মতের উল্লেখ করেন।

† ঋক্ সংহিতা ১।১৭০, ১।১৬৫ Sacred Books of the East Seriesএর ১ম খণ্ডে প্রথম সূক্তটীর প্রসঙ্গে অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

‡ শিবকে আদিম অধিবাসিগণের দেবতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। শিব ঐতরেয় আরণ্যকে প্রসিদ্ধ দেবতা। বাজসনেয়ী সংহিতা শতপথ ব্রাহ্মণ ও অথর্ব্ববেদ-সংহিতার কোন কোন অংশ হইতে শিব ও রুদ্রের অভিন্নত্ব পরিস্ফুট হইবে। অবশ্য ইহা একেবারে অসম্ভব নহে যে পৌরাণিক যুগের শিবে ইহার সহিত আদিম অধিবাসিগণের vegetation spiritএর কতক ধারা আসিয়া মিলিয়া গিয়া থাকিবে।

নাটকের জন্মকথার বিবরণে অতিলৌকিকত্বের * অবতারণা করিয়াছে। জাপানীয় (Japanese Lyric Drama) ও গ্রীকনাট্য সাহিত্যও এইরূপ প্রাকৃতিক শক্তির স্তুতি হইতে জন্ম পরিগ্রহ †করিয়াছে বলিয়া অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা। পরবর্ত্তী সংস্কৃতসাহিত্য হইতে (বুদ্ধচরিত ১।৬৩, বৃহৎসংহিতা, ভবিষ্যোত্তর পুরাণ ‡) ইন্দ্রধ্বজোৎসব যে প্রাকৃতিক শক্তিরই স্তুতি তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ডাঃ কীথ্ মহোদয়ের মতে শীতকালের অবসান ও বসন্তকালের প্রাদুর্ভাবই হইল প্রাকৃতিক ঘটনা, যাহা আদিমকালে ভারতীয় নাট্যের বীজ বপন করিয়াছে। তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি মহাভাষ্যে উল্লিখিত কংশবধ নাটককে প্রাচীনতম নাটকের * ভাবগত প্রকৃত আদর্শ মনে করিয়া মহাভাষ্যস্থ সন্দর্ভ ও গ্রীক সাহিত্যের সৌসাদৃশ্যের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আদিম ভারতবর্ষবাসী এরূপ এক সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা অপেক্ষা মৌশুমী বায়ুর প্রবাহ † এবং তজ্জন্য বৃষ্টি সৃষ্টির বিষয়কে অধিকতর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেন। বেদ সংহিতায় ইন্দ্রবৃত্র ব্যাপারের প্রাধান্য খ্যাপন ও পরবর্ত্তী যুগে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ইন্দ্রধ্বজ মহোৎসবের সহিত নাটকের সম্বন্ধ স্থাপন, এ বিষয়ে সাহিত্যের দিক দিয়া প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুধীগণ এস্থলে কোন্ পক্ষ অবলম্বন যুক্তিযুক্ত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ যুগে নাটক অভিনয় বিষয়ে কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তন ঘটিল। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের সময় সম্বাদসূক্ত সমূহের মধ্যে কোনও কোনটী পঠিত বা গীত হইতে লাগিল—তাহার সহিত অনুষ্ঠান (অঙ্গবিক্ষেপাদি) প্রবর্ত্তিত

* আদিম মানবের এইরূপ প্রয়াস সে অত্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ ছিল তাহা মনীষী ডাঃ ফ্রেজার মহোদয়ের প্রবন্ধসমূহে সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহার The Golden Boughএর ৪র্থ খণ্ডের The myth of Adonis প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। † † Encyclopeadia Brittannica এবং I Am Or Soc. 1901 দ্রষ্টব্য।

গ্রীক্ নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে চিন্তাশীল লেখক ডাঃ ফার্ণেলের মতও তুলনা করিবার যোগ্য।

‡ এবং যঃ কুরুতে যাত্রামিন্দ্রকেতোর্যুধিষ্ঠির।
পর্জ্জন্যঃ কামবর্ষী স্যাত্তস্য রাজ্যে ন সংশয়ঃ॥ ইত্যাদি

† Ragorinএর Vedic India এবং Muirএর Sanskrit Texts দ্রষ্টব্য।

‡ "The clear evidence of the Mahabhashya proves the connection of the earliest Indian literary form which was clearly dramatic (?) with the contest of the two figures Kamsa & Krisna—" P 416. I. R. A. S. 1912.

হইল *। উৎসবের আড়ম্বর প্রযুক্ত নৃত্যাদির আড়ম্বর সংসাধিত হইল "কর্ম্ম ও ভাবের অনুকীর্ত্তন" জটিল হইতে জটিলতর অবস্থায় উপনীত হইতে লাগিল। পুরোহিতগণের মধ্যেও কর্ম্মবিভাগ প্রবর্ত্তিত হইল; মন্ত্রের সহিত গদ্যও সন্নিবিষ্ট হইল—এই হইল অভিনয়াত্মক রূপকের জন্ম। † বাঙ্গলার পূর্ব্বতন যাত্রাগুলির ন্যায় এ সমস্ত নাটকে গদ্যাত্মক কথোপকথনাংশ অপেক্ষা পদ্যাত্মক গীতই অধিক থাকিত। কর্ম্মাঙ্গ উৎসব (Dramatic ritual) উৎসবাত্মক নাটো (ritual dram) পরিণত হইল। মহাব্রত উৎসবে ও সুপর্ণাধ্যায়ে ‡ এই ক্রমবিকাশের ধারা অনেকটা ব্যক্ত হইয়াছে। অশ্বমেধ প্রভৃতি মহাসমারোহে সম্পন্ন উৎসবসমূহে হোতা উদ্গাতা প্রভৃতি বৈদিক পুরোহিতগণকে ক্রমপরম্পরায় স্ব স্ব বেদোক্ত পুরাণমন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বাক্যাদি পাঠ করিতে হইত—অনুষ্ঠান যথাবিধি সম্পাদিত হইবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ পুরোহিতকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। তাঁহাকে কর্ম্মপরম্পরায় "সূত্র" ধরিতে হইত। অপর পুরোহিতগণ সেই সূত্র অনুসারে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতেন। ইনিই হইলেন সূত্রধৃক্ বা সূত্রধার। উৎসবাত্মক নাট্যের ইতিহাস অন্যত্রও এইরূপ * গ্রীকনাটকের কালে কোরাস্ প্রবর্ত্তন * প্রকারে বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্যে এক দেবতাদের এ "দিব্য চাক্ষুষক্রতু" * হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে নাটকের উৎপত্তি হইল। নাটকের বেদবেদাঙ্গসম্ভবত্ব প্রতিপন্ন হইল। † গ্রীস্ ও * ইংলণ্ডে এইরূপেই নাট্য-সাহিত্য ধর্ম্মের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিল।

* "These hymns we.e combined with the dances in the festivals of gods, which soon assumed a more or less conventional form"—Encyclopoedia Brittanica, vol .viii p 480.

† "The beginnings of drama and of primitive rites are intertwined at the very roots"—Miss Harrison's Themis.

‡ ডাঃ হার্টেলের (Hertel) মতে সুপর্ণাধ্যায় বৈদিক সাহিত্যের এক প্রকৃত নাটক।

* "Having chosen as spokesman, leader and representative, the chief dancer, they differentiate him to the utmost, make him their viear and then draw eff............Themis chapter II by Miss Harrison.

† 'দেবানামিদমামনন্তিমুনয়ো দিব্যং ক্রতুং চাক্ষুষং—' মালবিকাগ্নিমিত্র।

‡ All those matters (e. g. magic. Olympic games, drama) seeming so disparate, in reality, cluster round the hymn—Introduction to Themis Harrison.

* 'Only in the arms of the church, in the very chancel, indeed, was this expression of a dramatic instinct nurtured......—" Chap II Evolution of English Drama by C. W Wallace.

অতি প্রাচীন শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩।৫।৩।৩) ও বাজসনেয়ী সংহিতায় (৩০।৬৫) এইরূপ উৎসবে নাট্যপ্রয়োগাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। সূত্রধার শব্দ পরবর্ত্তী যুগে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। * তথাপি কার্য্যতঃ তাহার পূর্ব্বতন প্রয়োগসমূহের সহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ আছে। সূত্রধার শব্দ আদিম ধর্ম্মাত্মক নাট্যসমূহ ও নবসূত্রের † সহিত সংশ্রবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কাজেই সূত্র-সাহিত্য-যুগের প্রারম্ভেই নটের প্রচলন বা নাট্যের প্রয়োগ বেশ প্রসারলাভ করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে যে সকল ঋষি বা পুরোহিত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভরতবংশীয় পুরোহিতসম্প্রদায় অন্যতম। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (১০।৫।৮) এবং কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ভরতকৃত দ্বাদশাহ যজ্ঞ ও ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানের কথা পাওয়া যায়। মন্ত্রযুগেও ভরতবংশীয় পুরোহিতগণ (ঋক্‌সংহিতা ২।৩৬।২ ইত্যাদি) সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন। সুতরাং ইহা বিচিত্র নহে যে, নাট্য-সাহিত্যের সহিত ভরত ও ভরতসুতগণের নাম এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্র বলিয়া যে গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়, তাহা ভরতবংশীয় বিশিষ্ট কোনও কোনও মুনির নটসূত্র, নাট্যকারিকা, নাট্য নিরুক্ত, নাট্যভাষ্য প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইনিই কর্ম্মকাণ্ডের বাহুল্যের দিনে ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের সময় "ত্রৈগুণোদ্ভব" ‡ লোকচরিতময় নাটকের প্রয়োগ করিয়া দেবতার তৃপ্তিসাধন এবং মানুষের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

নাটক প্রবর্ত্তনের পরবর্ত্তী স্তরসমূহের ইতিহাস নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যস্মৃতির অন্যান্য গ্রন্থের সহিত একবাক্যতা করিয়া পাওয়া যায়। আর্য্যগণের ইন্দ্র-ধ্বজোৎসবে অসন্তুষ্ট দাসগণ বা দৈত্যগণ আর্য্যনাট্য প্রয়োগের অনুকরণে

† 'নাট্যোপকরণাদীনি সূত্রমিত্যভিধীয়তে।
সূত্রং ধারয়তীত্যর্থে সূত্রধারোমতো বুধৈঃ॥ বাচস্পত্যে উদ্ধৃত।

* পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (৪।৩।১১০, ১১১); শতপথ ব্রাহ্মণে "শৈলালিনো নটাঃ"

* ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্ব্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্ত্তনং।
ধর্ম্মো ধর্ম্মপ্রবৃত্তাণাং কামঃ কামোপসেবিনাং।
অর্থোপজীবিনামর্থঃ........॥ নাট্যশাস্ত্র।

† সাঙ্খ্যায়ণ ব্রাহ্মণে (২৯।৫) পিতৃমেধে ত্রৈগুণ্যাত্মক শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়।
'নৃত্য' 'নৃত্ত' ও 'নাট্য'—এই তিনই—শিল্পের তিন ভিন্ন অংশ। ছান্দোগ্য-উপনিষদের জনবিদ্যায়ও কি এই শিল্পের কথা উক্ত হইয়াছে?

তাহাদের নিজের ভাবে ও ভাষায় এক প্রকার অভিনয় প্রবর্ত্তন করিল। জন কয়েক অসন্তুষ্ট নাট্য-প্রয়োগ-নিপুণ ব্রাহ্মণগণও যে এই দলে যোগ দিয়াছিলেন তাহার আভাস নাট্যশাস্ত্রে পাই (৩৬৷৩৩-৩৫,৪১)। যাঁহারা এরূপ করিলেন, তাঁহারা শিষ্টসমাজে নিন্দিত হইলেন। (কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র ও মনুসংহিতা ৩৷১৫৫)। কিন্তু ইহাতে অনার্য্যগণের মধ্যে নাট্যের উন্নতি সংসাধিত হইল। এই ঋষিগণের "ব্যঙ্গকরণ গ্রাম্যধর্ম্মক সংসদ্বিযোজিত শিল্প"ই * কালে "দেশীনাট্য" * Secular drama বলিয়া আখ্যালাভ করিল। পরবর্ত্তী সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ। সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যগণের "মার্গনাট্য" * সাহিত্যও চর্চ্চিত ও পুষ্ট হইতে লাগিল—পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে উভয় নাট্য-সাহিত্যই উন্নত হইল। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উল্লিখিত কংশবধ ও বলিবন্ধ এইরূপ শ্রেণীর উন্নত ধর্ম্মাত্মক "মার্গ"নাট্য সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন *। দেশীয় নাট্য-সাহিত্যের তালিকায় আমরা মূর্ত্তি নামে এক নাট্যের উল্লেখ পাই।

কস্যচিৎ খ্যাতবৃত্তাস্য অভিনেতৃগণস্য বা।
অভিনেতুঃ ক্রিয়াহীনা মূর্ত্তিস্তদ্ভাববোধিকা॥
প্রদর্শিতা ভবেদ্ যত্র সূত্রধারেণ বর্ণিতা।
মূর্ত্তিঃ সংকথিতা সৈব বিদ্বদ্ভিঃ সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

পিশেলের মতে উল্লিখিত পুতুলখেলা তামাসা প্রভৃতি দেশী নাট্য সাহি-

‡ নাট্যশাস্ত্র, ৩৬৷২৯-৩০

† মার্গদেশীতি নাট্যস্য ভেদদ্বয়মুদীরিতং॥
ব্রহ্মণা-মত্তপস্তপ্ত্বা মার্গিতং শিবয়োঃ পুরঃ। মার্গনাট্যঞ্চ তৎ প্রাহুঃ.........॥
দণ্ডিলাদিভিরুক্তানি দেশীনাট্যানি ষোড়শ। সট্টকং ত্রোটকং গোষ্ঠী......॥

+ অধ্যাপক ল্যাসেন প্রভৃতি এই মতের সমর্থন করেন। এ বিষয়ে আমরা ডাঃ কীথ মহোদয়ের মতের অনুসরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার মতে এই নাটকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির স্তুতির উদ্দেশ্যেই রচিত—ধর্ম্মবিষয়ক উৎসবের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে গ্রীক নাট্যসাহিত্যের সাদৃশ্য (analogy) ব্যতীত অন্য কোন প্রবল যুক্তি প্রদান করেন নাই। মহাভাষ্যের যুগের পূর্ব্বেই প্রাকৃতিক শক্তির স্তুতির বাহুল্যের দিন অতীত হইয়াছিল—ভগবান বুদ্ধের তিরোধানের অল্পদিন পরেই তাঁহার জীবনের নানা ঘটনারূপ আখ্যানবস্তু লইয়া প্রাকৃত সাহিত্যে বহু রূপক প্রযুক্ত হইয়াছিল, এখন প্রমাণ পাওয়া যায়।

ত্যেরই প্রাচীন নিদর্শন। ছান্দোগ্য উপনিষদে * বর্ণিত বিদ্যার তালিকায় যে জনবিদ্যার (নৃত্য-শিল্প-বিজ্ঞান) উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা হইতে ও মহাভারত হইতে এই দেশী নাট্য-সাহিত্যের প্রাচীনত্ব ও লোকপ্রিয়তা অনুমান করা যাইতে পারে।

অবশ্য এই উভয়বিধ নাট্যই সাহিত্যের কলাকৌশল প্রভৃতিতে অপুষ্ট ও হীন ছিল †। এই সকল রচনায় পদ্যই প্রধানতঃ কথোপকথনের ভাষায় ব্যবহৃত হইত—গোড়ায় গদ্যের নামগন্ধও ছিল না; দৃশ্য প্রভৃতির একান্ত অভাব ছিল, রুচিও মার্জ্জিত হয় নাই ‡। পাত্রসংখ্যাও অল্প ছিল, কালক্রমে এই সকল ত্রুটী সংশোধিত হইল—আর নাটক শুধু কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাত্মক প্রয়োগ বা উচ্ছৃঙ্খল শূদ্রাচার জনের আমোদসামগ্রী রহিল না—শিক্ষিত সাহিত্য-রসরসিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নাটক অভিনয় দর্শন আমোদ ও শিক্ষার নিকষস্থল বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। সাহিত্যে নাটকের এক নবীন যুগের আরম্ভ হইল। এই পরিবর্ত্তনের মূলে রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তির লীলাই লক্ষিত হয়। সকলে এক রাজার প্রজা হইলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান হেতুবাদের দিনে ধর্ম্মের সামঞ্জস্যস্থাপনে মহৎ সহায় হইল, ভাষা ও সাহিত্যের একতানতার অনুকূল অনেক কারণ উপস্থিত হইয়া সাহিত্যের বাঁধাধরা দলাদলি মুছাইয়া দিল—মার্গ ও দেশী নাট্য-সাহিত্য উভয়েই মিলিয়া উভয়ের বিশেষত্বের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া নবীন সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের সৃষ্টি করিল। সাহিত্যের হিসাবে, কলার হিসাবে এক উন্নতযুগের প্রবর্ত্তন হইল। রাজশক্তি এই নবীন সাহিত্যিক উদ্বোধনের নেতা হইলেন *—মধ্যযুগে ইংলণ্ডের ন্যায় এই সময়ে

* এটী Tableaux vivanto শ্রেণীর। এইরূপ অভিনয় পিশেলের মতে উল্লিখিত আদিম পুতুল খেলার পরবর্ত্তী সংস্করণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

† নারদ-সনৎকুমার সংবাদ সপ্তম অধ্যায়।

‡ A ritual form, however solemn & significant, does not and did not make a great drama—Themis, Chap. viii.

আমাদের দেশের প্রথম যুগের অনেক যাত্রাই সাহিত্যহিসাবে এই শ্রেণীরই ছিল বলিয়া মনে হয়।

* অশ্বঘোষের সহিত সম্রাট কণিষ্কের ও মহাকবি ভাসের সহিত তাঁহার রূপকসমূহে উল্লিখিত 'রাজসিংহ উপেন্দ্রনারায়ণের' সম্বন্ধ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। এই যুগের প্রারম্ভ হইতে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে অবনতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজশক্তিই এ বিষয়ে পথ দেখাইয়া আসিয়াছিলেন। আজমীরের তারাগড় পাহাড়ের প্রস্তরগাত্রে খোদিত খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর 'ললিতবিগ্রহ' ও 'হরকেলি' নামক নাটক দুইখানি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতীয় * রাজসভায় উৎসব উপলক্ষে নাটকাদি প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের শেষ অধ্যায়ে ভরত-শিষ্যগণ কর্ত্তৃক নহুষ নামে রাজচক্রবর্ত্তীর সময়ে মর্ত্ত্যে নাট্যের অবতারণা, ভরতসুতগণের নাট্যশাপবিমুক্তি প্রভৃতি রূপকের সাহায্যে উভয় নাট্য-সাহিত্যের সমন্বয় ও রাজসভায় প্রয়োগের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

অয়ং হি নহুষো রাজা যাচতে নঃ কৃতাঞ্জলিঃ॥
গম্যতাং সহি তৈর্ভূমিং প্রযোক্তুং নাট্যমেব হি।
করিষ্যামশ্চ শাপান্তমস্মিন্ সম্যক্প্রযোজিতে॥
ব্রাহ্মণানাম্ নৃপানাঞ্চ ভবিষ্যাথ নকুৎসিতাঃ।
তত্র গত্বা প্রযুজ্যন্তাম্ প্রয়োগা বসুধাতলে॥ (নাট্যশাস্ত্র ৩৭।১৪-১৬)

ইংলণ্ডে চ্যাপেল রয়েলের ন্যায় † ভারতের "অভিরূপভূয়িষ্ঠ গুণগ্রাহী" পরিষৎ নবীন নাটকের সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধন করিল। অভিনীত (acted) বস্তুতন্ত্রপ্রধান (realistic) বা ধর্ম্মতন্ত্রপ্রধান (ritualistic) নাটকের তিরোধান ঘটিল, সাহিত্যিক (literary) আদর্শাত্মক (idealistic) নাটক তাহার স্থান অধিকার করিয়া অতুল প্রতিপত্তি ও প্রসার লাভ করিল। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য একে একে কর্ম্ম ও ভাবের স্থলাভিষিক্ত হইল, নাটক ক্রমশঃ কঠিন ও দুর্ব্বোধ হইয়া লোকসাহিত্যের ভাব হারাইতে বসিল। সাধারণের উপদেশ সাধনরূপ উদ্দেশ্য শনৈঃ শনৈঃ লুপ্ত হইল। মহাকবি অশ্বঘোষ ও ভাস প্রভৃতি এইরূপ সাহিত্যিক "বহুভূমিক" নাটক লিখিয়া যশস্বী হইলেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে নাটকের আলোচনা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নাট্য রচনায় বাঁধা-বাঁধির সূত্রপাত করিল। শেষে কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস স্বতন্ত্রভাবে অথচ অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রামাণ্য * সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া মধুরে উজ্জ্বলে মিশাইয়া অপূর্ব্ব কৃতিত্বের বলে নাট্যসাহিত্যে চরমস্থান অধিকার করিলেন। কাব্যজগৎ ধন্য হইল, সংস্কৃত ভাষা প্রাণময়ী হইল, সংস্কৃত-সাহিত্য অভিনব সম্পদে বরণীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

* Chapel Royal......the cradle of the New Drama .....vide Chapter iv Evolution of the English Drama up to Shakespeare, by C. W. Wallace. (Berlin, 1912). vide also Chapter ii of the same book.

† সম্ভবতঃ যে রাজার সময় নাট্য প্রথম রাজসভায় প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার নাম নহুষ না হইতেও পারে। নহুষ বৈদিক যুগের এক প্রসিদ্ধ রাজা (ঋগ্বেদসংহিতা ৭।৯৫) হয়ত নাটকের প্রচারের ইতিহাসে পূর্ব্বোল্লিখিত ইন্দ্র-রুদ্র-বৃত্র ব্যাপারের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য এই রাজাকে নহুষ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মহাভারত ৫।১১-১৭ দ্রষ্টব্য।

কত শতাব্দীর † চেষ্টার ফলে এই পরিবর্ত্তন সংসাহিত হইল তাহা বলা দুরূহ। তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাহিত্যে প্রথম নাটকীয় বীজের অভিব্যক্তির সময় হইতে সংস্কৃত নাটকের পরিপুষ্টি কালের ব্যবধান অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দী হইবে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র (বর্ত্তমান গ্রন্থ) যে সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখনও দেশে অভিনীত নাটকের সংখ্যা অল্প নহে। তখন শিষ্টজন-সাহিত্য নূতন আলোকে দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; কিন্তু তখনও নাট্য-সাহিত্যের স্নিগ্ধ প্রখর ছটার পরিপূর্ণ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে নাই। রামায়ণ মহাভারতে নাটক অভিনয়ের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়—ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর কালেও নাটক প্রয়োগের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। "যখন ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে, তখন তাঁহার দুই শিষ্য সর্ব্ব সমক্ষে নাটক অভিনয় করেন*।" অশ্বঘোষের নাটকখণ্ডগুলির পর্য্যবেক্ষণ এবং তাহাদের সহিত মহাকবি ভাস ও কালিদাসের রচনার আপেক্ষিক সমালোচনা না করিলে আমরা পরবর্ত্তী সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের কালগত মূল নির্দ্দেশ স্থূল ভাবেও করিতে সমর্থ হইব না। কালক্রমে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় আরও প্রাচীনতর সংস্কৃত নাটকের আবিষ্কার হইবে, এরূপ ভরসা করা যায় ; ফলে সংস্কৃত সাহিত্যে রূপকের ক্রমবিকাশের ধারা বিশদ-ভাবে পরিস্ফুট হইবে।

এই স্থলে সংস্কৃত নাটকের জন্মকথার সহিত গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের সম্বন্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেবার প্রমুখ পণ্ডিতগণের মত পোষণ করেন এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহাদের ধারণা পরবর্ত্তী সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের নিকট ঋণী। কিছুদিন হইল সরগুজা ষ্টেটের রামগড়ের গুহা ও তত্রত্য শিলালিপিদ্বয়ের বিবরণ প্রসঙ্গে ডাঃ ব্লক্ এইরূপ মতই ‡ প্রকাশ করিয়াছেন।

† কালিদাসের সময় অলঙ্কার শাস্ত্র যে সুধীগণের মধ্যে বহুল প্রচার হইয়া বাঁধাধরা নিয়ম কানুনের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত সন্দর্ভ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—

তৌ সন্ধিষু ব্যঞ্জিত বৃত্তিভেদং রসান্তরেষু প্রতিবদ্ধরাগং।

অপশ্যতামপ্সরসাং মুহূর্ত্তং প্রয়োগমাদ্যং ললিতাঙ্গহারং॥ কুমারসম্ভব, ৭।৯১

† S. M. Mitra, Angle—Indian Studies.

* বিশ্বকোষ। বেবরের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে এ কথার উল্লেখ আছে।

‡ It will likewise be admitted that the adoption of the stage of a Greek theatre in an Indian building, that served similar purposes, has a strong bearing upon the question of the Greek influence on the Indian rdama"—Dr. Bloch, Archaeological Report 1903-04. Page 127.

এখানকার সীতা বেঙ্গাগুহা তাঁহার মতে গ্রীক ভাস্কর্য্য বাহুল্যের যুগে গ্রীক আদর্শে নির্ম্মিত খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর এক ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ—এই গুহায় বসন্ত উৎসবে নরনারীগণ কর্ত্তৃক সমারোহে নাটক অভিনীত হইত। যোগীমারা গুহার উৎকীর্ণ লিপি হইতে সেখানে "দেবদাসী"গণের দ্বারা এবম্বিধ অভিনয়ের কথাও পাওয়া যায়। অধ্যাপক রীচ নাকি শুধু সাহিত্য ঘটিত প্রমাণের উপর সংস্কৃত নাট্য গ্রীকনাট্যের নিকট কত ঋণী, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এদিকে অধ্যাপক গিলবার্ট মারে মহোদয়ের মতে * গ্রীক সাহিত্যে নাটক-পদ-বাচ্য প্রথম গ্রন্থ (Thespis) খৃঃ পূঃ ৫৩৪ অব্দে রচিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এ কথা বলা যাইতে পারে, যে ঐ সময়ে সংস্কৃত নাটক ছিল না, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। আরও ভারতে গ্রীক নাটকের অভিনয়ের কোনও বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণই পাওয়া যায় না।

কলা শিল্প প্রভৃতি যে যে বিভাগে গ্রীক প্রভাব স্পষ্টই বর্ত্তমান ছিল, তাহার নিদর্শন সেই সেই বিভাগেও অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, অথচ সংস্কৃত নাটকে এরূপ কোনও নিদর্শন বর্ত্তমান আছে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই। † দুই একজন প্রতীচ্য বিশেষজ্ঞের মতও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না। ডাঃ ষ্টেনকোনো ও ডাঃ স্যার* মার্শেলের মতে অশ্বঘোষ খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন †। ষ্টেনকোনো বলেন—The oldest Indian plays we know, the Aswaghosha Fragments published by Prof Liders, do not remind us of the Greek stage at all" সুতরাং সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য অতি প্রাচীনকাল হইতে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইয়া আপনার উন্নতির পথ কাটিয়া লইয়াছে। ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর নাট্য-সাহিত্যের কথা আপাততঃ কেহ জানেন না এবং তাহাই ইহার গৌরবের পক্ষে কম কথা নহে।

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।

---

* History of Greek Literature. (H'neman)

† vide Keith J. R. A, S. 1909. page 208 ; and J. R. A. S. 1982. p- 423. ডাঃ কীথ্ তাঁহার মতের দিক্ দিয়া এ বিষয়ে এক প্রমাণের কথাও বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"But there is one salient distinction between Indian and Greek drama which adds to the improbability of the derivation of the former from the latter. The Indian drama must end happily, just as Krisna kills Kansa, the red the black, rather than black the red........"

* Punjab Historical Society's Journal, September 1913.

† The Indian Antiquary, April, 1914,

ফাল্গুন-স্মৃতি

সেই ফাগ সেই ত ফাগুন !
সেই ত দ্বারের কাছে
মাধবী ফুটিয়া আছে,
অশোকের গাছে গাছে সেই রক্তারুণ ;
সেই দক্ষিণের ছাতে,
বাতাস তেমনি মাতে,
তেমনি ঝরিছে প্রাতে ফুটন্ত বকুল ;
সেই ছায়া সেই আলো
সেই আঁখিতারা কালো,
সেই যারা বাসে ভালো তেমনি ব্যাকুল !
সেই ত পাগলপারা
ছুটিছে প্রাণের ধারা,
তেমনি কাটিছে সারা বসন্তের বেলা,
আভাসে গুঞ্জনে ভাষে
কলগানে কলোচ্ছ্বাসে
চলিছে উল্লাসে ত্রাসে হৃদয়ের খেলা !
সবি আছে কি যে নাই—
আজিকে ভাবিয়া তাই
আকুল নয়নে চাই আপনারই পানে ;
কি যেন বুকের মাঝে
লুটায় ব্যথায় লাজে,
যোগীয়া কেন যে বাজে হিন্দোলার গানে !
অশ্রু আসে আঁখি পূরে'
মোহিনী লাগেনা সুরে
দীপকে জ্বলিয়া পুড়ে লুকান আগুন ;
বসন্ত যা-কিছু যাচে
সবি ত তেমনি আছে—
সেই ফাগ রক্তরাগ সেই সে ফাগুন !

সেই ফাগ সেই ত ফাগুন!
লতায় পাতায় ঘাসে,
প্রকৃতি তেমনি হাসে
শুধু আনন্দের পাশে নিঃশেষিত তূণ!
মনে পড়ে ছেলেবেলা
সাথী সাথে কত খেলা
প্রমোদ উৎসব মেলা—হোলী মাতামাতি,
যৌবনের রক্তরাগে
মর্ম্ম ঝিনুকের দাগে
আজও যে তেমনি জাগে বসন্তের রাতি!
সেই অন্দরের ছাতে
দোল পূর্ণিমার রাতে
রঙ্গভরা কচিহাতে পিচকারী ভরি'—
পা-টিপিয়া কাছে আসা
সেই চোখে-চোখে ভাষা,
সেই ছোট-করে' হাসা 'গুরুজনে ডরি'!
বসন্ত বিহ্বল-বেশা
অধীর সমীরে মেশা
পুষ্প সুরভির নেশা তেমনি মধুর,
শুধু এ জীবনে হায়!
তাহার বারতা নাই,
জাগালে জাগেনা তাই পরাণ বিধুর!
কেন আজি বেদনাতে
জল আসে আঁখিপাতে,
জেগে উঠে সেই সাথে হিয়ার আগুন?
যেন আজি হয় মনে
ফুরায়েছে এ জীবনে
বসন্তের হাসি সাথে আনন্দ-ফাগুন!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরেন্দ্র আজ বছর দেড়েক যে এত ঘন ঘন বাড়ী আসিতেছে, ইহাতে গ্রামের প্রবীণ লোকেরা মাথা নাড়িয়া বলিল—"নিশ্চয়ই উহার একটা গভীর দুরভিসন্ধি আছে।" তাহারা সুরেন্দ্রকে যথোচিত সাবধানও করিয়া দিল। কিন্তু সে বড় একটা গা করিল না। ক্ষুণ্ণ হিতৈষীগণ ক্রমে সুরেন্দ্রের উপর বিলক্ষণ বিরক্তও হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বলিলেন—"আমাদের কথা এখন শুনচ না, শেষে পস্তাতে হবে কিন্তু। হরেন—যাকে তুমি মায়ের পেটের ভাই মনে কর্‌চ, সে তোমার শত্রু।"

সুরেন্দ্র একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—"হরেন আমার ভাই, ছোট ভাই! মা যখন মারা গেলেন, তখন ও যে আমার কাছ ছাড়া একদণ্ডও কোথা থাক্‌তো না। আমি ওর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় বটে—তা হলেও আমার মনে হয়, আমি যেন ওকে মানুষ করেচি। ও আমার কি শত্রুতা কর্‌বে?"

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী তামাক খাইবার জন্য খড়ের নুটি পাকাইতে পাকাইতে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"হরিচরণ উইল কর্‌বে, তা জান?"

সুরেন্দ্র একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল—"তাতে আমার কি? বাবা উইল কর্‌চেন্, আমরা তাঁর ছেলে, আমাদেরই নামেই ত' উইল কর্‌চেন্? এতে আর হরেন্ আমার শত্রু হলো কিসে? যাক্‌গে চক্রবর্ত্তী জ্যাঠা, বাবা যা কর্‌বেন্ তাই তো হবে! বাবা থাক্‌তে আমিই বা কে, আর হরেনই বা কে?"

পাড়াগাঁয়ের মেঠো হাওয়ার মত সেখানকার লোকের হৃদয়গুলিও অবাধ এবং নির্ম্মল। তাহাতে কয়লা গুঁড়ির ভেজাল নাই। চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুরেন্দ্রের উক্তরূপ স্নেহপ্রবণ বিশ্বাসভরা উত্তরে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখনি নিবারণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে গিয়া তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া সুরেন্দ্রের অভিমতও জানাইলেন।

মুখুয্যে মশায় কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরিচরণ যে সুরেন্দ্রকে একবারে ফাঁকি দিবে, এ কথা তোমায় কে বল্‌ল?"

"হরেন্দ্রর স্ত্রীই এ কথা নদীর ঘাটে আমার স্ত্রীকে বলেছে।"

"হরেন্দ্রর স্ত্রী কি বলেছে—বল তো শুনি আগে!"

চন্দ্র বলিল—"হরেন্দ্রের স্ত্রী বলেছে যে, একে শ্বশুরের বয়স হয়েছে, তাতে তাঁর শরীরও ভাল নেই; এই সব কারণে হরেন্দ্রের ইচ্ছা যে যা কিছু আছে বাপ থাক্‌তে থাক্‌তে তার একটা বিধি ব্যবস্থা হয়ে যায়। নৈলে বাপের অবর্ত্তমানে ঐ নিয়ে শেষে আবার কোনও গোলযোগ ঘটে। সেটা তো ভাল না! ঘরে আবার ঐ বিধবা মেয়ে ক্ষ্যান্ত রয়েছে—বাপ যদি নিজে কিছু দিয়ে যায়, তা হলে ও বেচারীও কিছু পায়! এ কথায় আমার স্ত্রী বলেছিল—সে তো ভালই। দুই ভাইও যেমন কিছু কিছু পাবে, বোনটিরও তো তেমনি কিছু পাওয়া উচিত। মা মরে যাওয়ার পর, ঐ তো বুক দিয়ে এতদিন সংসারটা খাড়া রেখেছে। এতেই হরেন্দ্রের স্ত্রী বলেছে—যে তার শ্বশুরের ইচ্ছে নয় যে, তিনি তাঁর বড় ছেলেকে কিছু দিয়ে যান্।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বেশ অভিনিবেশ সহকারে শুনিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"দেখ চন্দর, আমার মনে হয়, এ সব ঐ ক্ষ্যান্ত ছুঁড়িরই কারসাজী। হরা ত জন্মকুচুটে,: কিন্তু সে যে এতটা কর্‌তে সাহস কর্‌বে, আমার বিশ্বাস হয় না।"

"না দাদা, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌চনা। দুজনে মিলেই ওরা এ কাজ কর্‌চে। হরার তেজটা তো তুমি আজকাল দেখ নাই। ওরে বাপরে, তেজে মট্‌মট্ কর্‌চে। বাইশ টাকার নায়েবী করে, মাটিতে আর পা পড়ে না। আর কি সমস্ত রাজা উজীর মারা গল্প—শুন্‌লে একবারে পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে যায়।"

"বলো কি?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আরও উত্তেজিত হইয়া, একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গা টিপিয়া বলিলেন—"হাঁ দাদা, তবে আর বল্‌চি কি? হরা বাড়ী এসে, সুরেন্ ভাইয়ের জন্যে একবারে ব্যস্ত হয়ে বেড়ায়। কোথায় কি হরেন ভাল বাসে—এই সব যোগাড়যন্ত্র কর্‌তে সুরেনের নাইবার খাবার অবকাশ থাকে না। বড় ভাই হয়ে ঠিক যেন চাকরের মতন খাটে, আর হরেন্ সেই বড় ভাইকে কি না সেদিন আমার সাম্‌নে বল্‌লে—'তুমি একটা গাধা।' সুরেন্ মুখটি নীচু করে' চলে গেল। আমি থাক্‌তে পার্‌লাম না, হরেনকে একটু বক্‌লাম—সেই থেকে বাবু আমার সঙ্গে আর কথাই কন্ না।"

"বল্লো কি চন্দোর ?"

"কি বল্বো দাদা ? সুরেন্‌কে বল্‌তে গেলাম সে বল্‌লো—ও ছেলে মানুষ, ওর কথা কি ধর্ত্তব্য ? না কি গাধা বল্‌ল বলে আমার গায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে ?"

"আচ্ছা, তুমি একবার দত্তমশায়কে খবরটা দিয়ে রাখ। আজ সন্ধ্যায়—না আজ সন্ধ্যায় নয়, আমার একটু কায আছে—কাল সকালে চল আমরা সবাই গিয়ে একবার হরিচরণকে বলিগে।"

চক্রবর্ত্তীর মুখে সহানুভূতির পবিত্র আলোক উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন—আমরা থাক্‌তে গাঁয়ে ভাল মানুষের উপর কোনও অত্যাচার হ'তে দেব না! তা হলে লোকে বল্‌বে, গাঁয়ে কি কেউ মানুষ ছিল না ?"

পরদিন প্রভাতে গ্রামের মাতব্বর রাম দত্ত, নিবারণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্র-চক্রবর্ত্তী ও দীনুমণ্ডল হরিচরণের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। শুনিল অদ্য প্রত্যূষেই হরেন্দ্রের সঙ্গে হরিচরণ মহকুমায় গিয়াছেন। সুরেন্দ্র বিগত সন্ধ্যা হইতে বাড়ী নাই, হরিশ বাঁড়ুয্যের শব সৎকার করিতে গঙ্গাতীরে গিয়াছে। এ দিকে এই সকালে তাহার স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিচরণ ভট্টাচার্য্য উইল করিয়া ফিরিলেন—এসংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। কি যে উইল হইল, তাহা কিন্তু হরিচরণ গোপন করিলেন—লোকের অনেক পীড়াপীড়ি সত্বেও তিনি তাহা খোলসা করিয়া কাহাকেও বলিলেন না।

যে কায লোকে যত গোপন রাখিতে চেষ্টা করে, সে কায তত শীঘ্র প্রকাশ হয়—বিশেষতঃ অন্যায় কায। সুরেন্দ্রের যাহারা হিতৈষী, তাহারা মহকুমার রেজেষ্ট্রী আফিস হইতে খবর লইয়া জানিল যে, হরিচরণ তাহার যথাসর্ব্বস্ব স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ হরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিয়া দিয়াছেন—কেবল পাঁচ বিঘা জমি ও যৎসামান্য পিতল কাঁসার জিনিষ তাঁহার বিধবা কন্যা শ্রীমতী ক্ষ্যান্তমণি দেব্যার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দান করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র-নাথ তাঁহার অবাধ্য প্রভৃতি কারণে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হইতে

উক্ত সুরেন্দ্রনাথকে বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠপুত্রকে তাঁহার অবর্ত্তমানে বংশপরম্পরা-সূত্রে ভোগদখল করিতে অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

এই অদ্ভুত উইলের কথা শুনিয়া গ্রামশুদ্ধ লোকে একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সকলেই আশা করিতে লাগিল—যে এইবার সুরেন্দ্র মহা হুজ্জুৎ বাধাইবে। একে সে একগুঁয়ে লোক, তাহাতে আবার দু'বেলা দু'মুঠো ভাতেও যখন সবাই তাহাকে বঞ্চিত করিল, তখন এবার সে আর চুপ করিয়া থাকিবে না।

লোকে অধীর উৎকণ্ঠায় দুইদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল; কিন্তু সুরেন্দ্রের কোন ভাবান্তরই লক্ষিত হইল না। সে যেমন বেলা তৃতীয় প্রহরে যজমানদের বাড়ী পূজা সারিয়া, বামহস্তে নৈবেদ্যের ছোট ছোট রেকাবিগুলিকে উপর উপর রাখিয়া গামছায় ঝুলাইয়া, খালি পায়ে খালি গায়ে বাড়ী ফিরিত—তেমনিই ফিরিয়া থাকে। মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই আছে, চাহনিটি আগের মতই স্নিগ্ধ, শান্ত, নির্ভীক, নিশ্চিন্ত।

লোকে ভাবিয়াছিল, পিতার এই কার্য্যের বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতে, দুঃখ নিবেদন করিতে, সুরেন্দ্র নিজেই তাহাদের দ্বারস্থ হইবে। তাহা যখন হইল না, তখন লোকের বিস্ময় ও কৌতূহল আর বাধা মানিল না।

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনাইয়া বলিলেন—"বলি তোমার মৎলব-খানা কি বল দেখি? এত বড় যে একটা কাণ্ড হল—আমাদিগকে তা' কি জানাতে নেই? আমরা কি তোমার শত্রু?"

সুরেন্দ্র ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন জ্যাঠামশায়, কি কাণ্ড হয়েছে? আপনি কি বল্‌চেন, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না!"

"চিরকালই কি খোকাটি হয়ে থাক্‌বে? 'কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না'। তোমাকে সেদিন আমি বলেছিলাম কি না যে, হরা তোমার শত্রু! তখন যে ভাইয়ের পানে বড্ড টান দেখিয়েছিলে। এখন? খুব ভাইয়ের কায করেছে, নয়?"

সুরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল—বলিল—"এই কথা জ্যাঠা মশায়? এতে হয়েছে কি? আপনি কি মনে করেন যে, বাবা, হরেন্ সবাই আমায় বল্‌বে—তুমি তোমার ছেলেপিলে নিয়ে বেরিয়ে যাও? তাই কখনও পারে? এ উইলের কথা তো আমি পরসু দিনই শুনেচি।"

"তুই যে অবাক কর্‌লি সুরেন্! তুই ভাবচিস্ কি? তোকে যদি না তাড়াবে, তোকে যদি না ফাঁকি দেবে—তবে এ সব উইল ফুইল করবার দরকারণক?"

সুরেন্দ্র একটু চিন্তা করিল। তাহার মুখমণ্ডলে হঠাৎ চিন্তার একটা কালো ছায়া আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্ত্তী মশায় বলিতে লাগিলেন—"এখন আজ যদি তোকে ওরা বের করে দেয়, তা হ'লে তুই ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবি? খাবিই বা কি?"

সুরেন্দ্র আরও চিন্তিত হইয়া পড়িল। কুঞ্চিত ভ্রূযুগের নীচে সুরেন্দ্রের বিস্ফারিত আয়ত চক্ষুদুটির দৃষ্টি নির্নিমেষে ভূমিতে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। সুরেন্দ্র একটু চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল —"তা হ'লে আমি কি কর্‌বো?" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুপল্লব আর্দ্র হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া গেল।

চক্রবর্ত্তী মশায় গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আদালত ভিন্ন এর মীমাংসা আর কে কর্‌বে?"

কথা শেষ হইতে না হইতেই সুরেন্দ্র দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আদালত? বাপের নামে ছোট ভাইয়ের নামে বড় দিদির নামে আদালত! এ আমি পারবো না। কপালে যা থাকে তাই হবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহকুমা যাইবার তিন দিন আগে হইতেই হরিচরণের যে জ্বর আসিয়াছিল—সে জ্বর এখনও ছাড়ে নাই। গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা অপেক্ষা করিয়াছিল যে, হরিচরণের জ্বর ছাড়িলেই তাহারা তাহাকে ধরিয়া যে কোনও উপায়ে এ উইল রদ্ করাইবে। সুরেন্দ্রকে সকলেই ভাল বাসে, তাহাকে এমন করিয়া ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে তাহারা দিবে না। কিন্তু যখন সবাই শুনিল যে, বৃদ্ধের অসুখ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে, তখন সকলে একদিন রৌদ্রোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে ভট্টাচার্য্যের গৃহেই আসিয়া উপস্থিত হইল।

শারীরিক অবস্থা, চিকিৎসা পথ্যাদির প্রকরণ প্রভৃতি নানা বাক্যালাপের পর নিবারণ মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"দেখ হরি ভায়া, তুমি উইলটা এই সময় বদ্‌লিয়ে দিয়ে যাও। এটা কি তোমার ঠিক হয়েছে? তোমাকে তো লোকে ছি ছি কর্‌চেই, তার সঙ্গে আমরাও যে কেউ মুখ দেখাতে পারচি না।"

কক্ষে হরেন্দ্র একটা মোড়ায় বসিয়া একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পড়িতেছিল। মুখ তুলিয়া ঘৃণাভরে একবার অভ্যাগতদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় কাগজ পাঠে প্রবৃত্ত হইল।

হরিচরণ নিরুত্তর। চক্ষু বুঁজিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে যেমন শুইয়া ছিলেন, তেমনিই শুইয়া রহিলেন।

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিল—"কি ভাই শুন্‌চ'? মুখুয্যে মশায় কি বল্‌লেন?"

হরিচরণ মুদ্রিত নেত্রেই কহিল—"তা কি করব বল? আমার—"

হরেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল—"দেখ্‌চেন, ওঁর জ্বরে হুঁস্ নেই, এখন আর বিরক্ত নাই বা কর্‌লেন?"

চক্রবর্ত্তী ও রাম দত্ত উভয়েই গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"তুমি চুপ করে' থাক, নয় ঘর হ'তে বেরিয়ে যাও। যে কায করেচ, গলায় দড়ি দিয়ে মর গে!"

হরেন্দ্র দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কি, আমি বেরিয়ে যাব? এ বাড়ী আমার তা জান? বেরোও বল্‌চি, বেরোও আমার বাড়ী থেকে!"

রাম দত্ত ধীর ভাবে বলিলেন—"কার সঙ্গে কথা কইচ জান?" এ বাড়ী তোমার নয়, এ বাড়ী ভট্‌চাজ মশায়ের। তা ছাড়া, কার মাটিতে এ বাড়ী জান? আমি ইচ্ছে কর্‌লে এ বাড়ীতে ভাগাড় বসাতে পারি, তা জান?" বলিয়া দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "এখুনিই ঘর থেকে বেরোও।"

হরেন্দ্র মন্ত্রাহতের ন্যায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

হরিচরণ এই বচসার সময়ে একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিলেন।

দত্ত মহাশয় কোমল অথচ দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভট্‌চাজ মশায়, এর জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। একটু কেবল ধমক্ দিয়েছি। হাঁ, এখন বলুন, এ কায আপনি কর্‌লেন কেন?"

হরিচরণ ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। গ্রামের জমিদারের কাছে এরূপ একটা অন্যায় আচরণের সন্তোষপ্রদ কৈফিয়ৎ দিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া—একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিলেন না। হরিচরণের মাথা ঘুরিতেছিল, কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ নির্গত হইতেছিল দেখিয়া নিবারণ বলিলেন—"ঐ কথা না হয় যাক্‌গে, ও

আমরা সবই বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন এ উইল আপনি বদ্‌লে, সুরেন্‌কে তার ন্যায্য প্রাপ্য দিতে রাজী আছেন ত ?"

হরিচরণ তাঁহার ব্যারামের যন্ত্রণা অপেক্ষা উত্তরের জন্য অনেক বেশী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 'হাঁ' 'না' কি যে বলিবেন মাথায় কিছুই যোগাইল না। এই অশান্তি হইতে আশু নিষ্কৃতির জন্য তিনি বলিলেন—"আচ্ছা বাবু, আমি একটু সুস্থ হইলেই এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে'—যা হয় তাই কর্‌ব।"

চন্দ্র বলিল—"কি আর এমন তোমার ন'শো পঞ্চাশখানা তালুক মুলুক আছে যে, তার জন্যে এত সব পরামর্শ! এই যে কেলেঙ্কারি করে' এলে, ক'জনকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ?"

নিবারণ, চন্দ্রকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ধর', ঈশ্বর না করুন্‌, যদি নাই বাঁচ ? অবিশ্যি বয়সও তো হয়েছে। তখন ও বেচারীর কি দশা হবে ?"

হরিচরণ এতক্ষণ একটা বালিশে ঠেশ্‌ দিয়া বসিয়া ছিলেন, হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া বিছানায় পড়িয়া গেলেন। সকলে মিলিয়া কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদন করাইলেন। কিন্তু কোনও কথারই কিছু শেষ নিষ্পত্তি সে দিন আর হইল না।

সকলে চলিয়া গেলে হরেন্দ্র ক্ষান্তমণিকে ডাকিয়া কহিল—"দেখ্‌চ দিদি, বদ্‌মাইসের কাণ্ড দেখ্‌চ ? গাঁয়ের যত সব মজামারা বজ্জাত দিকে দিয়ে ওকালতী করানোর ধুম দেখচ ?"

ক্ষান্ত দক্ষিণ হস্তের তালুটি হরেন্দ্রের সম্মুখে পাতিয়া নিরাশাব্যঞ্জক স্বরে ছল ছল চক্ষে কহিল—"ভাই, তুমিই দেখ। তুমি তো বাড়ীতে থাক না—তুমিই দেখ। আমার দেখে দেখে হাড় মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। মনে হয় আফিং খেয়ে মরি।"

"তুমি সবুর কর দিদি। দেখ তো আমি একটা হেস্ত নেস্ত কিছু না করে' ছাড়্‌চি না। আজ কালের মধ্যেই করে' ফেল্‌চি, তুমি দেখে নিও।"

এমন সময় যেমনি সুরেন্দ্র কোঁচার কাপড়ে করিয়া চারিটি জীয়ন্ত মাগুর মাছ লইয়া অঙ্গিনায় উপস্থিত হইল, অমনি ক্ষান্ত একবারে রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞসা করিল—"এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিলি রে হতভাগা ?"

সুরেন্দ্র হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিল—"দিদি একবারে চব্বিশ ঘণ্টাই আগুণ! হরেন্ মাগুর মাছ ভালবাসে, তাই গঁরাইদের পুকুরে এই মাছ ধর্‌তে গিয়েছিলাম।"—

হরেন্দ্র বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে ক্ষান্তকে কহিল—"দিদি, ও মাছ আমি খাব না।" বলিয়া স্থানত্যাগ করিল।

সুরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ভাই?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই সময় হরিচরণের যে মূর্চ্ছা হইল, সেই মূর্চ্ছাই তাঁহার কাল। সন্ধ্যার পর হইতেই জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িল। জ্বরের ঘোরে সারা রাত্রি কত কি অসম্বদ্ধ বকিয়া বকিয়া প্রাতে যেমন একটু নিদ্রাবিষ্ট হইলেন, অমনি সুরেন্দ্রের সারারাত্রি জাগরণক্লান্ত দেহখানি পিতার শয্যাপার্শ্বে মেঝের উপর তন্দ্রায় ঢুলিয়া পড়িল।

তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছিল। তপনদেবের প্রচুর আলো পল্লীগ্রামের অবাধ পথে, গাছে, শাখায়, পাতায়, লতায়, ছাদে, জানালায় ঠিকরিয়া পড়িয়া ধরণীকে শিশুর শুভ্র সুন্দর হাসির মত শোভাময় করিয়া তুলিয়াছিল।

হঠাৎ গোলমালে এবং উচ্চ ক্রন্দনধ্বনিতে সুরেন্দ্র জাগিয়া উঠিল। দেখিল, হরেন্দ্র সতীশ এবং ক্ষান্ত তিন জনে ধরাধরি করিয়া মুমূর্ষ হরিচরণকে নীচে নামাইতেছে। সুরেন্দ্র চক্ষু মুছিতে মুছিতে সাশ্রুনেত্রে পিতাকে আঙ্গিনায় তুলসী মঞ্চতলে শোয়াইল। অল্পক্ষণ পরেই হরিচরণ তাহার ষাটবৎসরের পরিচিত সংসারের সহিত তাহার অকর্ম্মণ্য প্রাণহীণ দেহটিকে রাখিয়া চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

পিতার সৎকার শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিবার পরেই সুরেন্দ্রের জ্বর আসিল। বাটি পৌছিয়াই সে লেপ মুড়ি দিল। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"সুরেন্দ্র যে এই ১৫টা দিন উপরিউপরি রাত্রি জাগিয়া রোগীর সেবা করিয়াছে, দিনেও একটু বিশ্রাম করিতে পায় নাই—তার উপর এই দুর্ভাবনা ও মনেরকষ্ট, তাই নাড়ি একটু চঞ্চল হইয়াছে। ইহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই। এ জ্বর তিন দিন মাত্র থাকিয়াই বিরাম হইবে।"

হরেন্দ্র তবু আশ্বস্ত হইতে পারিল না। চুপে চুপে গিয়া ক্ষান্তকে

জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, কেমন বুঝ্‌চ'? আবার কি বিপদে পড়্‌বো নাকি?"

ক্ষান্ত তখন কাপড় চোপড় কাচা ও ঘর দুয়ার ধোয়া প্রভৃতি কার্য্যে খুবই ব্যস্ত ছিল; তাই সে তাড়াতাড়ি অল্প কথায় উত্তর দিল—"তা' ভাই, সে আশ্চর্য্য নয়, যে পোড়া কপাল আমাদের।"

হরেন্দ্র বলিল—"তাই তো বল্‌চি, যে শত্রুর পুরী হয়েছে, যদি কিছু হয় তো শালারা বলবে মেরে ফেলেচে; আর অমনি হাতে দড়ি।"

"মিছে নয় ভাই, যা' বলেচ'। তা' হওয়াও কিছু শক্ত নয়! আচ্ছা, এই হাতের কাযগুলো সেরে পরামর্শ কর্‌চি। তুমি একটু দাঁড়াও।"

দুই দিন ধরিয়া পরামর্শ হইল। তাহাতে এই স্থির হইল যে, সুরেন্দ্রকে সপরিবারে এ বাটি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেই হইবে। ইহাতে কালবিলম্ব করিলে চলিবে না। আর এই কথা জ্ঞাপন করার ভার ক্ষান্ত নিজেই গ্রহণ করিল।

চতুর্থ দিন প্রভাতে সুরেন্দ্র জ্বরে বিঘোর হইয়া পড়িয়া ছিল। ক্ষান্তমণি তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—"ওরে সুরো, শুন্‌চিস্—আর অমন ঠাট করে' পড়ে থাক্‌লে হবে না। নে নে ওঠ্।"

সুরেন্দ্র মুখ তুলিয়া কাতর দৃষ্টিতে দিদির মুখপানে চাহিয়া বলিল—"আমি কি অমনি সাধে পড়ে' আছি, দিদি? বড় কাবু না হ'লে আমি পড়ে' নাই। একবার খোঁজ ও তো নাও না, তার আর কি বুঝ্‌বে?"

"ঢং দেখে বাঁচি না! অমন মালগোট্টা শরীর—হয়েছে কি যে সারাদিন খোঁজ তল্লাস কর্‌তে হবে?" ক্রমে স্বর নামাইয়া বলিল—"তা সে যা' হয়, হোক্‌গে; এখন যা' বল্‌তে এসেচি শোন,—আমি কায কামাই করে দাঁড়াতে পার্‌চি না। হরেন্ বল্‌চে যে তোমাদের আর এ বাড়ীতে সে থাক্‌তে দেবে না!"

কথাটা শুনিয়া সুরেন্দ্র একবার আঁৎকাইয়া উঠিল। প্রথমটা সে ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার মাথার ভিতরে ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়ার মত বোঁ বোঁ শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। যখন সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল—তখন তাহার মনে হইল যেন তাহাকে শত শত ভীমরুলে দংশন করিতেছে। অভিমানে অপমানে দুঃখে রোগে যাতনায় সুরেন্দ্র একবারে হতভম্ব হইয়া গেল। সে নিরুত্তর!

নিরুত্তরের শানে আদেশকে আরও তীক্ষ্ণতর করিয়া ক্ষান্ত প্রশ্ন করিল—

"চুপ করে' রৈলি যে? কখন যাবি বল? আমার অনেক কায রয়েছে। আমি কি দাঁড়াতে পারি?"

এবার আর সুরেন্দ্র থাকিতে পারিল না। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। বড় বড় উত্তপ্ত ফোঁটাগুলি তাহার রুগ্ন কপোল আর্দ্র করিয়া বিছানায় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বলিল—"কখন যাব? দিদি, কোথায়ই বা যাব? খাবই বা কি? একে এই দুঃসময়, নানান্ দিকে ব্যতিব্যস্ত? কে জায়গা দেবে? এই অশৌচ, আমার এই অসুখ, ওদিকে আঁতুরে রোগী, দশদিনের কাঁচা ছেলে, ছোট ছোট তিনটি মেয়ে; এ অবস্থায় কোথা যাব দিদি?"

ক্ষান্তর মন একটু নরম যদিও হইল, তবুও সে এ রুগ্ন নিরুপায়কে শ্লেষবিদ্ধ করিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিল না। বলিল—"সে কি, তোমার এত হিতৈষী বন্ধু? ঐ চন্দোর চক্কোবর্ত্তী, নিবারণ মুখুয্যে, রামদত্ত, যারা তোমার জন্যে অনাহুত ওকালতী কর্‌তে আস্‌তে পারে, আর তারা তোমায় একটু জায়গা দিতে পারে না? কথায় তারা এত দরদ জানায়, আসলে কিছু কর্‌বে না—তাও কি হয়?"

সুরেন্দ্র বুঝিল, তাহাকে বাড়ী ছাড়িতেই হইবে। তবুও বলিল "এই আজ মোটে চারদিন বাবা গেলেন, এখন যদি তোমরা আমায় তাড়িয়ে দাও, তা হলে বড় কেলেঙ্কারী হবে। তার চেয়ে বাবার কাযটা ভাল ভালয় হয়ে যাক্, আমার জ্বরটাও সারুক, এর মধ্যে যা' হয় মাথা গুঁজবার একটা জায়গাও করে নি'—তারপর আমি আপনিই না হয় যাব। এখন গেলে যে লোকে বড় নিন্দে কর্‌বে?"

"হরেন্ বলে, সে নিন্দে হয়, তার হবে। তার জন্যে তোমার ভাবনা কি?"

সুরেন্দ্র ভৎসনার স্বরে বলিল—"কি? হরেনের নিন্দে হলে আমার কি?"

দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া হরেন্দ্র সব শুনিতেছিল। বেগে সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"আর তোমার ভালবাসা দেখাতে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে। এ বাড়ী আমার, তুমি এই মুহূর্ত্তেই বেরোও।"

বাহিরে আষাঢ়ের মেঘমন্দ্রিত আকাশে তখন বাদলে বাওরে তুমুল কল কোলাহল চলিতেছিল—সুরেন্দ্র নীরবে একবার বাতায়নপথে বহিঃপ্রকৃতিকে দেখিয়া লইল। মাথার গোড়ায় একগাছি বাঁশের লাঠি ছিল, তাহাতে ভর দিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল—"বড় বৌ, ছেলেদিকে নিয়ে আমার সঙ্গে এস।" বড় বৌ কাঁদিয়া উঠিল—মেয়ে তিনটি মার কাছেই

বসিয়া ছিল, তাহারাও কাঁদিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র কঠোর কণ্ঠে বলিল—"এসো—দেরী করো না, বল্‌চি। আমার সেই ছাতাটা আমায় দাও।" জ্বরে তাহার চক্ষু জবার মত লাল ছিলই, এখন যেন আরও ভয়ানক দেখাইতে লাগিল।

অঝোর বাদলে সুরেন্দ্র সেই শতছিদ্র ছাতাটি মাথায় দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গ্রামের পথে বাহির হইল। পশ্চাতে সদ্যোজাতা শিশুকন্যাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া রোরুদ্যমানা পত্নী ও কন্যাত্রয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাটি হইতে বাহির হইয়া সুরেন্দ্র বরাবর রাম দত্তর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক যথাযথ সমস্ত ব্যাপার জানাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভৃত্যগণকে আদেশ দিলেন যে লক্ষ্মী ময়রাণীর দরুণ ঘরখানাতে এখনি সুরেন্দ্রের স্থান করিয়া দেওয়া হউক।

লক্ষ্মী এই ঘরখানি বন্ধক রাখিয়া দত্ত মহাশয়ের নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল;—কিন্তু সে টাকা পরিশোধ করিবার পূর্ব্বেই সে ইহধাম পরিত্যাগ করে। তাহার আর কোন ওয়ারিশ না থাকায় এ ঘরখানি দত্ত মহাশয়েরই সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দত্ত মহাশয় বলিলেন—"এ ঘরখানি মায় মাটি শুদ্ধ আমি তোমায় দান কর্‌লাম, সুরেন্! পরে রীতিমত লেখাপড়া করে' দেব এখন। অপাততঃ সেখানে গিয়ে দাঁড়াও গে তো?"

সুরেন্দ্র জ্বরে ও ঠাণ্ডায় কাঁপিতে কাঁপিতে কি বলিতে যাইতেছিল, দত্ত মহাশয় তাহাকে বাধা দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈজসপত্র খাদ্য প্রভৃতি সমস্তই হাজির হইল।

হরেন্দ্রের এ নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার কাহিনী গ্রামে রাষ্ট্র হইতে দেরী লাগিল না। ঈদৃশ পৈশাচিক কার্য্যের প্রতিশোধ দিবার জন্য তৎক্ষণাৎ গ্রামের একদল লোক প্রস্তুত হইয়া দত্ত মহাশয় ও সুরেন্দ্রের আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইল। দত্ত মহাশয় তাঁহার বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্য সহকারে সকলকে স্থির হইতে ইঙ্গিত করিলেন। সুরেন্দ্রও অনুরোধ করিল যেন হরেন্দ্রের উপর কেহ কোনও রূপ অত্যাচার না করে। অবমানিত ভ্রাতৃস্নেহকে সুরেন্দ্র এইরূপে রাজধিরাজের মণিমুকুটে ভূষিত করিয়া দিল।

সুরেন্দ্রের অন্ন ছাড়িয়া গিয়াছে, আশ্রয় পাইয়াছে, গ্রামের সর্ব্বসাধারণে তাহাকে সাহায্য করিতেছে, লোকে বলিতেছে যে চাঁদা তুলিয়া সুরেন্দ্রের কন্যার বিবাহ দিয়া দিবে, রামদত্ত ইহারই মধ্যে দশটাকা বেতনে তাঁহার সেরেস্তায় সুরেন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়াছেন—ইত্যাদি সংবাদ হরেন্দ্র যতই শুনিতেছিল, ততই সে সুরেন্দ্রের প্রতি বেশী বেশী হিংসাযুক্ত হইতেছিল। গ্রামের লোকের উপর সে তো চটিয়া আগুন। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া সে যাহাকে পথের ভিখারী করিতে চায়, লোকে কেন তাহাকে আদর করিয়া তাহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিবে? সুরেন্দ্র নীরবে সমস্ত লাঞ্ছনা বহন করিতেছে, সে যে বাধা দিতেছে না—ইহা হরেন্দ্রের অসহ্য। তবুও সে তাহাকে আশানুরূপ জব্দ করিতে পারিতেছে না। হরেন্দ্র আপনার এই ক্ষমতাদৈন্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া উঠিল।

শ্রাদ্ধের সময় যখন নাপিত পুরোহিত ব্রাহ্মণ কেহই তাহার গৃহে পদার্পণ করা দূরে থাকুক্, আহ্বানই গ্রহণ করিল না—তখন হরেন্দ্র ভাবিল সে তাহার ব্যর্থ প্রয়াসের ভস্ম স্তূপের উপর আত্মহত্যা করে। সে ক্ষমতাও তাহার নাই। তাহার ইচ্ছা হইল—এই মুহূর্ত্তে গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিশ্বদাহী আগুন জ্বালাইয়া দেয়—ইহাও তাহার সাধ্যাতীত।

সুরেন্দ্রের গৃহে পিতৃশ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন। গ্রামশুদ্ধ লোক তাহার বাড়ীতে কাযে অকাযে কারণ অকারণে ঘুরিতেছে, হুকুম চালাইতেছে, কায করিতেছে, গোলমাল করিতেছে, নূতন ছোট ডাবা হুঁকা হাতে করিয়া মুরুব্বী-য়ানা করিতেছে—অর্থাৎ এ যেন গ্রামশুদ্ধ সকলেরই পিতৃশ্রাদ্ধ। হরেন্দ্রবাবু কলিকাতায় থাকে, মাইনর চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, কাযেই শিক্ষিত, জুতা পায়ে না দিয়া রাস্তায় বাহির হয় না, ঘড়ি দেখিয়া সময় নিরূপণ করে—সে এ অসভ্য গ্রাম্য বর্ব্বরদের খোষামোদ করিতে পারে না—তাই সেই দিনই কলিকাতা রওনা হইল। শ্রাদ্ধ সেইখানেই করিবে।

তিন চারি মাস পরে হরেন্দ্র পরিবারবর্গকে পুনরায় গ্রামে রাখিয়া কলিকাতা ফিরিয়া গেল। সতীশের এবার তাহার ছোট মামার—সম্প্রতি মামাবাবুর—অধীনে মাসিক ছয় টাকা বেতনে একটি চাকুরী হইয়াছে বলিয়া, সে আর আসে নাই।

কান্তমণির মনোভাবটা তবুও হরেন্দ্রের উপর তেমন প্রসন্ন নহে—এটা অনেকেই লক্ষ্য করিল। বিশেযতঃ গ্রামের স্ত্রীমহলে ইহা লইয়া বেশ কাণাঘুঁসা চলিতে লাগিল।

ক্ষান্তমণির প্রাণপণ সহযোগিতায় হরেন্দ্র সুরেন্দ্রকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে যে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, এজন্য ক্ষান্তর সঙ্গেও মহিলারা ভাল করিয়া মিশেন না, কাযেই আসল ব্যাপারটা কেহই ভাল জানিল না। যে দিন হরেন্দ্রের স্ত্রীর সহিত ক্ষান্তর একটি ছোটখাট কলহ হয়, সেই দিনই সকলে টের পাইয়াছে যে ক্ষান্তমণির বহুদিন সঞ্চিত পাঁচশো থানি রৌপ্যমুদ্রা ছিল, তাহার উপর হরেন্দ্রের চিরকালই একটা আকর্ষণ ছিল—সম্প্রতি হরেন্দ্র সেগুলি আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সতীশকে ভাল চাকরী করিয়া দিবে, ক্ষান্তকে তীর্থ করাইবে, আমরণ জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সমস্ত ব্যয় বহন করিবে, প্রভৃতি মধুর বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া ক্ষান্তমণি ছোট ভাইয়ের নিকট যে সেই রাশিপ্রমাণ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছে—তাহার যে পুনরুদ্ধার কখনও হইবে এ আশা অতি অল্প বলিয়া সময় সময় ক্ষান্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া থাকে। ইহাতেই গ্রামে আসল কথা ফাঁস হইয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দুই ভাই দুই ঠাঁই হইয়া এক রকম করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে। সুরেন্দ্রের আন্তরিক ইচ্ছা যে সে গিয়া হরেন্দ্রের সঙ্গে মিট্‌মাট্ করিয়া আসে, কিন্তু সকলেই তাহার এ মতের বিপক্ষে বলিয়া সে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই।

গ্রামে আসিলে হরেন্দ্র নিজেও কোথাও বাহির হয় না, অথবা তাহার নিকটও কেহই যায় না—লোকের মনে—এখনও তার ভাইয়ের প্রতি অত্যাচারের স্মৃতি জাগরূক। কখন কখন তাহার ইচ্ছা হইয়াছে কোথাও গিয়া দুই দণ্ড বসে, বা কাহারও সহিত দুইটা সুখ দুঃখের আলাপ করে,—কিন্তু তাহাকে যে সকলে ঘৃণা করে, কেহই তাহাকে নিজের পাশে বসাইবে না—ভাবিতে ভাবিতে রাগে তাহার শিরাগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত। এই জন্য সুরেন্দ্রের নাম পর্য্যন্ত তাহার সহিত না। পূজার ছুটি ছাড়া হরেন্দ্র বাড়ী আসাই প্রায় পরিত্যাগ করিল।

হরেন্দ্র বাটি আসিলে সুরেন্দ্রের খুবই ইচ্ছা হইত একবার তাহার নিকট যায়, কিন্তু কেহই তাহাকে যাইতে দেয় না। বিশেষতঃ দত্ত মহাশয়ও এমন ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করাতে যখন নারাজ তখন আর সুরেন্দ্র যায় কি করিয়া? তবুও পথে ঘাটে কোথাও দেখা হইলে সুরেন্দ্র ছোট ভাইয়ের কুশল প্রশ্ন না

করিয়া থাকিতে পারিত না। হরেন্দ্র ইহাকে অন্যরূপ ভাবিয়া অনেক সময় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত—তাহার ভয়, কি জানি কিছু চাহিয়া বসে। সুরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া মনে মনেই কাঁদিত।

এবারও হরেন্দ্র বাড়ি আসিয়াছে। পথে দুজনের সাক্ষাৎ হাওয়ায় সুরেন্দ্র স্বভাব হাসিতে অভিষিক্ত করিয়া স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল—"এই যে হরেন্ যে, কবে এসেছ ভাই?"

হরেন্দ্র দাঁত মুখ খিঁচাইয়া অত্যন্ত রূঢ়স্বরে কহিল—"কেন তোমার কিছু চাই টাই? যা মত্‌লব, খুলে বল।"

সুরেন্দ্র আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, হতাভিমানে মুখ নামাইয়া চলিয়া গেল! সুরেন্দ্র আজ অত্যন্ত ব্যথিত হইল, মর্ম্মান্তিকরূপে অপমানিত বোধ করিল। সে কি করিয়া বুঝাইবে যে, সে মাসিক দশটাকা বেতনে ও নৈবেদ্যের চাউলে রাজার হালে আছে, তাহার কোন অভাবই নাই। যজমানেরা এখন তাহাকে সিধায় বেশী বেশী চাউল দেয়, দুই আনার স্থলে চারি আনা দক্ষিণা দেয়—তাহাতে তাহার অবস্থা খুবই সচ্ছল, একথা সুরেন্দ্র তাহার মদান্ধ নির্ব্বোধ ভাইটিকে কি করিয়া বুঝায়? অথচ এত বড় একটা অপমানও সে সহ্য করিতে পারিতে পারিতেছিল না। 'কিছু চাই?' কখনও কি সে কিছু চাহিয়াছে? তাহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইল, শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিল, কণ্ঠের নীচে ভাণ্ডভরা বিষ ফেনাইয়া উঠিল—ফিরিয়া দেখিল যখন, তখন তাহার ভাই বহুদূর চলিয়া গিয়াছে,—এত দূর যে আর ডাকিয়া সে বিষ নিক্ষেপ করিতে গেলে তাহাতে ফল তো হইবেই না, হয় ত পরিহাসের মত গায়ে লাগিয়া ঝরিয়া পড়িবে। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া সুরেন্দ্র নিজের মনের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিল। এইদিন হইতে আর যাহাতে দুইজনে সাক্ষাৎ না হয়, তারজন্য সে বিশেষ সতর্কতাও অবলম্বন করিল।

আশ্বিনের শেষাশেষি। একে ত বর্ষাকাল হইলেই গ্রামে জল ঢুকে। তাহাতে আবার খবর পাওয়া গেল দামোদরে ভীষণ বন্যা। দেখিতে দেখিতে অজয়েও তাহার প্রতিধ্বনির মত কল কল রবে বানদেবতার স্বাগত শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। দুই তিন দিনের মধ্যেই বরাবর যতদূর জল আসে তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া স্ফীতোচ্ছ্বল ফেণায়িত জলরাশি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ছড়াইয়া গড়াইয়া পড়িল।

সুরেন্দ্র মকিপুরে নিজ কন্যার জন্য একটি পাত্র দেখিতে গিয়াছিল, কিন্তু

এই অকস্মাৎ বন্যার জন্য সেখানে তিনদিন হইতে আটকাইয়া পড়িয়াছে। খেয়ার মাঝিরা কোনও মতে সে তুফানে পাড়ি জমাইতে সাহসী নয়। শ্রাবণ ধারার মত বৃষ্টি ও তুফান যখন তিন দিনেও থামিল না—তখন সুরেন্দ্রকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। সে জমিদারের শরণাপন্ন হইল, তাঁহার আদেশে মাঝি একবার খেয়া বাহিতে অগত্যা স্বীকৃত হইল।

*	*	*	*	*	*	*

বেলা প্রায় বারটা। সুরেন্দ্র সারা পথ জল ভাঙ্গিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। কোথাও মাটি নাই—গাছ পালা, লতা, বাড়ী সব যেন জলে ভাসিতেছে। কত কত ঘর পড়িয়া গিয়াছে—সেই চালের উপর হতভাগ্য নরনারীগণ নির্ব্বাসিতের মত কাঁদিতেছে। গ্রামের গবাদি পশু কতক ভাসিয়া গিয়াছে, কতক মরিয়া গিয়াছে—অবশিষ্ট গুলিও এই সমাগত বিপদে মুহ্যমান্ হইয়া মরিবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছে। এই নিরন্ন, আশ্রয়চ্যুত, শীতজর্জ্জর, বর্ষাধারায় অনাচ্ছাদিত অনাবৃত পল্লীবাসীদিগের ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি দেখিয়া সুরেন্দ্র বড়ই ব্যথিত হইল। তাহার নিজের পরিবারের কথা মনে পড়িল। পড়িতেই তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠিল। তাহার প্রধান ভাবনা—এবার গৃহহীন হইলে কে আশ্রয় দিবে? ক্রমশঃ সুরেন্দ্র আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে এতই বিমনা হইয়া পড়িল যে, তাহার মাথায় নিজের কথা ভিন্ন অন্য কোনও চিন্তারই স্থান রহিল না।

সুরেন্দ্র উত্তরপাড়ায় যখন পৌছিল, তখন দেখিল যে কেবল এই দিকেই জল আক্রমণ করিতে পারে নাই। দেখিয়াই তাহার ভয়পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে একটা আশার জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিল।

সুরেন্দ্র গৃহে পৌছিয়া প্রথমে স্ত্রীকন্যাগণকে দেখিয়া তাহার সমস্ত দুর্ভাবনার বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইল। জলে ভিজিয়া ও পথ হাঁটিয়া সে যে ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গেল। তখন আবার মনে হইল যে গ্রামের কি দুর্দ্দশা সে দেখিতে দেখিতে আসিয়াছে। সকল দশা তাহার ভাল মনে না থাকিলেও, কুস্‌মি বাগ্দীকে ঘরের চালার উপর তিনদিনের প্রসূত সন্তান কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছে—তাই তাহার জন্য গৃহে একটু স্থান করিয়াই সে আবার তখনই বাহির হইয়া গেল।

কুস্‌মি বাগ্দীকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া, সুরেন্দ্র তাহার বাপের ভিটার অবস্থা দেখিতে ছুটিল। সে পথে গিয়া দেখে যে সেখানে হাঁটু ভোর জল,

ঘরখানি ডুবু-ডুবু। কিয়ৎক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া সে ভাবিল যে বাড়ীখানির তো পড়িতে বেশী দেরী নাই। কাযেই সে বাড়ীর লোকেরা যে কোথায় এই দুর্য্যোগে গিয়া দাঁড়াইবে, এ চিন্তা করিয়া সুরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিল না। কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া সে কোমর ভোর জলে নামিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

নিকটেই একটি অশথতলে হরেন্দ্র, ক্ষান্তমণি, সতীশ, তাহার পত্নী, হরেন্দ্রের স্ত্রী ও তাহার চারিটি কন্যা গৃহহীন হইয়া কাঁদিতেছে। সুরেন্দ্র সে দিকে চাহেও নাই।

সুরেন্দ্রকে বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া হরেন্দ্র ডাকিল—"দাদা—ও দাদা—ও দিকে কোথা যাচ্ছ ?"

সুরেন্দ্র চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মুখ ফিরাইতেই গৃহহারা আত্মীয়-গণকে দেখিতে পাইল। সুরেন্দ্র ফিরিল। নিকটে আসিলে, হরেন্দ্র তীব্র অথচ সলজ্জ দৃষ্টিতে—পরুষ অথচ করুণ, উদ্ধত অথচ আত্মসমর্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলে ?"

সুরেন্দ্র এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একহাতে এক পোঁটলা ও অন্যহাতে একটা বাকস মাথায় তুলিতে তুলিতে কহিল—"চল' চল' বাড়ী আগে চলত ? মারা যাবে যে ? কতক্ষণ এমন করে' দাঁড়িয়ে আছ তোমরা ? হেঁ—সব একেবারে ছেলেমানুষ ! এস, এস।" বলিয়াই সুরেন্দ্র চলিতে লাগিল।

সাপুড়িয়ার মন্ত্রে মুগ্ধ সর্পের মত সকলেই সুরেন্দ্রের অনুসরণ করিতে লাগিল।

হরেন্দ্র মনে মনে অনেকগুলি কথা সাজাইয়া ডাকিল—"দাদা—" ; কথা আটকাইয়া গেল। চক্ষু দিয়া সজোরে অশ্রুপ্রবাহ বহিতে আরম্ভ করিল। হরেন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও সে বেগ রোধ করিতে পারিল না।

সুরেন্দ্র উত্তর দিল—"ভাই !"

আর কোনও কথাই হইল না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অন্নপূর্ণা রূপ ।

কই তব অন্নকূট,
ভরি দাও করপুট,
ধরণি,—হা জননি,—ক্ষুধায় কাতর
দাঁড়াইয়া মহাকাল,
খসিছে বাঘের ছাল,
স্তিমিত-নয়ন-বহ্নি—শুষ্ক ওষ্ঠাধর,—
রিক্ত-শূন্য ভিক্ষাঝুলি,
মুষ্টিভিক্ষা গেছে ভুলি'—
রুধি'দ্বার কাঁদে গৃহী—ফিরে দিগম্বর—
ক্ষুধায় জর্জ্জর।

'দেহ অন্ন'—পাতি হাত
ডাকিছেন ভোলানাথ,
ভরিতে কালের কুক্ষি সাধ্য কাছে কার ?
ধনী অবনত-মুখ,
বিদরে দাতার বুক,
আঁচলে নয়ন মুছে বধূ আপনার।
অন্ন নাই—অন্ন নাই,
"দেহ অন্ন—ভিক্ষা চাই,"
অতিথি ফিরিয়া যায়,—কে করে সৎকার ?—
রুদ্ধ সর্ব্ব দ্বার।

কালের পরীক্ষা শেষ—
হাসিল আবার দেশ,
শস্যে পরিপূর্ণ হ'ল ধরার অঞ্চল ;
মায়ের প্রসন্ন মুখ,
দূরে গেল সর্ব্ব দুখ,
জুটিল দুয়ারে অর্থী-ক্ষুধিত-বিকল ;

নহে আর ব্যর্থ-শূন্য—
অন্নের ভাণ্ডার পূর্ণ,
জননীর-মুখে হাসি—স্নেহ নিরমল—
ভাতিল উজ্জ্বল।

স্বর্ণ দর্ব্বী শোভে করে
ক্ষুধিতে বণ্টন-তরে,—
পরিপূর্ণ-অন্নপাত্র ধরিলেন হাতে ;
দৃষ্টি হ'তে সুধা ক্ষরে,
কি দয়া সবার 'পরে ;
দাঁড়াইল মহাকাল চরাচর-সাথে ;
অন্নপূর্ণা দিলা সুধা,
হরিল কালের ক্ষুধা,
"জয়-জয় অন্নপূর্ণা"-রবে বিশ্ব মাতে—
আনন্দ প্রভাতে।

শ্রীগিরিজা নাথ মুখোপাধ্যায়।

রাণাঘাট
২রা চৈত্র—১৩২১

বঙ্কিমচন্দ্র-জীবনপঞ্জী।

[একুশ বৎসর হইল এই চৈত্রমাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "বঙ্কিম-জীবনী" অবলম্বন করিয়া আমি এই জীবনপঞ্জী সংকলন করিলাম। অন্যান্য গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ হইতেও কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছি।

এই জীবনপঞ্জী নিশ্চয়ই বহু অংশে অসম্পূর্ণ এবং সম্ভবতঃ স্থানে স্থানে ভ্রমাত্মক। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের এতদতিরিক্ত কোনও উল্লেখযোগ্য তারিখ বা সন অবগত আছেন, অথবা যাঁহারা এই সংকলনে কোনও ভ্রম প্রমাদ দেখিবেন, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া সেগুলি "মানসী" কার্য্যালয়ে লিখিয়া পাঠান, তবে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব। আমিও স্বয়ং নূতন তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছি। আগামী বৎসর চৈত্রের "মানসীতে" সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে এই জীবনপঞ্জী পুনঃ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।—

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।]

১৮৩৮—২৭শে জুন (১৩ই আষাঢ় ১২৪৫) রাত্রি ৯টার সময় চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়ায় জন্ম।

১৮৪২—পিতা ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম্মস্থান মেদিনীপুরে হাতেখড়ি।

মাতার সহিত কাঁটালপাড়ায় আগমন এবং রামপ্রাণ সরকার গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা।

১৮৪৪—মেদিনীপুরে পিতার নিকট আগমন এবং জেলা ইস্কুলে ইংরাজি পাঠ।

১৮৪৭—কাঁটালপাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন ও হুগলি কলিজিয়েট ইস্কুলে প্রবেশ।

১৮৪৯—ফেব্রুয়ারি। কাঁটালপাড়ার নিকট নারায়ণপুর গ্রামে বিবাহ হইল।

১৮৫০—"মানস ও ললিতা" কবিতা রচনা।

১৮৫৩—চৈত্র।—"প্রভাকরে" দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর কবিত প্রতিযোগিতা।

চারি বৎসর ব্যাপী সংস্কৃতচর্চ্চারম্ভ—ব্যাকরণ, * কাব্য ও সাহিত্য অধ্যয়ন।

১৮৫৭—মধ্যভাগে—হুগলি কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় গমন এবং প্রেসেডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়ন আরম্ভ।

পিতা যাদবচন্দ্র রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

১৮৫৮—এপ্রিল। আইন অধ্যয়ন ছাড়িয়া, বি এ পরীক্ষা দিলেন।

মে। বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

২৩শে আগষ্ট। ডেপুটি কলেক্টারি পদে নিযুক্ত হইলেন।

প্রথম কর্ম্মস্থান যশোরে গমন এবং তথায় দীনবন্ধু মিত্রের সহিত পরিচয়।

১৮৫৯—কার্ত্তিক। ষোড়শবর্ষ বয়সে জ্বররোগে পত্নীর মৃত্যু।

১৮৬০—জানুয়ারি। যশোহর হইতে নাগোয়াতে বদলি (কাঁথির নিকট) তথায় কাপালিক দর্শন।

জুন। হালিসহর গ্রামে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ।

একশত টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া পঞ্চম গ্রেডে উন্নীত হইলেন।

নভেম্বর। নাগোয়া হইতে খুলনায় বদলি।

১৮৬২—কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান ফীল্ড" পত্রে "রাজ্‌মোহন্স ওয়াইফ্" নামক ইংরাজি উপন্যাস প্রকাশারম্ভ। কাগজ বন্ধ হওয়ায় উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ হয় নাই।

১৮৬৩—আরম্ভে। চতুর্থ গ্রেডে উন্নতি ও একশত টাকা বেতনবৃদ্ধি।

"দুর্গেশনন্দিনী" রচনা।

* বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২০ সালের "সাহিত্যে" "বঙ্কিম প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাকরণশিক্ষা ভালরূপই হইয়াছিল। ভাটপাড়ার বিখ্যাত বৈয়াকরণ ৺শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নিকট তিনি ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।"

১৮৬৪—মার্চ্চ। খুলনা হইতে বারুইপুরে বদলি ও পথে কয়েকদিন কাঁটালপাড়ায় যাপন। *

শেষভাগে—বারুইপুর হইতে ডায়মণ্ডহার্ব্বারে বদলি। আবার ডায়মণ্ড হার্ব্বার হইতে বারুইপুরে বদলি। †

সঞ্জীববাবু আসিয়া দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিবার জন্য লইয়া গেলেন।

১৮৬৫—**দুর্গেশনন্দিনী** প্রকাশ।

* এই সময় বঙ্কিমের জ্যেষ্ঠদ্বয় (শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র) দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি শুনিয়া উহা প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া অভিমত দিয়া থাকিবেন, এইরূপ শচীশ বাবুর অনুমান।—"বঙ্কিমজীবনী" ১৩০ পৃঃ

† শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত মহাশয় তখন বারুইপুর রেজিষ্টরি আফিসের হেডক্লার্ক—তিনি লিখিয়াছেন—"এই সময়ের পূর্ব্ব হইতে তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন। এ স তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি সাক্ষীর এজেহার লিখিতে লি তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজ পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে—তাঁহার study room এ প্রস্থান করিতেন এবং চিন্তিত বিষয় লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না।—"বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধ—"প্রদীপ" ২য় ভাগ ২১৯ পৃঃ।

‡ ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়া মনে হইল উহা স্কটের আইবানহো পড়িয়া লিখিত। অনেকদিন পরে বঙ্কিমবাবুকে একবার এই কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগে আইবানহো পড়ি নাই।"

"বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধ। প্রদীপ ১ম ভাগ ২১৫ পৃঃ

কালীনাথ বাবু "প্রদীপে" প্রকাশিত উল্লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে বলেন—"দুর্গেশনন্দিনী লেখা সমাপ্তপ্রায় হইলে কিম্বা মুদ্রিত হইবার প্রাক্কালে আমি তাঁহার পাঠ-কক্ষের টেবেলে কয়েক ভলুম স্কটের ওয়েবর্লি উপন্যাস সজ্জিত দেখি। তিনি হয়ত কোনও বন্ধুকে তাঁহার দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতে দেন, বন্ধু তাঁহাকে Ivanhoeর উপাখ্যান ভাগের সঙ্গে তাঁহার পুস্তকের উপাখ্যান ভাগের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া থাকিবেন; তাহাতে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সম্ভবতঃ নূতন ওয়েবর্লি উপন্যাসাবলী বাজার হইতে ক্রয় করিয়া দেখিতে আনিয়াছিলেন। + + + Ivanhoeর ছায়া লইয়া যে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হয় নাই, ইহা বঙ্কিম বাবু নিজমুখে শতবার ব্যক্ত করিয়াছেন। আমার নিজের যাহাই ধারণা হউক না, আমি বঙ্কিম বাবুর কথায় বিশ্বাস করিয়া সে ধারণাকে অপসৃত করিয়াছি। কেন না আমি তাঁহার honesty কে unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি।"—প্রদীপ, ২য় ভাগ, ২১৯-২২০ পৃঃ।

১৮৬৬—বেতনবৃদ্ধি ও তৃতীয় গ্রেডে উন্নতি।

দেড়মাসের ছুটিতে বাড়ী আসিলেন।

ছুটিশেষে বারুইপুর ফিরিলেন।

১৮৬৭—প্রথমে। **কপালকুণ্ডলা** প্রকাশ।

জুলাই। আমলা বেতন নির্দ্ধারণ কমিশনের সেক্রেটারি নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। *

সেপ্টেম্বর। আলিপুর সদরে বদলি।

এ বৎসর "মৃণালিনী" রচনা আরম্ভ।

১৮৬৮—"মৃণালিনী" রচনা শেষ (রচনা কাল দশমাস)

জুন। ছয় মাসের ছুটি লইয়া কাঁটালপাড়ায় গমন, তথায় আইন অধ্যয়ন ও "মৃণালিনী" সংশোধন।

"মৃণালিনী" ছাপিতে দিয়া কাশীযাত্রা।

১৮৬৯—ছুটি শেষে আলিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন।

বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

৩রা মে। "দুর্গেশনন্দিনী" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

১০ই নবেম্বর। **মৃণালিনী** প্রকাশ।

২৯শে নভেম্বর। আলিপুর হইতে বহরমপুরে বদলি। †

---

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিত "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে বর্ণিত, আইন-শিক্ষার্থ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেসিডেন্সি কলেজে যাতায়াত সম্ভবতঃ এই সময় হইয়া থাকিবে।

† সে সময় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতা বহরমপুরে সবজজ। তিনি তাঁহার "পিতাপুত্র" প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবুর বহরমপুরে আগমন বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সরস বর্ণনাটি দীর্ঘ হইলেও সমস্তটুকু উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।—

"আমার বহরমপুরে যাওয়ার কিছুদিন পরে বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যান। × × × তাৎকালিক বঙ্কিমচরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া তাঁহার অহঙ্কারের কথা না বলা, ঘোরতর বিড়ম্বনা। বঙ্কিম আমাদের সমাজে, সাহিত্যে গোলাপ ফুল। গোলাপের কেবল পাপড়ির রঙ দেখিবে, মিঠা মিঠা সৌরভ দেখিবে, ঢল ঢল রূপ দেখিবে, গোলাপের বৃন্তে যে কাঁটা আছে তাহা কি দেখিতে নাই? গোলাপে কাঁটা আছে বলিয়া কি গোলাপের মর্য্যাদা কম? × × ×

বঙ্কিম বাবু বহরমপুর যাইতেছেন বলিয়া, সঞ্জীব বাবু পিতাকে পত্র লেখেন, আমাদের

বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন এবং কাছারির নিকট বঙ্কিম বাবুর জন্য একটি বাটী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য পাঁচটা বাড়ী দেখিয়া শুনিয়া, একটি বাড়ী ঠিক করিয়া ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া রাখিলাম; জল তুলাইয়া রাখিলাম; একটি ঠিকা চাকরও রাখিয়া দিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যে গুণপনায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম; সুতরাং কেবল আতিথ্যের খাতিরে নহে, প্রকৃত ভক্তিভরে, আনন্দ সহকারে, এই সকল কার্য্য করিয়াছিলাম। যথাকালে বঙ্কিমবাবু আসিলেন, আহারাদি করিলেন, শুনিলেন যে আমি গৃহবাসী গঙ্গাচরণ বাবুর পুত্র, বি এল পাস করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি। আহারের পর বিশ্রাম করিলেন; বিশ্রামের পর আমরা পিতাপুত্রে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ী দেখাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ী দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ঠিকা চাকর তিনখানা কেদারা বাহির করিয়া দিল, আমরা তিনজনে ক্ষণেক বসিয়া রহিলাম, বাসায় সকলে ফিরিয়া আসিলাম, বঙ্কিমবাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পিতার সহিত কথাবার্ত্তা চলিল। পরদিন প্রাতে তাঁহার জিনিসপত্র, চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া, গাড়ী করিয়া তিনি নিজ বাসায় গেলেন, আমি গাড়ী করিয়া দিলাম, গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম; তখনকার কথা মনে পড়িলে এখন বুক ফাটে! এ পর্য্যন্ত বঙ্কিমবাবু আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না; অধীনের প্রতি কপালকুণ্ডলাকারের করুণা হইল না। বাবা সব বুঝেন, সব জানেন, সব দেখিতেছিলেন, আমি ফিরিয়া উপরে গেলে, বলিলেন "বঙ্কিম গেল হে?" আমি বলিলাম "হাঁ।" "তোমার সহিত দুদিনে একটিও কথা হয় নাই?" আমি বলিলাম "কথা কি, আমি যে একটা জীব, এই বাসায় থাকি; সে খবর হয়ত তাঁহাতে এখনও পৌঁছে নাই।" পিতা বলিলেন "তাই বটে।" বলিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসির ফোয়ারায় আমার মনের ময়লা ধুইয়া গেল। পিতৃগৌরবে আমি গৌরবান্বিত, আমিও হাসিতে লাগিলাম।

কাছারির ফেরতা পিতা পুত্র দুইজনে বঙ্কিমবাবুর সুবিধা অসুবিধা কতদূর হইতেছে দেখিবার জন্য, বঙ্কিমবাবুর বাসায় তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। বঙ্কিম বাবু "আসুন" বলিয়া পিতাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন, এবার মনে হইল, পিতাকে আসুনের সম্বোধনে, ব্র্যাকেটের মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিযুক্ত সেই চাকর, সেইরূপ তিনখানি কেদারা বাহির করিয়া দিল; বঙ্কিমবাবুর আদেশ মত পিতাকে তামাক দিল, আমরা তিনজনে বসিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বঙ্কিম বাবুর কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি জনান্তিকে দুই এক কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম। বঙ্কিমবাবু কিন্তু টোপ ধরিলেন না। তবে আমি এবার বুক বাঁধিয়া গিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর এই ভাব গায়ে কিন্তু মাখিলাম না; তবে মনে মনে এমন ভাবটা হইয়া থাকিবে যে, "কাদা মাখা সার হল মোর, মাছ ধরা হল না।"

এইরূপে দিন যায়। বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়াছেন, দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। আমারও দিন আটকাইয়া রহিল না। যতদিন পিতা বহরমপুরে ছিলেন, ততদিন বঙ্কিমবাবু মাঝে মাঝে একবার আসিতেন, পিতার সহিত গল্প গুজব করিয়া চলিয়া যাইতেন।

১৮৭০—১৫ই এপ্রিল—কপালকুণ্ডলা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ। *
শেষভাগে—বেতন বৃদ্ধি, দ্বিতীয় গ্রেডে উন্নীত হইলেন।
মাতৃবিয়োগ।
ছুটি লইয়া বাড়ী আসিলেন।

১৮৭২—১লা বৈশাখ (বাং ১২৭৯) ভবানীপুর হইতে **বঙ্গদর্শন** প্রকাশ এবং তাহাতে "বিষবৃক্ষ" আরম্ভ। প্রথম সংখ্যা ১০০০ ছাপা হইল।+

তাহার পর পিতৃদেব চলিয়া গেলেন, আমি একা বাসায় রহিলাম। বঙ্কিমবাবু আর আসেন না, আমিও অবশ্য যাই না।

কিসের একটা ৪।৫ দিনের ছুটি হইল। বঙ্কিম বাবুও বাড়ী আসিবেন, আমিও বাড়ী আসিব। নলহাটীতে আসিয়া দুইজনে দেখা সাক্ষাৎ। সাত সাত ঘণ্টা কাল, নলহাটীতে বিশ্রাম ও কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহার পর হয়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়ানের গাড়ী আসিবে, নয়ত দুই ঘণ্টা বিলম্বেও আসিতে পারে। সেকেণ্ডক্লাসের বিশ্রামঘরে বসিয়া বঙ্কিম বাবু ও আমি। দিন যায় ত ক্ষণ যায় না। বহু দিন গিয়াছে কিন্তু এবার বঙ্কিমবাবু ক্ষণ কাটাইতে পারিলেন না। শুভক্ষণে, অতি শুভক্ষণে, বঙ্কিমবাবু কথা কহিতে লাগিলেন। একথা, সে কথা, ও কথা, কোথা হইতে কিরূপ করিয়া পড়িল—রহস্যকার রেণল্ডের কথা। তখন দুইজনে অসিধারে রেণল্ডের মুণ্ডপাত করিয়া,বসিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক দুইজনে সেই মুড়ি চিবাইতে লাগিলাম। চর্ব্বণের সেই রসগ্রহে, দুইজনের ভিতরে সহৃদয়তা জন্মিল; দিন দিন সে সহৃদয়তা ক্রমে ক্রমে অবিচ্ছেদে বিশেষ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। × × × বঙ্কিমবাবুর বন্ধুবৎসলতার পরিচয় চন্দ্রনাথ দাদা যথেষ্ট দিয়াছেন। আমি আর চন্দনে সুগন্ধি প্রক্ষেপ করিব কেন?"

'বঙ্গবাসী' আফিস হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক", 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধ, ৫৪১-৫৪৪ পৃঃ

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বর্ণিত নলহাটী ষ্টেসনে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত প্রথম বাক্যালাপ, সম্ভবতঃ এই সময়ে হইয়া থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় ঈষ্টরের ছুটিতে বাড়ী যাইতেছিলেন।

+ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"বঙ্গদর্শনের আদিযুগের একটা কথা মনে পড়িল। বহরমপুরে নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইয়াছে, ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা। আমিও তখন বহরমপুরে থাকি। সম্পাদকের নিজস্ব নম্বর খানিতে শ্রীমতী কর্ত্রীঠাকুরাণী সদর পৃষ্ঠায় যে বড় বড় অক্ষরে **বঙ্গদর্শন** ছাপা আছে তাহারই 'ব'র নীচে কখন একটি শূন্য বসাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদকের কনিষ্ঠা কন্যা তখন সবেমাত্র দ্বিতীয়ভাগ পড়িতেছেন তিনি সেই বঙ্গদর্শনখানি লইয়া তাড়াতাড়ি পিতার কাছে আসিয়া অনুযোগ করিলেন, "বাবা, তুমি যে বলিয়াছিলে 'বঙ্গদর্শন', এ যে 'রঙ্গদর্শন'?" বঙ্কিম বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার গর্ভধারিণীর গুণে রঙ্গ হইয়াছে, আমি কি করিব মা?"

নবপর্য্যায় "বঙ্গদর্শন", শ্রাবণ ১৩১৪

শ্রাবণ। বঙ্গদর্শনের গ্রাহকসংখ্যা ১৫০০ হইল।

বহরমপুরে ৺রমেশ দত্ত মহাশয়ের সহিত পরিচয়।

১৮৭৩—চৈত্র। বঙ্গদর্শনে "বিষবৃক্ষ" শেষ। এই সংখ্যায় "ইন্দিরা"ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

বৈশাখ। বঙ্গদর্শন কার্য্যালয় ভবানীপুর হইতে উঠিয়া কাঁটালপাড়ায় গেল। বঙ্গদর্শনে "যুগলাঙ্গুরীয়" প্রকাশ।

১লা জুন। **বিষবৃক্ষ** পুস্তকাকারে প্রকাশ।

আশ্বিন। বঙ্গদর্শনে "চন্দ্রশেখর" আরম্ভ।

বঙ্গদর্শনে "সাম্য" প্রবন্ধ প্রকাশ।

(ছোট) "ইন্দিরা" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

১৮৭৪—২রা ফেব্রুয়ারি। ছুটি লইয়া বহরমপুর হইতে গৃহে গমন।

এপ্রিল। ছুটি শেষে বারাসতে বদলি।

১৫ই জুলাই। "দুর্গেশনন্দিনী" পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ।

১৫ই আগষ্ট। "কপালকুণ্ডলা" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

ভাদ্র। বঙ্গদর্শনে "চন্দ্রশেখর" শেষ এবং "কমলাকান্তের দপ্তর" প্রকাশ আরম্ভ।

আশ্বিন। বঙ্গদর্শনে "রজনী" আরম্ভ।

অগ্রহায়ণ। বঙ্গদর্শনের গ্রাহক প্রায় ২০০০ হইল।

মালদহে বদলি।

২২শে নভেম্বর। "মৃণালিনী" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

২৬শে ঐ। **লোকরহস্য** প্রকাশিত হইল।

যুগলাঙ্গুরীয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

১৮৭৫—বৈশাখ। বঙ্গদর্শনে "কমলাকান্তের দপ্তর" শেষ হইল।

১৯শে এপ্রিল। **বিজ্ঞান-রহস্য** প্রকাশিত হইল।

১লা জুন। **চন্দ্রশেখর** পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

২২শে ঐ। নয় মাস ছুটি লইয়া কাঁটালপাড়া গমন। *

"রাধারাণী" এবং "কৃষ্ণকান্তের উইল" রচনা।

২৯শে সেপ্টেম্বর। "বিষবৃক্ষ" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। বঙ্গদর্শনে "রাধারাণী" প্রকাশ।

অগ্রহায়ণ। বঙ্গদর্শনে "রজনী" শেষ হইল।

রাধারাণী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

১৮৭৬—পৌষ। বঙ্গদর্শনে "কৃষ্ণকান্তের উইল" আরম্ভ।

২রা ফেব্রুয়ারি। **কমলাকান্তের দপ্তর** পুস্তকাকারে প্রকাশ। দুই হাজার ছাপা হইল।

১০ই ফেব্রুয়ারি। "দুর্গেশনন্দিনী" ষষ্ঠসংস্করণ প্রকাশ, দুই হাজার ছাপা হইল।

* সম্ভবতঃ এই নয়মাসের মধ্যে কোনও দিন কলিকাতায় "কলেজ রিইউনিয়নের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সে অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দর্শন করেন। ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমি দ্বিতীয় কলেজ রিইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম।" সম্পাদক হইয়াছিলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতার মরকতকুঞ্জ নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি এমন সময় একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে প্রকারে অভ্যর্থনা করিতেছিলাম বিদ্যুৎকেও সেই প্রকারে অভ্যর্থনা করিলাম বটে। কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করমর্দ্দন করিতে পাইব কি? সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম হাত উষ্ণ। × × × × সে দিন বঙ্কিম বাবুর সহিত আমার অধিক কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার পর রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের মূর্ত্তিমান রাগাদি (tableaux vivants) দেখিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—আপনি আপনার কোন্ উপন্যাসখানিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করেন? ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন—'বিষবৃক্ষ'। তখন চন্দ্রশেখর পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল।"—"বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধ, প্রদীপ ১ম ভাগ, ২১৬ পৃঃ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—"সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়ুনিয়ন নামক

মার্চ্চ। ছুটিশেষে হুগলিতে বদলি; কাঁটালপাড়া হইতে গমনাগমন। *

মিলন-সভা বসিয়াছিল। ঠিক কতদিনের কথা ভাল স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জন-তার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারো পরিচয় জানি-বার জন্য আমার কোনও রূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিত-দর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্ব্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। × × × × সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্দ্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন।"—"আধুনিক সাহিত্য", ১৩-১৪ পৃঃ

* এই সময় ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মাঝে মাঝে কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যাইতেন প্রথম দিনের কথা তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে, বঙ্কিমচন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া সেই আমার প্রথম আহার। আহার করিলাম—আদর। সকলেই এখন জানেন বঙ্কিমচন্দ্রের পৈত্রিক বাড়ী জেলা ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে গমনাগমন কালে অনেকে সে বাড়ী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কতক প্রাচীন ধরণের, কতক নব্য ধরণের অট্টালিকা ঐ রেলপথের পূর্ব্বদিকে নৈহাটী। হইতে ঐ ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকস্থিত প্রথম ফটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সদর বাড়ীতে বৃহৎ পূজার দালান ও প্রাঙ্গণ। দুর্গারাম এবং আমি বেলা ৯ ঘণ্টার সময় পৌঁছিয়া।দেখিলাম, সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে। × × × প্রাঙ্গণে ও পূজার দালানে বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে না পাইয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায়? ভৃত্য বাহিরের একটি ক্ষুদ্র গৃহ দেখাইয়া দিল। গৃহটি একতোলা, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের শিবের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে। উহা বঙ্কিমবাবুর নিজের বৈঠকখানা, সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যাঁহার আপনি ছিলেন তেমনই। অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এবং অপূর্ব্ব লেখা লিখি-

চৈত্র। বঙ্গদর্শন বন্ধ। গ্রাহক সংখ্যা এ সময় ১৬০০ ছিল।

১৯শে জুলাই। **বিবিধ সমালোচনা** প্রকাশ, পাঁচশতছাপা হইল।

১৮৭৭—মাঘ বা ফাল্গুন। কাঁটালপাড়ায় ৺নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রচারের পরামর্শ। *

বঙ্কিমচন্দ্র সপরিবারে চুঁচুড়ায় আসিয়া বাসা করিলেন। †

বার এবং বন্ধুদিগের সহিত অকৃত্রিম অপরিমেয় আলাপ করিবার উপযোগী নিভৃততার জন্য এই গৃহটি বঙ্কিমবাবুর বড়ই প্রিয় ছিল। × × × ঐ ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তকপাঠ করিতেছেন। আমাদের পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।"—

"বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধ। প্রদীপ ১ম ভাগ ২১৭ পৃঃ

* বিস্তৃত বিবরণ ৺নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় প্রণীত "আমার জীবন" ২য় ভাগ ৩৬৪-৩৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† এই বাসাবাড়ীর বর্ণনাও চন্দ্রনাথ বাবু করিয়াছেন—"দুইটি বাড়ীভাড়া করিয়াছিলেন। যোড়াঘাটের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বের বাড়ীতে তাঁহার বৈঠকখানা এবং বৈঠকখানার দক্ষিণে দুই খানা বাড়ীর পর একটি বাড়ী তাহার অন্দর ছিল। অন্দর বাড়ীর পূর্ব্বাংশের চাতালটি স্তম্ভোপরি নির্ম্মিত; উহার নীচে দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি। ঐ চাতালে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু একদিন বলিয়াছিলেন—"সন্ধ্যার পর আমরা এইখানে বসিয়া থাকি।' বুঝিয়াছিলাম, নিশীথে আপনার গুলিকে লইয়া ভাগীরথী ভোগ করেন। তিনি স্রোতস্বিনীর শোভা দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। বৈঠকখানা বাড়ীতে তিনটি ঘর ছিল, তন্মধ্যে মাঝের ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সে ঘরে গঙ্গার দিকের একটি বাতায়নের পার্শ্বে একখানি ঈজি চেয়ারে বসিতেন। কথা কহিতেন আর গঙ্গা দেখিতেন। গঙ্গা দেখিয়া তাঁহার ক্লান্তি বা বিরক্তি হইত না।"

"বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র"—প্রদীপ ১ম ভাগ ২১৮ পৃঃ

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও লিখিয়াছেন—"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোনও ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবন-হিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল।"

ঈশ্বর গুপ্তের জীবন চরিত।

বৈশাখ। ৺সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনে বঙ্গদর্শনের পুনঃ প্রচার।

২রা জুন। **রজনী** প্রকাশিত হইল।

২৪শে নভেম্বর। "ইন্দিরা," "যুগলাঙ্গুরীয়" ও "রাধারাণী" একত্র করিয়া **উপকথা** প্রকাশ।

১৮৭৮—

মাঘ। বঙ্গদর্শনে "কৃষ্ণকান্তের উইল" সমাপ্তি।

চৈত্র। বঙ্গদর্শনে "রাজসিংহ" আরম্ভ। (বঙ্গদর্শনে গ্রন্থ সমাপ্ত হয় নাই)।

১০ই মে। "কপালকুণ্ডলা" চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ।

৮ই আগষ্ট। **কবিতা-পুস্তক** প্রকাশিত হইল।

২৯শে আগষ্ট। **কৃষ্ণকান্তের উইল** পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

১৮৭৯—২৭শে এপ্রিল। **প্রবন্ধ-পুস্তক** প্রকাশ, পাঁচ শত ছাপা হইল।

১লা অক্টোবর। "দুর্গেশনন্দিনী" সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ, দেড় হাজার ছাপা হইল।

বহুমূত্র রোগের সূত্রপাত।

১৮৮০—জুন। "বিষবৃক্ষ" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

জুলাই। "ভারতবর্ষের ইতিহাস" এবং "আনন্দমঠ" রচনা। *

২৮শে জুলাই। "মৃণালিনী" পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ, পাঁচশত ছাপা হইল।

* ৺নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় প্রণীত "আমার জীবন" ৩য় ভাগ ২২৯-৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত, ১৫ই জুলাই ১৮৮০ তারিখে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি পত্রে এই গ্রন্থদ্বয় রচনার সংবাদ পাওয়া যায়। "ভারতবর্ষের ইতিহাসের" কয়েক পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন বলিয়া পত্রে প্রকাশ, কিন্তু সে পরিচ্ছেদগুলি কি হইল? নবীনচন্দ্রও এ প্রশ্ন করিয়াছেন।

১৮৮১ — ১৩ই মাঘ। পিতৃবিয়োগ।

২৬শে ফেব্রুয়ারি। "রজনী" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

হুগলি হইতে হাওড়ায় বদলি। *

চৈত্র। বঙ্গদর্শনে "আনন্দমঠ" আরম্ভ।

২৮শে জুন। "কপালকুণ্ডলা" পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ।

আগষ্ট। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটরি হইলেন।

আশ্বিন। বঙ্গদর্শনে "মুচিরাম গুড়ের জীনচরিত" প্রকাশ।

১৫ই সেপ্টেম্বর। "মৃণালিনী" ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ।

ডিসেম্বর। "উপকথা" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

১৮৮২—জানুয়ারি। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদ উঠিয়া যাওয়াতে আলিপুরে বদলি।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি। "রাজসিংহ" (ছোট) প্রকাশ।

এপ্রিল। আলিপুর হইতে বারাসতে বদলি।

জুলাই। বারাসত হইতে যাজপুরে বদলি।

বঙ্গদর্শনে "আনন্দমঠ" শেষ।

"কৃষ্ণকান্তের উইল" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

নভেম্বর। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া হেষ্টি সাহেবের সহিত মসীযুদ্ধ।

---

* সম্ভবতঃ এই সময়ের পর চন্দ্রনাথ বাবু আনন্দমঠের পাণ্ডুলিপি শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"বউবাজার ষ্ট্রীটের যে বাড়ীর সম্মুখের খণ্ডে এখন মুখুর্জ্জী কোম্পানির হোমিওপেথিক ঔষধের দোকান দেখিতে পাওয়া যায় দিনকতক তিনি সেই বাড়ীতে ছিলেন। + + + একদিন বৈকালে সেই বাড়ীতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। একটা জায়গা খুব ভাল লাগিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল হুঁকার নলটা হাতে করিয়া বসি। বলিলাম, 'এমন সময় একজন চাকরকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।' বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পড়া বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেলেন। মনে করিলাম ধমক ধামক করিতে গেলেন। কিন্তু সে সব কিছু শুনিলাম না। পাঁচ সাত মিনিট পরে আপনি তামাক সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া বলিলেন—"খাও"। আমি বলিলাম, 'প্রসাদ পাইব।' তিনি তামাক খাইতে বড় ভাল বাসিতেন, কিন্তু খুব মিঠে তামাক খাইতেন।—"

"বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র।" প্রদীপ ১ম ভাগ, ২১৮-১৯ পৃঃ

১৫ই ডিসেম্বর। **আনন্দমঠ** পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। *

১৮৮৩—পৌষ। বঙ্গদর্শনে "দেবী চৌধুরাণী" আরম্ভ।

জানুয়ারি। যাজপুর হইতে হাওড়ায় বদলি।

১০ই জুন। "দুর্গেশনন্দিনী" নবম সংস্করণ প্রকাশ।

২০শে জুলাই। "আনন্দমঠ" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

২৯শে আগষ্ট। "মৃণালিনী" সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ।

১৮৮৪—মাঘ। বঙ্গদর্শন বন্ধ (দেবী চৌধুরাণী অসমাপ্ত)

১০ই ফেব্রুয়ারি। "চন্দ্রশেখর" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

জ্যৈষ্ঠ। এ সময় বা ইতিপূর্ব্বে সানকীভাঙ্গার বাসায় উঠিয়া আসেন।

২০শে মে। **দেবী-চৌধুরাণী** পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত প্রকাশ।

১লা শ্রাবণ। "নবজীবন" প্রথম সংখ্যায় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রবন্ধাবলি আরম্ভ।

১৫ই শ্রাবণ। "প্রচার" প্রথম সংখ্যায় "সীতারাম" আরম্ভ।

১৮৮৫—প্রথম গ্রেডে উন্নীত হইলেন। বেতন ৮০০৲ হইল।

মার্চ্চ। তিনমাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় রহিলেন, সানকীভাঙ্গার বাসায়। †

---

* "আনন্দমঠ" প্রকাশিত হইবার পর ৺নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন বৌবাজার ষ্ট্রীটের বাসায় গিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ এবং বন্দেমাতরম্ গান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সে বিবরণ তৎপ্রণীত "আমার জীবন" ৩য় ভাগ ২৩১-২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† শচীশ বাবু লিখিয়াছেন—"আমার বেশ স্মরণ আছে, সানকিভাঙ্গার বাটীতে একদি আমার ভগিনীপতি স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার রচনার মধ্যে আপনি কোন্ পুস্তকখানিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?" তিনি বলিলেন, "তুমি বল দেখি?" কৃষ্ণধনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি বলিব না, লিখিয়া রাখিতেছি। আমি জানিতে চাই আপনার সহিত আমার মতের মিল হয় কি না।" কৃষ্ণধন বাবু লিখিয়া রাখিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র পর মুহূর্ত্তে একটুও চিন্তা না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কমলাকান্তের দপ্তর"। কৃষ্ণধন বাবু কাগজ উল্টাইয়া দেখাইলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে, কমলাকান্তের দপ্তর।" "বঙ্কিমজীবনী"র পরিশিষ্ট, "বঙ্কিমকাহিনী" ২৬ পৃঃ

মে। ছুটিশেষে ঝিনাদহে বদলি।

সেখানে অল্পদিন থাকিয়া তিনমাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন, সানকীভাঙ্গার বাসায়।

ছুটিশেষে ঝিনাদহে গেলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর। পরিবর্দ্ধিত আকারে "কমলাকান্ত" প্রকাশ।

হাঁপানি পীড়ায় দৈহিক অসুস্থতা।

১৮৮৬—১৫ই এপ্রিল। "আনন্দমঠ" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

৬ই জুন। ছোট "ইন্দিরা" চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ।

১৫ই জুন। "রাধারাণী" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

২৫শে জুন। "যুগলাঙ্গুরীয়" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

মধ্যভাগে। ঝিনাদহ হইতে ভদরকে বদলি।

একমাস ভদরকে থাকিয়া হাওড়ায় বদলি হইয়া আসিলেন এবং ছয়মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় রহিলেন।

১২ই আগষ্ট। **কৃষ্ণচরিত্র** পুস্তকাকারে প্রকাশ।

২০শে ডিসেম্বর। "আনন্দমঠ" চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ, দুইহাজার ছাপা হইল।

১৮৮৭—২৬শে জনুয়ারি। "দেবী চৌধুরাণী" চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ। *

প্রতাপ চাটুর্য্যের গলিতে নবক্রীত বাটীতে উঠিয়া আসিলেন।

ছুটিশেষে মেদিনীপুরে বদলি, তথায় ছয়মাস রহিলেন।

৪ঠা মার্চ্চ। **সীতারাম** পুস্তকাকারে প্রকাশ।

৪ঠা এপ্রিল। "বিষবৃক্ষ" ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ।

৭ই জুলাই। **বিবিধ প্রবন্ধ** প্রকাশিত হইল।

ডিসেম্বর। চারিমাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আগমন।

১৮৮৮—১৫ই মার্চ্চ। "দুর্গেশনন্দিনী" একাদশ সংস্করণ প্রকাশ। †

* শচীশ বাবু লিখিয়াছেন—"এই সংস্করণটা তৃতীয় কি চতুর্থ তাহা ঠিক বলিতে পারি না।"—"বঙ্কিমজীবনী" ২৭১ পৃঃ

† "১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যখন দুর্গেশনন্দিনীর একাদশ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া গৃহে আসিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—'এই পুস্তকখানির লোকে যত নিন্দা করিয়াছে তত আর কোনও পুস্তকের করে নাই, তাই এ পুস্তকের বিক্রী বেশী।' শচীশবাবুর "বঙ্কিমজীবনী"—শেষপৃষ্ঠা।

এপ্রিল। ছুটিশেষে আলিপুরে বদলি।

১৭ই মে। **ধর্ম্মতত্ত্ব** পুস্তকাকারে প্রকাশ, দুই হাজার ছাপা হইল।

২৫শে ডিসেম্বর। "কপালকুণ্ডলা" সপ্তম সংস্করণ এবং "দেবী চৌধুরাণী" পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ।

৩১শে ডিসেম্বর। "সীতারাম" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ।

১৮৯০—* ২৫শে ফেব্রুয়ারি। "বিষবৃক্ষ" সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ।

১৮৯১—২৭শে জুলাই। "কমলাকান্ত" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ (ঢেঁকি প্রবন্ধ এ সংস্করণে যোজিত হইল)

১লা অক্টোবর। "কবিতা-পুস্তক" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ (এবার নাম হইল, "গদ্যপদ্য বা কবিতা-পুস্তক,') পাঁচশত ছাপা হইল।

১৪ই সেপ্টেম্বর। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ। +

* সম্ভবতঃ এই বৎসরের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দত্ত তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"দুর্ভিক্ষের অবস্থা পরিদর্শন উপলক্ষে বঙ্কিমবাবু একবার আলিপুর হইতে জয়নগর অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন। + + + বাইসহাটার ও হাটপাড়ার দুর্ভিক্ষ ও তাহাতে অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের অনুসন্ধানান্তে বঙ্কিমবাবু সেদিন মধ্যাহ্নে এখানকার সব রেজিষ্ট্রার রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাদুরের বাসায় স্নান আহারাদি করেন। আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করি। ঘোষাল মহাশয়ের নিবাস বঙ্কিমবাবুর স্বগ্রামে, কাঁঠালপাড়ায়। উভয়ের মধ্যে কুটুম্ব সম্বন্ধ আছে। উভয়ের কথাবার্ত্তার মধ্যে জানিতে পারিলাম, বঙ্কিমবাবু বাল্যকালে কমলাপতি বাবুর নিকট ইংরাজি পড়িতেন। + + + শীঘ্রই পেন্সন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন এরূপ কথাও হইল। + + + এই ঘোষাল মহাশয়ের বাসায় বঙ্কিমবাবু আরও আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসর শুদ্ধ হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। দেহটা বড়ই অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাকে পবিত্র করিবার প্রয়োজন হওয়ায় আহার সম্বন্ধে এরূপ ব্রতাবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তিনি চিত্তশুদ্ধির জন্য দেহশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং দেহশুদ্ধির জন্য সাত্ত্বিক আহারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেন।"—"বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধ। প্রদীপ ২য় ভাগ, ২৬২—২৬৩ পৃঃ

\+ ৺ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—"১৮৯১ অব্দের শরৎকালে সীতামাঢ়ি হইতে কাঁথি বদলি হইবার সময় বঙ্কিমবাবুকে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে দেখিতে যাই।

১৮৯২—জানুয়ারি। রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তি।

২৫শে মে। "বিবিধ প্রবন্ধ" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ, পাঁচশত ছাপা হইল।

১১ই আগষ্ট। "কৃষ্ণচরিত্র" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ। *

২১শে নভেম্বর। "আনন্দমঠ" পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ।

৩০ শে ঐ "কৃষ্ণকান্তের উইল" চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ।

১৮৯৩—† ২৬শে মে। "যুগলাঙ্গুরীয়" পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ।

ঐ । "রাধারাণী" চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ।

৩১ শে মে। "সঞ্জীবনী সুধা" প্রকাশিত হইল।

৩০শে জুলাই। **ইন্দিরা** পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল।

১০ই আগষ্ট। **রাজসিংহ** পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল।

অল্পদিন মাত্র তখন তিনি পেন্সন লইয়াছিলেন, শরীর ভাল ছিল না। পূর্ণবাবু কাছে বসিয়া ছিলেন। আমি বলিলাম, "আগে বলিতেন পেন্সন লইয়া খুব লিখিব—এখন?" মৃদু হাসিয়া তিনি উত্তর করিলেন—"এখন গঙ্গার চড়ায় হরিনাম লিখিতে পারিলেই আমার হয়। তোমরা লেখ।' বলিলেন, 'রমেশকে (শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তখন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট) বলেছি দিন কতক রঘুনাথপুরের বাঙ্গালায় বাস করব, সমুদ্রের হাওয়ায় শরীর সারতে পারে। কিন্তু সেখানে খাবার জলের কষ্ট। বেশ হল, কাঁথি হতে তুমি ভাল ডাব পাঠাতে পারবে।'—কিন্তু সেখানে তাঁহার যাওয়া হয় নাই।"

"বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ"—প্রদীপ ২য় ভাগ, ১৭৪ পৃঃ

* শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্তের সহিত বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণচরিত্র" সম্বন্ধে আলোচনা, ২য় ভাগ প্রদীপ, "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধ, ২৬৪-২৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† এ বৎসর কোনও সময়ের উল্লেখ করিয়া ৺নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"এ সময়ে কলিকাতায় একদিন অপরাহ্নে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে একটু আন্তরিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার আদর অভ্যর্থনার কথা আর কি বলিব? তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ হইল। সর্ব্বশেষ সাপ্তাহিক প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমালোচনা ও বিজ্ঞাপনের কল্যাণে বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা উঠিল। আমি বলিলাম—'আপনি বঙ্গসাহিত্যের একমেটে সরস্বতীকে বটতলার ধূলা কাদা ও পূতিগন্ধ হইতে উদ্ধার করিয়া এবং দোমেটে করিয়া অমল শুভ্রবর্ণে ও

কার্ত্তিক । নেপাল হইতে কোনও সন্ন্যাসীর আগমন ও পূজার্থ বঙ্কিমবাবুকে একটি রুদ্রাক্ষদান । *

১৮৯৪—জানুয়ারি । সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্তি । +

মাঘ । সন্ন্যাসীর পুনরাগমন, "বঙ্কিমচন্দর্, এ দুনিয়া ছেড়ে

বহুমূল্য আভরণে সজ্জিত করিয়া শত-শোভা পূর্ণ সহস্রদলে স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন বঙ্গসাহিত্য আবার সেই 'কি মজার শনিবার' 'হদ্দ মজার রবিবার' সাহিত্যের দিকে গড়াইতেছে। আপনি কেমন করিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া আছেন?' তিনি চিন্তাযুক্ত বিমর্ষ মুখে বলিলেন—'নাতি! গড়াইতেছে কেন, গড়াইয়াছে বল। সত্যই আমরা যে বটতলা হইতে তুলিয়াছিলাম, বঙ্গসাহিত্য আবার সেই বটতলায় গিয়াছে। কিন্তু কি করিব?' আমি বলিলাম—'আপনি এখনও জীবিত, আপনার মানসিক শক্তি ও প্রতিভা এখনও পূর্ণ প্রতিভান্বিত এবং বঙ্গসাহিত্যে আপনার একাধিপত্য এখনও অপ্রতিহত। আপনি আবার বঙ্গদর্শনের পতাকা গ্রহণ করুন, আর আমরা আপনাকে বেষ্টন করিয়া সেই পতাকার ছায়ায় দাঁড়াই। আপনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, যদি আমরা সাহায্য করি আপনি একখানি ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস বঙ্গদর্শনের মত খণ্ডশঃ মাসে মাসে লিখিবেন। আপনি নভেল ছাড়িয়া এ গুরুতর কার্য্যটিতে ব্রতী হ'ন। আপনি ভিন্ন উহা আর কাহারও দ্বারা হইবে না।" তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'তাহা পারি যদি তোমরাও কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াও। আমি এখন বুঝিতেছি যে বঙ্গদর্শন বন্ধ করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলাম। তুমি আর একদিন আসিও। এ বিষয়ে ভাল করিয়া পরামর্শ করিয়া একটা কর্ত্তব্য স্থির করিব' + + + আমি বিদায় হইবার সময় আবার বলিলেন—'তুমি শীঘ্র আর একবার আসিও। তোমার ঐ জ্বলন্ত উৎসাহে আমার বুড়া হাড়েও বিদ্যুৎসঞ্চার করে। আর একবার সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব।'—বঙ্গসাহিত্যের সে সুদিন আর হইল না।"—"আমার জীবন", ৪র্থ ভাগ, ২৭৫-২৭৭ পৃঃ

* বিস্তৃত বিবরণ শচীশ বাবুর "বঙ্কিম জীবনী" পুস্তকে ২০৫-২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

\+ ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—"তাঁহার স্বর্গারোহণের বৎসর সরস্বতী পূজার বিসর্জ্জন দিনে বীরভূম হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। শৈলেশচন্দ্র আমার সঙ্গে ছিলেন। তখন জানিতাম না যে ইহজীবনে সেই শেষ সাক্ষাৎ। রাজ-সিংহের নূতন সংস্করণের কথা তুলিয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, তাঁহার মতে তাহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং চন্দ্রনাথ বাবুও তাঁহাকে তাহাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণে বোধ হয় তাহা বুঝিতেছে না। স্নেহের শেষ চিহ্নস্বরূপ একখণ্ড পুস্তক উপহার দিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যেন একটা সমালোচনা করি। আমারও সে বাসনা হইয়াছিল কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সময়াভাবে নিজে আমি তাহা পূর্ণ করিতে পারি নাই। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে উপহৃত পুস্তক খানি পাঠ করিয়াই যোগ্যতর

যেতে হবে তা কি বিস্মৃত হয়েছ” কখনও দ্বারে অর্গলবদ্ধ করিয়া তিন ঘণ্টা কাল গোপনে আলাপ।

ফেব্রুয়ারি। বহুমূত্র রোগবৃদ্ধি, শয্যাগ্রহণ। ক্রমে মূত্রনালীতে স্ফোটক দেখা দিল।

২৫শে চৈত্র। বাক্‌রোধ হইল, কিন্তু সজ্ঞান অবস্থা।

২৬ চৈত্র, রবিবার, বেলা ৩টা ২৩ মিনিট। দেহান্ত।

সমালোচক “সাধনায়” তাহার যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু তখন অন্তিম শয্যায়, সম্ভবতঃ পড়িতে পারেন নাই। এইখানে বলা ভাল যে মতবিরোধী সমালোচনা তাঁহার প্রীতিপ্রদ ছিল না, এ বিষয় তাঁহার কাছে অতি বড় পাণ্ডিত্য অথবা বন্ধুবাৎসল্যের কোনও মূল্য ছিল না। তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই তাহা জানিতেন।

“আমি বিদায় হইবার কিছু পূর্ব্বে বঙ্কিম বাবু বলিলেন “আবার কিছু লিখব লিখব ভাবচি—কি লিখি বলত?” আমি একটু হাসিয়া উপন্যাস লিখিতে বলিলাম। বঙ্কিম বাবু বুঝিলেন যে তাঁহার ধর্ম্মালোচনার চেয়ে কাব্যালোচনার আমি তখনও পক্ষপাতী। হাসিয়া উত্তর দিলেন, “আমিও তাই স্থির করেছি, এবার একটা বৈদিক কালের স্ত্রী চরিত্র আঁকিব, ঐ দেখ খাতা বেঁধেছি।”—জানি না সে খাতায় তাঁহার অমর লেখনী স্পর্শ হইয়াছিল কি না।”—“বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ”—প্রদীপ ২য় ভাগ, ১১৫ পৃঃ

উৎসর্গিত পুষ্প।

হায় আমি নহি শুষ্ক, নহি গন্ধহীন,
সরস, সুরভি-ভরা, নশ্বর, নবীন,
ফুটিছে কণক আভা, সুললিত কায়,
উথলে বিমল শোভা মুখের প্রভায়,
দেবতার পায়ে শুধু, ক্ষণিকের তরে
অর্পণ করেছে বলে লবেনা ক মোরে?
জাহ্নবীর পূত বক্ষে দিতে বিসর্জ্জন
আনিয়াছে তাই এত করিয়া যতন!
এখনও চন্দন লেখা ললাটে ধরিয়া
অপূর্ণ সাধনা-সাধ কাঁদে গুমরিয়া!

শ্রীলীলা দেবী

নূরজাহান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সংসারত্যাগী উদাসীন সন্ন্যাসী সেক সেলিম চিস্তির শুভাশীর্ব্বাদের ফলে জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়; আকবর সাহের পরিত্যক্ত বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের রত্নসিংহাসনে বসিয়াও তাঁহার সমগ্র জীবন সুখে যায় নাই, জীবনাপরাহ্ণে চিরজীবনের কামনার ধন মেহেরের স্নেহবক্ষের অঞ্চলতলে, নিরাপদ স্নেহনীড়ের মধ্যে, নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার দিন যখন সমাগত, মনুষ্যবুদ্ধির অনধিগম্য কোন্ দূরান্তর হইতে লোকান্তরের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ার্থ তাঁহার আহ্বান আসিল—উদাসীনের আশীর্ব্বাদবলে জাত রাজনন্দনের উদাসীনের ন্যায় পথপার্শ্বেই পার্থিবনয়ন চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া গেল।

যে গেল সে ত বাঁচিয়াই গেল, অন্ততঃ পক্ষে আমরা ভাবি যে সে বাঁচিয়া গেল। যে জন্মান্তর মানে না তাহার নিকট এই রঙ্গমঞ্চই শেষ অভিনয়ের স্থান, এ সংসারের সুখদুঃখের অভিনয় শেষ হইয়া গেলেই তাহার কাজে চিরনিবৃত্তি, আর জন্ম নাই, সুতরাং রোগ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, এইবার যে নিমেষপাত হইয়া গেল আর চক্ষু মেলিতে হইবে না, আর পিতা-পুত্র, শ্বশুর-জামাতা, ভ্রাতা-ভগিনী সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে চড়িয়া দশের তৃপ্তি অতৃপ্তির অপেক্ষায় প্রাণপণে অভিনয়ের উদ্যম করিতে হইবে না। এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ যে দিন ভস্মীভূত কিংবা প্রোথিত করা হইল বা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল, সেই হইতে চিরকালের জন্য চিরনিবৃত্তির মহামৌনতার মধ্যে চিরনির্ব্বাণ পাইলাম—দেহাতিরিক্ত দেহী নাই, সুতরাং দেহান্তর প্রাপ্তিজন্য পুনরায় জন্ম, যৌবন, জরার যাতনা আর পীড়া জন্মাইতে পারিবে না। যাঁহারা বিমল বিপুল বুদ্ধিবলে দেহাতিরিক্ত দেহীর সত্বা স্বীকার করিয়া লোক-লোকান্তর ও জন্ম-জন্মান্তরের কল্পনা করিয়াছেন তাঁহারা এই পার্থিব-দেহের নাশের সঙ্গে দেহীর নাশ স্বীকার করেন না—তাঁহাদের মতে ইহজন্মের লীলা খেলার শেষ হইলেই সব শেষ হইল না, ইহার পরেও জন্ম হইবে, মৃত্যু হইবে,—কতবার হইবে, কত সুখ, কত দুঃখ, আবার ভোগ করিতে হইবে; এইরূপ লোক লোকান্তরে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে একদিন এক শুভ মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত আসিবে যখন জন্মমৃত্যু, জরাব্যাধি, সুখশোক সকলের হাত হইতে

অব্যাহতি লাভ করিয়া জীবের এক আনন্দময় সত্তা ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না এবং সেই আনন্দলাভই জীবের পরম পুরুষার্থ। জানি না ইহা সত্য কি না, জানিবার কোন উপায়ও নাই—হয়ত সত্য, হয়ত বা সত্য নহে, কেবল চিরন্তন দুঃখক্লিষ্ট ধরণীর অক্ষম উপায়হীন নরনারীর শান্তি ও সান্ত্বনার জন্য দয়াপরবশ বুদ্ধিমানের উদ্ভাবনী কল্পনার আশাসৃষ্টি—যে আশাকে অবলম্বন করিয়া আমরা এ ধরার দুঃখময় দিনগুলিকে বুক দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিতে চাই, দুঃখের পরে সুখ আছে এই ভাবিয়া বর্ত্তমানকে বহনীয় ও সহনীয় করিবার উদ্যমের মধ্যে কোনমতে বাঁচিয়া থাকি ; কিন্তু হায়, প্রিয়জনের সদ্য শোক কোন সান্ত্বনা কি মানে ? লোকান্তরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সুখে আছে এই আশ্বাস নববৈধব্যের অসহ্য যন্ত্রণার কোন উপশম কি করিতে পারে! যার দেহের সেবা আমার দিনের কাজ, যার মনের আনন্দ-বিধান আমার দৈনিক জীবনের তপশ্চরণ, আমার ত্রিলোক যে একটিমাত্র লোকের মধ্যে সংহৃত হইয়া আসিয়াছে, সেই আমার একমাত্রের অভাবে যে সর্ব্ব অভাব সমুপস্থিত হয়, জীবন যে দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, কোন আশা, কোন আশ্বাস, কোন সান্ত্বনাই যে বিয়োগবিধুরার আকুল অশ্রুস্রোতে বালির বাঁধ ও বাঁধিয়া দিতে পারে না! জাঁহাপনা জাহাঙ্গীরের জীবলীলার অবসান হইয়াছে, রাজ্যের দীনতম জনের দিনও যেমন চলিতেছিল সেইরূপই চলিতেছে। শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করিবার প্রত্যাশায় প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব নাই, এক দিকে দক্ষ রাজকুমার শাজাহান, মন্ত্রী আসফ খাঁ ও সুদক্ষ সেনাপতি মহবতের সহায়তায় রাজদণ্ডের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া রাজধানী অভিমুখে সসৈন্যে অভিযান-উদ্যত, প্রকাশ্যে না হউক অপ্রকাশ্যে রাজ্যের কোন কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি খশ্রুনন্দন বুলাকির পক্ষপাতী, সুতরাং পরলোকগত রাজাধিরাজের মৃত্যু জন্য শোকাভিভূতের সংখ্যা নখাগ্রে গণনা করিতে পারা যায়। শূন্য সিংহাসন পূর্ণ হইবে এবং হইয়াও ছিল, রাজ্যের ছোট বড় সকলেই পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমতাপন্নের শরণাপন্ন হইয়াছিল, অশান্তি অরাজকতা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যুদ্ধবিগ্রহ সব ঘুচিয়া গিয়া অচিরকাল মধ্যে রাজনৈতিক আকাশে নিরাময় শান্তির নির্ম্মল নীলিমা বিরাজিত হইয়াছিল। এক অধীশ্বরের পরিবর্ত্তে আর একজন আসিয়া শাসনদণ্ড ধরিলেন, রাজ্য যেমন চলিতেছিল তেমনই আবার চলিতে লাগিল, কোথাও কোন শূন্য যে ঘটিয়াছিল তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না ; কেবল এই বিস্তীর্ণ ভারতসাম্রাজ্যের যিনি একাধীশ্বরী

ছিলেন, যাঁহার কৃপা অকৃপার উপর সমগ্র সাম্রাজ্যের জীবণ মরণ নির্ভর করিত, কেবল তিনিই আজ জীবন্মৃত অবস্থায় অবস্থিত, তাঁহার হৃদিনন্দনের আনন্দ-পারিজাত আজ চিরদিনের জন্য শুকাইয়া গিয়াছে, নয়নের অমৃতবর্ত্তি আজ হারাইয়া গিয়াছে; দেহমনের অবলম্বনশূন্য হইয়া রাজরাজেশ্বরী আজ ধরণীর ধূলিতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। পথপার্শ্বপ্রসূতা সদ্যজাতা কন্যকার শিরোপরি নাগরাজ অনন্তফণা বিস্তার করিয়া আতপতাপ নিবারণ করিয়াছিল; তারপর যে দিন জীবনাপরাহ্নে অন্তরের নিগূঢ় আশা আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জ্জন দিয়া শেষ দিনের প্রতীক্ষায় বসিবার আয়োজন হইবে, সেই দিন মেহেরের জীবনদেবতার প্রেমের আহ্বান তাঁহাকে মোগল রাজশালার মণিময় রাজ-ছত্রতলে ডাকিয়া আনিল—আজ আবার ছত্র দণ্ড সিংহাসন ও হৃদি-সিংহাসনের একাধীশ্বর বল্লভতম প্রিয় দয়িতকে হারাইয়া—রাজরাণী এক নিমেষে কেমন করিয়া কাঙালিনী হইয়াছে, এবং সেই কাঙাল হৃদয়ের আর্ত্তি তাঁহাকে কেমন করিয়া মরণ যাচ্ঞা করাইতেছে তাহা কেমন করিয়া বলিব? সেলিম-মেহেরের প্রণয় কিশোরকিশোরী বা যুবকযুবতীর এক নিমেষের চক্ষের দেখার প্রণয় নহে, প্রথম দর্শনে উভয়ে উভয়কে ভালবাসিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রথম জীবনের সেই প্রথম দর্শনের পরই তাহাদের মিলন সংঘটন হয় নাই, বরং নানা বিচিত্র ঘটনায় দুইজন জীবনের বিভিন্ন পথে যাত্রা করিয়াছিল; ইহলোকে তাহাদের হৃদয়ের আশা যে কোন দিন পূর্ণ হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা কাহারই মনে উদয় হয় নাই। বিভিন্ন প্রকারের অবস্থার মধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া গিয়াছিল, যখন জীবনাপরাহ্নে সমগ্র জীবনের অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষার সংহরণ করিয়া শেষ দিনের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় আসিয়াছে, যাহা ইহ-জীবনে পাওয়া যায় নাই জন্মান্তরে তাহা লাভ করিবার জন্য তপশ্চরণের যখন সময় আসিয়াছে, জীবনের সেই শান্তসন্ধ্যায় জীবনাধিকের অপ্রত্যাশিত মিলন লাভ করিয়া কি অপরিমেয় আনন্দের মধ্যে মেহের তাহার নবজীবন গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা সেই জানিত; আবার নির্দ্দয় মৃত্যু যখন সেই প্রাণতুল্য প্রিয় দয়িতের জীবন অপহরণ করতঃ মেহেরের ইহলোকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিয়া ধূলিতলে তাহার শয়ন বিছাইয়া দিল, মেহেরের সেদিনের অপরিসীম যন্ত্রণা বাক্যমনের অতীত! দুঃখের উপর দুঃখ এই যে স্বামীর শেষ মুহূর্ত্তের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবার শক্তিটুকুও মেহেরের ছিল না। অথচ প্রাণাধিক প্রিয়পতির শেষ-নিদেশ পালনার্থ যত্নচেষ্টা না করিয়া

মেহেরের ন্যায় প্রণয়শালিনী পত্নীর উদাসীন থাকাও অসম্ভব। যাঁর স্নেহের বলে ভারতসাম্রাজ্য মেহেরের পদতলে লুণ্ঠিত হইত, যাঁহার অকৃত্রিম প্রণয়ের প্রশ্রয় পাইয়া মেহেরই হিন্দুস্থানের প্রকৃত বাদশাহ হইয়াছিল, সে জাহাঙ্গীর আজ নাই, একমাত্র তাঁহার অভাবে আজ তাঁহার প্রেমাশ্রিতা প্রিয়তমার কি দুর্দ্দশা সমুপস্থিত! যে মেহেরের হৃদ্গত ইচ্ছা ইঙ্গিতে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই তাহা সম্পন্ন হইয়া যাইত, আজ তাঁহার রাজরাজেশ্বর স্বামি-দেবতার মৃত্যু-মুহূর্ত্তের নির্ব্বন্ধ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল নয়নে চারিদিকে সহায় খুঁজিতে হইতেছে—সে সহায়ও মিলিতেছে না।

ধরণীর অসহায় জীব, অন্তরের মধ্যে অপরিমেয় স্নেহ ও অপরিসীম ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি সঞ্চিত করিয়া একজনের পাদপদ্মে এমনি করিয়া নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহারই জীবনে জীবন, অদৃষ্টে অদৃষ্ট, এমনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে কেন যে বাঁধিয়া দেয় এবং সেই আশ্রয় এক নিমেষে টুটিয়া গেলে কেন যে এমন নিঃসহায় হইয়া ভূলুণ্ঠিত হয়—কে বলিয়া দিবে? কোন্ ঐন্দ্রজালিক অন্তঃপটে বসিয়া অদৃশ্যে এই রহস্য সৃজন করিতেছেন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবের এই পতন-অভ্যুত্থান ঘটাইয়া বিশ্বসৃষ্টির কি সৌকর্য্য বিধান হইতেছে, অসহায় মানব মানবীর দুঃসহ হৃদয়-বেদনার উপর কোন্ দেবতার এ নির্ম্মম অট্টহাস্য, তাহা জানি না—জানি কেবল দুঃখ, জানি কেবল একজনের অভাব হইলে, একজনকে না পাইলে, একজনকে পাইয়া হারাইলে, অপরের নিদারুণ যন্ত্রণা, এবং প্রাণত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিল তিল করিয়া তুষানল। মেহেরের সেই তুষানল আরম্ভ হইয়াছে, প্রতিমুহূর্ত্তে যখন মৃত্যু যাত্রা করিবার দিন আসিয়াছে, প্রিয়তমের একান্ত বিরহে যখন দেহ বহন করিয়া এ পৃথিবীতে জীবিত থাকা দুঃসাধ্য মনে হইতেছে, প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে যখন মনে হইতেছে এ "অজপার" কবে শেষ হইবে, সেই সময় স্বামি-নিদেশ মাথায় লইয়া জাহাঙ্গীরের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান শারিয়ারকে সাম্রাজ্য দিবার প্রাণপণ চেষ্টা বিধবাকেই করিতে হইতেছে; এ যে কি দুর্ভোগ তাহা যাহার ভুগিতে হইয়াছে সেই জানে, অপরের অনুভূতি সে অসহ্য বেদনার যথাযথ পরিমাপ করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা।

নারায়ণ, ফাল্গুন—

"কবিতার কথা" প্রতিভা পত্রিকায় মাঘ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য 'নারায়ণ'কে নিবেদন না করিলেই ভাল হইত।

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশ্য; লেখক শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল এ সংখ্যায় কৃষ্ণতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বের ভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"সেকালের স্মৃতি—বাজে কথা" নামে দিয়া শ্রীসুরেশ সমাজপতি যে প্রবন্ধ লিখিতেছেন তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অল্প বক্তব্য বিষয় লইয়া দীর্ঘ রচনা করিতে হইলে যে দোষ অনিবার্য্য তাহাই এই সাতটি পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে; যে সব কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই, লেখক তাহাও বলিতে ছাড়েন নাই। তারপর স্থানে স্থানে অযাচিত হইয়াও আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

(১) "শকুন্তলা বঙ্গবিশ্রুত সমালোচক ও মনীষী শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসুর শকুন্তলা-তত্ত্ব; বোধ হয়, না বলিলেও চলিত। কিন্তু এখনকার লেখকেরা ও পাঠক-পাঠিকারা প্রাচীন গ্রন্থকারদের কোনও গ্রন্থই ত প্রায় পড়েন না। এই জন্য এখনকার সাহিত্যের সঙ্গে তখনকার বিশ পঁচিশ বৎসরের সাহিত্যেরও যেন কোনও প্রাণের যোগ নাই। গত পুরুষের স্থপতিরা যে বনিয়াদ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আছে; তাহার উপর শৈবাল ও আগাছা জন্মিতেছে। এখন যাঁহারা গড়িতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই বালির উপর খেলা-ঘরের পত্তন করিতেছেন।"

এই কথাগুলি সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ "সাহিত্য"-সম্পাদকের লেখনী-নিঃসৃত না হইলে আমরা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা সব গ্রন্থ না পড়িতে পারেন, কিন্তু লেখক প্রাচীন গ্রন্থকারদের কোন গ্রন্থই ত প্রায় পড়েন না এ কথাটা লেখকের বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়। 'শকুন্তলাতত্ত্ব' সকলে না পড়িতে পারেন, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস পড়েন নাই এমন লেখক ত দেখিতে পাই না। লেখকের মতে চন্দ্রনাথ যদি প্রাচীন গ্রন্থকার হন, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রও তাই। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা ও সেই সব প্রাচীন গ্রন্থকারগণ যাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের রচনা পাঠ করিয়াই যখন লেখকেরা বালির উপর খেলাঘরের পত্তন করিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে লেখকের অনুমানটি ঠিক হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্য পঠনের উপর আধুনিক সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ভর করিতে পারে না। সাহিত্য নির্ভর করে মানুষের উপর; বিশ বৎসর পূর্ব্বের মনুষ্য সমাজের সহিত আধুনিক সমাজের পার্থক্য থাকিলে সাহিত্যের প্রকৃতির ভিন্নতা অনিবার্য্য।

(২) "সর্ব্বত্র কাণই আমাদের অনেকের একমাত্র প্রমাণ বটে। কবিতার ত কথাই

নাই। তবে তাহা সঙ্গত হওয়া চাই। যাহা কাণের জন্যই করা হয়, কাণ পর্য্যন্তই যাহার গতি, কাণেই যাহার স্থিতি, এবং কাণেই যাহার চরম পরিণতি বা জীবমুক্তি তাহা কাণ ভিন্ন প্রাণের অপেক্ষা করিবে না। তবে একটা কথা মনে রাখিলে মন্দ হয় না,—আমরা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাণ লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। আমাদের কাণ বঙ্কিমচন্দ্রের কাণের অপেক্ষা একটু দীর্ঘ। তবে হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞানও অবশ্য বিধাতা নিজের ওজনে দুনিয়ায় দান করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে, এই কয়টা কথা বলিবার জন্য স্থান নষ্ট করিতাম না।"

এই অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলির শেষাংশে ভাবের অস্পষ্টতা ও প্রকাশের অক্ষমতা কতদূর তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

"ধোঁয়া" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীসরযুবালা দাস গুপ্তা অনেকগুলি দার্শনিক কথা বলিয়াছেন। রচনায় লেখিকার চিন্তাশক্তির ও কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাটি প্রাঞ্জল ও মনোরম।

"বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের দেববাদ ও দেবোপাসনা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল বলিতেছেন —"পূজা অর্চ্চনার একটা ঐন্দ্রজালিক প্রভাব আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ব্যতীত ইহার দ্বারা কোনও বিশিষ্ট ফল লাভ করা যায়। দেবোপাসনার এই ঐন্দ্রজালিক দিক ছাড়া একটা রসের এবং কাব্যের দিকও আছে। আমাদের প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের ঐ ঐন্দ্রজালিক দিকটা নষ্ট করিতেই হইবে। না করিলে ধর্ম্মের সত্য মর্ম্ম এবং সাধনের সঞ্জীবনী শক্তি কোনও দিনই ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিবে না। কিন্তু এই সকল পূজা অর্চ্চনার বাহ্য ও অলীক ঐন্দ্রজালিক প্রভাব নষ্ট করিতে যাইয়া উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা ও রূপকরূপে এই সকল দেবদেবীর কল্পনা আমাদের দেশের ভক্তিসাধনের ধারাকে আশ্রয় করিয়াই যে ক্রমে ক্রমে সাধক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, ঐ কথাটাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আমরা এই যুগে বালক-বৃদ্ধ কিংবা শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলেই যে এই সকল পুরাতন পৌরাণিকী রূপকের আশ্রয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধন করিতে পারিব, এমনটাও বলা যায় না। কিন্তু কাহারই পক্ষে এ গুলি ভক্তিসাধনের সহায় হইতে পারে এমন কথাই বা বলিতে পারি কি? বিরোধের ও প্রতিবাদের পূর্ব্ব প্রয়োজন আর নাই; ভাঙ্গার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে; এখন গড়িতে আরম্ভ করা আবশ্যক। আর এই গড়া নিতান্ত পরামুচি-কীর্ষাপর অথবা একান্ত মনগড়া হইলে চলিবে না। দেশের নূতন সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।" বিপিনবাবু এই সব কথায় কোন সিদ্ধান্তের উল্লেখ না করিলেও তাঁহার উক্তিগুলি অনেক ভাবিবার জিনিস উপস্থাপিত করে।

"বৌদ্ধ-ধর্ম্ম" শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা। এ সংখ্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল এ প্রশ্নের মীমাংসা আছে।

ভারতবর্ষ, ফাল্গুন—

"গোরা" ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা—মধুর, প্রাণস্পর্শী। একটু উদ্ধৃত করি,—

ও কে প্রেমে মাতোয়ারা চোখে বহে ধারা
কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই?

সব দ্বেষ হিংসা ছুটি আসি পড়ে লুটি
ও তার ধুলি মাখা দুটি রাঙ্গা পায়।

* * * * * * * * * * * * *

ও কে যায় নেচে নেচে আপনায় বেচে
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে দেবতা-ভিখারী মানবদুয়ারে
দেখে যারে তোরা দেখে যা"

ছন্দ শিথিল হইলেও কবিতাটির মধ্যে এমন একটি সুর আছে যাহা সহজেই পাঠককে মুগ্ধ করে। ছন্দ ভাবানুগত।

এই গানটি 'ভারতবর্ষে' মুদ্রিত হওয়ায় আমরা প্রথম দেখিলাম এমত নহে, মনে হইতেছে যেন ইতিপূর্ব্বে "নিকল" রেকর্ডে ইহা আমরা শুনিয়াছি। আমাদের স্মৃতিশক্তি আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে কিনা তাহা ভারতবর্ষের অভিভাবকগণ বলিতে পারেন।

'মেঘ-বিদ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীআদীশ্বর ঘটক খনার কয়েকটি বচনের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। খনার বচনের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে লেখক তাহা টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীকামিনীকান্ত নিয়োগীর "আবির্ভাব" কবিতাটিতে ছন্দ ও ভাষার মাধুর্য্য আছে। হৃদয়ে কবিতার আবির্ভাবে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, কবির ভাষায় এখানে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

"ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ" শীর্ষক প্রবন্ধে ত্রিবেদী মহাশয় বলিতেছেন—ব্যবহারিক জগৎ অর্থাৎ কাজ-চালান জগৎ বস্তুগত্যা একটা নিয়মবদ্ধ জগৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহাকে আমরা প্রাণের দায়ে নিয়মবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং সেই নিয়মের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেছি। ব্যবহারিক জগৎ যেন একখানা Drama—উহার একটা Plot আছে, একটা end আছে, গোড়ায় একটা design আছে,—অঙ্কের পর অঙ্ক, একটা উদ্দেশ্য purpose লইয়া আসে,—কেহই নিরর্থক আসে না। আর প্রাতিভাসিক জগৎ প্রত্যেকের perceptional world প্রত্যেকের প্রত্যক্ষলব্ধ জগৎ প্রত্যেকের immediate perceptionএর উপলব্ধ জগৎ। প্রাতিভাসিক জগৎ যেন একটা Epic poem ঘটনাবহুল,—বিচিত্র—উচ্ছৃঙ্খল। এই পার্থক্য মনে রাখিয়া চলিলে জগতের অনেকগুলা হেঁয়ালি নূতনভাবে নূতনরূপে দেখা যাইতে পারে, অনেক বিতণ্ডার অবসান হইতে পারে।" যাঁহারা আধুনিক সমস্যা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের দৃষ্টি আমরা এই প্রবন্ধের দিকে আকর্ষণ করিতে চাই।

প্রবাসী, ফাল্গুন—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্তের "শিক্ষার আদর্শ" পাঠ করিয়া যে সার সংগ্রহ করিয়াছি তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল—মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ হইতে হইবে, এই শিক্ষাটা আর এখন

চরম উপায় বলিয়া গ্রহণ করা হয় না, বরং সমস্ত শিক্ষা ব্যাপারটাকেই কেবলমাত্র ধনাগমের ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য সুযোগ বিশেষের উপায় বলিয়া গণ্য করা হয়। জীবনের প্রথম হইতেই নির্দ্দোষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে জোর করিয়া এমন ভাবে খর্ব্ব করা হয়, যে ক্রমশঃই বালকের সে প্রবৃত্তিগুলি শুকাইয়া আসিতে থাকে। বিশ্ব তাহাকে আপনার মনীষী কবি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই তাহার অন্তরের প্রত্যেক তন্ত্রীটি সহজভাবে বিশ্বের প্রত্যেক রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। মানুষ যখন আপনার নিজের ছন্দে চলিতে থাকে তখনই বিশ্বের সমস্ত ছন্দ সার্থক হয়। তাই ছেলেবেলা হইতেই একদিকে যেমন তাহার প্রবৃত্তিগুলিকে স্বতন্ত্র ও সহজভাবে প্রস্ফুটিত হইবার অবসর দিতে হইবে, আর একদিকে তেমনি বিশ্বের সঙ্গে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে সম্বদ্ধ ও সংযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। বিশ্ব প্রকৃতির সহিত এই মিলন-সংযোগ ও গোপন-বন্ধনটুকু জাগ্রত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে শিক্ষায় জ্ঞানই বাড়িয়া যায় কিন্তু রসধাতু তাহার অনুবর্ত্তন করিতে পারে না, সে শিক্ষা যেমন শুষ্ক ও সারবিহীন, যাহাতে রসই বাড়িয়া চলে কিন্তু জ্ঞান তাহার সঙ্গে বাড়ে না, সে শিক্ষাও তদ্রূপ। লেখক শিক্ষাকে মানুষের স্বভাবের উপযোগী করিতে চান। আধুনিক শিক্ষার নিয়ম এই ভাবে প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। লেখকের বক্তব্য প্রকাশ করিবার রীতি ভাল নয়। ভাব প্রকাশ করিবার জন্য একটা কষ্টকর চেষ্টা রচনার অনেক স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গুণী" গল্পটিতে একটি ভণ্ড তান্ত্রিক ও একটি চতুর বাঙ্গালীর কার্য্যকলাপ ও মন্ত্রতন্ত্র লইয়া কতকটা হাস্যরসের অবতারণা করিবার চেষ্টা পরিস্ফুট হইয়াছে। হাস্যরসটি অনেক স্থলে ন্যাকামীর রূপান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"গীতাপাঠের উপসংহারে" শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন—গীতা পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় শ্রীকৃষ্ণ শব্দের ভিতরকার অর্থ জীবাত্মার প্রিয়তম পরমাত্মা, অর্জ্জুন শব্দের ভিতরের অর্থ পরমাত্মার প্রিয়তম জীবাত্মা; যজ্ঞানুষ্ঠান শব্দের ভিতরের অর্থ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান।

অর্জ্জুন ব্যতীত অর্থাৎ পরমাত্মার পরম ভক্ত ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের (অর্থাৎ প্রেমময় পরমাত্মার) মধুর উপদেশবাণী কে বা শোনে—কে বা গ্রাহ্য করে?

"আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যেরা যাহাকে বলিয়াছেন "নকল সত্য" তাহার নকলত্ব ঢাকা দিবার জন্য পাশ্চাত্য জাতিদিগের জ্ঞানোপদেষ্টারা তাহার নাম দিয়াছেন "আপেক্ষিক সত্য" (relative truth) পক্ষান্তরে, পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যেরা যাহাকে বলেন "আসল সত্য"—সেই একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্য শেষোক্ত জ্ঞানোপদেষ্টাগণের মতে ছাই সত্য। ইহারা বলেন পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্য অজ্ঞেয়, সুতরাং তাহা কাহারও কোনো উপকারে আসিতে পারে না। আপেক্ষিক সত্যকে যে কাজে লাগাও সেই কাজেই লাগে—আপেক্ষিক সত্যই কাজের সত্য। তেমনি আবার ব্রহ্মবাদী আচার্য্যেরা যাহাকে বলেন পরমার্থ অর্থাৎ পরম অর্থ—অজ্ঞেয়বাদী জ্ঞানোপদেষ্টাগণের মতে তাহা ছাই অর্থ। ইহাদের মতে সোনা রূপার অর্থই কাজের অর্থ।

প্রবন্ধের শেষভাগে লেখক বলিয়াছেন "অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনের কপাট এবং অধ্যাত্ম-

যোগের অনুষ্ঠানের কপাট যখন যুগপৎ উদ্ঘাটিত হইবে, তখন অধুনাতনকালের বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রজালকে ছাপাইয়া উঠিয়া পৃথিবীতলে আরো কত যে পরমাশ্চর্য্য মাঙ্গলিক ব্যাপার সকলের নিগূঢ় কপাট সকল খুলিয়া যাইবে, তাহা এক্ষণে বিদ্যা-বৃহস্পতিদিগের ধ্যানের অগোচর।"

কথাগুলি সাময়িক আলোচনার উপযোগী বলিয়া আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"মুক্ত" ও "স্বর্গ" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুইটি কবিতা। রবিবাবুর আধুনিক কবিতার মধ্যে অনেকগুলি তাঁহার মত ও তর্ক প্রচার করিতে এতই ব্যস্ত যে সে গুলির মধ্যে কবিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ঐ সমস্ত কবিতার অন্তর্গত সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বটি ক্রমশঃ রসকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছে।

সবুজপত্র, ফাল্গুন—

"শ্রীবিলাস" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প; রবিবাবু ইদানীং সবুজপত্রে যে গল্পগুলি লিখিতেছেন সে গুলি স্বতন্ত্র হইলেও তাহাদের মধ্য দিয়া একটি কথার সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। সব গল্পগুলি না পড়িলে কোন একটি বিশেষ গল্পের ভাবটুকু নিঃশেষে গ্রহণ করা যায় না। বাঙ্গালা ভাষায় এ ধরণের রচনা নূতন। এই গল্পটীতে দামিনী ও শচীশের চিত্র দুটি মনোরম হইয়াছে। যে মনস্তত্ত্বের কথা বিবৃত হইয়াছে তাহা জটিল, ছোট গল্পের মধ্যে তাহা সুস্পষ্ট করিতে লেখক অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইহার মধ্যে সরল মাধুর্য্য নাই। লেখকের বিচার যুক্তি ও রচনাভঙ্গী পাঠকের চিত্ত এই জটিল গল্পের প্রতি উদাসীন হইলেও তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনে। শ্রীবিলাসের উপাদেয় চরিত্র অল্প কথায় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দামিনীর প্রতি শ্রীবিলাসের যে অকৃত্রিম প্রেমের টান ছিল,নানা কথায় নানা ব্যবহারে তাহার অভিনয় শ্রীবিলাস করে নাই; উপযুক্ত মুহূর্ত্তে যে কয়টি কথা বলিলে সব বলা হয় শ্রীবিলাস তাহাই বলিয়াছে। শচীশের প্রতি পূর্ব্বে প্রণয়-শালিণী বিধবা দামিনীকে বধূরূপে গ্রহণ করা শ্রীবিলাসের ভালবাসার গভীরতা ও তাহার নির্ভীক চরিত্রবলের পরিচায়ক। সমাজ জোর করিয়া সমাজস্থের উপর আবহমান কাল যে দুঃখ দিয়া আসিতেছে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মেরুদণ্ডবিহীন মনুষ্যের কর্ম্ম নহে। শ্রীবিলাস তাহার ভয়লেশহীন কর্ম্মের দ্বারা স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছে—যে তাহার মেরুদণ্ড ছিল এবং হৃদয়কে সমাজের হাড় কাঠে বলি দেওয়াই চরম পুরুষার্থ নহে। সংসারে অনুসন্ধান করিলে অনেক শ্রীবিলাস পাওয়া যায় কিন্তু দামিনীর একান্ত অসদ্ভাব। সংসারে দামিনী যদি পাওয়া যাইত তবে বুকের মধ্যে আগুণ জ্বালিয়া সংসারের জীব এমন দণ্ডে দণ্ডে পুড়িয়া মরিত না। আপাত দর্শনে মনে হয় দামিনী চঞ্চলচিত্ত, শচীশকে প্রাণপনে ভালবাসিয়া পরিশেষে শ্রীবিলাসকে স্বামিত্বে বরণ কেমন করিয়া করিল? শ্রীবিলাসকে বিবাহ না করিয়া দামিনী আমরণ শচীশের প্রতি অনুরাগের স্মৃতিমাত্র সম্বল করিয়া তাহার অনাদৃত ভক্তি ও প্রেমের দুর্ব্বহ দুঃখভার বহন করতঃ যদি এবারের মত জীবনপাত করিয়া দিতে পারিত,

তবে হয় ত বা কাহারও কাহারও মনে দামিনীর চরিত্র আদর্শ চরিত্র বলিয়া পূজা পাইবার যোগ্য হইত। কিন্তু আমাদের মতে বর্ত্তমান ঘটনাধীন শ্রীবিলাসকে বিবাহ করিতে সম্মত হওয়া দামিনীর পক্ষে অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনে হয় না। শচীশকে নানা ভাবে বহুদিন ধরিয়া প্রেম জ্ঞাপন করিয়া দামিনী কোন প্রতিদান পায় নাই কেবল তাহাই নহে—শচীশ দামিনীকে অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহার প্রেমের পূজা লইতে কোন প্রকারে স্বীকৃত হয় নাই। দামিনী যখন কেবল শচীশের সেবা করিবার অনুমতি চাহিয়াছে সে আদেশও শচীশ দেয় নাই উপরন্তু দামিনী হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা শচীশ স্পষ্ট অস্পষ্ট নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। নারী হৃদয়ের শ্রেষ্ঠদান শচীশের পদতলে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যাকুলমনে যখন দামিনী শচীশের নিকট উপযাচিকা হইয়া দাঁড়াইল, তখন শ্রীবিলাস যে দামিনীকে কতখানি ভালবাসে এবং সে ভালবাসা যে কত অকৃত্রিম তাহা দেখিবার দামিনীর সময় ছিল না; শচীশ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া দামিনী যখন তাহার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিবার সময় ও অবসর পাইল, তখন স্বল্পভাষী শ্রীবিলাসের সুগভীর মৌন প্রেমের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। অনাদৃত প্রেমের বেদনায় নারীহৃদয় পীড়িত হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই সময় কাহারও নিকট হইতে সত্য প্রেমের আস্বাদ পাইলে তাহা পরম উপাদেয় বলিয়াই মনে হয়। শ্রীবিলাসের নিকট হইতে বিবাহের প্রস্তাব পাইয়া যখন দামিনী তাহাতে সম্মতি দিয়াছিল, তখন সম্প্রদান করিবার জন্য শচীশকে নিমন্ত্রণ করিবার কথা শ্রীবিলাসকে সে বলে এবং শচীশ যখন আনন্দের সহিত সম্প্রদান করিতে সম্মত হয়, তখন দামিনী নিঃসন্দেহে বুঝিল যে শচীশকে সে কোন দিনই পাইবার আশা করিতে পারে না। যদি করে তবে তাহা দুরাশা। অপরিমেয় প্রণয়শালিনী সুন্দরী যুবতীর অযাচিত অকৃত্রিম প্রেম যে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে সে দেবতা হয় হউক, এ সুখ-দুঃখ-ভ্রম-প্রমাদ-স্নেহ-প্রেম-পরিপূর্ণ ধরণীর মানব সে নহে, সুতরাং মানবী দামিনী মনুষ্যত্ববিশিষ্ট একান্ত প্রণয়শীল শ্রীবিলাসের প্রসারিত প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে নিজকে বধূরূপে ধরা দিয়া শ্রীবিলাসের একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতিদান দিয়াছে এবং যথার্থ প্রেমের আদান প্রদানে উভয়ের তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয় যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল তাহা দামিনীর মৃত্যু জন্য দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও শ্রীবিলাস ও দামিনী উভয়েরই ব্যর্থ জীবন তাহাতে সার্থক হইয়াছে। শ্রীবিলাসের বধূ হইতে অস্বীকার করিয়া দামিনী যদি তাহার অনাদৃত প্রেমের দুঃখময় স্মৃতি লইয়া জীবন কাটাইতে বসিত এবং শ্রীবিলাসের অপরিমেয় প্রেমের প্রতি অনাদর দেখাইয়া তাহার জীবনও নষ্ট করিয়া দিত, তবে মানবকৃত জীর্ণসমাজের কথা বলিতে পারি না, এই বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে যে মহাশক্তি সর্ব্ব কার্য্যকারণের নিয়ন্তা, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন জনিত মহাপাপ দামিনীকে স্পর্শ করিত এবং একান্ত চরণাশ্রিত শ্রীবিলাসের হত্যার অপরাধে সে ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইত। রবীন্দ্রবাবুর লেখনী জয়যুক্ত হউক, তিনি বঙ্গসমাজে দামিনীর সৃজন করিয়া যাইতে পারিলে তাঁহার দৈবশক্তি সফল হইবে এবং অনেক শ্রীবিলাসের ব্যর্থ জীবন সার্থক হইতে পারিবে।

"দুই নারী" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা। কবি উর্ব্বশী ও লক্ষ্মীতে নারীর দুই রূপ দেখাইয়াছেন।

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চ-হাস্য অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
দুহাতে ছড়ায়ে তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে
আর জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্ব্বাদ পানে।
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য সুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে জীবন মৃত্যুর
পবিত্র সঙ্গমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

এ শুধু নারীর কথা নয়, প্রকৃতির—প্রকৃতিরও দুই দিক—এক দিকে ভোগ, আর এক দিকে নিবৃত্তি। একদিকে যৌবনের গান, আর একদিকে অনন্তের পূজার মন্দির। কবিতার ছন্দ ও ভাষা হৃদয়গ্রাহী।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর "অভিভাষণ" উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল। লেখক শিক্ষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে decent alisationএর পক্ষপাতী। বাঙ্গালা দেশে জাতীয় সভাসমিতি স্বতন্ত্রভাবে উন্নতি লাভ করিয়া সংখ্যায় যতই বাড়িয়া উঠুক না কেন তাহাতে তিনি কোন ক্ষতি দেখিতে পান্ না। অনেকে মনে করেন প্রদেশবাৎসল্য উদার স্বদেশ-বাৎসল্যের প্রতিবন্ধক কেননা তাহা সংকীর্ণ, লেখক বলেন এই সংকীর্ণ মনোভাবই উদার মনোভাবের ভিত্তি। যে স্থলে কোন অংশের প্রতি প্রীতি নাই, সে স্থলে সমগ্রের প্রতি ভক্তির মূল কোথায় তাহা তিনি খুঁজিয়া পান না। তাঁহার মতে কোন একটি আঢ্য পরিষদের শাসনাধীন থাকিলে প্রাদেশিক পরিষদগুলি সম্যক স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিবে না।

এই কথাগুলি আমরা কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারি নাই। শাসন সম্যক স্ফূর্ত্তির প্রতিবন্ধক নয়। সম্যক স্ফূর্ত্তির জন্য কোন-না-কোন প্রকার শাসন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। প্রাদেশিক পরিষদগুলি কোন আঢ্য পরিষদের কঠোর নিয়মাধীন হইয়া স্ফূর্ত্তি লাভ না করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের যে কোন-না-কোন প্রকার শাসনের অধীনে থাকিতে হইবে একথা অস্বীকার করা চলে না। অংশের প্রতি প্রীতি সমগ্রের প্রতি ভক্তির মূল নয়। প্রথমে সমগ্রের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তারপর আমরা অংশের প্রতি আকৃষ্ট হই। আমরা প্রথমে Sentence বলি, তারপর শব্দের

প্রতি আকৃষ্ট হই। শিশু প্রথমে অনেকের সহিত বন্ধুত্ব করে, পরে বুঝিতে পারে, কো বিশিষ্ট লোকের সহিত তাহার সম্পর্ক অধিক—তাঁহার প্রতি তাহার ভালবাসা তখনই প্রগা হয় তবে Sentence বলিবার পূর্ব্বে শব্দ শিক্ষা করা বা অনেককে ভালবাসিবার পূর্ব্বে এ জনকে ভালবাসা প্রয়োজনীয় হয়, তাহা শুধু Sentence বলিবার জন্য বা অনেককে ভা বাসিবার জন্য। প্রকৃত শব্দজ্ঞান বা একজনের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা পরেই হইয়া থাকে গোড়াতেই যদি শব্দের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যায়, বা একজনের প্রতি ভালবাসাকেই প্রশ্র দেওয়া হয় তাহা হইলে Sentence বলা বা উদার মনোভাব লাভ করা দুঃসাধ্য, এমন কি অসাধ্যও হইতে পারে। প্রদেশবাৎসল্যকে প্রশ্রয় দিলে উদার স্বদেশবাৎসল্য নিশ্চয় প্রতিহত হইবে।

ভাষাসম্বন্ধে লেখক বলিতে চান—"আমরা যে লেখায় মৌখিক ভাষার পক্ষপাতী তাহার কারণ আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মাতৃভাষা রূপেযৌবনে তথাকথিত সাধুভাষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।"

তারপর তিনি সাধুভাষার ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিয়াছেন। "বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত আছে—কিন্তু সে সাহিত্য পদ্যে রচিত, গদ্যে নয়। আজ প্রায় একশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গদ্য-সাহিত্য জন্মলাভ করে—এ সাহিত্য জাতীয় মন হইতে গড়িয়া উঠে নাই;—ইংরাজ রাজপুরুষদের ফরমায়েসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত অযত্নে ইহা গঠিত হইয়াছিল।"

এ কথাটা আমরা মানিয়া লইতে পারিলাম না। পুরাকালে কোন সাহিত্য-গ্রন্থ লিখিতে হইলে সকলেই সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার করিতেন। জয়দেব, কুলুকভট্ট বঙ্গদেশের লোক হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অনেকের রচনায় সংস্কৃতবহুল ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক বড় কম নয়। কাজেই বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে তাহাতে সংস্কৃত ভাষার বাহুল্য থাকিবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে অনুমান করা যায়। সাধু ভাষা ইংরাজ রাজপুরুষদের ফরমায়েসে গঠিত হয় নাই। সাধুভাষার ইতিবৃত্ত দেখিতে হইলে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারকে ছাড়াইয়া আরও পিছনে যাইতে হইবে। পোষাকী ভাষা প্রাচীন কবিদের রচনায় বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার পোষাকী ও আটপৌরে ভাষা বহুদিন হইতে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে। এখন তাহাদের মিলন সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইংরাজি ভাষারও কতকটা শক্তি এই মিলিতভাষার উপর প্রযুক্ত হইয়াছে কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে কতকটা প্রভেদ চিরকালই থাকিবে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা যে কথিত ভাষা নয় তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শস্থানীয় লেখকদিগের রচনা হইতে আধুনিক লেখকদিগের রচনার ক্রমোন্নতি দেখিলেই বুঝা যায়। কথিত ভাষা লিখিত ভাষাকে রূপান্তরিত করে সত্য; কিন্তু লিখিত ভাষার শক্তিও কথিত ভাষার উপর সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। আধুনিক ভাষা যে শুধু কথিত ভাষারই পরিণতি হইবে এ কথা লেখক বলুন, আমরা বলিতে পারি না।

উপসংহারে লেখক বলিতেছেন—বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে রস আছে, তবে যে আমাদের

সাধারণ-সাহিত্য যথোচিত রস ও শক্তি হইতে বঞ্চিত তাহার জন্য দোষী আমাদের নবশিক্ষা। আমরা ইংরাজী ভাষায়, ইংরাজী সাহিত্যে শিক্ষিত হই, অথচ ইংরাজী জীবনের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ-পরিচয়ও নাই, কাজেই সে শিক্ষার দৌলতে আমরা সঞ্চয় করি শুধু কথা। আমরা concreteএর জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্ত্তে পাই শুধু abstractionও; শুধু abstraction লইয়া কাজ করি বলিয়াই আমাদের লেখায় না আছে দেহ, না আছে প্রাণ। আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ realityর প্রতি মনোযোগ দিলে আমরা এই abstractionএর দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিব। অনুভূতিই সকল জ্ঞানের মূল।

পরীক্ষা ব্যতীত কোন বস্তুরই সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। এ যুগে স্কুল-কলেজে আমরাই পরীক্ষিত হই, কিছুই পরীক্ষা করিতে শিখি না। ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সমাজের মন, নিজের মন,—এই সকল বিষয়ই সাহিত্যের বিচারালয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইবে। এ বিচার কেবল দর্শনে বিজ্ঞানে নয়, নাটকে নভেলে হইবে।

প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটা নিজস্ব গঠন আছে, নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই গঠন রক্ষা না করিতে পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।

ভাষার ন্যায় ভাবও রচনা করিতে হয়। আমাদের চিত্তবৃত্তি স্বতই বিক্ষিপ্ত;—যাহা বিক্ষিপ্ত তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করা সাহিত্যের কাজ। মনের ভিতর যাহা অস্পষ্ট তাহাকে স্পষ্ট করা, যাহা নিরাকার তাহাকে সাকার করাই আর্টের ধর্ম্ম। এই সব কথাগুলি সবুজ পত্রের পাঠকদের অবিদিত না থাকিলেও আমরা পুনরুল্লেখ করিলাম কেননা কথাগুলি সত্য ও বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য।

“এবার” ও “আবার” দুইটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের রচিত। দুটিতেই প্রথমে প্রকৃতি তার পর আত্মার, প্রথমে সান্ত, তারপর অনন্তের অনুভূতির কথা আছে। কবির কবি-প্রতিভা এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে “আবার” কবিতাটি অস্পষ্ট।

সার্থক দান

ক্ষুদ্র হলেও তুচ্ছ নয় সে
স্নেহের প্রেমের প্রীতির দান,
নিঃস্ব যদিও বন্ধু তোমার
মিথ্যা নয় গো প্রাণের টান;
শিউলি ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধে
উষার পরাণ সরস হয়,
বুকচেরা ধন শ্রেষ্ঠ দান সে
ব্যর্থ নয় গো ব্যর্থ নয়।

শ্রীমুকুন্দপ্রসাদ সিংহ।

সাহিত্য সমাচার।

বিজ্ঞানাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম, এ, এফ, সি, এস, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত "আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য-রসায়ন" ও বৈজ্ঞানিক জীবনী" নামক দুইখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম মহাশয়ের "মধুমালতী" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "গল্পাঞ্জলি"র দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" এই মাসেই প্রকাশিত হইবে।

: দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের "কৈসার অন্তঃপুর-রহস্য" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষের "সুরভি" নামক কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।



বিদ্যুৎ-মিলন

চিত্রকর, শ্রীযুক্ত [illegible] রায় | MANASI PRESS

মানসী

৭ম বর্ষ ১ম খণ্ড	বৈশাখ ১৩২২ সাল	১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা

কাব্যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়মের প্রয়োজনীয়তা। *

বর্ষার সপ্তাহব্যাপী অবিশ্রান্ত জলধারাবর্ষণে নদ, নদী, কূপ, তড়াগ, খাল বিল সমস্ত ভরিয়া এক হইয়া গিয়াছে; জলের গতি নাই, স্রোত নাই, তরঙ্গ নাই, জল-নির্গমের পথ নাই। সপ্তাহব্যাপী উদ্দাম ভীষণ প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে ভগ্ন-তরু, তরুশাখা, লতা, গুল্মে, তাহাদিগের ফল, পুষ্প, পত্র, কাণ্ডে ও ভগ্ন গৃহ-রাশির নানা অবয়বে সেই স্থির নিশ্চল জলরাশি আরও নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছে। গিরিগাত্র ও উচ্চভূমি ধৌত করিয়া বর্ষার জল নানাপ্রাণীর মলমূত্র, মৃত প্রাণীর পূয়, শোণিত, বসা, মজ্জা ও দূষিত আবর্জ্জনারাশি দ্বারা সেই জলরাশিকে ফেনিল, পঙ্কিল মলিন করিয়া ফেলে, অপূত জলপ্রণালী উচ্ছ্বসিত হইয়া উৎক্ষিপ্ত মলিন জলে জলরাশিকে পূতিগন্ধি করিয়া তুলে। সুতরাং এই জল পানে, স্নানে, আচমনে নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগের সৃষ্টি করিবে, সন্দেহ নাই। এই জন্য বলিতেছি এইরূপ স্থির ধীর আবদ্ধ জলের প্রশংসা নাই। আবার যখন জল জমিতে থাকে, তখন উচ্চ হইতে যে পথে সে পথে যেদিকে সেদিকে বাহির হইয়া জল নিম্নভূমিতে গড়িয়া যায়; ক্রমে ক্ষীণধারায় বহিয়া নদ, নদী, খাল, বিলে যাইয়া মিশে। নিম্নভূমিতে বাধা পাইলে সেই স্থানের পত্রাদি আবর্জ্জনার সহিত পচিয়া

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশনে পঠিত।

বিষম দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে, বাষ্পাকারে শূন্যে উত্থিত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ুকে দূষিত করে ও সেই দুষ্ট জলের অংশ ভূগর্ভে প্রবাহিত হইয়া খাতের জলে মিশিয়া পানীয় জল নষ্ট করে। আমরা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সহায়তায় এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারি, বুঝিয়া জলের এই স্বাতন্ত্র্য, জলের যদৃচ্ছাচারিতা নষ্ট করি। যাহাতে জল মানবের স্বাস্থ্য বিনষ্ট না করে, তাহার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করি, জলের গতিকে নিয়মিত করি, দূষিত জলকে সত্বরতার সহিত দূরে অপসারিত করি, বিশুদ্ধ জলকে বিশুদ্ধ ভূমির মধ্য দিয়া দ্রুত প্রবাহিত করিয়া পানীয় জলের সঙ্গে মিশাইয়া দিই, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সহায়তায় জানিয়া কৃষিবিজ্ঞানের সহায়তায় আবশ্যকতার উপলব্ধি করিয়া স্থাপত্য-বিদ্যার সহায়তায় পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। এই উদাহরণ এবং এইরূপ শত শত উদাহরণ দেখিয়া অবধারিত হইয়াছে যে, উচ্ছৃঙ্খলতায় জগতের উপকার হয় না। প্রত্যুত তাহা দ্বারা অপ্রতিহত বিপদের আহ্বান করা হয়, ঘোরতর অনিষ্টের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করা হয়।

মানবের জ্ঞানবৃদ্ধি, সুখবৃদ্ধি ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য বিজ্ঞানের উদ্ভাবন। সর্ব্বত্র আমরা এই বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিতে পাই। প্রথমে বিজ্ঞান উচ্ছৃঙ্খলতা দূরে অপসারণ করে ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। প্রত্যেক বিদ্যায় বিজ্ঞান শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে বলিয়া আমরা অল্প সময়ে সে সকল বিদ্যাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি। পাণিনীয় মহাভাষ্যে লিখিত আছে, ব্যাকরণ অধ্যয়ন ভিন্ন যদি কেহ সহস্র বৎসর ভাষা অধ্যয়ন করে, তাহা হইলেও তাহার ভাষায় কোন জ্ঞানই জন্মে না। অর্থ,—ব্যাকরণ হইতেছে,—ভাষার বিজ্ঞান। ভাষায় যে শৃঙ্খলা আছে,—ব্যাকরণ তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। আদি বৈয়াকরণ শব্দ-বিদ্যার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন. তিনি ভাষার গতি, ভাষার প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শব্দরাশির জাতিভেদ নির্ণয়ে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন, শব্দগত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভিন্নতাগুলিও তাঁহার উজ্জ্বল অনুভূতিতে প্রতিভাত হইয়াছিল। এই শ্রেণীভেদের জ্ঞান, এই শৃঙ্খলার উপলব্ধিই আমাদিগকে সেই সেই ভাষায় পারদর্শী করিয়া তুলিতেছে। বিজ্ঞান সর্ব্বত্র আছে, শৃঙ্খলা সর্ব্বত্র আছে। তর্কে আছে, দর্শনে আছে, জ্যোতিষে আছে, গণিতে আছে, চিকিৎসায় আছে, চিত্রে আছে, শিল্পে আছে, নৃত্যে আছে, গীতে আছে, বাদ্যে আছে, এমন কি রন্ধনে, ভোজনে, শয়নে, গমনে, উপবেশনে পর্য্যন্ত আছে। ইহার মধ্যে যদি একটিতেও অনুষ্ঠাতার শৃঙ্খলা ব্যাহত হইতেছে বুঝা যায়, তাহা হইলে হয় ত তাহার সেই সেই

বিষয়ে শিক্ষা নাই—অবধারণ করি, নয় ত তাহার মস্তিষ্ক অন্যপ্রকার আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হইতেছে, কল্পনা করি।

সর্ব্বত্র শৃঙ্খলার সদ্ভাব, সর্ব্বত্র বিজ্ঞানের আধিপত্য; কেবল কাব্যে নাই বলিতে পারি কি? সমস্ত শিল্পের মধ্যে কাব্য যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত ললিতকলার মধ্যে কবিতা যে কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বর্ণ ও রেখার সন্নিবেশে চিত্রের পরিস্ফুরণ, অভিজ্ঞ চিত্রকর দুই একটি রেখাপাতেই যে চিত্রকে জীবন্ত করিতে পারে, স্থান বিশেষে দুই একটি রেখাপাত করিয়াই যে চিত্রে ভাবের অভিব্যক্তি করিতে পারে, ভয় বিস্ময়, উৎসাহ অনুরাগ, করুণা, ঘৃণা, ক্রোধ ও হাস্য ফুটাইতে পারে; চিত্র বিদ্যা না জানিলে চিত্র বিজ্ঞান না জানিলে চিত্রকরের জড় হস্ত কখনই চিণ্ময়-ভাবের আভাষ দিতে সমর্থ হয় না। আবার স্বরবিজ্ঞান না জানিলে গায়ক কখনই স্বরের লহরী তুলিয়া রাগিণী ও রাগকে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইতে পারে না। এক রাগের অঙ্গে অন্য রাগের অঙ্গ সমাবেশ করিয়া দক্ষপ্রজাপতির সৃষ্টি করিয়া ফেলে।

যে চিত্রবিদ্যার নিদর্শন কাব্যে দেখিতে পাই, রূপকে দেখিতে পাই, পুরাণে দেখিতে পাই, মহাভারতে দেখিতে পাই, রামায়ণে দেখিতে পাই, তন্ত্রে দেখিতে পাই, বেদে উপনিষদে পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, সে চিত্রবিদ্যা আজ ভারত হইতে অন্তর্হিত। যে সঙ্গীতের মাহাত্ম্য সাম হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্য নাটকে পর্য্যন্ত প্রকটিত, সে সঙ্গীত আজ ভারতে লুপ্তপ্রায়। লামা তারানাথের কথায় আজ কাহারই আস্থা হইত না, যদি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির নেতা শ্রীমান্ রাজ-কুমারের অর্থবৃষ্টি ও যত্ন-সমষ্টিতে, যোগ্যতম নেতৃদ্বয়ের বুদ্ধিচালনায় ভূগর্ভ হইতে শত শত প্রস্তর-নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তি উত্থাপিত না হইত। আজ বঙ্গে সে ভাস্কর্য্য কৈ? আজ কাব্যের বিজ্ঞান-অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া যুবকগণ যেরূপ ঝুড়ি ঝুড়ি কাব্যের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে আশঙ্কা হয়, কাব্যও বঙ্গ-ভাষা হইতে অচিরে অন্তর্দ্ধান করিবে।

বালকবালিকারাও তৃণকাণ্ডের বা অঙ্গুলীর সহায়তায় ভূমিতে হাতী, ঘোড়া, কাগা, বগা অঙ্কণ করে, তাই বলিয়া বলিব কি ভারতে চিত্রবিদ্যা আছে? রাখালেরা মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া গাছের তলায় বসিয়া গলা ছাড়িয়া গান গায়, তাই বলিয়া বলিব কি ভারতে আজও সঙ্গীতবিদ্যা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে? বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় না টিকিলে তাহাকে আর তাহা বলিব না, কিছুই নয় বলিয়া উপেক্ষা করিব।

উদ্দেশ, লক্ষণ, পরীক্ষা। প্রথমতঃ প্রতিপাদ্য পদার্থের নাম কীর্ত্তন, ইহাকেই উদ্দেশ বলে। ইতর ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের নাম লক্ষণ, পরে সেই পদার্থের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। নামতঃ কাব্য জানি, কাব্যের লক্ষণ কি জানা আবশ্যক। কাব্যের লক্ষণ কি জানিয়া, কাব্য কি, আগে বুঝ; তারপর কাব্য লিখিতে যাও।

কাব্য কি না জানিয়া কাব্য লিখিতে যাওয়াও যা, প্রতিমা কি, না জানিয়া প্রতিমা-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হওয়াও তাই। কোন এক সময়ে একটি শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন,—"ঢুলিয়া ঢুলিয়া যাহা পড়া যায় তাহার নাম কাব্য।" আমি বলিয়াছিলাম,—"আমি ইচ্ছা করিলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া বোধোদয়ও ত পড়িতে পারি; তবে কি বোধোদয় কাব্য হইবে?" তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। আবার আর একটি শিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন,—"ছন্দোবদ্ধ বাক্যের নাম কাব্য"। আমি বলিলাম,—"খনার বচন, শুভঙ্করের আর্য্যাও ত ছন্দে লিখিত, সেগুলি কি কাব্য হইবে?" আর একটি শিক্ষিত ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন,—"আপনি কি বলিতেছেন? কাব্য কি পড়িলেই বুঝা যায়, ইহা অন্য কিছু নয়, ইহা কাব্য। কাব্যের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নাই, কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ করাও উচিত নয়। করিলে কাব্যে যে একটি ব্যাপক ভাব আছে, তাহাকে বিদূরিত করা হয়; তৎপরিবর্ত্তে তাহাতে সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করা হয়। আপনাদিগের একটি বৃহৎ দোষ,—আপনারা সর্ব্বত্র এক একটি স্বকপোলকল্পিত লক্ষণের সৃষ্টি করিয়া জিনিসকে একটি গণ্ডীর ভিতরে আনয়ন করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করিয়া ফেলেন; পরে সেই গণ্ডীর বাহিরে যাহা পড়িবে, তাহাকে আর সে জিনিষ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, তাহাকে বাতিল করিয়া ফেলেন। এই সঙ্কীর্ণতা আনিয়া সংস্কৃত ভাষাকে নষ্ট করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষাকেও নষ্ট করিতে বসিয়াছেন। দেশ উৎসন্নে গিয়াছে, ভাষার উপরে ব্যাকরণের বাঁধ, ছন্দের বাঁধ, আবার অলঙ্কারের বাঁধ চড়াইতে চাহিতেছেন। বাঁধে বাঁধে একেবারে অসাড় করিয়া তুলিতেছেন। আর ভাষাতে জীবন্ত ভাব নাই। আপনারা কোন গতানুগতিক ন্যায়ে গড্ডলিকা প্রবাহে তাহার উপরে চলিয়াছেন। বাল্মীকি ও কালিদাসের ভাণ্ডারেই কি ভাবের সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে? বন্ধনগুলি সমস্ত ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া দূরে ফেলাইয়া দেউন, কাব্যে কত নূতন নূতন ভাবের সঞ্চার হইবে। কবি-প্রতিভার কত যে নূতন ভাব ফুটিতে পারে কে বলিতে পারে? সেইজন্য কাব্যের ডেফিনেশন হইতে পারে না। ব্যক্তিগত

স্বাতন্ত্র্য চাই, প্রত্যেক প্রতিভাবান কবির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আছে ও থাকিবে। কবিতায় এই স্বাতন্ত্র্য ফুটাইলে কবিতা হইল, যিনি এই স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে যাইবেন, তিনি কবিতার শত্রু, কবির শত্রু, সাহিত্যের শত্রু, দেশের শত্রু। তাহাকে ও তাহার সমালোচনাকে দূরে পরিহার করিতে পারে; সৌভাগ্য বশতঃ পাশ্চাত্য জগৎ হইতে প্রবল বেগে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া যে নিরাবিল স্রোতঃ দেশে আসিয়াছে, জনকতক লোক আপনারা তাহাকে কখনই বাধা দিতে পারিবেন না; স্রোতের মুখে আপনারাই ভাসিয়া কোন্ অজানা দেশে গিয়া পড়িবেন। বন্ধুভাবে পরামর্শ দি, বাধা না দিয়া সেই স্রোতে আপনারাও গা ভাসাইয়া চলুন। দেশের মঙ্গল হইবে। ভাষা স্বাধীন ভাবে আপনা আপনি আপনাকে গড়িয়া তুলিবে।" আমি সেই পাশ্চাত্য স্রোতে গা ভাসাইয়া দিই বা না দিই তাঁহার সেই বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝি বা না বুঝি আমি কিন্তু তাঁহার সেই বক্তৃতার স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, আমার আর বলিবার অবসর রহিল না। বৈয়াকরণের মুখে নৈয়ায়িকের মুখে চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি গো আনয়ন করিয়া বন্ধন কর, পরে অশ্ব আনয়ন কর,—বৃদ্ধের এই আদেশে অন্য বৃদ্ধ সেই কার্য্য করিলে বালক গো কি, অশ্ব কি বুঝিয়া লয়। একটি গো, একটী অশ্ব দেখিয়া গো ও অশ্বের লক্ষণ স্থির করে ও তাহা দ্বারা নিখিল গো ও নিখিল অশ্বকে চিনিতে পারে। এক্ষণে বুঝিলাম, এ প্রণালী ঠিক নয়, ইহা দ্বারা গোকে একটা গণ্ডীর ভিতরে আনা হইল, গোতে একটা সঙ্কীর্ণতা আসিল। গরুর ব্যাপক অর্থ ধরিয়া মনুষ্যকেও গরুর মধ্যে ফেলিলে মনুষ্যেরও মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি ও ব্যাপকত্ব সিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই।

ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখে আমার একটী গল্প মনে পড়িল। একটী মেসে কয়েকটী বালকের সঙ্গে একটা শিক্ষক থাকিতেন। পাচক ব্রাহ্মণ অসুস্থ হইয়াছে, বালকেরাই রন্ধন করিতে গিয়াছে। বর্ষাকাল, বাহিরে থাকিয়া খড়িগুলি ভিজিয়া গিয়াছে, নীচের ঘরে উনুন, সেঁত সেঁতে হইয়াছে। বালকেরা বহুকষ্টে উনুন ধরাইয়া দাইল চাপাইয়া দিয়াছে। কিছুকাল পরে দাইল উথলাইতে আরম্ভ করিলে একটি অভিজ্ঞ বালক সেই উথলান থামাইবার জন্য সেই দাইলে তৈল দিতেছিল,; শিক্ষক তাহা দেখিয়া হাত তুলিয়া বলিলেন, খবরদার, দাইলে তৈল দিও না, উথ্‌লাইতে দেও, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ফুটুক, দাইলের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিও না!" মাষ্টার মহাশয়ের আদেশে দাইলে তৈল দেওয়া হইল না, দাইল উথ্‌লাইয়া একেবারে উনুনটি নিবাইয়া ফেলিল। পরে

বালক ও মাষ্টারের শত চেষ্টায় আর উহ্নুন ধরিল না, অভুক্ত অবস্থায় সব স্কুলে যাইতে হইল। কবির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে ও কবিতার সেই প্রতি প্রস্ফুরিত স্বাতন্ত্র্যে বাধা না দিলে যদি দাইলের মত যুগপৎ সেই কবি ও ক উভয়ে উথ্‌লাইয়া সেই বহুপুরাতন সেঁত সেঁতে উহ্নুনটি একেবারে নিবাইয়া ে আমাদিগের হইতেছে সেই চিন্তা।

স্বাতন্ত্র্য কাহাকে বলে? স্ব শব্দের অর্থ কি? স্ব শব্দের অর্থ যদি অ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে পারি, স্বাতন্ত্র্য শব্দের অর্থ আত্মার অধীনতা। আমি কি আত্মার অধীন? বলিতে লজ্জা করে,—আমাদিগের প্রভু একটি দুইটি অসংখ্য। আমরা এই প্রত্যেক প্রভুর নিকটে মস্তক বিক্রয় করিয়া রাখিয় কায়মনোবাক্যে প্রতিক্ষণে প্রত্যেক প্রভুর হুকুম তামিল করিতেছি; স্ত্রী পু নিকটেও দাসখত লিখিয়া দিয়াছি। বেতনভোগী ভৃত্য পর্য্যন্ত আমার প্র বেতন দিয়া আবার তাহারই অধীন হইয়া রহিয়াছি। আমার দেহে বাস কা উদ্দাম উদ্ধত ইন্দ্রিয়নিচয় যে আমার উপরে প্রভুত্ব করিতেছে, একান্ত আমাকে অধীন করিয়া ফেলিয়াছে, সে বিষয়ে কি মুহূর্ত্তের জন্যও আমি ি করিতে পারি? ইন্দ্রিয়দাস আমি কি করিয়া বলিব,—আমার স্বাতন্ত্র্য আে স্বাতন্ত্র্য স্বাতন্ত্র্য যে বলিতেছি, সে আর কিছুই নয়, আত্মাকে একেবারে বি করিয়া সেই স্থানে ইন্দ্রিয়ের আসন পাতিয়াছি। ভোগলিপ্সা চরিতার্থতাে স্বাতন্ত্র্য নাম দেওয়া হইয়াছে।

সংযমের কষাঘাত ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শাসন হয় না, ইহার দমন হয় না। অসংয ইন্দ্রিয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। ঋষিরা সংযমের অভ্যাসে ইন্দ্রিয়দমনের ব্যব করিয়াছেন; ঋষিদিগের ব্যবস্থা না মানিয়া এখনও যাহারা শতবার পরীক্ষাদ্বা কর্ত্তব্যের অবধারণা করিতেছেন, আবার তাহা হইতে মন্দ ফল উৎপন্ন দেখিয়া তাহার বর্জ্জন করিতেছেন, সেই অসংযমী ভোগবিলাসে একান্ত প্রবৃ সেই সমাজের অনুকরণ ও অনুসরণ করা একান্ত অকর্ত্তব্য। কোন কো বিষয়ে তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি হইলেও অনেক বিষয়ে তাঁহারা এখন কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারেন নাই। এজন্য সে সমাজে সেই সেই বিষয়ে সু শান্তি নাই, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে।

নৈয়ায়িকেরা স্ব শব্দের সম্বন্ধে স্বাধীন। তাহার লক্ষণ করিতে যাইয়া ঘা পট, মঠ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্ব শব্দে ধরিয়া লইয়া থাকেন। ইঁহাদিগে মতে স্বাতন্ত্র্য শব্দের ভেদ বুঝিতে পারি; গোতে গো ভিন্ন পদার্থের যে ভে

তাহাকেই আমরা স্বাতন্ত্র্য বলিতে পারি। এই ভেদক উপাধিটি লক্ষণ। এই লক্ষণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি হয়। কাব্যে এরূপ স্বাতন্ত্র্য আমরাও স্বীকার করি। এই স্বাতন্ত্র্য বুঝিবার জন্যই ত কাব্যের লক্ষণের প্রয়োজন। অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে অভিধা, লক্ষণ লইয়া ঘোরতর বিচার আছে, তাহা জানি বা না জানি, অলঙ্কার পরিচ্ছেদ পড়িয়া অলঙ্কারের নামগুলি মুখস্থ করি বা না করি; রস, গুণ, রীতি জানা চাই। কাব্যের দোষগুলি দোষ জানিয়া দূরে তাহার পরিহার করিয়া যথারীতি রসানুগত গুণের সদ্ভাবে কাব্যের রচনা আবশ্যক, তাহা হইলেই সেই কাব্য হয়। নয় ত বর্ণনীয় রসের পরিপন্থী রসের সমাবেশে লিখিলে কাব্য হয় না। বর্ত্তমান যুগের কাব্যে বর্ণনীয় রসের প্রতিদ্বন্দ্বী রসের সমাবেশ দেখিতে পাই। অলঙ্কার-শাস্ত্র না জানিয়া কাব্য লেখার এইটি ফল। এক্ষণে যে সুসভ্য ইউরোপে রোমান্টিক কাব্যের একটা ধোঁয়া উঠিয়াছে, ইহা আমাদিগের অনেক পুরাতন কথা। ইউরোপ যাহাকে রোমান্টিক বলে তাহাকে আমরা ধ্বনি-কাব্য বলি। ইউরোপ রোমান্টিকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া বুঝাইতে পারে নাই, আমরা তাহা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া বুঝাইয়াছি। এই রোমান্টিক বুঝিতে হইলেও অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রয়োজন।

রসবিশেষে যেমন "ধীর সমীরে যমুনাতীরে" বলিতে হয় আবার ভিন্ন রসের অবতারণা করিতে যাইয়া "উন্মজ্জলকুঞ্জরেন্দ্রভসাস্ফালানুবন্ধোদ্ধতঃ"ও বলিতে হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের খড়ম খটখটায়মান শব্দ বলিলে চলিবে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভগবান মনুর শাসনে অদ্যাপি খড়ম ছাড়িয়াই দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। নীরবে বাণীপূজা হয় না। উচ্চকণ্ঠে সরস্বতীর স্তোত্র পাঠ করিতে হয়; এই স্তোত্রে পূর্ব্বপুরুষের চির অরাধিতা সরস্বতী প্রসন্ন হয়েন। গদগদ ভাবে জগৎ উচ্ছ্বসিত হয়। স্তোত্রের সেই শক্তি বর্দ্ধনের জন্যই অলঙ্কার-শাস্ত্রের ব্যবস্থা।

এ খটখটায়মান শব্দ নিরীহ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের খড়মের নয়। এ ধূর্জ্জটী পিণাকীর তাণ্ডবের পদ শব্দ। চণ্ডী অট্টহাস্যে সহস্র পারিতলে তাল দিতেছেন,—আর সহস্র বাহুদণ্ড ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের সহিত সহস্র গ্রহ নক্ষত্রকে বিপর্য্যস্ত করিয়া, সপ্তসিন্ধুকে উদ্বেলিত করিয়া, সহস্র শিরা নাগরাজকে ফেণিল গরল উদ্বমনের সহিত মস্তকরাশিকে চূর্ণ বিচূর্ণ ও মেদিনী মণ্ডলকে ধূলি-সাৎ করিয়া চণ্ডেশ্বরের জগৎবিধ্বংসকারী প্রচণ্ড তাণ্ডবের এ গভীর পদশব্দ।

এ দেশে তাণ্ডবের সহিত লাস্যের সমাবেশ নাই। বীণাপাণি সহাস্যমুখী

সরস্বতী যখন বীণার ঝঙ্কার তুলিয়া মৃদুমধুর অলঙ্কারের ধ্বনি তুলি নাচিতে থাকেন, সে লাস্য এ নয়, এ রৌদ্রমূর্ত্তি রৌদ্রের অকাণ্ড তাণ্ডব। যি যমুনাকূলে নীপমূলে ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইয়া মধুর মুরলীধ্বনিতে যমুনাকে উজা বহাইয়াছিলেন, গোপাঙ্গনাদিগকে উন্মাদিনী করিয়াছিলেন, তিনি আব কুরুক্ষেত্র মহাসমরে পার্থ-সারথি হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খের গভীর নিনাদে বী কেশরীদিগের হৃদয় ভীতিবিহ্বল করিয়াছিলেন। একত্র দুইএর সমাবেশ নাই কুরুক্ষেত্রেও জ্যা-কিণ চিহ্নিত কঠোর হস্তে মুরলী নাই।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কাউএল সাহেবের প্ররোচনা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় "কাব্যনির্ণয়" নামে বঙ্গভাষা একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সেই গ্রন্থখানি নর্ম্মালস্কু অধ্যাপিত হইত। এক্ষণে তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপন উঠিয়া গিয়াছে। বিশ্ব বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয় হলে সপ্তাহে ২।৩ দিনের জন্য বঙ্গভাষায় লেক্‌চারার নিযুক্ত হইয়াছেন। তি কি শিক্ষা দিতেছেন জানি না। যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের একান্ত আবশ্যক তাহ কিন্তু উঠিয়া গিয়াছে। কাশী কুইন্স কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার ভিনিসে মুখে অলঙ্কার-শাস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছি। পণ্ডিত যাকোবী সে দেশে এ দেশে আলঙ্কারিক বলিয়া সম্মানভাজন; আলঙ্কারিক বলিয়াই তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে এ দেশে আনীত হইয়াছিলেন। আমরা কিন্তু সে অলঙ্কার-শাস্ত্রে আবশ্যকতা নাই মনে করিয়া সেই শাস্ত্রের উপর অবজ্ঞা প্রদর্শন করি। বিদেশী যাহার শতমুখে প্রশংসা করেন, আমরা ভারতবাসী হইয়া ভারতীয় মনীষীদিগে উদ্ভাবিত সেই শাস্ত্রের উপর সম্মান করি না। উপসংহারে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, আমরা সৌভাগ্যবশতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন উপযুক্ত ভাইস চেন্সেলার পাইয়াছি। যাহাতে তাঁহার এই দিকে একটুকু দৃষ্টিনিক্ষেপ হয়, তাহার জন্য সম্মিলনের সভাগণ সমবেত হউন।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

নববর্ষ ।

ঐ মধু মাধবের কুসুমিত পাদপের
শাখে ডাকে পাখী ; বুঝি এল নববর্ষ ।
চুম্বিয়া নভস্তল, গিরি-শৃঙ্গ, সিন্ধু-জল,
কর বায়ু, রেখা-আঁকা এ ললাট স্পর্শ ।
সে পরশে মহোৎসব করি মনে অনুভব
দীপ্তিহীন চক্ষু মুদে, স্মরি নব আগতে ।
ঝেড়ে মুছে আপনার চূর্ণ ধূলি বাসনার,
জীর্ণ গৃহ-দ্বারে তারে সম্ভাসিব স্বাগতে ।
নবীনের আদরের গৃহে দুঃখী কাতরের
কণ্ঠধ্বনি রুদ্ধ করি, উদ্বোধিয়া হর্ষ,
বৈশাখের রৌদ্র লিপ্ত শ্যাম বিশ্ব করি দীপ্ত,
বসন্ত রচিত কুঞ্জে এস নববর্ষ ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

নিবেদন

অদ্যকার এই সভায় সকল বিষয়ে সকলের ছোট হইয়া, অন্ততঃ দুইটি বিষয়ে আমার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। প্রথমতঃ আমার স্থান যে আপনাদের সকলের নিম্নে, এই অধিবেশনে আপনাদের আহ্বান করিতে গুণহিসাবে আমার যে কোনই অধিকার নাই এবং আপনারা আজ এখানে উপস্থিত হইয়া যে মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন—এ সকল কথা বলিলে আপনারা আমাকে অন্ততঃ কৃত্রিম বিনয়ের কোন অপবাদ দিবেন না। দ্বিতীয়তঃ আজকার আয়োজনের যত কিছু ত্রুটিপ্রমাদ, তাহার জন্য আজ আমাকে মার্জ্জনার অপেক্ষা করিতে হইবে না, কারণ সে সকল আপনারা স্বতঃই মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। আমার কথা আজ এই খানেই সমাপ্ত হওয়া উচিত। তবু আপনারা অভয় দিলে অদ্যকার আমোদ-আহ্লাদের যে অর্থে সার্থকতা, তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ দুই একটি কথা শুনাইতে ইচ্ছা করি।

* সাহিত্য-সঙ্ঘতের পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত

আমি কথাটা যে ভাবে বলিব, আপনারা ঠিক সেইভাবে কথাটা বিবেচন করিয়া দেখিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু এ কথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন না যে আজকার এই আমোদ, আহ্লাদ, আলাপ-পরিচয়, গান-বাজনার কোন সার্থকতাই নাই।

সংসার জুড়িয়া এই যে নানাভাবে, নানাদিকে, নানারূপে চিরচঞ্চল বিশ্বজীবন গড়িয়াছে, গড়িতেছে ও গড়িবে, ইহার আদৎ অংশটা কিন্তু চিরকালই খুব স্থায়ী, নিরেট ও খাঁটি। তাহা অন্য কিছুই নয়—কেবল আমাদের এই খাওয়া-দাওয়া, আপিসে-যাওয়া, ঘরসংসার চালান এবং যথাকালে মৃত্যুতে পরিসমাপ্ত দিনের-পর-দিনের জীবন ঠিক Biology বা জীববিদ্যায় যাহাকে নিঃসংশয়ে জীবন বলে—এই হৃ-ধাতুর যতপ্রকার ঔপসর্গিক বিকৃতি প্রহারাহার-সংহার-বিহার-পরিহারবান্ অর্থাৎ মারামারির, খাওয়া-দাওয়ার, কাটা-কাটির চলাফেরার, ছাড়াছাড়ির এই জীবন। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী আমাদিগকে এই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই জীবনটাই খুব আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তাঁহারাই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া পৃথিবীর পনের আনা অংশের ভোগদখল করিতেছেন। বাকি এক আনা অংশ যাঁহাদের অধিকারে—যথা ভাবুক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সংস্কারক—তাঁহারা fitt st বা যোগ্যতম নন বলিয়া প্রকৃতির নিয়মে কিছুতেই এসংসারে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। কবির মৃত্যু হয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিককে সংসার ছাড়িয়া নিজের চিন্তারাজ্যেই বসতি করিতে হয়, আর সংস্কারককে সকলের নিন্দা-তাচ্ছিল্য মাথায় লইয়া হয়ত কারাগৃহেই জীবন কাটাইতে হয়। সংসারে যাহারা জয়ী, তাহারাই পনের-আনা; তাহাদের জীবনই ঠিক প্রকৃতির নিয়মগত জীবন এবং সেই জীবনে ভাবের, কল্পনার, পাণ্ডিত্যের, উচ্ছ্বাসের কোন স্থান নাই! সেই ঘরসংসার চালান জীবনটাই খুব স্থায়ী, নিরেট ও খাঁটি।

এই কাজের জীবন আমরা কলের মতন চালাইয়া যাই এবং এই কাজের কল চালাইতে অনেক জিনিসকে আমাদের দূর করিয়া ফেলিয়া যাইতে হয়। সেগুলি কোন কাজের মাল-মস্‌লা বলিয়া আমরা ধরি না—তাহাতে গৃহে এক কপর্দ্দকও আসে না, জীবিকা-নির্ব্বাহের কোন উপাদানই তাহাতে পাওয়া যায় না। সে গুলিকে সাধারণতঃ আমরা বাজে জিনিস বলিয়া থাকি। এই বসন্ত-সুন্দর ফাল্গুনারম্ভে আকাশে, বাতাসে, আলোতে, আঁধারে

মিলিয়া হৃদয়ে যে মাধুর্য্য রসের আভাস জাগাইয়া তোলে, এই কর্ম্মময় জীবন তাহাকে কেবল একপাশে ফেলিয়া রাখিয়া সম্মুখে চলিয়া যায়। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে বপ্রক্রীড়া-পরিণতগজ-প্রেক্ষণীয় আশ্লিষ্টসানু মেঘদর্শনে যক্ষের যে গূঢ় বিরহ-বেদনা জাগিয়াছিল, কালিদাসের কাব্যে তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বিদেশে চাকরীগত-প্রাণ কেরাণীর মনে সে ব্যথা উঠিলে তাহা উপহাসের বিষয়ই হয়। তপোবন হইতে বিদায়বিধূরা শকুন্তলার প্রাণের টানের যে বেদনা—তাহার অভিনয় ত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে হইয়া থাকে, কিন্তু দুইদিনে চোখের জল মুছিয়া জনক জননী আবার পূর্ব্বের মতই ঘরকন্না করিয়া যান—সে বেদনাটা যেন বাজে, নিত্যকার কাজের জীবনকে ক্ষণিকের জন্য সকরুণ করিয়া মিলাইয়া যায়। সংসারে তাহার কোন চিহ্নই রহিল না—ব্যর্থ অশ্রুজল দুইদিনে শুকাইয়া গেল। এমন করিয়া কত অস্ফুট ভাব, কত অর্দ্ধোদ্গত চিন্তা, কত অসম্ভব ইচ্ছা যে পথে পথে ফেলিয়া জীবনের রাজপথে চলিতে হয়, তাহার আর অন্ত নাই। এইগুলি যেন আমাদের পুঁটলী-বোঝাই নুড়ির ভার—যতদূর সম্ভব ইহা লাঘব করিয়া না চলিলে জীবনের পাল্লায়জেতা যাইবে না। তাই কবি অনেক দুঃখে বলিয়াছেন—

> 'হে হৃদয়, তোমার সঞ্চয়
> দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।'

এই কথাটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি বলিয়া, আমরা বিশ্বজীবনের মধ্যে কতগুলি দ্বিত্বভাবের সৃজন করি। যথা, কাজের ও বাজে, সদ্ব্যয় ও অপব্যয়, প্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত। ভাত না খাইলে চলে না, কিন্তু কাব্যামৃত রসাস্বাদন না হইলেও চলে; আপিসে না গেলে চলে না, কিন্তু চিন্তারাজ্যে বিচরণ না করিলেও চলে; পরিবার প্রতিপালন না করিলে চলে না কিন্তু সাহিত্যের পুষ্টি সাধন না করিলেও জীবনযাত্রায় বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ইত্যাদি। এবং যে মূর্খ এই প্রথম শ্রেণীর কাজগুলি অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ-গুলিকে বাড়াইয়া তোলে, তাহাকে আমরা যে অপ্রকৃতিস্থ বা পাগল বলিয়া গালি দেই, সে গালিটা খুবই সত্য, কারণ প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সংসারে তাহাদের স্থান নাই। তাহারা কবি, ভাবুক, পণ্ডিত, কিন্তু প্রকৃতিস্থ মানুষ নহেন—স্বয়ং সেক্ষপীয়রও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কিন্তু এই দ্বিত্বভাবের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, তাহার সীমা কোথায়, তাহাও একবার বুঝিয়া লওয়া দরকার। জীবনের কাজের কল যাহা ফেলিয়া

দেয়, সেই ফেলানো ছড়ানো জিনিসগুলিকে মাল-মস্‌লা করিয়া যে অ একটা জীবনের পুঞ্জ গড়িয়া উঠিতেছে, বিজ্ঞান তাহার কোন ধার ধারে বটে, কিন্তু সাহিত্য তাহা লইয়াই ব্যস্ত। তাই এক হিসাবে সাহিত্য কে সংসারের দৈনন্দিন জীবনের একটা By product যতই কেন মনে ম কাজের জিনিসে ও বাজে জিনিসে দ্বিত্ব গড়িয়া তুলি, এই দুইটাতে কিছুতে ছাড়াছাড়ি করা চলে না। সংসারের খাওয়া-দাওয়া ঘরসংসার চালান তু দৈনন্দিন জীবনের প্রবাহেই সাহিত্যের ক্ষেত্র যে উর্ব্বর হইয়া উঠিতেছে, কথা ভুলিলে চলিবে না। এই জীবনটাকে ক্ষুণ্ণ করিলে, সাহিত্যের জীবন ক্ষুণ্ণ হইবে। এই জীবনটাকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত রাখিলে, সাহিত্যে জীবনও পরিপুষ্ট হইবে। ইতিহাস হইতে তাহার কত দৃষ্টান্ত দেখাইব প্রাচীনভারতে ভোগবিলাস-মধুর বিক্রমাদিত্যের সময়ের কথা ভাবিয়া দেখু অথবা গ্রীসের Periclean Age ইংলণ্ডের Elizabeth ও victori র শাসনকাল।

আকাশ কুসুমের কেবল কল্পনাই করি; কিন্তু আকাশের এত মেঘে রঙ্গীন লীলাখেলায় চন্দ্রের এত স্নিগ্ধ মধুর আলোকে, কিম্বা প্রভাতের রক্তি আভায় ও সায়াহ্নের ম্লানচ্ছায়ায় কোন দিন ত আকাশে ফুল ফুটিতে দে যায় নাই; সে ফুল ত মাটির ধূলা ময়লাতেই অযত্নে ফুটিয়া থাকে। বসন্তে যত সৌরভ, যত গান, যত মনোমোহন আয়োজন তাহা ত এই ধূলা কাদা জগতেরই মধ্যে। এই পৃথিবীর উপরিভাগটা aeroplan এ চড়িয়া কিছুদূর ছাড়ি গেলেই বসন্তের আর কোন আভাস নাই—পাখীর গানও নাই, পাতা সবুজও নাই, ফুলের রংও নাই, হাওয়ার মৃদুদোলও নাই। কথাটা য ভাবে খুসী ফলাও করিয়া লউন, আসল বক্তব্যটা এই যে, মহিমা যেমন তুচ্ছ জিনিস হইতেই উঠে, সাহিত্য তেমনই এই খেলাধূলার দৈনন্দিন জীব হইতেই ফুটিয়া বাহির হয়।

কবি কল্পজগতের অশরীরী মানস-প্রতিমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা;

তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগনবিহারী।
মম হৃদয় রক্তরঞ্জনে, তব
চরণ দিয়েছি রাঙ্গিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী!
তব অধর এঁকেছি সুধা বিষে মিশে
মম সুখ দুখ ভাঙ্গিয়া;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি
মম বিজন জীবন-বিহারী।"

কবি ভাবিলেন, আমার এই স্বপনচারিণী মানসী-প্রতিমাকে কি করিয়া এমন ধূলিমলিন জগতে তুচ্ছ কোলাহলের মাঝখানে মন্দির গড়িয়া দিব। যেখানে বিজলীর, গ্যাসের, এমন কি তেলের বাতিও নাই, কিন্তু যেখানে অবিশ্রান্ত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারকা আলোক দিতেছে, যেখানে মর্ত্ত্যের তুচ্ছ কোলাহল নাই, কেবলি চিরপ্রতিষ্ঠিত নীরবতা, যেখানে তালবৃন্ত কি চামর নাই, কিন্তু দশদিকের অবাধ উদাস হাওয়া কেবল বহিয়া যাইতেছে, এমন এক দুরারোহ দুর্গম গিরিশৃঙ্গে কবি তাহার মানস-প্রতিমার জন্য সোণার মন্দির গড়িয়া দিলেন। কবি ভাবিলেন—দেবী আমার এই খানেই তুষ্ট থাকিবেন, এখানে মর্ত্ত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক থাকিবে না। কিন্তু, হায় কবি, তোমার দেবী যে নিতান্তই মানবী। সে যে এই মানুষেরই কোলাহলের জন্য, বালকবালিকার খেলাধূলার জন্য, লোকালয়ের আনাগোনা ও ঘরসংসারের জন্য মনে মনে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। ওখানে তাহার মন্দির-প্রতিষ্ঠা ঠিক হয় নাই, এই সংসারেই তাঁহার ঘরদুয়ার, বসতি।

এখন আমার এই রূপক কথার Moral এই যে, আপনারা সাহিত্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবেন না। এমন একটা বাস্তবিক বিচ্ছেদ কোথাও নাই। উদ্ভট শ্লোককার বলিয়াছেন---কালিদাস কবিতা নবং বয়ঃ মাহিষং দধি শর্করং পয়ঃ। এই যে বিরহী যক্ষের কাতর বেদনা, শকুন্তলার করুণ কাহিনী, রঘুবংশের উদার অন্বয়, দূর হিমালয়শৃঙ্গে হরগৌরীর মিলন-ব্যাপার, নিদাঘ বসন্তাদি ঋতুপরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব বর্ণনা—এই নানা রস সমন্বিত-কালিদাস কবিতার সঙ্গে শ্লোককার মহিষের দই ও চিনিপানাটুকু যোগ করিয়া দিয়া প্রকৃত অন্তর্দর্শিতা ও রসজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

আমার কথার এইখানে উপসংহার। এখানে আপনারা যাঁহাদের ক শুনিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সময় আমি আর নষ্ট করিব না। পরিশে আপনাদের ধন্যবাদ জানাইয়া, যিনি আমার প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া আজক ব্যাপারের সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, সেই উদারহৃদয় নাটোরে মহারাজকে শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীসুকুমার দত্ত।

আগমন।

বিশ্বজিৎ যজ্ঞশেষে নিঃস্ব "দেওদার"—
আকাশে চাহিয়াছিল রিক্ত কর জোড়ে,
পদতলে পুঞ্জীভূত ত্যক্ত তার পল্লব সম্ভার,
শীর্ণ পর্ণে পৃথ্বী ছিল ভরে ;
বর্ষ শেষ কাল সান্ধ্য ঝড়ে
শূন্য শাখে মুহুর্মুহু অতীতের ব্যর্থ হাহাকার,
কাতর করিয়াছিল ভবিষ্যের ভাসা আকাঙ্ক্ষার।

বিশ্ববন্ধু সমীরণ সর্ব্ববিশ্ব হ'তে
উদার দক্ষিণকর ভরি দক্ষিণায়,
ঝঙ্কারিয়া সাম গান আকাশের অবারিত পথে,
আলিঙ্গনে ঘেরিল তাহায়,
নিখিল আশ্বাস দিল গায়,
গেলনা বহুল দিন, দেখা দিল পরতে পরতে
ক্ষৌম শ্যাম পত্ররাজি, জাগাইল আনন্দ জগতে!

চলিল বিগত বর্ষ অজস্র ছড়ায়ে
চারিদিকে শ্লথ-বৃন্ত জীর্ণ সুখ ভার,
বর্ণ গন্ধ গীত শোভা অবিরাম ছিল যা জড়ায়ে
ঋতু রূপী প্রতি অঙ্গ তার,
আজি সব শুধু স্মৃতি সার!
চড়কের সন্ন্যাস নিশ্বাসে হায় অতীত বিদায়ে,
ভবিষ্য আসিছে হাসি, উদয়ের আলো সর্ব্ব গায়ে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

রোগশয্যার প্রলাপ।

(১২)

একদিন মনে হইল,—"আমাদের ইতিহাস নাই কেন? বেদ আছে, স্মৃতি আছে, পুরাণ আছে, দর্শন আছে, কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, গণিত, আয়ুর্ব্বেদ, সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রভৃতি যা' কিছু আবশ্যক, তা' সবই আছে আর তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রশংসনীয় অবস্থাতেই আছে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যাহাকে ইতিহাস বলেন, তেমন ইতিহাস নাই কেন?—ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, আমাদের রাষ্ট্রনীতি, দেশনীতি, সমাজনীতি, পারিবারিকনীতি এবং ব্যক্তিগতনীতি এমন ভাবে ধর্ম্মের সঙ্গে বিজড়িত, ধর্ম্মের শাসনে অনুশাসিত যে, উহার কোনটিরই উন্নতির জন্য তেমন ইতিহাসের প্রয়োজন আমাদের হয় নাই, আর হইতেছেও না। আমরা সৎ ও সত্যের এতটা পক্ষপাতী হইতে অভ্যস্ত হইয়াছি যে, আমাদের কাছে ব্যক্তি ও কালের অবচ্ছেদ আর মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। বেদ ও উপনিষদ্, পুরাণ ও স্মৃতিই আমাদের সকল ইতিহাস—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও নৈতিক ইতিহাসের স্থান পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, আর তাহাতেই ইউরোপীয় প্রথার ইতিহাস-বিশিষ্ট কোন জাতি অপেক্ষা আমাদের ঐতিহাসিক-শিক্ষার কোন তারতম্য হইতেছে না। আমাদের পুরাণ যদি 'কোন এক দেশের কোন এক রাজা কোন এক সময়ে এই সৎকার্য্য করিয়া বা এই অসৎকার্য্য করিয়া এইরূপ ফল পাইয়াছিলেন'—এইরূপ অস্থিত-পঞ্চকভাবে উপদেশ দেয়, আমরা তাহাতে কোন অভাব বা ক্ষুণ্ণতা মনে করি না! কার্য্যের ফলাফল লইয়া শিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হয়,—সেই ফলাফলটিই যখন জানিতে পারিলাম, তখন তাহা হইতে যাহা শিক্ষণীয় তাহাও জানিতে পারিলাম, সুতরাং সে ঘটনা কোথায়, কবে, কখন, কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই বা তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের কোন ইতরবিশেষ হইবেও না বলিয়া তাহা পুরাণকার যথাযথ রক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। শরণাগত-রক্ষার্থ শিবি রাজা আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন আর তার ফলে তাঁহার সদ্গতি হইয়াছিল, এইটুকুই লোকশিক্ষার বিষয়,—পুরাণ-কার ইতিহাস বলিয়া এই সত্যটুকুই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। রাজা শিবি চেদিরাজ ছিলেন, কি পাঞ্চাল রাজ ছিলেন, কি প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপ ছিলেন,

অথবা তিনি খৃষ্টের পাঁচ হাজার বা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বা পরে বর্ত্তমান ছিলে তাহার স্থির সিদ্ধান্ত রক্ষায় তাঁহারা আদৌ মনোযোগী হন নাই; লোকশিক্ষ সে তথ্যগুলি কোনই সাহায্য করিবে না বলিয়া তাহা রক্ষা করিবার কো আবশ্যকতাই অনুভব করেন নাই। পৃথুপুত্র বেণরাজার সময়ে বর্ণসঙ্কর জা সমূহের বৃত্তিবিধান ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং রাজদোষে বর্ণসঙ্কর জন্মাইয়া সমা বিপ্লব ঘটাইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উরুমন্থন দ্বারা তাহার প্রতীক ঘটাইয়াছিলেন,—রাজদোষে রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব ঘটে, এবং তাহ ফলাফল বর্ণনা করিয়া লোকশিক্ষায় ইতিহাসের যতটুকু প্রয়োজন, পুরাণক ততটুকুই রক্ষা করিয়া বেণরাজের রাজ্য ও কালাকাল সম্বন্ধে কোন কথ রক্ষা করেন নাই। পুরাণ ছাড়িয়া দিলেও আমাদের নিকটবর্ত্তী কালে ভারতীয় ইতিহাস রক্ষার ধারা আজিও ঐরূপই চলিয়া আসিতেছে। কা দাসের কাব্যই শিক্ষণীয় ও পঠনীয়; তিনি খৃষ্টের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে কি খৃ পর ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মিয়াছিলেন তাহা জানিবার আবশ্যকতা নাই বলি তাহার কোন সূত্রও রক্ষিত হয় নাই। আর এখনকার গবেষণা বলে যদি কে একটা বৎসর কালিদাসের জন্ম বা রঘুবংশ রচনার বৎসর বলিয়া সিদ্ধান্ত তবে কালিদাসের কাব্য-মহিমা যে কিছু বাড়িবে, বা রঘুর ন্যায় আদর্শ রাজ সৎকীর্ত্তি সম্বন্ধে আমরা আর কিছু অধিক জানিতে পারিব, তাহা নহে কেহ কাশ্মীরের মাতৃগুপ্তকেই কালিদাস বলেন, আর বাঙ্গালার বর্ণনায় কা দাসকে বিশেষ পক্ষপাত করিতে দেখা যা, বলিয়া কেহ তাঁহাকে বাঙালী প্রমাণ করুন, তাহাতে মারাঠা বা দ্রাবিড়ের লোকের শিক্ষার কিছু ক্ষ হইবে না। কাশ্মীর বা বাঙ্গালাদেশের লোক তাহাতে কালিদাসকে আমাদে বলিয়া গৌরব করিতে পারিবে বটে, কালিদাসের কাব্যাদিগত শিক্ষার পরিম যে কিছু বাড়াইতে পারিবে, তাহা নহে; বরং গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া একদি হয়ত গর্ব্বে অভিভূত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে। বৈদিক ঋ পৌরাণিক ঋষি মুনি, স্মৃতির ব্যবস্থাপক ঋষি মুনি কে বাঙালী, কে উড়িয়া, ে কাশ্মীরী কে খোরাসানী, কে আফগান, কে পারসীক, কে বেলুচি, ে সাইবিরীণ (তিলকের মতে), কে মঙ্গোলীয় (উমেশ বিদ্যারত্নের মতে ইউরোপীয় প্রণালীতে ঐতিহাসিক গবেষণা করিতে শিখিয়া, তাহা নিং করিবার জন্য আমরা এখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নর, দৈত্য, অসুর প্রভৃতি দেবযোনিদিগকে পুরাণমতে আ

আমরা স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, সত্যলোক, ব্রহ্মলোক, দেবলোকের অধিবাসী বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না, থিয়সফির দোহাই দিয়া ইংরাজীতে order of the 5th plane, order of the 7th plane বলিয়া না বুঝিলে তৃপ্তি পাই না; অথচ দুটাতেই তাঁহাদের লিখিত জ্ঞানোপদেশের যে কোন প্রসারতা হইতেছে তাহা নহে, যে তিমিরে, সে তিমিরেই আছি। তপস্যালব্ধ লোকালোকের জ্ঞান কেবল উপদেশে যাহা হইবার তাহার ইতর বিশেষ কি পুরাণ কি থিয়সফি, কিছুতেই হইতেছে না,—উভয়েই বলেন সাধনা কর, তপস্যা কর, বুঝিতে পারিবে। ভারতচন্দ্রও বলিয়া গিয়াছেন, "কথায় কে করে প্রত্যয়"—"করি দেখ বুঝিবে তখনি।" ইউরোপীয় ইতিহাসের দেশ-কাল পাত্র সাক্ষ্য-প্রমাণবদ্ধ ঘটনাবলীর শিক্ষাও যে পুরাণোক্ত ইতিহাসের শিক্ষা অপেক্ষা আর বেশী কিছু শিক্ষা দিতে পারে, তাহা ত বোধ হয় না। পুরাণ বলেন রাবণ অসাধারণ শক্তিবলে, দম্ভবলে সসাগরা ধরণী চুলায় যাউক ত্রিলোক জয়ও করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে পাপে, অহঙ্কারে, রাজশক্তির অপব্যবহারে সংবংশে ধ্বংস হইলেন। ইউরোপীয় ইতিহাসের আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় ও নেপোলিয়নের ইউরোপ জয়ের ব্যাপার হইতেও তাহার অতিরিক্ত আর কি অধিক শিক্ষণীয় বস্তু পাওয়া যায়, তাহাত বোধ হয় না। এই শিক্ষার জন্য তাঁহাদের দেশকাল পাত্রের সঠিক সংবাদ যে খুব একটা বেশী কার্য্যকর হয়, তাহা মনে হয় না। আলেকজাণ্ডার গ্রীক না হইয়া তুর্কী বা জিপ্‌সি এবং নাপোলিয়ঁ ফরাসী না হইয়া পারসী বা ভীল হইলে এবং একজন খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দী বা অপর জন খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীতে না জন্মিয়া হিন্দুর কল্পিত লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের সত্যযুগে জন্মিলেই তাঁহাদের দিগ্বিজয়, রাজ্য পালন, বীরত্ব, মহানুভবতা, দাম্ভিকতা, অত্যাচার, পৃথিবীব্যাপী বীরক্ষয় প্রভৃতির যে ইতিহাস আমরা আজ পাইয়া তন্মধ্য হইতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত শিক্ষা পাইতেছি, তাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইত, তাহা ত বুঝি না। দাশরথি রামচন্দ্র কবে ছিলেন, তাহা হিন্দু ও বর্ষমাস ধরিয়া দিন স্থির করিয়া বলিতে পারে না কিন্তু "রামের মত স্বামী হউক, লক্ষ্মণের মত দেবর হউক" এ প্রার্থনা এ শিক্ষা হিন্দু নারী ত আজও ভুলে নাই, "জয় রাজা রামচন্দ্র কি" বলিয়া তাঁহার মহত্ত্ব স্মরণে কোন হিন্দু কোন মাত্র অভাব বোধ করেনা, কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসে কত শত পরোপকারী সত্যব্রত আদর্শ পুরুষের আজন্ম-মরণের কার্য্যাবলী দিনমাসবৎসর ধরিয়া ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিলেও কই কেহ ত হিন্দুর ন্যায় তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া লইতে পারে নাই! তবে একটা

মনে হইতে পারে দেশকাল পাত্রের জ্ঞান থাকিলে কেহ কেহ মনে করে বিশ্বাসের মাত্রা অধিক এবং দৃঢ় হয়। ইহা কল্পনার কথা। উত্তর কাল বর্ত্তী লোকের পক্ষে পূর্ব্বকালবর্ত্তীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতী অন্য গত্যন্তর নাই। একজনের কথায় বিশ্বাস না কর, দশজনের কথায় বিশ্বা করিবে কি প্রকারে তাহা ত বুঝিয়া পাই না!—যুক্তি ত এই, দশজনেই কি মিথ্যা কথা বলিবে?—গ্রীকবীর হারকিউলিসের বীরত্ব-কাহিনী স কি মিথ্যা, পুরাণ-কল্পিত ব্যাপার কি না, তাহাই নির্ণয়ে ইউরোপীয় শিক্ষি সমাজ এখন ব্যস্ত, কারণ হারকিউলিসের ইতিহাস দেশকালের সীম দিয়া সংবদ্ধ করা নাই। বহুদূর অতীতকালে উল্লিখিত দেশকালের প্রতি অর্ব্বাচীন কালের লোকের যে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া আসে, ইহা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে প্রত্যহ যখন অনুভূত হইতেছে, তখন কোন দূর ভবিষ্যতে নাপোলিয়ের বিবরণও যে পৌরাণিক জল্পনার ন্যায় দেশকালপাত্র দ্বারা অবচ্ছিন্ন থাকিলেও অশ্রদ্ধা লাভ করিবে না তাহা কে বলিল? দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইউরোপে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হ না কি? সেরূপ দেশ কাল পাত্রের সাক্ষ্য প্রমাণের কথায় হিন্দুর যুক্তি এই যে লোক শিক্ষার্থে ইতিহাস পুরাণ রচনা করিতে বসিয়া সেই একজনেই কে মিথ্যা কথা বলিবে, এ সন্দেহই বা করি কেন? অকিঞ্চিৎকর বলিয়া একে ব্যবহার দেশকালপাত্রের সাক্ষ্য হিন্দু ত্যাগ করিয়াছে। আর মিথ্যা মিথ্যার কি শিক্ষা নাই?—এখনকার কালেও কি মিথ্যাবলম্বন শিক্ষা দেওয় হয় না! গল্প বলিয়া, ইন্দুর কাক বিড়ালের কথা বলিয়া শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা কি কল্পনামূলক মিথ্যা কথা নহে? এদেশের ধাতু গড়িয়া গিয়াছে, ইহার সারগ্রহণে পটু, সৎকথা বলিয়া দৃষ্টান্ত সহ যাহা উপদেশ দিবে, তাহাই ইহারা গ্রহণ করে। দৃষ্টান্তের প্রমাণ খুঁজিয়া এদেশের লোক অনর্থক শিক্ষার সময় নষ্ট করে না। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের রাজনাম-মালায় পুরাণে পুরাণে বিভিন্নতা দেখা যায়। তজ্জন্য হিন্দুর ইতিহাস শিক্ষায় কোন ক্ষতি হয় না নামমালার পৌর্ব্বাপর্য্য বা নাম-সমতায় শিক্ষার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়, হিন্দু তাহা মনে করে না। কোন রাজা কি সদসৎ কর্ম্ম করিয়া কি ফলাফল পাইয়া গিয়াছেন, তাহাই পৌরাণিক শিক্ষার লক্ষ্য। সেই ফলাফলের শিক্ষার উপরেই হিন্দু সমাজের গঠন নির্ভর করে। আদি প্রজাপতি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কোন রাজ-বংশাবলীর নামমালার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষায় ও তাহা

ছাত্রগণের অভ্যাস করার উপর কোন শিক্ষা নির্ভর করে না, হিন্দুর এইরূপ বিশ্বাস। এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় নব প্রকাশিত গৌড় রাজমালার একটা স্থান নজরে পড়িল। তাহাতে দেখিলাম,—আদিশূরের অস্তিত্বতেই গ্রন্থকারের সন্দেহ হইয়াছে। কেন না তাঁহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ এখনও দেশকালপাত্র দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া লোকচক্ষুর গোচরীভূত হয় নাই। সুতরাং বাঘ বকের গল্পের মত আদিশূরের ব্যাপারটাকে গল্প কথা বলিয়া উড়াইয়া দিলে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; কিন্তু আদিশূরের নামের সঙ্গে এদেশের বেদাচারভ্রষ্ট অবস্থায় যে অন্য দেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া দেশাচারের সংস্কার চেষ্টা, লোক শিক্ষার ব্যবস্থা, রাজোচিত প্রজাপালন শক্তির পরিচালন প্রভৃতি শিক্ষণীয় কথার সংশ্রব আছে, সেগুলা ত্যাগ করা ইতিহাসের পক্ষে উচিত কি না এবং ত্যাগ করিলে বাঙ্লায় ইতিহাস শিক্ষার ক্ষুণ্নতা আসিবে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? আদিশূরকে যতক্ষণ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক-বিজ্ঞান-বলে দেশকালপাত্রের দ্বারা অবচ্ছিন্ন করিয়া লইতে না পারিতেছি, ততক্ষণ তিনি নাই; কিন্তু তাঁহার নামে আরোপিত এই যে এক মস্ত সংশিক্ষার ব্যাপার বিজড়িত আছে, তাহা কি ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া অন্ততঃ বাঘ বকের গল্পের ন্যায় সদুপদেশ দিবারও অধিকারী নহে? ঐরূপ অবচ্ছেদের স্থান না থাকিলে, এতন্নিহিত শিক্ষাও কি ফলদায়িনী হইবে না?—এত ভাবিয়াও কি স্থির করিব বুঝিলাম না, কাজেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম এবমস্তু।

(১৭)

একদিন মনে হইল—"যখন সত্যযুগের চারিপোয়া ধর্ম্মের শৃঙ্খলা ত্রেতাযুগে ক্ষয়িত হইয়া তিন পোয়ায় এবং দ্বাপরে দুই পোয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর সেই সকল ভ্রষ্টাচার নিবারণের জন্য, পৃথিবীকে পাপভার হইতে মোচনের জন্য ভগবানকে যুগে যুগে অবতার হইয়া কত কাণ্ডকারখানা বাধাইতে হইয়াছে, এবং তাহা পুরাণকারের কথায় আমরা বিশ্বাস করিয়া মানিয়া আসিতেছি, তখন কলিকালের এই তিন পোয়া পাপের আক্রমণ জনিত ভ্রষ্টাচারের জন্য আমরা ক্ষুণ্ণ হইতেছি কেন? যে শাস্ত্রের কথায় সত্য ত্রেতা দ্বাপরের ইতিহাস বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, সেই শাস্ত্রেই যখন কলিকালের জন্য এই ভ্রষ্টাচার ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখন তাহা বিশ্বাস না করিয়া আমরা

ইহার জন্য এত বিমর্ষ হই কেন? তারপর সেই শাস্ত্রেই কলির ব্রাহ্মণ, কলির রাজা, কলির রমণী কেমন হইবে, তাহা যখন ভগবদ্বাক্যচ্ছলে পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার অন্যথা কল্পনা করি কেন? আমরা এ প্রথার পরিবর্ত্তন করিব, বেদহীন কলির ব্রাহ্মণকে বেদশিক্ষা দিয়া আবার সত্য-যুগ ফিরাইয়া আনিব, এ সকল কল্পনা করিয়া মস্তিষ্ক বৃথা পীড়িত করি কেন? ইহা দ্বারা কি আমাদের ভগবদ্বাক্য হেলন, ভগবদ্বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করা হয় না? তদ্ভিন্ন আর এক কথা আছে! ভ্রষ্টাচার ও পৃথিবীর পাপভার লাঘবের জন্য ভগবান নিজেই অবতার হইয়া সে কার্য্য সম্পাদন করেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে" কথাটা তাঁহারই শ্রীমুখ বিনির্গত; অতএব যাহার কার্য্য তাঁহারই জন্য রাখিয়া দিয়া আমরা যদি অনধিকারচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া সার্ষপ নিদ্রা ভোগ করি—বর্ণাশ্রমাচার সংস্থাপন পতিত জাতির উদ্ধার, বিধবা বিবাহ প্রচলন, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন, নিষিদ্ধ ভোজন বিচার, প্রভৃতি বড় বড় সামাজিক সংস্কারের কথায় নাচিয়া না বেড়াই, শাস্ত্রানুসারেই আমাদের কোন অকর্ম্ম করা হইবে না। ইহার নজীরও আছে। যে কলি-কালের সংস্কারের কথা আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি, সেই কলিকালের অবতার-সম্পর্কেই সে নজীর পাইয়াছি। কলিকালের বিষ্ণুর দুই অবতার—বুদ্ধ ও চৈতন্য। বুদ্ধকে পুরাপুরি অবতার বলিয়া হিন্দুসমাজ দশাবতারের শ্রেণীতে আসন দিয়া মানিয়া লইয়াছে, চৈতন্যের অবতারত্ব এখনও "হসংখেয়ার" মধ্যে দুলাইয়া রহিয়াছে। তা' থাকুক, তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে অর্থাৎ কলি সন্ধ্যার অর্দ্ধেক দিন যাইতে না যাইতে দ্বাপরযুগ ব্যবস্থা (দুই পোয়া ধর্ম্মও) যখন বেশ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে বুঝিতে পারা গেল, তখন বুদ্ধদেব আসিলেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বে যাহারা ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহারা পৃথিবীর ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া "সমাজ সংস্কারের" চেষ্টা না করিয়া ঋষি পত্তনে নিরালায় বসিয়া বুদ্ধদেবের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার পর যাহা করিতে হইল, তাহা বুদ্ধাবতার স্বয়ং আসিয়া করিয়াছিলেন। সেইরূপ চৈতন্যাবতারের পূর্ব্বে যাঁহারা "পাষণ্ডী জনার" অত্যাচারে উৎপীড়িত এবং ধরণীকে নিপীড়িত দেখিয়া ক্লেশানুভব করিতেন, সেই অদ্বৈত শ্রীবাস-চন্দ্রশেখরাদি গোপনে শ্রীবাসের বা অদ্বৈতের আঙ্গিনা কাঁদিয়া ভিজাইতেন। তাঁহারা তখনকার ম্লেচ্ছ-রাজের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা নিবারণ, গঙ্গাসাগরে পুত্রনিক্ষেপ, রাজপুতের কন্যাহত্যা, চড়ক

পূজায় বাণফোঁড়া প্রভৃতি সমাজের অনিষ্টকর কুসংস্কারগুলির সংস্কার কল্পনা করিয়া কোন আইন পাশ করাইবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। তাঁহারা প্রাণের ব্যথায় প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেন, আর ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিতেন। হইলও তাই; সেই চৈতন্য আসিয়া যাহা করিতে হয় করিয়া গেলেন। সে আজ ৫০০ বৎসরের অনধিক কালের কথা, তখনও কলির সন্ধ্যাকাল শেষ হয় নাই; অর্থাৎ তখনও দ্বাপরের ছায়া অতি ক্ষীণভাবে কোথাও কোথাও (একান্ন-বর্ত্তিতায়, পূর্ত্ত ও পৈত্র্য কার্য্যে, বর্ণধর্ম্মে এবং আরও কোন কোন ব্যাপারে) কিছু কিছু ছিল। তখন বোধ হয়, সেই জন্যই আমরা খোদার আইন নিজের হাতে গ্রহণ করি নাই। এখন কলিসন্ধ্যার ৫০০০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখন পুরা কলিকাল আসিয়া পড়িয়াছে। এখন পুরাদমে ভাগবতোক্ত ও তন্ত্রোক্ত তদৈব প্রবলঃ কলি দেখা দিয়াছে। তাই কি আমাদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে!

শ্রীরোগাতুর শর্ম্মা।

বালবিধবা।

বধির বিশ্ব চির নির্ব্বাক উদাসীন আজ ওরে,
মরণের পথে আঁখিজল তারা পাথেয় দিয়েছে তোরে;
তুই ক্ষুধার্ত্ত দগ্ধ প্রাণের করুণকাহিনী নিয়ে,
গলাতে কি চাস্ নিঠুর ধরার পাষাণে গঠিত হিয়া;
উল্লাসভরা কোলাহলঘেরা উৎসব মন্দিরে,
তোর ক্রন্দন পশেছে কি কভু কারো হৃদয়ের তীরে;
তুই চিরকাল ভিখারীর মত ভিক্ষার ঝুলি হাতে,
চলেছিস্ এই অন্ধ মত্ত জনতার সাথে সাথে;—
করুণা আর্দ্র নয়নে তাহারা চেয়েছে কি তোর পানে,
প্রাণে কি তাদের ব্যথা জাগিয়াছে বুক ফাটা দুখ গানে।
মানুষের সাথে সব বন্ধন ছিন্ন যে তোর আজ,
চুকায়ে দিয়েছে হিসাব নিকাশ বিশ্বের অধিরাজ!

হোথা যাস্‌নে কো এয়োতীনারীর মঙ্গল-শাঁখ বাজে,
আলোক পুলকে সজ্জিত অই শুভ উৎসব মাঝে;
পুরনারীদের হরষ মুখর মৃদু গুঞ্জন-তানে,
অকল্যাণের ছায়া আজ ওরে ফেলিস্‌ না কোনো খানে;
প্রলয় অনল গরল ঢালিয়া করিস্‌ না তারে কালো,
নিঃশ্বাসে তোর নিভে যাবে যেরে উৎসব জ্বালা আলো!

ক্ষণে ক্ষণে কেন চমকিয়া উঠি জাগাস ব্যাকুল ভীতি,
জীর্ণ প্রাণেরে সাড়া দিয়ে আজ জেগেছে সে কোন স্মৃতি—
মাঙ্গলিকের পুণ্যমন্ত্র চন্দন ধূপ-ধূম,
একদা এমনি মধুর নিশীথে ভেঙ্গেছিল তোর ঘুম,
মায়ার সোণার রঙ্গীন স্বপন মদির আঁখির কোণে,
গড়েছিল আসি দেবতার দূত সোহাগে সংগোপনে,
নব গৌরবে দেখা দিয়েছিল সারাটী বসুন্ধরা,
হরি' নিয়েছিল সোণার কাঠির পরশে প্রাণের জরা,—
সহসা প্রাণের শান্ত সাগরে কাল বৈশাখী ঝড়,
তোলপাড় করে দিয়ে চলে গেল ভেঙ্গে চুরে অন্তর!
দেবতা সে গেছে দেবতার পাশে চুপে চুপে চলে হায়,
তুমি আছ একা সঙ্গীবিহীন বিশ্বের আঙ্গিনায়!
সারা তনু তব অনলে দহিছে একি জ্বালা একি তাপ,
শূন্য পরাণে সঞ্চিত শুধু বিধাতার অভিশাপ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ।

ছোট গল্প। *

ছোট গল্প সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিবার ভার আমার উপর প্রদত্ত হইয়াছিল! তথা-কথিত, অতি অকিঞ্চিৎকর দুই চারিটি গল্প লিখিয়া যে পাপ করিয়াছি, তাহার জন্য যে এমন কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা ত জানিতাম না। কিন্তু সে কথা বলিবার সময় নাই—সভাপতি মহাশয়ের ঘড়ি ও ঘণ্টা কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে না।

যাঁহারা বড়, তাঁহারা বড় কথার আলোচনা করিতেছেন; আমি ছোট, তাই ছোট কথা লইয়া একটু বাগাড়ম্বর করি।

ছোট গল্প আমাদের দেশে নূতন একটা কিছু নহে; বেদ উপনিষদ পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাকুরমার ঝুলি ও ঠাকুরদাদার থলি, সকলের মধ্যেই ছোট গল্প যুক্ত ও নির্ম্মুক্ত ভাবে বিদ্যমান। তবে এখন ছোট গল্প বলিয়া যাহা জাহির হইয়াছে, তাহা উহারই মধ্যে একটু রকমফের, একটু পাশ্চাত্যগন্ধী।

এই রকমফের ছোট গল্প কোথায়, কোন্ সাত সমুদ্র তের নদীর পারে প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার ঠিকুজি বা কুলপঞ্জী লইয়া বাদানুবাদ আমার পক্ষে শোভা পায় না, তাহা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার বিষয়ীভূত। তবে বংশলতা না দেখিয়াও এইটুকু বলিতে পারি যে, ফরাসী দেশে ছোট গল্পের যথেষ্ট বংশবৃদ্ধি হইয়াছিল; কারণ অনেক ফরাসী ছোট গল্প ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইয়া আমাদের দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং এখনও পৌঁছিতেছে। এখন ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ইটালি, সুইডেন, নরওয়ে ডেনমার্ক প্রভৃতি সকল দেশেই ছোট্ট গল্পের চাষ আবাদ হইতেছে।

এই গোষ্ঠীর ছোট গল্প কবে এ দেশে আমদানী হইয়াছে, তাহার সন তারিখ না বলিতে পারিলেও মোটামুটি একটা কথা হয় ত বলিতে পারি। আমার যেন মনে হইতেছে, 'সাহিত্য'-সম্পাদক মনস্বী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় ইহা সর্ব্বপ্রথম মাসিকপত্রের হাটে আমদানি করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রে তাঁহারই লিখিত 'প্রাইভেট টিউটর' এই রকমফের ছোট গল্পের অগ্রদূত। সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সেই 'কাবুলীওয়ালা' হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত এই ক্ষেত্রে সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে সর্ব্বপ্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন। সাপ্তাহিক পত্রিকায়ও

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহীর অধিবেশনে পঠিত

ইহার পূর্ব্বে ত একটী ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার যেন মনে হয়, 'হিতবাদী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে সর্ব্বপ্রথম ছোট গল্প লেখেন।

সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী এনড্রু ইউল কোম্পানী যেমন প্রথমে বিনামূল্যে পরে অল্পমূল্যে চায়ের পেয়ালা দিয়া আমাদের দেশটাকে ভীষণ চা-খোর করিয়া তুলিয়াছেন, সমাজপতি ও রবীন্দ্রনাথও তেমনই বার্ষিক দুই টাকা কি তিন টাকা ছয় আনা লইয়া প্রথমে 'সাহিত্য,' 'সাধনা' ও 'ভারতী'র মারফৎ ক্রমাগত ছোট গল্প জোগাইয়া এখন দেশটাকে ভীষণ ছোটগল্পখোর করিয়া তুলিয়াছেন। এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে একেবারে ছোট গল্পের জোয়ার আসিয়াছে। এই জোয়ারের টানে অনেকে ডিঙ্গে পানসী বজরা প্রভৃতিতে পা'ল তুলিয়া দিয়া জাহির হইতেছেন।

আমার যেন মনে পড়ে 'সাহিত্য'-পত্রেই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় গি দে মোপাঁশার ছবি ও জীবনকথা প্রকাশিত হয়; এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও সুহৃদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ওরফে বীরবল মহাশয় সর্ব্বপ্রথম মোপাঁশার একটী গল্পের অনুবাদ করিয়া 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত করেন। বীরবলের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পরলোকগত বন্ধু ও সাহিত্য সখা নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় মো পাঁশার ও অন্যান্য লেখকের ছোট গল্পের অনুবাদ 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত করেন। তাহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক অনুবাদ চলিতেছে; কেহ বা অনুবাদ স্বীকার করেন, কেহ বা বলেন ছায়া অবলম্বনে লিখিত, কেহ কেহ বা বলেন আদি ও অকৃত্রিম—একেবারে ওরিজিনাল।

একটি কথা এখানে না বলিলে চলিতেছে না। এখন যে সকল সত্তর আশি পৃষ্ঠা ব্যাপী গল্প ছোটগল্প বলিয়া চলিতেছে, তাহাই যদি ছোটগল্পের প্রকৃত আয়তন বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আমাকে বলিতেই হইবে যে, আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিক হয় নাই। তাহা হইলে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের যুগলাঙ্গুরীয়ক, রাধারাণী, মধুমতী; দামোদর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত প্রবাহ পত্রে জয়চাঁদের চিঠি, তারকনাথ বিশ্বাসের গল্পগুলি বাঙ্গালা ছোট গল্পের আদি ও অকৃত্রিম।

কিন্তু আমি ও সকল কথা বলিতে বসি নাই; এবং আমি যাহা বলিলাম তাহাই যে একেবারে নির্ভুল, তাহাও বলিতে পারি না; স্মৃতির সাহায্যে যতটুকু পারিলাম, তাহাই বলিলাম। বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের নির্দ্দেশ করাই আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ, গল্প জিনিষটা বলিতে এই বুঝা যায় যে, উহা কোন সম্ভবপর ঘটনা-বৈচিত্র্যের বিবৃতি। উহা সত্য ঘটনার ইতিবৃত্ত নহে; তবে উহা যে ঘটনার বিবৃতি, স্বাভাবিক অবস্থায় সে ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। সিন্ধবাদ নাবিকের সমুদ্রযাত্রা, বা চীন রাজকুমারীর রাতারাতি বোগ্‌দাদ গমন, আমার এই সিদ্ধান্ত মতে গল্প নহে, আজগুবি একটা কি যেন!

ঘটনার আলোচনা করিতে হইলে অবশ্য ঘটকের সন্ধান লওয়া দরকার; ঘটকের আকার প্রকার, মনোভাব এবং কর্ম্মকাণ্ডের বিবৃতি আবশ্যক। তাহা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর বা জ্ঞানগোচর অনুভূতি হইতে যতই তফাৎ হউক না কেন, একেবারে আজগুবি না হইলেই হইল। মানুষ যাহা চিন্তা করিতে পারে, বলিতে পারে, করিতে পারে, তাহা উপরিউক্ত ঘটকগণ করিয়াছেন কি না, তাহাই দেখিতে হইবে। গল্পের সাফল্য সেইখানেই, যেখানে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পরম্পরা এবং ফল হইতে অনুষ্ঠাতার চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অসামঞ্জস্য গল্পের মারাত্মক ব্যাধি; বলা বাহুল্য আমরা অনেকেই এখন এই ব্যাধি-প্রপীড়িত।

বড় গল্পের সঙ্গে ছোট গল্পের পার্থক্য অনেক। প্রথমতঃ বড় গল্প কেবল একটা ঘটনার অথবা ঘটনাসমষ্টির ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিয়া বৈচিত্র্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রায়শঃই ইহার মধ্যে বহুজনের এবং বহু অনুষ্ঠানের ঘাতপ্রতিঘাত জনিত জটীলতার সৃষ্টি হয় এবং তাহার বিশ্লেষণও পরিদৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, ইহাতে মুখ্য ও গৌণভাবে বহু ব্যক্তি, বহু ভাব ও বহু ঘটনার সমাবেশ করিতে হয়, ইত্যাদি----

ছোট গল্পের আকার যেমন ছোট, ইহার উজ্জ্বলতাও তেমনই প্রখর। প্রধানতঃ ছোট গল্পে কোন একটি ঘটনা, কোন এক জোড়া নায়কনায়িকা বা ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কিত কোন একটামাত্র ব্যাপারের ব্যাখ্যা। উহাতে আগের বা পরের কোন কথাই নাই—তাহার আবশ্যকতাও নাই। উহা ঠিক গভীর রজনীতে পুলিশ সার্জ্জনের চোরা লণ্ঠনের তীব্র আলোকের দ্বারা আলোকিত স্থান-বিশেষের ন্যায়। পাঠকের মন কেবল সেই আলোকিত স্থানেই নিবদ্ধ হয়, এবং তাঁহার চিন্তাতরঙ্গ তাহারই চারিধারে অন্ধকারের মধ্যে নাচিতে থাকে।

ছোট গল্প লেখার মধ্যে কায়দা, ভঙ্গী, কলা অর্থাৎ Art বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। গল্প বড়ই হউক আর ছোটই হউক, উহা সাহিত্য হওয়া চাই ই। সাহিত্য হইতে হইলে উহা লিখনভঙ্গীর (style) উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে।

আর নির্ভর করে আখ্যানবস্তুর পরিণতির নির্দ্দেশের উপর, অর্থাৎ ইংরাজীতে বলিলে বলিতে হয় indication of i's development by way of suggestion. ছোট গল্পের কায়দা বা কলা বা art বহু পরিমাণে তাহার মধ্যের কথোপকথন অংশের উপর নির্ভর করে। লেখক নিজে লম্বা বক্তৃতা দ্বারা কথাটা বুঝাইবার নিস্ফল চেষ্টা না করিয়া তিনি গল্পোক্ত ব্যাক্তিগণের মুখে যে পরিমাণ কথা বসাইতে পারিবেন, সেই পরিমাণে গল্প সুন্দর হইবে এবং তাহার আর্টও পরিস্ফুট হইবে। কিন্তু গল্পোক্ত বক্তিগণের মুখে যে সে কথা বসাইলেই হইবে না; তাহা হইলে ত একেবারে মাটি। যত কথা বলাইতে হইবে সব কথার সম্পূর্ণ সার্থকতা চাই।

আমাদের দেশে অল্প তুই চারিজন ব্যতীত যে ভাল গল্পলেখক জন্মিতেছে না, অথচ ঝুড়ি ঝুড়ি ছোট গল্পের আমদানী হইতেছে, তাহার কয়েকটি কারণ আছে। আমার সামান্য বিবেচনায় মনে হয় যে, আধুনিক বাঙ্গালা গল্পলেখকগণ সাহিত্য তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করেন না; তাঁহারা ছোট গল্পের স্বভাব উপলব্ধি করেন না; আর তাঁহাদের চারিদিকে ঘিরিয়া ছোট গল্পের যে সকল উৎকৃষ্ট উপাদান রহিয়াছে, তাহা হইতে সম্পদ আহরণ করেন না, অর্থাৎ তাঁহারা চক্ষু চাহিয়া দেখেন না। তাহার ফল এই হয় যে, তাঁহারা গল্প লিখিতে বসিয়া কল্পিত নরেন্দ্রনাথ ও কমলিনীর প্রণয় ব্যাপারটা কিরূপ ঘটা তাঁহাদের কল্পনা অনুসারে উচিত ছিল, তাহারই সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ দার্শনিকতাপূর্ণ ও ভাবপ্রবণ মন্তব্য লিখিয়া পাঠকের সম্মুখে খাড়া করেন।

আমাদের এই সকল বিড়ম্বনা দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, এখন যে সমস্ত ছোট গল্প বাহির হয় তাহা ছোট হইতে পারে, কিন্তু গল্প নহে—ছোট গল্প ত নহেই। ছোট গল্প সম্বন্ধে আমার এই অতি ছোট প্রবন্ধটিকে সকলে আমার কবুল জবাব বলিয়া গ্রহণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

সভাপতি মহাশয়ের ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই আমার ঢক্কা নিনাদের মধুরতা আপনারা উপভোগ করুন।

শ্রীজলধর সেন।

ক্ষণ মিলন।

আলোক প্লাবনে ভাঁটা পড়ে আসে
দিবস পিছায়ে পড়ে,
নয়ন ভুলাল শ্যামল ধরণী
ধূসর বরণ ধরে'!

দিবস নিশার সন্ধি নিমেষে
স্তিমিত আলোক পথে,
ক্ষণিকের দেখা, চলে গেলে হায়
আঁধারে, আলোক হ'তে!

প্রভাত উদয়ে আলোক জোয়ার
ভুবন ভরিবে যবে,
তোমার বিদায় নয়ন তিমির,
মরমে জাগিয়ে রবে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

সামাজিক সমস্যা।

লৌকিকতা।

"লৌকিকতা" কথাটা আমাদের সমাজে কি অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা আর বোধ হয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। হিন্দু সমাজের সকলেই এই লৌকিকতার সঙ্গে ভালরূপেই পরিচিত আছেন। তবে ইহাকে সামাজিক সমস্যার অন্তর্গত করা হইল কেন, এটা কাহারও কাহারও নিকট একটা সমস্যার মত বোধ হইতে পারে বটে কিন্তু, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন হইবে না।

লৌকিকতাটা আমাদের প্রাচীন সামাজিক প্রথা সমূহের অন্যতম। বহুকাল হইতেই ইহা সমাজ-শরীরে আশ্রয়লাভ করিয়া বাঁচিয়া আছে। এখন এই আশ্রয় হইতে ইহাকে বিচ্যুত করিবার জন্য, লৌকিকতাকে এরূপে সমাজ

হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য এক দলের চেষ্টা হইয়াছে। সুতরাং এটা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই কি? সমাজে ইহা থাকাই উচিত, অথবা ইহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদই বাঞ্ছনীয় কিংবা ইহার প্রাচীনত্ব হেতু, যে সব দোষ ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে সে গুলিকে যথাসম্ভব বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া ইহার সংস্কার সম্পাদনই সমীচীন এই কথাটা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক নয় কি? আজকাল অনেক সময় মুদ্রিত নিমন্ত্রণ-পত্রের এক কোণে "লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম" এইরূপ একটা বাক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা এইরূপ ভাবে লৌকিকতার হাত হইতে মুক্তি পাইতে চাহেন তাঁহারা যে, লৌকিকতা গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন, একথাটা না বলিলেও চলে।

পূর্ব্বে এইরূপ কথা উঠিত না—পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ পত্রেও এরূপ কোন কথা লেখা থাকিত না। এইরূপ লৌকিকতা করার নিষেধ বিধিটা অতি অল্পদিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে, অবশ্য এখনও ইহার প্রচলন তাদৃশ বিস্তৃতিলাভ করে নাই। কিন্তু প্রচালকগণ ইহার প্রচলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন ইহা ধরিয়া লইতেই হইবে। সেই আবশ্যকতাটা কি, তাহা নির্ণীত হওয়াই প্রথম কর্ত্তব্য। কারণ, সেই কারণটা পাওয়া গেলেই তাহার উপর বিচার বিবেচনা করিবার সুবিধা হইবে।

আমরা যথাসাধ্য ক্রমে ক্রমে তাহা এবং এতদানুসঙ্গিক আর আর শাখা-পল্লবের বিষয় আলোচনা করিয়া এ সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা পাইব।

আমি ক্ষুদ্রব্যক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তিও আমার অতি সামান্য—তবে এই সব বিষয় লইয়া অনেকদিন ধরিয়া মনে মনে আলোচনা ও আন্দোলন করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই আমি নিবেদন করিব। যদি তাহাতে ভ্রম প্রমাদ থাকে তবে সুধীগণ কৃপাপূর্ব্বক তাহা প্রদর্শন করিলে কৃতার্থ হইব।

হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের (বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাত কর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন) মধ্যে বিবাহ, অন্ন-প্রাশন, উপনয়ন এই তিন সংস্কারের সময় এবং স্থল বিশেষে সময় সময় শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ার কালে আমন্ত্রিত আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ কর্ম্মকর্ত্তাকে কিছু কিছু সাহায্য দান করেন, ইহাকেই আমরা লৌকিকতা বলিয়া থাকি। শারদীয়া পূজা কি ঐরূপ বৃহৎ কোন পূজার্চ্চনার উপলক্ষেও স্থল বিশেষ যে প্রণামী দান করা হয় তাহাকেও একরূপ লৌকিকতাই বলা যাইতে পারে। তবে এই প্রণামী দান প্রথাটা

সর্ব্বদেশে সকল সমাজে সেরূপ প্রচলিত নাই। কিন্তু উক্ত ত্রিবিধ সংস্কার উপলক্ষে লৌকিকতা বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। বাঙ্গালাদেশ ভিন্ন অন্যান্য দেশেও যে একেবারে নাই তাহা বলিতে পারি না। তবে স্থানে স্থানে প্রণালীটা ভিন্নরূপ। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ বঙ্গদেশের প্রচলিত প্রথা লইয়াই আলোচনা করিব।

এই সব লৌকিকতাতে যে সর্ব্বদাই নগদ টাকাই দেওয়া হয় এমন নহে, বস্ত্র, অলঙ্কার, মিষ্টদ্রব্যাদিও স্থল বিশেষে প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিবাহব্যাপারে অনেক সময়ই বস্ত্র ও মিষ্ট দ্রব্যাদি দ্বারাই লৌকিকতা করা হয়। পুত্রের বিবাহ স্থলে, বধূর মুখ দর্শনী বাবদ লৌকিকতা প্রায়ই টাকা দিয়াই রক্ষা করা হইয়া থাকে। এইরূপ সব কার্য্যে আত্মীয় বন্ধুগণের উপহার প্রদান অথবা লৌকিকতা বিলাত প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। যাহার যেরূপ সাধ্য সে সেইরূপ ভাবেই এ লৌকিকতা রক্ষা করিয়া থাকে। সে সব দেশে জন্মদিন, খ্রীষ্টমাস্ প্রভৃতি উপলক্ষে এইরূপ উপহার প্রদান করা হইয়া থাকে ইহা অভিজ্ঞগণ জ্ঞাত আছেন।

আবার আমাদের দেশে আর একরূপ লৌকিকতাও আছে তবে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ন্যায় দরিদ্রগণের সে লৌকিকতার ভার বহন করিতে হয় না। কিন্তু দেশের মহারাজা, রাজা, জমিদার প্রভৃতি বড় লোকগণকে সময় সময় তাহার ভার বিশেষরূপেই বহন করিতে হয়—সেটা এ দেশস্থ ইয়ুরোপীয় পদস্থ লোকদিগের পুত্রকন্যা প্রভৃতির অথবা নিজেদের বিবাহের লৌকিকতা; সময় সময় তাঁহাদের গৃহিনীগণের ঐ সব বড়লোকদিগের বাড়ীতে পদধূলি প্রদান উপলক্ষে লৌকিকতা। এ সব লৌকিকতা দু চারি টাকাতে হইবার নহে, দু দশ হাজার ব্যয় করিতে হয় বলিয়া শুনিয়াছি, আর এ লৌকিকতার একটু বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রতি লৌকিকতার আশা বড় কিছু নাই তবে সস্মিত শুষ্কগর্ভ মৌখিক ধন্যবাদ কে যদি প্রতি লৌকিকতার স্থলাভিষিক্ত করা যায় তাহা হইলে সে ভিন্নকথা।

যাহা হউক আমাদের সমাজে যে এই প্রথাটা বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে ইহার উৎপত্তির মূল কারণটা কি?

প্রাচীন সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া সমাজে ইহার প্রচলন করিয়াছিলেন? সমাজকে পীড়িত করিবার উদ্দেশ্যেই যে তাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। কারণ ইহা সমাজের প্রত্যেক

ব্যক্তির উপরই সমভাবে প্রযোজ্য সুতরাং কাহারও ইহার হাত হইতে মুক্ত থাকিবার উপায় ছিল না। এরূপক্ষেত্রে তাঁহারা নিজকে পর্য্যন্ত পীড়িত করিবার অভিপ্রায়ে সমাজ-শরীরে এই ক্ষত উৎপাদন করিয়াছিলেন এরূপ ধারণা সমীচীন নহে।

নিশ্চয়ই তাঁহারা সমাজ স্থিতি কল্পে, ইহার একটা প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াই ইহার প্রচলন করিয়াছিলেন—সমাজের উৎসাদনের জন্য নহে। হইতে পারে, তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত, বর্ত্তমান অর্থনীতি ও সমাজ নীতির হিসাবে তাঁহাদের ব্যবস্থা দূষনীয় বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য মন্দ ছিল, ইহা আমরা কখনই বলিতে পারি না।

তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যটি কি, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিয়া তাহার পরে তাঁহাদের ব্যবস্থার গুণাগুণ বিচারের প্রয়াস পাইব।

আমি এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে পারস্পরিক সাহায্যের উদ্দেশ্যেই এই লৌকিকতার প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। আজকাল যে Co-operative credit-এর উপকারিতার বিষয় জনগণকে নানা উপায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইতেছে, এই লৌকিকতাটাও অনেকটা সেই ভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দেশে আজকাল প্রভিডেণ্ট কোম্পানির অভাব নাই; বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহের উপায়ের জন্য এই সব প্রভিডেণ্ট কোম্পানির প্রতিষ্ঠা। তাহাতে চাঁদা প্রতিমাসে দিতে হইবে তারপর বিবাহাদির সময় উপস্থিত হইলে, প্রদত্ত চাঁদার দ্বিগুণ, বা ত্রিগুণ, কি ঐরূপ একটা মোটা রকমের টাকা পাওয়া যাইবে।

এই লৌকিকতার প্রথাও নীরবে, এইরূপ প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের কাজ অনেকটা করিয়া থাকে। আমার কন্যার বিবাহে হাজার টাকার প্রয়োজন, আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা সেই ব্যয় সংকুলানের জন্য প্রত্যেকে সাধ্যমত আমাকে সাহায্য করিয়া লৌকিকতা রক্ষা করিলেন; আমি এই খরচের সময় কিছু টাকা এইরূপে একত্রে পাইলাম, তাহাতে আমার ব্যয়ভার একটু যেন লাঘব হইল। আবার তাঁহাদের এইরূপ কার্য্যের সময় আমি সাধ্যমত তাঁহাদের সাহায্য করিব। এইরূপ পারস্পরিক সাহায্য এই লৌকিকতা প্রথার দ্বারা হইয়া থাকে; এই উদ্দেশ্যেই এ প্রথার প্রবর্ত্তনা হইয়াছে।

কোন কোন প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে নিয়ম আছে যে, নিয়মিত চাঁদা ব্যতীত প্রত্যেক বিবাহের উপর প্রত্যেক মেম্বরকে একটা নির্দ্দিষ্ট অতিরিক্ত চাঁদাও দিতে হয়।

আবার যাহার বিবাহের জন্য চাঁদা দিতেছি বিবাহের পূর্ব্বে যদি তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে প্রদত্ত চাঁদার কতকাংশ মাত্র ফেরৎ পাওয়া যায়।

কোন কোন ফ্যামিলি প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের নিয়ম আছে, যে মনোনীত ব্যক্তির পূর্ব্বেই মৃত্যু হইলে, প্রদত্ত চাঁদার কিছুই ফেরৎ পাওয়া যায় না।

আমাদের এই লৌকিকতার অন্তরালেও প্রচ্ছন্ন ভাবে ইহাদের কতকটা দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজে এমন লোক আছেন, যাঁহার বিবাহ দিবার, কি অন্নপ্রাশন দিবার কেহই নাই। তাঁহাকেও লৌকিকতা রক্ষা করিতে হয়; কারণ তিনিও ত সমাজের একজন বটে! এরূপ স্থলে তিনি পরার্থে স্বার্থত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অথচ তিনি দুঃস্থ হইলে আর আত্মীয় স্বজনের সংখ্যা বেশী হইলে এজন্য তাঁহাকে সময় সময় বড় বেগ পাইতে হয় সন্দেহ নাই সে বিষয়ের বিচার ও আলোচনা পরে করা যাইবে। তবে অনেক সময় দুঃস্থকেও বাধ্য হইয়া সরকারী চাপে voluntary c ntribution অথবা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা দানের ভাণ করিতে হয়। ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। মনিবের চাপে যদি হললম্ কি কামস্কাট্কার লোকদের সাহায্যের জন্য চাঁদা দেওয়া চলে, তবে সমাজের নিয়মে আপন আত্মীয় বন্ধুর ক্রিয়াকলাপে মধ্যে মধ্যে এরূপ লৌকিকতা করাটাই বা না চলিতে পারে কেন? যাহা হউক আসল কথাটা এই যে, এইরূপ পারস্পরিক সাহায্যের উদ্দেশ্যেই এই লৌকিকতা প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা বিনা বিজ্ঞাপনে, বিনা নিয়মাবলীর মুদ্রিত তালিকাতে কতকটা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। অবশ্য একথা ঠিক, যে একজন লোকের কতই আত্মীয় স্বজন থাকে আর তাঁহারা কতই টাকা দেন, যে তদ্বারা বিশেষ একটা সাহায্য হইতে পারে। কিন্তু ইহার অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন স্নেহ-মমতার একটা গ্রন্থির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেইটার মূল্য অনেক বেশী—তাহা অমূল্য! আমার আত্মীয় এই কার্য্য করিতেছেন, আমি তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আমার সামর্থ্যানুরূপ সাহায্য করিতেছি, এই যে, একটা আপনাআপনির ভাববন্ধন, ইহাই সমাজবন্ধন দৃঢ়তর করে এবং সমাজের নিরপেক্ষ ভাব ঘুচাইয়া তথায় সাপেক্ষের ভাব প্রতিষ্ঠিত করে। সমুদ্র-বন্ধনে সামান্য কাষ্ঠবিড়ালীর নগণ্য সাহায্যও যেমন ভগবান কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিল এইরূপ ক্ষেত্রেও বন্ধুগণের, আত্মীয়স্বজনের স্বেচ্ছাকৃত দান তাঁহাদের হৃদয়স্থিত মঙ্গলাশীষধারায় স্নাত হইয়া অপূর্ব্ব গৌরবমণ্ডিত ভাবে প্রতিভাত হয়। এইজন্যই তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মদর্শী প্রাচীন সামাজিকগণ এই পারস্পরিক সাহচর্য্যের ভাবপ্রাণোদিত হইয়াই যখন এই লৌকিকতা প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের উদ্দেশ্য কেমন করিয়া আমরা নিন্দনীয় বলিতে পারি? ইহার দ্বারা অন্যের কার্য্যে নিজের একটা মমত্বভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে! যাঁহারা আত্মীয়স্বজন কেবল তাঁহারাই, এই লৌকিকতা রক্ষা করেন, প্রত্যেক নিমন্ত্রিতকেই তাহা করিতে হয় না। সুতরাং যাঁহারা এই লৌকিকতা রক্ষা করেন, তাঁহাদের মনে কর্ম্মকর্ত্তার সহিত একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠতার ভাব উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে সাধারণ নিমন্ত্রিতগণ হইতে পৃথক করিয়া দেয়—তাঁহারা সেই বাড়ীরই একজন এইরূপ একটা মমত্বভাব, তাঁহাদের মনে জাগরিত হয় এবং তাঁহারা বিশেষভাবে কর্ম্মকর্ত্তার কার্য্যের সুসম্পাদনের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং প্রথাটিরমূলে উদ্দেশ্য অসৎ নহে মহৎই বলিতে হয়।

অনেকস্থলে দুঃস্থ আত্মীয়ের বাটীতে এইরূপ কোন ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত হইলে, অর্থশালী অন্য আত্মীয় তাঁহাকে কোন একটা অলঙ্কার, পরিচ্ছদ, শয্যা কি এইরূপ কোন জিনিস দ্বারা লৌকিকতা করিয়া তাঁহার ভার অনেকটা লঘু করিয়া দেন; এবং পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মকর্ত্তাকে সে বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন, ইহাতে প্রকৃত সমবেদনা জানান হয়। আবার কর্ম্মকর্ত্তা স্বয়ং সম্পন্ন ব্যক্তি হইলেও সামাজিক নিয়মে তাঁহাকে মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র আত্মীয়ের নিকট হইতে লৌকিকতা গ্রহণ করিতে হয়, তদ্দ্বারা তাঁহার মনে অহঙ্কারের ভাব আসিতে পারে না। তিনি বড়লোক বলিয়া দরিদ্র আত্মীয়ের এ সাহায্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রতি লৌকিকতা স্থলে প্রদত্ত অর্থের বা অন্য যৌতুকের দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ প্রদান করিয়া দরিদ্র আত্মীয়েরও সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয়বত্তার ভাব প্রকটিত হয়। তৎপরিবর্ত্তে যদি ঐরূপ সম্পন্ন কর্ম্মকর্ত্তা লৌকিকতা গ্রহণ না করেন, তাহাতে তাঁহার একটা উপেক্ষার ভাব ফুটিয়া উঠে—তিনি সমাজের নিকট, নিজ আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পান না—এই ভাবটাই উক্তরূপ ব্যবহারে প্রকটিত হয়। আমাদের সমাজ, মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থের উপরে নহে। হিন্দুর সমাজে প্রত্যেক শ্রেণীর, যে সব নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী আছে সেই সেই শ্রেণীর অন্তর্গত ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই একই বন্ধনে আবদ্ধ। সামাজিক হিসাবে যাঁহাদের কুল মর্য্যাদা অধিক, তাঁহারা যতই দরিদ্র

হউন না কেন, সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাদেরই আসন সকলের চেয়ে উচ্চে। সুতরাং এইরূপ সামাজিক ব্যাপারে দরিদ্র আত্মীয়কে ছাঁটিয়া ফেলিবার উপায় নাই। যদি তাহা করা যায়, তবে অপযশ ভিন্ন আর কিছু লাভ হয় না।

লৌকিকতার আদান প্রদান ব্যাপারে এই সামাজিক বন্ধনের চিত্রই আমরা দেখিতে পাই, এবং ইহার মধ্যে সমবেদনা ও স্নেহের শুভ্র হাস্যচ্ছটাই প্রতিভাত। অতএব ইহাকে একেবারে সমাজবক্ষ হইতে বিদূরিত করা আমরা সমর্থন করিনা—কোন দেশেই বোধ হয় তাহা সমর্থন করিবে না।

তবে যদি ইহার অপব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার সংশোধন অবশ্যই বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই।

সময় সময় আমরা দেখিতে পাই, যে লৌকিকতার তারতম্য অনুসারে খাতির যত্নের, ইতর বিশেষ করা হয়।

যে আত্মীয় লৌকিকতা করিতে অপারগ তাঁহাকে যেন কিছু সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয় এবং তাঁহাকে যেন অনেকে কৃপার চক্ষে দৃষ্টি করে; এটা যে সঙ্গত নহে তাহা আর বেশী করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন করে না। যাঁহারা প্রকৃত মনস্বী সেরূপ ব্যক্তি কখনই এরূপ করিবেন না, ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। যদি কোথাও ঐরূপ ইতর বিশেষের অনুষ্ঠান হয় তাহা হইলে সর্ব্ব প্রযত্নে তাহা পরিত্যাজ্য।

অনেকস্থলে লৌকিকতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিলৌকিকতা করার প্রথা আছে। একজনের পুত্রের বিবাহে, অন্য একজন লৌকিকতা করিলেন, কর্ম্মকর্ত্তা আবার তৎপরিবর্ত্তে বস্ত্রাদি দ্বারা আত্মীয়কে সংবর্দ্ধিত করিলেন। যে স্থলে কর্ম্ম-কর্ত্তা সম্পন্নব্যক্তি সে স্থলে ইহাতে কোন কষ্টের কারণ নাই। কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা দরিদ্র হইলে এইরূপ প্রতিলৌকিকতা করাতে তাঁহাকে বেশী দায়গ্রস্ত হইতে হয়, আর লৌকিকতার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিপরীত কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ সব ক্ষেত্রে কর্ম্মকর্ত্তার লৌকিকতার বিনিময় না করাই সঙ্গত। তাঁহাকে আত্মীয়গণের বাটীর ভবিষ্য ক্রিয়াকলাপের অপেক্ষা করিতে হইবে। যখন সেরূপ ক্ষেত্র উপস্থিত হইবে তখন তিনি তাঁহার সাধ্য মত লৌকিকতা রক্ষা করিবেন।

যেখানে লৌকিকতা নাই, সেখানে প্রতিলৌকিকতাও নাই সমাজের এই পদ্ধতিতে সূচিত হয় যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণের মধ্যেই লৌকিকতার ব্যবহার প্রচলিত। নতুবা যেখানে সামাজিকতা নাই, সেখানে লৌকিকতার প্রয়ো-

জনীয়তাও নাই। কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে স্বসমাজের বহির্ভাগেও অনেককে এইরূপ লৌকিতা রক্ষা করিতে হয়, তাহা অনেক সময়ই এক তরফা হওয়াতে দাতার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে। একটা দৃষ্টান্তদ্বারা কথাটা বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।

এক জেলার উপর একজন লোক একাকী কর্ম্ম উপলক্ষে বাস করেন। তাঁহার বেতন সামান্য ৪০।৫০ টাকা, কিন্তু কর্ম্মসূত্রে জেলার উকীল মোক্তার জজ মুনসেফ প্রভৃতি পদস্থ লোকের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। সুতরাং ঐ সব ব্যক্তির বাটীতে কোন শুভকার্য্য উপলক্ষে তাঁহারও নিমন্ত্রণ হয়। এখন ঐ ভদ্র লোককে যদি প্রত্যেক নিমন্ত্রণ লৌকিকতার সহিত রক্ষা করিতে হয় তবে গড়ে মাসে ৪।৫ টাকা ঐ হিসাবেই ফেলিতে হয়; যে ব্যক্তি ৪০।৫০ টাকা বেতন পায় তাঁহাকে যদি ঐরূপ লৌকিকতা কুটুম্বস্থল ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার উপর বিশেষ চাপ পড়ে আর তিনি এদিকে একাকী। তাঁহার দেশের বাড়ীর কার্য্যে এসব লোককে আমন্ত্রণও করেন না প্রতিলৌকিকতার আশাও তাঁহার নাই। এইরূপ সব স্থানে ঐরূপ লৌকিকতা গ্রহণ না করা অথবা গ্রহণ করিলেও উহা প্রতিলৌকিকতা স্বরূপে প্রত্যর্পণ করাই সমীচিনি বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন স্থানে যে এইরূপ করা হইয়া থাকে তাহা আমি জ্ঞাত আছি। আমার বোধ হয় ঐরূপ স্থানে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণামী বা আশীর্ব্বাদী স্বরূপে উহা কোনরূপে দাতাকে প্রত্যর্পণ করিলেই সকল দিকেই ভাল হয়।

আবার সময় সময় এরূপও ঘটিতে দেখিয়াছি যে লৌকিকতা করিতে অক্ষম আত্মীয় লজ্জাতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই যান না। সেই জন্যই অনেকে নিমন্ত্রণ পত্রে লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া ঐরূপ ব্যক্তিগণের মনের সঙ্কোচ দূর করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় এতদুভয়ের মধ্যে কোনটাই লৌকিকতার প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে নহে।

লৌকিকতা করিতে যিনি প্রকৃতই অক্ষম তাঁহার লৌকিকতা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, তিনি নিজ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা, তত্ত্বাবধান প্রভৃতি দ্বারাই আত্মীয়কে সাহায্য করিতে পারেন। অর্থ বা যৌতুক দ্বারা সাহায্য করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার ক্ষুণ্ণ হইবার কোনই কথা নাই এবং কর্ম্মকর্ত্তা নিতান্ত নীচমনা না হইলে কখন সেরূপ প্রত্যাশাই করিতে পারেন না।

কোন শুভকার্য্যে আত্মীয় কুটুম্বগণের সহিত একত্র আমোদ করিবার ইচ্ছা সকলেরই হয়,—সেটাতে যদি লৌকিকতাই বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে স্নেহ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতিরও উপর লৌকিকতার স্থান দেওয়া হয়। সেটা নিতান্তই অসঙ্গত সন্দেহ কি?

তারপর ধনী আত্মীয়ের লৌকিকতার প্রতিলৌকিকতাতেও যদি দুঃস্থ আত্মীয় ধনীর সমকক্ষতা করিতে যান তাহা হইলেও লৌকিকতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। অমি মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র অবস্থার লোক, সৌভাগ্যক্রমে আমার ২।৪ জন ধনী কুটুম্ব আছেন। তাঁহাদিগকে আমার কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলে কেহ একখানি অলঙ্কার দিলেন, কেহ ১০৲ টাকা পাঠাইয়া দিলেন ইত্যাদি। এখন ঐ সব আত্মীয় কুটুম্বগণের বাটীর শুভ কার্য্যেও যদি আমিও ঐ অনুপাতে লৌকিকতা রক্ষা করিতে যাই, তাহা হইলে সে লৌকিকতা আমার পক্ষে বড় বিষম ভারই হইয়া পড়ে। সুতরাং তদ্বারা লৌকিকতার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে আমার ন্যায় ব্যক্তির অবস্থানুরূপ লৌকিকতা রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য, তাহাতে সঙ্কুচিত বা ক্ষুন্ন হইবার কিছুই নাই। ধনী আত্মীয়েরও তাহাতে কোন মনের বিকার হইবার কথা নাই অন্ততঃ থাকা উচিত নহে।

তারপর আমাদের অনেক সময় এমন সব বন্ধু থাকেন, যাহারা কুটুম্ব না হইলেও পরমাত্মীয়। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সর্ব্ব প্রকারে ঘনিষ্ঠতা থাকিলেও এই লৌকিকতার সম্পর্ক তাঁহাদের সঙ্গে না থাকাই ভাল। আমার যতদূর মনে হয় তাহাতে স্বর্গীয় পূজ্যপাদ ভূদেব বাবু তাঁহার "পারিবারিক প্রসঙ্গে"র কোন স্থানে এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় ঐ পুস্তক এখন আমার কাছে নাই সুতরাং তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

তবে এইরূপ সব বন্ধুগণের মধ্যে যখন কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধের মত একটা কিছু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়া পড়ে সেরূপ স্থানে বিশেষ বিধিরূপে ইহা সহনীয় হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে বিদেশের বন্ধুবর্গের মধ্যে লৌকিকতার আদান প্রদানের ব্যবস্থা না থাকিলেই ভাল হয়। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে বাহিরে চক্ষু লজ্জার খাতিরে তাহা রক্ষা করিলেও ভিতরে ভিতরে সেটা ভার বলিয়াই বোধ হয়। লৌকিকতার নানাদিকই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। ইহা হইতে আমরা এই সমাধান করিতেছি যে লৌকিকতার উদ্দেশ্য মন্দ

নহে সুতরাং ইহাকে সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করা অর্ব্বাচীনতা। নিমন্ত্রণ পত্রে লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করা সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ এবং তাহা গর্হনীয় সুতরাং পরিত্যাজ্য।

যেখানে লৌকিকতা প্রকৃতই ভারস্বরূপ সে ক্ষেত্রে উহা না করাই কর্ত্তব্য কেহ করিলেও কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষ হইতে তাহা কোন প্রকারে প্রত্যর্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা হইলে গরীব আত্মীয়ের পক্ষে সেটা ভারস্বরূপ হয় না।

বন্ধুমাত্রেরই সহিত লৌকিকতার সম্বন্ধ না থাকাই ভাল। তাঁহারা আমন্ত্রিত হইবেন, আসিবেন, আমোদ করিবেন, কিন্তু লৌকিকতা করিবেন না। আশা করি সুধীগণ সমাধানগুলির বিষয় বিচার করিয়া দেখিবেন।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

কখন না।

কই—সে মনের কথা হ'ল না বলা—
দাঁড়াইয়া বনপথে,
ভাবি—যদি কোন মতে
তাহারে কহিতে পারি—ছাড়িয়া গলা,
যা হ'বার হবে—তা' যে হ'লনা বলা।

সে ধীর প্রশান্ত মুখ চারু চাহনি,
হেরি হয় শির নত,
রেণু, কণা, অণু মত
আপনারে ক্ষুদ্র ভাবি—কেন কি জানি,
স'রে যাই—ম'রে যাই লাজে অমনি।

কি যে কথা—শতবার আসে তা' মনে,
"তুমি নিত্য পরিপূর্ণ,"
আমি তুচ্ছ চির শূন্য,
তুমি জ্যোতিঃ ঘোর তমো আমি ভুবনে,
এ অধমে কেন দেবি, রেখেছ মনে!

"যদি করেছ এ দয়া তবে ভুল না"—
এ'কি বলা যায় কভু—
সাগরে ডুবিব তবু,
ছিঁড়ি যাক্ হিয়া খানি স'ব বেদনা,
এ দীনতা এ হীনতা
মনের লুকা'ন ব্যথা,
তারে কি জানাতে পারি—না কখন না!

শ্রীমানকুমারী

স্কচ্-বাট্‌পাড়্।

সে দিন লেডি অলষ্টন প্রায় স্পষ্টভাবেই বলিলেন যে, তাঁহার স্বামী জগতে অতুলনীয়। কথাটি যদিও অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয় বটে, কিন্তু নিতান্ত মিথ্যাও নয়। একটী হীরার হার বাড়ী পাঠাইবার জন্য ইটালিতে বসিয়া কেহ নিজ কোষাধ্যক্ষকে স্কটল্যাণ্ড হইতে আনাইয়া উপদেশ দেয় না। লর্ড অলষ্টন বলেন তাঁহার চিঠি লিখিবার সময়াভাব, আর তাহার সহিত হারটি পাঠাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন। "আর কিছু না হ'ক হেণ্ডার্সনের কাছ থেকে হারটা চুরী যাবে না; তার ওপর যত বিশ্বাস করা যায় তত কি তোমার চাকরাণীকে বিশ্বাস হয়?" ইচ্ছাপূর্ব্বক লর্ড অলষ্টন সুবিখ্যাত অলষ্টন পরিবারের বহুমূল্য হীরকহার সুদূর ইটালিতে লইয়া যান নাই—ইটালির রাজসভায় নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তাঁহার বিলাতি ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্তই ওরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই কারণেই বলিষ্ঠ বৃহৎকায় হেণ্ডার্সনকে হীরকহারটি দিয়া নি লর্ড কহিয়া দিলেন "দেখ হেণ্ডার্সন, কোনও কারণে প্রাণ গেলেও এক মিনিটের জন্যেও হার নিজের কাছছাড়া করবে না; আর যতদিন ট্রেণে থাকবে, ততদিন ভুলেও চোখ বুঁজবে না; দুটো ত নয়ই, একটা কখন কখন পলক ফেলবার সময় বুঁজতে পার। বাড়ী গিয়ে যত পার চোখ বুঁজে থেক, আমার আপত্তি হবে না। এই চাবি নাও, কাষ্টম্ হাউসে একবার বাক্সটা খোলবার দরকার হবে। চাবিটা পেণ্টালুনের পকেটে রাখ্‌বে, বুঝলে ত? ষ্টীমারে ওঠবার আর নামবার

সময় বিশেষ সাবধান থাকবে ; যদি কেহ বেশী আত্মীয়তা করতে আসে ত ৩৫ হাত দূরে তাকে বাঁ হাতের ধাক্কায় সরিয়ে দেবে, সেটা তোমার অভ্যস্ত। রেভিংটনে রাত্তির কাটাতে হবে মনে থাকে যেন, কেননা সকালবেলা ও লাইনের গাড়ী আসবে। সেখানে খুব সাবধানে থাকবে।”

হেগুাসন শরীরানুযায়ী বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া স্থির করিল যে পথে কোনও রূপ বিপদ অসম্ভব। সে জীবনে কখনও স্কটল্যাণ্ডের বাহিরে পদার্পণ করে নাই। পথে বিদেশীয় ষ্টেশনগুলিতে হিব্রু ভাষায় কথিত প্রশ্নগুলিতে বেচারা বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিল। সে মনে মনে স্থির করিল যে জীবনে তাহার এরূপ বিপদ কখনও হয় নাই ; অতএব ধৈর্য্যের প্রায়াজন, তাই সে প্রতি প্রশ্নেই ধীরভাবে নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া টিকিট দেখাইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে চেষ্টা করিত। কয়েক দিবস অহোরাত্র জাগরণ ও আহার পরিত্যাগ করিয়া শরীর রক্ষা করা নিতান্ত সহজ নহে। আহার পরিত্যাগ বই কি ? একটী নাতিক্ষুদ্র চর্ম্মপেটিকা দক্ষিণ হস্তে অহোরাত্র ধারণ করিয়া আহার কিরূপে সম্ভব তাহা বুঝিয়া লউন। বিশেষতঃ হেগুার্স ন জীবনে আর কখনও জাহাজে চড়ে নাই ; জাহাজের উপর তাহার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া অনেক গম্ভীর-প্রকৃতি ব্যক্তিরও গাম্ভীর্য্য হারাইতে হইয়াছিল। জাহাজ হইতে অতি কষ্টে নামিয়া ট্রেনে উঠিয়া স্থূল পদযুগল ছড়াইয়া বেচারা বসিয়া পড়িল ও ভারতীয় ওজনের একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল “হুঁঃ পাচশো টাকা দিলেও ফের এ রকম কাজ আর হাতে নেব না। তা প্রভু আমার হাতে দিয়ে ভালই করেছেন, নয় ত অন্য কোনও চাকরকে ওরকম ভিড়ের ভিতর বিশ্বাস কি ? আমি ছাড়া আর কেউ কি তিন রাত্তির জেগে আসতে পারত ?” তাহার চক্ষু প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, এমন সময়ে এক ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করিল। সুপ্ত বুলডগ্ কর্ণদ্বয় খাড়া করিল, আহা বেচারা মনে করিয়াছিল বুঝি একা থাকিলে একবার পাঁচ মিনিটের জন্য ডুব দিয়া জল খাইয়া লইবে ; কিন্তু বিধি বাধ সাধিলেন। আগন্তুক ক্ষীণকায়, চঞ্চল প্রকৃতি ও চতুর বলিয়া অনুমিত হইল। গুম্ফশ্মশ্রুবর্জ্জিত, উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়বিশিষ্ট বলিয়া হেগুার্স ন তাহাকে দুর্জ্জন দলভুক্ত বলিয়াই ধরিয়া লইল, কারণ তাহার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি বড়ই প্রিয় ছিল। বড়ই বিরক্তির সহিত সে অর্দ্ধ দৃষ্টিতে এক একবার আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া শুনিল “গাড়ী আর একটু হলেই ছেড়ে দিয়েছিল আর কি !”

হে।—"হুঁ—" গাড়ি ততক্ষণ ষ্টেশন ছাড়াইয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া

আ।—"দেখ হেণ্ডার্সন, আমার আসাতে তুমি মোটেই সন্তুষ্ট হও নি, তা আমি জানি; না হবারই কথা, কারণ আমি এখানে তোমারই হেফাজাত করতে এসেছি।" হেণ্ডার্সন অবাক হইয়া গিয়াছিল, অসন্তুষ্টও যে হয় নাই তা কেমন করিয়া বলিব?

হে।—"আমার হেফাজাত করতে? অনুগৃহীত হলাম, তা বোধ হয় আমার হেফাজাত আমি নিজেই করতে সক্ষম। বলি, তুমি কে হে?"

আ।—"ডিটেক্‌টিভ্ ইন্‌স্পেক্টার বার্ণ্‌স্, লর্ড অলষ্টনের টেলিগ্রাম পেয়ে এসেছি। আমাকে দেখতে হুকুম হয়েছে যে তোমার হাতের ওই চামড়ার ব্যাগটা না হারায়"। হেণ্ডার্সনের রৌদ্রদগ্ধ মুখখানি ঈষৎ রক্তিম হইল; অবশ্য, জগতে কাহাকেও বিশ্বাস না করা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু এতদিন প্রাণপণ প্রভুভক্তি দেখাইয়াও কি মন পাওয়া যায় না?

হে।—"আমার হাতে জিনিষ থাকতে হারানটা মি-লর্ড কেমন করে সম্ভবপর মনে করলেন বলতে পারি নে।"

আ।—"তা তুমি কেমন করে বুঝবে? তোমার মত ভালমানুষ সে কথা বুঝতে পারে না, ও সব আমাদের মত লোকেই বুঝে থাকে। মি-লর্ড ঠিক কাজই করেছেন, এতে তোমার দুঃখিত হবার কোনই কারণ নেই। তুমি কি ভাব যে, ওরকম একটা দামী হার পাঠান হ'ল, এ কথা ইউরোপের বিখ্যাত চোরেরা টের পায়নি? আর রাগ ক'রো না, তুমি ও রকম একটা চোরের সঙ্গে কখনই পেরে উঠবে না; আর যদি দুতিন জন পেছুনে লাগে তাহ'লে ত কথাই নেই।"

হে।—তুমি বল্‌তে চাও কি? আমি কেমন ক'রে জান্‌ব যে তুমি নিজেই চোর নও?

আ।—আর যদি আমিই চোর হই, তাহলে আমি কি করি বল ত?

হে।—তা ঠিক বল্‌তে পারিনে, কিন্তু তোমার কি দশা হয় তা বলতে পারি।

আ।—তুমি আমাকে আধমরা করতে চেষ্টা কর কেমন? তুমি জোয়ান বটে, কিন্তু একবার চেষ্টা করেই দেখ না?

হে।—"বটে! দেখবে তবে?" বলিয়াই প্রাণপণে আগন্তুককে একটী মুষ্টাঘাত করিল, কিন্তু আঘাতটি পার্শ্ববর্ত্তী গদির উপর লাগিল মাত্র ও সেই সঙ্গে হেণ্ডার্সনের দেহ প্রায় উল্টাইয়া ধুলিশায়ী হইবার উপক্রম হইল।

অপসৃত আগন্তুক-মূর্ত্তি উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল "খুব চালাও, আর কিছু না হ'ক ঘুমটা ত আস্‌বে না, আরে মূর্খ। এটুকু যদি না শিখ্‌ব ত এসব জায়গায় আস্‌ব কেন?" বলিয়াই ডিটেক্‌টিভ বার্ণ্‌স্‌ হাসিয়া কহিল—"বন্ধু, যদি আমার চুরী করবার ইচ্ছে থাক্‌ত তাহলে, কি আর রেলগাড়ীতে চুরী করতে আস্‌তাম; তাহলে অন্য কোন উপায় দেখতাম। পাঁচ ছয় রকম উপায় হতে পারে। আচ্ছা দেখত এ উপায়টা মন্দ কি?" বলিয়াই বিড়ালের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া আগন্তুক বৃহৎকায় হেণ্ডার্স‌নের পেটে জানুদ্বয় দ্বারা আঘাত করিল ও উভয় হস্তে তাহার গুম্ফ ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিল। "ছাড়, ছাড়, গেলাম, গেলাম" বলিয়া হেণ্ডার্স‌ন উভয় হস্ত শূন্যে আস্ফালন করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অবিলম্বে বার্ণ্‌স্‌ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। "এটা সুধু একটা উদাহরণ দিলাম মাত্র। আমি গোঁফগুলো ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারতাম, ঠিক্‌ কি না বল, সাভাত জান? জুইজুৎসু জান? আমি তোমাকে অনেক রকম দেখাতে পারি। যাক্—আমি কেবল দেখিয়ে দিলাম যে, তোমার গায়ে অসাধারণ ক্ষমতা থাকলেও ও সব চোরের হাতে তোমার কোন ক্ষমতাই খাটবে না।"

অর্দ্ধ ক্রন্দনের স্বরে হেণ্ডার্স‌ন।—"কোন্‌ সব চোর?"

বা।—তা কেমন করে বল্‌ব?—তাদের মস্ত দল; কে যে আস্‌ছে কেমন করে জানব বল? এ গাড়ীতে তারা আছে কি না, দেখবার সময় পাইনি; বোধ হয় নেই—আর আমাকে দেখ্‌লেই সরে পড়বে। তারা কিন্তু রেভিংটনের হোটেলে রাত্রে একবার চেষ্টা করবে বলে বোধ হয়।"

হে। আমি যে হোটেলে থাক্‌ব তা তুমি কেমন করে জানলে?

সে কথার উত্তর না দিয়া বার্ণ্‌স্‌ বুঝাইয়া দিল যে সেও রাত্রে সেই হোটেলেই থাকিবে ও দেখিবে কি উপায়ে দস্যুগণ বাক্সটি অধিকার করে। সে থাকিতে সমস্ত দল আসিলেও কিছুই করিতে সক্ষম হইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্থানীয় পুলিসদের দেখাইবে যে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভদের বুদ্ধি কত অধিক। অনেকবার দলপতি তাহার হস্ত ছাড়াইয়া পলাইয়াছে, কিন্তু এবার আর নিষ্কৃতি নাই। থানায় সংবাদ সে নিজেই দিয়া রাখিবে, কারণ বলা যায় না দলে যদি অধিক লোক থাকে।"

ট্রেন রেভিংটনে পৌঁছিল। স্পষ্টই বুঝা গেল হেণ্ডার্স‌নের বার্ণসের প্রতি বিরুদ্ধভাব ক্রমেই লোপ পাইতে লাগিল ও যেন একটু বিশ্বাস একটু নির্ভরতার ভাব তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে তাহার মনে হইতে

লাগিল যে তাহার প্রভু বার্ণসকে পাঠাইয়া বিশেষ অন্যায় আচরণ করেন নাই। কারণ দোষ কি? রক্ষীটি সুদক্ষ বটে, অধিকন্তু ন দোষায়। বিশেষ আর অধিকক্ষণ জাগ্রত থাকিবার ক্ষমতা তাহার আছে কি না সে বিষয়ে সে বিশেষ সন্দিহান হইয়া আসিতেছিল। উভয়ে একত্রে আহার করিল ও পরে হেণ্ডার্সন হাতমুখ ধুইয়া আসিল ও উভয়ে একসঙ্গে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। বার্ণসের অত্যধিক বকুনিতেও হেণ্ডার্সনের চক্ষুদ্বয় সংযত থাকিতে অস্বীকার করিতে লাগিল; কিন্তু সে পরমুহূর্ত্তেই চমকিত হইয়া উঠিল, কারণ শুনিল বার্ণস্ বলিতেছে "দেখ হেণ্ডার্সন, তোমার তিনভাগ ঘুমিয়ে পড়েছে কেবল একভাগ মাত্র জেগে আছে। তা নিয়ে কতক্ষণ ব্যাগটিকে আগ্‌লে রাখবে বল ত? তার চেয়ে আমার হাতে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও না কেন?"

হে।—না, তা কেমন করে করি বল? জান ত, আমার উপর হুকুম আছে যে এক মিনিটের জন্যও এটা হস্তান্তর করব না, আমি সে হুকুম মরে গেলেও অমান্য করতে পারিনে জান ত?

বা।—বলি আমার উপরেও ত হুকুম আছে যে, যাতে জিনিষটা না খোয়া যায় তা আমাকে দেখতে হবে; আমারও ত দায়ীত্ব আছে! তোমার যে রকম অবস্থা তাতে যে আমার দায়ীত্ব বজায় থাকে তা মনে লাগছে না। সে চোর বেটাদের চালাকি ত জান না, তারা যে কখন কার ঘরে ঢুকে পড়্‌বে কে বল্‌তে পারে? যদি আমাকে দেখ্‌তে পায় তাহলে বড় ঘেঁসবে না; কিন্তু যদি তোমাকে এই অবস্থায় পায় তাহলেই সুপ্রভুল। চক্ষের নিমেষে ব্যাগটা অন্তর্ধান হবে, আর তখন আমি নিজের হাত কামড়ে মরব দেখ্‌তে পাচ্ছি। এইরূপ ভাবে অনেক বুঝাইবার পর স্কচ্‌মস্তিস্কে সুবুদ্ধির সমাগম হইল।

অতীব দুঃখের সহিত সে অবশেষে রাজী হইল। "আমি বুঝতে পারছিনা আমি ঠিক করছি কি না; কিন্তু আসল কথা যে না দিলে উপায় নেই কারণ আর পাঁচ মিনিটও আমি জেগে থাক্‌তে পারব কিনা ভীষণ সন্দেহস্থল।" ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখিয়া সে অতিশয় অনিচ্ছার সহিত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"দেখ মিঃ বার্ণস্ ক্ষমা ক'রো, এটা যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছে না? কাজটা যেন বড়ই বোকার মত হচ্ছে বলে ভয় হচ্ছে, নয় কি? ঠিক বলত? তবে এ রকম অবস্থায় যদি তোমার জিনিস কিছু জামিন রাখ, এই দামী জিনিস, যদি অবশ্য তোমার অপমান বোধ না হয়—কি জান—?

এক গাল হাসিয়া বার্ণস্ কহিল—তাতে কেন আপত্তি করব? এই নাও

আমার ঘড়ি, গোটা তিরিশেক টাকা দাম হবে আর আমার মণিব্যাগ শ' দেড়েক টাকার নোট আছে, আর তেইশ টাকা সাড়ে পনর আনা নগদ আছে। যদিও হারের তুলনায় কিছুই নয়, তবে তোমার যদি এতে বিশ্বাস হয়ত নিয়ে যাও—'

হে।—হাঁ, কতকটা শাস্তি হয় বই কি। এখন মনে হচ্ছে তুমি যথার্থই আমাকে ঠকাচ্ছ না, এতগুলো টাকা কি সহজে লোকে ছেড়ে দেয়?

ক্লান্ত পদে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া হেণ্ডার্সন স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; দ্বারে চাবি বন্ধ করিল, একটি টেবিল দ্বারের নিকট সরাইয়া রাখিল ও তাহার উপর একটি সিন্ধুক রাখিল ও পরে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া শয্যাশায়ী হইল ও তখন সেই নিশ্চিন্ত বিপুলকায় স্কচ্‌ম্যানের নাসিকাধ্বনিতে হোটেল ধ্বনিত হইতে লাগিল।

সূর্য্যোদয় হইলে তাহার দ্বারে সজোরে আঘাত হইতে লাগিল। চক্ষুদ্বয় সজোরে ঘর্ষণ করিয়া হেণ্ডার্সন সিন্ধুকটা যথাস্থানে স্থাপন করিল ও টেবিল সরাইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিল ও বোকার ন্যায় চাহিয়া রহিল; দেখিল দ্বারদেশে দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত স্থানীয় পুলিস ইনস্পেক্টার দণ্ডায়মান। হেণ্ডার্সন তাহাকে জানিত। "খুব যা হ'ক মিষ্টার হেণ্ডার্সন, তুমি এ রকম বোকা, তা জানতাম না। মাদক দিয়ে জল খাইয়ে চোরটা তোমার কাছ থেকে চুরী করে নিয়ে গেল, তুমি কিছুই বুঝতে পারলে না? একটা রাজার রাজত্বের দাম যে তোমার হাতে বিশ্বাস করে দেওয়া হয়েছিল তাও একবার ভেবে দেখলে না? তুমি এত বোকা!"

বোকার ন্যায় হেণ্ডার্সন মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে কহিল—

"কই! ইন্‌স্পেক্‌টার বার্ণ্‌স্‌ কোথায় গেল?"

কর্ম্মচারী।—খুব ইন্‌স্পেক্‌টার বার্ণ্‌স্‌ পেয়েছিলে যা হ'ক্; তুমি এত বোকা? সে চোরটা যে কোথায় গেল তাই ভাবছি, সে যে আটদশ ঘণ্টা আগে সরে পড়েছে, সেইটেই বিপদের কথা। আমরা এইমাত্র টেলিগ্রাম পেয়েই এসেছি। এর মধ্যে কাজ ফতে ক'রে সে সরে পড়েছে। দোষটা কিন্তু তোমারই; তোমার একটুও বুদ্ধি নাই।

হে।—আমার গোড়ায় সন্দেহ হয়েছিল বই কি। সে কিন্তু খুব বুদ্ধিমান বলেই বোধ হ'ল।

ক।—তোমার যদি তার শতাংশের এক অংশও বুদ্ধি থাক্‌ত তাহলেই একাণ্ডটা হ'ত না। মি-লর্ড শুনলে কি উপায় হবে বল ত? এতক্ষণ হয়ত

হীরেগুলো সব খুলে নিয়ে হারটা গলিয়ে ফেলেছে। এখন উপায় যে কি করব বুঝতে পারছি না।

হে।—না, না, অতটা হয় নি, হীরে এখনও পর্য্যন্ত ঠিক লাগানই আছে ; তবে ব্যাগটা থেকে বেরিয়েছে মাত্র—বলিয়াই স্বীয় কোট উন্মোচন করিয়া হেণ্ডার্সন স্বীয় বক্ষে সেই দুর্ম্মূল্য হীরকহার দর্শকবৃন্দকে দেখাইল ও তাহার জ্যোতিতে পুলকিত হেণ্ডার্সনের চক্ষুর্জ্জ্যোতিঃ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল—

"গলায় দিয়ে শুয়ে থাকতে কষ্ট বোধ হচ্ছিল বই কি। কিন্তু তবুও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ব্যাটা আমার জলে মাদক দিয়েছিল বই কি। কিন্তু মুখ ধোবার সময় আমি সেটা বুঝে ফেলেছিলাম ; তাই ব্যাগটা খুলে হার গলায় পরে নিয়েছিলাম। ব্যাগটা কিন্তু জন্মের মত গেল—তবে দামের চেয়ে বেশী আদায় করে নিয়েছি। আর ঘড়িটা বক্‌সিসের মধ্যে হ'ল ; কি বল ? মন্দ কি ?"

অবাক হইয়া পুলিস ইনস্পেক্‌টার হেণ্ডার্সনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার।

বসন্ত

ঋতুরাজ বসন্তের নামে প্রশস্তি রচনা করিতে বসি নাই ; বসন্তরোগের একটা ক্ষুদ্র প্রাদেশিক বিবরণ লিখিব। প্রবন্ধটি কাব্য ত নহেই, চিকিৎসা-বিদ্যা ঘটিত একটা তথ্যও নহে। তবে কি ? সে কথা প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

মধ্য প্রদেশের ছত্রিশগড় বিভাগে, সম্বলপুর অঞ্চলে এবং উড়িষ্যা দেশে বসন্তরোগের নাম 'মাতা' ; তবে বিনা টীকায় উঠিলে উহার নাম 'উভা-মাতা'। মাতা হইলেন বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রোগের নাম না করিয়া লোকে মাতাই বলে। বঙ্গদেশেও ঠাকুরাণী বা ঠাকুরুণ ব্যবহৃত আছে। কোন ভীষণ পদার্থেরই নাম করিতে নাই ; তাই আমরা ভয়ে রাত্রে সাপের নাম করি না এবং অনেক রোগেরই যথার্থ নাম উচ্চারণ করি না। রোগের বসন্ত নামটাও খাঁটি নাম নহে ; বসন্তকালে ঐ প্রাণসংহারক মহাব্রণ দেখা দেয় বলিয়া উহার নাম বসন্ত। ভীষণ রকমের এক শ্রেণীর অতিসার, বসন্ত কালে দেখা দিত বলিয়া উহারও এক সময়ে নাম ছিল বসন্ত।

ঐ শ্রেণীর অতিশারকেই কলেরা বা বিসূচিকা বলিয়া সন্দেহ হয়। কলেরা রোগে ওলা বা পেট নামান আছে এবং উঠা বা বমন আছে বলিয়া উহার সাঙ্কেতিক নাম ওলাউঠা। বঙ্গদেশে ওলাউঠার একটা ওলাদেবী আছেন বটে, কিন্তু যাহার ওলাউঠা হয় সে হতভাগা দেবীর আবির্ভাবপূত বলিয়া কেহ মনে করে না। সম্বলপুর অঞ্চলে কাহারও বসন্ত হইলে গায়ে মাতা বা ঠাকুরুণ উঠিয়াছেন বা আছেন বলিয়া, সে ব্যক্তি ব্রণ থাকা পর্য্যন্ত গুরুজনকে প্রণাম করে না, কিম্বা দেবীর অস্পৃশ্য কোন পদার্থ আহার করে না। এখন ডাক্তারি টীকা চলিলেও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ডাক্তারি টীকা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নূতন। উহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে প্রকার টীকা দিবার ব্যবস্থা ছিল তাহাও সম্বলপুর অঞ্চলে ১৮৬১ সনের পূর্ব্বে প্রচলিত হয় নাই।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সম্বলপুর অঞ্চলে প্রায় ৬।৭০০০ হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে বসন্তরোগ প্রতিষেধের জন্য টীকা প্রভৃতি দিবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। নাগপুরের বিজয়ী ভোঁসলা রাজা যখন সম্বলপুর, সোনপুর, এবং বৌধের রাজাদিগকে বন্দী করিয়া নাগপুর, ভাণ্ডারা, চাঁদা প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদিগকে রাখিয়াছিলেন (১৮০৩—১৮২০ খৃষ্টাব্দ) সেই সময়ে রাজারা বসন্তের টীকা দিবার ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সোনপুরের রাজা পৃথ্বী-সিংহ দেব চাঁদা সহরে টীকা দিবার সুব্যবস্থা ও সুফল দেখিয়া বন্দী থাকিবার সময়েই সোনপুর হইতে কয়েকজন লোক লইয়া টীকা দিবার পদ্ধতি শিখাইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র প্রভাবের অধীনে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত হইলেও চাঁদায় তেলেগু ভাষা প্রচলিত। ঐ তেলেগু গুরুর নিকট হইতেই সর্ব্ব প্রথমে এই অঞ্চলে টীকা দিবার পদ্ধতি শিক্ষিত হইয়াছিল।

টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে শ্রেণীর লোক দৈব উৎপাত উপশম করিত, সেই শ্রেণীর লোকেরাই 'উভামাতা' হইলে মন্ত্র তন্ত্র করিত। এই শ্রেণীর লোকের নাম 'দেহেরি'। দেহেরিরাই চাঁদায় গিয়া টীকা দেওয়া শিখিয়া আসিয়াছিল। সম্বলপুর এবং বৌধ সম্বন্ধেও এই একই কথা।

টীকা প্রচলনের পূর্ব্বে উভামাতা হইলে বসন্ত দেবীর পূজার জন্য যেমন ঘট বসিত এবং পাড়ায় পাড়ায় বসন্ত দেবীর পূজা হইত; টীকা প্রচলনের সময়েও তাহা বজায় রহিল। গ্রামের বা নগরের একটি প্রধান স্থানে (সাধারণতঃ রাজবাড়ীতে) দেহেরি ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করিত এবং

মাতার আদেশ পাইলে গো-বীজ লইয়া গ্রামে বা নগরে টীকা দিতে আরম্ভ করিত। দেহেরিদিগের এই টীকার ফল বড় ভাল হয় নাই; কারণ অনেক লোক টীকা লইবার পর জ্বরে এবং বসন্তে মারা পড়িত।

সম্বলপুর যখন ইংরেজের জেলায় পরিণত হইল, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বাকুড়া জেলার বাঙ্গালী টীকাওয়ালারা সম্বলপুর অঞ্চলে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। দেহেরি টীকার পরিবর্ত্তে এই বাঙ্গালী টীকা তখন সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল এবং এই প্রথায় বিপদের আশঙ্কা অত্যন্ত কম বলিয়া এই অঞ্চলে সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়া থাকে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দেও সম্বলপুরের গড়জাত অঞ্চলে আমি বাকুড়া জেলার অনেক টীকাওয়ালাকে দেখিয়াছি।

যে সময়ে প্রথমে দেহেরির টীকার আমদানী হইয়াছিল, তখন সোনপুর নগরবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ টীকা দিত; কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই উহা অগ্রাহ্য করিত। বাঙ্গালী টীকার ফল অশুভজনক নহে দেখিয়া ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে লোকেরা ধীরে ধীরে দেশের মধ্যে টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলন করিয়াছিল। এখন লোকের বিশ্বাস, যে হাঁসপাতালের টীকা গ্রহণ না করিলে দণ্ডিত হইতে হয়; কাজেই অধিকাংশ লোকেই টীকা দিয়া থাকে। এখনও কিন্তু পলাইতে পারিলে অনেকে ছাড়ে না।

কোষ্ঠা প্রভৃতি কয়েকটী জাতির লোকেরা কখনও টীকা লয় নাই; দণ্ডের ভয় দেখাইলেও তাহাদিগকে টীকা গ্রহণ করিতে সম্মত করা অসম্ভব। কোষ্ঠা জাতীয় লোকেরা তসরের কাপড় বুনিয়া থাকে। কেহই বলিতে পারেন না যে, এই সকল সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষা বসন্তে বেশী মারা পড়ে। টীকার উপকারিতার আলোচনার সময় চিকিৎসক পণ্ডিতেরা এ কথার অনুসন্ধান এবং বিচার করিতে পারেন।

যে শ্রেণীর লোকেরা কদাচ টীকা গ্রহণ করে নাই, বসন্ত সম্বন্ধে তাহাদের একটি অনুষ্ঠানকে এদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত প্রাচীন অনুষ্ঠান বলিয়াই মনে হয়। অনুষ্ঠানটি এই—দৈবাৎ কাহারও গৃহে (যে জাতির লোকই হউক) উভামাতা দেখা দিলে (এ কালের টীকার পরে মাতা দেখা দিলেও) কোষ্ঠা জাতির স্ত্রীলোকেরা স্নানের পর নূতন কাপড় পরিয়া, কুলায় করিয়া পঞ্চশস্য এবং প্রদীপ লইয়া উভামাতাকে বরণ করিতে যায়। যে গৃহে মাতা আসিয়াছেন, সেই গৃহের দ্বারে দেবীর জয়-ঘোষণায় উলুধ্বনি দিয়া বসন্তরোগগ্রস্তের সমক্ষে কুলা নাড়িয়া প্রদীপ দোলাইয়া এবং পঞ্চশস্য ছড়াইয়া

দেবীকে বরণ করে। এই ব্যবস্থা বসন্তরোগের প্রতিষেধের জন্য নহে; বরং উল্টা, মাতাকে আপনাদের পাড়ায় ডাকিয়া লইবার জন্য। মাতার আগমনে বাধা দিলে, সর্ব্বনাশ হইবে বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে মাতার প্রতি এরূপ ভাবের আদর ঠিক দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা একালের ব্যবস্থার টীকা দিবার পূর্ব্বেও ঘট বসাইয়া দেবীর পূজা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু মাতা কোথাও উভা হইয়াছেন শুনিলে একেবারে সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করেন।

কোন নগরে বা গ্রামে সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলেই এদেশের লোকেরা যথাসাধ্য গ্রাম বা নগর পরিত্যাগ করিয়া যায়। যাহারা ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য তাহারাও এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। আমি নিজে একবার সোনপুর সহরে কলেরা প্রাচুর্ভাবের সময় দেখিয়াছি যে, সহরের অধিকাংশ লোক ৩।৪ দিনের মধ্যে সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল; এবং পলায়নপরদিগের মধ্যে অনেকে অন্য গ্রামে স্থান না পাইয়া, একেবারে কিছু দিনের জন্য জঙ্গলে গিয়া বাস করিতেছিল। পতি রোগগ্রস্তা-পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এবং মাতা শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

তিন।

ছেলেবেলায় পড়িয়াছি—একে চন্দ্র, তুই এ পক্ষ, তিনে নেত্র। নেত্র ছাড়া অন্যত্রও যে তিনের প্রভাব বর্ত্তমান, তাহারই সম্বন্ধে অত্র কয়েক ছত্র লিখিতে বসিয়াছি।

বিজ্ঞান-জগতে তিনের মহিমা যদি দেখিতে চান, তাহা হইলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসাপ্রণালী হোমিওপ্যাথির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। যেমন চাঁদ সওদাগরের জন্ম হইয়াছিল মা মনসার মহিমা প্রচার করিবার জন্য, সেইরূপ হোমিওপ্যাথির জন্ম রোগ সারাইবার জন্য হউক আর নাই হউক, তিনের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য ত বটেই। হোমিওপ্যাথিক-ঔষধের বাক্স খুলিলেই দেখিবেন যে খালি তিন, তিন, তিন—আর কিছুই নাই। বেলেডোনা তিন, আর্সেনিক তিন, চায়না তিন—তিনে তিনে ধূল পরিমাণ। হয় তিন, না হয় তিন দুগুণে ছয়,

না হয় তিন তিরিক্কে নয়, তিন ছয় আঠারো বা তিন দশে তিরিশ সংখ্যক ডাইলিউশনই চলিত। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি কোন্ বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুযায়ী দ্বিতীয় পঞ্চম, সপ্তম, বা একাদশ ডাইলিউশন এত অধম হইয়াছে? বলিতে চান কি যে, আর্শেনিক ৩০এর এক ফোঁটাতে মরা মানুষ জীবন্ত হয়, ২৯ ডাইলিউশনে কিছুই হয় না? তারপর এই ডাইলিউশন প্রস্তুত করিবার সমস্ততেই তিনের মহিমা সুস্পষ্ট। এক ফোঁটা ঔষধ তিন তেত্রিশং নিরানব্বই ফোঁটা মদের সহিত ঝাঁকাইয়া একটা ডাইলিউশন হয়। আচ্ছা আটানব্বই ফোঁটা বা পুরোপুরি একশ ফোঁটা লইলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত?

বিজ্ঞান আরও শিক্ষা দিতেছে যে দ্রব্য তিন প্রকার—কঠিন, তরল ও বায়বীয় (Solid liquid and g seons); কিন্তু চোখে দেখিয়াই কোন জিনিস কঠিন, তরল বা বায়বীয় কি না তাহা ঠিক করা যে যায় না, তাহার প্রমাণ আছে —লুচি, দই ও সন্দেশ। জিজ্ঞাসা করি কাঁচাগোল্লা সন্দেশ কঠিন, তরল, না বায়বীয়? সন্দেশ কঠিন দ্রব্যত হইতেই পারে না, কঠিন হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রভূত চিনি সংযোগ হেতু উহা অখাদ্য। তরলও যে নহে—একবার মুখে পুরিলেই বুঝিতে পারেন, সহজে গলাধঃকরণ হয় না, খানিকটা জল গলার ভিতর না ঢালিলে বড় সহজে নামে না। অতএব ব্যতিরেক প্রমাণ অনুসারে প্রমাণিত হইতেছে যে সন্দেশ কঠিন নহে, তরলও নহে, উহা বায়বীয়। সন্দেশের বায়বীয়ত্বের অপর প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, বাটীতে আনিয়া রাখিয়া দিলে পরদিন ঠিক বায়ুরই মত সব উপিয়া যায়।

তারপর দধি তরল পদার্থ কি না? দধি জলের মত তরল হইলে গোয়ালার বা তাহার চতুর্দ্দশ পিতৃপুরুষের কি আর রক্ষা আছে? দধি যে তরল পদার্থ নহে তাহা কলিকাতায় বসিয়া বুঝিতে পারিবেন না। নাটোরে যান, পাবনায় যান, রাজসাহীতে আসুন—দেখিবেন দইএর হাঁড়ি উপুড় করিলে এক ফোঁটাও মাটিতে পড়িবে না। এখানকার নিমন্ত্রণ বাটিতে দইএর থক্থকে, চাপচাপ, আঁটাসোঁটা রূপ দেখিলে "ন রাত্রৌ দধি ভোজনং" এই শাস্ত্রবচন একেবারেই মনে থাকে না। ঠাকুরমার নিকট গল্প শুনিতাম যে, আগে আমাদের পল্লীগ্রামেও দই যে তরল পদার্থ নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য গোয়ালাদের মধ্যে লড়াই বাধিত। বড় কাজকর্ম্মে গোয়ালারা আসিয়া সকলের সাক্ষাতে নিজের নিজের দইএর হাঁড়ি দূর হইতে উঠানে ফেলিয়া দিত। যাহার দই হাঁড়ি ফাটিরা গেলেও এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহার দইএরই বায়না হইত। গোয়ালারা অবশ্য দই

সম্বন্ধে expert ; তাহারা যখন প্রমাণ করিতে সদাই ব্যস্ত যে দধি তরল পদার্থ নহে, তখন আপনি আমি বলিলে চলিবে কেন ? বাস্তবিক দধির বেলায় কেন, অনেক স্থানেই দেখা যায়—hings are not what they seem.

দধি ও সন্দেশের কথাত গেল, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে লুচি এই তিন অবস্থার কোন্ অবস্থাপন্ন ? লুচি বাসি হইলে অবশ্য কঠিন হয়, কিন্তু গরম গরম ফুলকো লুচির অবস্থা কি ? উহার অবস্থা চোখে দেখিতেও বেশ ভালই, কিন্তু যিনি বেশী লোভ করিবেন তাঁহার পৈটিক অবস্থা যে খুব ভাল থাকিবে এরূপ আশা বড়ই কম। সে যাহা হউক গরম লুচিতে সকলেই এই তিন অবস্থার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবেন। তাহার উদরে বায়ু, বাহিরে চব্‌চবে তরল ঘৃত, গাত্রে পাতলা, ঈষৎ কঠিন, মোলায়েম ময়দার স্তর। দুঃখ এই যে, এ হেন পদার্থ এক শ্বশুরালয়ে বা নিমন্ত্রণ বাটী ভিন্ন অন্যত্র বড় মিলে না।

তারপর দেখুন এই তিনেতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিয়া গিয়াছে। অনেকেই জানেন একজন প্রতীচ্য কবি লিখিয়া গিয়াছেন

The east is east and the w. st is w st
The t vain shall never meet.

তাঁহার কথা যে একেবারে ভুল তাহার প্রমাণ এই তিন। বাঙ্গালীর ছেলেরা চোর চোর খেলিবার সময় বা দৌড়াদৌড়ি করিবার সময় এক, দুই, তিন বলিয়া হাততালি দিবার পর ছুটিতে আরম্ভ করে, সাহেবদের ছেলেরাও On , Two, Three, উচ্চারণ করিয়া তবে দৌড় দেয়। বাঙ্গালীর ছেলেরা এক, দুই, তিন, চারি বলে না, সাহেবদের ছেলেরাও One Two বলিয়া থাকে না—সাহেব বা বাঙ্গালী উভয় জাতির বালকেরা এক, দুই, তিন, বলিয়া তবে ছোটে। কথাটা খুব ছোট বটে, কিন্তু বিষয়টা বড়ই গুরুতর। প্রাচ্য প্রাচ্য বটে, প্রতীচ্য প্রাচ্যও নহে, উত্তরও নহে, দক্ষিণও নহে সত্য বটে। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিশিবে না কেন ? মনে রাখিতে হইবে প্রাচী বা প্রতীচ্য, উত্তর, দক্ষিণ, সকল দিক ও দেশবাসী এক বিশাল মানবজাতির অংশ মাত্র। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যখন প্রত্যেক পরমাণু প্রত্যেক পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে, অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র তারকামণ্ডলী পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া বিশ্বে অপূর্ব্ব মৈত্রীর বারতা ঘোষণা করিতেছে, তখন এক মানবাত্মা অপর মানবাত্মাকে স্নেহবন্ধনে আকর্ষণ করিবে না কেন ? সাদায় কালোয় কি আসিয়া যায় ? যমুনার কৃষ্ণ তোয় কি গঙ্গার শ্বেত বারির সহিত মিলে নাই ? ভ্রমরকৃষ্ণ

কেশকলাপ কি সুন্দরীর তরুণ অরুণরাগরঞ্জিত বদনমণ্ডলের শোভার বৃদ্ধি করে না ? তবে শ্বেতকৃষ্ণ মিশিবে না কেন ? প্রাচ্য প্রতীচ্য মিলিবে না কেন ? প্রতীচ্য নবীন, তাই যুবকের ন্যায় অশান্ত, প্রাচ্য স্থবির কিন্তু বয়ো ও জ্ঞানবৃদ্ধ। সেইজন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য একত্র মিলিলে প্রাচ্যের সংযম, প্রাচ্যের আত্মদৃষ্টি, প্রাচ্যের নিষ্কাম সাধনা, প্রতীচ্যের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত করিবে ; অপর দিকে প্রতীচ্যের অনন্ত উদ্যম, অসীম আত্মনির্ভরশীলতা, অনন্ত কর্ম্মসাধন প্রাচ্যকে নবীনমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিতেছে, মিশিবে, মিলিয়া মিশিয়া পৃথিবীতে দ্বিতীয় প্রয়াগের সৃজন করিবে এবং এই নূতন গঙ্গাযমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থলে বিশ্বের যাত্রীরা অবগাহনপূর্ব্বক নিজেদের ক্ষুদ্রতা, দৈন্য ও কৃপণতা মণ্ডন করিয়া এক নবীন উজ্জ্বল কলেবর ধারণ করিবে।

ছেলেবেলায় ধারাপাতে পড়িয়াছি তিনে নেত্র। কথাটায় বড় আটক লাগিত। স্পষ্ট দেখিতেছি আমার বা অপরের, এমন কি, গরু, মহিষ, বিড়াল ছাগলের দুইটা বই চক্ষু নাই, অথচ ধারাপাতে লিখিতেছে "তিনে নেত্র"। গল্প শুনিয়াছি একটি ছোট ছেলেকে তাহার পিতা কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিতেছিলেন কয়টা হাত, কয়টা পা, কয়টা অঙ্গুলি ইত্যাদি। বালকও ঠিক ঠিক উত্তর দিতেছিল। যখন তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "চক্ষু কয়টা ?" বালক অম্লান বদনে উত্তর করিল "তিনটা"। বালকের পিতা একটু আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি ? বালক তখন সভয়ে উত্তর করিল "কেন বাবা, ধারাপাতে পড়িয়াছি, তিনে নেত্র। গুরুমহাশয় বলিয়া দিয়াছেন নেত্র মানে চক্ষু।" পিতা অনেকক্ষণ ভাবিলেন পরে বলিলেন "ধারাপাতে দুইএ নেত্র না লিখিয়া তিনে নেত্র কেন লেখে, বড় হইলে বুঝিবে।" গুরু মহাশয়ের কাছে তিনি যখন এই গল্পটি করিলেন, গুরুমহাশয় হাসিয়া বলিলেন "এখন থেকে আর তিনে নেত্র পড়াইব না, তিনে ভুবন (ত্রিভুবন) পড়াইব।" এই অবোধ বালকের মত আমিও ছেলেবেলায় এই "তিনে নেত্র" কথাটার মানে বুঝিতাম না ; ভরসা ছিল যে যখন ছাপা পুস্তকে এই কথাটা লেখে, তখন তিনে নেত্রওয়ালা কোন জীব আছেই আছে। বড় হইয়া জানিয়াছি যে শিবের কপালে এই তৃতীয় নেত্র আছে—এই নেত্রের অগ্নিতে মদন ভস্ম হইয়াছিল। ভগবতী যখন পাটনীকে আক্ষেপ করিয়া স্বামীর পরিচয় দিতেছিলেন "কোনও গুণ নাই—তার কপালে আগুন," তখন তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, শিবের কপালে এই আগুন না জ্বলিলে তাঁহার নিজের কপাল পুড়িত। মানুষের এই তৃতীয় নেত্র না থাকাতে

মানুষ মদনের এত দাস হইয়া পড়িয়াছে। মানুষকে মদন ভস্ম করিতে হইলে শিবের মতই কঠোর সংযম ও সাধনা করিতে হইবে—তাহা হইলে মানুষের এই তৃতীয় নেত্র বাহির হইবে এবং তাহার আগুনে মদন মায় তাহার ফুলধনু পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, ধারাপাতের লেখা সার্থক হইবে।

শাস্ত্রে তীর্থে ত্রিরাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। ত্রিরাত্রিবাসে পুণ্য হয় কি না জানি না, কিন্তু তিন রাত্রির কমে কোনও স্থানে থাকিতে হইলে আমি ত মারা যাই। প্রথম রাত্রি রেল বা গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিজনিত বেদনা সারাইতে কাটিয়া যায়, দ্বিতীয় রাত্রি ঠাকুরদেবতা দেখার জন্য সমস্ত দিবস ঘুরিয়া বেড়ানর দরুন পদযুগলের যে বেদনা হয় তাহার ঔষধ স্বরূপ নিদ্রার প্রলেপ দিতে কাটিবে। তৃতীয় রাত্রি অন্ততঃ সন্ধ্যাবেলা মোটমাটারি বাঁধিতে ও ডেরাডান্দি তুলিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য প্রোগ্রাম আলোচনা করিতে করিতে কাটিবে।

এইরূপে পরিশ্রমের অপনোদন হয় বলিয়াই শাস্ত্রে তীর্থে ত্রিরাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। আমার ব্যাখ্যা সকলের মনঃপূত হইবে কি না জানি না, কিন্তু যখন শাস্ত্রে দ্বিরাত্রি বা চতুঃরাত্রির বাসের ব্যবস্থা নাই তখন আমার ব্যাখ্যা ঠিক না হইয়া যায় না। বাস্তবিক আমাদের দেশে যে সকল নৈতিক উপদেশ প্রচলিত আছে, তাহার এইরূপ একটা না একটা অর্থ আছে। অনেকে সেগুলি নিরর্থক মনে করিয়া ভুল করেন। ছেলে বেলায় মা বলিতেন "বাবা, গরু বাঁধা থাকিলে তাহার দড়ি ডিঙ্গাইয়া যাইও না, গরু মরিয়া যাইবে।" তখন মনে হইত, হ্যাঁ! এ আবার একটা কথা, দড়ি ডিঙ্গাইলে গরু মরিয়া যাইবে! মার কথা ঠিক কি না পরীক্ষা করিবার জন্য বাঁধা গরুর দড়ি অনেকবার ডিঙ্গাইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোনওবার গরু ত মরে নাই, তাহার কোনও ব্যারাম পর্য্যন্ত হয় নাই। তারপর সত্য সত্যই একদিন পালে বাঘ আসিল। একদিন দড়ি ডিঙ্গাইয়া যেমন যাইব, অমনি গরুটা ভয় পাইয়া লাফাইয়া উঠিতেই পা আটকাইয়া গিয়া ধপাস করিয়া পড়িয়া গেলাম। যখন পতন জন্য রক্ত নামক লোহিত রাগরঞ্জিত তরল পদার্থ নাসিকা হইতে ধূলীধূসরিত ওষ্ঠদ্বয় ও চিবুক বহিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল, তখন বুঝিতে বাকি রহিল না যে অশান্ত বালককে পতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পশুর মৃত্যুভীতি দেখাইয়া মাতা বালককে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পান।

সত্ব, রজঃ তমঃ—এই তিনগুণ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ইউরোপের জাতিরা রজোগুণসম্পন্ন, ভারতের জাতিবৃন্দ সত্বগুণসম্পন্ন। তমোগুণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলে, সত্বগুণ ভাল কি রজোগুণ ভাল এ

মীমাংসা লইয়া অনেকে লড়াই করিয়া থাকেন। এইরূপ তর্কের কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না—দুইই ভাল। সত্বগুণের লক্ষণ ক্ষমা, দান, ত্যাগ, শান্তি ও ধৈর্য্য, এবং রজোগুণের লক্ষণ—তেজ, বীর্য্য, সাহস, আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্মপ্রিয়তা। লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, এই দুই গুণ একত্র বিরাজ না করিলে কোনও জাতি বড় হইতে পারে না। শুধু সত্বগুণসম্পন্ন জাতি শীঘ্রই অলস অপটু অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, অপরদিকে কেবল রজোগুণসম্পন্ন জাতি ক্রমে অশান্ত, উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত হইবেই। সেই জন্য কোনও বড় জাতি একগুণ বিশিষ্ট হইতে পারে না—তাহাকে দ্বিগুণবিশিষ্ট হইতেই হইবে। যাহারা মনে করেন, যে ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে সত্বগুণ নাই, তাঁহারা ভুলিয়া যান, যে তাহাদের মধ্যে কত অসাধারণ দান, কত স্বর্গীয় ত্যাগের দৃষ্টান্ত, তাহাদের গৌরবময় ইতিহাসকে চিরউজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আবার যাহারা মনে করেন যে ভারতবাসী রজোগুণ বর্জ্জিত, তাঁহারা জানেন না যে ভারতের বিচিত্র ইতিহাসে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মারহাট্টা, রাজপুত প্রভৃতি কত জাতির কত তেজ, বীর্য্য, অদম্য কর্ম্মোৎসাহের গাথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, তবে এটা ঠিক বলিয়া মনে হয় যে ইউরোপের অশান্তি উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করিতে হইলে, তাহাকে সত্বগুণ অধিক পরিমাণে লাভ করিতে হইবে, আবার ভারতের আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা দূর করিতে হইলে, তাহাকে ইউরোপের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী রজোগুণের সেবা অধিক পরিমাণে করিতে হইবে।

তিন তিথির একত্র সংযোগ হইলে ত্র্যহস্পর্শ হয়—যাত্রা নাস্তি। অবশ্য রাস্তা মেরামত হইলে সে রাস্তায় যাত্রা নাস্তি, কিন্তু তিন তিথি একত্র হইলে কিরূপে দশদিকে No thoroughfare ঘটে তাহা বুঝা কঠিন। সে যাহা হউক ত্র্যহস্পর্শ বা অন্য কোনও অশুভবারে কোনও স্থানে যাত্রার কথা উঠিলে বাটীতে খুব জোরের সহিত আপত্তি উঠিতে থাকে। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সাহেবদের বা মুসলমানদের ত আর ত্র্যহস্পর্শ নাই, যে দিন ত্র্যহস্পর্শ, সে দিন তাহারা যাত্রা করিলে, যদি তাহাদের কর্ম্মহানি না হয়, তাহা হইলে বাছিয়া বাছিয়া কেবল হিন্দুর কর্ম্মহানি হইবে কেন? উত্তর ও হাতে হাতে মিলিয়া থাকে—“এটা আর বুঝলে না, তাহারা যে সাহেব বা মুসলমান তা'রাত হিন্দু নয় তবে ত্র্যহস্পর্শ তাহাদিগকে লাগিবে কেন?” ইহার উপর ত আর কথা চলে না বলিয়া শুধু তিনের মহিমাতেই যাত্রা নাস্তি ঘটিতেছে, দেখিয়া অবাক হইয়া থাকি।

ট্রিনিটি বা ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা হিন্দুধর্ম্মেও আছে, খৃষ্টধর্ম্মেও আছে। হিন্দুর ত্রিমূর্ত্তি হইতেছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, মহেশ্বর সংহর্ত্তা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপারটা এত বিশাল যে, তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনটা সেক্রেটেরিয়েট ও তিন জন মেম্বরের কল্পনা বড় অন্যায় হয় নাই। মহেশ্বর ঠাকুরের আফিসের জন্য ঘরবাড়ী ইমারতের দরকার নাই, শ্মসান তাঁহার আফিস। এ বৎসর দেখিতেছি, যে এই শ্মশানচারী ঠাকুরটির আফিসের কাজ ভারি বাড়িয়া গিয়াছে। ইউরোপখণ্ডে, আজ যে মহাসমরের ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহাতে সভয়ে দেখিতেছি, কত লক্ষ লক্ষ বীরপুরুষ অকালে জীবনাহুতি দিতেছে, কত মাতা পুত্রহীন হইতেছে, কত সাধ্বী বিধবা হইতেছে, কত শিশু অনাথ হইতেছে। সুসমৃদ্ধ কত জনপদ, গ্রাম, উপগ্রাম শ্মশান হইতেছে, আর্ত্তের মর্ম্মন্তুদ কাতরধ্বনি কর্ণ বধির করিয়া দিতেছে। প্রভু! তোমার রুদ্র সংহারমূর্ত্তি সম্বরণ কর, তোমার এই ভীষণ Extra work বন্ধ কর, জগতে শান্তি স্থাপিত হউক।

প্রসঙ্গক্রমে কথাটার একটু আলোচনা করিব। লোকে কথায় কথায় বলে, হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেবতা পূজা করে। আমি ত এই ত্রিমূর্ত্তি ভিন্ন বড় জোর আর ত্রিশটি দেবতার নাম করিতে পারি। বোধ হয়, কোন দুষ্ট লোকে এই তেত্রিশ কোটি দেবতার হুজুকটা তুলিয়াছে। সে যাহা হউক তেত্রিশ হউক আর তেত্রিশকোটি হউক, হিন্দুর দেবতা বহুত। কিন্তু হিন্দুর দেবতা অনেক হইলেও হিন্দু এক ঈশ্বরের পূজা করে কি না? অনেকে বলেন, হিন্দু পাথর পূজা করে, মূর্ত্তি পূজা করে। তাহারা নিশ্চয়ই ভুল বুঝেন। পাথরকে কি পূজা করা যায়? মূর্ত্তির খড়, কাঠ, চূণ, মাটি কি কেহ সজ্ঞানে পূজা করিতে পারে? আমরা রসায়ণশাস্ত্রের অধ্যাপক, আমরা ছাত্রদিগকে ড্যাল্‌টনের পরমানুবাদ Daltons atomic theory) বুঝাইবার সময় চক্ষুরীন্দ্রিয়ের অতীত পরমাণু গুলি বিভিন্ন রংএর কাঠের বল বা গোলা দিয়া বুঝাইয়া থাকি। ছেলেরা নিরাকার পরমাণুর ধারণা সহজে করিতে পারে না, এই কাঠের গোলার সাহায্যে কিরূপে দ্রব্যের মধ্যে পরমাণু গুলি থাকে, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারে। গল্প আছে, এইরূপ বক্তৃতার পর একজন ছাত্রকে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন "পরমাণু কি?" ছাত্র নাকি উত্তর করিয়াছিল "পরমাণু ড্যাল্‌টন সাহেবের আবিষ্কৃত কাঠের গোলা।

"পরমাণু কাঠের গোলা" অবোধ ছাত্রের এই উত্তর আর হিন্দু পাথর পূজা করে এই উভয় মত এক শ্রেণীরই যুক্তি। নিরাকার পরমব্রহ্মের পূজা হিন্দুশাস্ত্রতে ত নিষেধ নাই। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র উপনিষদ এই পূজারই প্রচারক। কিন্তু নিরাকার পরমব্রহ্মের আকার যিনি কল্পনা করিতে অক্ষম তিনি যদি কোনও কল্পিত মূর্ত্তিতে পরমব্রহ্মের পূজা করেন তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে কেন? রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ নিরাকার পরমব্রহ্মের পূজা করেন নাই; কালী মূর্ত্তিতে ব্রহ্মের পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কি তাই বলিয়া কম সাধক ছিলেন? আসল কথা ব্রহ্মের পূজা—তাহা সাকারই হউক বা নিরাকারই হউক—দুই-ই ব্রহ্মেরই পূজা। তবে মূর্ত্তি-পূজার সহিত পশুবলি প্রভৃতি জঘন্য প্রথা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সেগুলি উঠাইয়া দিউন। তাহা বলিয়া মূর্ত্তিপূজা মাত্রই যে নিন্দনীয়, একথা যুক্তিমূলক নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি খৃষ্ট ধর্ম্মেও এক ত্রিমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। বাইবেল বলিতেছেন যে ভগবানের তিন রূপ পিতা, পুত্র ও পবিত্র ভূত (God the Father, the Son and the Holy ghost)। এ বিষয়ে হিন্দু ও খৃষ্টানের মধ্যে পার্থক্য এই যে হিন্দু ভগবানকে পিতা বলিয়া বড় একটা ডাকে নাই মা বলিয়াই বেশী ডাকিয়াছে। পিতা ও মাতা উভয়ই গুরুজন বটে কিন্তু সন্তানের সহিত তাঁহাদের সম্পর্কের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। পিতার নিকট সন্তান একটু দূরত্ব অনুভব করে—পিতা যেন বড় গম্ভীর বড় উচ্চে, বড় ছাড়াছাড়া। কিন্তু মা যে বড়ই পরিচিতা মার কাছে সন্তান যেমন সহজে, প্রাণ খুলিয়া, শত আবদার করিতে পারে পিতার কাছে কিছুতেই সেরূপ পারে না। পিতার নিকট হইতে এই দূরত্ব ঘুচাইবার জন্য যেখানে হিন্দু ভগবানকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াছে, সেখানেও শ্মশানচারী শিবরূপে তাঁহাকে "পাগ্‌লা বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। এই দূরত্বের বাধা যাহাতে না থাকে, সেই জন্য হিন্দু চিরকাল ভগবানকে মা বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে। এই মা নাম যে কত মধুর, তাহা যিনি রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতগুলি একবার পড়িয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। মার কাছে, রামপ্রসাদের এই শত ন্যায় অন্যায় আবদার আবেদনগুলি আমাকে অন্ততঃ বড়ই তৃপ্তি প্রদান করে। কিন্তু আধুনিক অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতে অনুসন্ধান করিয়াও সে তৃপ্তি পাই না। এগুলি পিতার উদ্দেশ্যে রচিত—আমার কাছে অন্ততঃ এগুলির আন্তরিকতা সুস্পষ্ট নহে, কই ঐগুলিত কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে না। শুধু ভাষার সারল্যে রামপ্রসাদের গানগুলি এত

তৃপ্তিদায়ক তাহা নহে, খৃষ্টধর্ম্মের অনুকরণে ভগবানকে পিতৃরূপে কল্পনা করার দরুণই ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি তত মধুর হয় নাই।

ভগবানকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন—যিশুজননী মেরী ও কৃষ্ণজননী যশোদা তাঁহারা ভাগ্যবতী রমণী; আপনার আমার সে ভাগ্য হইবে না, আমরা দূর হইতে তাঁহাদিগকে প্রণাম করি।

কিন্তু ভগবানকে স্বামীরূপে পাইয়াছিলেন, শ্রীরাধিকা ও গোপিনীগণ। রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রেমলীলা আপনি আমি স্থূলচক্ষে দেখিব জানিলে বৈষ্ণব-কবি কখনই উহার প্রচার করিতেন না। জগতের শ্রেষ্ঠ ভালবাসা প্রেম, শ্রেষ্ঠ নিবেদন সর্ব্বস্বত্যাগ! তাই ভারতের শ্রীরাধিকা ভগবানকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য ধন জন মান, এমন কি কুল ত্যাগ করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে নাই। তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ত্যাগশীল হিন্দুর ধর্ম্ম, পুরাণ, গাথা ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছে; তাই বৈষ্ণব কবিগণের রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথার তুল্য কবিতা জগতের কোনও সাহিত্যে আছে কি না, সন্দেহের বিষয়। আধুনিক অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতে বৈষ্ণব কবির এই ভগবদ্‌প্রেমের এক নবীন সংস্করণ দেখিতে পাই। কিন্তু এগুলি যেন বড় কৃত্রিমভাবাপন্ন, এ প্রেমে যেন বন্যা নাই, যেন প্রাণ নাই। "প্রাণারাম, প্রাণারাম, প্রাণারাম" পড়িয়া যেন প্রাণে আরাম পাই না। হে জীবনস্বামী বলিতে যেন জীবনের স্বামীকে চিনিতে পারি না। এ প্রেম যেন কেবল বাক্যেই উচ্চারিত, প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে যেন উহা উঠে নাই।

তার পর আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন, যে holy ghost বা পবিত্র ভূতের মানে কি? মশাই, কাজ কি পবিত্র ভূতের মানে লইয়া—আমি হিন্দু, চিরকাল ভগবানকে মা বলিয়া ডাকিয়া আসিয়াছি। মা নামেই যখন তৃপ্তি পাই, তখন অন্য কথায় আমার কাজ কি?

এখন ত্রিভুবনের কথা পাড়া যাউক। রাগ হইলে, অনেকে এক চড়ে ত্রিভুবন দেখাইবার ভয় দেখান। কিন্তু ত্রিভুবন ত বড় সহজ নয়—স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল লইয়া ত্রিভুবন। পাতাল বা রসাতলে কি আছে কে জানে? পুরাণকার বলেন যে সহস্রশীর্ষ নাগরাজ বাসুকি পাতালে বিরাজ করিতেছেন, তিনি একবার মাথা নাড়া দিলে, মর্ত্ত রসাতলে যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন বাসুকির বংশধরেরা অবশ্য পাতালের ছোট ছোট গর্ত্তে বাস করেন বটে, এবং সুযোগ পাইলেই কামড়াইয়া থাকেন, তবে পাতাল বিভিন্ন

স্তরের মৃত্তিকার দ্বারা গঠিত। নিম্নে জল আছে, খনিজ আছে, ধাতু আছে। যাহা হউক রসাতলে যখন কেহই যাইতে ইচ্ছুক নহেন, তখন ও বিষয়ে বিতণ্ডা করিয়া কোনও লাভ নাই, নাগরাজের বংশধরেরা দয়া না করিলেই মঙ্গল।

স্বর্গে ত এ জন্মে এখনও যাই নাই। যাইবার বয়স হয় নাই—বুড়া মা আছেন। তবে যাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তত আছি। কিন্তু পুরাণকার যে স্বর্গের কল্পনা করিয়াছেন, সে স্বর্গে যাইবার বড় একটা লালসা নাই। এই দিগন্তব্যাপী সুনীল নভোমণ্ডলের উপরিভাগে পৌরাণিক এক বিচিত্র সৌরাজ্য কল্পনা করিয়াছেন, সে রাজ্যে একজন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা আছেন—ইন্দ্র; চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা তাঁহার সভাসদ। সেখানে সোণার থাম, মতির ঝালর, হীরার রাস্তা ঘাট আছে। পানীয় অমৃতধারা। কোকিলকণ্ঠী পরমা সুন্দরী অপ্সরাবৃন্দ সর্ব্বদা নাগরিকগণের চিত্তবিনোদন করিতেছে। পারিজাতের অতুল সুরভিতে সে রাজ্যের বায়ুস্তর নিয়ত সুগন্ধি। চিরবসন্ত সেখানে বিরাজিত, মৃদুমন্দ মলয় সেখানে সতত সঞ্চারিত। এ হেন স্বর্গ বাস্তবিক লোভনীয় বটে, কিন্তু স্পৃহনীয় নহে। এখানে ভোগের আয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ভোগে অবসাদ আনে; তাহাতে সুখ আছে, তৃপ্তি নাই, যেখানে কেবল ভোগের আয়োজন সেখানে কাম আছে, মোহ আছে। কামক্রোধমোহপূর্ণ এ স্বর্গ আমি ত চাহি না। যদি মৃত্যুর পরপারে এমন স্বর্গ থাকে, যেখানে কামনার সুমিষ্ট যাতনা নাই, যেখানে সুখও নাই দুঃখও নাই, যেখানে কেবল সৎ-চিৎ আনন্দ বিরাজিত, সে স্বর্গে যাইতে সদাই আকাঙ্ক্ষা আছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে কি এ স্বর্গ দেখিবার সুযোগ নাই? মনে হয়, নিশ্চয়ই আছে। মনে হয় এই মর্ত্ত্যই স্বর্গ! এই মর্ত্ত্যই নরক! মনে হয় স্বর্গ, নরক এই মর্ত্তেই আছে, অন্যত্র নাই। যিনি এতটুকু অপকর্ম্ম করিয়াছেন, তিনিই অনুতাপের জ্বালায় একটু না একটু নরক যন্ত্রণা নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। আবার যিনি একদিনও নিষ্কামভাবে জীবের সেবা করিয়াছেন, স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, সত্যের সন্ধান করিয়াছেন, তিনি চির আনন্দময় এই স্বর্গের কিঞ্চিৎ আভাস হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেনই। ত্যাগ, সেবা, সত্যই প্রকৃত স্বর্গের সোপান। মৃত্যুর পরপারে অন্য কোনও স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা নাই—আকাঙ্ক্ষা আছে—এ জন্মে ত হইল না—যেন এই মর্ত্তে পুনরাগমন করিয়া সত্য,সেবা, ত্যাগের সাধনা করিতে পারি। তাহাতে আনন্দ মিলিবে, তৃপ্তি মিলিবে, স্বর্গ মিলিবে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

নববর্ষ।

হৃষ্ট কুক্কুটের ডাকে, চঞ্চল কাকের পাখে
এল এল ওই নববর্ষ,
উষার সোণার থালে গোলাপের ফিকে লালে
নবীনের রাঙ্গা পদস্পর্শ।
বেলা যূথিকার ঠোঁটে উৎসবের হাসি ফোটে
মালঞ্চ ঝুলনা বাঁধে রঙ্গে,
আনন্দে নিদাঘ বায় মাধবী মঙ্গল গায়
দোল খেলে কুসুমের সঙ্গে।
আবার সরসী বুকে ঢেউ তুলি নাচে সুখে
অঠাঁই মাঝারে দেয় ঝম্প,
ঘুমবিজড়িত আঁখি চমকি উঠেছে পাখী
পাতায় পাতায় প্রাণকম্প।
পাখীর গলায় বেণু শুনি হাম্বা ডাকে ধেনু
ফেলিয়াছে ছিঁড়ি সব বন্ধ,
নব-পঞ্জিকার পাতে প্রকৃতির নিজ হাতে
আবাহন-গীতি-অনুবন্ধ।

বঁধুর চুমোটি ঠোঁটে বধূ শয্যা হ'তে ওঠে
কি মোহিনী করিয়াছে লজ্জা,
হেরে বাতায়ন পথে অতিথ কে আসে রথে
ভুলে' গেছে সামালিতে সজ্জা।
পুত্রবতী ভাবে,—ফিরে ফুলশয্যা হবে কিরে
সে দিনেরই মত কাঁপে বক্ষ,
আগুনের মত গাল পরাণে চেলীর লাল
ভিজা কেন কাল আঁখি পক্ষ।

খোকা কেন অকারণে　　দৃঢ় করি আলিঙ্গনে
　　খুকীরে করিছে ব্যতিব্যস্ত,
চপলা দাদার হাতে　　যেন এ মধুর প্রাতে
　　প্রাণ মান করিয়াছে ন্যস্ত।
ওদিকে বুড়ার দল　　করিতেছে কোলাহল
　　প্রাণে প্রাণে এ যে লাল চিহ্ন,
কোথা রঙ্ কোথা ফাগ্　　কবে ধু'য়ে গেছে দাগ
　　আবিরের থ'লে শতছিন্ন।

সুদীর্ঘ বারটী মাস　　সহিয়াছি উপবাস
　　বড় আশ পাব তব দর্শ,
স্বাগত মাধবীনাথ　　সুপ্রভাত সুপ্রভাত
　　এস হর্ষ, এস নববর্ষ।
পুরাতন হও দূর,　　হোক্ আজ চূর চূর
　　তব সনে বিদ্বেষের স্তম্ভ;
তোমার রথের ধূলি　　মিলনতীর্থের কলি
　　ভালে মাখি প্রেম হল দম্ভ।
সংসারের খেলা-ঘরে　　মিলেছিনু একত্তরে
　　কবে হয়েছিল দলভঙ্গ।
সে কথায় কাজ নাই　　ভাই চিরদিনই ভাই,
　　অনাদৃতে দাও পুন সঙ্গ।
আজি মার্জ্জনার লাগি　　তোমাদের কৃপা মাগি
　　দুয়ারে দাঁড়ায়ে যোড় হস্তে,
আর থাকিও না সরে'　　কোল দাও প্রাণ ভরে'
　　পদধূলি দাও মোর মস্তে।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

সাহিত্য ও মানব-হৃদয়

কবে কোন প্রথম বসন্তদিনের শুভ মাহেন্দ্রমুহূর্ত্তে সাহিত্যের রসধার ব্রহ্মকমণ্ডলুবিহারিণী মন্দাকিনীর মত দগ্ধমানবের হৃদয়ব্রণের উপর শীতলধারা ঢালিবার জন্য কোন দেবতার কমণ্ডলু হইতে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহার সময় নিরূপণ দুঃসাধ্য, অসাধ্যও বোধ করি বলা যায়। ছন্দোময়ী গাথা যেমন একদিন জীবনসঙ্গীর বিয়োগবিধুরা ক্রৌঞ্চবধূর হৃদয়বেদনায় রত্নাকরের মানসকন্যারূপে এ ধরায় জন্মলাভ করিয়াছিল, সাহিত্যের প্রথম রসধারা তেমনি কোন্ আদিযুগে বুঝি বা মানবের মর্ম্মপীড়ার মহৌষধিরূপে মহৈশ্বর্য্যময় স্বর্গলোক হইতে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত নামিয়া আসিয়া আজও বসুন্ধরার সন্তান সন্ততির সন্তাপহরণের উপায় হইয়া রহিয়াছে। প্রিয়বিরহ ও অপ্রিয় সম্মিলনের অকরুণ আঘাতে অন্তর যখন কাঁদিয়া উঠিল, তখন এই ক্ষণবিধ্বংসি ধরার ক্ষণিক সুখের প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি দিয়া সত্য শিব সুন্দরের দর্শনের একান্ত আগ্রহে মানবমনে দর্শনশাস্ত্রের অঙ্কুরোদ্গমের সূচনা হইল; তখন কপিল, কণাদ, গৌতম, দ্বৈপায়ন তাঁহাদের অপার জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া সুধাপাত্র আনিয়া সংসারের তৃষ্ণার্ত্ত ওষ্ঠাধরের নিকট ধরিলেন, সে সুধার আস্বাদ সকলের ভাগ্যে ঘটে না, যাঁহারা তাহা পান করিয়াছেন, তাঁহারা পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন কি না তাহা তাঁহারাই জানেন। রোগের একান্ত মুক্তির অব্যর্থ মহৌষধ সকলের ভাগ্যে সকল সময় ঘটিয়া উঠে না, আপাত নিবারণের উপায়টুকু যদি পাওয়া যায় তাহাই পরম সৌভাগ্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও আচার্য্য-শঙ্করের মত চিকিৎসককে ডাকিয়া দুঃসাধ্য রোগের চিকিৎসা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। Burrows and Wellcomeএর আবিষ্কৃত অর্দ্ধরতি অহিফেনগুটিকার মত রসময় সাহিত্যের "সর্ব্বাঙ্গসুন্দর" বটিকার সাহায্যে দুরারোগ্য বেদনাময় আপাত ব্যাধির উপশম করিতে পারিলেই আমরা বাঁচিয়া যাই। কোন্ দয়াপরবশ দেবতার করুণায় এই "সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের" সৃষ্টি হইয়াছিল জানিনা, তাঁহার নাম Burrows কিনা তাহাও বলিতে পারি না, তবে উহা যে মানবসমাজের নিকট wel ome তাহাতে দ্বিধা করিবার কোন কারণই নাই। মানব-মনের চিরন্তন অমূর্ত্ত মানসী

---

* বর্দ্ধমান বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে সাহিত্যশাখায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

মর্ত্তবিশ্বের শোভাসৌন্দর্য্যের মধ্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আবির্ভূতা হইয়া পরম শোভাময়ী সৌন্দর্যময়ী প্রাণমনমোহকরী যাদুকরী মূর্ত্তিতে দর্শন দিতেছেন, তাই বহিঃপ্রকৃতি ষড়ঋতুর সৌন্দর্য্যসম্ভার লইয়া এমন শোভাময়ী। বসন্ত-বৈতালিকের মধুর কণ্ঠ, মলয়স্পর্শে উল্লসিত মালঞ্চের পুষ্পৈশ্বর্য্য, প্রাবৃটান্ত গগনের নয়নাভিরাম নির্ম্মল নীলিমা, শারদাকাশের সান্ধ্যরক্তরাগ ও পর্ব্ব-নিশাথিনীর পূর্ণ শশধর, উষাসুন্দরীর সীমন্তের সিন্দুরশোণিমা সবই আমার শ্রান্তক্লিষ্ট মনের উপর সুধা লেপ দিবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে, আমার অন্ধ নয়ন যে কিছুই দেখিতে পায়না; তাই যে দেবতার আশীর্ব্বাদবলে মানসসুন্দরীর প্রথম মূর্ত্তশ্রী মানবের কণ্ঠে আসিয়া বাণীরূপে দর্শন দিয়া নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, সেই পরম, দেবতার অসীম অনুগ্রহ ও পরম শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া বারবার তাঁহার চরণোপান্তে মানবসমাজ উদ্দেশে প্রণত হইতেছে। বাগ্দেবতার সেই প্রথমাবিভাবের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত মানবমন যখনই অভাব-সঙ্ঘাতে আর্ত্ত হইয়া উঠে, আর্ত্তিহারিণী মানসী অপূর্ব্ব শোভাসম্ভারে সমন্বিত হইয়া তখনই মানবের মানসস্বর্গে মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দেন—সে মূর্ত্তি কবি কাব্যে, ভাস্কর শ্রীমূর্ত্তিতে, চিত্রকর তুলিকাসাহায্যে চিরন্তনী করিয়া রাখিতে প্রয়াস পায়। অনন্ত সুন্দরের অখণ্ড অনাময় আনন্দের সন্দর্শন লাভ করিয়া আমরা জীবন্মুক্ত হইতে পারি না, দুঃখ-দৈন্য-আর্ত্তি-অভাব-পরিপূরিত এই ধরণীর ধূলিতলে আমাদিগকে জীবনযাপন করিতেই হয়, সে জীবন যখন দুঃখের বেদনায়, অভাবের তাড়নায়, বিরহবিয়োগের যাতনায় দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, তখন মানবহৃদ্‌বিহারিণী নানারূপময়ী মানসলক্ষ্মীর মর্ত্ত সৌন্দর্য্য সাহিত্যই আমাদের শান্তি ও সান্ত্বনার বিধান করে। ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়তটে সুখদুঃখের আন্দোলনে মানসবিহারিণীর কমলাসন যখন চঞ্চল হয়, রসাত্মক বাক্যের মধ্য দিয়া মানসীর মনোমোহিনী মধুরমূর্ত্তি তখনই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং সে মূর্ত্তি দেশকালপাত্র নির্ব্বিশেষে চিরন্তনী হইয়া সন্তাপদগ্ধ মানবমনের শান্তি সম্পাদন করে।

রামগিরিপ্রবাসী যক্ষের অস্তিত্ব কোন কালেই ছিল কিনা মেঘদূত পড়িবার সময় সে কথা কাহারও মনে আসে না, যক্ষের প্রিয়তমা "তন্বী শ্যামা," "মধ্যক্ষামা" কি শ্রোণীভারমন্থরা সে দৃশ্য কাহারও মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদয় হয় কিনা জানিনা, কিন্তু নববারিধরসমাগমে কেতকীকুটজগন্ধবাহী সমীরণের শীতস্পর্শে কালিদাসের ব্যাকুল বিরহ যে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই। বিরহী প্রবাসী মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে মন্দ মন্দ উচ্চারিত

মেঘদূতের অমরশ্লোকাবলী যখন পাঠ করে, তখন কালিদাসের করুণ বেদনা তাহার চতুর্দ্দিকে বিরহব্যথার জাল বয়ন করিয়া দেয়, একথা কে অস্বীকার করিবে? বর্ষার দিনে, বিরহের বিপুল বেদনার দিনে, মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা কেবল যক্ষের নয়, কালিদাসের নয়, বিশ্বের সমস্ত প্রিয়-সান্নিধ্যশূন্যজনের ভারাক্রান্ত মনে কি মম যন্ত্রণার সৃজন করে, তাহা প্রিয়-বিরহ-কাতর জনেই জানে। কালিদাসের মন্দাক্রান্তার অমরশ্লোকাবলী পাঠ করিতে করিতে যক্ষবিরহ পাঠকের বক্ষে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, দেশকালপাত্রের সমস্ত দূরতা বিদূরিত হইয়া যক্ষের কল্পিত করুণা আমার বাস্তব বেদনার সহিত মিশিয়া যায়, কবির বেদনার ছন্দোময়ী গীতি আমারই বিয়োগযাতনার যথাযথ অভিব্যক্তির রূপ ধরিয়া উঠে। তারকনিধনরূপ দেবপ্রয়োজনে কুমারের সম্ভব প্রয়োজনীয় হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, দেবকার্য্যে দগ্ধদেহ অনঙ্গের চিরসঙ্গিনী নব বৈধব্যবেদনাকাতর রতির সকরুণ বিলাপে যে বিশ্বের সমস্ত বিধবার হৃদয়বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অঙ্গীকার না করিয়া উপায় নাই। বসুধার আলিঙ্গনে ধূসরিতস্তনী কন্দর্প-মনোমোহিনীর নববৈধব্যের অসহ্য বেদনার মর্ম্মভেদি-বিলাপ প্রত্যেক বিধবার প্রিয়তমের চিতাবহ্নির দুঃসহ তাপ হৃদয়ের মধ্যে কেমন করিয়া জ্বালাইয়া তোলে, তাহা প্রিয়-দয়িত-বিয়োগ-কাতরা প্রিয়াই বলিতে পারে। পৌরাণিক আখ্যানমতে গিরিরাজনন্দিনী তাঁহার চিরপ্রার্থিত দেবাদিদেব মহৈশ্বর্য্যময় মহেশ্বরকে লাভ করিয়াছিলেন, তারকাসুরনিধনকারী দেবসেনাপতি কুমারের সম্ভবে ব্যাঘাত হয় নাই, দেবকার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া দেবতার আনন্দনিবাস স্বর্গলোক নিষ্কণ্টক হইয়াছিল, সর্ব্বপ্রকার মনোভীষ্ট লাভে সকলেই সফলমনোরথ হইয়াছিলেন, কেবল কন্দর্পের চিরসঙ্গিনী, অনঙ্গের চির সাহচর্য্যের একান্ত অভিলাষিণী স্মরপ্রিয়া তাঁহার প্রাণপ্রিয় চির-আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী কামদেবের হরকোপানলে ভস্মাবশিষ্ট দেহাবশেষের নিকট উন্মুক্তকুন্তলে রোদন করিয়া চতুর্দ্দিক শোকাকুলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন; সেই শোক অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া উজ্জয়িনীর অমরকবি তাঁহার বিলাপগাথায় তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। রতির হৃদয়বেদনা বিক্রমসভার কবিশ্রেষ্ঠের লেখনীমুখে নিঃসৃত হইয়া আজ পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্বের নববৈধব্যশোকাচ্ছন্ন সদ্যোবিধবার অব্যক্ত মর্ম্মবেদনার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে।

দাক্ষায়ণীর শবদেহস্কন্ধে মহৈশ্বর্য্যময় মহেশ্বরের তাণ্ডবনৃত্য কবিকল্পনার কি অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর চিত্র তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। চক্রীর চক্রে

বহুধা বিভক্ত সতীদেহ যেখানেই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই স্থানই আজ পর্য্যন্ত মহাতীর্থ বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছে—এ পূজা দেবত্বের নিকট নহে—ভুজঙ্গে ও মণিমাল্যে যাঁর সমদৃষ্টি, মহীমহেন্দ্র ও নগণ্যে যিনি ভেদজ্ঞান রহিত, চন্দনে ও চিতাভস্মে যাঁহার সমজ্ঞান; বিষে অমৃতে যাঁহার কোন প্রভেদ নাই, সেই সর্ব্বত্যাগী শ্মশানবিহারীর ঐকান্তিক একনিষ্ঠ প্রেমের নিকট দেশকালনির্ব্বিশেষে কোটি কোটি মানবের মস্তক অবনত হইতেছে। যুগযুগান্ত পূর্ব্বের মহাকবিকল্পিত মহাপ্রেমের নিকট মানবের এই স্বেচ্ছাকৃত প্রণিপাত প্রেমমাহাত্ম্যের অপূর্ব্ব গৌরবের অকাট্য ও অবিনশ্বর প্রমাণ। এই মহাযোগী মহাজ্ঞানী মহাপ্রেমিকের প্রেমের ধন বলিয়াই শিবানীর শবদেহের অংশ যেখানে পড়িয়াছে, সেই স্থানই আজি মহামহিমময় দেবীপীঠ বলিয়া খ্যাত।

শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্ম্মসম্পদ ও কাব্যসৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ সাহিত্য জগতে অপূর্ব্বসৃষ্টি—কবিহৃদয়বাসিনী সুন্দরী মানসীর মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তশ্রী এমন আর কোথাও বিকশিত হইয়াছে কিনা জানি না। সুখদুঃখ হর্ষামর্ষ কৃপাক্রোধ মিলনবিরহের অনেক কথা কবি অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; বসুদেব দেবকীর কারানিবাসের করুণকাহিনী, নন্দ-যশোদার অপূর্ব্ব অপত্যস্নেহ, ব্রজবালকের সুধাময় সখ্য, সাক্ষান্মন্মথের মন্মথরূপী, বনমালা বিভূষিত, পীতাম্বর, ব্রজসুন্দরের চরণারবিন্দে বৃন্দাবনবাসিনী আভীররমণীর অচলামতির সদ্যঃফল জীবন্মুক্তি, মহারাসবিলাসিনী পরম প্রেমময়ী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতীর শ্যামসুন্দরে অপূর্ব্ব অনুরাগ ভারতসাহিত্যের অমূল্য মণিময় সম্পদ।

বৈদিক সময়ের ঊষা অরুণ ইন্দ্র বরুণের স্তুতিগীতি, ঔপনিষদিক যুগের কথাচ্ছলে ব্রহ্মোপদেশ, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির পৌরাণিক ইতিকথা, মহাশ্বেতা পুণ্ডরীক প্রভৃতি অর্দ্ধপৌরাণিক চরিত্রচিত্র, পুরাণবর্ণিত দেবমানব চরিত্র অবলম্বনে শকুন্তলা উত্তররামচরিত কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য ও নাটক এবং মৃচ্ছকটিক মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতির সামাজিক অবস্থাবর্ণন—এই সমস্ত উপলক্ষ্য করিয়া কবিহৃদয়ের অপরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দুঃখদীর্ণ অভাবপূর্ণ মানবমনের কি অমৃতপ্রলেপ তাহা কাব্য-কুঞ্জের সাহিত্যিক ষট্‌পদবৃন্দের অবিদিত নহে।

কবিগুরু অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যা-দশরথের রামবাৎসল্য ও অযোধ্যাবাসী নরনারীর রামনির্ব্বাসনের অরুন্তুদ করুণা সুনিপুণ হস্তে রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে দুঃখ বিস্মৃত হইতে পাঠকের অধিক সময় লাগে না, সীতানির্ব্বাসনের

অপার করুণা আজও ভারতবাসি-নরনারীর মনে শেলসম বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কালের প্রলেপ সে ক্ষত-বেদনার কিছুই করিতে পারে নাই।

কুমারসম্ভবের উমা তাঁহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য ও প্রথমোদ্ভিন্নযৌবন লইয়া হরযোগভঙ্গে বিফলমনোরথ হইলেও তপস্যার বলে তাঁহার চিরাকাঙ্ক্ষিতকে লাভ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সাময়িক ব্যর্থতার বেদনা মানবের মনে চির-স্থায়ী হইয়া নাই, কিন্তু স্মর-সঙ্গিনীর বৈধব্যের ব্যথা আমরা ভুলিতে কি পারি? ঊনবিংশ সর্গে সমাপ্ত রঘুবংশের সবই আমরা ভুলিয়া যাই, নবোঢ়া ইন্দুমতীর অকালবিরহে অজের বিলাপ প্রিয়াবিরহিত জনের মনে জাতমূল হইয়াই থাকে। নন্দদুলালের বৃন্দাবনলীলা মাধুর্য্যের অপার পারাবার—দাস্য, সখ্য বাৎসল্যের তরঙ্গভঙ্গে সে সুধাসমুদ্র নিত্য লীলায়িত; অনঙ্গবর্দ্ধন বংশীনিনাদে প্রেমোন্মাদিনী আহিরিণীর রজনীযোগে বনপথে প্রয়াণ, কুটিলকুন্তল শ্রীমুখের প্রতি অপলক দৃষ্টিদানের ব্যাঘাতস্বরূপ কৃষ্ণতার নয়নের ঘনপক্ষ্মদাতা বিধাতাকে ধিক্কার দান, গোপকামিনীর প্রগাঢ় প্রেমের কি প্রচুর প্রমাণ, তাহা গোপি-গীতার পাঠকেই জানে, কিন্তু এ সকল রসতরঙ্গ হৃদয়তটে নিত্য আঘাত করে কিনা জানি না, যেদিন আহিরিণীর নয়নজলে যমুনার জলতরঙ্গ বৃদ্ধি করিয়া রাধাহৃদয়ের আশালতা সমূলে উৎপাটিত করিয়া—যে দিন শ্রীহরি শ্রীমতীর শতবৎসরব্যাপী বিরহের ব্যবস্থা করিয়া অক্রূরের রথে আরোহণ করতঃ বড় সাধের ব্রজধাম ত্যাগ করিলেন, "পাদমেকং ন গচ্ছামি" সত্যের মর্য্যাদা যে দিন তিনি ভঙ্গ করিলেন, রাধাহৃদয়ের সে দিনের করুণা, হরিবিরহের সে দুঃসহ বহ্নি, মানব সমাজ আজও ভুলিতে পারে নাই, কারণ বৃন্দাবনলীলা যে নিত্যলীলা, মানবের হৃদয়ভূমিই যে নিত্য বৃন্দাবনধাম।

বৈচিত্র্যময় ধরণীতলে মানবজীবন নানা সুখদুঃখের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতেছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখের মধ্যে আমাদের দৈনিক জীবন বহিয়া যায়, সে সুখের স্মৃতি আমাদের মনে চিরন্তন হইয়া থাকে না, কিন্তু দুঃখের ক্ষুরধার অস্ত্রে যে ক্ষতচিহ্ন রাহিয়া যায়, সে দাগ জীবনে মিলাইবার নহে। সাহিত্যের মধ্য দিয়াও যখন আমরা দুঃখের বার্ত্তা পাই, সে দুঃখ আমাদের মনে চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। অশ্রুজলের প্রস্রবণধারায় তাহা ধুইয়া ফেলিবার চেষ্টা আমাদের বৃথা চেষ্টা।

কেবল পৌরাণিক সাহিত্য নহে, নববঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও আমাদিগকে সুখের চিত্র দিয়া ভুলাইতে পারেন নাই। সূর্য্যমুখীর

সুখের সংসার আবার ফিরিল ; সে সুখ আমাদিগকে সুখী করিল কিনা জানিনা, ক্ষুদ্র কুন্দের দুঃখ আমাদের মনের উপর গুরুভার বিন্ধ্যাগিরির মত চাপিয়াই আছে। রবীন্দ্রনাথের আশার আশা মিটিয়াছিল, কিন্তু বিনোদিনীর বিনোদনের উপায় গ্রন্থকার কিছুই করেন নাই—বিহারীর প্রত্যাখ্যান বিনোদ ও পাঠকের মনে শেলসমই বিঁধিয়া রহিয়াছে।

ভ্রমর এবং গোবিন্দলালের প্রথম জীবন সুখেই কাটিয়াছিল সে সুখের চিত্র আমাদের মনে ক্ষণস্থায়ী, তাহাদের দুঃখময় পরিণাম পাঠককে অসহায় ভাবে অভিভূত করিয়া দেয়। ভ্রমপ্রমাদের হাত হইতে কেহই এ সংসারে নিস্তার পায় না, ইহারাও পায় নাই, অবশিষ্ট জীবনকাল ইহারা যে দুঃখে কাটাইয়াছে এবং যে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে ইহাদের অবসান হইয়া গিয়াছে তাহা মনে আসিলে অশ্রুজলে পাঠকের কণ্ঠরোধ হইয়া যায় এবং প্রথম জীবনের সুখময় দিনগুলি নৃত্যভঙ্গীতে অতিবাহিত হইলেও সে স্মৃতি পাঠকের মন হইতে মুছিয়া গিয়া কেবল তাহাদের দুঃখেরই কথা আমাদের মনে ভারের মত চাপিয়া বসিয়া থাকে। নীতিবিৎ হয় তো রোহিণীর দুঃখে কাতর হইবেন না, কিন্তু হরলালের অর্থের লোভ এবং বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া রোহিণী গোবিন্দলালের অজ্ঞাতসারে তাঁহার পরমোপকার সাধন করিয়াছে উহা যে প্রেমের প্রেরণায় করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই এবং সেই প্রেমাশ্রিতা রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া অনেক পাঠকের চক্ষু অশ্রুভারাকুল হইয়া আসে।

সন্ন্যাসী চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে ফিরিয়া পাইয়া আবার সংসারী হইয়াছিল, কিন্তু সংসারে থাকিয়াও চিরসন্ন্যাসী প্রতাপের ব্যর্থপ্রেমের পদতলে হাস্যমুখে স্বেচ্ছাকৃত আত্মবিনাশের সকরুণ কাহিনী হতভাগ্য পাঠককে কেমন করিয়া শোকাকুলিত করিয়া তোলে তাহা চন্দ্রশেখরের পাঠকবর্গের কাছে অবিদিত নাই।

মাইকেলের মেঘনাদ বঙ্গভাষার কবিতাগ্রন্থের মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে—কবি দক্ষতার সহিত সুনিপুণ হস্তে নানা সুখের চিত্র আঁকিয়াছেন, রামলক্ষ্মণের ভ্রাতৃবাৎসল্য, বিভীষণের ন্যায়পরতা, সরমার সীতার প্রতি সহানুভূতি কিছুই পাঠকের মনে স্থায়ী স্থান লাভ করে নাই। দশম সর্গে ইন্দ্রজিতের অবসানের পর বিয়োগকাতরা প্রমীলার সহমরণদুঃখ এবং দাম্ভিক বীর্য্যশালী ভোগী বীরাগ্রগণ্য রাজাধিরাজ রাবণের শোকনম্র হৃদয়ের বৈরাগ্য ব্যথা পাঠকের অন্তর চির-বেদনাতুর করিয়া রাখিয়াছে।

অশান্ত আকাঙ্ক্ষা পঞ্জরপিঞ্জরে চঞ্চল বিহঙ্গের মত চির-অস্থির হইয়াই আছে, জীবনভরা তপস্যা করিয়াও প্রিয়-লাভের বাসনা আমাদের তৃপ্ত হয় না, তাই সংসারের দৈনিক জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ নিত্য আসে ও চলিয়া যায়, আমাদের অন্তরপটে কোন চিহ্নই রাখিয়া যাইতে পারে না। একান্ত আগ্রহ ভরে আমাদের পরমপ্রিয় পদার্থটির প্রতি একাগ্র দৃষ্টি আমরা রাখিয়াছি জীবনব্যাপী আরাধনা ব্যর্থ করিয়া দিয়া কামনার ধন যখন আমাদের প্রসারিত হস্ত হইতে দূরে প্রস্থান করে, সে দুর্ণিবার দুঃখ আমাদের সমস্ত অবশিষ্ট জীবন কালকে বিষাদময় করিয়া দেয়—সাহিত্যের মধ্যেও যখন আমাদের হৃদয়স্থ বিষাদ বিষণ্ণতার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই, আমারি হৃদয়ের অভিব্যক্তি বলিয়া উহা আমাদের অন্তরফলকে চিরমুদ্রিত হইয়া যায়, অপ্রাপ্ত-জীবন-সর্ব্বস্বের নিবিড় বেদনা তখন নিবিড়তর হইয়া বিষাদের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে কাঙ্গাল থাকিয়াই আমাদিগকে এ জীবনের নিকট চিরবিদায় লইতে হয়—তাই

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
 পারে যারা যাবার গেছে পারে,
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে
 সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে!
"কূলের বা'র নাইকো যার ফসল যার ফল্‌লোনা
 দুঃখের কথা ব'লতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো সাঁঝের আলো জ্বল্‌লোনা
 সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।"

মহাকবির এই করুণ উক্তি পাঠ করিয়া এতাদৃশ অবস্থাপন্নের মনে কি হয় তাহা সেই জানে।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

অন্ধ আবেগ।

গাইতে গিয়ে সুরটিরে যাই ভুলি',
চিন্‌তে লক্ষ্য নয়ন যখন খুলি',—
চারদিকেতে আঁধার-করা ধূলি
লাগায় ধাঁধাঁ, তাই তো মুদি আঁখি।
ভাব্‌নারে যাই ভুলে' ভাব্‌তে গেলে ;
চল্‌তে গিয়ে দাঁড়াই চরণ ফেলে'।
ঘুমুতে চাই যখন, চক্ষু মেলে'
কেমন যেন অবাক হয়ে'ই থাকি।
সত্য বলে' জড়িয়ে ধরি যা'রে,
স্বপ্নসম মিলায় অন্ধকারে।
মায়ার মোহে পথটি বারে বারে
এমনি করে' হারিয়ে ফেলি তা'ই।
কাঁদ্‌তে চাহি, কান্না নাহি আসে ;
বুকটা ভরা কেবল দীর্ঘশ্বাসে !
জীবন-পথে শুধুই আশে পাশে
সংখ্যাবিহীন বাধাই দেখ্‌তে পাই !
হায়রে, এমন আপনা-ভোলা প্রাণে
কোথায় যে'তে যাব যে কোন্‌খানে,
কেমন করে' কইব ? কেই বা জানে—
কোথায় গেলে শান্ত হ'বে মন।
ভুলকে যতই রাখ্‌তে চাইরে দূরে
ততই যে তা'র মাঝে বেড়াই ঘুরে' !
কেন রে আজ আমার মরম-পুরে
এ কা'র শুনি কিসের আবাহন ?

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

ব্যর্থতা

(১)

সুভাষিনী মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া স্বামী নরেশচন্দ্রকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অত্যন্ত অনুনয় করিয়া যান। কিন্তু নরেশ আজ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই, করিবে বলিয়া ত মনে হয় না। এক বৎসর অতীত হইল নরেশচন্দ্র বিপত্নীক হইয়াছে। এই এক বৎসর যে কেমন করিয়া অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা নরেশের মুখের প্রতি চাহিলেই বুঝিতে পারা যায়। হাস্যময় যুবকের মুখে হাসি নাই। যৌবন-সুলভ স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের উপর এমন একটা ইচ্ছাকৃত অযত্ন ও অবহেলার মলিন ছায়া পড়িয়াছে, যাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংসারে থাকিতে হয় বলিয়াই যেন কোন রকমে সে আছে। কোন দিক হইতে একটা নিবিড় স্নেহবন্ধন তাহার উপর অখণ্ড আধিপত্য সংস্থাপন করিতে অক্ষম জানিয়া, সে তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

বসন্তনগর গ্রামে নরেশচন্দ্র ঐশ্বর্য্যশালী জমিদার। আজ কয়েক বৎসর হইল সে ওকালতী পাস করিয়াছে। কিন্তু কেহ তাহাকে একদিনের জন্যও আদালত মাড়াইতে দেখেন নাই। বহু শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট এই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত জমিদার-পরিবার অধুনা লোকবিরল। নরেশচন্দ্র একমাত্র বংশধর।

বহু কন্যা অনুসন্ধানের পর সুভাষিনীকে, নরেশের পিতা ব্রজদুর্ল্লভবাবু পুত্রবধূরূপে মনোনীত করেন। তিনি সম্ভবাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া নরেশের বিবাহে সমস্ত গ্রামব্যাপী আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন। নরেশের বিবাহের পাঁচ বৎসর পর, সে বৎসর গ্রামে ভীষণ মহামারী দেখা দিল। গ্রামে হাহাকার পড়িল। ব্রজদুর্ল্লভবাবু লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া ঔষধ বিতরণ করিলেন। কিন্তু মহামারী গ্রাম ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, মহামূল্য দুইটী জীবন বলি লইয়া প্রস্থান করিল—তাঁহারা নরেশের জনক-জননী।

কল-কোলাহল-পরিপূরিত, নিত্য-মহোৎসব-মুখরিত জমিদার-ভবন এখন অভিনয়ান্তে রঙ্গমঞ্চের মত নীরব, নির্জ্জন ও নিরানন্দ। কর্ম্মচারিগণ দপ্তরখানায় বসিয়া কাজ করে অতি সাবধানে, আশঙ্কা পাছে গোলমাল হয়। একটা জমাট বিষাদমলিন ছায়া, জমিদার-গৃহের সর্ব্বদিকেই প্রতিদিন মসীকৃষ্ণবর্ণে ঘনাইয়া উঠিতেছিল। অন্নাভাবে দরিদ্র যখন ভিক্ষাপাত্রহস্তে একমুষ্টি অন্নের নিমিত্ত বুকভরা আশ্বাস লইয়া দ্বারে দাঁড়াইত, তখন শ্রীহীন

জমিদার-গৃহের পূর্ব্ব-গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিতে নয়ন অশ্রুসিক্ত যে না হইত, তাহা বলিতে পারি না।

বৃদ্ধ নায়েব হরিশঙ্কর বহু বার নরেশের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। পরম আত্মীয়স্বরূপ নায়েবের সকল কথা, নরেশ নীরবে শুনিত, কিন্তু কোন উত্তর দিত না।

(২)

নরেশের বাটীর উত্তর দিকে, প্রায় দুই রশি দূরে, স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথের অভিভাবক-বিহীন পরিবার একখানি পতনোন্মুখ ভগ্নবাটীতে বাস করিত। নরেন্দ্রনাথ অকালে মারা যান। তাঁহার মৃত্যুকালে একমাত্র নবমবর্ষীয়া কন্যা ইন্দিরা ও স্ত্রী লক্ষ্মীমণি ভিন্ন সংসারে অপর কেহ ছিল না। যৎসামান্য দুই চারি বিঘা জমিজমা যাহা ছিল, তাহা বন্ধক দিয়া ভদ্রতা, মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিতে অচিরেই সব প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গেল। ক্রমে দুই মুঠা অন্ন জোটাও কঠিন হইল। মুখ ফুটিয়া ভিক্ষা করা বা অন্যের নিকট দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করা, লক্ষ্মী-মণির পক্ষে মর্ম্মান্তক। গাছের ফল বিক্রয় করিয়া ও টুপি বুনিয়া দুই চারি আনা যাহা পাইতেন, কোন প্রকারে তাহাতে ইন্দিরার জন্যই অনেক দিন এক বেলার আহার সংগ্রহ হইত। ইন্দিরা খাইতে বসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিত "মা, তোমার ভাত বাড়লে না", তখন লক্ষ্মীমণি বহু কষ্টে আত্ম-গোপন করিতেন, পাছে সত্য কথা জানিতে পারিলে ইন্দিরার কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগে; সুতরাং বলিতেন "আজ যে মা মঙ্গলবার, আমাকে খেতে নাই।" কোন দিন বা একাদশী, পূর্ণিমার নাম করিয়া কন্যার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইতেন। অভেদ্য দুর্গের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর মধ্যস্থিত শত্রু-আক্রান্ত সৈন্যের ন্যায় দারুণ ক্ষুধার জ্বালা, দারিদ্র্যের কঠিন নিষ্পেষণ, লক্ষ্মীমণি অম্লান বদনে সহ্য করিতেন; কাহাকেও ঘুণাক্ষরে সেকথা জানিবার অবকাশ দিতেন না।

লক্ষ্মীমণির সহিত সুভাষিণীর বিশেষ ভাব ছিল। সুভাষিণী লক্ষ্মীমণির অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা হইলেও তাহাদের মধ্যে সখীত্বের দিক হইতে কোনরূপ বাধা ছিল না; সেটা বুদ্ধিমতী সুভাষিণীর গুণে। সুভাষিণী যখন জীবিত ছিলেন, তখন প্রায় তাহাদের নানারূপ সাহায্য করিতেন, ও নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। সুভাষিণী লক্ষ্মীমণিকে যথেষ্ট যত্ন করিতেন। তিনি যে জমিদারগৃহিণী আর

লক্ষ্মীমণি যে সামান্য দরিদ্র গৃহস্থবধূ, এমন একটা ভাব, কোন দিক হইতে কোন দিন তাঁহাকে জানিবার মোটেই অবসর দেন নাই। সে কারণ, লক্ষ্মীমণি সুভাষিণীর নিকট সকল অভাব, অভিযোগ, অসঙ্কোচে প্রকাশ যে না করিতেন তাহাও নয়। লক্ষ্মীমণি যখন বিধবা হইলেন তখন সুভাষিণী তাঁহার দুঃখ, অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত কোনরূপ আনন্দোৎসবে যোগ দেন নাই।

ইন্দিরা মেয়েটি মায়ের মত ধীর-প্রকৃতি, মুখে কথা নাই। এই অল্প বয়সে বেশ একটী সংযমের আভাষ তাহার শিশু-প্রকৃতিতে পরিদৃষ্ট হইত। অনর্থক কথা বলা বা অকারণ হাস্য মোটেই সে পছন্দ করিত না। মায়ের সঙ্গে টুপি বুনিয়া সে তাহাদের অবস্থা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিল। ইন্দিরাকে দেখিলে মনে হয় দরিদ্রের গৃহে ছলনা করিতে বুঝি বা স্বয়ং ইন্দিরারই আবির্ভাব হইয়াছে। ভ্রমর কৃষ্ণ মুক্ত কেশপাশ, প্রবালারক্ত অধরপল্লব, পদ্মকোরকের মত সৌন্দর্য্য। প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপের ন্যায় তাহার লাবণ্য, বীণার ঝঙ্কারের মত তাহার কণ্ঠস্বর। এত রূপ বিধাতা কেন যে, এই নিঃসহায়া দীনা বালিকার উপর মুক্তহস্তে ঢালিয়াছেন বিধাতাই বলিতে পারেন! কিন্তু, এত সৌন্দর্য্যসম্ভার লইয়াও ইন্দিরা সংসারে চিরদুঃখিনী। ইন্দিরার বিবাহের সময়, সুভাষিণী নরেশচন্দ্রকে দিয়া অযাচিতভাবে বিবাহের সমস্ত ব্যয় প্রদান করান।

দশ বৎসর বয়সে ইন্দিরার বিবাহ হয়। আর যে বৎসর সুভাষিণী ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন; তার পর বৎসর ইন্দিরা পনর বৎসর বয়সে উপনীত হয়। যৌবন-বসন্তের আগমনে যখন ইন্দিরা অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্য-সম্পদে ঐশ্বর্য্যময়ী, যখন চারিদিক হইতে একটা আনন্দের আবেশ-বিহ্বল চাঞ্চল্য, পদে পদে তার অন্তরের অবসাদ ও আলস্যের উপর সাড়া দিয়া চলিয়াছে, তৃষ্ণাকাতর অধরোষ্ঠের নিকট হইতে সহসা সুশীতল বারিপাত্র অপহরণ করার মত যৌবন প্রারম্ভেই বিধাতা ইন্দ্রিরার নারীজন্ম চিরজীবনের নিমিত্ত ব্যর্থ করিয়া তাহার স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন এবং দৈন্যের পসরা মাথায় তুলিয়া দেন। সে দিন এ দুঃসংবাদ শুনিয়া লক্ষ্মীমণি কন্যার মুখের দিকে কেবল স্তম্ভিত নির্ব্বাকভাবে চাহিয়াছিলেন; চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ইন্দিরাকে আরো অধিক করিয়া শোক সাগরে ভাসাইয়া লাভ নাই বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, তাহার নয়নপ্রান্তে এক বিন্দু অশ্রু দেখা যায় নাই। অন্তরে যে দুর্ব্বিসহ মর্ম্মবেদনা অহোরাত্র তাঁহাকে পীড়ন করিত, তাহা মাঝে মাঝে বক্ষের কঠিন কারা বিদীর্ণ করিয়া সকলে

অজ্ঞাতে অশ্রুধারায় ফুটিয়া উঠিত, কন্যাকে হৃদয়ে চাপিয়া সকল জ্বালা-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতে তিনি প্রাণপণ শক্তিতে প্রয়াস পাইতেন। সুভাষিণীর মৃত্যুর পরও নরেশচন্দ্র তাহাদের সাহায্য করিতেন।

(৩)

সে দিন সকালে অত্যন্ত মেঘ করিয়াছে। গগনস্পর্শী নারিকেল গাছগুলি যেন মেঘস্পর্শে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। নরেশচন্দ্র বাতায়নের সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিয়া একদৃষ্টে মেঘের একটানা স্রোত দেখিতেছিলেন। টেবিলের উপর কয়েকখানি বই পড়িয়াছিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহভিত্তিগাত্রে সুসজ্জিত চিত্রগুলি সহস্রবার দৃষ্ট হইলেও এক মনে পুনরায় দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে একটী আলমারীর নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। এ আলমারিটা সুভাষিণীর। আজ দীর্ঘ দুই বৎসর আলমারী আবদ্ধ; বহু পুতুল-পরিবার কয়েদী অবস্থায় রহিয়াছে। সুভাষিনীর স্পর্শসুখ হইতে তাহারাও নির্ম্মম ভাবে নির্ব্বাসিত। অনেকগুলি গ্রন্থ সুন্দররূপে বাধান,—তাহাদের উপর সোণার জলে নাম লেখা। সেগুলি কাচের প্রাচীরের ভিতর হইতে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছে। নরেশ দেখিল একখানি ক্ষুদ্র হস্তিদন্তের পালঙ্কের উপর মখমলের শয্যা—শয্যার উপর দুইটি সুন্দর চীনে মাটীর পুতুল শয়ান রহিয়াছে। তাহাদের কণ্ঠদেশে নানাবর্ণের পুঁতির মালা। সুভাষিণীর বহু সুখস্বপ্ন ও অপূর্ব্ব সুখসাধ এই আলমারী মধ্যে তাহাদের লইয়া নিবদ্ধ, তাহার কোমল হস্তের নিপুণ কলাকৌশল ও নারী-হৃদয়ের যৌবন-সুলভ অলীক কল্পনার মানচিত্রাবলি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিপূর্ণতার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল অন্তরে আলমারীর মধ্যে অপেক্ষা করিতেছে। নরেশচন্দ্রের মনে হইল, আলমারীটি খুলিয়া তাহাদের উপর সঞ্চিত ধূলারাশি বিদূরিত করেন; কিন্তু তাহা করিলে পাছে যেমনটি আছে, তেমনটি না হয়; সুতরাং বাহির হইতে দেখিয়াই তিনি সুখী হইলেন।

এমন সময় বাহির হইতে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে ইন্দিরা ডাকিল, "নরেশ-দাদা কি ঘরে?"

চিন্তাস্রোতে বাধা পাইয়া নরেশচন্দ্র ফিরিয়া দেখিল, একখানি অত্যন্ত মলিন, বস্ত্র পরিধান করিয়া ইন্দিরা দাঁড়াইয়া। তাহাকে দেখিয়া নরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "কিরে ইন্দু? ভিতরে আয়! ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

ভিতরে আসিয়া ইন্দিরা মেঝের দিকে চাহিয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিল "মার চার পাঁচ দিন জ্বর হয়েছে—কিছু খান না, জ্বরও খুব বেশী!"

"তা এত দিন কি কচ্ছিলি ? বাড়াবাড়ি না করে ত কোন কথা জানাস না।"

"আমি পরশু আস্‌তে চেয়েছিলাম—মা বল্লেন এ কিছু নয়, আপনিই সেরে যাবে।"

"তুই এখন যা, আমি একটু পরেই ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভাল কথা, এই টাকা পাঁচটা নিয়ে যা—বেদানা টেদানা আনিয়ে নিগে যা।"

"পাঁচ টাকা! এতটাকা কি হবে দাদা, দু'টাকা হলেই ত হবে এখন।"

"না, না, টাকা কটা নিয়ে যা। আরও অনেক দরকার আছে, ডাক্তারকে দিতে হবে কি না ? বুঝ্‌লি—হ্যাঁরে ইন্দু, আজকাল তুই যে বড় আসিস না ?"

"আমি, দিদির সঙ্গে দেখা করে চলে যাই—বাড়ী থেকে বেরুলে, মা বড় রাগ করেন" বলিয়া ইন্দিরা চলিয়া গেল।

যথাসময়ে ডাক্তার গিয়া লক্ষ্মীমণিকে দেখিয়া আসিলেন। নরেশচন্দ্র ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া বলিয়া আসিল, "আমি বৈকালে দিদিকে পাঠিয়ে দেব এখন; যদি কিছু আবশ্যক হয়, তবে তাঁকে দিয়ে বলে দিস্, ঠিক ঠিক সময় ওষুধ খাওয়াস—দুদিনেই সেরে যাবে।"

নরেশচন্দ্রের দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী উমাশশী এখন নরেশের সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনিও মাঝে মাঝে অবসর পাইলে, নরেশকে বিবাহ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন! নরেশ কিন্তু সে প্রস্তাবে কোন দিক হইতে ধরা দেয় না; বরং বলে আর কটা দিনের জন্য মিছে কেন ঝঞ্ঝাট বাড়ান।

(৪)

তখনও গগনপ্রান্তে প্রভাতের তারাটি মিলাইয়া যায় নাই—তখনও ভোরের বাতাসে পত্রান্তরালে পাখী গাহিয়া উঠে নাই—তখনও অরুণালোকের কনকবন্যায় শিশিরসিক্ত তৃণদল ঝলসিয়া উঠে নাই—কেবল মধুর স্নিগ্ধ বায়ু-স্পর্শে নরেশের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু তখনও তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সুভাষিনীর অনুযোগ। অনুনয় বিনয় করিয়া দুইটি হাত ধরিয়া এইমাত্র যেন তিনি তাহাকে বলিতেছিলেন "তুমি বিবাহ কর, এমন করে সকল সুখ বিসর্জ্জন দিও না।" :নরেশের: মনে হইল, যেন এতক্ষণ সুভাষিণী তাঁহারই শয্যাপ্রান্তে বসিয়াছিলেন। অমনি তাহার সর্ব্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। সে গৃহ হইতে তাড়াতাড়ি বহির্গত হইয়া গেল।

ফাল্গুন মাস। বসন্ত শোভাসম্পদে ভরিয়া উঠিয়াছে। পত্রে-পুষ্পে, আকাশে-

বাতাসে, আলোকে ও সর্ব্বত্র একটা পুলক-সংঞ্চার হইয়াছে। সকল দিক হইতে তার আগমনবার্ত্তা সাড়া দিতেছে। আম্রমুকুলের গন্ধে, কোকিলের কুহুস্বরে এমন একটা নিবিড় নেশা প্রতিক্ষণ ঘনাইয়া উঠিতেছিল, যে, তাহার অজ্ঞাতস্পর্শ হইতে ধরণী আত্মগোপন করিতে পারে নাই, এবং সকলকে তাহার নেশায় আকুল করিতেছিল। সকলের উপর যেন একটা সৌন্দর্য্যের অবাধ মোহাবরণ কখন আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা কেহই ধরিতে পারে নাই। একটা উৎসাহ, একটা নবীন জীবন, একটা নিরালম্ব কাঙ্গাল প্রণয়লিপ্সা, গভীর নিশীথে অকস্মাৎ বন্যার মত কখন আসিয়া প্রকৃতির স্তরে স্তরে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। নরেশচন্দ্রের মন আজ অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত; সে যে দিকে চাহিল, দেখিল প্রসন্নতা সকল মুখেই উদ্ভাসিত। নরেশ সম্মুখের পুষ্প কাননে সহসা প্রবেশ করিয়া বিনা কারণে কতকগুলি ফুল তুলিল। আজ কতদিন সে এ বাগানে আসে নাই; দেখিল বাগানের মধ্যে দুইটী বালক-বালিকা সাজি হাতে একধারে দাঁড়াইয়া আছে। বালিকার পরিধানে নীলাম্বরী। বালকের বাসন্তী রং এ ছোবান কাপড়। তরুণ অরুণের কনক-কান্তি তাহাদের সুকুমার সৌন্দর্য্যের উপর অপরূপ রূপলাবণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা নরেশকে তত ভোরে বাগানে দেখিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মুখের প্রতি চাহিতেই নরেশ তাহা বুঝিল। মেয়ে ও ছেলেটির অঙ্গে হাত বুলাইয়া স্নেহ-কোমলকণ্ঠে বলিল "কই, তোমাদের ফুল দেখি?" মেয়েটি ভয়জড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল "আমি বড় গাছের ফুল পাড়তে পারিনি," বলিয়া সাজি দেখাইল। বালক তাড়াতাড়ি দিদির কটীদেশ জড়াইয়া ধরিয়া মুখ লুকাইল। নরেশ দেখিল সাজিতে যৎসামান্য ফুল আছে। সে তখন অনেক-গুলি ফুল তুলিয়া দিল এবং একটী চাপা গাছের শাখা নীচু করিয়া ধরিলে আনন্দ-ক্ষিপ্র ক্ষুদ্র হস্তে আশাতীত অনেকগুলি ফুল তুলিয়া অগভীর চাহনিতে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মহা উল্লাসে বালক বালিকা চলিয়া গেল।

সেদিন নরেশ বাগানের মধ্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বসন্ত প্রভাতের এই অভিনয়টি একটা সুনিবিড় শূন্যতায় তাঁহার মন ভরিয়া তুলিল। তাঁহার প্রাণের ভিতর যেন একটা অজানা অভাব, বারংবার আকুল হইয়া উঠিতেছিল। সে যে কি সে ধরিতে পারিল না।

অপরাহ্নে যখন অস্তমিতপ্রায় সূর্য্যের সুবর্ণ-আভায় মেঘপুঞ্জ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন বসন্ত-সমীরের অধীরস্পর্শে নরেশচন্দ্রকে চঞ্চল করিল।

একটা অবাধ্য উল্লাসের তীব্র নেশা তাহাকে তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কখন যে আকুল করিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে টানিয়া বাহির করিল, তাহা নরেশ অনুভব করিতে পারিল না। সে সেই নেশায় দেখিল, যেন আজ একটা অসম্ভব সৌন্দর্য্যের বন্যায় বিশ্বের সর্ব্বস্থানে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে। সে বন্যা সকলকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। সে চাঞ্চল্য সকলকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতেছে। দেখিল সহস্রবার দৃষ্ট, সেই আকাশ, সেই সুনীল মেঘপুঞ্জ অপূর্ব্ব শোভাসম্ভার, অনন্তসৌন্দর্য্য, অধীর উল্লাসে আজ বিশ্বজয়ের জন্য যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে। পুষ্পবিতানেও সে আনন্দের জোয়ার লাগিয়াছে। সেখানে পুষ্পরাশিও যে পর্য্যাপ্ত ফুটিয়াছে। নরেশ বুঝিল না, কেন আজ তাঁহার সর্ব্বশরীর পুলকিত হইতেছে। একটা অজানা অভাব যেন মনে হইতেছে, তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নির্ম্মম আকর্ষণে পীড়িত করিতেছে। আজ নরেশের দেহ মন অকস্মাৎ নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। নরেশের চক্ষে ক্ষুদ্র তৃণটিও আজ এক অপরূপ রূপলাবণ্যে উদ্ভাসিত। কার্ণিশের উপর কপোত-দম্পতীর সুখসম্ভাষণে মুখামুখী বসা, আজ তাহার অনাবশ্যক জীবনে, নবীনজীবনের আলোকসম্পাত করিল। একটা অনাগত আনন্দের নবীন আলোকরশ্মি তাহার বিগ্রহ-বিহীন অন্ধকার হৃদয়-মন্দিরে আরতি-দীপ জ্বালিয়া দিল। তাহার অন্তরের মানুষটা আজ তাহার শূন্যতাকে পূর্ণতা দান করিবার নিমিত্ত তুপতুষ্ট দেবতার মত তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেশচন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া খুঁজিয়া লোকবিরল পথে বেড়াইতেছিল। সুখস্বপ্নের, সম্ভব অসম্ভব মূর্ত্তিগুলি তাহাকে চঞ্চল করিল। সন্ধ্যার পরই মাঠ পার হইয়া পল্লীপ্রান্তরস্থিত পুষ্করিণী অভিমুখে চলিল। সেই দিক দিয়া গৃহে ফিরিলে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার কেবল মনে হইতেছে, আজ যেন তাহার সকল কাজেই তার হৃদয়ের গোপনীয় কথাগুলি আপনা-আপনি ধরা দিবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

[৫]

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করিল "মা আজ কেমন আছ ?"

"বেশ ভাল আছি। আজ ত আর জ্বর হয় নি,—ইন্দু, তোর খাওয়া হয়েছে ?"

" হ্যা মা, হ'য়েছে। আজ দিদি আমাকে খাবার দিয়ে গিয়েছিল।"

লক্ষ্মীমণি বলিল, "ভগবান তাঁদের ভাল করুন, ওঁরা না থাকলে, আজ যে কি হ'তো, বলা যায় না।"

"তা সত্যি মা, নরেশদাদা খুব ভাল লোক, কিন্তু উনি কেবল ঘরে বসেই থাকেন। সে দিন দিদি বলছিলেন, কিছু কাজ কম্ম দেখেন না। হ্যা মা, একটা বিয়ে করা কি উচিত নয়?"

লক্ষ্মীমণি কোন উত্তর না দিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "একটু জল দে ত মা। হ্যাঁরে, একাদশী কবে জানিস্?"

জল গড়াইতে গিয়া ইন্দিরা দেখিল কলসীতে সামান্যমাত্র জল আছে, রাত্রে চলিবে না। তার জল না তোলা বড় ভুল হইয়া গিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে,—ধীরে ধীরে নীল আকাশে রজতকিরণ বিকীর্ণ করিয়া দশমীর চন্দ্র দেখা দিয়াছে। ইন্দিরা বলিল "কাল একাদশী মা!"

কাল একাদশী শুনিয়া লক্ষ্মীমণি কোন উত্তর করিল না। ইন্দিরা ভাবিল, মাকে বলিয়া এখন জল আনিতে যাইলে মা রাগ করিবেন। কিন্তু জল না হইলেও ত চলিবে না। যদি রাত্রে জল চান? আবার মনে হইল, কাল একাদশী! দিনের বেলা জল না তুলিয়া সে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে, একথাটাই অনেকবার ইন্দিরাকে আঘাত করিল।

পাড়ার বাহিরে, মাঠের ধারে, জমিদারদের "নূতন পুকুর"। যে বৎসর মহামারীতে নরেশের পিতামাতা ও বসন্তনগর গ্রামের অনেকেই অকালমৃত্যুর কঠোর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারে নাই, সে বৎসর নরেশচন্দ্র জনকজননীর স্মৃতিরক্ষার্থ বহু অর্থব্যয় করিয়া এই পুষ্করিণী খনন করান। পুষ্করিণীর জল নির্ম্মল, স্বাস্থ্যকর। এই পুষ্করিণীতে কাহারও স্নান করিবার আদেশ ছিল না। পানীয় জলের জন্য ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল; সম্ভবতঃ সেই কারণে পল্লীর বাহিরে, পুষ্করিণীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইন্দিরা দেখিল জননীর যেন অল্প তন্দ্রা আসিয়াছে, তিনি চুপ করিয়া আছেন। সে আর বিলম্ব না করিয়া গামছা ও কলসী লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। ইচ্ছা, মুহূর্ত্তের ভিতরে ফিরিবে, মা কিছু জানিতে পারিবেন না। বাহির হইতেই কেমন একটা শঙ্কা হইল। পরক্ষণেই মনে হইল, এ কিছু নয়। এমন সময় সে দিকে ত কেউ থাকে না,—আমি যাব আর আসব। ইন্দিরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দূর গ্রামপ্রান্ত হইতে, মাঠ পার হইয়া বসন্তের মৃদুমন্দ মলয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টার ক্ষীণ শেষ

রেষ মিলাইয়া আসিতেছে। দশমীর চন্দ্র আর একটু মাথার উপর উঠিয়াছে! তাহার অজস্র তুষারধবল শুভ্র রজতকিরণবন্যায় বনান্তরাল ও মাঠ ঘাট ডুবিয়া গিয়াছে। কোথাও একটু অন্ধকার নাই। বসন্তরাণী অনন্তযৌবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে, উৎকর্ণ হইয়া ব্যাকুলঅন্তরে প্রকৃতির মধ্যে কাহার পদধ্বনি শুনিবার জন্য যেন স্তব্ধ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন! ইন্দিরা ধীরে ধীরে, ঘাটের পাষাণ-সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া শেষ সোপানে গিয়া মুহূর্ত্তের জন্য হর্ষ-বিহ্বল অন্তরে দাঁড়াইল। সেদিন, সহসা তাহার যৌবনশ্রী স্বচ্ছ বারিদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্তরের মধূচ্ছ্বাসে আকুল হইল। ব্যর্থজীবনে, রূপলাবণ্যের জোয়ার নিস্ফল বেদনায় এমনি করিয়া সর্ব্ব দিক হইতে মাঝে মাঝে তাহাকে অধীর করিত। ইন্দিরা যখনই তাহার নিজের বিষয় চিন্তা করিত, তখনই সে দেখিত, বিধাতা তাহার হৃদয়চিত্রখানি অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র্যে অঙ্কিত করিবার সম্পূর্ণ আয়োজন করিয়া মধ্যপথে অসমাপ্ত রাখিয়া অন্তর্ধান করিয়াছেন। জলে কলসীর আঘাত লাগিবামাত্র, সহস্র তরঙ্গের মাথায় শশাঙ্কের উজ্জ্বল ভাতি নাচিয়া উঠিল ও তরঙ্গমালা তীরতটে প্রতিহত হইয়া ইন্দিরার চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বিশ্বপ্রকৃতির কোন স্থানে আজ দৈন্যের ক্ষীণ ছায়া পর্য্যন্ত নাই। মাঝে মাঝে, কোন অগীত সঙ্গীতে সুর মিলাইয়া বসন্তের কোকিল সবুজপত্রের অন্তরালে থাকিয়া থাকিয়া, ডাকিয়া উঠিতেছিল। আজ স্তব্ধ প্রকৃতি, যেন রুদ্ধ কথার দ্বার মুক্ত করিয়া দেউলে হইতে বসিয়াছে। ইন্দিরা আবেশ-বিহ্বল নয়নে পুষ্করিণী হইতে সিক্তবসনে পূর্ণকুম্ভ কক্ষে লইয়া যখন ঘাটের উপর দাঁড়াইল, তখন একবার চারিদিক চকিতে চাহিয়া দেখিল; দেখিল কেহ কোথাও নাই। তখন এখানে কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া, সোপানের উপর কলসী নামাইয়া গাত্র-মার্জ্জনা করিতে লাগিল। তখন নরেশচন্দ্র বেড়াইয়া অন্যমনস্কভাবে মন্থরগতিতে এই পথে, গৃহে ফিরিতেছিল। সহসা কলসী নামানর শব্দে তাহার চিন্তার স্রোত ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ইন্দিরার সর্ব্বাঙ্গ হইতে জলকণাগুলি চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত হইয়া উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট সহস্র সহস্র মুক্তার মত সোপানের উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল। নরেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিল। পল্লীপ্রান্তে এই লোকবিরল নির্জ্জন পুষ্করিণীতে কি এখন কেহ আছে? সে একটী বৃক্ষ অন্তরালে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল যেন সমগ্র বাগানে আজ আলোকোৎসব হইয়াছে। তরুপত্রের ভিতর দিয়া চন্দ্রের রজতরশ্মি সহস্র খণ্ডে পুষ্করিণীর কালজলের উপর শ্বেতপদ্মের

মত প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ঘাটের উপর নরেশের দৃষ্টি পতিত হইলে, সে নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের মত স্তব্ধ হইয়া গেল। বনদেবীর মত ও কে? দেখিল বারিসিক্ত বস্ত্রখানি যৌবনশ্রীর স্তরে স্তরে এমনভাবে বিজড়িত; যেন মনে হইল সূক্ষ্মবস্ত্রের উপর মণিমুক্তা ঝুলিতেছে, তাহার ভিতর দিয়া দেহের সমস্ত লাবণ্য পরিপূর্ণ গৌরবে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। তারপর নরেশ কেমন করিয়া ঘাটের নিকট আসিয়া পৌঁছিল তাহা সে বুঝিতে পারিলেন না, আজ তাহার নিকট বিশ্বের সমস্ত আনন্দ ও সৌন্দর্য্য মনে হইল, যেন এই সুন্দরী নারীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে মুগ্ধ হইল। ইন্দিরা দেখিল, কে যেন আসিতেছে, আশঙ্কায় সে কেমন হইয়া গেল—পাষাণসোপানশ্রেণী যেন তাহার চরণপ্রান্ত হইতে অপসৃত হইতে লাগিল—ইন্দিরা পাষাণের মত কঠিন হইয়া অপলক দৃষ্টিতে কেবল চাহিয়া রহিল।

নরেশ নিকটে আসিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে ইন্দিরা? এত রাত্রে এখানে কেন?"

ইন্দিরা দেখিল, সেদিন নরেশের দৃষ্টিতে একটা সৌন্দর্য্যমুগ্ধ বিহ্বল বিস্ময়! সে দৃষ্টি তাহাকে মুগ্ধ করিল। সে উত্তর করিল "জল তুলতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই নিতে এসেছি" "বলিয়া কলসী কক্ষে লইয়া প্রস্থান করিল।

নরেশ পাগলের মত আপনার শয়নকক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। টেবিলের উপর একটা বাতিদানে আলো জ্বালিতেছিল, মালী ফুলদানীতে কখন একটা ফুলের তোড়া রাখিয়া গিয়াছে। মুক্তবাতায়নপথে শয্যার উপর শশধরের সহস্র কিরণধারা পড়িয়া পুষ্প শয্যার মত সুন্দর দেখাইতেছিল। বড় আয়নাখানির সম্মুখে দাড়াইবার মাত্র নরেশ আপনাকে দেখিয়া আপনি শিহরিয়া, ত্রস্তে সরিয়া আসিল। সে কক্ষের কোন দিকে চাহিতে শঙ্কিত হইল। আজ নরেশের মনে পড়িল, সুভাষিণীর শেষ অনুরোধ, বিবাহ করিও। সর্ব্বদিক হইতেই সুভাষিণীর তিরস্কার-তীর, অনুযোগ-পূর্ণনয়ন দুইটা যেন গৃহের মধ্যে সহসা ভাসিয়া নরেশের দিকে নির্ম্মমভাবে উজ্জ্বল হইল। সে গৃহের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া বসিতে পারিল না। বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন পল্লী-প্রান্তের শস্য-শূন্য মাঠ হইতে, একটা দমকা বাতাস আসিয়া তাঁহার কর্ণে হা, হা রবে পরিহাস করিয়া, গৃহবাতায়ন দিয়া পুনরায় মাঠের দিকে চলিয়া গেল। নরেশ বারান্দা হইতে তাড়াতাড়ি ছাদে গিয়া উঠিল। সেখানেও সে এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না। দেখিল, শুভ্র-আলোকপ্লাবনে বিশ্ব আজ ডুবিয়া

গেল। তারপর কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতে পারে নাই। পরদিন কিন্তু গত সন্ধ্যার কথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। পাছে নরেশচন্দ্র সম্বন্ধে কেহ কিছু মনে করিবার একটা অবসর পায়, ইহা ভাবিয়া ইন্দিরা কুণ্ঠিত হইল। তাহারই মত যে নরেশের জীবন ব্যর্থও শূন্য এমন একটি করুণ নিবেদন নরেশের তরফ হইতে যে ইন্দিরার মনের নিকট ওকালতী না করিল, তাহাও নয়।

সেদিন সারারাত্রি নরেশের নিদ্রা আসিল না। নানা প্রকার চিন্তায় সে অধীর হইল। সে ভাবিল, ইন্দিরা কি আমায় দেখিয়া কোনরূপ কিছু মনে করিয়াছে? না, তাহা হইতে পারে না। আমি স্বপ্নেও ত ভাবি নাই, যে সন্ধ্যার পর বাগানে কেহ থাকিতে পারে! বাগানের ভিতর দিয়া বাড়ী ফিরিব, একপ কল্পনাই আমার আসে নাই। ইন্দিরা কেন, কোন স্ত্রীলোক যে বাগানে আছে, জানিলে ত আমি সে দিক দিয়া কখনই আসিতাম না। ইন্দিরা তাহা জানে। তারপর ইন্দিরার অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তাহার অন্তর সেদিন সহায় ভূতির করুণায় আকুল হইল। ইন্দিরার রূপযৌবন, যেন ইন্দিরার জীবনের উপর বিধাতার অকরুণ অভিসম্পাত বলিয়াই নরেশকে বারংবার পীড়া দিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, ইন্দিরা, যে দিন সংসারের সকল সৌভাগ্য, সকল আনন্দ চির দিনের নিমিত্ত বিসর্জ্জন দিল, সেদিন কিন্তু সে বোঝে নাই, সংসারের মধ্যে একটু স্থানও তার প্রয়োজন আছে! তখন এ সত্যটি উপলব্ধি করিবার মত সে বিজ্ঞ হইয়া উঠে নাই। সেদিন অনেক কথা বুঝিবার মত, অনেক নূতন ভাবই তাহার নিকট তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই! ইন্দিরা যে এত সুন্দর, নরেশ তাহা জানিত না। সেদিন, কিন্তু ছায়ালোকের মধ্যে নরেশের মনে হইয়াছিল, ইন্দিরা এ পৃথিবীর লোক নয়, সে স্বর্গের দেবী? আজ ইন্দিরার দুঃখ, ইন্দিরার অনাবশ্যক জীবনধারণ, নরেশকে বড় বেদনা দিল। তার ব্যর্থজীবন করুণ করিয়া সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল।

সেদিন, সকালে যখন নরেশ বাহিরে যাইতেছিল, দেখিল, রান্নাঘরের দ্বারে উমাশশীর নিকট ইন্দিরা দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে। সেদিকে চাহিতেই, ইন্দিরার সহিত তাহার চোখোচোখী হইল। ইন্দিরা কবাটের দিকে একটু ঘেঁসিয়া গিয়া যেন সলজ্জভাবে প্রকাশ করিয়া চক্ষু নত করিল। এই অল্প অবসরে

নরেশ দেখিয়া লইল ইন্দিরার দৃষ্টিতে অল্প পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অন্য দিন হইলে, হয়ত নরেশ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু সে দিন, সে আর সেদিকে তাকাইতে পারিল না। ধীরে ধীরে, বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। উমাশশী বলিল, "হ্যাঁরে ইন্দু ঐ নরেশ গেল না?"

"সকাল বেলা যে বেরিয়ে যাচ্ছেন, এখন বল্লে কিছু মনে করবেন না ত?"

"তুই যা না, কি আর মনে করবে?"

ইন্দিরা তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিল, নরেশ প্রায় অন্দরমহল ছাড়াইয়া বাহিরে যান আর কি। তখন সে অগত্যা পশ্চাৎ হইতে কোমল কণ্ঠে ডাকিল "নরেশ-দাদা!"

"কিরে ইন্দু?" বলিয়া নরেশ পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইন্দিরা অঞ্চলের খুঁট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "এই কাগজটা দেখুন ত? কাল দুপুরবেলা, আদালতের পেয়াদা দিয়ে গিয়েছে।"

নরেশ কাগজের দিকে তাকাইল কিন্তু একটীও অক্ষর স্পষ্ট দেখিতে পাইল না। দেখিল যেন অক্ষরগুলি রণক্ষেত্রে আহত সৈন্যের ন্যায় পরস্পরের ঘাড়ের উপর পড়িয়াছে। ইন্দিরা যে আর কখনও তার সামনে এমনভাবে আসিবে এটা নরেশ মনে করে নাই। তাই প্রথমটা সে কেমন হইয়া গিয়াছিল। পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া বলিল "কলেক্টারের খাজনা দেওয়া হয় নাই সেই জন্য। আচ্ছা, আমি নায়েবকে বলব এখন," বলিয়া নরেশ ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিল।

ইন্দিরা মাথা নীচু করিয়া বলিল "মাকে জিজ্ঞাসা করে যা বলেন বলব। কাগজটা কি আপনার কাছে থাকবে?"

নরেশ বলিল "তা, না হয়, নিয়ে যাও, কিন্তু আবার আজই দিয়ে যেয়ো। বেশী সময় নেই।"

ইন্দিরা ভাবিল, নরেশ দাদা পরোপকারী ভদ্র, শিষ্ট জমিদার। কিন্তু, বুদ্ধিমান হইয়াও তিনি কেন তাঁহার জীবন এমন বাঁকা পথে টানিতে গেলেন? হৃদয়ের স্বভাব, সে যখন পরের জন্য কাতর হয়, ভাবে, তখন পরের দোষটাও যেন তাহার মার্জ্জনীয় কার্য্য বলিয়া মনে হয়। অনেক সময় পরের কর্ম্মগুলিও এমনই একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আশ্রয়লাভ করিয়া সহনীয় হইয়া প্রকৃতির চক্ষে মোটেই ধরা পড়ে না। এই দুর্ব্বলতার হাত ইন্দিরাও আজ এড়াইতে পারিল না।

"লক্ষ্মীমণি সকল শুনিয়া বলিলেন—"তা কাগজখানা দিয়ে এলি না কেন?

"তুমিত তা বলনি।"

লক্ষ্মীমণি আর কিছু বলিল না, বুঝিল, ইন্দিরার ইচ্ছা টাকা কয়টী দিয়া তবে কাগজখানি দিতে হইবে।

ইন্দিরা আজ কাল বেশী করিয়া খাটে,—অনেক করিয়া টুপি বোনে; ফলে পরের অনুগ্রহের হাত হইতে মুক্তিলাভ করাই তার একান্ত বাসনা। ইহাতে তাহাদের বাহিক অবস্থার উন্নতি না ঘটিলেও স্বাবলম্ব অর্থে, মনে খুব বল পাইয়াছে। নরেশচন্দ্র যে ইহা বোঝে নাই তা নয়। অনেকক্ষেত্রেই আর তাঁহার সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই, বলিয়া তাহারাও তাহাকে অভাবের কথা জানায় না। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন নরেশকে একটু বিশেষ করিয়া লাগিল। মধ্যে এমন একটা ব্যাপার না হইলে, বোধ হয়, নরেশচন্দ্র কোন দিন এতটা খোঁজ রাখিতে পারিত কি না, সন্দেহ; আর পারিলেও এ বিষয় লইয়া এতটা চিন্তা করিবার কারণ থাকিত না। তখন ইন্দিরা গিয়া প্রয়োজন মত সাহায্য গ্রহণ করিত, এখন নরেশ মাসে মাসে দিদিকে পাঠাইয়া প্রয়োজন আছে কি না, জানিতে ভরসা করিয়া কোন কথা নিজ হইতে বলিতে, এখন নরেশ কুণ্ঠিত হয়। তখন ইন্দিরার কথা বড় মনে পড়িত না, এখন সদাসর্ব্বদা তাহার বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্মপটুতার কথা তাহার মনে আসিত। সেই সঙ্গে সঙ্গে, ইন্দিরার পারিপার্শ্বিক সকল গুণই ধীরে ধীরে, নরেশের মনের মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করিত, যে অনেক সময় নরেশ দেখিত, সারাদিনের মধ্যে অনেকখানি সময় তার অজ্ঞাতে, ইন্দিরার চিন্তায় কাটিয়াছে।

যে দিন হইতে, ইন্দিরা দেখিল এখন তাহাদের আর অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন নাই, সে দিন হইতে, সে তার নরেশদাদার বাড়ী যাওয়ার মাত্রা একটু বেশী বাড়াইয়া দিল এবং এই অতিরিক্ত যাওয়ার মধ্যে সে এতটুকুও সঙ্কুচিত হইত না। নরেশ যখন তখনই, ইন্দিরাকে তাহাদের বাড়ীর মধ্যে দেখিতে পাইত। তাহার চিন্তার গতি ভিন্নরূপ ধারণ করিল। দেখিল ইন্দিরা অসন্তুষ্ট হইয়া যে সাহায্য অবহেলা করিয়াছে তাহা নয়, মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতারই শরণ লইয়াছে। সাহায্য না লইয়া, সে যেন সাধারণকে তাহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন রূপ ভাবিবার কিছুমাত্র অবসর দেয় নাই। নরেশ কোন দিন যে তাহাদের সাহায্য করিত, এমন একটা চিন্তা নানাকারণে পাছে নরেশের মনে উদয় হইয়া তাহাকে

অন্যের নিকট হইতে বেশী প্রত্যাশা করিয়া হতাশ ও মর্ম্মাহত হইতে না হয়, সে কারণটা যেন ইন্দিরার নিকট সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নরেশের মনে হইল।

নরেশ যত বেশী করিয়া ইন্দিরার এই সকল আচরণগুলি বুঝিল, তত অধিক করিয়া দিন দিন তাহার মন ইন্দিরার চিন্তায় ভরিয়া উঠিল। এখন একদিন ইন্দিরাকে না দেখিলে, নরেশের কষ্ট হয়, কিছু ভাল লাগে না, অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া থাকে। সমস্ত দিনটাই যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে—চোখের দেখা হইলে একটা অখণ্ড তৃপ্তি তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেয়। আর না দেখা হইলে যেন একটা অনন্ত অবসাদ তাহার চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত ও আকুল করিয়া তোলে। অনেক সময় নরেশ, ইন্দিরার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তাহাকে দেখিয়া তাহার কথা শুনিয়া শান্তি পায়। যখন সে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে চাহিয়া দেখে, তখন আকুল হইয়া উঠে, দেখে কখন গোপনে ইন্দিরা, সে শূন্য সিংহাসনখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। একদিন আহারে বসিয়া নরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "দিদি এ পিঠেগুলি চমৎকার হ'য়েছে; আর আছে নাকি?"

দিদি তাড়াতাড়ি যতগুলি ছিল সব গুলি তার পাতে ঢালিয়া দিল তাহার আনন্দের সীমা রহিল না।

আজ দুই বৎসর হইল নরেশ আহারে বসিয়া কোন জিনিষ চুইবার চায় নাই। উমাশশীর মনে ইহাতে একটা আশার সঞ্চার হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ'রে খেতে কি ভাল হয়েচে?"

"খুব ভাল হয়েছে। তুমি যে এমন পিঠে করতে পার, তা জানতাম না।"

যে পিঠেগুলি সেদিন নরেশের এতদিনের মৌন ভঙ্গ করিয়া সমাদর লাভ করিল, সেগুলি, দিদি দেখিলেন, তাঁহার প্রস্তুত নয়, তখন তিনি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেও নরেশের ভাললাগার জন্য ইন্দিরার উপর সন্তুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

নরেশ বলিল, "কাল তুমি অন্য কিছু না করে, এই পিঠেই কর।"

দিদি বলিলেন "তাই করব এখন। তবে ইন্দিরাকে একবার খবর দিতে হবে?"

ইন্দিরার নামে নরেশ চমকিয়া উঠিল ও খাবারের থালা হইতে বিস্ময়ে চক্ষু তুলিয়া দিদির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তাকে খবর দিতে হবে কেন?"

"সেই এগুলি গড়েছে। আহা বেচারীর জীবনে কোন সাধ আহ্লাদ ত পূর্ণ হয় নি। আমি বৈকালে তোর জন্য যখন খাবার করছিলাম, তখন সে এসে

সেখানে বস্‌লো। বল্লে, দেখ দিদি, আমি শ্বশুরবাড়ী অনেক রকম খাবার করতে শিখেছিলাম কিন্তু একটাও, তৈয়েরি করবার অবকাশ পেলাম না। তার-পর সে চুপ করে রইল। জানিস্ ত, মেয়েমানুষের রান্নার চেয়ে গুণ নেই, রান্না খেয়ে, লোকে যদি সুখ্যাতি করে, তখন পৃথিবীর সকল সুখ চেয়ে, সেই সুখ্যাতি স্ত্রীলোকের বড় হয়ে উঠে। আমি ইন্দিরাকে বল্লাম "আচ্ছা, তুই কি জানিস একটা গড় দেখি। তখন সে যেন হাতে স্বর্গ পেলে। তিনঘণ্টা পরিশ্রম করে এগুলা গড়লে। সন্ধ্যে হ'য়ে যাবার পর বাছা তবে বাড়ী গেল। যাবার সময় অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বল্লে, দিদি,জানি না,কেমন হবে,অভ্যাস নেই ত?" নরেশ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "তাদের খাবার দিয়েছিলে?"

দিদি করুণস্বরে মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বিধবাকে কি এ সব খেতে আছে রে?"

নরেশ আর কোন কথা বলিল না সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

(৯)

পর দিন ইন্দিরার জননী যখন কন্যার রান্নার গুণপনা শুনিলেন তখন ইন্দিরার মুখের প্রতি চাহিয়া একটা অভূতপূর্ব গৌরবে বিধবার দুঃখভার-পীড়িত অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেদিন ইন্দিরা আরও অনেক রকম খাবার করিয়া দিয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিল,তখন নরেশের সহিত পথে তার দেখা হইলে, নরেশ তাড়াতাড়ি বলিল "ইন্দু, কাল তুমি খাসা পিঠে করেছিলে, তুমি যে এসব করতে জান, তা জান্‌তাম না।" ইন্দু একটু স্তব্ধ হইয়া মাথা নীচু করিয়া দাড়াইল। অন্যের মুখে, এই প্রথম তার জীবনে, নিজের সম্বন্ধে সুখ্যাতি শুনিল। আনন্দে তাহার মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিল। সে কোন উত্তর খুজিয়া না পাইয়া বলিল, "আপনার ভাল লেগেছে?"

"সেই জন্যই ত আজ আবার তোমাকে কষ্ট দিতে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।"

"এতে আর কষ্ট কি। এ যে আমাদের সৌভাগ্য?"

নরেশ এত সরল ভাবে কথা কহিতে পারিবে একবার ভাবে নাই। 'সৌভাগ্য' কথাটা যেন তাকে বড় ব্যথা দিল—তাহার মন চঞ্চল যে হইতেছিল—সে তাহা বুঝিল তখন তাড়াতাড়ি বলিল, "ইন্দু, কাল একবার সকালে এসো, আমি কতকগুলি ভাল বই আনিয়েছি তোমায় দেব।"

ইন্দু মাঝে মাঝে, নরেশের নিকট হইতে বই লইয়া যাইত। নিজে পড়িত এবং মাকে পড়িয়া শুনাইত।

পরদিন ইন্দিরা বই লইতে যখন আসিল, তখন নরেশ পড়িতে পড়িতে, একখানি বই মুখের উপর ঢাকা দিয়া অল্প তন্দ্রাতুর হইয়াছিল। ইন্দিরার পায়ের শব্দে ত্রস্তে সে জাগিয়া উঠিল। বলিল, "ইন্দু এসেচ, তোমার কি কি বই চাই বল।"

"আমি ত জানি না, আপনার কি কি বই এসেচে?"

নরেশ দশবারখানি বইএর একটি প্যাকেট তার সম্মুখে ধরিয়া দিল। ইন্দিরা মেঝের উপর বসিয়া এক এক খানি করিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। দুই তিন খানি কবিতার বই ছিল, সেগুলির পাতা উল্টাইয়া রাখিয়া দিল। নরেশের চক্ষু তাহা এড়াইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল "ওগুলা দেখ্‌লে না যে?"

"কবিতার বই, আমার ভাল লাগে না।"

এই সময় দিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন "হ্যারে ইন্দু তুই যে, সে কি বই পড়ে, শোনাবি বল্‌লি, তাত আর শোনালি না!"

নরেশ জিজ্ঞাসা করিল "কি বই দিদি?"

"ও ছাই, আমি কি অত নাম জানি! ও ইন্দুই জানে।" নরেশ ইন্দিরার দিকে তাকাইলে, ইন্দিরা বলিল, "রবিবাবুর নৌকাডুবি বইখানি আপনার ঘরে দেখ্‌তে পাইনি, সেজন্য পড়া হয় নাই।"

"রমেশবাবু পড়তে নিয়ে গেছে, এনে দেবো এখন।"

ইন্দিরা দুই তিন খানি বই বাছিয়া লইল বলিল, "হাঁ, দিদি, ঘরটা এমন অপরিষ্কার হ'য়ে রয়েছে কেন? দেখ্‌লে গা নিস্‌পিস্ করে। ঐ দেখ না, ছবিগুলার উপর একরাস ঝুল জমেছে, অনেকদিন যেন মানুষের হাত এ ঘরে পড়ে নাই।"

উমাশশী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তা ত পড়ে নাই বাছা। একলা সব দিক পেরে উঠিনা। ঝি মাগির কি দরদ আছে, যে দেখে শুনে, এ সব করবে। যে দিক দেখব না, সে দিকটা একবার 'দ'পড়ে যাবে। ইন্দু, তুই যদি আজ মনে করিচিস্ বাছা, তবে তুই কেন আজ দিদির হয়ে একটু পরিশ্রম কর না।"

নরেশ বলিল "এ মন্দ নয়, ও বেচারী, বই নিতে এসে বড় মুস্কিলে পড়ল দেখ্‌চি। ঘর নাই বা পরিষ্কার হলো, কেইবা দেখ্‌তে আস্‌চে।"

ইন্দিরা আপত্তি করিয়া বলিল, "কেউ দেখতে আসবার সঙ্গে ঘর পরিষ্কার করার নিত্য সম্বন্ধ যে খুব আছে, তা ত আমার মনে হয় না, তবে যেখানে থাকৃতে হবে, সে স্থানটা পরিষ্কার করে, থাকাই হচ্ছে সংসারে ধর্ম্ম।"

দিদির তরফে ওকালতী করিতে গিয়া, ইন্দু অনেকগুলি কথা বলিয়া ফেলিল। নরেশ শুনিয়া মনে মনে, বেশ একটু আনন্দলাভ করিল। বলিল, "আপন ইচ্ছায় যদি কেউ পরেরবোঝা ঘাড়ে করতে প্রস্তুত হয়—তবে অন্যে আপত্তি করলে, সে আপত্তি টেঁকবে কেন।"

ইন্দিরা দিদির দিকে চাহিয়া বলিল, "অন্যায় আপত্তি, কোন দিন কোনখানে তার নিজের জেদ্ বজায় করতে পারে, বলে ত মনে হয় না।"

সেদিন ইন্দিরা নরেশের শয়নকক্ষখানি ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া গেল। ছবিগুলিকে স্থানান্তরিত করায় নরেশের মনে হইল, যেন দুই এক খানি নূতন ছবি টাঙ্গান হইয়াছে।

(১০)

এমন করিয়া ইন্দিরা নরেশের সংসারে আপনার অনেকখানি করিয়া সময় দিতে লাগিল। দিদিও যেন অনেকটা অবসর পাইল।

একদিন নরেশচন্দ্র বলিল, "দেখ্ ইন্দু, তোদের বাড়ীটা পড়ে যাবার মত হ'য়েছে, এই সময় সারাতে না পারলে, পড়ে যাবে; তখন মেরামত করতে অনেক টাকা পড়বে।"

ইন্দিরা বলিল, 'ঐ রকম করে যে, কয়দিন যায়—কার জন্যই বা মেরামত করা?"

নরেশ বলিল "ইন্দু তুমি তোমার নিজের যুক্তি ঠিক রাখতে পার না, সেদিন তুমিই আমার ঘর পরিষ্কার যে কারণে প্রয়োজন মনে করেছিলে—আজ ঠিক সেই কারণেই বাড়ী মেরামত করা আমি উচিত মনে করচি।"

ইন্দিরা কোন উত্তর দিল না। নরেশ বাক্স খুলিয়া দশখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া ইন্দিরার হাতে দিতে যাইলে, ইন্দিরা সবিস্ময়ে বলিল "টাকা কিসের নরেশদাদা! মেরামত করার টাকা আমাদের জোটে, তখন করাবো, না জোটে পড়ে যাবে, সেও ভাল! আমাদের এই অবস্থায় অত টাকা খরচ করে বাড়ী মেরামত করলে লোকে কি মনে করবে?" বলিয়া ইন্দিরা তাড়াতাড়ি নরেশের গৃহ হইতে চলিয়া গেল। নরেশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিতান্ত অসহায়ের মত শয্যার উপর স্তব্ধ হইয়া শুইয়া পড়িয়া রহিল। শেষে মনে হইল, কাজটা কি বড়ই অন্যায় হইয়াছে! লোকে কি মনে করবে? লোকে কিছু মনে করতে পারে, এই দুর্ভাবনায় তবে কি বাড়ী চাপা পড়ে মরতে হবে? তখন কি সমাজ বা লোক তোমায় দেখতে আসবে?" এবার নরেশের মনে পড়িল, কেন ইন্দিরা এত পরিশ্রম করিয়া টুপি মোজা বোনে? কেন সে নরেশের সাহায্য লইতে নারাজ? টাকা দিতে

হয় তবে কি সে ইন্দিরার অন্তরে আঘাত করিয়াছে? অবশ্য করিয়াছে, না হইলে, ইন্দিরা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল কেন? নরেশের মনে হইল, ইন্দিরা হয়ত টাকা দেওয়ার ভিতর হইতে একটা এমন কিছু অনুমান করেছে, যাতে করে, তার এখানে বসে থাকা, সম্পূর্ণ অন্যায় মনে হয়েছে।

তারপর চার পাঁচ দিন ইন্দিরা অসুখ করিয়াছে বলিয়া নরেশের বাড়ী আসিল না। দিদি একদিন নিজে ডাকিতে গিয়া বলিলেন, "ইন্দু, কেমন আছিস্‌রে?"

সে বলিল, "ভাল আছি দিদি।"

উমাশশী বলিলেন, "নরেশের কদিন কেমন অরুচি মত করেছে, কিছু খেতে পারে না, যা রাঁধি তাই পড়ে থাকে—আমরা হলুম সেকেলে মানুষ, নতুন রান্না তোরা ত কি ছাই বেশী জানা আছে—তাই মনে করলুম—একবার যাই ইন্দুকে

লক্ষ্মীমণি সেখানে বসিয়া কন্যার বোনা কার্পেট সাহায্য করিতেছিলেন, বলিলেন এর জন্য আসবার কি দরকার ছিল, মেয়ে মানুষের রান্নার চেয়ে বড় কাজ আর কিছু আছে বলে ত মনে হয় না। আত্মীয়স্বজনকে বেঁধে খাওয়াতে পারলে ত মেয়েজন্ম সার্থক। তা ইন্দু যাবে এখন?"

"একটু পরে আসিস্‌ বোন্‌" বলে, দিদি চলিয়া গেলেন।

১১

ইন্দিরা যখন শুনিল, নরেশচন্দ্র কয়দিন মোটেই খাইতে পারে নাই, তখন তার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। সেদিন অমন করিয়া চলিয়া আসিয়া, সে যেন নরেশচন্দ্রের অন্যায় বিচার করিয়াছে। তিনি ত পূর্ব্বে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। এখনও নির্ব্বিবাদে তাহা গ্রহণ করা হইয়াছে। সে কারণ, তার সাহায্য করিতে আসা যে খুব অসঙ্গত হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না। তার পক্ষ হইতে যথেষ্ট দোষের কারণ ছিল না, সুতরাং ভাল করিয়া বলিলেই চলিত। অতএব তাঁহার অন্তরে অমন করিয়া নির্দ্দয়ভাবে আঘাত দিবার ত কোন প্রয়োজন ছিল না। সেই নিমিত্ত বোধ হয়, তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া ইন্দিরা নিজের কাছেই, নিজেকে বড় অপরাধী মনে করিল।

সে দিন ইন্দিরা রাঁধিয়া গিয়া নিজেই পরিবেশন করিল। দিদি সেখানে বসিয়া খাওয়াইতেছিলেন। নরেশ যখন দুই তিনটি তরকারি পুনঃ পুনঃ চাহিয়া লইল, তখন ইন্দিরার আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না।

ইন্দিরা এমন করিয়া নরেশের শূন্যজীবনের মধ্যে ধীরে ধীরে যেন একটা সফলতার নব অয়োজনের সূচনা করিয়া দিতে লাগিল। তাঁর অন্তরের অনেকখানি শূন্যতা যেন ইন্দিরার সাহচার্য্য ভরিয়া উঠিতেছিল। কর্ম্মহীন জীবনের মধ্যে ইন্দিরা অকস্মাৎ কর্ম্ম করার নেশায় বেশ আনন্দলাভ করিতে লাগিল। এখন নরেশের সংসারের অনেক কাজই ইন্দিরার কর্ম্মনিপুন সেবা-হস্তের সহিত পরিচিত।

এমন সময়ে, একদিন দিদি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন; লক্ষ্মীমণি যে দিন দেখিতে আসিলেন, সে দিন তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতে পারিলেন না। লক্ষ্মীমণি দেখিয়া গিয়া ইন্দিরাকে পাঠাইয়া দিলেন। ইন্দিরা সে দিন গিয়া সম্পূর্ণভাবে নরেশের সংসারের ভার গ্রহণ করিল। এই সময় ইন্দিরাকে নরেশের সকল কাজ করিতে হইত। নরেশ দেখিল তাহার শয্যা দুগ্ধ-ফেন-নিভ শুভ্র, তাহার বইগুলি সুন্দরভাবে টেবিলের উপর গোছান। তাহার পড়িবার বইখান পর্য্যন্ত বালিসের পার্শ্বে রাখা হইয়াছে। ঘরের ছবিগুলি ও আলমারি ঝক ঝক করিতেছে। একখানি সমবেদনা পূর্ণ করুণ-হৃদয়, যেন সকল দ্রব্যের উপর তাহার অনুরাগ-প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক জিনিসটির মধ্যেই যেন, সেই মধুর অন্তরখানি নরেশের নিরাশ জীবনে সুমধুর আশা ও আশ্বাসে উদ্বেলিত করিতেছিল।

ইন্দিরা ও লক্ষ্মীমণি দিদির যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিল। নরেশ বহু অর্থব্যয় করিয়া ডাক্তার দেখাইল, কিন্তু, এক মাসের জ্বরেই তিনি ইহ সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সুতরাং এমন অবস্থায় ইন্দিরা অনন্যোপায় হইয়া নরেশের সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। ইহাতে গ্রামস্থ সকলেই লক্ষ্মীমণির বহু সুখ্যাতি করিল।

কর্ম্মের মধ্যেই সুখ—সেই কর্ম্ম যখন বেশী করিয়া ইন্দিরাকে সর্ব্বদিক হইতে পাইয়া বসিল, তখন সে, আপনার মধ্যে আপনি বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। তার হৃদয়ের শূন্যতা সেই আনন্দে ভরিয়া উঠিল। এ বিশ্বের মধ্যে, সে যে কখনও কারো কাজে লাগিতে পারে, তাহা সে, এত দিন জানিত না, সুতরাং তাহার যে জীবনধারণের একটা প্রয়োজন ছিল, জানিয়া সে সমাজের নিকট আপনাকে চিরকৃতজ্ঞ মনে করিতে দ্বিধা করিল না। এমন করিয়া যখন জমিদারগৃহের অন্তঃপুর ইন্দিরার

ণপাত পরিশ্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, তখন একদিন নরেশচন্দ্র অত্যন্ত ড়িত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মীমণি কাজে কাজেই নিজে সংসারের ভার ইল। ইন্দিরা তার নরেশ-দাদার সেবায় মনোনিবেশ করিল।

নরেশ যখন রোগের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিত, ইন্দিরা তখন তাহার শয় গিয়া বসিত, গায়ে হাত বুলাইয়া দিত। বেদনা-করুণ কণ্ঠে অত্যন্ত পনার জনের মত, সে ব্যাকুল অন্তরে জিজ্ঞাসা করিত "কি অসুখ করচে? ক্তার আন্‌তে পাঠাব কি?"

নরেশ কিন্তু ইন্দিরার কথা শুনিলে, সে যে তার কাছে বসিয়া আছে, বং সেবা করিতেছে জানিলে আপনাকে অনেকটা সুস্থ ও সুখী বিবেচনা রিত। শীর্ণ ম্লান অধরপ্রান্তে একটা আনন্দের জ্যোতিঃ সমুজ্জ্বল য়া উঠিত। একদৃষ্টে ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির মত সে, সেবানিরতা ইন্দিরার প্রতি হিয়া অসহ্য যন্ত্রণার সময় বড় আগ্রহে তার কল্যাণভরা হাত দুইখানি পনার ঘনস্পন্দিত উত্তপ্ত বক্ষের উপর প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া শান্তি অনুভব রত। তখন সংসারের কোন অভাবই এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাহাকে ন দিক হইতে, তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা মনে করিবার অবসর ত না। ইন্দিরার অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন নরেশকে অচিরে আরোগ্যের থ আনিল। নরেশ যেমন ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতে আরম্ভ ল, ইন্দিরাও তেমন অল্পে অল্পে, একটু একটু করিয়া নরেশের সেবা করা তে আপনাকে সরাইয়া লইতে লাগিল।

(১২)

সেদিন, নরেশ অনেকটা সুস্থ আছে; দুই দিন হইল পথ্য করিয়াছে। ই দিনের ভিতর কেবল একবার মাত্র খাবার দিবার সময়, নরেশ ইন্দিরার খা পাইয়াছিল। তারপর আর সে আসে নাই। কেন আসে নাই, তাহা শ অনেকক্ষণ অবধি ভাবিল, শেষে ঝিকে ডাকিয়া বলিল, "ইন্দিরাকে এক- এখানে ডাকিয়া দাও।

ইন্দিরা যখন শুনিল, নরেশ তাহাকে ডাকিয়াছেন, তখন অকস্মাৎ কি য়া তার ললাটের শিরাগুলি অল্প স্ফীত হইল,—কই তিনি এমন ভাবে খন ডাকেন না?

ইন্দিরা আসিবামাত্র নরেশ একটু অভিযোগ করুণ-কণ্ঠে বলিল "তুমি সারাদিনের মধ্যে এ পথ মাড়াও নাই কেন? হ'য়েচে কি?"

"আপনি ভাল আছেন কি না, সে জন্য আসা প্রয়োজন মনে করি নাই।"

"তা' হলে দেখচি আমার ভাল না থাকাই ভাল।"

ইন্দিরা ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া নরেশের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কেবল চাহিল। কোন উত্তর দিল না। ইন্দিরা নিজের অন্তর দিয়া যেন অনেকখানি দূর ভবিষ্যত দেখিতে পাইল।

নরেশ সে দিকে না তাকাইয়া বলিল, আমার মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দাও।"

ইন্দিরা পূর্ব্বের মত শয্যার উপর উপবেশন না করিয়া একখানি চৌকি টানিয়া তাহাতে বসিল। এবং নরেশের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। একটা অপূর্ব্ব সংযম যেন সেদিন ইন্দিরার উদ্ভিন্ন যৌবনশ্রীকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিতেছিল।

নরেশ বলিল, "ইন্দ্, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

ইন্দিরা, এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া সহসা উত্তর করিল "না।"

নরেশ বলিল, "কেন?"

ইন্দিরা বলিল, "আর একটা কথা আপনি বিস্মৃত হবেন না, জানবেন, ইন্দিরা সকল কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু সে, কোন দিন, কোন রকমে তার নরেশদাদার হৃদয়ের এতটুকু দুর্ব্বলতা কিছুতেই সহ্য করতে পারবেনা। রুগ্ন নরেশ তাড়াতাড়ি শয্যায় উঠিয়া বসিতেই দেখিল ইন্দিরা তখন অশ্রুভারাবনত নয়নে গৃহ হইতে ধীর পদবিক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে, নরেশ ব্যাকুল কণ্ঠে পুনরায় ডাকিল "ইন্দ্ একটা কথা শুনে যাও।"

ইন্দিরা অত্যন্ত স্নেহবিহ্বল আর্দ্রকণ্ঠে উত্তর করিল "জানি আমি, আপনি কি বলতে চান; কিন্তু আপনার কথা না শুনতে চেয়ে, যে আপনার অন্তরে কতখানি বেদনা দিচ্চি, মনে করবেন না, যে ততখানি বেদনা বোঝবার মত হৃদয় ইন্দিরার নাই। আজ আপনাকে এই 'না', বলতে আমার অন্তরের অন্তর যে কি নির্ম্মমভাবে নিপীড়িত, তা কি আপনি অনুভব করতে পারচেন না? ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করা, কতখানি অন্যায়! কতখানি মিথ্যা দিয়া যে সেই অনাবিল সহজ, সুন্দর সত্যকে ঢাকতে হয় এবং তার যে কি মর্ম্মস্পর্শী অনুশোচনা, নারী-হৃদয়ের পক্ষে কতখানি কঠিন! সে কথা কি নরেশদাদা তুমি—তুমি বুঝতে পার না? আজ হাঁ বলতে পারলে, আমার অপেক্ষা এ বিশ্বে যে কেউ অধিক সুখী হ'তে পারে, সে

কথা ইন্দিরা কোন দিন বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। "বলিয়া ইন্দিরা নিমেষ মধ্যে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল!

(১৩)

নরেশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বারের দিকে তাকাইয়া অবশেষে পুনরায় নিঃসহায় ভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িল। বহুক্ষণ অবধি সে মুদিতনয়নে পড়িয়া কত কি ভাবিল। তাহার দুর্ব্বল দেহমন অকস্মাৎ অধিক বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল, সুতরাং সে আর ঔষধ খাইবার কোনরূপ উদ্যোগ পর্য্যন্ত করিল না। মধ্যে একবার ঝি আসিয়া দুধের বাটী রাখিয়া গেল। নরেশ তাহা দেখিল। কিন্তু স্পর্শ করিল না। পরদিন ইন্দিরা, নরেশের ঘরে আসিল না, বাহির হইতেই বন্দোবস্ত করিতে লাগিল; নরেশ রোগশয্যায় পড়িয়া পড়িয়া ইন্দিরার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিল, কিন্তু একবার তাহাকে দেখিতে পাইল না। এই সকল কারণে, অভিমান আরও বেশী করিয়া তাহাকে বিচলিত করিল। ঔষধের শিশি টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল, একটা দাগও কমিল না। নরেশ আর সারিয়া উঠিতে পারিল না। সারিবার জন্য তার এতটুকু আগ্রহ বা উৎসাহ মোটেই পরিলক্ষিত হইল না। দারুণ দৌর্ব্বল্যে তিনি দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। চতুর্থ দিন প্রবলবেগে পুনরায় জ্বর দেখা দিল। সে কিছুমাত্র তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না; এবং মনে মনে, সেদিন যেন কি কারণে অত্যধিক আনন্দিত হইল। অনাবশ্যক জীবন অকারণ বহন করিয়া তাহার অন্তরে গভীর বেদনাপ সঞ্চার হইতেছে, ভাবিয়া, মৃত্যুপথের পথিক হইতে, সমস্ত অন্তর দিয়া সর্ব্ব দিক হইতে একটা অনির্ব্বচনীয় পুলক স্পর্শ অনুভব করিল। রক্তশূন্য পাণ্ডুর মলিন মুখের উপর, অন্তর অনুভূত আনন্দের একটা অপূর্ব্বজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

লক্ষ্মীমণি যখন জানিলেন যে নরেশের পুনরায় জ্বর হইয়াছে, তখন তিনি শঙ্কিত হইয়া ডাক্তার ডাকিতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেন না। ডাক্তার অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "রোগীর বিশেষভাবে যত্ন না হইলে, ভয়ের খুব সম্ভাবনা। জ্বর বাঁকা পথে ধরিয়াছে।"

সে দিন, জ্বরে নরেশ একরূপ অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল। অদম্য পিপাসায় বক্ষবিদীর্ণ হইলেও একবিন্দু জল নরেশ কাহারও নিকট চাহিল না। মরিতে হইলে মানুষ যেমন করিয়া আত্মসমর্পণ করে, তেমন

করিয়াই সে যেন মৃত্যুকে আহ্বান করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ সঙ্কল্প, ইন্দিরা তার প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়া গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

ইন্দিরা নরেশের রোগশয্যায় উপবেশন করিয়া ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ ও পথ্য খাওইবার ভার আপনি গ্রহণ করিল। হঠাৎ নরেশের পুনরায় পীড়িত হইবার কারণ কি তাহা বুঝিতে ইন্দিরার একমুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। একথা যতবার তার মনে হইতেছিল, ততবার তার তৃষিত হৃদয় পঞ্জর ভেদ করিয়া মর্ম্মাহত অনুশোচনার অশ্রুধারা দুই চক্ষু বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল।

দিনের পর দিন, অসুখ কেবল বাড়িয়া উঠিতেছিল। ডাক্তার একবারের স্থলে তিনবার, চারবার প্রয়োজনমত আসিতে আরম্ভ করিলেন। যত দিন যাইতে ছিল, ক্রমেই একটা নিদারুণ নৈরাশ্যের ভাব যেন সমগ্র জমিদারগৃহের মধ্যে ঘনাইয়া উঠিতেছিল। ইন্দিরা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে নরেশের সেবায় আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করিল। কিন্তু, এত যন্ত্রণার মধ্যেও নরেশের প্রফুল্ল মুখখানি ইন্দিরার প্রণয়কাতর হৃদয় মথিত করিয়া একটা সকরুণ অনুযোগ ভাব প্রতি তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া ফিরিতে ছিল। ইন্দিরার সেদিনকার আচরণ তার নিজের কাছেই আজ সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবিবেচনার কাজ বলিয়া বারবার মনে হইতে লাগিল। ইন্দিরার নিত্য দুঃখভার পীড়িত জীবন, মাতার অবমাননা সবার নিমিত্ত, আপনার বিরুদ্ধে গভীর অভিযোগে নিজেকে পীড়িত করিয়া যেন কতকটা শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করিল। সে অনিচ্ছায় ভাবিল, "যদি মারা যান, তবে?" ইন্দিরার নয়নপল্লব সিক্ত করিয়া দরদর অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে মনে মনে নানাদেবতার পূজা মানসিক করিল। ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে, অশ্রুপূর্ণ আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "ঠাকুর এবার বাঁচাও, আমাকে, নিয়া তার প্রাণে রক্ষা কর।"

এমন করিয়া ইন্দিরা যখন তার অন্তরকে, অবিবেচনার জন্য সহস্রবার অপরাধী করিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হইল না, তখন নরেশ অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত ব্যাধির সকল যন্ত্রণা অবহেলা করিয়া আনন্দমগ্ন। এক মুহূর্ত্তের জন্য সেযন্ত্রণার কথা প্রকাশ করা দূরে থাক; এমন ভাবও প্রকাশ করিল না, যাহাতে কেহ অনুভব করিতে পারে—যে সে পীড়িত। একবার ভুলিয়া ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল না। এত প্রসন্নতা, এত আনন্দ, আজ সে হঠাৎ কোথা হইতে আনিল? সকল প্রিয়-সম্বন্ধের সকল অচ্ছেদ্য বন্ধনের বাহিরে দাঁড়াইয়া

নির্লিপ্ত উদাসীন ব্যক্তির মত যখন প্রতিদিন টিকে মহানন্দে সে তার মৃত্যু দিনের নিকট অগ্রসর করিয়া আনিতেছিল, ইন্দিরা তখন তার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত জীবন, সকল আশা আশ্বাস দিয়া যেন তার পথরোধ করিয়া করুণকণ্ঠে বলিতেছিল, "ওগো এবার তুমি সার, তারপর তুমি যা আদেশ করবে, তাই আমি পালন করব।"

নিভৃত অন্তরের এই নিতান্ত অসহায় কাঙ্গাল অনুরোধ মৃত্যুপথের পথিকের মনে, মধুর সঙ্গীত জাগাইয়া তুলিতেছিল, তাহা উৎসবময়ী বাসর-রজনীর নহবতের ঝঙ্কারের অপেক্ষাও মধুর। ইন্দিরার আঁখি যখন অশ্রুঅন্ধ হইয়া আসিত, অব্যক্ত বেদনাময় অকরুণ ভবিষ্যত যখন সর্ব্বদিক হইতে অনন্ত অন্ধকারের ছবি ঘনাইয়া তুলিত তখন ইন্দিরা স্থিরদৃষ্টিতে নরেশের মুখের প্রতি তাকাইয়া কি দেখিত, তাহা সেই জানে ? দেখিতে দেখিতে, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ উদ্বেগ-আকুল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিত, "নরেশদাদা!" তারপর তার অঙ্গস্পর্শ করিয়া দেখিত, গা

নরেশ, তার আনন্দদীপ্তনয়নদুটি ইন্দিরার শঙ্কাকুল, ভয়ার্ত নয়নের উপর সংস্থাপন করিয়া সান্ত্বনার কি মধুর বাণী ইন্দিরার নিভৃত হৃদয়ে বহন করিয়া দিত কিন্তু, ইন্দিরার আকুল মন কোন সান্ত্বনাই মানিত না।

প্রাণপণ শক্তিতে ইন্দিরা নরেশের সেবা করিল। ইন্দিরার অশ্রুভারাক্রান্ত করুণাপ্রার্থী অকলঙ্ক নয়ন, যখন নরেশের অত্যুজ্জ্বল লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টির সহিত মিলিত হইত তখন ইন্দিরা যেন নীরব আবেদন জানাইয়া কেবলই বলিত "ওগো, তুমি সব জান, এক মুহূর্তের ভুলের জন্য, এরূপ নির্মমভাবে আমার বিচার করিও না।"

নরেশ যে ইহা অনুভব করিত না, এমন নয়, তাহার অন্তরের মধ্যে যে প্রবল ঝড় বহিতেছিল, যদিও বাহিরে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ ছিল না, তথাপি তাহার মৌনচিত্ত অন্তরের শক্ত মন্দিরদ্বারে ব্যাকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুণ্ঠিত হইতেছিল। নরেশ অনেকবার ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র সান্ত্বনার কথাও তাহাকে বলিল না। এই নির্ম্মম নীরবতাই ইন্দিরার নারীহৃদয় বিহ্বল বেদনায় ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। ইন্দিরা অনাহারে দেবতার পাদ-পীঠতলে হত্যা দিয়া পড়িয়া কাঙ্গাল প্রার্থনা জানাইল, কিন্তু, সেদিন বুঝি বা মানব হৃদয়ের আর্ত্ত আবেদন সে সিংহাসন সমীপে পৌঁছিল না।

অনাদৃত প্রণয়ের নীরব বেদনা সহ্য করিয়া প্রয়োজনহীন প্রাণ কতদিন এ দেহে থাকিতে পারে? দেহমনের সকল আর্ত্তি ঘুচাইবার জন্য কোন লোক

লোকান্তর হইতে, কোন করুণাময়ের করুণ আহ্বান আজ নরেশের কাণে পঁহুছিয়াছে; তাই তাহার ভঙ্গুর দেহপিঞ্জরের দ্বার খুলিয়া তাহার প্রাণবিহঙ্গ কোন্ বেদনাবিহীন নিরাময় উন্মুক্ত আকাশতলে উড়িয়া যাইবার জন্য আজ প্রাণ-পণে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাই এ পৃথিবীর দারুপ্রস্তরময় দেবতার অকরুণ পদ-তলে ইন্দিরার ব্যাকুল মর্ম্মবেদনা ও আকুল নিবেদন কোন ফলই প্রসব করিল না। দিনদেবতার অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে, নরেশের জীবনপ্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল, গৃহে যখন সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবার সময়, তখন ইন্দিরার অন্তরবাহির বিমল অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া তাহার ইহলোকের একমাত্র আলোকবর্ত্তিকা চির দিনের জন্য নিবিয়া গেল। ইন্দিরার বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না, বাক্যহীন পাষাণপ্রতিমার মত নরেশের শয্যায় বসিয়া শবদেহের পা দুখানি প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ইন্দিরা একবার আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল—"নরেশ—দাদা, নরেশ, প্রাণেশ",—তারপর সব নীরব হইয়া গেল। হায়, ইন্দিরা—একদিন আগে যদি এমনি করিয়া একবারও ডাকিতে?

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নূরজাহান।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

শারিয়ার কর্ম্মপটু নহে, সক্ষম বীরপুরুষ বলিয়া কোন দিনই তার খ্যাতি ছিল না, পিতা জাহাঙ্গীরের বাধ্যানুগত হইয়া চিরজীবন যাপন করিয়াছে, সেই জন্য এবং কনিষ্ঠপুত্র বলিয়া পিতার স্নেহ তার প্রতি সমধিক ছিল; সাজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিল, এই সব কারণে জাহাঙ্গীর মৃত্যুকালে শারিয়ারকে সিংহাসন দিবার কল্পনা করেন; জীবনে কুলায় নাই, তাই তাঁর মৃত্যুর পরে নূরজাহান স্বামীর নির্দেশ পালনে যত্নবতী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন—শারিয়ার নূরজাহানের জামাতা, তিনি রাজ্য পাইলে নূরজাহানের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এই উদ্দেশ্যে নূরজাহান শারিয়ারের সিংহাসনপ্রাপ্তির সহায়তা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। একথার স্বপক্ষে বিপক্ষে আমরা কিছুই বলিতে পারিনা, তবে শারিয়ারকে সিংহাসন দিবার ইচ্ছা যে জাহাঙ্গীরের ছিল এবং মৃত্যুকালে সে ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেম, ইহা ঐতিহাসিক সত্য; সুতরাং নূরজাহানের পক্ষে

শারিয়ারকে সাহায্য করিবার অন্য যে কোন কারণেই থাকুক না; পতিনিদেশ যে তাহার একতম কারণ—ইহা ইতিহাসবিৎ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

নূরজাহান জানিতেন—সাজাহান বীরপুরুষ, বহুযুদ্ধে স্বয়ং লিপ্ত থাকিয়া, বাদশাহী সৈন্য চালনা করিয়া, রণপাণ্ডিত্য তাঁহার জন্মিয়াছিল; বহুপ্রদেশে সম্রাট্‌প্রতিনিধিরূপে সুবাদারের কার্য্য করিয়া রাজকার্য্যে তিনি সুনিপুণ হইয়াছিলেন; উদয়পুর প্রভৃতি হিন্দু রাজপুত রাজগণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপন হইয়াছিল, মন্ত্রী আসফ খাঁ তাঁহার শ্বশুর, সুতরাং তাঁহার সহায়তা সাজাহান লাভ করিবে, সেনাপতি মহাবৎ খাঁ মহাবীর, সেই পলাতক মহাবৎকে আশ্রয় দিয়া সাজাহান তাঁহার সহিত আনুগত্য স্থাপন করিয়াছে এই সমস্ত কারণে কেবল তাঁহারি সহায়তায় শারিয়ার সাজাহানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়া সিংহাসনলাভে সক্ষম হইবে না—একথা এতদিন রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার পর বুদ্ধিমতী সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের জানিতে অধিক বিলম্ব হইবার কথা নহে। সাজাহানের সহিত শারিয়ারের সংঘর্ষে পরাজয় সুনিশ্চিত, প্রাণনাশও হইতেই হইবে, সাজাহানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইবে—ইহা জানিয়াও জামাতার পক্ষে যে নূরজাহান অবলম্বন করিয়াছিলেন স্বামিনিদেশে কর্ত্তব্যের প্রেরণাই তাহার কারণ এবং নূরজাহানের পরবর্ত্তী জীবনেতিহাস ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে এই মীমাংসাতেই সকলকে আসিতে হয়।

সিংহাসনের জন্য দুই ভ্রাতার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই দ্বন্দ্বে পরাজিত শারিয়ারের জীবলীলার শেষ হওয়ায় ভ্রাতৃবিরোধভীতি আর সাজাহানকে উৎকণ্ঠিত করিতে পারে নাই। দাক্ষিণাত্য হইতে সসৈন্যে রাজধানী পহুঁছিতে আসিতে, সাজাহানের বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা এবং ততদিন সিংহাসন শূন্য থাকিলে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বুদ্ধিবলে শারিয়ার তাহা অধিকার করিয়া বসিলে-তাঁহার ক্ষমতার বৃদ্ধি হইবে এবং সিংহাসনাধিরূঢ় সম্রাটকে ত্যাগ করিয়া রাজ্যের অনেক পদস্থ আমীর ওমরাহ সাজাহানের পক্ষ অবলম্বন না করিতেও পারে—এই সকল বিবেচনা করিয়া শারিয়ারের পথরোধ ও ভগিনী নূরজাহানের সঙ্কল্প বিফল করিবার জন্য মন্ত্রী আসফ খাঁ খস্রুনন্দন বুলাকীকে সাজাহানের সসৈন্যে আগমন কাল পর্য্যন্ত সিংহাসনে বসাইয়া দেয়। আসফ জানিত সাজাহানের বীর্য্যের নিকট বালক বুলাকী অচিরাৎ পরাস্ত হইবে এবং অধিক-

তর ক্ষমতাশালী সাজাহানের পদতলে সাম্রাজ্যের অবনত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। ফলেও তাহাই হইয়াছিল, সাজাহান সসৈন্যে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হওয়ামাত্র বালক বুলাকী ভীত হইয়া সিংহাসন ত্যাগ করতঃ পলায়ন করে এবং তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন সিংহাসন সাজাহান নিষ্কণ্টকে অধিকার করিয়া বসিলেন, সাময়িক উপদ্রব যাহা রাজ্যে ঘটিয়াছিল, তাহা অল্পকাল মধ্যে মিটিয়া গেল, ভারতসাম্রাজ্যে পুনরায় শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, একমাত্র নূরজাহানকে সমস্ত দুঃখের ভার মাথায় লইয়া অসৌভাগ্যের শান্তিহীন সান্ত্বনাবিহীন দীর্ঘ দিন বহুকাল ধরিয়া কাটাইতে হইয়াছিল।

প্রিয়সম্মিলন যখন একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হইল, তখন অ স্বজন যাহার হাতে মেহেরকে তুলিয়া দিয়াছিল, মেহের তাহারি সঙ্গে রাজধানী ত্যাগ করিয়া সুদূর বঙ্গদেশের পল্লীগ্রাম বর্দ্ধমানে আসিয়া দিন যাপনের জন্য সংসার পাতিয়া বসিল। সে সব দিন সুখে কি দুঃখে গিয়াছে তাহা অনুমান কঠিন নহে, অন্তরের একান্ত কামনার চিরবাঞ্ছিত জনকে এজন্মে আর পাইবই না মনের এই অবস্থা লইয়া দিনাতিপাতের যে আয়োজন সে আয়োজন কি সুখের হইতে পারে? শরীর থাকিলে আহারনিদ্রা করিতে হয়, মেহেরও করিত, একজনের গৃহিণী হইলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক কাজের ভার স্কন্ধে আসিয়া চাপে, সে গুলি না করিলে সংসার চলেনা; সুতরাং মেহের, আলীকুলীর গৃহিণী হইয়া তাহার সংসারও চালাইত, কিন্তু প্রণয়িনী গৃহিণী হইলে সংসারের দিনগুলি যেমন নৃত্যের লাস্যলীলায় চতুর্দ্দিকে আনন্দতরঙ্গ তুলিয়া লঘুপদে দ্রুত চলিয়া যায়, আলীমেহেরের সাংসারিক দিন তেমন করিয়া অতিবাহিত হয় নাই। সুখদুঃখের মধ্য দিয়া জীবনের সে অধ্যায় শেষ হইল, হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া যখন একান্তে বসিবার সময়, তখন জীবনাধিকের স্নেহ-আহ্বান মেহের উপেক্ষা করিতে পারে নাই, এক সময়ে পায় নাই বলিয়া সময়ান্তরে যে আনন্দ আপনি আসিয়া মেহেরের করতলগত হইয়াছিল, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার মত নির্ব্বুদ্ধিতা মেহেরের হয় নাই, আজীবনসঞ্চিত অন্তরের স্নেহরস যাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উচ্ছ্বসিত হইয়া মেহেরের মনে বিপুল বেদনার সঞ্চার করিতেছিল, স্নেহকাঙাল রাজভিখারীর রিক্ত দুই হস্ত সেই স্নেহে ভরিয়া দিয়া মেহেরের নারীজীবন সে সফল করিয়াছিল এবং রাজাধিরাজও হিন্দুস্থানের

সম্পদরাশির উপর বসিয়া যে ব্যর্থতার বেদনায় চিরকাতর ছিলেন, তাঁর সে ব্যর্থ জীবন ও জন্ম ধন্য হইয়াছিল। রাজকান্তের স্নেহহীন অন্ধকার জীবন মেহেরের সেবা সোহাগের মণিদীপজ্যোতি পাইয়া ছায়াচ্ছন্ন আর অপরাহ্নে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই স্নেহবর্ত্তিকার স্নিগ্ধ আলোকের মধ্যে যখন তাঁহার নয়ন চিরমুদিত হইয়া গেল তখন জীবনের ব্যর্থতার জন্য শোকসন্তপ্ত হৃদয় লইয়া তাঁহাকে বিদায় হইতে হয় নাই; কিন্তু যাঁর বুকভরা স্নেহের দান হাত ভরিয়া নিয়া রাজনন্দন ধন্য হইয়াছেন, সেই জাহাঙ্গীরের দেহান্তরের পর তাঁর হৃদয়নিধি, চিরকামনার স্পর্শমণি, জন্মজন্মান্তরের আশা ও বাসনার আকাঙ্ক্ষিত ধন, মেহেরের দুঃখের দিন বিন্ধ্যাচলের মত অচল হইয়া কেমন করিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহা দেখিবার তখন তো আর কেহই ছিল না, দিনারম্ভ হইতে দিনান্ত এবং দিনশেষ হইতে অরুণোদয় পর্য্যন্ত আশাহীন উদ্যমহীন প্রয়োজনবিহীন দেহ ও প্রাণ বহন করিয়া সৌন্দর্য্যশূন্য ধরণীর নীরস ধূলিতলে আত্মযাপন কি দুঃসহ দুঃখের ভোগ তাহা প্রিয়বিরহকাতর জনেই জানে; দিনযামিনীর অবিচ্ছেদ সাহচর্য্যে প্রাণপ্রণয়ীকে পাইয়া, কৈশোরের মনোচোরকে প্রৌঢ়ের পরিণত প্রণয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাসের মধ্যে ধরিয়া যাহার আনন্দমহোৎসবে দিন কাটিয়া গিয়াছে, অসহায়, নিঃসঙ্গ, নিরাশ্রয়, বৈধব্যের দিন তাহার কি কাটে? দুঃখদীর্ণ জীবন যে দীর্ঘ হইয়াই চলে। প্রাণপণে শেষের দিনকে ডাকিলেই যদি আসিত, তবে একা মেহের কেন পৃথিবীর আদিসৃষ্টির দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ও কোটি কোটি নরনারী গলবস্ত্র হইয়া যমদূতের শরণ যাচিয়া ব্যগ্র প্রতীক্ষায় কাল কাটাইত; সুখের গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই রবিনন্দনের ত্বরিত আবির্ভাব হয়, দুঃখের দিনে তাহার দর্শন দুর্লভ হইয়া উঠে। তিনি মেহেরের কেবল মনঃপূত স্বামী ছিলেন না, সে যে তাহার হৃদয়পুষ্পের মধুলোলুপ প্রিয়মধুকর; প্রেমময়ের অন্ধ আবেগের মধ্যে তাহাদের বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইয়া বৈধব্যের দিনে উভয়তঃ সে অধ্যায় শেষ হইয়াছিল এমন নহে, উভয়ে উভয়ের যে পরম সাধু আহরিত অমূল্য নিধি, তাই এ বিয়োগ যে তাহার প্রাণবিয়োগের সমতুল; যে জীবনাধিক প্রিয়তম, যাহার চরণতলে দেহমন সমর্পণ করিয়া জীবন ও জন্ম সফল করিয়াছি, যাহার সঙ্গে একাত্ম হইয়া নিত্য আনন্দের মধ্যে জীবনের সব সার্থকতা লাভ করিয়াছি, অনন্যমনে বহুবর্ষ ধ্যান-জনিত পুণ্যবলে যে একান্ত প্রিয়লাভে ধন্য হইয়াছি, তাহার ক্ষণিক বিরহই মর্ম্ম-যাতনা দেয়—এ জন্মের মত তাহার সহিত চিরবিরহ যে কি দুঃসহ বেদনা তাহা ভুক্তভোগীই অন্তরে অন্তরে অনুভব করে।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

উল্কা।

(১)

কলেজ খুলিলে দুই বন্ধুতে তল্পি বাঁধিয়া বাড়ী ফিরিলাম। সেদিন পূজার ছুটীর শেষদিন, ট্রেণে অত্যন্ত ভিড়। অনেক খুঁজিয়া একখানি গাড়ি কামরায় আমরা বিছানা পাতিয়া যখন শুইয়া পড়িলাম, তখন আমাদের কোনরূপ অসুবিধা হওয়া দূরে থাক, সুনিদ্রারও ব্যাঘাত ঘটে নাই। কিন্তু যশোবন্তনগরে গাড়ি থামিলে একজনের ঠেলাঠেলিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখিলাম আকস্মিক বন্যাপ্লাবনের মত আমাদের কামরাটি যাত্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। আমাদের দুজনের মধ্যে বন্ধু শৈলেন চিরনির্ব্বিকার। কোন অবস্থাতেই কেহ তাহাকে বিচলিত হইতে দেখে না। কিন্তু আমার স্বভাব ঠিক ইহার বিপরীত। নিদ্রাভঙ্গকারীর প্রতি চটিয়া বলিলাম "ডাকলেই ত হ'তো মশাই, ভদ্রলোকের গায়ে হাত দিয়ে ঘুমভাঙ্গান—এ কি রকম ভদ্রতা ?

ভদ্রলোকটি বয়সে প্রবীণ, কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া উত্তর করিলেন "ছেলেবয়স কিনা, ঘুমটা কিছু গাঢ়। এত গোলমালেও কিছু হচ্চে না দেখে ডাকে ফল হবে না বুঝেছিলাম। রাগ করবেন না, কোমরের ব্যথা, দাঁড়াতে পারি কি বেশিক্ষণ !"

আর একটি লোক কোন্ সময় কোন্ ষ্টেসনে গাড়িতে উঠিয়া আধখানি বেঞ্চ অধিকার করিয়া নিদ্রা দিতেছিলেন, তাহা জানিতেও পারি নাই। তিনি এই গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কহিলেন "গোড়া থেকে আরম্ভ হোক, মশাই, গোড়া থেকে আবার আরম্ভ হোক, সব শোনা হয়নি।"

আমি ক্রুদ্ধভাবে উঠিয়া গিয়া একপাশে বসিলাম। শৈলেন নিজে হইতেই মানে মানে বিছানা গুটাইয়া লইয়া জায়গা ছাড়িয়া দিয়াছিল।

গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে,—এমন সময় একটি বৃদ্ধ একটি ময়লাকাপড়ে বাঁধা প্রকাণ্ড বোচকা, বোচকার গায়ে দড়ি দিয়া ঝুলান একটি খোলো হুঁকা এবং অপর হস্তে একখানি চাঁচাবাঁশের লাঠি ধরিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে সেই কামরার দরজার কাছে আসিল। তাহার সঙ্গে একটী মেয়ে। বৃদ্ধ ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল "কাল থেকে পড়ে আছি মশাইরা, সঙ্গে এই সমর্থ মেয়েটি রয়েছে, একেবারে নাহাক্ হয়রান্ হয়ে গেলুম। দয়া করে একটু জায়গা দিন।"

বালিকা একটী পিতলের ঘটি হাতে করিয়া সভয় সন্দেহে বৃদ্ধের পিছন হইতে গাড়ির মধ্যে চাহিয়া দেখিতেছিল। উত্তেজনায় ও দৌড়াদৌড়িতে তাহার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

গাড়ির ভিতর হইতে একটি বাবু ক্রুদ্ধস্বরে দ্বার খুলিতে উদ্যত বৃদ্ধকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া কহিয়া উঠিলেন “এই বুড়ো, দেখতে পাচ্চনা, এটা তোমারগে থার্ড কেলাস নয়। এক্ষণি গাড়ি ছেড়ে দেবে, যাও, অন্য জায়গায় যাও।”

বৃদ্ধ একেবারে অসহায়ভাবে চেঁচাইয়া উঠিল “সব গাড়ি ছোট লোকে ঠাসা মশাই, কোথাও একটু তিল ধরবারও স্থান নেই। সঙ্গে যে এই মেয়েটা রয়েচে। হুদো হুদো মিন্‌ষেগুলো দুদিক থেকে চেপে ধরে; এ চোক দুটো থাকতে তা দেখি কেমন করে? এই জন্যই বলেচে পথে নারীবিবর্জ্জিতা।”

তাহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই হাসিল, কিন্তু কেহই তাহাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইল না। কিন্তু হঠাৎ একজনের চিত্ত - তাহার না হোক, বোধ হয় তাহার সহযাত্রিনীর দুঃখে আর্দ্র হইয়া আসিল, সে বলিল “একটি অসহায় বৃদ্ধ একটি যুবতী কন্যাসঙ্গে এমন করিয়া অরক্ষিত অবস্থায় ষ্টেশনে পড়ে থাকবেন, আর আমরা এতগুলো ভদ্রলোক জোয়ান দিব্যি আরাম করে যাব? এই জন্যই তো আমাদের এমন দশা!” এই বলিয়া শৈলেন্দ্র তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া বৃদ্ধকে ডাকিয়া বলিল “এস তুমি আমাদের এই কামরায়।” বলিয়াই নিজে তাহার ভারি মোটটা ভিতর দিকে টানিয়া লইল। ইতিমধ্যেই তাহার বসিবার জায়গাটুকু বেদখল হইয়া গিয়াছিল, এবং চারিদিক হইতে তাহার এই অবিমৃষ্যকারিতার সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ভদ্রব্যক্তিগণ তাঁহাদের মধ্যে দুইটা ময়লা কাপড়পরা ‘ছোট লোককে’ স্থান দেওয়ার জন্য তাহাকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বৃদ্ধ ও মেয়েটিকে গাড়ীতে উঠাইয়া আমার স্থানে তাহাদের বসিবার স্থান করিয়া দিয়া আমরা দুজনেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অপর যাত্রীদিগের সহিত তুমুল তর্ক জুড়িয়া দিলাম। অবশেষে শৈলেনের কাজটাকে অভদ্রতা-জনক বলিয়া যখন সাব্যস্ত হইল না, তখন একজন তাচ্ছিল্যভরে তাহাকে ছোট করিয়া দিবার চেষ্টায় কহিয়া উঠিলেন “সারাপথটি ঘুম দিতে পেলে আমিও অমন ভদ্রতা করতে পারি হ্যাঁ, ঢের দেখেচি অমন দয়ালু!”

অপর এক ব্যক্তি কহিলেন “একেই বলে বক পরমধার্ম্মিক; রেলকোম্পানির দুখান টিকিট যে জোচ্চুরি করা হলো সেটি?”

আমি সক্রোধে বলিলাম "সে সৎসাহস আমাদের আছে। সে জন্য আপনাদের অত মাথাব্যথার দরকার নাই। আমরা দাম দিয়ে দেবো।"

অনেকক্ষণ পরে গোলমাল তর্ক বিতর্ক মিটমাট হইয়া কক্ষ নিস্তব্ধ হইলে আমরা ভাল করিয়া আমাদের আশ্রিতদিগের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর পাইলাম।

বাবুদের বিবাদ দেখিয়া ও নিজেদেরই ইহার উপলক্ষ্য বুঝিয়া আগন্তুক দুজন কিছু ভীত ও কতকটা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। আমাদের চাহিতে দেখিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল "হঁ্যা বাবু, এ গাড়ীতে কি গরীব মানুষদের উঠতে নেই? গেঁয়ো মানুষ জানিনেতো কিছু। এইবারই এই মেয়েটার দায়ে পথে বের হয়েছি, এর আগে এতটা বয়স কোন দিন আমাদের নওগাঁর ওধারে পা দিই নি।"

শৈলেন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া শান্ত করিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় যাবে তুমি?" বলিতে বলিতে গাড়িশুদ্ধ লোকের দৃষ্টি অনুসরণে আমারও কৌতূহল দৃষ্টি তাহাদেরি অনুকরণ করিতে গিয়া তেমনি করিয়াই সেই মেয়েটির মুখের উপর আবদ্ধ হইল। এই দীন দরিদ্রের সাথী এই মেয়ে, এ কোন দেবতার ছলনা—না আমার দৃষ্টিবিভ্রম। সেই রাঙ্গাপাড়ওয়ালা মলিন সাড়ি, মোমবাতির মত দুখানি গোলগাল হাতে দুগাছি কালো কাচের চুড়ি, রুক্ষ সুক্ষ্ম অবিন্যস্ত কেশজালে তাহার সেই মেঘাবৃত চাঁদের মত অর্দ্ধাবরিত মুখ, যাহা এখনও গুরু পরিশ্রম, ভয় ও সব চেয়ে এতগুলা অচেনা পুরুষের কুণ্ঠাহীন প্রশংসা দৃষ্টিতে লজ্জাসঙ্কোচে আরক্ত হইয়া আছে, এইসব গুলাই যেন তাহাকে সমধিক উজ্জল করিয়া তুলিয়াছিল। আমি বি এর কোর্সে কালিদাস পড়িয়াছি; মনে পড়িয়া গেল, 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।' আমার প্রশ্নোত্তরে বৃদ্ধ কহিল "আর মশাই সে কথা কন কেন? সে যেমন হবার, নাহাক্ হয়েরাণ হয়ে এসেচি, বাড়ী আমাদের কাটোয়া জেলা—নওগাঁ, নন্দীগ্রাম হচ্চে গাঁয়ের নাম মশাই, বুঝলেন ত? হঁা, গাঁটির নাম নওগাঁও বলে নন্দীগ্রামও বলে, তা ও একই কথা; এ নাম লিখলেও চিঠি টিঠি যায়, ওতেও যায়। তবে হঁা, জেলাটি স্পষ্টকরে লিখতে হবে। বুঝলেন ত? ঐ নওগাঁ আরও নাকি আছে। হঁা, তাই জন্যে ঐ জেলার নামটা, বুঝলেন ত? হঁা, তা সেই নন্দীগ্রামে মশাই আমাদের বাস। সে আজকের বাস নয় মশাই, আমার পো ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দা থেকে আমরা এই ক-পুরুষ এখানে বাস করচি, বুঝলেন ত? হঁা, সেই গাঁয়ের পুরুৎ আমি।

ত ছোটখাট গাঁটি বটে, তবে নেহাৎ যে ছোট লোকেরই বসতি, তা নয়। এখনও দু'দশঘর বামুনকায়েতের ঘরে সেখানে সাঁজসন্ধ্যে পড়ে, বুঝলেন ত? হ্যাঁ, তা আছে এখনও গাঁয়ে দু'দশজন ভদ্রলোক। আমারও ঐ বিদেয়টা সিধেটাআসটা কুড়িয়ে চলে যায় এক রকমে। তা ব্রাহ্মণীরও কাল হয়েছে, ঘরেও আর বেশী কেউ খেতে মাখতে নেই, চলবে না কেন বলুন না মশাই? হ্যাঁ, একটা পেট বইত নয়। তা দেখুন, এই যে মেয়েটি দেখছেন, এটি আমার এক শিষ্যিকন্যে। রামহরির বউ মরণকালে একে আমার হাতে সঁপে গিয়েছে, বুঝলেন ত? হ্যাঁ, না দিয়ে করে কি মাগি? আর ত কেউ কোথাও নেই ক তার। তার বেটা, বউ তারা ত অনেক দিন আগেই মরে গেছল। একেই বুকে আঁকড়ে মাগি এতদিন কুঁড়ের মধ্যে পড়ে সেই বিষম শোকে জ্বরে ছিল। একদিন পট্ করে পটল তুলে, বুঝলেন ত? হ্যাঁ তা আমায় অনেক করে বলে গেছে যে হরিদ্বার কনখলে এর দাদামশাই, মাতামো' দাদা আছেন। কি করি মশাই, বুঝলেন ত? কাজেই এই বেরিয়েছি। পরের দায়, এ যে মহাদায় বুঝলেন ত? তাতে মেয়ে বড়ও হয়েছে, এখন এর ভিক্ষে সিক্ষে করে বিয়ে দিলেও আর তাতে কন্যে দানের ফল হবে না। গৌরীদানের ত হবেই না। বুঝলেন ত? হ্যাঁ! এ মনুর বিধান! আইন এ সব। এও আর অমান্য করা চলে না। তা এখন আর সবাই মানছে না, স্বেচ্ছাচার করছে। হ্যাঁ, তা গিয়ে মিথ্যে হয়রাণি! সেখানে এখন আর তিনি থাকেন না; সত্তের নম্বর গণেশ মহল্লায় কাশীধামে এসে রয়েছেন। বুঝলেন ত? হ্যাঁ তাই যাচ্ছি আবার সেখানে।"

বৃদ্ধের কাহিনী এতক্ষণ সকলেই সকৌতূহলে শুনিতেছিলেন। বৃদ্ধের কথা শেষ হইয়া গেলে একজন মন্তব্য করিলেন "মেয়েটি যেন রাজকন্যে! চমৎকার মেয়ে!"

শুনিয়া মেয়েটি নতদৃষ্টি তুলিয়া একবার বক্তার পানে চাহিয়াই আবার বিশাল সরল নেত্রদুটি আরও একটু নত করিল। সেই চকিত কটাক্ষটুকু যেন সবলে কুঁকড়িয়া মিনতি করিয়া বলিল "কেন তোমরা আমার পানে চাহিয়া আছ? কেনইবা বিরক্তি এবং সহানুভূতি জানাইতেছ? কিছু কাজ নাই; শুধু তোমাদের মন ও দৃষ্টি এখান হইতে সরাইয়া লও—তা হইলেই আমি বাঁচি!" বৃদ্ধ আবার আরম্ভ করিল "গরীব মানুষ, কোথা কি পাব বলুন? রামহরির কুঁড়েটুকুন বেচে গাই গোরুটো গয়লাকে পোষানী দে, বিয়ে পাঁচ

সাত বাক্ষেত জমী ছিল সে সব দামুজোনের ব্যাটা রাজজোন'কে জমা ধরিয়ে দে, সেই ঘর বিক্রির সচৌদ্দগণ্ডা টাকা নিয়ে বেরিয়েছি। বুঝলেন ত? হাঁ, তা তার মধ্যে এই ত এক্ষণই প্রায় কুড়ি টাকা সাড়ে বার আনা খরচ হয়ে গেছে। মোট নিজের শুদ্ধ জড়িয়ে সড়িয়ে হাতে আছে চৌত্রিশ টাকা আট আনা এক পাই। উহুঃ, তাথেকে আবার আধলার তামাক আর আধলার টিকে কিনেচি, বুঝলেন ত? হাঁ, তা'হলে ওটা পুরোই আট আনা, তা যা এখনও খরচ হয়, যা বাচবে ওরই আঁচলে বেঁধেদে আসবো। গরীববটি বটে মশাই, কিন্তু চোর কি জোচ্চোর নই। ও গচ্ছিত ধন আমার রক্ষরক্ত! বুঝেছেন ত? ও রক্ষরক্ত! ছুঁয়েচি কি গেছি! হাঁ, তা ওকে আর ওর টাকা পয়সা ক'টা একবার তাঁর কাছে পৌছে দিতে পারলেই নিশ্চিন্দি হই মশাই, ঘাড়ের বোঝা নেমে যায় আমার! বুঝেছেন ত? এ মহা দায়! পরের দায় মহাদায়! তা এ থেকে একেবারে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘরে ফিরে যাব। একবার গিয়ে পড়তে পারলে হয়। সেখানে গেলে আর কোন ভাবনা নেই। মস্তলোক তিনি, খুব নামডাক তার, সব্বাই চেনে শোনে,—বুঝলেন ত? হাঁ, সে খুব সুবিধে হবে তখন।" ইতিমধ্যে নূতন রসাস্বাদে সিক্ত হইয়া কখন বিবদমানগণের অন্তর্তাপ শীতল হইয়া গিয়াছিল বোধ হয়। আমরা ঠেলিয়া ঠেসিয়া তাহার ভিতরেই একটু জায়গা করিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়াছিলাম। শৈলেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "কি নাম তাঁর? কিছু কাজটাজ করেন?"

"তিনি কি করেন? কিছু না। লোকে তাঁকে খুব মানে। মস্তলোক, মস্তলোক। খুব নাম, বুঝলেন ত? হাঁ, খুব নাম। তাঁর নামটি হচ্চে সীতাপতি ভট্টাচার্য্য। পিতার নাম শ্রীধরনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, পিতামহের নামটি শোনা হয়নি; রামহরির বউও বোধ হয় জানত না। আদ্ বাড়ী জেলা যশোর, গ্রাম কালিয়া। কুলের মুখটি, তিনপুরুষে, পিতামহ সাতগায়ে বৃন্দাবন রায়ের ঘরে ভঙ্গ হন। সেই থেকে সাতগেয়েই বাস করছিলেন। ঐ এক কন্যে, রামহরির পুত্রবধূ—ঐ একটি কন্যে তাঁর, বুঝেচেন তো? হাঁ, তা ঐ এক কন্যে বলে আর অতশত মানেন নি, পাচ পুরুষে রামহরির ব্যাটা, তারও ঐ একটি ব্যাটা মশাই, সবে ধন নীলমনি, তা নামেও তাই, কাজেও তাই। ঐ ওর সঙ্গে বে দিয়ে জামাইকে নিজের কাছে নিয়ে বিদ্যে শেখাতে আরম্ভ করে দিলেন। শিখেছিলও খুব। বুঝলেন ত? হাঁ, তা খুব একজন দশের মধ্যে নামওলা হত, বেঁচে থাকলে। তা থাকবে কেন? কুলীনের

মেয়ে কখনও অকুলীনে সয়? সইল না মশাই সইল না, পট করে আগে মেয়েটা মল, তারপর নীলমাধবও দু'মাস যেতে না যেতে—ব্যাস্! বুঝলেন ত? হঁ্যা, তা থাক্ সে সব কথায় আর কাজ কি মশাই? মেয়েটা এখনি হয় ত কেঁদেই ফেলবে। দেখেনি জানেনা বটে; হাজারও না দেখুক তবু ত বাপ মা।"

আমারও আর সীতাপতি ভট্টাচার্য্যের 'কুলজী' শুনিবার স্পৃহা অধিক ছিল না। সম্পূর্ণ সায় দিয়া তাই এ কাহিনী সমাপ্তির পোষকতা করিয়া বলিলাম "আহা, সেত ঠিকই কথা! বলেন কি বাপ, মা! অমন কি কেউ আর আছে।"

শৈলেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল "যদি তাঁকে কাশীতেও না পাওয়া যায় তা হলে এঁকে নিয়ে কি করবেন পুরুৎ ঠাকুর?"

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ প্রশান্তমুখে কহিয়া উঠিল "আমার ঘরে ফিরিয়ে নে' যাব। কার কাছে কোথায় দেব মা লক্ষ্মীকে আমার! বাপ্‌রে! তা কি পারি? বুঝেছেন ত? হ্যাঁ, এ যে আমার গচ্ছিত ধন, কি বলেন?"

"মেয়েটির নাম কি ঠাকুর? বড় লক্ষ্মী মেয়ে। আহা ভগবান ওকে সুখী করুন।" শৈল এই কথা বলিয়া তাহার নম্র নত মুখখানির দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আমরা কিন্তু কেহই এই কৈশোরোত্তীর্ণাপ্রায় কুমারীকে এমন সহজ ভাবে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি নাই। একটু লজ্জা, কিছু কুণ্ঠা, কি যেন অপরাধী ভাব সকলেরই চক্ষে প্রকাশ পাইতেছিল। সকলেই সকলকে গোপন করিয়া এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সুধা নেত্র দ্বারা পান করিতে উৎসুক। কেহ কাহাকেও এদিকে জানাইতে ইচ্ছুক নহেন যে এই নারীটি তাঁহার কোন প্রকার আগ্রহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এমনি করিয়াই বাঙ্গালী যুবারা অপরিচিতা রমণীদের সম্বর্দ্ধনা করিতে অভ্যস্ত। শুধু আমরাই বা কেন, অনেকেই এই পথের পথিক, এ কথা আমার বিশেষ জানা আছে। তা আমাদেরই বা সব দোষটা দিলে এখন চলিবে কেন? মেয়েরা যেখানে লজ্জায় ঢাকা মুখের বত্রিশ হাত ঘোমটা কৌতূহলের তাড়নায় উচু করিয়া ধরিয়া তাহারি মধ্য হইতে খেমটা নামক এক জাতীয় নাচ নাচিতে থাকেন, আবার লোকে দেখিলেই যেন কি কাণ্ডই ঘটিল, এমনই করিয়া তড় তড় হুড় হুড় শব্দে ছুটিয়া পালান; কাজেই একজনকে ইহার ব্যতিক্রম করিতে দেখিলেই আমরা তাহা কি অপূর্ব্বদর্শন বোধে গিলিয়া ফেলিতে চাই। আর তাহারাও আমাদের বেহায়া বলিয়া গালি দেন। মারাঠা মেয়েদের মতন স্থির ধীর নির্ভীক ভাব দেখিলে কি কেহ

তাহার দিকে চোরাকটাক্ষে চাহিতে সাহস পায়? অথচ তাঁদের সেই ঘোমটার উঁকিঝুঁকি না থাকা সত্ত্বেও ত কেহ কখনও নির্লজ্জত্ব আরোপ করিতে সাহসী হয় নাই। আমরা যে কাজ নিজে না করিতে পারি, তাহা অপরকে করিতে দেখিলে, হয় তাহার প্রশংসা করি, না হয় অধিকস্থলে এইটাই হয়,—তাহার নিন্দা করি। শৈলেনকে আজ একটু নিন্দাই করিলাম। মনে মনে লজ্জিত হইয়া ভাবিলাম ছিছি, ওটা হলো কি? অত বড় মেয়ের নাম জিজ্ঞাসা করা কেন? সাহেবরাও ত এমন করে না।

বৃদ্ধ কিন্তু খুব প্রসন্ন মনেই একগাল হাসিয়া উত্তর দিল, "নাম ওর স্বর্ণলতা, লক্ষ্মী লক্ষ্মী করে আমরা সবাই ডাকি। ঐ নামটাই থেকে গেচে। আসল আর কেউ ধরেও না, চলেও না।"

জনান্তিকে আমি শৈলেনকে কহিলাম "কি হে কোর্টশিপের মতলবে আছ না কি? তোমার ত চিরদিনের ওটা একটা সাধ।"

সে হাসিয়া তেমনি চুপিচুপি উত্তর দিল "না, ঘটকালির চেষ্টায় আছি।"

"তুমি ত সরস্বতী চাও না, তাই দেখছিলুম লক্ষ্মীর যদি পেচাটি করে দিতে পারি।" দুজনেই হাসিলাম। কথাটা এইখানেই চুকিয়া গেল। না কোর্টশিপ, না ঘটকালি, কিছুই আর অগ্রসর হয় নাই।

(২)

পড়াশোনা চুকাইয়া ওকালতির সনদ লইবার পরই হঠাৎ একদিন বাল্যবন্ধু শৈলেনের নিকট হইতে এক নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়া পৌঁছিল। "বহুকাল দেখা সাক্ষাত নাই, একবার এই অবসরে বাঁকিপুরটায় বেড়াইয়া যাও না।"

না আসিলে দুঃখিত হইবে, এবং মনেও অনেক রকম ভাবান্তর উপস্থিত হইতেও পারে। এমনি সব অনেক রকম ভীতি-প্রদর্শনও সে করিয়াছিল।

আমার পক্ষে এমন কিছু বাধাও বর্ত্তমান ছিল না যে, এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি।

শৈলেনের সঙ্গে সেই তার বিবাহের সময় শেষ দেখা হইয়াছিল। তারপরই সে বাঁকিপুরে। এই বড় রকম চাকরিটা পাইয়া সেখানে চলিয়া যায়। স্ত্রীও তাহার নিতান্ত বালিকা ছিলেন না, সেই হইতে তিনিও তাহার কাছে। কাজেই আর সে বড় একটা আমাদের এদিক পানে পা বাড়ায় নাই। এখন তাহাদের একটি সন্তান জন্মিয়াছিল, ছেলেটির নাম অমিয়কুমার, সকলে ডাকে তাহাকে 'মণ্টু' বলিয়া। ষ্টেশনে নামিয়াই আমি সর্ব্ব-প্রথম শৈলর কোল হইতে তাহার

ছেলে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিলাম। এমনি সুন্দর মুখখানি যে দেখিলেই যেন বুক জুড়াইয়া যায়। বন্ধু হাসিয়া বলিলেন "ওরে অকৃতজ্ঞ! ও কি তোকে এখানে এনেছিল? এদিকে যে বাবুর একেবারে লক্ষ্যই হ'লো না।"

আমি ছেলেকে আবার আদর করিয়া কহিলাম "নিশ্চয়! কোন্ অজ্ঞাত আকর্ষণ মানুষকে তার ইচ্ছায় অনিচ্ছায় টেনে নিয়ে যায়, কে তার খবর রাখে? হয় ত ওরই এই সুন্দর মুখখানির চুম্বক এই লোহাটাকে কোন রকমে স্পর্শ করেছিল।"

শৈল উচ্চহাসি হাসিল, কহিল "ঠিক্ ধরেচ! তোমার অলৌকিক শক্তি-বিশ্বাসের ভিত্তি দেখচি এখনও তেমনি দৃঢ়ই আছে। কিন্তু এবার আমিও তোমার এই চৌম্বকাকর্ষণ ব্যাপারটির সমর্থন করি। তবে সে চুম্বকটি এখন কোথায় সে তর্কটা এখন নাই তোলা গেল; সে পরে দেখা যাবে। এস!"

ছেলেটা কিন্তু এমনি অকৃতজ্ঞ, আমার স্নেহভরা চুমাগুলা সে একান্ত অবহেলার সহিতই গ্রহণ করিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বাপের কাছে নালিশ রুজু করিয়া দিল "বাবা, কাকা হামকো ঝুটা কর দিয়া!"

শৈলেনের বাড়ীখানি বড় সুন্দর সাজান। ঝকঝকে তকতকে গৃহখানি যেন গৃহলক্ষ্মীর নিপুন হাতখানিকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। সামনে বেশ একটুখানি ফলবাগান। সিঁড়ির দুধারে টবে পাতাবাহার গাছ সাজান। মধ্যের হলে ঘরজোড়া কার্পেট, টানাপাখা, টেবিল, চেয়ার, দেওয়ালে গৃহিণীর চিত্র করা, বয়ন করা কতকগুলি চিত্র প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। সর্ব্বত্রই আধুনিক রুচির একটা পূর্ণ সামঞ্জস্য দেদীপ্যমান। এতটা আমি আশা করি নাই, একটু যেন কেমন কেমন বোধ হইল একেবারে দিশী মানুষ কিনা!

শৈলেনের স্ত্রী তড়িতা হালফ্যাসানে শিক্ষাপ্রাপ্তা একালের মেয়ে। স্বামীর মেজাজের সঙ্গে তাহার বেশ মিশ খাইয়া গিয়াছিল। খাওয়া দাওয়ায় পুরা সাহেবিয়ানা শৈলের ছিলনা, তাছাড়া আর সব বিষয়ে সে খুবই পাশ্চাত্যপদাঙ্কানু-সরণে চলিত। এই একটি অসুবিধায় আমায় না পড়িতে হইল, এ ছাড়া আর কোন বিষয়েই তাহাদের যত্ন আদর স্নেহের এক বিন্দু ত্রুটি খুঁজিলেও মিলিত না। প্রথম দিন নিজের ট্রাঙ্ক হইতে পঞ্চপত্র বাহির করিয়া একজন হিন্দু চাপরাশীর কল্যাণে প্রাপ্ত গঙ্গোদকটুকু লইয়া নিজের ঘরের একপাশে সন্ধ্যাহ্নিকটা সারিয়া সবেমাত্র গীতার প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোক শেষ করিয়াছি, এমন সময় বৌদির প্রেরিত ভৃত্য আসিয়া জানাইল 'আহার্য্য প্রস্তুত।'

দেন তাহলে আমার কাছে ত কখন এতটুকুও পেতে হবে না, এ আমি শপথ নিয়ে বলতে পারি! আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট কেবল এই প্রার্থনা করি, যেন তিনি ওর পরে কখনও কোন দৈবাঘাত না করেন। তড়িৎ আমার গেলে আমি আর একদণ্ডও এ পৃথিবীতে থাকব না। ও যে আমার কত জন্মের তপস্যালব্ধ পুরস্কার, তা কেউ জানে না!”

বলিতে বলিতে তাহার মুখে চোখে যেন একটা সগর্ব্ব হর্ষের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সুখে বেদনায় বিজড়িত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে চুপ করিল। আমি তাহাদের অটুট শান্তি কামনা করিয়া কহিলাম “এ যেন ভাঙ্গা ঘরে বাস করা শৈল, বড় ভয়ে ভয়ে থাকা।”

সে সহজভাবেই হাসিয়া উত্তর দিল “ভয় কিসের? সাবধানে থাকা উচিত বলেই থাকি। নৈলে আমি ঠিক জানি আমার তড়িৎ আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না। সেই বিয়ের কনে এসেচে, আজ চারবছর একদিন এক মুহূর্ত্তও কোথাও যায় নি।”

আমি বিশ্বাসের দৃঢ়তা বড় পছন্দ করিতাম, খুসী হইলাম। কিন্তু পছন্দ করিলে কি হয়, মনে মনে গোপনে গোপনে সকল বিষয়েরই মত এ বিষয়েও কতকটা সন্দিহান ছিলাম। তাই মনের মধ্যে ঈষৎ অবিশ্বাসে একটু ঘাড় নাড়িয়া আপনা আপনি বলিলাম, “যাই বল ভাই ও সব খেয়ালের কথা ত নয়! গতিক বড়ই মন্দ! সরু সূতায় সমস্ত টুকুই ঝুলছে।”

যাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা আমাকে চিন্তিত করিয়াছিল, তাহারা কিন্তু সে দিকে এতটুকু উদ্বেগ বা আশঙ্কার চিহ্নও দেখিতে পায় নাই। হাসি-খুসী গল্প-গানে যেন পরস্পরকে লইয়া সারা বিশ্ব বিস্মৃত হইয়াছিল, অতীত এবং অনাগত কাহাকেও দৃক্‌পাত না করিয়া তাহারা সুখময় বর্ত্তমানকে উপভোগ করিতেই ব্যস্ত।

বৈকালে শৈলেন্দ্র অফিস হইতে বাড়ী ফিরিলে আমরা তিনজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প করিতাম। গল্প প্রায়ই তর্কে পরিণত হইয়া পড়িলে কোন দিন বাগানের মধ্যের চাতালে, কোন দিন বারান্দার চৌকিতে আমরা বসিয়া পড়িতাম। যে দিন আমাদের তর্কটা খুব বেশি রকম পাকিয়া না উঠিত, সেদিন ক্ষণপরে বৌদিদির পাকা হাতের যন্ত্রধ্বনি আমাদের কর্ক্কশ কণ্ঠের স্বরলহরীর প্রতিধ্বনিতে প্রহত গৃহাকাশকে শীঘ্রই শীতল প্রলেপ বুলাইয়া জুড়াইয়া দিত। গলাটিও তাঁহার বেশ মিষ্ট, তা আমিও অস্বীকার

করিতে পারি না। যদিও স্ত্রীলোকের সঙ্গীত-সাধনা, বিদ্যাচর্চ্চা, স্বাধীনভাবে উদ্যান-ভ্রমণ, এ সবই আমার চোকে বিসদৃশই ঠেকে, তথাপি ইহাঁকে এ সকলের মধ্যেও যেন আমার খুব বেখাপ ঠেকিত না—যেন এই ভাবেই এঁকে বেশ মানায়।

আর যে দিন আমাদের তর্কের রোখ এবং গলার স্বর উভয়ই চড়িয়া উঠিতে থাকিত, সেদিন বেচারি তড়িতা কোন্ সময় এ অঞ্চল হইতে সরিয়া পড়িত। শেষটা আমাদের মাথাঠাণ্ডা হইয়া আসিলে হুঁস হইত, শৈলেন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া ক্ষণপরে ম্লানমুখে আসিয়া বলিত "কি পাষণ্ড আমি—নিজের খেয়ালেই চেঁচিয়েছি। তড়িতের ত কোন রকম গোলমাল সহ্য হয় না, তার বুকটা কেমন করচে। অবশ্য সে তা স্বীকার করলে না, কিন্তু মুখ দেখেই বোঝা যাচ্চে ত? না ভাই, তোমার মতই হয়ত ঠিক; থাক ও সম্বন্ধে আর কখন আমি তর্ক তুলবো না।"

তার পর আর দুচার দিন তর্ক তোলা হইত না; তড়িতার গান শোনা হইত, মণ্টুর খেলা দেখা হইত, ছাত্রজীবনের কত সুখস্মৃতি চিত্ত চিত্র-শালা হইতে বাহির করিয়া আলোচনা করা হইত। আবার একদিন আচম্‌কা কোথা হইতে কি উপলক্ষ্যে দুরন্ত হাঙ্গরের মত হাঁ করিয়া সেই না-তোলার প্রতিজ্ঞা করা তর্কটা তুলিবার অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা হইতে উঠিয়া উপস্থিত! এই জন্যই কথায় বলে যে 'স্বভাব যায়না মলে!'

তর্কটা কি লইয়া জান? শৈল পূরা "মেটিরিয়ালিষ্ট" -আর আমি বেশি রকমই "স্পিরিচুয়ালিষ্ট।" কাজেই দুজনের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য ত থাকিবেই। তা'ছাড়া আসল বিবাদ ছিল এই খানেই যে;—শৈল বলিত তাহাকে যাহা বলা হয় সে ঠিক তা নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার কোনপ্রকার বিদ্বেষ অথবা আগ্রহ নাই। সে মানুষের নৈতিক জীবনকেই মুখ্য মনে করে। প্রেমই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য, চরম উৎকর্ষ—এই তাহার বিশ্বাস। মনুষ্য যদি ভালবাসা দিতে এবং ভালবাসা পাইতে পারে, তবে তাহার অপর আর কোন সাধনারই আবশ্যক করে না। এ প্রেমের পরাকাষ্ঠা অবশ্য সার্ব্বজনীন ভালবাসা বা বিশ্বপ্রেম। আমার মত অত সহজ নয়। মানুষকে আমি খুব উদারভাবে দেখিতে সাহসী নই। অতি দুর্দ্দান্ত পশুর চাইতে মানুষ কোন অংশেই ভাল নয়। তাহাকে হাতে পায়ে শিকল লাগাইয়া চাবুকের পর চাবুক মারিতে থাকিলে তবেই সে যা একটু সায়েস্তা থাকিবে।

একটু এলাকাড়া দিয়াছ, কি অমনি উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। আমার মত তাই প্রত্যেক নরনারীকে অতি শৈশব হইতে একান্ত কঠোরতার সহিত পালন করিতে হইবে। বৌদ্ধ অথবা রোম্যান ক্যাথলিক পুরোহিতগণের 'পেনিটেন্স্' বা আত্মদোষানুসন্ধান আমার আদর্শ ছিল। জগতের প্রত্যেক নরনারীরই ঐরূপ পাপক্ষালন চেষ্টা করা আমার মতে অবশ্য কর্ত্তব্য। বিবাহ আমার চক্ষে স্বার্থপরতা। বিবাহদ্বারা মানবচিত্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। বিশ্বপ্রেমের যে আদর্শ বন্ধু দেখাইতে চাহেন তাহা এই সীমাবদ্ধ প্রেম দ্বারা খণ্ডিতই হয়। মন ভগবৎভক্তি গ্রহণ করিতে পারেই না। সন্তান এবং সন্তান-জননীর সুখ স্বাস্থ্য খুঁজিতে উৎসুক চিত্তে কোনও ত্যাগের ভাব আসিতেই অসমর্থ। এই সকল অকাট্য যুক্তিদ্বারা আমি বহুবার প্রমাণ করিয়াছি যে, মানুষকে আদর্শ মানব হইতে হইলে তাহার চারিপাশে জ্ঞানের, ধর্ম্মের, ত্যাগের অতি ভীষণ বহ্নি জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্রাধ্যয়ন আচার, নিষ্ঠা সর্ব্বদা পালনে-নিরত হইতে হইবে। এই সকল বর্ম্মাবৃত থাকিলে ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতেই পারে না, এবং তাহারই পক্ষে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া পরমপদপ্রাপ্তি সম্ভব। প্রেম! প্রেম বলিয়া বস্তুতঃ কোন সামগ্রী জগতে নাই। উহা মোহেরই সংজ্ঞান্তর। প্রেমে মানবচিত্তকে সংসারে বিজড়িত করে, ইহারই নাম মায়া। ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম্ম। সমস্ত বিশ্ব হইতে নিজেকে সযত্নে সরাইয়া রাখিবে, যেন কোনখানে একটু ঠেকা-ঠেকি হইয়া পড়ে না, তা হইলেই সব গেল।

শৈল হাসিত, বলিত "ও তোমার ভুল! শাস্ত্র কখনও অমন কথা বলিতেই পারে না, তুমি বোধ হয় ঠিক বুঝিতে পার নাই।"

আমি রাগিয়া যাইতাম। "ও চিরকালই এসব বড় কথায় হাসে।" শাস্ত্র আমি যেমন বুঝিয়াছি এমন—স্বয়ং বেদব্যাসও বুঝিয়াছিলেন কি না জানি না। তবে শঙ্করাচার্য্য বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর কতকটা মতের মিল আছে দেখিতে পাই। তা, শৈলেনের দোষই বা দিব কি? ইংরেজি পড়িয়া কয়জনই বা মাথা ঠিক রাখিতে পারে? আর না পড়িয়াই বা কয়জন যথার্থ ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেছে?

হঠাৎ একদিন এক বিভ্রাট ঘটিল। শৈলেন কাছারি ফেরৎ একেবারে আমার ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মনু, তোমার শিরোমণিকে মনে পড়ে?"

"কে শিরোমণি ?" এরকম নাম কোন দিন শুনিয়াছি এমন সন্দেহও করিতে না পারিয়া উত্তর দিলাম "কই না, মনে ত নাই।"

শৈলেন্দ্র গায়ের কোটটা খুলিতে খুলিতে কহিল "মনে নাই ? সেই যে একবার পূজার ছুটীতে আমরা দুজনে বেড়িয়ে ফিরছিলাম। ট্রেনে একটি লোক ও একটি মেয়েকে আমরা তুলি– মনে নাই ? মেয়েটি খুব সুন্দরী, নাম তার লক্ষ্মী। ওঁরই যজমানের মেয়ে,কেউ নাই বলে উনিই অভিভাবক হয়ে—"

মনে পড়িয়া গেল,—না তা ঠিক নয় মনে ছিলই, যে জন্য প্রথমে বুঝিতে পারি নাই তাহাই বলিলাম। কহিলাম "ও বুঝিয়াছি, আর বল্‌তে হবে না। সেই 'বুঝেছেন ত' না ? তা তার নাম ত শুনি নি। কি হয়েচে তার ? এখানে তার কেউ আছে নাকি ? তুমি তার খবর কোথায় কি পেলে ?"

তাহাদের খবর পাইতে আমার দুর্দ্দম মনটা এক একবার দারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া ফেলিত। সে জন্য সে অপরাধী ক্যাথলিকের মত কতবার নিজেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। তবু রোগের যে জড় মরে নাই, তাহা বুঝিতে পারা গেল।

শৈলেন আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "তারা আজ এক বৎসর প্রায় আমার আশ্রিত। এখানে কিছু দূরে কলবেড়ের কাছে 'মানিক তলাও' বলে এক দীঘি আছে; তা'রই শিবমন্দিরে পুরোহিতের দরকার ছিল। হঠাৎ কেন কে জানে আমার তাঁর নামটা মনে পড়ে গেল। ঠিকানাও জানা ছিল। তখনই একখানা চিঠি লিখেছিলুম; চিঠি পাবে কি আসবে, এতও আশা করিনি। হঠাৎ একদিন ভোরে দেখি মেয়ে সঙ্গে শিরোমণি এসে উপস্থিত। সেই অবধি এই খানেই তাঁরা রয়েচেন।"

আমার বুকের ভিতর জোরে জোরে কি যেন দোলা দিয়া উঠিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মেয়ে সঙ্গে ? সেই মেয়েটাই নাকি ?"

শৈল আবার আমার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া উত্তর করিল "হ্যা, সেই লক্ষ্মী। শিরোমণির আর কেউ-ই নেই।"

"তা সে ওর কাছে থাকে কেন ? মাতামহের কাছে যায় নি যে ?"

"মাতামহ মারা গেছলেন, দেখাও হয় নি। কোথা যাবে, তাই ওঁর কাছেই আছে।"

"শ্বশুরবাড়ী যায় না কেন ? এ বয়সে স্বামীর কাছে থাকাই উচিত ত।"

"শ্বশুরবাড়ী থাকিলে ত যাবে। তুমি এঁড়ে গরুকে টেনে দোহার ব্যবস্থা করিয়া দিলে।" বলিয়া শৈলেন হাসিল।

আমি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "বুঝেচি, বিধবা হয়েচে। তারা ঠাঁই দেয় না।" শৈলেন্দ্রর পোষাক বদলান হইয়াছিল ; ভৃত্যের হস্তে প্যাণ্টুলেনটা ছাড়িয়া দিয়া সে একটা চৌকি টানিয়া বসিয়া কহিল "বোঝ নি ; সে বিধবা নয়, কুমারী। আজও তার বর জোটে নি।"

আমি ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক-শক্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম। এতক্ষণ সেটার পিন গাথা কাগজ নাড়াচাড়া করিতেছিলাম, এবার সেটা সবেগে টেবিলের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর একটা সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিয়া উঠিলাম "ঐ দেখ! সমাজ আমাদের একেবারে অধঃপাতে যাচ্চে! ধর্ম্ম বলে আর কিছু ভারতে রৈল না।"

শৈলেন ঈষৎ বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিল ; জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় কি অধর্ম্ম দেখলে ?

"ওঃ হ্যাঁ তা অধর্ম্ম বই কি। গরীবের মেয়ে বলে অমন মেয়ে কেউ নিতে চায় না। আবার এদিকে সবই নিজেদের হিন্দু হিন্দু, বলে চেঁচিয়ে গলা ফাটান! এ গুলো খুব অধর্ম্ম বই কি—একশো বার।"

"না নেওয়া অন্যায় বটে, কিন্তু বিয়ে দেবই মনে করলে কি আর বিয়ে এতদিন হয় না। সে রকম ধর্ম্মের ভয় থাকলে কোন্ কালে বরও জুটে যেত। ভাল শিক্ষিত পাত্র বড় লোকের ছেলে এসব খুঁজলেই সহজে জোটে না। জাত যাবে ভয় রেখে যেমন তোক পাত্রে দিয়ে ফেল্লেই গণ্ডা গণ্ডা জুটে যায়।"

"তবে তোমার মত কি অপাত্রে হোক কুপাত্রে হোক হিন্দুর মেয়ের নির্দ্দিষ্ট বয়সে বিয়ে দিতেই হবে ? মনুরও কি ঐ মত ছিল ?"

"ছিল বই কি, মনু বলেচেন······কন্যা দ্বাদশ বার্ষিকী, তারপর ত বিয়ে হতেই পারে না। ঐ বয়সেই বিবাহের শেষ সীমা।"

শৈল বলিল "তা বলচি না। মনু কি অপাত্রে দেবার কথাটাও বলে গেছেন কোথাও ? যে মনু বলেচেন বাল্যবিবাহ উচিত, তিনিই ব্যবস্থা করে গেছেন "দেয়া বরায় বিদুষে" বিদ্বান বর না পেলে যাকে তাকে ধরে দিতেই হবে এমন বলেন নি। মনু, শাস্ত্র পড়তে হয় ত খানিকটা পড়ে ছেড়ে দিতে নেই, বা কিছু মনে রেখে কতকটা ভুলে যাওয়া ভাল নয়।"

তাহার শেষ মন্তব্যে একটু চটিলাম। কারণ প্রতিবাদ করিবার কিছু

পাইলাম না। তাই একটুখানি উষ্মা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তা এখন আমার তাঁদের খবর নিয়ে কি করতে হবে? আমার ত ঘটকালির ব্যবসা করা অভ্যাস নাই।"

শৈল এবার খুব খানিক হাসিয়া বলিল "তোমার না থাক, আমার আছে। আমিই এবার ও কাজটা করিব মনে করিয়াছি। তুমিত খুব হিন্দু, ব্রাহ্মণকে জাতিপাত হইতে রক্ষা কর। শাস্ত্র সফল হোক, তুমি লক্ষ্মীকে দয়া করে বিবাহ করিয়া সুখী কর। কাজটা এখন নিঃস্বার্থভাবে করিলেও পারে সুদশুদ্ধ আদায় হইবে, একথা আমি বড় গলা করিয়াই বলিতেছি। নিজে যা আছ তার লক্ষ গুণ সুখী না হইয়া থাকিতে পারিবে না দেখিও।"

আমি প্রথমটা তামাসা মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কথার স্বরে শেষ দিকটায় বুঝিলাম, সে সত্যই আমায় এই অসঙ্গত অসম্ভব অনুরোধ করিতেছে। মনে বড় অভিমান হইল। আমায় এতটা খেলো করিয়া দেখিল! এতদিনের সঙ্কল্প আমি এখন ছাড়িলেও ছাড়িতে পারি, এমনি তাহার বিশ্বাস হইয়াছে। বিরক্ত হইয়া বলিলাম "আর বর পাইলে না? মেয়েটির বয়স এখন বোধ হয় কুড়ি পার হয়েচে? আর বছর দশেক সবুর কর, তখন বরং পারি ত দেখা যাবে। অত ছোট মেয়ে আমার সঙ্গে ত মানাবে না।"

শৈল মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, কহিল "তুমিত খোকা নও, তোমার বয়স ছাব্বিশ বৎসর হ'ল ত? লক্ষ্মী এই সতের বছরের,—নবছরের তফাৎ কিছু কম নয়। যদি এখন তোমার কারও সঙ্গে মানায় ত ওর সঙ্গেই মানাবে। না সত্যি, অমন মেয়ে সংসারে সর্ব্বদা জন্মায় না। মণি, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না ভাই,—সে সত্যিই লক্ষ্মী।"

শৈলেনের মুখ প্রশংসার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি জোর করিয়া লোভ দানবটাকে গলা টিপিয়া কাবু করিয়া একপাশে সেটাকে ঠেলিয়া ফেলিলাম। ত্যাগই মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি। সেই মহাশক্তির সাহায্যে নিজেকে জয়ী করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে হাসিয়া উত্তর দিলাম "ঘটক ঠাকুর! ক্ষান্ত হন, এ ভবী ভোলবার নয়, তেল ফুল চাপিয়ে করবেন কি? বরং যদি একটা চাঁদার খাতাটাতা খোলা হয় তাতে কিছু দিতে টিতে পারি। আজকাল সবেতেই ত চাঁদা ওঠান হয়, এতেই বা বাদ যায় কেন? আমার মতে সেটা খুব মন্দ নয়। মেয়ে বুড় করে রাখার চেয়ে সেও ভাল।"

শৈল একটু দুঃখিতভাবে কহিল "আচ্ছা তোমার ত্যাগের খাতিরেও এ বিয়ে করতে পার ত; নিজের স্বার্থ, সুখ, সঙ্কল্প পরের জন্য ত্যাগ কর। এর চেয়ে বেশি কে কি ত্যাগ করতে পারে?"

আমি বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে কহিলাম "কামিনী-কাঞ্চনই সর্ব্বপ্রধান ত্যজ্য। ও কথা যাইতে দাও। আমি দু একশো টাকা বড় জোর ত্যাগ করিতে পারি।" শৈলেন্দ্র আর কিছুই বলিল না; সে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। আমিও বোধ হয় একটু ক্ষুব্ধ হইলাম,—কিন্তু কি করা যায়, উপায় কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

স্বগত।

এই আমাদের পৃথিবীকে কত ভালবাসি, কত ভালবাসি! শষ্পমণ্ডিত এই শ্যাম প্রান্তর, আকাশের অনন্ত আলোক প্রসার, বাতাসের অশেষ জীবনানন্দ, সব আমাকে মুগ্ধ করে, সবাই আমাকে প্রলুব্ধ করে, আমার মনখানিকে টেনে নিয়ে চলে! ভাগ্যে মন একখানি বস্ত, একটা বস্তু, একটি মাত্র পাত্র নয়। অনন্ত-বিযুক্ত অনন্তহীনের যাত্রী সে—অসীম নিয়েই তার সুখ। তাই সে সব খেলাতেই যোগ দিতে পারে। আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়ে, পৃথিবীর কোমলতায় আশ্রয় লাভ করে, বাতাসের আনন্দ-উৎসব নৃত্যের সঙ্গী হয়। কা'কে আমি সব চেয়ে অধিক ভালবাসি? আকাশ, আলোক, বাতাস না পৃথিবীকে? সকলকেই বাসি, অথচ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক এক জনকে বেশী ভালবাসি, বিশেষ করে, সেই তখন আমার বন্ধু, সঙ্গী, আমার প্রিয়তম হয়। আকাশের বর্ণচাতুরী, মেঘের নর্ম্মলীলা, আলোকের প্রেম-অভিজ্ঞান, নক্ষত্রের পত্রলেখা, রক্তরশ্মির অলক্ত-রাগ, আর চন্দ্রকিরণের কৌতুক হাস্য আমাকে কত মুগ্ধ করে! আবার আকাশ যখন সব বিলাস পরিহার করে' একেবারে ধ্যানী অমিতাভ হয়, তখন যে আমি তার সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে চাই। বাতাস হিল্লোল তুলে, পত্র পল্লব দুলিয়ে, পুষ্প গন্ধ বহন করে, যখন চারিদিক হ'তে জড়িয়ে ধরে, ভালবাসে, আদর করে, চুলের উপরে নিঃশ্বাস ফেলে, বুকের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাকে

কি প্রত্যাখ্যান করা যায়? কিন্তু যখন সে প্রলয়পিনাক বাজিয়ে, তাণ্ডব-নৃত্যে ছুটে আসে, সমুদ্রের তরঙ্গ সব আছড়ে পড়ে, অরণ্য উদ্যতবাহু হয়ে হাহাকার শব্দ করে, আকাশ-পৃথিবীর ব্যবধান ভরে' ওঠে, তখনই তাকে আমি যথার্থ ভালবাসি। তখনই আমার সমস্ত মন নিঃশেষে তার সঙ্গে মিশে যায়। পৃথিবীর বুকের উপর ধান্যমঞ্জরী যখন শ্যাম বিলাসে উদ্বেলিত হ'তে থাকে, দূর্ব্বাঙ্কুরে রোমাঞ্চিত হয়, স্নিগ্ধ হরিত লাবণ্যে চক্ষুদুটি জুড়িয়ে যায়; তখন হেসে, মুখ নেড়ে, ঠেলা দিয়ে তাকে বলতে ইচ্ছা করে, 'হলা অনসূয়ে, খবর ভাল ত?' দুই সখির মত, পা ছড়িয়ে, চুল এলিয়ে, রোদে পিঠ দিয়ে বসে মনের কথা কইতে সাধ যায়। কিন্তু যেদিন গ্রীষ্মের নিদারুণ নিঃশ্বাসে, তার শষ্পমাধুরী শুকিয়ে ওঠে, শ্যামলতা পাণ্ডুমালিন্যে পরিণত হয়, যেদিন সে ধূসরে পরিবসানা, এক বেণী-ধরা বিরহিণী, সেই দিন সে আমার অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করে নেয়। পঞ্চতপা যে করেছে, সেই তাপিতের ব্যথা জানে, সুখী যে, সে কি সে কথা বোঝে?

চড়কের উদ্বোধন করে' গ্রীষ্ম আসে। চৈতালি শুকিয়ে ওঠে, চম্পকের তীব্র গন্ধে আকাশ স্তম্ভিত হয়, রুদ্ররশ্মিতে আকাশের কটাহে, বাসনার সব বাসন্তীবর্ণ পাংশু হয়ে আসে। ব্যোমকেশের জটার মধ্যে গঙ্গার প্রচুর ধারাও ক্ষীণ হয়ে যায়। তখন শঙ্কিত চিত্তে, কম্পিত হস্তে, জপমালা ঘুরিয়ে কেবলই বলি, শিবশম্ভো, শিবশম্ভো। যিনি একান্ত মনে সে সময় পঞ্চতপা করেন, তারই জীবনে পরে পতিতপাবনীর পুণ্য প্লাবন অবারিত হয়। আকাশের উদাস ভস্মরাগ ধুয়ে দিয়ে, নিবিড় স্নিগ্ধ নীলিমার মাধুরী জেগে ওঠে; কেতকী সৌরভে কাননপথ, মিলন মুগ্ধা রাধিকার মত নিরতিশয় রমণীয় মনে হয়; আর পদ্মবনে কলহংসের সঙ্গীত, নিকুঞ্জদ্বারে নৃত্যপর পরিতৃপ্ত ময়ূরের সড়্‌জ সংবাদিনী কেকার, রাগিণী আলাপ ঝঙ্কৃত হয়।

শীতের দীর্ঘ রাত্রিতে যদি ভয় হয়, গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিন ত আরও দুর্ব্বহ। তার জ্বালাময়ী তীব্রতা কেমন করে সহ্য হবে? শীত ত দয়া করে আসে, কুয়াশা টেনে দিয়ে, স্বপ্ন দেখবার অবসর দেয়। সূর্য্যরশ্মি করুণার মত মনের মধ্যে সুমধুর স্পর্শসুখ সঞ্চার করে, চন্দ্রালোক ধ্যানের মত সুগভীর, তার কৌতুকদৃষ্টিও সমাধি-স্তিমিত হয়ে আসে

শীতের সুদীর্ঘ রাত আর গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিন দুই-ই মনে বিভীষিকা সঞ্চার করে, কেমন করে রাত কাটবে, কি উপায়েই বা দিনটি ভরে উঠবে? রাতের ব্যাকুলতার মধ্যে একটি সান্ত্বনাও আছে, নিস্তব্ধ অন্ধকার মনকে উদাস করে, চঞ্চল করে না। আকাশের কাল চোখের গভীর শান্ত নতদৃষ্টি, স্নেহের আশ্রয়ের মত মনকে ক্রমে অবলম্বন এনে দেয়। জেগে জেগে চারিদিকের কেমন এক অস্ফুট সঙ্গীত শোনা যায়। ঘুমন্ত পাখী এক একবার জেগে উঠে, নিদ্রিত, অতি মৃদু স্বরে গান করে, আবার ক্ষণিকের মধ্যে সে টুকু ফুরিয়ে আসে। মনে হয় যেন জেগে-ওঠা ছেলেকে মা যেমন কপালে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে স্পর্শ করে' বুকের কাছে টেনে নিয়ে, আবার ঘুম পাড়িয়ে দেন, এদেরও যেন কেউ তেম্নি করলে। শুনতে পাই বাগানের মধ্যে ইন্দুর আনা-গোনা করছে, অতি ভীত ভাবে, অতি চকিত পদক্ষেপে, ক্রমে তাও আর শোনা যায় না। রাত্রি যত গভীর হয়, পৃথিবী তত অধিক নীরব হ'তে থাকে—মনের মধ্যকার ব্যথা, অশান্তি, ব্যাকুলতা যেন প্রসারিত হয়ে কোন সুদূরে মিলিয়ে যায়। যেখানে গিয়া তার শেষ হয়, সেখানে অশেষ নীরবতা, অনন্ত ধ্যান, অনির্ব্বচনীয় শান্তি। তখন কে আমার আছে, কে আমার নাই, কি পেয়েছি, কি পাইনি, কি হ'তে পারত তা হয়নি, সে সকল কোন কথাই মনে থাকে না। মনে হয় সৃষ্টির আদিম রহস্যের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছি—সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে পৃথিবীর জাগরণ আসবে, আমারও জাগ্রত স্বপ্নের অবসান হবে।

আর দিনের ব্যাকুলতা, নিঃসঙ্গতার কষ্ট বড় ভয়ানক, চারিদিকে যখন জীবন-উচ্ছ্বাস জাগ্রত, শত শত তরঙ্গ আক্ষেপে তটভূমিতে আঘাত করছে, চারিদিকে প্রাণের নৃত্য, বাতাস ছুটে চলেছে, গাছপালায় অশ্রান্ত মর্ম্মর, সূর্য্যালোকের অজস্র প্রপাত, পাখীর গান অবিরত মধুর, কত ডাকাডাকি, জানাজানি, কত পরিচয়ের পরিপূর্ণতা, তখনও যে পরিত্যক্ত, ব্যর্থ, অনাদৃত তার কি যন্ত্রণা! ঝরা পাতাও যখন উড়ে চলে, সে যে তখনও সমাহিত, নিশ্চেষ্ট, ম্রিয়মান; হাহাকারে তার সমস্ত মন ভরে ওঠে, অথচ চোখের জলের লেখা দিয়ে সে ভাষা সে প্রকাশ করতে অক্ষম। হায় এই শুষ্ক নিরাশ উপায়হীন অবস্থা বড় ভয়ানক!

মানসী।

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রথমেই বলিয়া রাখি রাজপ্রাসাদে আমার জন্ম হয় নাই এবং জন্ম উপলক্ষে দান, ধ্যান, পূজা, মহোৎসব, সে সব কিছুই হয় নাই—দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে আমি জন্মিয়াছিলাম। আমি পিতামাতার একাদশ সন্তান—আমার জন্মে তাঁহারা আনন্দিত হইয়াছিলেন কি না একথা বলা কঠিন নয়—দরিদ্রের গোষ্ঠী খুব আনন্দদায়ক কি না সে বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাদের মতামত দিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমার মতামতের কোন আবশ্যক এখানে নাই। নাটোর রাজবংশে পুত্রসন্তান না থাকায় পোষ্যপুত্র রাখিয়া বংশরক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং জ্যোতির্বিদের গণনায় আমি দীর্ঘজীবী; আমার জন্মসময়ে বৃহস্পতি একাদশ, শনি তৃতীয় এবং রাহু তুঙ্গী থাকায়, রাজবংশের উপযুক্ত বংশধর আমিই—এইরূপ সাব্যস্ত হইয়া গেলে আমার চৌদ্দ মাস বয়সের সময় মহাসমারোহে পুত্রেষ্টি যাগ করিয়া আমাকে রাজসংসারে আনা হইয়াছিল, এইরূপ শুনিয়াছি। এক নিমেষে দরিদ্রের সন্তান আমি রাজনন্দন হইয়া গেলাম। আমার রাশিচক্রের সঙ্গে মিলাইয়া অনন্ত গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থান, কোথায় কিরূপ ছিল কে জানে, তবে রাজধানীর জ্যোতির্বিদ জগবন্ধু আচার্য্য আমার রাহু তুঙ্গী বলিয়া আমাকে এক মুহূর্ত্তে অভ্রভেদী রাজপ্রাসাদের তুঙ্গ শিখরে চড়াইয়া দিল। সেই অবধি স্নেহময়ী, সর্ব্বসহা, শস্পস্তীর্ণা ধরিত্রীর সুখময় স্পর্শ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াই আছি। আজও তাঁহার সুধাশীতল অঙ্কে শুইয়া চক্ষু বুজিবার অবসর আমার হইল না! শৈশবের অনেক কথা লোকমুখে শুনিয়াছি, তবে শোনা-কথা আদালতে চলে না, প্রামাণ্য নয়; ইতিহাসেও শোনাকথা আজকাল চলিতেছে না; শিলালিপিতে যাহা উৎকীর্ণ হয় নাই, তাহা বিশ্বাস্য নহে এই মত আজ কাল চীৎকার করিয়া সকলে জাহির করিতেছেন। তাই আমার শিলাকঠিন মনের উপর যে কথাগুলি খোদিত হইয়া আছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। অতি শৈশবের দু'একটি কথা মনে থাকে, আমারও আছে—রাজধানীর কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের স্থলাভিষিক্ত চন্দ্রকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার পঞ্চম বর্ষ বয়সের সময় সরস্বতী পূজার দিনে কেমন করিয়া আমার 'হাতে খড়ি' দিয়াছিলেন, সে কথাটি আমার মনে আছে। দুঃখ-কথা লোকে শীঘ্র ত বিস্মৃত হয় না।

বাঙ্গালা দেশের প্রথা শ্রীপঞ্চমীর দিনে কুসুম ফুলে রঙান কাপড় পরে; সবাই পরে, স্ত্রী পুরুষ-নির্ব্বিশেষে পরে। আমিও মা'র কাছে কাঁদিয়া আবদার করিয়া, (উপদ্রবও বুঝি বা করিয়াছিলাম) 'ছিলি-পচুমি'র দিনে পীতাম্বর পরিয়া আমার খেলার সাথী ছোট্‌দিদির কাছে গর্ব্বভরে আমার পীত-শ্রী দেখাইতে ছুটিয়াছিলাম, তখনও জানি না পুরোহিত ঠাকুর আমার হিতের জন্য 'হাতে খড়ি'র ব্যবস্থা সেই দিনেই করিয়াছেন। শ্রীপঞ্চমীর দিন অনধ্যায় চিরপ্রথা—নিষিদ্ধ দিবসে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কেন আমার বিদ্যারম্ভ করাইলেন বলিতে পারি না—হয়ত বা তাহারই ফলে বাগ্‌দেবতার করুণা আমার প্রতি হইল না—জ্ঞানের আলোক মনের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল না—পাঁচবৎসর বয়সে মনের আঁধার যেমন ছিল, তদপেক্ষা আজ কিছু কমিয়াছে এমন ত মনে হয় না, বরং অন্ধকারের পর অন্ধকার মনের মধ্যে আরও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে—সে আঁধারে পথ চলা দুঃসাধ্য! জীবন-পথ যে বড় বন্ধুর!

হাতে প্রকাণ্ড একখানা চা খড়ি দিয়া পুরোহিত ঠাকুর আমার হাত ধরিয়া 'ক' হইতে 'ঙ' পর্য্যন্ত পাঁচটি বর্ণ সেদিনকার মত শিখাইয়া দিলেন। বিদ্যারম্ভটা যত সহজে নিষ্পন্ন হইল, বিদ্যাটা অত সহজে আয়ত্ত করা যদি যাইত, তবে বুঝি বা আমারও বিদ্যা হইতে পারিত। লোকে কথায় বলে আরম্ভটাই কঠিন, একবার আরম্ভ হইয়া গেলে শেষ কোনমতে হইয়াই যায়—সব বিষয়ে এ কথা খাটে না, অন্ততঃ আমার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে এ কথাটা মোটেই খাটে নাই—আরম্ভটা আমার অতি সহজেই হইয়াছিল, কিন্তু শেষের দিকটা বড় কঠিন হইয়া আসিয়াছিল, সে কথা যথাস্থানে যথোপযুক্ত সময়ে আমার পাঠকপাঠিকাদিগকে শুনাইব। পাঁচবৎসর বয়ঃক্রমের এই একটি কথাই মনে আছে, আর কিছু মনে নাই।

তার পর দু' এক বৎসর গেলে আমার অভিভাবকবর্গ আমার বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বিশেষভাবে বন্দোবস্ত করিবার নানাবিধ আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ীতেই একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুল স্থাপিত হইল এবং নিকটস্থ কয়েকখানি গ্রামের ভদ্রসন্তান—সংখ্যায় প্রায় ষাট সত্তর জন হইবে—ঐ স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হইল; আমরা সকলে যথাকালে প্রতিদিন স্কুলঘরে সমবেত হইতাম, বেতন দিতাম, বেতও খাইতাম—দিনগুলি, মাসগুলি, বৎসরগুলি, যত শীঘ্র অগ্রসর হইতে লাগিল আমার বিদ্যা তত শীঘ্র অগ্রসর হইতে

পারিল না। লক্ষ্মী শুনি চঞ্চলা, সরস্বতী যে পঙ্গু সে তথ্য আমিই বোধ হয় প্রথমে আবিষ্কার করিলাম। যে কয়টি শিক্ষক আমাদের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল সে পরিমাপ করিবার মত ক্ষমতা আমাদের ছিল না, তবে তাঁহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী এবং শাস্তির বিধান আমাদের মনমত মোটেই নয়—বালকের প্রসারিত দক্ষিণ হস্তের তালুর উপরে জলন্ত অঙ্গার রাখা, পড়া না পারিলে ভীমরুল দিয়া হতভাগ্য বালককে কামড়াইবার ব্যবস্থা করা, সর্ব্বাঙ্গে বিছুটি ঘসিয়া দেওয়া এই সব অভিনব অথচ স্মৃতি যাহা সযত্নে রক্ষা করিবে এরূপ শাস্তি তাঁহারা অনেক জানিতেন। এই সমস্ত কারণে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ক্রমে কম হইতে আরম্ভ করিল, ছাত্রবেতন যথারীতি এবং উপযুক্ত পরিমাণে সংগ্রহ আর হয় না। অন্যান্য ছাত্রের অভিভাবকেরা যখন এই পণ্ডিতনামধারী রবি-নন্দনের অনুচরদিগের মায়ামমতার সঠিক খবর পাইতে লাগিলেন, তখন নিজ নিজ সন্তানদিগকে তাহাদের পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিবার বহু পূর্ব্বেই স্কুল ছাড়াইয়া নিলেন—“দশবর্ষানি তাড়য়েৎ” এই নীতিবাক্য মানিয়া চলিবার ধৈর্য্য আর তাঁহাদের রহিল না—সমস্ত স্কুলের মধ্যে রহিয়া গেলাম আমি এবং ঐ পাঁচটি শিক্ষক। আমার পলাইবার উপায় নাই এবং শিক্ষক মহাশয়দের যাইবারও আর দ্বিতীয় স্থান ছিল না, সুতরাং আমি এবং আমার পঞ্চ শিক্ষক মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইলাম, পরীক্ষা চলিতে লাগিল—এক ছাত্রের পাঁচ শিক্ষক হইলে ছাত্রের প্রতি সরস্বতী এবং যমরাজের মধ্যে কার দয়া আগে হয়। এই সমস্যার কোনরূপ সন্তোষজনক মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল—আট বৎসর তিন মাস বয়ঃক্রম কালে আমার দুটী চক্ষুই অন্ধ হইয়া গেল, সেই জন্য মাষ্টার মহাশয়েরা তার পরে কোথায় গেলেন, তাহা সঠিক বলিতে পারিব না, কারণ এই রূপময়ী নগনদীগ্রাম-নগর-শোভিতা শব্দস্পর্শশালিনী বসুন্ধরা আমার চক্ষুর উপর হইতে কোথায় সরিয়া গেল, অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডিত সৌর জগৎ যেন নিমেষে নিবিয়া আমার চতুঃপার্শ্বে এক অন্তহীন অন্ধকারের সৃজন করিল, আমি সেই অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়া কি ভাবিলাম সব কথা এখন মনে নাই।

ঠিক উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমার উপনয়ন হয়, আজ আর উপনয়নের পর দ্বাদশবর্ষব্যাপী গুরুগৃহবাসের ব্যবস্থা নাই, দ্বাদশ দিবস একটি ঘরে রুদ্ধ থাকিয়া গায়ত্রীটা কোন মতে শিখিয়া লইতে পারিলেই বেদাধ্যয়ন,

ব্রহ্মবিদ্যা লাভ সবই হইয়া যায়—আমিও উপনয়নের পর একঘরে বদ্ধ হইয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া এবং গায়ত্রী মুখস্থ করিয়া আমার গুরুসেবা বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যা সব শেষ করিলাম। ফাল্গুন মাসে আমার উপনয়ন হয়, সেই সময় দোলযাত্রা—আমাদের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের ফল্গুমহোৎসব খুব সমারোহেই সে সময় নিষ্পন্ন হইত, আবীর, গুলালের ছড়াছড়ি নাটোর সহরের রাস্তাঘাট সব একমাস পর্য্যন্ত লালে লাল হইয়া থাকিত, লোকের পরিধেয় বস্ত্রের রঙ্ উঠাইতে রজকের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ উপস্থিত হইত— পঞ্চম দোলের দিন আমার নিভৃত বাসের যন্ত্রণার অবসান হইল—একে একাকী একঘরে দ্বাদশদিন বসবাস করা আমার মত লোকের পক্ষে সুকঠিন, তার উপর দোলের উৎসবে যোগ দিতে না পারায়—আবীরে আপাদমস্তক লাল করিয়া আনন্দের উন্মাদনার মধ্যে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতে না পারায়, আমার যে কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঐ বয়সের বালক ভিন্ন অপরের বুঝা সহজ নয়। যে দিন ছাড়া পাইলাম সেই দিন পঞ্চম দোল, সেই দিনই আমাদের বাড়ীর দোলের শেষ উৎসব—আমি ছাড়া পাইবামাত্র আমার কাপড়ের খুঁটে আবীর ও কুঙ্কুম লইয়া বাহির হইলাম, স্নানাহারের সময়েও সেদিন আমাকে ধরা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়াছিল।

ফল্গু-উৎসব ত মিটিয়া গেল কিন্তু তাহার পরদিবস আমার দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল, সকলে বলিল আবীর চ'খে গিয়া ওরূপ হইয়াছে, আমলকীর জল বা গোলাপ জল দিয়া চক্ষু ধুইয়া দিলে ভাল হইয়া যাইবে। মা সেইরূপই করিলেন, কোন ফল হইল না। সে পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ী ডাক্তারী চিকিৎসা প্রবেশ লাভ করে নাই। আমার পিতামহী, মা, সকলেরই ধারণা ডাক্তারী ঔষধমাত্রেই মদ্যের সংশ্রব ছাড়া হয় না, সুতরাং ডাক্তার ও ডাক্তারী ঔষধের সংস্পর্শে যাহাতে বাড়ীর কেহ না আসিতে পারে তৎপ্রতি তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টির অভাব ছিল না। আমাদের বাড়ীর প্রাচীন কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয় আয়ুর্ব্বেদমতে আমার চক্ষুর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন, কত প্রকারের পুট, প্রলেপ, বর্ত্তির ব্যবস্থা হইল, কিন্তু ব্যাধি কোন বাধাই মানিল না। তাহার পূর্ণ প্রকোপের ফলে একদিন প্রাতে উঠিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখি আমার পরিচিত পৃথ্বী কে যেন একখানি সূক্ষ্ম জাল দিয়া আবরণ করিয়া দিয়াছে, সবই আমার চক্ষে ধোঁয়ার মত বোধ হইতেছে। শীতের কুয়াসা সূর্য্যোদয়ে সূক্ষ্ম হইয়া যায়, কিন্তু এ কুয়াসা সূক্ষ্ম

হইল না। তিন চারি দিনের মধ্যে আমার দৃষ্টিশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইল, কিছুই আর দেখিতে পাই না। অপরের সাহায্য ব্যতীত এক পাও নড়িবার সাধ্য নাই। মা আহার করাইয়া দিতেন; যেখানে বসাইয়া রাখিতেন, সেই খানেই নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকিতাম। মানুষের আনাগোনা পদশব্দে অনুমান করিয়া নিতে হইত, উষার অরুণোদয় ও সন্ধ্যার সূর্য্যাস্ত বিহঙ্গ কাকলিতে আমার কল্পনার বিষয় হইয়া উঠিল; বৈচিত্র্যময়ী ধরণীর মনভুলান, চোক-জুড়ান বিচিত্ররূপ আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে কে যেন মুছিয়া ফেলিয়া দিল। এইভাবে আমার দিন কাটিতে লাগিল; প্রাতে, সন্ধ্যায় জ্বালাযন্ত্রণাময় ঔষধ মা আমার চক্ষে দিয়া দেন, তিনিই আহার করাইয়া দেন, আর দিবারাত্রি নিবিড় অন্ধকার আমার দুই চক্ষুতে ভরিয়া নিয়া আমি নিশ্চলভাবে একস্থানে বসিয়া থাকি। রোগের কোন উপশম দেখা যাইতেছে না তথাপি চিকিৎসার পরিবর্ত্তন হইল না, সে জন্য বালক আমি, আমার মনে কোনরূপ দুঃখ কষ্ট অধৈর্য্যের লেশমাত্রও ছিল না, বরং যমের দোসর মাষ্টার পণ্ডিতের কাছে পড়ার জন্য নির্ম্মম প্রহার পাইতেছি না সে জন্য মনে আনন্দ একটু হয় নাই এমন কথা বলিতে পারিব না। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার জ্বরজ্বালা হইয়াছে ও সারিয়া গিয়াছে, এ পীড়াও সারিবে সে বিষয়ে আমার মন নিঃসংশয় ছিল, তবে যত বিলম্বে সারে সেই ভাল; শিক্ষার জন্য শিক্ষকের অনানুষিক তাড়না বালকের মনে কি বিভীষিকারই সৃজন করিয়াছিল যে তাহার পরিবর্ত্তে অন্ধতাও তাহার কাছে শ্লাঘ্য মনে হইয়াছে। আমার জনক তখনও জীবিত ছিলেন। কার্য্যান্তরে তিনি স্থানান্তরে যান, সেই সময়ে আমার এই চক্ষুরোগের সূত্রপাত হয়। তিনি বাড়ী ফিরিবা মাত্রই আমার জননী বলিলেন "রজের চক্ষুর পীড়া হইয়া দুই চক্ষুই প্রায় নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, সে কিছুই দেখিতে পায় না, তুমি একবার রাজবাড়ী গিয়া তাহাকে দেখিয়া আইস এবং যাহা করা উচিত কর; তুমি বাড়ী ছিলে না, তোমার বিনানুমতিতে রজকে দেখিতে আমি রাজবাড়ী যাই নাই।" এইখানে বলিয়া রাখি, অন্নপ্রাশনের সময়ে পিতামাতা আমার নাম "রজনাথ" রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যত দিন জীবিত ছিলেন আমাকে ঐ নামেই ডাকিতেন। আজ আমি যাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের সুধাসিঞ্চনে জীবনকে বহনীয় বলিয়া মনে করি,—কেবল একমাত্র সেই স্থান হইতেই এই স্নেহের ডাক পাই, আর সকলে রাজধানীর প্রদত্ত আমার "জগদিন্দ্র" নামই জানে। পিতা আমার জননীর মুখ হইতে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ পাইয়া তখনই রাজবাড়ী আসিলেন; আমি যেখানে স্থানুর

মত বসিয়া থাকিতাম সেইখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রজ, তোমার চক্ষু কেমন, কিছুই কি দেখিতে পাওনা ?" তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকৃত মনে হইল, তখনও বুঝিতে পারি নাই তিনি কষ্টে রোদন সম্বরণ করিতেছিলেন, তাই তাঁর কণ্ঠ অমন বিকৃত শুনাইয়াছিল। যখন উত্তর শুনিলেন "আজ্ঞা না, কিছুই দেখিতে পাই না, আপনাকেও দেখিতে পাইতেছি না", তখন সেই বয়স্ক, জ্ঞানী, তেজস্বী, নির্ভীক, প্রৌঢ়পুরুষ, তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র এই নিতান্ত দুর্ভাগাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। বয়স্ক লোককে কাঁদিতে সেই আমি প্রথম দেখিলাম, তখন আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, আজ আমার সে সংস্কার দূর হইয়াছে, আজ বুঝিয়াছি বয়স্ক লোককেও কাঁদিতে হয়, এবং সে কান্না বড় মর্ম্মভেদী।

কবিরাজী চিকিৎসায় ফল হইতেছে না, সুতরাং ডাক্তারী মতে চিকিৎসা করাইয়া একবার দেখা উচিত, এই প্রসঙ্গ লইয়া আমার পিতামহীর সহিত আমার জনকের বচসা হয় এবং তিনি আমার পীড়ার যথারীতি চিকিৎসা যাহাতে হয় সেই ব্যবস্থা করাইবার জন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তৎক্ষণাৎ রওনা হইয়া যান এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিয়া সিভিল সার্জ্জনসহ ম্যাজিষ্ট্রেটকে নাটোরে সঙ্গে করিয়া আনিয়া আমার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া দেখান। সিভিল সার্জ্জন মত প্রকাশ করিলেন যে পীড়া পূর্ব্বে সামান্যই হইয়াছিল, যথারীতি চিকিৎসা না হওয়ায় এবং অযত্নে চক্ষু এখন নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে ; অবিলম্বে কলিকাতা গিয়া চক্ষুরোগের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে অপেক্ষাকৃত উপকার হইতে পারে। সিভিল সার্জ্জন এর মত অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিলেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বালককে কলিকাতা পাঠান হউক—কোম্পানী বাহাদুরের হুকুম অমান্য করিবার শক্তি কাহারও নাই, বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট নাটোরে বসিয়া রহিলেন, আমার কলিকাতা যাত্রা দেখিয়া তবে জেলায় ফিরিয়া যাইবেন—এমন অবস্থায় আর উপায় কি ? ডাক্তারী ঔষধে মন্ত্রের প্রক্ষেপই থাকুক, আর রেলপথে গমনাগমনে ব্রাহ্মণের জাতিনষ্টই হউক এই অন্ধ, ব্রাহ্মণ বালককে, কলিকাতায় পাঠাইতেই হইল।

সে দিনে নাটোর পর্য্যন্ত রেল হয় নাই, পাল্কী, নৌকা প্রভৃতি যানের সাহায্যে কুষ্টিয়া আসিয়া তবে রেল পাওয়া যাইত। রাজধানীর প্রাচীন দেওয়ান যাদবচন্দ্র মৈত্রেয় এবং পুরাতন ঝি বামা ও চাকর রামলালকে সঙ্গে দিয়া আমার পিতামহী ও মা আমাকে কলিকাতা পাঠাইলেন। সেই আটবৎসর ছয়মাস

বয়সের সময়ে আমার আত্মীয়-সংস্পর্শ-শূন্য বিদেশবাসের সূচনা হয়; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশই আমার দেশ, অনাত্মীয়ই আমার আত্মীয়ের বাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিচিত্র ঘটনাময় জীবনকাহিনী যখন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি তখন কেমন করিয়া যে

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।"

সে কথাও আমার পাঠক পাঠিকাকে শুনাইবার ইচ্ছা রহিল— বাঁচিয়া যদি থাকি তবে সব কথাই শুনাইব।

চিকিৎসার্থ কলিকাতা আসিবার সব বন্দোবস্ত যখন স্থির হইল তখন এ অন্ধ-বালকের মন কলিকাতা দেখিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; কলিকাতার অনেক কাহিনী লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, কখনও দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই তাই এ আনন্দ; কিন্তু হায় দুরদৃষ্ট! দর্শনেন্দ্রিয়হারা হইয়া সমস্ত পৃথিবী যে মহাপ্রলয়ের তমঃসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, হর্ষোৎফুল্ল বালকের মনে সে ভাবনা একবারও উদয় হইল না! কোথায় আজ সে সুখময় শৈশব, কোথায় সে অদ্ভুত যাদুকর, যার মোহমন্ত্রে শত দুঃখের মধ্যেও আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ বালকের বুকে নন্দনের চিরানন্দ নিত্যবিকশিত করিয়াই রাখিয়া দেয়!

ক্রমশঃ

শ্রীভবানীন্দ্রনাথ রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী চৈত্র—

প্রথমেই শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের "বর্ষ-বিদায়"। কষ্টে সৃষ্টে কতকগুলি মিল সংগ্রহ করিতে পারিলেই যদি কবিতা লেখা হয়, তাহা হইলে এটিও কবিতা। রচনাটি পড়িলেই বোধ হয় বাঙ্গালীর কবিতা লিখিবার প্রবৃত্তি সহজাত; রচনা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক, তাহাকে কবিতা লিখিতেই হইবে। তাহা না হইলে আজ বিজয় বাবু তাঁহার উপযুক্ত রচনা ছাড়িয়া স্কুলের নবীন তরুণ ছেলেদের উপযোগী পদ্যে হাত দিলেন কেন? কবিতাটিতে নূতনত্ব একটুও নাই;

"প্রাচীনে আজ দাও গো বিদায়
বর্ষ হল অবসান
নবোৎসবের বিশ্ববাসে
এস প্রভু ভগবান।"

এখানে কবির প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে বা হইবে কিনা জানি না, তবে "প্রভু ভগবান" যে কবির ছন্দটি জোর করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছি। উদ্ধৃত অংশটুকু পাঠ করিলে খৃষ্টান পাদ্রীদের বঙ্গভাষা মনে পড়িয়া যায়। অনর্থক শব্দ-প্রয়োগের উদাহরণ কবিতায় যথেষ্ট আছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আধুনিক ভারতবর্ষ" সুপাঠ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য যাঁহারা নীরবে প্রশংসা ও আদরের অপেক্ষা না করিয়া প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, জ্যোতিবাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন। বাঙ্গালা সাহিত্যকে মৌলিক রচনার দ্বারা ও নানা দেশ হইতে অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া তিনি যে ভাবে সজ্জিত করিয়াছেন সেরূপ অনেকেই পারেন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে। জ্যোতিবাবু এখনও তাঁহার উপযুক্ত আদর ও সম্মান লাভ করেন নাই, ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য কি দেশবাসীর দুর্ভাগ্য, তাহা বলিতে পারি না। যাই হোক "কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চপৃথ্বী" এমন একদিন আসিবে, যখন তিনি আপনার প্রাপ্য বিনা চেষ্টায় আদায় করিতে পারিবেন।

"বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধের অনেক কথাই পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক নূতন কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বঙ্কিম ও দীনবন্ধু বাবুর জীবনীতে স্থান পাইবে না। লেখকের কয়েকটি কথা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

(১) সর্ব্বদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন; পত্রের দ্বারা বিদ্রূপ করার অভ্যাস তাঁহাদের চিনদিনই ছিল। দীনবন্ধু একবার কাছাড়ের এক জোড়া দুষ্প্রাপ্য জুতা বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন ও তাহার সহিত একখানি তিন কথার পত্র লিখিয়াছিলেন "বঙ্কিম কেমন জুতো?" বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "তোমার মুখের মতন।"

(২) বঙ্কিমচন্দ্র যখন নেগুঁয়া (কাঁথি) মহকুমায় ছিলেন, তখন একজন সন্ন্যাসী কাপালিক মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। এই ঘটনাই তাঁহাকে "কপালকুণ্ডলা" লিখিতে প্রবৃত্ত করে।

(৩) দীনবন্ধুর লীলাবতীতে বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে স্থানে লিখিয়াছিলেন।

(৪) পরোপকার দীনবন্ধুর জীবনের ব্রত ছিল। সামান্য কাজে কর্ম্মেও তাঁহার এই গুণটি প্রকাশ পাইত। একবার তিনি একটি মাতালকে খানা হইতে উঠাইয়া সযত্নে গন্তব্য স্থানে পাঠাইয়া দেন। এই মাতালই "সধবার একাদশীর" ভোলা মাতাল।

নারায়ণ চৈত্র—

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পৌরাণিকী কথায়" এবার তন্ত্র ও ভক্তিসূত্রের কথা আছে। লেখকের বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের উদাহরণ প্রবন্ধের অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। লেখক বলিতেছেন—পুরাণে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই বহু আখ্যায়িকা এবং উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। বিশ্বব্যাপী আত্মার এবং দেহব্যাপী আত্মার মিলনচেষ্টা হইতেই উপা-

সনার উৎপত্তি। উপাসকের কার্য্যসিদ্ধির জন্যই চিন্ময় জ্ঞানময় অদ্বিতীয় অখণ্ড অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। আত্মস্থ দেবতাকে পরিহার করিয়া যে বাহিরের দেবতার উপাসনা করে সে ভ্রান্ত এ কথাও তন্ত্র বলিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে দেহস্থ আত্মাকে চিনিতে পারিলে বাহিরের বিশ্বাত্মাকে ঠিকমত চেনা যায়। ইহার জন্য দীক্ষা আবশ্যক। মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষা হয় মন্ত্রজপের প্রভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, তন্ত্র বলিয়াছেন "জপাৎ সিদ্ধিঃ।" প্রসঙ্গক্রমে লেখক বলিয়াছেন "আমাদের বাঙ্গালা দেশে আজ কাল যেমন মৃণ্ময়ী প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করা হয় পূর্ব্বে এমন ছিল না। পূর্ব্বে বাঙ্গালার হিন্দু যন্ত্রের পূজা করিতেন। রাজা জগদ্রাম রায়ের সময় (১৪শ শতাব্দী) হইতে বাঙ্গায় আধুনিক প্রথামত দুর্গোৎসব প্রচলিত হইয়াছে। গৃহস্থের গৃহে কালী গড়াইয়া পূজা আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দই (১৬শ শতাব্দী) চালাইয়া গিয়াছেন। জগদ্ধাত্রী পূজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। প্রতিমা গড়াইয়া সরস্বতী পূজা বোধ হয় শত বৎসরের অধিক হইবে না। তারপর লেখক বলিয়াছেন মাটীর মূর্ত্তি আমরা নির্ম্মাণ করি বটে, কিন্তু পূজা করি আত্মার—আত্মশক্তির। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—এমন কত বাদই আছে; পুরাণ সকল বাদের সমাহার; যে বাদের অনুকূল বচন চাহিবে, উহাতে তাহাই পাইবে। পুরাণ সত্য মিথ্যা লইয়া চিন্তিত নহেন; পুরাণের কেবল দৃষ্টি সিদ্ধান্তের দিকে, রসোন্মেষের দিকে, তথ্য নির্ণয়ের দিকে। পুরাণ লোকশিক্ষার গ্রন্থ; সমাজ শাসনেরও গ্রন্থ। পুরাণে প্রধানতঃ এই কয়টি বিষয়ের অলোচনা আছে;—(১) ঈশ্বরে বিশ্বাস (২) একনিষ্ঠা (৩) ঈশ্বরে মনুষ্যত্বের আরোপ (৪) ঈশ্বরে ইষ্টদেবতায় সাধকের সর্ব্বস্ব নিবেদন (৫) সমাজধর্ম্ম বা সমাজশরীরের ধর্ম্ম কেমন হওয়া উচিত, তাহার ব্যাখ্যা (৬) ফলশ্রুতি।

"অন্তর্যামী" কবিতাটি অস্পষ্ট। অল্পকথায় অধিক ভাব ব্যক্ত করা গদ্যে প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু কবিতায় তাহা একান্ত প্রয়োজনীয়।

পথখানি লাগি প্রাণ ইতি উতি চায়,
পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায়!
কোথা পথ, কোথা পথ, কোথা পথখানি
সে পথ বিহনে যেগো, সব মিছা মানি!
এদিকে ওদিকে চাই; চকিত পরাণে,
পাগলের মত ধাই পথের সন্ধানে,
এই পথ দেখি ভাবি পেয়েছি পেয়েছি,
এ পথ সে পথ নয়, এ পথে এসেছি!

ইহা পদ্য বটে, কিন্তু কবিতা নয়। কাশীরাম কৃত্তিবাসের আমলের ছন্দ ও ভাষা লেখক বেশ অনুকরণ করিয়াছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী "বৌদ্ধধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিতেছেন "বৌদ্ধধর্ম্মের নাম ও আচার ব্যবহার অনেকটা পূর্ব্বদিক হইতেই আসিয়াছে। বুদ্ধ পূর্ব্বাঞ্চলের লোক। এইখানেই অশ্বচিকিৎসা, হস্তিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র উৎপন্ন হয়। আর্য্যগণ যখন

সুসভ্য দেশ আক্রমণ করিয়া তাহার রাজা, সমাজ, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি সব ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে আর্য্যসভ্যতা দান করিবার উদোগ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় উঠিতে লাগিল, শেষে সব ধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া এক বৌদ্ধধর্ম্মই পূর্ব্বভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতে লাগিল। যাহাতে বুদ্ধের ধর্ম্ম এত বড়, যাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়, যাহার জন্য বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান, যাহার জন্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম্ম এত উদার, সেটি তাঁহার মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ মাঝামাঝি চল, বাড়াবাড়ি করিও না।" Aristotle তাঁহার উদ্ভাবিত Golden Mean এ এই মধ্যমা প্রতিপদের আভাস দিয়াছেন। তিনি বুদ্ধের বহুপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কাজেই এই মধ্যমা প্রতিপদের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের আসন নির্ম্মাণ করিলে বিশ্বের ধর্ম্ম ইতিহাসে তাহা খুব উচ্চ বলিয়া পরিগণিত হয় না। আশা করি শাস্ত্রীমহাশয় বৌদ্ধধর্ম্মের মহত্ত্ব অন্য দিক দিয়াও দেখাইবেন।

"আরও কিছু আমার কথা" শ্রীজগদম্বা দেবীর প্রবন্ধ। আজকাল বাঙ্গালা দেশে লেখিকাদের নামের সংখ্যা বড় অল্প নয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে শক্তিমতী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং স্ত্রীলোকের রচনা সমালোচিত হইবার দিন আসিয়াছে একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই প্রবন্ধটির ভাষা অপূর্ব্ব, কোথাও কথোপকথনের ভাষা, কোথাও সাধুভাষা—রচনা শিথিল, উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত। ইহাকে গদ্য বলিব কি পদ্য বলিব, তাহা ঠিক করিতে পারি না। ভাষার কতকটা নমুনা তুলিয়া দিতেছি—"আজ আমার মুখশ্রীতে এক অলৌকিক স্নিগ্ধ আভা দেখে, কে যেন অনিমেষ নয়নে আমায় নিরীক্ষণ করছেন, আর আমি হ্রীবিজিতা মুগ্ধার মত ব্রীড়ানত হয়ে এক অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। আমি তাই আজ রূপের উপঘাতিকা, পরশের পরিচারিকা, রসের নবনায়িকা। আজ যৌবন আমার ছন্দবিহারী, গন্ধ আমার মনোহারী, শব্দ আমার ভাণ্ডারী আর আমি হয়ে আছি আমার দুয়ারের ভিখারী, দূরে দাঁড়ায়ে অভিমান 'মরিছে গুমরি'।"

আরও একটু উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি—

"কে একে এমন বেওয়ারিসি মাল করে দিলে? যার যখন ইচ্ছা আসে যায়; একে ভাঙ্গে, গড়ে, গাঁথে, জোড়ে, সাজায় গোজায়, ফের দেখ্‌না দেখ্‌ চলে যায়। না করে এরা আমায় আসতে জিজ্ঞাসা। না জানিয়ে যায় যাবার বেলা! আছি যেন একটা সাক্ষী গোপাল পড়ে। আমার ছিল একখানা খুদে ঘর, ছিলাম আমি তাতে গরীবী হালেতে, না তা হোলনা; কর, কর, একে বড় কর, কর কর, একে মনোহর কর; সাজাও দিয়ে সৌখীন সাজ, দাও তাক্ লাগিয়ে সবায় আজ।"

এই অদ্ভুত রচনাটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সামলাইতে পারা যায় না। যাক্ এ কথা। এই রচনার মধ্যে লেখিকা কতকটা দার্শনিক কথা (সবুজপত্র যাহা মাসে মাসে ফুটাইয়া তুলিতেছে) প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতির একটা স্বতন্ত্রতা আছে, এই স্বতন্ত্রতাকে যদি কেহ জাগাইয়া তোলে তাহা হইলে সে দেখিতে পাইবে জ্ঞানের সহিত প্রকৃতির বিরোধ নাই, প্রকৃতিকে যে বাদ দেয়, সে মূর্খ। লেখিকা উত্তম পুরুষের প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতির কথাগুলিই প্রকাশ করিয়াছেন। কোনমতে ভাষার জাল ছিন্ন করিতে

পারিলে ভাবে আসিয়া ঠেকিতে হয়। ভাবটি অনেক স্থলে অস্পষ্ট, বোধ হয় লেখিকাও তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এ ধরণের রচনা বঙ্গভাষায় আজকাল সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিতেছে। যাঁহারা সাহিত্যরথী তাঁহারও এ সকলকে প্রশ্রয় দিতেছেন, অথচ যাহাতে এসব রচনা একটা সুচারু পথ অবলম্বন করিতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন না। ফলে কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত রচনা বাহির হইতেছে, যাহাতে সাহিত্যের কোন উপকার হওয়ার চেয়ে অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। রচনার মধ্যে যতই দার্শনিক কথা থাক না কেন, অলংকার শাস্ত্রে ধ্বনি বলিয়া একটা জিনিস আছে যাহাকে হাজার বার পদদলিত করিলেও তাহা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চায়। লেখিকা তাহা ধরিতে না পারেন, আমাদের দেশের সম্পাদকেরাও যদি এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে একটু সাহায্য করেন তাহা হইলে বাঙ্গালার মাসিক পত্রে এত অপাঠ্য রচনা প্রকাশিত হয় না।

"বংশীধ্বনি" শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর কবিতা। কবি বিষয়নির্ব্বাচন করিয়াছেন ভাল, তবে বড়ই দুঃখের বিষয় যে এমন বস্তু লইয়াও তিনি এ কবিতায় একটুও মাধুর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বাঁশীকে কবি বাহ্য উন্মাদনা বলিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিদের কেহ জীবিত থাকিলে আধুনিক কবির এই ব্যাখ্যায় নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিত হইতেন। কবিতাটি অত্যন্ত দীর্ঘ। ছন্দে লালিত্যের অভাব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল "বাঙ্গালার আদি নাটক" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিতেছেন "বাঙ্গালা ভাষার আদিনাটক "ভদ্রার্জ্জুন" মহাভারতের সুভদ্রাহরণের কাহিনী লইয়া রচিত। নাটকখানির দৃশ্যে দৃশ্যে ক্রিয়া (action) কিছুই নাই। নাটকের পাত্রপাত্রী পয়ারাদি ছন্দেই কথোপকথন করিতেছে, অতি অল্প স্থলেই গদ্যে কথোপকথন আছে। একখানি কাব্যের পংক্তিগুলি কথোপকথনচ্ছলে লিখিলে যেরূপ হয়, নাটকখানির অধিকাংশ স্থলই সেইরূপ। নাটকোচিত ক্রিয়া বা জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি ভদ্রার্জ্জুনে নাই। চরিত্রের মধ্যে বলদেবের অভিমান, ভীমের ক্রোধ ও নারদের কলহ-পরায়ণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রৌপদী চরিত্র আদৌ ফুটে নাই। সত্যভামা ও রুক্মিণী চরিত্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় না। কেবল রমণীগণের কথোপকথন ও ক্রিয়াকলাপ আঁকিতে গিয়া নাট্যকার যেখানে তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গমহিলাচিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছেন, সেই স্থলগুলি এই হিসাবে দুষ্ট হইলেও বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে।" ইহার পর লেখক "ভদ্রার্জ্জুনের" বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে" লেখক এবার বুঝাইয়াছেন "ভাব ও ভাষার মধ্যে যে নিগূঢ়, নিত্য ওতপ্রোত, অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ দেখিতে পাই, তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পৌরাণিকী কল্পনার শ্রীকৃষ্ণেরও সেই সম্বন্ধ। পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ কল্পিত বটেন, কিন্তু অসত্য নহেন।"

ভারতবর্ষ, চৈত্র—

"অজন্তা" শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ। লেখক পত্নবিদ্যার দিক হইতে অজন্তার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অজন্তার চিত্রগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-রস না থাকিলেও প্রত্নতত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসুর নিকট ইহার আদর হইতে পারে।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের "ব্যর্থপ্রভাত" ও "ব্যর্থসন্ধ্যা" শীর্ষক কবিতা দুটির মধ্যে সরল মাধুর্য্য আছে। ভাবের নূতনত্ব না থাকিলেও ইহার সহজ ভাবটি অন্তর স্পর্শ করে।

"মধু-স্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম মধুসূদনের অনেকগুলি ইংরাজী কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলি পূর্ব্বে Madras Circulator পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "১৮৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে Circulator পত্রে তাঁহার 'A Vision, Captive Lady প্রভৃতি কবিতাবলী প্রকাশিত হয়; সে সকল কবিতায় তিনি নিজ নামের পরিবর্ত্তে, "Timothy Penpoem Esq. এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন।" লেখক কয়েকটি ভিন্ন কবিতাও উদ্ধৃত করিয়াছেন—তন্মধ্যে একটি কলিকাতায় লিখিত প্রেমপিপাসাপূর্ণ কবিতা, আর একটি সাদির পারস্য কবিতার অনুবাদ অপর দুইটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা। "মাদ্রাজে থাকিতে 'Anglo-Saxon and the Hindus এবং অপর দুই তিন খানি ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্যও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী অমিত্রাক্ষর ছন্দে "রিজিয়া" নামক একখানি নাটকও তিনি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করেন নাই। এই ইংরেজী কবিতাগুলিতে মধুসূদনের কবিত্বশক্তি কতটা স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে তাহা লেখক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত কবিতাগুলি পাঠ করিলে অনুমান করিয়া লওয়া দুঃসাধ্য নয়।

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ "কবি রাজশেখর" নামক প্রবন্ধে প্রাচীন সংস্কৃতকবি রাজশেখরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁহার প্রচলিত নাটকগুলির উপাখ্যানভাগটুকু প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি লেখক ভবিষ্যতে কবির নাটকগুলি সমালোচনা করিয়া পাঠকগণকে সুখী করিবেন। লেখকের ভাষা কিছু ভারগ্রস্ত। একটু নমুনা তুলিলাম—

"পাঠক, নিশাবসানে শুকতারার উজ্জ্বলতা কি লক্ষ্য করিয়াছেন, কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকার; গাছের কোল, নদীর কূল, বনের পথ, প্রকৃতির সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,—সকল শোভা ঘেরিয়া রাখিয়াছে; এমন সময় শুকতারা উদিত হইয়া অন্ধকারের নিবিড়তা অপসারিত করিয়া কিরূপে প্রকৃতির হাস্যময়ী শোভা বিকাশিত করে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন? রাজশেখরও সেইরূপ অলৌকিক কবিত্বের কিরণচ্ছটায় সংস্কৃত সাহিত্যাকাশ আলোকিত করিয়াছিলেন।"

লেখক যে জিনিষটি দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন, আশা করি আধুনিক বাঙ্গালার পাঠকেরা তাহা দেখিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন নাই। আজকাল অল্প কথাকে ফেনাইয়া লিখিবার বা পাঠকসাধারণকে স্কুলের ছেলের মত বুঝাইবার দিন কাটিয়া গিয়াছে।

গৃহকল্যাণী

ভূষণহীনা মলিন-দীনা এস আমার প্রিয়া,
সজ্জা নাহি লজ্জা কিসের কাতর কেন হিয়া?
গন্ধতেলে কেশে তোমার
ঢেকা খোঁপা চাইনা আমার,

এলোকেশে, অমনি এসে দাঁড়াও রমণীয়া,
আলতা আঁকা, সাবান মাখা নেই বা হলো প্রিয়া!

গয়নাপরা আজ হবেনা আসতে হবে খুলি',
শুনতে না চাই তৈরীকরা ময়নাপড়া বুলি।
সত্য কথা,—সরল কথা,
শুনতে প্রাণের ব্যাকুলতা,
মুছতে তুমি পাবে নাক গায়ের পায়ের ধূলি,
গয়না যদি থাকে গায়ে আসতে হবে খুলি'।

সাজ করাও সইবনাক সোণার দেহময়,
অরুন্ধতীর বেগমসাজা সহ্য নাহি হয়।
রঙীন-করা ফুলের দেহ,
ভাল কি হায় বাসবে কেহ?
হরির ভোগে আমিষ হেরে' অঙ্গ শিহরয়;
কোন্ দুখেতে গোপনকরা আপন পরিচয়?

রান্নাঘরের হলুদমাখা, ময়লা তেলে জলে,
আটপহুরে কাপড় পরে' অমনি এস চলে'
নখ গেছে ক্ষয় বাটনা বেটে,
কুটনা কুটে, আঙুল কেটে—
চুন-খয়েরে দাগ পড়েছে তোমার করতলে।
জাহ্নবী ত হবেই মলিন বিশ্বসেবার ফলে।

তুলসী তলার মণ্ডলীতে, দেব-দেউলের মাঝে,
হাত দু'খানি কঠোর হ'ল গৃহের শত কাজে।
পবিত্রতার পুণ্য পরশ,
সেবা ব্রতের ধন্য হরষ
শক্তকাজেই সফলতা শক্ত হয়েই রাজে,
গৌরবে আজ চলে এস—মলিন কেন লাজে?

হরির পায়ের তুলসীসম সতীর লোহা হাতে,
চঞ্চলা সে লক্ষ্মীদেবী পড়লো বাঁধা যা'তে,

আঁধার চিরে অরুণ-লেখা,
সীঁথে তোমার সিঁদূররেখা,
সতীমায়ের রাঙা পায়ের রক্তধূলি মাথে
ছড়াক জ্যোতি, সন্ধ্যারতি কুটীর-আঙিনাতে।

ছদ্মবেশে ঘুরছো বলে চিনব নাক আমি ?
পরশ দিয়ে করলে সোণা আমার নায়ে নামি'
ভাগ্যবতীর পরম রতন,
আয়ুষ্মতীর প্রাণের যতন,—
শুভ্র শাঁখার দর্পণে যে চিন্‌ছি দিবাযামী
জানি না কোন্ পুণ্যফলে তোমার আমি স্বামী।

ধূপ ত আছে নাই বা হলো সোণার ধূপাধার
হর্ম্ম্যবিহীন বারাণসী, পুণ্য বেশী যার
কাঙাল পতির কাঙাল বধূ
রূপ না থাকুক—আছে মধু,
সোণার চাঁপা কি হবে, নাই গন্ধমধু যার
কণ্ঠা কিসের কণ্ঠে যদি নাইবা থাকে হার।

শ্রীকালিদাস রায়।

সাহিত্য-সমাচার।

যশোরের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক লেখক শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস "নূরজাহান" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন গল্পের পুস্তক 'পরিকথা' এই মাসেই প্রকাশিত হইবে।



পাগলিনী

(ওফিলিয়া)

MANASI PRESS

মানসী

৭ম বর্ষ ১ম খণ্ড	জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ সাল	১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নৌকা পাল্কী রেল এই নানাবিধ যান-বাহনের সহায়তায় কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিলাম। শোনা ছিল রেলগাড়ী দ্রুত চলে, আমার নিকট তখন রেলের প্রচণ্ড শব্দ ছাড়া গতি যে কিছু আছে তাহা বোধ হইল না, ইহার কারণ যে কি তাহা আমার তখনকার শিশু-মনে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, আজ বুঝিতেছি রেলে চড়িয়া যখন বাহিরে চাওয়া যায়, বাহ্যবস্তুর কাল্পনিক বিপরীত গতি যখন দেখি, সেই সময়েই আমাদের দ্রুত বা বিলম্বিত গতির অনুভূতি হয়। আমি অন্ধ, সুতরাং সে জ্ঞান তখন হওয়া আমার অসম্ভব, রেলগাড়ীর স্পর্শমাত্রই পাইলাম, রূপ দেখা আমার কপালে তখন ঘটিল না। আমাদের সেই চিরস্মরণীয় ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভূগোল পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু অনেক বালক ভূগোল আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শিক্ষকের তাড়নায় গোল আরম্ভ করিয়া দিল, তাহাদের অভিভাবকেরা বিনা গোলে তাঁহাদের বংশধরগণকে স্কুল ছাড়াইয়া নিয়া গেলেন, সুতরাং সে সব বালকের আর ভূগোল পড়া ঘটিল না। সর্ব্বসহা ধরিত্রীর সন্তান আমি, সব উপদ্রব সহ্য করিয়া, দুই হাতে অশ্রু মুছিয়াছি, আর এই বসুন্ধরার নগ, নদী, নগর, সহর, হ্রদ, তড়াগ, দ্বীপ, উপদ্বীপ অন্তরীপ প্রভৃতির নাম মুখস্থ করিবার প্রাণপাত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। সেই সময়ে শিখিয়াছিলাম আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ এবং সেই ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা। রেলগাড়ী হইতে

যেখানে রামলাল দাদা আমাকে কোলে করিয়া নামাইল, শুনিলাম সে স্থানের নাম শিয়ালদহ, নামটা আমার শিশু-কর্ণে মিষ্ট লাগিল না। সে কথা কাহাকেও বলি নাই, ভাবিয়াছিলাম, যেখানে কলিকাতার রেল থামে তাহার নাম হয় ত শিয়ালদহই হওয়া উচিত, এবং তাহাই হইয়াছে, আমার কাণে মিষ্ট লাগুক আর নাই লাগুক তাহাতে কিছু আসে যায় না—মাষ্টারের প্রহারও আমার মিষ্ট লাগে নাই, তাই বলিয়া তাহার রদ রহিত ত কেউ করেন নাই, আমার ইচ্ছায় শিয়ালদহ নামই বা বদল হইবে কেন? এখন বুঝিতেছি আমার শিশু-মন শিয়ালদহ নামের সঙ্গে আপোষ করিয়া যে ভাবে তা'কে গ্রহণ করিয়াছিল, এ সংসারের সবই আমাদিগকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে হয়, আমার ভাল-লাগা মন্দ-লাগার জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি তৃণ পর্য্যন্তেরও পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় না।

পূর্ব্ব হইতেই ভবানীপুরে বাসা স্থির ছিল, সেই বাসায় গেলাম, এখনকার যান ঘোড়গাড়ী, সেই আমার জীবনে প্রথম ঘোড়গাড়ী চড়া। এই সব অভিনব বস্তু দেখিবার কি ব্যগ্রতা বালকের মনে উপস্থিত হয়, তাহা নিজ নিজ বাল্য-জীবনের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলে সকলেই বুঝিবেন; কিন্তু আমার কৌতূহল যত বড়ই কেন হউক না, সে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার উপায় ছিল না—আমি যে অন্ধ! অভিনব সকল বস্তুর উপরেই হাত বুলাইয়া তাহার রূপ অনুভবে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। ঘোড়গাড়ীর ভিতরে যখন আমাকে বসাইয়া দিল, আমি আমার চারি পার্শ্বে হাত বুলাইয়া যথাসম্ভব মোটামুটি তাহার রূপটা দেখিয়া লইলাম। ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাইবার দরকার হয় নাই, কারণ পল্লীগ্রামে আমার জন্ম এবং বাস, গরু ঘোড়া ভেড়া বাঁদর অনেক দেখিয়াছি—আজ সহরেও অনেক দেখিতে পাই, তবে সে কথা সাহস করিয়া বলি না।

যে দিন কলিকাতায় পঁহুছিলাম সেই দিনই বন্দোবস্ত করিয়া তার পর দিন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সুপ্রসিদ্ধ চক্ষুরোগের চিকিৎসক Dr Jonesকে আনান হইয়াছিল, তিনি আসিয়া সে দিন কি একটা ঔষধ কয়েক ফোঁটা চক্ষে দিয়া গেলেন, বলিলেন পরদিন চক্ষু পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। ডাক্তার সাহেব অবশ্য ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, আমার ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যের সঙ্গে যদিও ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু প্যারিচরণ সরকারের Second Book of Reading, Beginner's grammar

আর Blockman's G ography'র বলে খাঁটি ইংরাজের অর্দ্ধস্ফুট উচ্চারণে কথা বার্ত্তা বলিবার ইংরাজী ভাষা বুঝিতে পারি এ পরিমাণ জ্ঞান আমার হয় নাই, ডাক্তার সাহেবের সমস্ত কথাবার্ত্তার ভাবার্থ প্রাচীন দেওয়ান যাদব মৈত্র মহাশয়কে রাজধানীর ইংরাজী সেরেস্তার "কেরাণী" রামকানাই তলাপাত্র বাঙ্গালা করিয়া বুঝাইতেন, আমি সেই সময়ে এসব তথ্য সংগ্রহ করিতাম এবং Dr Jones এর সঙ্গে তখন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক বাঙ্গালী লাল মাধব ডাক্তারও আমার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার কাছেও ডাক্তার সাহেবের মতামত সব শুনিতে পাওয়া যাইত। পর দিবস ডাক্তার সাহেব বেলা দুইটার পর আসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আমার চক্ষু নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, পরীক্ষার এই "নানা ভাব" অবশ্য আমি চক্ষু দিয়া ত দেখিতে পাই নাই, তবে আমার চক্ষেরই যখন পরীক্ষা, কখন আমাকে দাঁড় করাইয়াছে, বসাইয়াছে, হাত ধরিয়া বারান্দায় নিয়াছে, আবার অন্ধকার কক্ষে প্রচণ্ড একটা প্রদীপের নিকট বসাইয়া আলোর দিকে আমার চক্ষু দিয়া চক্ষের সম্মুখে কি একটা ধরিয়া তীব্র আলো আমার চক্ষের উপর ফেলিয়াছে, যাহার তীব্রতায় আমার অন্ধ চক্ষু হইতে অবিরল জল পড়িয়াছে। এইরূপ প্রায় দুই ঘণ্টা পরীক্ষার পর ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেল, সে দিনের মত আমি নিষ্কৃতি পাইলাম। পরীক্ষান্তে লালমাধব বাবু মৈত্র দেওয়ানের নিকট সাহেবের মতামত বাঙ্গালায় যখন ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে আমার কক্ষে আমি একাই বসিয়াছিলাম, কারণ রামলাল দাদা এবং বামাদিদিও আমার প্রতি স্নেহবশতঃ লালমাধব বাবুর মুখে আমার ভবিষ্যৎ অদৃষ্টলিপি শুনিতে গিয়াছিল। অন্ধের শ্রবণ ও স্পর্শশক্তি প্রখর হয় ইহা বোধ করি সকলেই জানে, কিন্তু সে বিষয়ে আমার যেরূপ জ্ঞান, আশা করি, আমার পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে কাহারও সেরূপ জ্ঞান নাই এবং প্রার্থনা করি সেরূপ জ্ঞান যেন তাঁহাদের কাহারও না জন্মে। চক্ষু রোগের সূত্রপাত হইতে প্রায় ছয় মাসের অধিককাল হইয়া গিয়াছে, এই সময়ের মধ্যে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় বিলক্ষণ প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। কক্ষান্তরে অস্ফুটস্বরের কথাবার্ত্তা আমার কাণে গেল, আমি শব্দ লক্ষ্য করিয়া হাতড়াইয়া একটু অগ্রসর হইয়া কি কথা তাই শুনিতে গেলাম, এমন কৌতূহল আমার প্রায়শঃ হয় না, কিন্তু সে দিন কি খেয়াল হইল, কি কথা হইতেছে জানিবার একটা প্রবল ইচ্ছা আমায় যেন পাইয়া বসিল। দৃষ্টিশক্তি যত হ্রাস হইতেছে

শ্রবণক্ষমতা তত প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম আমার পীড়ার কথাই হইতেছে, মনঃসংযোগ করিয়া শুনিলাম লালমাধব বাবু বলিতেছেন "বড় বিলম্বে এখানে আনিয়াছেন, এখন সম্পূর্ণ আরোগ্যের ভরসা কেহই দিতে পারে না, ঈশ্বর এ বালকের ভাগ্যে কি লিখিয়াছেন তিনিই জানেন, কিছু দিন পূর্ব্বে আসিলে নিশ্চয়ই এ পীড়া আরোগ্য হইতে পারিত, এ বালক যদি আপনাদের বিবেচনার ক্রটিতে অন্ধ হইয়াই থাকে তবে কি পরিতাপের বিষয় হইবে ভাবিয়া দেখুন।" এই কথা শুনিবার পর দেওয়ানজির মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল জানি না, আমার মনে হয়, সেই দিন প্রথম আমার এই পীড়ার ভাবনা প্রবেশ করিল, কি এক অজ্ঞাত ভয়ে আমার সমস্ত অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষুরোগ হইবার পূর্ব্বে একদিন আমাদের খিড়কির পুকুরে ডুবিয়া যাইবার মত হইয়াছিলাম, তখন ঘাটে আমার সমবয়স্ক একজন বালক ব্যতীত বয়স্কলোক কেহ ছিলনা, আমি কি ব্যাকুলতায় সাহায্যপ্রার্থী হইয়া সেই বালকের দিকে আমার আর্ত্তচক্ষু ও ব্যগ্রবাহু বাড়াইয়া দিয়াছিলাম তাহা আজও আমার মনে আছে। সে দিন লালমাধব বাবুর মুখে চির-অন্ধতার সম্ভাবনার কথা শুনিয়া আমার যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়া আসিল, শুধু বাহ্য জগতের অন্ধকার নহে, অন্তরের অভ্যন্তরেও কি এক হিম-শীতল অন্ধকারের স্তূপ চাপিয়া বসিল, যাহার নিপীড়নে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে আমার ইচ্ছা হইল, দুইবাহু বাড়াইয়া অসহায়ের যিনি সহায়, গতিহীনের যিনি গতি, অশরণের যিনি শরণ, তাঁহারি চরণের কৃপা যাচিয়া এ বালকের মন কেমন করিয়া কি প্রার্থনা জানাইল, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আছে বলিয়া আমি জানিনা। চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্ত, দিগন্তের হরিত শোভা, প্রস্ফুট পুষ্পের অপরূপ সুষমা, নয়নাভিরাম পূর্ণচন্দ্রের অমৃতময় চন্দ্রিকাপ্লাবন, কিছুই আর দেখিতে পাইব না! সংসারের একান্ত স্নেহময়ী জননীর মুখও দেখা আমার ভাগ্যে আর ঘটিবে না! এসকল কথা এমনি করিয়াই তখন মনে আসিয়াছিল ঠিক তাহা নহে, তবে যাহা মনে আসিয়াছিল তাহার সারমর্ম্ম ঐরূপ। উদয়-অরুণিমা চারুপূর্ণিমা প্রস্ফুট প্রসূনের অপূর্ব্ব লাবণ্য অপেক্ষাও শোভা-সৌন্দর্য্যময়,—প্রিয়াৎ প্রিয়তর আর একখানি মুখ দেখিবার সৌভাগ্য ভবিষ্যতে আমার হইবে এবং অন্যকারণে না হইলেও কেবল সেই জন্যই আমার চক্ষু রোগের উপশম হইতেই হইবে সেকথা তখন জানি না। লালমাধব বাবুর

মুখে যে দিন চির-অন্ধতার সম্ভাবনার কথা শুনিয়া মনের মধ্যে বিষম বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল, তার বহুবৎসর পরে এক দিনের এক শুভসন্ধ্যায় উজ্জ্বল সান্ধ্যনক্ষত্রের মত, শুক্লা একাদশীর নয়নাভিরাম শশিকলার মত আমার পরম প্রিয়দর্শনকে দেখিয়াছিলাম, সেই দিনের সে অমৃতপ্রলেপ যথার্থ আমার দেহমনের অন্ধতা দূর করিয়াছিল, সেই দিন সত্য সত্যই আমার চক্ষুরোগের উপশম হইল, ধরাসুন্দরীর মধুময় রূপ সে দিন আমার চক্ষে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল; আমার সৌভাগ্য যে শৈশবে চক্ষুরোগ হইয়া শৈশবেই তাহার উপশম হইয়াছিল, তাহা না হইলে যৌবনের প্রথম সমাগম সময়ে এক শুভসন্ধ্যার মাহেন্দ্রলগ্নে, নয়নাভিরাম, পরমপ্রিয়, আমার অদৃষ্ট বিধাতার, আমার-জীবন দেবতার দর্শন লাভ করিয়া জীবন আমার কেমন করিয়া ধন্য হইত? যার দর্শন লাভে জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে তাহাকে না দেখিয়া আমার অন্ধনয়ন ও অন্ধকার জীবন লইয়া কি প্রয়োজনে বাঁচিয়া থাকিতাম?

চক্ষু-পরীক্ষার পরদিবস হইতেই ডাক্তারী চিকিৎসার আরম্ভ হইল—সে কি ভীষণ যন্ত্রণা! চক্ষুর কোঠায় জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ, রগে এবং কপালে ফোস্কা তোলা, রগ ফুঁড়িয়া সূতা বান্ধিয়া সপ্তাহ কাল ঐ সূতা ধরিয়া টানাটানি, নানাপ্রকার জ্বালাযন্ত্রণার ঔষধ চক্ষুর মধ্যে দেওয়া, এই প্রকার নানা রূপ আসুরিক চিকিৎসা চলিতে লাগিল। প্রথম কিছু দিন কোন উপশম নাই অথচ চিকিৎসাও মৃদুতর হয় না, সুতরাং অন্ধ বালকের নিকট ভিষক্ এক বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে দিন রাত কাটে—আর সকলের দিন রাত, কিন্তু আমার পক্ষে কেবলি রাত্রি—'অন্ধ জাগ কিবা রাত্রি কিবা দিন,' আমার সেই অবস্থা। আন্দাজ প্রায় একমাস পরে একটু যেন আবছায়া গোছ দেখিতে পাই, সাদা কাপড় পরা মানুষ দাঁড়াইলে বোধ হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে একটা কিছু আছে, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে একটু আলো যেমন দেখা যায় এমনি বোধ হইতে লাগিল, রাত্রে ছোট্ট কেরোসিনের আলো প্রকাণ্ড একটা আকারহীন অগ্নিকাণ্ডের মত যেন বোধ হয়। তখন আমার মনে আশা হইল এই পুরাতন পৃথিবীকে আবার চক্ষে দেখিয়া তাহার সহিত সুখদুঃখের সম্বন্ধ পাতাইবার দিন বুঝি আসিবে; তখন আর কাটা, ফোঁড়া, বেঁধা, জোঁক, বেলেস্তারা কিছুতেই ভয় নাই, একবারে এক স্থানে তিনবার বেলেস্তারা দিলে উপকার যদি শীঘ্র শীঘ্র হয়, তবে তাহাই করুক আমার মনে এমনি একটা ত্বরা

উপস্থিত হইল। নিয়মিত চিকিৎসা চলিতে লাগিল, ক্রমে একটু একটু অধিক উপকার যেন বোধ হয় এইরূপে একবৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হইল। ঔষধের গুণে চক্ষুর উপরের সাদা পর্‌দা (ছানি) কাটিয়া গেল, কিন্তু পরিষ্কার দৃষ্টিশক্তি তখনও আসিল না, সোজা পথে মানুষ যখন ঈপ্সিত ফল পায় না তখন তাহার মন নানা অপূর্ব্ব পথের আবিষ্কারে নিযুক্ত হয়; কবিরাজী ডাক্তারী দুই মতেই যখন পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে না দেখা গেল তখন আমার সঙ্গী অভিভাবকগণ অবধূত, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির দত্ত ঔষধের অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন, ঝাড়াফুঁকাও চলিতে লাগিল। স্কুল কলেজের নব্য বিদ্যার মত্ততা আসিয়া তখনও আমার মনকে অধিকার করে নাই, দৈবশক্তিতে বিশ্বাস তখনও হারাই নাই, সুতরাং মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িয়া যখন বলে "বল, নাই" তখন প্রাণপণ বিশ্বাসে, তেমনি জোরেই বলিতাম "নাই"। কখনও কখনও বিশ্বাসের বলে মনে হইত সত্য সত্যই বুঝি পীড়ার অনেক উপশম হইয়াছে, বুঝি সত্যই ঝাড়া দিবার পূর্ব্বে এবং পরে দৃষ্টিশক্তির অনেক তারতম্য দেখা যাইতেছে। ডাক্তারী ঔষধ চলে এবং তার সঙ্গে সন্ধ্যা সকালে ঝাড়া-ফুঁকা মন্ত্রতন্ত্র জল পড়াও চলিতেছে, এইরূপে কিছু দিন গেল। তার পর কালীঘাটের এক সন্ন্যাসীর প্রদত্ত ঔষধ আবিষ্কার হইল, তাহা চক্ষে দিতে হয়। চক্ষুতে অজ্ঞাত ঔষধ দেওয়া উচিত কি না এই লইয়া মৈত্র দেওয়ান ও ইংরাজীনবিশ রামকানাইয়ে খুব তর্কবিতর্ক কিছু দিন চলিল, তারপর স্থির হইল রামকানাইকে গোপন করিয়া সন্ন্যাসীর ঔষধই দেওয়া হইবে। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ঔষধ আমার চক্ষুতে দিবার একান্ত ইচ্ছা মৈত্র দেওয়ানের মনে কেন হইয়াছিল সে কথা তাঁর মুখে এ ঘটনার বহুদিন পরে শুনিয়াছিলাম। রাজধানীর জ্যোতির্ব্বিদ্ জগবন্ধু আচার্য্য আমার "ঠিকুজি" দেখিয়া দিন ফল কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে যে বয়সে আমার চক্ষুরোগ হইয়াছিল, সেই বয়সেই গ্রহের ফলে চক্ষুরোগ আমার হইবে সে কথা কোষ্ঠীতে লেখা ছিল, সুতরাং আমার কোষ্ঠী যে ভ্রমশূন্য একথা দেওয়ান মহাশয় নিঃসন্দেহে জানিয়াছিলেন। কোষ্ঠীর শেষাংশে লিখিত আছে অভীষ্টলাভে বিফলমনোরথ হইয়া দুঃসহ মনঃপীড়ার ফলে আমি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব এবং সেই অবস্থাতে বান্ধবহীন বিদেশের পান্থ-নিবাসে আমার চক্ষুর শেষ নিমেষপাত হইয়া যাইবে। কোষ্ঠী নির্ভুল, (কারণ একটি ফল মিলিয়াছে) আমাকে সন্ন্যাস যখন গ্রহণ করিতেই হইবে তখন সন্ন্যাসীর ঔষধে আমার উপকার হইবার কথা, ভূত এবং ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসীর মধ্যে কোন প্রকার

যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নহে ইহাই স্নেহশীল বৃদ্ধ সাধু দেওয়ানের মন স্থির করিবার অকাট্য হেতু। অভীষ্টলাভ আমার ভাগ্যে আছে কি না জানিনা, সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে কি না, তাহাও এখন বলিতে পারি না, তবে একান্ত বিশ্বাসপরায়ণ স্নেহশীল সাধু বৃদ্ধ দেওয়ান যে ইচ্ছায় সন্ন্যাসীর ঔষধ আমার চক্ষে দিয়াছিলেন, তাঁহার সে মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর ঔষধ পদ্ম-মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পায়রার পালক দিয়া আমার চক্ষে প্রয়োগ করা হইল, সপ্তাহকাল অতীত হইবার পূর্ব্বেই আমার দৃষ্টিশক্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তারপর যে দিন অপরের সাহায্যব্যতীত কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে পারি, মানুষ চিনিতে পারি, খাদ্যবস্তু দেখিয়া নিজেই আহার করিতে পারি, সে দিনে আমার কি আনন্দ! সে দিন বিশ্বের সবই আমার বন্ধু, চিরপরিচিত চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা, বৃক্ষ-লতা, ফুল-পল্লব, দিন-যামিনী, এ ধরণীর নিতান্ত অগ্রাহ্য ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমার চক্ষে মধুময় হইয়া উঠিল। তখন দিনে কত-বার করিয়া যে অকারণে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতাম, রাত্রে নক্ষত্র দেখিবার জন্য কতবার যে বারান্দায় বাহির হইয়া কত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিতাম এবং তারার আলো আমার অন্তরে যে কি আনন্দের আলোক বিকীরণ করিত, তাহা কি ভাষায় বলিয়া বুঝাইতে পারি? আমার পাঠকপাঠিকার মধ্যে যদি কেহ প্রায় দুই বৎসর কাল একেবারে অন্ধ হইয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তুচ্ছতম ব্যাপারের জন্যও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন, যাহা না দেখিলে প্রাণ বাঁচে না, অথচ দেখিবার কোন উপায়ই নাই, এমন দুর্দ্দশায় পড়িয়া থাকেন, তবে তিনিই আমার চক্ষুদানের দিনের অনাময় নিরাবিল পরম আনন্দ ও গভীর সুখের ধারণা করিতে পারিবেন, সে কথা বলিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। সে দিনের সে আনন্দস্মৃতি আজও আমার মনে স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তেমন আনন্দ জীবনে আর একটিবার মাত্র পাইয়াছিলাম, সে দিনও তেমনই ভাবেই সারাবিশ্ব আমার বন্ধু মনে হইয়াছিল, সে নববসন্তের প্রথম সমাগম দিন লক্ষ বসন্তের শোভাসৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল; নন্দনের সুধা কি তা'ত জানিনা, কিন্তু সে দিন মনে হইয়াছিল, যে আনন্দ-সুধায় আমার আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার নিকট মন্থিত সাগরের সুধাভাণ্ড তুচ্ছাদপিতুচ্ছ; সে সুধাভাণ্ডের অধিকার লইয়া সর্প বিহঙ্গ দেব দানব যার ইচ্ছা বিবাদ করুক আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই, আমার সুধাপাত্রখানি আমারি অধরোষ্ঠের কাছে অক্ষয় হইয়া থাকুক, আমি আমার এই অন্তরের আনন্দ উৎসব এবং পুলকাঞ্চিত দেহ লইয়া বাঞ্ছিত লাভের গৌরবের মধ্যে চিরনির্ব্বাণ লাভ করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

কিশোরী

আজিকে বাহুপাশে রহিয়া শ্যামরায় মনে যে পড়ে বহু কথা ;
কেমনে লুকাতাম গোপন স্বপনের, কিশোরী-হৃদয়ের ব্যথা,
সেটা কি আজ বঁধু, করিল বাঁশীতান
কানের পথ দিয়ে মরমে আনচান ?
তখনি করেছিনু এ নারী-হৃদি দান সে কথা বুঝনি কি, প্রভু !
সে কথা বুঝাইতে এতেক আয়োজন ব্যর্থ হয় না ত কভু।

প্রভাত প্রায় শেষ নিশার হিমময় হৃদিটি কমলের কলি,
মরমে জাগিয়াছে গন্ধমধুরস, আসিতে বাকী শুধু অলি,
যমুনা উছলিলে হৃদয় উছলিত,
কদমসহ দেহ তখনি কাঁটা দিত,
আঁখি সে তখনি-ই গোপনে সুধা পিত, চাপিয়া রহিতাম জাগি'
তোমাকে লুকাবার ছিল না সাধ প্রভু, তোমাকে জানাবার লাগি'।

বুঝনি কি গো সখা, যমুনাজল হ'তে ফিরিতে কেন হ'ত দেরী ?
কেন না আসিতাম গোধন গোঠ হতে গৃহেতে ফিরিতে না হেরি।
যমুনা তীরে যদি করিতে তুমি কেলি,
কলসে সাধ করে' দিতাম কেন ঠেলি ?
সে শুধু তুমি দেখি সকল খেলা ফেলি' সাঁতারি' দিবে তুলি' বলে
কেন বা যেতে যেতে থমকি' দাঁড়াতাম সখীরে ডাকিবার ছলে।

গাছের শাখা হ'তে ফুলটি ছিঁড়িবার শক্তি ছিলনাক যেন
গোকুলে কেহ কি গো ছিল না ডাকিবার, তোমারে ডাকিতাম কেন ?
তোমার পাশ দিয়ে যাইতে কেন মোর
বেতসডালে শুধু বাধিত বাসডোর
বিঘিত পথে যেতে, চাহিলে তুমি চোর, কুশের কাঁটা কেন পায় ?
অভয়বাণী তব শুনাতে মোরে যেন ধেনুটি তাড়া দিত হায়।



বাঁশীটি শুনি তবে দিতাম দ্বারে সাঁজ তোমারি ধ্যান হতে জাগি',
যে পথে তুমি, তথা যেতাম শতবার নয়নে পড়িবার লাগি'
তোমারে হেরিতাম এমন ঠাঁয়ে স্বামী,
কেহ না দেখে মোরে দেখিতে পাই আমি,
আপনা সামলাই যদিও দিবাযামী, সমুখে তব আলু থালু,
তটিনী যত চাহে ঢাকিতে বাহিরিত ততই সৈকত বালু!

মুখ সে মূক হয় বুকেরি মত হায়, এমনি কিশোরীর প্রেম
আশা সে ভাষাহারা নীরব ধ্যানপারা গোপনে জপ করে ক্ষেম।
দীর্ঘশ্বাস তা'ও শুনিতে পায় পাছে
ফেলিতে, হেরিতাম কেহ কি কাছে আছে?
চাপিয়া রাখিবারে হৃদয় কাঁপিয়াছে, ফুঁপিয়া গুমরেছে প্রাণ;
জীবন এইরূপে গোঁয়ান কি কঠিন তুমিই কর অনুমান।

এ সব কথা কি গো বুঝনি তুমি শ্যাম নিঠুর এত কি গো হবে?
এত যে আয়োজন ছলের আবরণে লাজের আভরণে রবে?
জাগিত হৃদিকথা গণ্ড শোণিমায়
আঁখির ভাষা হতে বেশী কি বলা যায়?
ছিল না সংশয় কিশোরী অবলায়, কেহ তা' দেখিত না চাহি'
যদি না বুঝে থাক তুমি গো তাহা তবে রাখিতে দুখ ঠাঁই নাহি।

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রাচীন যৌধেয় জাতি। *

পুরাণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে কত অসংখ্য জাতি, জনপদ ও নৃপতিবর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেই অতীত যুগের ইতিহাস আমাদের নিকট অন্ধকার সমাচ্ছন্ন; সুতরাং এই সমুদয় আমাদের নিকট একটী নীরস নামের তালিকা মাত্র বলিয়াই প্রতীত হয়। যদি দৈবাৎ ইহাদের কাহারও বিশিষ্ট ইতিহাস অন্য উপায়ে জানা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই, কত গৌরবময় স্মৃতি, কত অভিনব তত্ত্ব, কত অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী এই সকল নামের পশ্চাতে লুক্কায়িত রহিয়াছে—সভ্যতার কত বিভিন্ন দিক-বিশেষ

* উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশনে পঠিত।

ইহাদের দ্বারা পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। এইরূপ একটি জাতির কাহিনী আজ আমাদের আলোচনার বিষয়। এই জাতি ইতিহাসে যৌধেয় নামে পরিচিত।

যৌধেয় জাতির পুরাবৃত্ত দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। পুরাণকারগণের মতে যযাতির পুত্র অণু হইতে যৌধেয় জাতির উৎপত্তি; কিন্তু পুরাণোক্ত যৌধেয় কাহিনীর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আজকাল বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে যাঁহারা ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের মতে পুরাণ প্রভৃতির কোন ঐতিহাসিক মূল্যই নাই। বিগত কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনীতে প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে যে তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত প্রত্নবিদের মুখে শুনিয়াছিলাম—ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা কোন উক্তি সমর্থন করিতে যাওয়া বৃথা; কারণ ইহাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্যই নাই। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর, সুতরাং এতৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াই আমি যৌধেয়গণের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বর্ত্তমানকালে আমাদের অনেক জ্ঞান বিজ্ঞানই ইউরোপীয়গণের নিকট হইতে লব্ধ, প্রত্নতত্ত্ববিদ্যাও তাহার অন্যতম। আর ইউরোপেও এ বিদ্যা খুব আধুনিক। বিগত শতাব্দীতে ইজিপ্ট, অ্যাসিরীয়া ব্যাবিলন প্রভৃতির পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের চেষ্টাতেই এই বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই সমুদয় দেশে প্রাচীন ইতিহাসের গঠনের উপকরণের মধ্যে ছিল কেবল শিলালিপি ও প্রাচীন ভাস্কর্য্য-নিদর্শন প্রভৃতি। এই সমুদয় উপকরণ কাজে লাগাইয়া যাহাতে অতীত ইতিহাস গঠন করা যায়, তাহার চেষ্টায় ইউরোপের ধীশক্তি নিয়োজিত হইল—তাহার ফলে জগতে Archeology বা প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যার সৃষ্টি। ইহারই অনুকরণে ভারতবর্ষে প্রত্নবিদ্যার সাহায্যে অতীত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা আরব্ধ হয় এবং এখন পর্য্যন্ত সেই চেষ্টা অবিরাম গতিতে চলিয়াছে।

দেশকাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহা অনেক দোষের আকর হয়। প্রত্নবিদ্যার এই যে অনুচিকীর্ষা আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে—তাহা একদিকে যেমন অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে, অপর দিকে তেমন কতকগুলি দোষেরও সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপ যে উপায়ে প্রত্নবিদ্যার সাহায্যে মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতির অতীত ইতিহাস গঠন করিতে সফলকাম হইয়াছে, আমরাও যখন সেই উপায়গুলি অবলম্বনে আমাদের অতীত ইতিহাস গঠনে প্রবৃত্ত হইলাম—তখন এ কথা মনে রাখিলাম না যে, মিশরের

ইতিহাসের যে শ্রেণীর উপকরণ বিদ্যমান ছিল, ইউরোপীয় প্রত্নবিদ্যা কেবলমাত্র তাহারই প্রতি প্রযোজ্য—কেবলমাত্র সেই শ্রেণীর উপকরণই উক্ত প্রত্নবিদ্যার সাহায্যে অতীত ইতিহাস গঠিত করিতে সমর্থ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে সমুদয় উপকরণ বিদ্যমান, তাহার কতকাংশ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বটে এবং তাহাদের প্রতি ইউরোপীয় প্রত্নবিদ্যা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস গঠনের আর এক শ্রেণীর উপকরণ আছে, তাহা উপরোক্ত শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন—সুতরাং তাহার প্রতি ইউরোপীয় প্রত্নবিদ্যার মূলসূত্রগুলি প্রযোজ্য নহে। এই উপকরণ আমাদের বিরাট সাহিত্য-সম্ভার, বেদ পুরাণ মহাভারত প্রভৃতি। মিশরে ব্যাবিলোনীয়ায় এই শ্রেণীর উপকরণ তাদৃশ বলবৎ নহে—সুতরাং সেখানে প্রত্নবিদ্যার সাহায্যে শিলালিপি প্রভৃতির দ্বারাই ইতিহাস সংগঠন করিতে হইয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে এই সমুদয় উপকরণের অভাব নাই—কাজেই এই উপকরণ কাজে লাগাইতে না পারিলে ইতিহাস গঠনের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইবে না। কিন্তু উপকরণ থাকিলেই কাজে লাগান যায় না, তাহার ব্যবহারের নিয়ম জানা চাই। এই নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা আমরা কখন করি নাই, পরন্তু ইউরোপীয়গণ যে নিয়মে শিলালিপি প্রভৃতি উপকরণ কাজে লাগাইয়া ইতিহাস গঠন করিয়াছেন, আমরাও এই সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর উপকরণ সম্বন্ধে ঠিক সেই নিয়মই অবলম্বন করিয়াছি। ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিতে হইলে মৃত্তিকার ছোট ছোট চৌকা খণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহা আগুনে পোড়াইয়া লইতে হয়; কিন্তু বিশাল শালকাষ্ঠ প্রভৃতির সাহায্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে যিনি প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি যদি উপকরণের প্রভেদ ভুলিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রণালীরই অনুসরণ করেন, অর্থাৎ কাষ্ঠকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহা আগুনে পোড়াইয়া লন—তবে গৃহ নির্ম্মাণ ত হয়ই না—পরন্তু: ভগ্নাবশিষ্ট কাষ্ঠের অবস্থা দেখিয়া ইহা যে প্রণালীভেদে গৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী উপকরণ হইতে পারে এ প্রস্তাবও সদম্ভ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। আমাদের অবস্থাও ঠিক তাহাই হইয়াছে। যে মূল সূত্রগুলি অবলম্বনে থুটমোসিসের শিলালিপির ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে আমরা পুরাণ মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে বসিয়াছি। যে নিয়মে ব্যক্তিবিশেষের একখণ্ড দলিলের মূল্য যাচাই হইয়াছে—ঠিক সেই নিয়মেই একটি বিরাট্ জাতির, জাতীয় সত্য ও সভ্যতার আধারভূত মহাভারত প্রভৃতির মূল্য যাচাই হইতেছে; এবং এই শালকাষ্ঠ চৌকা করিয়া আগুনে পোড়াইয়া যখন পাইতেছি ভস্ম,

তখন উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিয়া বলিতেছি, এসব ত ভস্ম ভস্ম! ইহার আবার ঐতিহাসিক মূল্য কি? মজুরের মূল্য কত তাহার পরিমাপ তাহার দৈহিক শক্তি, খাটিবার সামর্থ্য দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। পণ্ডিতের মূল্যেরও যদি ঐ পরিমাপ হয় তবে তাহা একটু আতঙ্কের কথা—অথচ উভয়েই মানুষ। মহাভারত ও অশোকলিপি উভয়ই writt n document বা লিখিত বিবরণ হইলেও ইহাদের মূল্য নিরূপণে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

আমার বক্তব্য কতদূর আপনাদের বোধগম্য করিতে পারিয়াছি জানি না; কিন্তু পুরাণ মহাভারতের কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা এবিষয়ে আমার মত ব্যক্ত করা এখন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত উদাহরণ অনুসারে বলিতে পারি কাষ্ঠ যেমন গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ—কিন্তু তাহার ব্যবহারের প্রণালী ভিন্নরূপ, মহাভারত প্রভৃতিরও তেমনই যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস; তবে এক্ষেত্রে মূল্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এ প্রণালী একদিনে আবিষ্কৃত হইবার নয়; কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত, ধীশক্তিমান তাঁহারা শ্রদ্ধাভরে এই সমুদয় গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে কালে এই প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। প্রত্নবিদ্যা আমাদের দেশে অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে এবং ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রাচীন লিপিমুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে আরও উপকার করিবে এবং কালে এই বিদ্যা ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত মন্দিরের সুদৃঢ় স্তম্ভ নির্ম্মিত করিতে পারিবে; কিন্তু স্তম্ভ মন্দিরের একাংশ মাত্র। এই স্তম্ভের উপর ভর করিয়া যে ছাদ গঠিত হইলে মন্দিরের সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে তাহারও যোগাড় আবশ্যক। মিশরের পুরাবৃত্ত মন্দির এখনও মাল মসলার অভাবে ছাদহীন রহিয়াছে।—কিন্তু ভারতবর্ষে এই মাল মসলার অভাব নাই; তবে তাহার ব্যবহারের প্রণালী উদ্ভাবন করা চাই। ইহাও আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

কথায় কথায় অনেকদূর আসিয়া পড়িলাম। এইবারে মূল বিষয়ের ঐতিহাসিক কাহিনীর আলোচনা করা যাউক। এই আলোচনার উপাদান যৌধেয়গণের প্রচলিত মুদ্রা ও তিনখানি শিলালিপি—যথা রুদ্রদামনের গির্ণার শিলালিপি, * সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি, † ও যৌধেয়গণের বিজয়গড় শিলালিপি। ‡ এই সমুদয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যৌধেয়গণের সম্বন্ধে

* E. I.—VIII.

† CII—III.

‡ Do,

প্রথম ও প্রধান কথা এই যে ইহারা প্রজাতন্ত্রমূলক শাসনের অধীনে বাস করিত। অর্থাৎ ইহারা একটি Republic গঠন করিয়াছিল। ইহাতে বিস্ময়েব বিষয় কিছুই নাই; কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র শাসিত দেশ ছিল। যৌধেয়গণও যে এইরূপ তন্ত্রের অধীনে ছিল তাহাদের প্রচলিত মুদ্রাই সে বিষয়ে প্রধান প্রমাণ—সাধারণতঃ রাজার নামেই মুদ্রা প্রচলিত হয়, কিন্তু যে জাতির রাজা নাই সে জাতির মুদ্রায় জাতির নামই দেখিতে পাওয়া যায়। যৌধেয় জাতির মুদ্রায় দেখিতে পাই কেবলমাত্র "যৌধেয়ণ" বা "যৌধেয়-গণস্য জয়" অথবা কুল দেবতার নাম "ভগবত স্বামিন ব্রহ্মণ্যদেব যৌধেয়"। এই একটি প্রমাণের উপরই আমাদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করা যাইতে পারে; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আরও প্রমাণ আছে। লুধিয়ানার নিকটে কতকগুলি মৃন্ময় মুদ্রার সিলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহাতে লিখিত আছে, "যৌধেয়াণাং জয়মন্ত্রধরাণাং"—এখানেও যৌধেয় জাতিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে, কোন রাজার উল্লেখমাত্র নাই। রিস্ ডেভিড্স বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে প্রজাতন্ত্রশাসিত রাজ্যের কতক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন—তিনি বলেন যে, এই সমুদয় দেশে একজন "রাজা" নির্ব্বাচিত হইতেন, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার হস্তেই প্রধান কর্ত্তৃত্বতার ভার থাকিত—সম্থাগারে মিলিত হইয়া জাতীয় প্রতিনিধিগণ রাজ কার্য্য বিচার করিতেন। তিনি তাঁহাদের সভাপতি স্বরূপ থাকিতেন এবং তাঁহাদের অনুমোদিত প্রণালীতে দেশ শাসন করিতেন। সুতরাং নামে রাজা হইলেও ইহারা প্রকৃত পক্ষে গ্রীসদেশের আর্কন, রোমের কন্‌সাল বা বর্ত্তমান Republic সমূহের প্রেসিডেণ্টের সমকক্ষ ছিলেন। নির্দ্দিষ্টকালের অবসানে তাঁহার পদে অন্য রাজা নির্ব্বাচিত হইত। রিস্ ডেভিডস্ বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে এই যে বিবরণ সঙ্কলিত করিয়াছেন, ইহা যে যৌধেয়গণের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য তাহার আভাস আমরা বিজয়গড় শিলালিপিতে প্রাপ্ত হই। দুঃখের বিষয় এই শিলালিপিখানি ভগ্ন, প্রথম পঙক্তির যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা এই যৌধেয়গণ "পুরস্কৃতস্য মহারাজ মহা সেনাপতে" অর্থাৎ যে মহারাজ মহা সেনাপতিকে যৌধেয়গণ দলপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছে (who has been made the leader of the Yaudheya tribe) তাহাদের ইত্যাদি এই লিপি হইতে দেখা যায় সে মহারাজ মহা সেনাপতি প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারিগণ যৌধেয়গণ দ্বারাই নির্ব্বাচিত হইতেন। বর্ত্তমান Republic বলিতে আমরা যাহা বুঝি, যৌধেয় রাজ্যও যে তাহারই অনুরূপ ছিল, অতঃপর বোধ হয় সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

যৌধেয়গণের মুদ্রা ও শিলা-লিপিতে দেশ ও রাজাকে অতিক্রম করিয়া এই যে জাতির মহিমা ও প্রাধান্য কীর্ত্তন, ইহা আমাদের অতীত ইতিহাসের একটি অভিনব ব্যাপার। এইরূপ একটি জাতীয় ভাবের উদ্বোধন প্রাচীন ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল, এ তথ্যটি আমাদের নিকট একটি অমূল্য সম্পত্তি। মালব ও অর্জ্জুনায়ন জাতির মুদ্রায় দেখিতে পাই মালবাহ্ন (মালবানাং) জয়, অর্জ্জুনায়নাং জয়ঃ। যে ভাবের প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী ও বেলজিয়ামের রাজাকে King of the French ও King of the Belgians এই পরিবর্ত্তিত উপাধি ধারণ করিতে হইয়াছিল—'যৌধেয়গণস্য জয়ঃ' প্রভৃতির মূলেও তাহার অনুরূপ ভাব বর্ত্তমান কি না, সুধীগণই তাহার বিচার করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতবর্ষে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র-শাসিত দেশ ছিল; কিন্তু যৌধেয়গণ প্রজাতন্ত্র-শাসিত হইলেও তাহাদের দেশ নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। বর্ত্তমানে যে সমস্ত স্থানে যৌধেয়গণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে প্রাচীন যৌধেয় রাজ্যের পরিমাণ মোটামুটি ঠিক করা যায়। অবশ্য এরূপ অনুমান ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য নহে। কারণ ব্যবসায় উপলক্ষে বা অন্য কোনও কারণে মুদ্রাসমূহই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়, সুতরাং মুদ্রাপ্রাপ্তি স্থান মাত্রই যৌধেয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে। কিন্তু তথাপি যে যে স্থানে বহুল পরিমাণে যৌধেয় মুদ্রা পাওয়া যায়—সেই সেই স্থান যৌধেয়-শাসিত দেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং যদি ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকে এবং সমর্থক প্রমাণাবলী পাওয়া যায়, তবে যৌধেয় রাজ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কানিংহাম, কাপ্তেন কটলী প্রভৃতি মূলতান, ভাওয়ালপুর, কাংড়া প্রদেশ, দেপলপুর, সাতগড়া, অযুধান, ভাটনের, আভোর, সিবলা, কাঠোর, পাণিপথ, শোণপথ প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন যৌধেয়গণের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমুদয় হইতে প্রাচীন যৌধেয় রাজ্যের সীমা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে—পশ্চিমে ঘরা এবং বিপাশা নদী, পূর্ব্বে যমুনা নদী। কাংড়া হইতে সাহারাণপুর, এবং ভাওয়ালপুর হইতে ভরতপুর দুইটি কাল্পনিক রেখা টানিলে তাহাই যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ সীমা। এই বিস্তৃত ভূভাগের পরিমাণ-ফল ৬০ হাজার বর্গমাইলেরও অধিক—অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীসের তিন গুণ, বর্ত্তমান বেলজিয়ামের ছয় গুণ, এবং ইংলণ্ড ওয়েলস্ অপেক্ষাও বৃহত্তর। এই বিস্তৃত ভূভাগে যৌধেয়গণ কতকাল রাজ্য করিয়াছিল, তাহা সঠিক

জানিবার উপায় নাই। পাণিনির ব্যাকরণে যৌধেয় জাতির উল্লেখ আছে তবে পাণিনির ব্যাকরণ কবে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ একমত নহেন। এ বিষয়ে গোল্ড ষ্টুকার ও ভাণ্ডারকর যে যুক্তি-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই আমার নিকট সমীচীন বোধ হয়। তাঁহাদের মতে পাণিনি ব্যাকরণ খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী বা তাহার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং অন্ততঃ খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেই যে যৌধেয়গণ একটি বিশিষ্ট জাতীয়-জীবন লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পরবর্ত্তী কালে গ্রীস ও রোম জাতির উৎপত্তি বিষয়ে যে কাল্পনিক ইতিহাস সংগঠন করিয়াছিল, তাহাতেও তাহাদের জাতীয় জীবনের আরম্ভ খৃষ্ট পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে অর্থাৎ ঐতিহাসিক যৌধেয় জাতির অনধিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে মাত্র হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। অপর দিকে সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভে এবং বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় যৌধেয় জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরেও তাহারা বর্ত্তমান ছিল। এই সুদীর্ঘ তের শত বৎসর কালই যে তাহারা সমানভাবে বিক্রমশালী ছিল বা পূর্ব্বোল্লিখিত বিস্তৃত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিল তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই। প্রায় এক শত বৎসরকাল তাহারা কুশাণগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। রুদ্রদামন একবার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত তাহাদিগকে স্বীয় শাসনাধীনে আনিতে সমর্থ হন নাই, তবে তাঁহার সভা-কবির মতে "যৌধেয়গণ, সর্ব্বকরদান আজ্ঞাকরণ ও প্রণামাগমন প্রভৃতি দ্বারা গুপ্ত রাজ্যের পরিতোষ সম্পাদন করিত। আর ইহাও বড় বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন সব জাতিরই ঘটে, যৌধেয়গণেরও ঘটিয়াছিল; কিন্তু তথাপি সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল যে এই যৌধেয় জাতি বীরবিক্রমে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

যৌধেয় জাতির বীর বিক্রমের সুবিস্তৃত পরিচয় জানিবার উপায় নাই। তবে কয়েকটি ঘটনা দ্বারা তাহার একটি মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে। প্রচণ্ড বিক্রম দিগ্বিজয়ী নরপতি সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাদিগের রাজ্য আত্মসাৎ না করিয়া কেবলমাত্র কর গ্রহণেই নিরস্ত ছিলেন—ইহাতে প্রতীতি হয় যে, যৌধেয়গণ নিতান্ত ক্ষীণবল ছিল না। কার ইঁকেন নামক সাহেব লুধিয়ানার

নিকটে সোণাইত গ্রামে কতকগুলি দগ্ধ-মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মুদ্রা প্রাপ্ত হন। ইহাদের একটির উপরে খোদিত আছে "যোধেয়ানাম জয়মন্ত্রধরাণাম"—শক্র জয় করিবার মন্ত্রধারী অর্থাৎ অবহেলায় শক্র জয় সাধনকারী যৌধেয়গণ—এই উপাধির পশ্চাতে কতটা বীরত্বের গর্ব্ব লুক্কায়িত আছে, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। কিন্তু যৌধেয়গণের নিজকৃত বলিয়া এই গর্ব্বোক্তি সর্ব্বথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত না হইলেও হইতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় তাহাদের পরম শক্র রুদ্রদামন স্বয়ংই ইহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গির্ণার লিপিতে লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষের সমুদয় ক্ষত্রিয় জাতির পরাজয়সাধনপূর্ব্বক স্বীয় বীরত্ব-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যৌধেয়গণ গর্ব্বিত হইয়াছিল। এই গির্ণার লিপিতেই যৌধেয়গণের প্রবল পরাক্রমের অন্যবিধ প্রমাণ আছে। রুদ্রদামনের সভা-কবি লিখিত অনুশাসনেই প্রকাশ যে যিনি অবহেলে অনুপ আনর্ত্ত, সুরাষ্ট্র সিন্ধু গৌবীর প্রভৃতি অধিকার করিয়া 'স্বয়মধিগত মহাক্ষত্রপ' অর্থাৎ মাত্র নিজের বাহুবলে মহাক্ষত্রপ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই রুদ্রদামনও সহজে যৌধেয়দিগকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

যৌধেয়গণের মুদ্রা ও শিলা-লিপি সম্বন্ধে কতকগুলি কূট প্রশ্ন আছে। কিন্তু বহুক্ষণ আপনাদের সময় ও ধৈর্য্য নষ্ট করিয়াছি—এইগুলি উত্থাপন করিয়া আর অপরাধের মাত্রা বাড়াইতে চাই না। তবে যৌধেয়গণের সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্নের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি। তাহার উল্লেখ করিয়াই আমি এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। কাহারও কাহারও মতে বর্ত্তমান কালের জোহিয়া রাজপুতই যৌধেয় জাতির বংশধর। ইহা অসম্ভব নহে—তবে নিশ্চিতভাবে এখনও বলা যায় না; কিন্তু আজকাল প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, রাজপুত জাতি আদৌ ভারতবর্ষীয় নহে—সুতরাং রাজপুত জাতির গৌরবে ভারতবর্ষের গৌরব করিবার অধিকার নাই। রাজপুত জাতি কোথা হইতে আসিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় নাই; কেহ বলেন মিডিয়া, কেহ বলেন পারস্য, কেহ বলেন মধ্য এশিয়া—কাহারও বা মতে শক, হূণ, পহ্লব, তাতার, যবন প্রভৃতি যত বিদেশী আক্রমণকারী ভারতে আসিয়াছে, সকলের সংমিশ্রণে রাজপুত জাতির উৎপত্তি। যৌধেয়গণ অবশ্য খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিল; শক যবন প্রভৃতি তাহার বহুপরে ভারত আক্রমণ করে—কিন্তু যাঁহারা ভারত-গৌরব শাক্যসিংহকে

শক জাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তাঁহারা এই সব তর্কে দমিবার নহেন—তাঁহারা বলেন খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে শক যবন প্রভৃতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, ইহা আমরা জানি ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যে তাহারা আসে নাই তাহার প্রমাণ কি ? টড্ সাহেব বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত বীর ও নিরীহ মেষতুল্য অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায় এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তাই তিনি প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, রাজপুত ভিন্নজাতীয় এবং টড্ সাহেব সেই যে সুর তুলিলেন তাহার ফলে নানা পণ্ডিতমণ্ডলী বিচার প্রমাণ সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, রাজপুত জাতি হিন্দু নহে—হিন্দু হইতে পারে না এবং পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করিতেছেন যে, তাহাদিগের বীরত্ব-গাথা লইয়া আমরা যে গর্ব্ব করি, তাহা ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিবার সাধ্য আমার নাই। আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, একটি জাতির আদিম বাসস্থান কোথায় ছিল তাহাই তাহার পক্ষে গুরুতর কথা নহে, কিন্তু যে সভ্যতার সংস্পর্শে ও সাহচর্য্যে এই জাতীয় জীবন উদ্বোধিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কালে তাহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাহাই সেই জাতির সম্বন্ধে প্রধান জ্ঞাতব্য কথা। ফলে জাতির আদিম নিবাসস্থলই তাহার গৌরবের অধিকারী হইতে পারে না, পরন্তু যে সভ্যতার ফলে তাহার জীবন গঠিত হইয়াছে, সেই সভ্যতা ও যে স্থানে সেই সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ, সেই স্থান—ইহারাই মাত্র সে গৌরবের অধিকারী। সকলেই জানেন যে একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ইংলণ্ডে নর্ম্মান জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—কিন্তু সে জন্য ইংলণ্ডের গৌরব ফ্রান্স বা নরওয়ে ডেনমার্কের প্রাপ্য নহে। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মতে হেনরির সহিত ম্যাটিল্ডার বিবাহই ইহার কারণ। তাহা হইলে ত সাজাহান প্রভৃতি মোগল সম্রাটগণের গৌরবও হিন্দুগণেরই প্রাপ্য ; কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, নর্ম্মান সভ্যতা ইংরাজ সভ্যতার উপর প্রাধান্য স্থাপন বা তাহা হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই, বিরাট ইংরাজ সভ্যতার সহিতই মিশিয়া গিয়াছে ; সেইরূপ বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের যাহা কিছু গৌরব—কোল ভীল প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী হইলেও তাহা তাহাদের প্রাপ্য নহে, এবং মধ্য এসিয়া জাতীয় আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান হইলেও এই গৌরবের অধিকারী নহে। ভারতবর্ষই এই গৌরবের অধিকারী, কারণ এই সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষেই হইয়াছিল।

আমাদের মূল প্রশ্ন ছিল, যৌধেয়গণকে আমরা ভারতবাসী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি কিনা এবং তাহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিবার দাবী আমাদের আছে কিনা। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে আমি এইটুকু বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই প্রশ্নের উত্তর, যৌধেয়গণের আদিম বাসস্থান কোথায় ছিল তাহার উপর নির্ভর করে না, কিন্তু কোন সভ্যতার সংস্পর্শে যৌধেয়গণের জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারাই ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমি মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পুরাণকারগণের মতে যযাতির পুত্র অণু হইতে যৌধেয় জাতির উৎপত্তি। যযাতি বলিয়া কোন রাজা কখন ছিল না, বা থাকিলেও অণু নামে তাঁহার কোন পুত্র ছিল না, এবং এই দুইজন থাকিলেও যৌধেয় তাঁহাদের বংশোদ্ভব নহে—এ সমস্তই মানিয়া লইলাম; কারণ সে বিষয়ে প্রমাণাভাব—কিন্তু পুরাণকারগণের এই প্রত্যেক উক্তি ভ্রান্ত হইলেও ইহার মধ্যে একটি অমূল্য সত্য নিহিত আছে, তাহা এই যে যৌধেয়গণ আদৌ যাহাই থাকুক না কেন ভারতবর্ষের সভ্যতার আশ্রয়েই তাহাদের জাতীয়-জীবন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে ভারতের প্রাচীন রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা—পরিণত সভ্যতাশালী কোন জাতির পক্ষেই ইহা স্বাভাবিক বা সম্ভব নহে। এই চেষ্টা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যৌধেয়গণ প্রথম হইতেই ভারতবর্ষের সভ্যতার সংস্পর্শে জাতীয় জীবন লাভ করে এবং ভারতবর্ষের সভ্যতার অতিরিক্ত কোন জাতীয় জীবন থাকিলেও তাহা নিতান্ত নগণ্যই ছিল—তাহাদের মুদ্রায় ভগবান ব্রহ্মণ্যদেবের নাম ও মূর্ত্তি, ও তাহাদের প্রস্তর-লিপির ভাষা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করে যে ধর্ম্মে ও ভাষায় তাহারা হিন্দুই ছিল—এবং পুরাণকারগণের উক্তি হইতে আমি যে, সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহাও এইরূপ ভিন্ন প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয়। পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য কি এবং যৌধেয়গণের গৌরবে আমাদিগের গৌরব করিবার অধিকার আছে কিনা এ উভয় প্রশ্নের বিচারের ভার আপনাদের উপর অর্পণ করিয়া আমি এই সুদীর্ঘ নীরস প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

চিত্রপট

শুধু একখানি ছবি ছায়া চিত্রপট,
এই নিয়ে কেটে গেল সারাটা জীবন ;
তাহারি সম্মুখে স্থাপি' অর্চ্চনার ঘট
দীন পূজকের মত করিনু যাপন ;
জীবন প্রভাত সন্ধ্যা মধ্যাহ্ন আমার,
অনিমিষে চাহি' মুখ চিত্র-দেবতার
হাতে লয়ে প্রেম অর্ঘ্য বদ্ধ কৃতাঞ্জলি,
বিনীত ভক্তের মত চরণের তলে
জ্বালাইয়া চারিধারে ভক্তি-দীপাবলী,
মুগ্ধনেত্রে ক্ষণেকের কৃপা পা'ব বলে',
আপনা ভুলিয়া বসি' আছি আশা ধরি',
শত জন্ম-জন্মান্তের করুণা ভিখারি।
জানিনা সে কতদিনে দয়া হবে তার
চিত্র ত্যজি' দিবে দেখা সম্মুখে আমার।

শ্রীমৃন্ময়ী দেবী।

মৌলি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"বুঝলে সেজদি? আর এই নূতন চাকরটাকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে থাক্ হয়ে যাচ্ছি। এই দেখ না? ওরে শশে, আমার মাথা খেয়ে এটা কি নিয়ে এলি? খোল্ দেখি ওর ভিতরে কি আছে? দেখ্‌লে সেজদি, দেখলে একবার লক্ষ্মীছাড়া বেটার আক্কেল! ওঁর আফিসের টিফিন বাক্সটা কি না একেবারে উপরের ঘরে নিয়ে এসে হাজির! বেরো, শিগ্‌গীর বেরো। ওটাকে আবার ফেলে গেলি কেন? নিয়ে যা বল্‌ছি এখুনি, যেখানে ছিল সেই-খানে রেখে আয়। অ ঝি, ও তারণের মা, এইদিকে এস, এই খানটায় গোবর জল ছড়িয়ে দাও। ও গুলো ওঁর আফিসে খানা খাবার জিনিস, আমি ভাই ওপরে তুল্‌তে দিই না। কেষ্টো বাড়ী গিয়ে অবধি যে জ্বালাতন

হচ্ছি, তা আর তোমায় কি বল্‌ব। সে সেফ্‌টি পিনকে সিটপিটিন বল্‌ত, এসেন্সকে সিন্‌সিন্‌ বল্‌ত, কিন্তু তাহলে কি হয়, সব জিনিস পত্র চিনে গিয়েছিল। অনেক দিনের পুরাণো চাকর কি না। আমার শ্বশুরের আমল থেকে আছে।

"তুমি শোননি বুঝি? তার বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে। টলির পরে আমার যে মেয়েটা হয়ে রইল না, সেটাকে কেষ্টা বড় ভালবাসিত; সে পোড়া-কপালীর মেয়েও কেষ্টাকে ছেড়ে থাক্‌ত না। সেটা যখন গেল, তখন উনি দিন কতক পাগলের মত হয়েছিলেন, আমার কথাত ছেড়েই দাও। যে রাত্তিরে সে গেল, সেই রাত্তির থেকে কেষ্ট নিরুদ্দেশ। তার পর তিন চার মাস কেষ্টার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না, উনিত ভেবেই অস্থির—"

"এটা আবার কি নিয়ে এলি? ওমা দেখলে? এটা যে বাবুর আফিসের ব্যাগ? এতে সব মকদ্দমার কাগজ পত্র রয়েছে। কাগজ পত্র ছড়িয়ে রেখে আসিস নি ত? তাহলে মরবি মার খেয়ে। সেজদি, জ্বলে পুড়ে গেলুম। উনি বলেন যে ভাল দেখে একটা মুসলমান খিদমদগার এনে রাখি। তা ভাই হিঁদুর ঘর, কি বলে মোছলমান ঢুক্‌তে দিই বল দেখি। ওঁরা বাইরে যা খুসী করুন, কিন্তু বাড়ীর ভিতর অনাচার ঢুক্‌তে দিলে কি আর রক্ষা আছে? উনি যেদিন রাত্তিরে খানা খেতে যান, সেদিন কিন্তু আমি সে কাপড়ে বাড়ীর ভিতরে আসতে দিই না।

"শশে, ও শশে, একেবারে জন্মের শোধ গেলি বাবু। তোকে একবার বলে দিলে চিনে রাখতে পারিস না কেন? এখন থাক্‌, বড় খোকা আসুক স্কুল থেকে তার পর তোকে দেখিয়ে দেবে এখন। তুই নীচে যা, সদর দরজাটা যেন খুলে রাখিস নি।

"তার পর কি বল্‌ছিলুম সেজদি? সেই কেষ্টার কথা। তার পর দুমাস বাদে তার দেশ থেকে এক চিঠি এসে হাজির, সে ওঁকে নিমন্ত্রণ করেছে—তার বিয়ে। উনি ত হেসেই খুন, বড় খোকা ত হেসে লুটোপুটি। উনি বল্লেন যে কেষ্টার বয়েস পঞ্চাশ বছরের একঘণ্টা কম নয়, তার আবার বিয়ে? শূদ্দুররা কিন্তু ভাই, সবাই বুড়ো বয়সে বিয়ে করে। উনিত ভাল করে ভারি করে একছড়া সোণার হার গড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন; বল্লেন অনেক দিনের পুরাণো চাকর, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। সে যখন বিয়েই করতে বসেছে বুড়ো বয়েসে, তখন তার বৌকে একখানা

সোণার গয়না দেওয়া উচিত। দিতে থুতে উনি বড় ভালবাসেন, আমি তাতে কখনও বাধা দিই না। ওঁর পয়সা, উনি দিবেন আমি কেন নিমিত্তির ভাগী হতে যাই? তার মাস খানেক পরে কৃষ্টচন্দর এসে হাজির; তখন তার বিয়ে টিয়ে হয়ে গেছে। দিন কতক থেকে যেমন কাজকর্ম্ম কর্‌ত তেমনি করতে লাগল। হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি নিয়ে বাবুর কাছে এসে হাজির; বল্লে যে তার শ্বশুর চিঠি লিখেছে, তাকে তখনি বাড়ী যেতে হবে। কেষ্টা সেই যে গেছে আর দেখা নেই।

"শশে, ও শশে, তিনটে বেজে গেছে, স্কুলে গাড়ী নিয়ে যেতে বল্। বস্‌না ভাই? কতদিন পরে এসেছিস একটু খানি বস্। বাবা গিয়ে অবধি আর ত দেখা শুনো হয় না। বড় খোকা স্কুল থেকে এলে সেই গাড়ী তোকে দিয়ে আসবে এখন। তোর নিজের গাড়ী ফিরিয়ে দে ভাই। উনি? উনি ট্রামে না হয় ভাড়াটে গাড়ী করে আসবেন। রাগ করবেন না, আরও কিছু? কতদিন এমন হয়েছে।

কি বলছিস, ভাল করে বল না? তোর ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি কথা আমি বুঝতে পারি না বাবু? কি বলে সেজদি, তুইত ভাই মুখুজ্জে মশায়ের সঙ্গে অনেক দিন উড়েদের দেশে ছিলি? পুরাণো চাকর এসেছে, কে বল দেখি? ক্রুষ্ণ? ক্রুষ্ণ কি ভাই? ওমা তাই বুঝি? কেষ্টাকে ক্রুষ্ণ বলে? মুখে আগুণ পোড়ার দেশের কথার। কই? কোথায় সে, শিগ্‌গীর তাকে এই খানে নিয়ে আয়। ও কেষ্ট, তুমি কখন এলে? বস, এখন কি বেড়াতে এসেছ। বৌ কেমন আছে? মরে গেছে? আ—হা—কি হয়েছিল? জ্বর? আহা, বুড় বয়সে আবার শোক পেলে? তোমার বিয়ে না করলেই হত ভাল। তুমি কাজ করবে তাহলে ত বাঁচি, নূতন নূতন চাকরগুলো হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে। না, ওকে ছাড়াব কেন? ও থাকবে, ও বড় খোকার সঙ্গে স্কুলে যাবে। বাঁচলুম বাবু, বাবু বল্‌ছি দাদা। ওঁর বড় অবস্থা হয়েছিল, কাল পশ্চিমে বেড়াতে যাবেন, তারি জন্যে অকুলপাথার ভাবছেন। তুমি এলে, আমি বাঁচলুম; ওঁর সঙ্গে তুমি গেলে আমি নিশ্চিন্তি। এস নীচের, বসগে, তোমার ঘরে সেই অবধি চাবি লাগান আছে, উনি কাউকে ঢুকতে দেননি।

"এই কেষ্ট—সেজদি! ও এল আমি বাঁচলুম, নিশ্চিন্তি হয়ে থাকব। পোড়া কপাল আমার, ও আবার আমায় গিন্নি বলবে? ওঁকেই সময়ে সময়ে মাম

ধরে ডাকে, তবে নেহাৎ লোকজন থাক্‌লে "আপনি" "আজ্ঞে" বলে। বুড়ো বয়সে কেন সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে গেল বল দেখি, কেবল শোক পাবার জন্যে।

"ওরে বড় খোকা, কে এসেছে দেখ দেখি? আরও একজন এসেছে, কে একজন এসেছে, কে বল্‌ দেখি? কেষ্ট এসেছে। আমাদের কেষ্ট নয়ত আবার কাদের। ও সেজদি আর একটু বস, তোমার পায় পড়ি আমার মাথা খাও, মুখুজ্জে মশায় রাগ করবেন না, আমি কাল বুঝিয়ে বলে আসবো।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ডালহাউসী

৫ই অক্টোবর ১৯০৩

মহারাণী!

কতদিন পরে তোমায় পত্র লিখিতেছি বল দেখি? তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু মুখে কখনই স্বীকার করিবে না যে, সত্য সত্যই ভুলিয়া গিয়াছ। আজ দশ বৎসর পরে তোমায় পত্র লিখিতে বসিয়াছি। এই দশবৎসরের মধ্যে কি তোমায় একখানিও পত্র লিখি নাই? খুব কম করিয়া এক হাজার চিঠির কাগজ জীবন-যাত্রার অত্যাবশ্যক সংবাদ বহন করিয়া আমার কাছ থেকে লেফাফা বদ্ধ হইয়া তোমার নিকট গিয়াছে, কিন্তু সে গুলা ত পত্র নয়। শেষ পত্র কবে লিখিয়াছি তাহা আমার এখনও বেশ মনে আছে। তোমার মনে আছে কি? লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া যখন কলিকাতায় ওকালতী করিতে গেলাম সেই সময়ে। সে আজ দশবৎসরের কথা। দশবৎসর পরে সত্য সত্য লিখিতে বসিয়াছি, সেই জন্য দশবৎসর পূর্ব্বে পত্রে তোমাকে যাহা বলিয়া সম্বোধন করিতাম, আজও তাহাই বলিয়া সম্বোধন করিতেছি।

মহারাণী! এই দশবৎসরে আমাদের কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে বল দেখি। তুমি হয়ত বলিবে যে তুমি এখন গৃহিনী হইয়াছ, এখন যৌবন গিয়াছে, এখন আর তুমি সেইরূপ পাগলামি করিতে প্রস্তুত নহে। যৌবন গিয়াছে বিশেষতঃ তোমার, ও কথা আমি কখনই স্বীকার করিতে পারিব না। বড় জোর বলিতে পারি যে প্রথম যৌবনের বসন্ত-চঞ্চলতা অতীত হইয়াছে। কথাটা মনে পড়িল কি? কবে কোন্ সময়ে কোন্ নিপুণ শিল্পীর

পরিণত বয়সের রচনা পড়িতে পড়িতে দুইটি অপরিণত বয়স্কের চারিচক্ষে জল আসিয়াছিল বলিতে পার?

মিণু! সেদিন এতই দূর? আমার কাছে ত ইহা কালিকার কথা বলিয়া মনে হয়। আরও মনে হয় যে, যৌবনে অকারণে অকাল বার্দ্ধক্য টানিয়া আনিয়া জীবন গুরুভার হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমরা তাহা ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলি। তুমি পঁচিশ বৎসর বয়সেই প্রবীণা গৃহিণী সাজিয়াছ, কিন্তু কেন সাজিলে বল দেখি? মাথার চুল কোঁকড়াইয়া চুল বাঁধিতে তোমার লজ্জা বোধ হয়, পাছাপেড়ে কাপড় পরিতে তোমার লজ্জা বোধ হয়। তুমি বল এখন আর ও সব ভাল দেখায় না, লোকে কি বলিবে? কিন্তু মেজবৌদিদি কি করেন বল দেখি? তিনি ত আমার খাশুড়ী অপেক্ষা বড় বই ছোট নহেন, তাঁহার বেশভূষাটা একবার মনে কর দেখি? মেজবৌদিদির দৌহিত্রীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কেশবিন্যাস, তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ, চাল চলন, অলঙ্কার ব্যবহার সমস্তই যৌবনের উপযোগী অথচ তাঁহার যৌবন যে গত হয়েছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মেজদাকে দেখ দেখি, তাঁর জামাই রবি—থান পরে, সাদা উড়ানী ব্যবহার করে, কিন্তু মেজদা এখনও দিশি কালাপাড় ধুতি, গিলাকরা ঢিলা আস্তিনের জামা, আর কোঁচান মিহি উড়ানী ভিন্ন অন্য কিছু ব্যবহার করেন না। আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে আমরা দুজন যথেষ্ট যৌবনসত্বেও গত-যৌবন হয়ে পড়্‌ছি। আমাকে আবার নূতন করে' তোমার সঙ্গে লাগ্‌তে হবে দেখছি। তোমার এই অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্নগুলা দূর না করিলে আমার মনে আর শান্তি হইবে না।

তুমি হয় ত বলিবে যে, এতকাল পরে তোমার উপর নজর পড়িল কি করিয়া। নজর চিরকালই ছিল, সমান ভাবেই আছে। ফুল-শয্যার দিনে তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, জানালা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া তোমার সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল, আমি সে সৌন্দর্য্য দর্শনে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম, সে রাত্রিতে ঘুমাই নাই। রাগিও না আমার কথাগুলা স্থির হইয়া শোন। তাহার পর কত রাত্রি সেই একই কার্য্যে একই ভাবে কাটিয়াছে, তাহা কি তুমি জান? এখনও,—ভাল,—লিখিব না। তোমার কথা মনে পড়িয়া গেল, কেমন করিয়া জান? অম্বালা ষ্টেশন দিয়া আসিতে আসিতে। সেই কথা, সেই দিনের কথা, তাহা তুমি কখনই ভুলিয়া যাও নাই। সেই

কথায় মনে পড়িয়া গেল। অম্বালা ষ্টেশন এখনও তেমনই আছে, কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। তুমি যখন বলিলে যে, অত গোরা দেখিয়া একা ওয়েটিং রুমে থাকিতে তোমার বড় ভয় করে, তখন তোমাকে লইয়া যে স্থানটিতে বসিয়াছিলাম, তাহা এখনও তেমনি আছে। কৃষ্ণও সঙ্গে আছে, নাই কেবল তুমি। তুমি কেন আসিলে না? তুমি যদি উপস্থিত থাকিতে, তাহা হইলে সেবারকার মত পুরস্কার—ভুল হইয়া গেছে, গুরুদেব, এমন কথা আর লিখিব না। তুমি কেন আসিলে না? তোমার সংসার? সেটা সঙ্গে উঠাইয়া আনিলেই হইত। মুসৌরীতে এবং সিমলায় তোমার সংসার কে চালাইত? যে দাসদাসীগুলি তোমার বকলমে তোমার সংসার চালাইয়া থাকে, এখানেও তাহারাই চালাইত।

কৃষ্ণও সেই কথা বলে। সে কাল বলিতেছিল যে খোকাবাবুদের লইয়া আসিলে তাহার দিন কাটিত ভাল। দেখ, কৃষ্ণ একেবারে বদলাইয়া গেছে, তাহার দেহে আর তেমন শক্তি সামর্থ্য নাই। তোমার মনে আছে কি? যে বৎসর বড় খোকার অসুখের জন্য আমরা মুসৌরী যাই, সেবার সে রাজপুর থেকে হাঁটিয়া মুসৌরী গিয়াছিল, কিন্তু গিরীশ ঠাকুরকে ডাণ্ডি চড়িতে হইয়াছিল। সে আর কতদিনের কথা! কিন্তু এখন আর কৃষ্ণ চলিতে পারে না, একটা বড় লাঠি না হইলে, পাহাড়ে উঠিতে পারে না। বুড়া বয়সে শোক পাইয়া সে একেবারে বসিয়া গিয়াছে। এত দিনে কৃষ্ণ সত্য সত্যই বুড়া হইয়াছে, তাহার চুলগুলা একেবারে সাদা হইয়া গেছে, প্রায় সমস্ত দাঁতগুলা পড়িয়া গিয়াছে, হাত-পা কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে কিন্তু এখানে আসিয়া ভাল আছে। আগে বাবার সঙ্গে বৎসর বৎসর গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে যাইত, আমার সঙ্গে প্রতিবৎসর অন্ততঃ একবার করিয়া দার্জ্জিলিং যাইত; কিন্তু বিবাহ করিয়া দেশে গিয়া অবধি সে আর পাহাড়ে আসে নাই। কৃষ্ণ বলিতেছে যে, এখানে আসিয়া তাহার খাওয়া বাড়িয়াছে। তবে একটা অসুবিধা, এখানে মোটে মাছ পাওয়া যায় না; তুমি যদি এখানে কখনও আস, তাহা হইলে বড়ই বিপদে পড়িবে।

যখন তোমাকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন কত কথাই যে বলিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু চিঠি ত শেষ হইয়া আসিল, অথচ কোন কথাই বলা হইল না। এবারে বুঝিতেছি বিরহ বহুবিধ, যথা—আহারের সময়ে বহু দাসদাসী সত্ত্বেও গৃহিণীর বলয়-শোভিত হস্তের তালবৃন্ত ব্যজন, সময়ে সময়ে

তৈল ঘৃত অনভাবজনিত সুস্বাদু ব্যঞ্জন লাভ, নিতান্ত অনাবশ্যক সংবাদ প্রাপ্তি এবং ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পিত চিত্র, যথা বড় খোকা বড় হইলে তাহার বিবাহের সময়ে কি কি করিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন আমি এই সর্ব্ববিধ বিরহ একা একই সময়ে ভোগ করিতেছি জানিবে।

বড় খোকাকে বলিও যে, তাহার জন্য রাওলপিণ্ডির নাগরা জুতা ও শিয়ালকোটের ব্যাট লইয়া যাইব, ছোট খোকার জন্য দিল্লী হইতে হকি সেট লইয়া যাইব।

তোমার চির দাসানুদাস

পনি।

পুনঃ—পনি ঠিক সেই রকমই আছে, কেবল তাহার কোঁকড়া চুল, যাহার জন্য তাহার পনি নাম হইয়াছিল, তাহা বিরল-হইয়া আসিতেছে। লাহোর ষ্টেশনে তোমার শিশির দাদার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণচন্দ্র কোথায় গেল? আজ সকাল থেকে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বৃন্দাবনে আসিয়া অবধি জ্বালাতন হইতেছি—ধূলা মশা মাছি এবং বানর এই চারিটার জ্বালায় অস্থির। অবশ্য যমুনায় কচ্ছপের উপদ্রব আছে। সকাল বেলায় কেশবের পুরাতন মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম; তখনও রৌদ্র উঠে নাই, কিন্তু তখনও কৃষ্ণকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন বেলা দশটা, কিন্তু তখনও কৃষ্ণ ফিরিয়া আসে নাই। সে কোথায় গেল?

এক ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া আর পারিলাম না, কৃষ্ণকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। শ্রীবৃন্দাবনে অবশ্য সকলেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অন্বেষণে আসিয়া থাকে, কিন্তু আমার কৃষ্ণান্বেষণ নূতনতর। ইহা সকাম অন্বেষণ, কারণ কামনা এই যে কৃষ্ণ আসিয়া আর কিছু করুক আর না করুক জিনিষপত্রগুলা ত আগলাইতে পারিবে। ইহা শরীরী কৃষ্ণের অন্বেষণ; আমার উদ্দেশ্য বস্তু হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-নাসা বিশিষ্ট এবং সত্য সত্যই বস্তু, যাহাকে স্পর্শ করিলে অনুভূতি হয়। অপরের কৃষ্ণান্বেষণ জন্ম জন্মান্তরেও শেষ হয় না, কিন্তু আমার অন্বেষণের শেষ আছে, কারণ সন্ধ্যার পূর্ব্বে খুঁজিয়া বাহির না করিতে পারিলে পুলিসে সংবাদ দিতে হইবে।

বৃন্দাবনে একজন অপরিচিত বৃদ্ধ বাঙ্গালীকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। কারণ যে কয়জন বঙ্গবাসী শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে আসেন, তাঁহারা সকলেই বৃদ্ধ। যৌবন গত না হইলে কোনও পুরুষ শ্রীবৃন্দাবনে বা ৺বারাণসীতে বাস করিতে আসেন বলিয়া বোধ হয় না। যেখানে বাঙ্গালী মাত্রেই বৃদ্ধ, সেখানে যে কোনও ব্রজবাসীই বৃদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্রের সন্ধান বলিতে পারিবে না, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বেলা বাড়িয়া চলিল, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণেরও দেখা পাইলাম না, রৌদ্রে পুড়িয়া তিন ঘণ্টা পরে বাসায় ফিরিলাম এবং দেখিলাম যে, বানরে নূতন বুটজুতাজোড়ার একখানা লইয়া গিয়াছে ও পাণ্ডা ভাত লইয়া বসিয়া আছে।

আহার সারিয়া পুনরায় বাহির হইলাম। পাণ্ডাকে বলিয়া গেলাম যে কৃষ্ণ যদি ইহার ভিতর ফিরিয়া আসে তাহা হইলে সে যেন থানায় গিয়া সংবাদ দিয়া আসে এবং বুটটার সন্ধান করিতে পারিলে নগদ এক টাকা বখ্‌শিস পাইবে। বাহির হইয়া সারা বৃন্দাবন খুঁজিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু কৃষ্ণের সন্ধান ত মিলিল না। হয়রাণ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় থানায় ফিরিয়া আসিলাম। দারোগা বলিল যে কেহ আমাকে সন্ধান করিতে আসে নাই, সুতরাং বুঝিলাম যে কৃষ্ণ সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও বাসায় আসে নাই। কি করিব থানায় কৃষ্ণের নাম ধাম চেহারার বিবরণ সমস্ত লিখাইয়া দিয়া আসিলাম। দারোগা বলিল যে সময়ে সময়ে যমুনায় স্নান করিতে নামিলে কচ্ছপে ধরিয়া লইয়া যায়, দুই তিন দিন পরে লাস পাওয়া যায়। বড়ই সুখবর; ইহা প্রাপ্ত হইয়া যথোচিত হৃষ্ট মনে থানা হইতে বাহির হইলাম।

মনে করিয়াছিলাম যে আজ রাত্রির ট্রেণে দিল্লী ফিরিব। লালা দেওয়ানচাঁদ আমার পুরাতন মক্কেল, তাহার স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক দুই এক দিন দিল্লীতে বাস করিয়া যাইব। দেওয়ানচাঁদকে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিলাম যে, সকাল বেলায় পৌছিব, সুতরাং আর একখানা টেলিগ্রাম করিবার জন্য ষ্টেশনে ছুটিতে হইল। বৃন্দাবন ষ্টেসনে শুনিলাম যে, ষ্টেসন হইতে এক মাইল দূরে একজন লোক রেলে কাটা পড়িয়াছে। তখনই রেলের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম যে লোকটা কৃষ্ণ নহে। ফিরিবার সময়ে রেলের ডাক্তারের সঙ্গে ট্রলিতে আসিলাম। দেওয়ানচাঁদকে তার করিয়া দিয়া যখন ষ্টেশন হইতে বাহির হইলাম, তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণ কোথায় গেল? ইহা ত বিষম সমস্যা, সমস্যা পূরণের কোনও উপায় দেখিতেছি না। সমস্ত বৃন্দাবন খুঁজিয়া আসিয়াছি, তাহাকে যখন পাই নাই, তখন সে নিশ্চয়ই বৃন্দাবনে নাই। ব্রজধামে যত গণ্ডগ্রাম আছে, আর যত ভিন্ন ভিন্ন বন আছে যথা কাম্যবন, খদির বন, নিধু বন, নিকুঞ্জ বন, বৃন্দাবন ইত্যাদি, সে সমস্ত খুঁজ্‌তে গেলে তিন চারি বৎসর লাগিবে। অথচ কৃষ্ণকে ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছি না, কেমন করিয়া যাইব? সে অনেক দিনের লোক, মা'র বিবাহের পূর্ব্বে সে আমাদের বাড়ী চাকরী করিতে আসিয়াছিল। আমি জন্মিবার পরে সে আর দেশে যাইতে চাহিত না, মা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত "খোকাকে ছেড়ে যেতে পারি না মা, বড় কষ্ট হয়।" আমি যখন বড় হইয়া উঠিলাম, তখন সে আমাকে চক্ষুর অন্তরালে যাইতে দিত না, স্কুলে সে ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তাহার জন্য পিতার কাছে তিরস্কৃত হইত, তথাপি সে আমাকে ছাড়িত না। আমার জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসর সে কখনও আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। বড় খোকা, টলি এবং ছোট খোকা জন্মিলে সে তাহাদিগকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিত, তখন আর সে আমার কাজ করিবার অধিক সময় পাইত না।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমার একটি এক বৎসরের মেয়ে মারা গিয়াছে। কৃষ্ণ তাহাকে বড়ই ভাল বাসিত, তাহার প্রাণে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার পরেই সে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। কিছু দিন পরে কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল এবং জানাইল যে, সে বিবাহ করিয়াছে। তখন তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। ইহার পরে কিছু দিন আমার নিকট থাকিয়া কৃষ্ণ দেশে চলিয়া যায়, তাহার পরে অনেক দিন আসে নাই। আমি এই বৎসর পূজার ছুটিতে বেড়াইতে বাহির হইবার পূর্ব্বের দিন কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত।

কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া বিদেশে বাহির হইলাম। সে চিরকাল যেমন ভাবে আমার সেবা করিত, এখনও তেমন ভাবেই আমার সেবা করিতে লাগিল; কিন্তু সে সর্ব্বদাই বিমর্ষ হইয়া থাকে, এবারে আর তাহাকে সদা হাস্যময় প্রফুল্লবদন দেখি নাই। তাহার কারণ আছে, কৃষ্ণ আসিয়াই বলিয়াছিল যে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। সে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছিল, সেই জন্যই বোধ হয় শোকটা তাহার অধিক লাগিয়াছিল। সে দেশ বেড়াইতে চিরকাল ভালবাসে, তাহার মন প্রফুল্ল করিবার জন্য ডালহাউসীতে না থাকিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। কিন্তু এবারে যেন তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিলনা।

সেই জন্যই সে হারাইয়া যাওয়াতে এবার অধিক ভাবনা হইতেছে, অন্য সময়ে তাহাকে খুঁজিয়া না পাইলে হয়ত এত ভাবিতাম না।

রাত্রি দশটার সময় বাসায় ফিরিলাম, কোনই খবর নাই। ঘরে আলো নাই, বিছানা পাতা নাই, কাপড়গুলা যেখানে ফেলিয়া গিয়াছিলাম সেইখানে সেই ভাবেই পড়িয়া আছে। যাহা কখনও করি নাই তাহাই করিতে হইল; নিজের শয্যা নিজেই পাতিয়া লইলাম, যতদূর পারিলাম কাপড়গুলা গুছাইলাম। এমন সময়ে পাণ্ডা খাবার লইয়া আসিল। সে বলিল যে কৃষ্ণের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই, বুটের তিনটুকুরা পাওয়া গেছে আর এক টুকরা কাল প্রাতে পাওয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আগ্রা

৩রা নবেম্বর ১৯০৩।

মহারাণী!

আবার তোমাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছি। কয়দিন যাবৎ বড়ই ব্যস্ত ছিলাম, সেইজন্য পত্র লিখিতে পারি নাই। বৃন্দাবন থেকে বড় খোকা ও টলিকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় তাহারা এতদিনে পাইয়াছে। প্রায় দেড়মাস তোমাদের ছাড়িয়া আসিয়াছি, ইহারই মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে জগতের পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে, তাহা অদৃশ্য; কিন্তু সম্প্রতি যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা আমাদের মধ্যে আমরা জগতের যে ক্ষুদ্র অংশটুকু অধিকার করিয়া আছি তাহারই মধ্যে এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ। কৃষ্ণকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম, কিন্তু যখন পাইয়াছিলাম তখন তাহার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে।

সে হারাইয়া যাইবার দুইদিন পরে মথুরায় আসিয়া শুনিতে পাইলাম যে হাঁসপাতালে একজন বৃদ্ধ বাঙ্গালী আসিয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। কেহ তাহাকে চিনেনা এবং কেহই তাহার পরিচয় বলিতে পারে না। কোনও উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার মস্তকে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে, বোধ হয় চৈতন্য আর ফিরিবে না। সেই কৃষ্ণ।

হাঁসপাতালের ডাক্তার বাঙ্গালী। তাঁহাকে কৃষ্ণের পরিচয় দিয়া তাহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, জীবনের কোন আশাই

নাই, তবে জ্ঞান হইলেও হইতে পারে। তাহার শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় মথুরায় এ কয়দিন অপেক্ষা করিতেছিলাম। এখন সে আর নাই, তাহার জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে, তাহাকে যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি। তাহার চৈতন্য ফিরিয়াছিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে সে আমাকে কতকগুলি কথা বলিয়া গিয়াছে, তাহাই তোমাকে লিখিতেছি। তাহা শুনিয়া তোমার কোমল মনে ব্যথা লাগিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি ; তথাপি তোমাকে লিখিতেছি, কেন জান, সে কথাগুলা চির-পুরাতন অথচ বড় নূতন।

সে যাহা বলিয়া গিয়াছে তাহা নূতনতর বলিয়া তুমি বুঝিতে পারিবে, অথচ তুমি তাহা স্বীকার করিবে না। তাহা তোমার হৃদয়ের কোমলতর কোণে আঘাত করিবে, অথচ তুমি তাহা বোধ করিবে না, বরঞ্চ তুমি সেই উদারহৃদয় বৃদ্ধ ভৃত্যকে কুকথা বলিতে আরম্ভ করিবে। কখনই ইহার অন্যথা হইবে না, ইহা সুদীর্ঘ সমাজ-বন্ধনের ফল। ভারতবর্ষে এ কথা যে শুনিবে সেই বলিবে যে কৃষ্ণের মত নির্ব্বোধ মূর্খ ইহার পূর্ব্বে জন্মায় নাই, কিন্তু পাশবদ্ধ সমাজের বাহিরে যেখানে মানুষ আছে, সেখানে তাহার কথা অমর কীর্ত্তি লাভ করিবে।

দেহে যে বাস করে তাহার নাম প্রাণ, কেমন ত ? নিশ্চয় একজন সেখানে বাস করে, কারণ সে যখন ছাড়িয়া যায় তখন সেই বাসস্থানের অবস্থান্তর হয়। পরিত্যাগের সময় জড় বাসস্থান বড়ই কষ্ট পায়। কৃষ্ণ যখন তাহার অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কালের বাসস্থান ছাড়িতেছিল, তখনই সে এই কথাগুলি বলিয়াছিল। মরণ-কাতরের জীবনব্যাপী হতাশার কথা দীর্ঘ অসম্পূর্ণ অনাবশ্যকতা মিশ্রিত,—একরূপ প্রলাপ মাত্র। সেইজন্য তাহা তোমার জন্য সাজাইয়া গোছাইয়া লিখিতেছি। মনে রাখিও যে ইহা কৃষ্ণের কথা। কৃষ্ণ বলিল—

"মোলি যখন গেল, তখন আমার বক্ষের অবশিষ্ট পঞ্জর কয়খানা ভাঙ্গিয়া গেল। সে অনেক দিন ধরিয়া দুশ্চিকিৎস্য রোগে কষ্ট পাইতেছিল, আর জন্মাবধিই বড় রুগ্ন, বড় দুর্ব্বল। তাহার দুর্ব্বল রোগক্লিষ্ট মূর্ত্তিখানি দেখিলে আমার বড় কষ্ট হইত। তোমার অন্যান্য সন্তানগুলির ন্যায় সে সুন্দর সুগঠিত নহে বলিয়া তোমরা তাহাকে তেমন ভালবাসিতে না। তাহার মাও তাহাকে তেমন ভালবাসিত না। সেইজন্য সে নিতান্তই আমার অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে তোমার ভাল মনে আছে ; সে কাল ছিল, তাহার টলির ন্যায় চম্পকবিনিন্দিত বর্ণ ছিল না, তাহার হস্তপদগুলি শীর্ণ ছিল, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় সুগঠিত ছিল না। বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া তাহার রুক্ষ

চুলগুলি অযত্নে উড়িয়া বেড়াইত। তোমরা কেহ তাহাকে লইতে চাহিতে না। তোমাদের সন্তান, তোমরা তাহাকে হারাইয়াছ, আমি তোমাদের মনে ব্যথা দিতে চাহি না; কিন্তু সে তোমাদের নিকট বড়ই অনাদরে দিন কাটাইয়া গিয়াছে। তাহার ভাল করিয়া কথা ফুটে নাই, কিন্তু সে আধ আধ কথায় আমাকে যাহা বলিত, তাহা হইতে বুঝিতাম যে সে তাহার অনাদর বুঝিত। রোগের যন্ত্রণায় যখন সে অস্থির হইয়া উঠিত, তখন তাহার মাতাকে সে ডাকিয়া পাইত না, মাতৃহস্ত-স্পর্শের যে অনির্ব্বচনীয় শান্তি তাহা চিরদিন তাহার নিকট দুর্ল্ভ ছিল। তুমি পিতা, তুমি অর্থের জন্য দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াও, তুমি রোগক্লিষ্টা মরণাহতা শিশু কন্যার দিকে একবারও কি চাহিয়া দেখিতে? কাহারও নিকট শান্তি না পাইয়া সে আমার নিকটে আসিত; আমি যদি ঘুমাইয়া থাকিতাম, তাহা হইলে সে তাহার শীর্ণ উত্তপ্ত হাতখানি দিয়া আমাকে ডাকিত, আমি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইলাম।

তাহার রোগ বাড়িয়া উঠিল, ডাক্তার আসিত, বৈদ্য আসিত, কিন্তু তোমরা কি তখনও তাহাকে দেখিতে? তোমার বোধ হয় মনে পড়ে যে, আমি তখন তোমাকে ছাড়িয়া দিবারাত্রি তাহার নিকটে থাকিতাম। বাবু, তোমাকে আমি জন্মিতে দেখিয়াছি, তোমাকে আমি হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি, তোমা অপেক্ষা কি তোমার সন্তানের উপরে আমার মায়া অধিক হইতে পারে? কিন্তু তুমি এখন বড় হইয়াছে, পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছ; সে দুর্ব্বল, রোগ-ক্লিষ্ট। আমি তোমাকে ছাড়িয়া তাহাকে পাইলাম। আমি বুঝিতে পারিয়া-ছিলাম যে সে বাঁচিবে না, কেমন করিয়া তাহা বলিতে পারি না। কে যেন আমাকে বলিয়া দিয়াছিল যে সে অধিক দিন এ জগতে থাকিবে না।

তাহার রোগ বাড়িতে লাগিল, যখন তাহা চিকিৎসকের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, তখন তোমরা শোকে আকুল হইয়া উঠিলে। সে দিবারাত্রি আমার নিকট থাকিত, আসন্ন মরণের যন্ত্রণায় সে যখন অস্থির হইয়া উঠিত, তখন সে তাহার মাতাকে ছাড়িয়া আমার নিকটে আসিত। আমি তাহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতাম, তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতাম; আমি মনে কষ্ট পাইব বলিয়া সেই অবোধ শিশুও ক্ষণেকের জন্য শান্ত হইল, কিন্তু মৃত্যু-যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিলে কাঁদিয়া উঠিত।

তোমাদের সংসারে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছি, বহুকালের অভ্যস্ত কার্য্যগুলি ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে লইয়া যখন এদেশ ওদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতাম, নির্ব্বোধ

পিতা মাতা তোমরা ভাবিতে যে, তোমাদের শিশু কন্যা ভাল আছে, কিন্তু হাবু, তাহার যন্ত্রণা অপেক্ষা আমার যন্ত্রণা অধিকতর অসহ্য হইয়াছিল। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলাম, যে, তিল তিল করিয়া মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিতেছে; তাহাকে প্রাণপণে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া আছি, অথচ কাহার অদৃশ্য শক্তি আসিয়া তাহাকে আমার বুক হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। আমার দেহের, আমার মনের, আমার হৃদয়ের, আমার বাহুর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া তাহাকে রাখিতে পারিলাম না, তাহার যন্ত্রণার কণামাত্রও শান্ত করিতে পারিলাম না। হাবু, ইহা অপেক্ষা অসহ্য যন্ত্রণা জগতে আর কিছু আছে কি না বলিতে পারি না।

সকলে মিলিয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, সে চলিয়া গেল। তাহার ক্ষুদ্র দেহখানি বস্ত্রের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া যখন গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল, তখন সে গৃহে আমি আর তিষ্ঠিতে পারিলাম না। ত্রিশবৎসর পরে তোমাদের সংসার পরিত্যাগ করিলাম। মনে হইল যেন সমস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া গেছে, আর কেন থাকিব, কিসের জন্য থাকিব? তখন তোমাকে মনে পড়িল না, হাবু, তুমি আমার বুকের একখানি পঞ্জর, তোমাকে রাখিয়া আমি মরিতেছি, বড়ই শান্তিতে মরিতেছি, কিন্তু তখন তোমাকেও মনে পড়িল না। কোথায় যাই, কোথায় গেলে শান্তি পাই, এই কথাই মনে হইতে লাগিল। বহুকাল পরে দেশের কথা মনে পড়িল, তোমাদের বাড়ী আসিয়া অবধি দেশে যাই নাই, দেশে আপনার বলিতে যাহারা ছিল তাহারা বহুকাল চলিয়া গিয়াছে! হাবু, মৌলিকে হারাইয়া দীর্ঘকাল পরে দেশে ফিরিলাম।

দেশে আসিলাম, বহুকাল পরে দেশে আসিয়া দেখিলাম যে পৈতৃক ভিটায় বন জন্মিয়াছে, কেহই নাই। আত্মীয় কুটুম্ব আমাকে প্রথমে চিনিতেই পারিল না, তথাপি দেশেই রহিয়া গেলাম। তোমার পিতার তোমার পিতামহের সেবা করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার অবশিষ্ট দিনগুলা স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতে পারিত। সেই অর্থের সন্ধান পাইয়া জ্ঞাতি কুটুম্বের দল আমাকে পাইয়া বসিল; সকলেই বলিতে আরম্ভ করিল, বিবাহ করিয়া সংসারী হও। আমি যে তখন সীমান্তে আসিয়াছি তাহা কেহ দেখিয়াও দেখিল না।

পরেশ ঘোষ আমার প্রতিবাসী, তাহার পিতা আমার খেলার সাথী ছিল। তাহার কন্যাটির বিবাহের বয়স হইয়াছিল, তাহার মুখখানি দেখিতে

ঠিক মোলির মত। অবলম্বনহীন জীবন সাবলম্বন করিয়া তুলিব ইহাই অভিপ্রায় ছিল। পরেশের কন্যাকে পাঁচশত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়া বধূ ঘরে আনিলাম, সে কেবল তাহার মুখখানি মোলির মত বলিয়া। মোলি যে দিন যায় সে দিন সে দারুণ যন্ত্রণায় মুখে "মা, মা," বলিয়া ডাকিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার রোগশীর্ণ রক্তশূন্য তপ্ত মুখখানি কেবল আমার বুকেই লুটাইতেছিল। ভাবিয়াছিলাম তাহাকে পাইয়া ভাবিব মোলি ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই জন্যই বিবাহ করিয়াছিলাম।

তাহার মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, আমি যেন যাদুকরের মায়ায় মোহিত হইয়া পড়িলাম। চারিদিকে ঐখানে সে বসিয়া থাকিত, সে দাঁড়াইতে শিখিয়াছিল, কিন্তু দুর্ব্বল বলিয়া দাঁড়াইতে পারিত না, ক্রমশঃ সে দাঁড়ান ভুলিয়া গিয়াছিল। বারান্দায় ঐখানে সে বসিয়া থাকিত। আমি যদি কোন কারণে কোথাও চলিয়া যাইতাম, তাহা হইলে তাহার নিষ্প্রভ কাতর নয়ন দুইটি আমাকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইত, আমি আসিলে তাহার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুইখানিতে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিত। ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত ঐ বুঝি সে বসিয়া আছে,—আমি চলিয়া গিয়াছি বলিয়া তাহার কাতর নেত্রদ্বয় আমাকে বুঝি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ঐ সে বসিয়া আছে, ঐ সে আমাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল—না। ছায়া? তাহার ছায়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। সে আবার আসিবে মনে করিয়া বসিয়া থাকিতাম। তাহার মোহ-মদিরা আমাকে দিবানিশি মত্ত করিয়া রাখিত। এমনি করিয়া কিছুদিন কাটিয়া গেল। দেশ হইতে পরেশ ঘোষ পত্র লিখিল যে তাহার কন্যাকে অধিকদিন পিত্রালয়ে রাখা উচিত নহে, জ্ঞাতি কুটুম্বেরা নিন্দা করিবে।

তখন বড়ই বিপদে পড়িয়া গেলাম, কোথায় থাকি? কোথায় যাই? শুষ্কমুখে বারান্দায় বসিয়া থাকিতে দেখিতাম, প্রতি প্রভাতে তাহার কাতর নিষ্প্রভ নেত্রদ্বয় আমাকে যেন বলিত "আমাকে ছাড়িয়া যাইও না, আমাকে, আর কেহ ভালবাসে না, আর কেহ দেখিতে পারে না। আমি আর অধিকদিন এখানে থাকিব না, এখন আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।" দুই একদিন অন্তর পরেশ পত্র লিখিতে লাগিল "আমার কন্যাকে লইয়া যাও, লোকে নিন্দা করিতেছে।" অবশেষে তোমাদের ছাড়িয়া দেশেই ফিরিলাম।

দেশে আসিয়া নূতন করিয়া সংসার পাতিলাম, স্ত্রী লইয়া আসিলাম,

তোমরা ভাবিলে যে পুরাতন ভৃত্য বিনা কারণে ছাড়িয়া গেল। প্রথম প্রথম দিন কতক মন্দ কাটিল না। যাহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম তাহাকে মোলি মনে করিয়া মোলির মতই তাহাকে পালন করিতাম, শূন্যহৃদয় পূর্ণ হইত, সে বিশ্রী বিষম অভাবের ভাব দূর হইয়া গিয়াছিল। বেশ ছিলাম, মনে করিতাম ক্রমে মোলি বড় হইয়া উঠিয়াছে, সে মরে নাই, সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই, সে আমারই আছে, আমার নিকটেই আছে।

কিন্তু তাহার বয়স যত বাড়িতে লাগিল, যৌবনশ্রী ফুটিয়া তাহার মুখ-শ্রী ততই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল। মোলির মুখের যে ছায়াটুকু তাহার মুখে দেখিতে পাইতাম, তাহা যেন ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন আর আমার তাহাকে ভাল লাগিত না। ধীরে ধীরে তিল তিল করিয়া সে আমার মন হইতে দূরে, বহুদূরে সরিয়া গেল। মন তখন, আবার বহুদিন পরে মোলির অভাব অনুভব করিতে লাগিল। সে আমার স্ত্রী; যখন প্রসাধনসুন্দর নবপুষ্পিত যৌবন-শ্রী লইয়া কান্তের কামনা করিত, তখন আমি ভাবিতাম যে সে কলিকাতায় তোমার গৃহের বারান্দায় বসিয়া নিষ্প্রভ কাতর নেত্রে আমার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছে। এই ভাবে এক বৎসর গেল, দুই বৎসর গেল, কিন্তু এমন করিয়া কতদিন চলিতে পারে? একদিন শূন্য অথচ জনাকীর্ণ গ্রাম্যপথ, শূন্য শব্দ মুখরিত দিগন্তে ঘুরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, গৃহ শূন্য।

শূন্য গৃহ দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল যে, সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে যেন আমাকে লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, আমি যেন কারাগারে আবদ্ধ ছিলাম। সে চলিয়া গিয়াছে, আমি মুক্ত। আমার কারাগৃহ রক্ষীহীন, মুক্তির যে কি অপার আনন্দ, তাহা তুমি কি বুঝিবে? সে চলিয়া গেল, তখন আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব যাহারা দয়া করিয়া আমার চরণে লৌহ-নিগড় পরাইয়া দিয়াছিল, তাহারই প্রথমে অস্ফুটস্বরে, তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। আমি তখন বিপুল হরষে হরষিত, আমি তাহা গ্রাহ্য করিতাম না।

আরও একবৎসর কাটিয়া গেল। কে যেন অলক্ষিতে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অদৃশ্য ব্যক্তি আমাকে কোথায় কোন্ দেশে লইয়া যাইতে চাহে তাহা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু কে আমাকে ডাকিতেছে, কে আমাকে টানিতেছে, কে আমাকে কোথায় লইয়া যাইতে চাহে, ইহা অনুভব

করিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইত, কেন হইত তাহা বলিতে পারিনা। আরও এক বৎসর পরে আর দেশে থাকিতে পারিলাম না, তোমার নিকট চলিয়া আসিলাম।

তোমার সঙ্গে কত দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু কোথাও শান্তি পাইলাম না, অদৃশ্য তখনও আমাকে অজ্ঞাত দেশে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিত। যেদিন বৃন্দাবনে আসিলাম, তুমি ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলে। সেদিন বড় গরম, আমি বাহিরে বেড়াইতে গেলাম। বৃন্দাবনের সঙ্কীর্ণ দীপালোকিত গলিপথে বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় দেখিলাম একদল বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আরতি দেখিয়া ফিরিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে একজনের মুখ দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলাম, তাহার মুখ মোলির মত; কিন্তু সে ত মোলি নয়? কিন্তু তাহার মুখ পরিচিত! সেই—সে!

তাহার সঙ্গে, তাহার ক্রোড়ে একটি ক্ষুদ্র শিশু, সে তাহাকে মা বলিয়া ডাকিল। সে আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, আমি পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলাম। সে যখন কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গেছে, তখন আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। সেই জনাকীর্ণ দীপালোকদীপ্ত পথ দিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত জাগ্রত অবস্থায় চলিতে লাগিলাম। নগর ছাড়িয়া, রাজপথ ছাড়িয়া তাহারা জ্যোৎস্না-ধৌত গ্রাম্যপথ অবলম্বন করিল। দুই দিকে নবকর্ষিত ক্ষেত্র ধীরভাবে গোধূম শীর্ষের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা সুষুপ্তিমগ্ন স্নিগ্ধ শান্ত গ্রামপ্রান্তে আসিয়া পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, আমি তখনও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলাম। এতক্ষণ সে পিছন ফিরিয়া চাহে নাই, তাহার সঙ্গিনীগণের সহিত কথা কহিতে কহিতে পথ চলিয়া আসিয়াছে। একা পড়িয়া সে বোধ হয় পদশব্দ শুনিতে পাইল, শুনিতে পাইয়া সে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল, আমি তখন দশ পদ দূরে।

সে আমাকে চিনিতে পারিল, চিনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে পথের মাঝে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; তাহার পরে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার শিশুও কাঁদিয়া উঠিল, আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার মুখ ঠিক মোলির মত; যৌবনোদ্গমে যে আকৃতিগত সাদৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, মাতৃত্বে তাহা আবার ফিরাইয়া আনিয়াছে। চন্দ্রালোকে তাহাকে অবিকল আমাদের মোলির মত দেখাইতেছিল। তাহাকে কেবল নিমেষের তরে দেখিয়াছিলাম,

তাহার পরেই সে তাহার কুটীরে প্রবেশ করিয়া অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল। আমি ফিরিলাম।

সেখানে আমার কোন আবশ্যক নাই বলিয়াই ফিরিলাম। তখনও স্বপ্নাবিষ্টের মত চলিতেছি, কোথায় যাইতেছি তাহা বলিতে পারি না। তখন আমার মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট বা দুঃখ হয় নাই, কেন তাহা বলিতে পারি না। চারিদিকে জনশূন্য প্রান্তর; শরদিন্দুকিরণধবলিত চারিদিকে কি বিশাল নীরবতা, শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর ধ্বনিও কাণে আসে না। কতক্ষণ চলিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। অনেকক্ষণ পরে দেখিলাম সম্মুখে পথ রুদ্ধ, তখন কেশবের পুরাতন মন্দিরের সম্মুখে আসিয়াছি।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছি, মথুরা নীরব নিস্তব্ধ। আর চলিবার ক্ষমতা নাই, অন্ধকারে পুরাতন জনশূন্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। রাত্রি তখন কত হইবে? বোধ হয় তৃতীয় প্রহর শেষ হইয়া আসিয়াছে। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, তাহাকে দেখিয়া হৃদয় আঘাত লাগিয়াছিল, মন তাহাতে জড় হইয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল।

সে—সে আমাকে ছাড়িয়া আসিয়া সুখে আছে, সে নূতন সংসার পাতিয়া বসিয়াছে, সে তাহার কলঙ্ক ভুলিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছে, আমাকে তাহার কোনই আবশ্যক নাই। সে—সে—তাহার মুখখানি মোলির মুখের মত। আমি ত সেই জন্যই তাহাকে চাহিয়াছিলাম—কিন্তু সে যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—তখন আর আমি তাহাকে চাহি নাই। আমাকে দেখিয়া সে চিনিয়াছে, সে বুঝিয়াছে আমি তাহাকে চিনিয়াছি। তাহার নূতন সংসার টলিয়াছে, তাহার সাধের গৃহ এইবার তাসের ঘরের মত পড়িয়া যাইবে। তাহার মুখের ভাব কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে, তাহার নয়নদ্বয়ে সেই সেই পুরাতন নিষ্প্রভ কাতর নেত্রের করুণ চাহনির ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে,—মোলির মত—সে আবার মোলির মত হইয়াছে।

না। আমি যাইব না—তাহার কাছে যাইব না, তাহার পথভ্রান্তির কথা জগতে প্রকাশ করিব না, তাহা হইলে তাহার শিশুকে লোকে জারজ বলিবে—সে মনে ব্যথা পাইবে, আবার তাহার নেত্রদ্বয়ে অসহায়তার কাতর ভাবটি ফুটিয়া উঠিবে।—না—আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না, আমি তাহা দেখিতে পারিব না—আমি যাইব না।

যেমন এই কথাটি মনে আসিল অমনি মনে হইল যে মন্দিরের অন্ধকারে কে যেন হাসিয়া উঠিল। আবার কে হাসিয়া উঠিল—সে হাসি কাহার? তাহা যেন কোথায় শুনিয়াছি।—কাহার?—কাহার?—কে সে? সে যখন তোমার গৃহের বারান্দায় বসিয়া থাকিত, যখন সে অসহায়ের মত চারিদিকে অন্বেষণ করিত, তখন আমাকে দেখিতে পাইলে এমন করিয়াই হাসিয়া উঠিত। এ যে তাহারই হাসি—আমি অনেকদিন শুনি নাই বলিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

সে আবার হাসিয়া উঠিল—সেইবার দিক্ ঠিক করিলাম! সে যে উপরের বারান্দায়? কেমন করিয়া উপরে উঠিলাম, তাহা বলিতে পারি না, উপরে উঠিয়া দেখিলাম, সেই—সে—সেই হাসিতেছিল—সেই মোলি। সে ত—মথুরা নয়—সে কলিকাতায় তোমার গৃহের বারান্দা—সে পূর্ব্বের মত সেইখানে বসিয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার পরে সে একটা গোলাপী মেঘে ভাসিয়া উঠিল। অন্ধকার দূর হইয়া গেল—ঈষৎ রক্ততামরসবর্ণ স্নিগ্ধ আলোকে জীর্ণ মন্দির পূর্ণ হইয়া গেল—মেঘের উপরে বসিয়া সে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আহ্বান করিতে লাগিল, সে যখন ভ্রমণ করিতে যাইত, তখন যেমন করিয়া আহ্বান করিত, তেমনি করিয়াই ডাকিল। হাবু, আমি আর থাকিতে পারিলাম না, তাহার জন্য আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, আমি তাহার রক্তাভ মেঘ ধরিয়া তাহার সঙ্গে তাহার নূতন দেশে যাত্রা করিলাম। ইহাই কৃষ্ণের শেষ কথা।

মহারাণী! কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছে, মোলির নিকটই চলিয়া গিয়াছে। আমি জানিতেছি যে পত্র পড়িয়া তুমি কাঁদিবে, তোমার তাহার কথা মনে পড়িবে, তথাপি লিখিলাম। কাল দেশে ফিরিব, টলি, বড় খোকা ও ছোট খোকাকে বলিও যে তাহাদের জন্য কিছু কেনা হইল না। মঙ্গলবার সকালবেলায় বাড়ী পৌঁছিব।

তোমারই
পুরাতন
পমি।

শ্রীকাঞ্চনমালা দেবী।

কর্ণ

(১)

মাতৃবক্ষ পরিত্যক্ত অভাগা সন্তান
হায় কর্ণ; শৌর্য্য-রাজ্য যশোধন মান
কিছুতে ছিলনা তৃপ্তি বিরহ বিধুর
তব শূন্য হৃদয়ের, হাহাকার দূর
হয় নাই কোন দিন, হায় অভাজন
মাতৃস্তন্য-পীযূষ-বঞ্চিত; অনুক্ষণ
তৃষাতুর বক্ষে তব তাই ঈর্ষ্যানল
জ্বালিয়াছে দীপ্তবহ্নিশিখা অচঞ্চল
মরু-মরীচিকা সম, অব্যর্থসন্ধান
তাই ব্যূহমুখে তব হিংসাক্ষিপ্ত বাণ
অভিমন্যু-হৃদয়ের তরুণ রুধির
পান করেছিল সুখে, কর্ত্তব্যে বধির
বিমুখ স্নেহের করি' সর্ব্ব অবিচার
প্রতিশোধ; পূর্ণ করি' বিধি বিধাতার।

(২)

পিতৃধনে ধনী তুমি ওগো মতিমান্
দাতাকর্ণ নাম ধর, তপন সমান
তব দান নির্ব্বিচার, ধনী দীন জনে
তৃপ্ত করিয়াছ তুমি অকুণ্ঠিত মনে
মুক্ত হস্তে, সমদৃষ্টি তাঁহারি মতন
সূত অধিরথে তাই ভক্তিনম্র মন
পূজিয়াছ অনুদিন, ধাত্রী মাতৃকায়
পুত্রের অধিক স্নেহে যতনে সেবায়
দিয়াছ গৌরব, দৃপ্ততেজে পূর্ণ হিয়া
রক্ষার কবচ খুলি শক্রকরে দিয়া
ক্ষুণ্ণ নহ তবু, পুত্রে দিলে বলিদান
রাখিতে অতিথিরূপী দেবতার মান
হাস্যমুখে, কর্ণ তুমি তপনতনয়
ধর্ম্মসম মৃত্যুঞ্জয়ী অশোক নির্ভয়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

কাশী-স্মৃতি।

সাহিত্যিক উদ্দেশ্য লইয়া কাশীতে যাই নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে গলিতে গলিতে যেন একটা প্রাচীন ভাবরাজ্যের আব্-হাওয়ার ঈষৎ কম্পন অনুভূত হইত। ঘাটের পর ঘাট, মন্দিরের পর মন্দির, মানুষের গায়ে মানুষ যেন ধাক্কা দিয়া চলিয়াছে;—হঠাৎ ভ্রম হয় যেন এমনিতর অনাদিকাল হইতে চলিয়াছে, সমস্ত দৈনন্দিন সংসারকে দুই হাত দিয়া সরাইয়া দিয়া চলিয়াছে। সহরের বুকের উপর,—বড় রাস্তার মাথায় খৃষ্টানের প্রকাণ্ড গির্জ্জা যেন এই জীবনস্রোতের মাঝখানে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যেন এখানে তার করিবার কিছুই নাই, নূতন বাণী শুনাইবার কিছু নাই। প্রাচীন বিশ্বেশ্বর-মন্দির ভাঙ্গিয়া কালাপাহাড় যে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া-

ছিল, তাহাও কক্ষচ্যুত উপগ্রহের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে মাত্র! মুসলমান হার মানিল, খৃষ্টান সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

রেলিংএ ঘেরা জ্ঞানবাপী। কালাপাহাড়ের কবল হইতে রক্ষা করিয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ নিমজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ আবার তাহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চিরদিনইত আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ জ্ঞানবাপীর পার্শ্বে একাগ্রচিত্তে তপশ্চরণ করিয়া আসিতেছেন। গুহামধ্যে অবস্থিত 'রসো বৈসঃ'; সাধনা পূর্ণ হইলে তাঁহাকে আবিষ্কার করা যায়। যুগে যুগে এই রকমই হইয়া আসিয়াছে। আজও ব্রাহ্মণ সেই সনাতন সত্যটি আঁকড়িয়া ধরিয়া আছেন।

অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের দ্বৈতাদ্বৈত রহস্যে কাশীধাম পরিপূর্ণ। মানববুদ্ধি মনীষা (intellect) এক্ষণে সচকিত, পরাভূত; তাহার পিছনে যে নিত্য-বস্তু—যে চিরজাগ্রত ভাবুক আত্মা (spirit)—আছেন, তিনি আজ চঞ্চল।

সন্ধ্যার ঘনান্ধকারে শরতের পরিপূর্ণ গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়া চলিয়াছে। সারি সারি সারি জ্বলন্ত প্রদীপ বক্ষের উপর ভাসিতেছে। বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা গঙ্গা;—মানুষ এখানে এই তিনে-এক, একে-তিন, দেবতাটিকে পূজার অর্ঘ্য দিতেছে। অন্নপূর্ণা ও গঙ্গা এখানে সতীন। কিন্তু সেই গানটি মনে পড়ে। মাতা মেনকাকে কন্যা অন্নপূর্ণা বলিতেছেন—

হর আমায় হৃদে রাখে,
সে জটায় লুকায়ে দেখে;
সে আমার প্রিয়তমা সুখের সুখিনী,
তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনী

এ সব হয়ত কেবলমাত্র ভাবের উচ্ছ্বাস। উপায় নাই;—বুদ্ধির বিচার (intellect) এখানে পরাভূত।

কিন্তু অনতিদূরে, সারনাথে, মনীষা (intellect) জাগ্রত হইয়া কৌতূহলী হইয়া উঠে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার ইতিহাসের যবনিকা যেন একটু সরিয়া যায়। অসংখ্য স্তূপ পরিবৃত অশোকস্তম্ভ, বৌদ্ধমঠের চিহ্নবিশেষ আরও কত কি পাঁচঘণ্টা ধরিয়া দেখিলাম। প্রতীত্য সমুৎপাদ-তত্ত্বের আবিষ্কারের পর যখন বুদ্ধদেবের সম্বোধিলাভ হইল, তখন তিনি পৃথিবীকে সাক্ষী রাখিবার জন্য অঙ্গুষ্ঠ দিয়া পৃথিবীস্পর্শ করিলেন। যাদুঘরে (museum) এর মধ্যে সেই ভূমিস্পর্শ মুদ্রার একখানি প্রতিকৃতি আছে।

কাশীতে গেলে একটি কথা বড় বেশী করিয়া মনে পড়িতে থাকে। যে পবিত্রতার পুণ্যস্মৃতি (sacredness)এর (idea) ভাব য়ুরোপে নাই বলিয়া আজ সেখানে মহাপ্রলয়—সেখানে ধর্ম্ম (church) জীবন (life) আত্মসম্মান (honour) কিছুই শ্রদ্ধাযোগ্য (sacred) নয়—সেই জিনিষটার আভাস এখনও আমাদের তীর্থস্থানে অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে অতিরিক্ত মাত্রায় মর্য্যাদা দান করিয়া গল্পচ্ছলে ইউরোপীয় ছাঁদে নরনারী চিত্র আঁকিতেছেন উহা এ সমাজের পক্ষে হিতকর কি না কে জানে ? তাহাতে ভাঙ্গা যায়, জোড়া যায় না। যে পাদপে বিংশ শতাব্দীর বাংলায় সবুজ পত্র গজাইতেছে, সেই পাদপের মূল শত শতাব্দীর নিম্নতম স্তরে প্রোথিত। যুগে যুগে কত সবুজ পত্র তাহাতে গজাইয়াছে, পীত পত্রে পরিণত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার খবর কে রাখে ? সেই পাদপের তলে কত ঋষির আশ্রম, কত গুরুশিষ্য সংবাদ, কত হোমধেনু, আশ্রম মৃগ ঋষিবালক ও ঋষিকুমারীর মিলন, কত রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষির অভ্যুদয় ও তিরোভাব ! তখনকার সবুজপত্র বিদ্রোহী হইয়া গজাইত কি ? অথবা —

'সুখ সুপ্তি দিত আনি'
ঝর্ঝর পল্লবদলে করিয়া বীজন
মৃদু স্বরে' ?

শারদ পূর্ণিমায় কলকলনাদিনী উত্তরবাহিনী গঙ্গার তটে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া সেই সুখসুপ্তির রসাস্বাদ করা যায়।

অসংখ্য নরনারীর কলকণ্ঠস্বরে মুখরিত ঘাট হইতে বিশ্বেশ্বরের অন্নপূর্ণা মন্দিরের আরতিতে লোকসমাগম দেখিলে মনে হয় যেন মদনভস্মের পর একটা স্ত্রীপুরুষভেদবিরহিত মানবাত্মা (sexless) ধূর্জ্জটিজটাভ্রষ্ট গঙ্গোদকে অবগাহন করিয়া মহাযোগী বিশ্বেশ্বরের দ্বার হইতে অন্নপূর্ণা-মন্দিরে যায় ; এবং সেখানে ফুলবিল্বদলের নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া মহাদেবের সহিত একাত্ম হইতে চাহে।

শ্রীতীর্থযাত্রী।

উল্কা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

সেদিন হইতে শৈলেন আমায় আর লক্ষ্মী সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু আমার পাপিষ্ঠ মনটা তাহার চেয়েও বোধ হয় আমার বেশি শত্রু ; তাই সে সেই দিন হইতে যখন তখন আমার মধ্যে সেই এক অতীত দিনের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া কত কি যেন অবোধ্য অস্পষ্ট ভাব, ভাষা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। যখন পূর্ব্বে লক্ষ্মীকে দেখিয়াছিলাম, তাহার দুঃখে সহানুভূতি করিয়াছিলাম, তাহার রূপের প্রশংসা করিয়াছিলাম, নারী মূর্ত্তি কল্পনায় মন তাহাকেই যেন আদর্শ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল ; কিন্তু তা ছাড়া আর কিছুই ত নয়। কিন্তু সে দিন শৈলেনের ঘটকালীর পর, তাহার সম্বন্ধটা যেন কতকটা বদল হইয়াছিল। এখন গীতাপাঠ শেষে হঠাৎ এক সময় হয় ত মনে হয় এই বইটইগুলা গুছাইয়া রাখিবার একজন থাকিলে, বড় মন্দ হইত না। পূজার ফুল সাজাইয়া দিতে থাট থাট শুভ্র আঙ্গুলগুলি বেশ মানায়! এমনি এমনি একটা আবছায়ার মত তরুণ কল্পনা মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে গেলে যদিও মার খায়, তবুও সেটা স্কন্ধে ভর করা ভূতের মত সঙ্গ ছাড়িতে রাজী হয় না।

শৈলেনেরও এ ক্ষেত্রে কিছু অপরাধ ছিল। আমি তাহাকে বিবাহ করিতে না হয় সম্মত হই-ই নাই ; তা বলিয়া তাহার কথা শুনিতেও ত আমার কোন বাধা থাকিতে পারে না ; আর তাহাকে কিছু বলিতেও মানা করি নাই। তবে হঠাৎ একবার করিয়া আমাকে বিবাহের বর সাজাইয়া দিয়াই পরক্ষণ হইতে তাহার কোনও কথা সম্বন্ধে একেবারে জিহ্বা বন্ধ করিয়া ফেলিল কেন? বোধ হয় সে আমার বিরক্তির ভয় করিত? সে হয় ত মনে করিয়াছিল, বারে বারে এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে আমি এখানে থাকিতেই চাহিব না। ভালই করিয়াছিল বোধ হয়। কিন্তু তাও ঠিক বলিতে পারি না। যেখানে তোষামোদ থাকে সেখানেই অনিচ্ছা। সেটি ফুরাইলে অনিচ্ছাও সঙ্গেসঙ্গে ফুরায়। শৈলেন অনেক লেখা পড়া শিখিয়াছে, বড় কাজও সুখ্যাতির সহিত সম্পন্ন করিতেছে ; কিন্তু এ সব শিখিলে কি হইবে, মানব-প্রকৃতির গুপ্তরহস্য সে কোনদিনই আমার মত সূক্ষ্মদর্শন—শক্তি

প্রয়োগ দ্বারা অনুধাবনপূর্ব্বক পাঠ করে নাই। এ বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতার লেশও ছিল না। আমি তাহার এই মানব চরিত্রানভিজ্ঞতার জন্য মনে মনে কয়দিন তাহার উপর একটুখানি অসন্তুষ্ট হইয়া রহিলাম। আমি হইলে আমার কখনও এমন-ধারা ভুল হইত না! আমি ঠিক বুঝিতে পারিতাম যে, বিবাহ করুক আর নাই করুক, মনে মনে সে লক্ষ্মীকে যে প্রশংসা না করে, তাহার সম্বন্ধে দু একটি কথা যে, জানিতে ইচ্ছুক হয় না এমন কখনও হওয়া সম্ভব নয়। অন্যের সহিত আমার ঠিক্ এইখানেই প্রভেদ! এই জন্যই আমার সহিত কাহারও মনের মিল হয় না। শৈলেন্দ্রের সঙ্গে আমার মনের মিলের সীমা ছিল না, কিন্তু মতের মিল যে নাই, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

এমন করিয়া দিন যাইতেছিল, আমারও সেদিনকার আলোচনা বড় একটা আর স্মরণ ছিল না। আজকাল সূক্ষ্ম শরীরের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে আমাদের ঘন ঘন আলোচনা চলিতেছিল। শৈলেন অবিশ্বাসের হাস্য আমার রোখ চড়াইয়া দিয়াছিল। আমি প্রাচ্য পাশ্চাত্য লিখিত অলিখিত সমুদয় সম্মানিত অসম্মানিত ব্যক্তিগণের বর্ণিত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, নিজের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলাম। আজকাল কালের সবটুকু সময় এই এক তর্কেই কাটিয়া যায়। আমি স্থূল শরীরত্যাগী-সম্বন্ধে বিবিধ অদ্ভুত কার্য্য প্রণালীর বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। যে জীবিতাবস্থায় যে বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ-সম্পন্ন বা বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন থাকে মৃত্যুর পর তাহার অপঞ্চিকৃত সূক্ষ্ম ভৌতিক শরীর প্রবল শক্তি লাভ পূর্ব্বক জীবিতের পক্ষে অসম্ভব সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, এ সম্বন্ধে আমি অনেক বড় বড় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরও মত প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করি নাই। শৈলেনের মতে সেই বিখ্যাত পণ্ডিত-গুলির মস্তিষ্ক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনুশীলনের যোগ্য হইয়াছে। সে কেবলি হাসে ও বিপরীত যুক্তি বাহির করে। ইহার মধ্যে একটা যুক্তি এই যে, সূক্ষ্ম শরীর স্থূলের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং কর্ম্ম-ক্ষমতা লাভ করিতে পারে না। ইহারা সম্পূর্ণ ভাবেই পরস্পরাশ্রয়ী।

একদিন এই আলোচনার মুখে তড়িতা হঠাৎ হাসিয়া কহিলেন "আমি মরে যদি সূক্ষ্ম শরীর হয়ে বেড়াই, তা হলে কি করি, জান ঠাকুরপো?"

এ কথায় তিনি আমার সপক্ষতা বা বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন বুঝিতে না পারিয়া আগ্রহ বা অনাগ্রহশূন্য এমনি আলগা ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম "না, কি কর?"

"তা হলে আমি আমার এই বাসার মধ্যে অদৃশ্যভাবে, বাস করি, না যাই স্বর্গে, না যাই নরকে। লোকে আমায় দেখতে না পেলেও আমি সবাইকে দেখতে পাই, সব শুন্‌তে, সব জান্‌তে পারি! আঃ, তা হলে কি যে আমার সুখ হয়, সত্যি ঠাকুরপো! আমি তাহলে তোমায় কত যে তখন আশীর্ব্বাদ কর্ব্বো।" বলিতে বলিতে তাঁহার হাসি মুখখানি যেন একটা আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীর দিকে হর্ষবিকশিত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন "কিন্তু যদি দেখি তুমি আমার জন্য অত্যন্ত কাতর হয়ে আছ, অথচ আমি তোমায় জানাতে পারব না যে আমি কোথাও যাইনি এই এইখানেই তোমার কাছেই আছি, তা হলে কি ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে? সেই ভেবেই যা ভয় হয়, না হলে, হ্যাঁ ঠাকুরপো! সূক্ষ্মশরীরধারীরা কি মানুষের মত কথা কইবার শক্তি পায় না?"

বউদিদি যে সবটাই তামাসা করিতেছেন না, সে পরিচয় তাঁহার জিজ্ঞাসার ধরণে ও কণ্ঠস্বরের ব্যগ্রতায়ই প্রকাশ পাইল। কিছুই আশ্চর্য্য নয়! একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, সকলকার সকল বিষয় বিশ্বাস করিবার শক্তি থাকে না। আমি তাঁহার সুবুদ্ধির পরিচয়ে শুধু তাঁহার পরেই নয়,—শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতি যে মাত্রায় বিরক্তি পোষণ করিতাম, তাহারও কতকটা বিস্মৃত হইয়া এই শ্রেণীর মহিলাদের উপরেও সন্তুষ্ট হইয়া, প্রথমে শৈলেনের দিকে চাহিয়া বলিলাম "মেয়েদেরও যদি বুঝাইয়া দেওয়া যায়, দেখিতেছি, অনেক পুরুষের চাইতে তাঁরা বেশি বুঝিতে পারেন।" গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলাম "তা যাবে না কেন? খুব যায়। তবে শুনিয়াছি সে ভাষা ঠিক এই জীবিত আমাদের মত হয় না।"

তড়িতা হাসিয়া স্বামীর ব্যথিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন "তবে আমি মরেও তোমার কাছ-ছাড়া হব না; সে বেশ হবে।"

আমি তৎক্ষণাৎ একটু ব্যঙ্গ করিলাম, এরূপ ব্যঙ্গ বোধ হয় সাধারণ লোকে সচরাচর করে না; কিন্তু আমার মতে, সত্যের আভাষ সকলেরই দেওয়া চলে, ইহাতে সঙ্কোচ করিবার আবশ্যক দেখি না। "কহিলাম আর যদি দেখ ঘরে সতীন আসিয়াছে?"

এই কথায় অকস্মাৎ তড়িতার সহাস্য মুখে, বেত্রাহতের মুখের মত যন্ত্রণা, ভয়ের আর্ত্ত চিহ্ন যেন প্রকট হইয়া উঠিল। সে চমকিয়া স্বামীর দিকে করুণ চক্ষে চাহিয়া, ভীত শিশুর মতই তাহার দিকে একটুখানি সরিয়া

গেল। যেন আততায়ীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটা দারুণ ব্যাকুলতা সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে একেবারে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। শৈলেন্দ্রও শিহরিয়া বিবর্ণমুখে স্ত্রীর ভয়ার্ত্ত মুখের দিকে চাহিল। তারপর সে ক্ষোভ ও ব্যথার সহিত আমার দিকে ফিরিয়া কহিয়া উঠিল "ও সব কথা ছেড়ে দাও তোমরা। তড়িৎ বেশ ভালই জানে, সে ভয় তার নাই। তাছাড়া সে আমায় ছেড়ে যেতেই পারবে না। কোথায় যাবে? না না, সে যে আমার সর্ব্বস্ব! এ পৃথিবীর সবটুকু আকর্ষণের হেতুই যে আমার তড়িৎ। না ভাই, ও রকম কথা আর আমি কখনও তোমাদের কইতে দিব না।"

বৌদিদির 'সপত্নী'-সম্ভাবনার স্মৃতিতেও এত বড় বিচলিত ভাব দেখিয়া আমিও নিজের অসাবধানতায় কতকটা লজ্জা পাইয়াছিলাম। তাঁহার এ সম্বন্ধে এত বড় অসহ্য ভয় ভাবনা আমায় বিস্মিতও করিল। মৃত্যুর পর তাঁহা-হীন গৃহেও নারীর প্রবেশ-কল্পনা, তাঁহার স্বামীর প্রতি অপরের অধিকার স্থাপন-চিন্তা, এটুকুও তাঁহার প্রাণে সহে না! কি প্রবল সপত্নী-বিদ্বেষ স্ত্রীলোক পোষণ করে! যাক্ এ আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত করা গেল। কিন্তু তাহার পরও দু' একদিন পর্য্যন্ত যেন বৌদিদিকে কেমন অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল। বোধ করি তাঁহার দুর্ব্বল বক্ষ প্রবল স্পন্দনের বেগে অনেকখানি দমিয়া পড়িয়াছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কখনও কোন মেয়েমানুষের সাক্ষাতে সতীনের কথা উল্লেখ করিব না।

শৈলেন সে দিন আমাকে মানিকতলাও দীঘির কেশব শিরোমণির সাগ্রহ নিমন্ত্রণ গ্রহণের সপক্ষে অশেনবিশেষে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন সে নিজেই একটু ক্ষুণ্ণমনে বাহির হইয়া গেল। বলিল "শিরোমণি আমার আশা করবেন; কেউ না গেলে তাঁকে অপমানিত করা হয়।"

যাইবার সময় আমায় আর কিছু বলিল না, কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতেই আমার মনে হইতেছিল, আচ্ছা না হয়, তা একবার যাওয়াই যাক; কিন্তু সে বুদ্ধিমান হইলেও এটুকু সূক্ষ্ম বোধশক্তি তাহার মধ্যে ছিল না যে, চিত্তরহস্যের এ গোপন লেখা পাঠ করিতে পারে।

শৈলেন চলিয়া গেলে মনটা একটু খারাপ হইয়া গেল। না হয় আমি

যাইব না-ই বলিয়াছিলাম, তা সে আর একটু জেদ করিলেও ত পারিত! শৈলেনের ঐ কেমন দোষ, সকল কাজেই ত্বরা!

একা একা খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আর ভাল লাগিল না। মনেও একটু কৌতূহল জাগিল, ভাবিলাম ইহাতে আর দোষই বা কি? মানুষ কি আর মানুষের বাড়ী বেড়াইতে যায় না।

দুপুরবেলা চারিদিকে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; দীঘির কালোজলে মাঝে মাঝে তালগাছের ছায়ার সঙ্গে রৌদ্র চিক্‌মিক্ করিতেছিল। কেহ কোথায়ও নাই। ছোট্ট শিব মন্দিরটির পাশে চালা ঘরখানিতে শিকল দেওয়া; একপাশে মাটির ডাবা'য় মাথা 'জাব' সামনে করিয়া একটি হৃষ্টপুষ্ট 'পাট-নায়ে-গাই', ড্যাবডেবে চোক মেলিয়া আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ইচ্ছা থাকিলেও হয়ত ভাষার অভাবে সে তাহাদের এই নূতন অতিথির অভ্যার্থনা করিতে সমর্থ হইল না।

বড় লজ্জা করিতে লাগিল। একবার ভাবিলাম এখনও আমায় কেহ দেখিতে পায় নাই, এই সময় না হয় ফিরিয়া যাই। কিন্তু ওই যে 'কিন্তু' শব্দটাই মানুষের চির বিঘ্ন।—সে বলিল, এতদূর আসিয়া শুধু ধূলা পায়েই ফিরিবে? শিরোমণির সহিতও না হয় দেখাটা করিয়া ফেল। মনও সায় দিল, বলিল "বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈত নয়। দেখা করার জন্য অপেক্ষা করিলে কিছুই দোষ হইবে না। বৃদ্ধের প্রতি আকর্ষণ, মোহ পদবাচ্য নহে।" কথাটা যুক্তিসঙ্গত। কাজেই রহিয়া গেলাম।

দীঘির তলা পর্য্যন্ত সানবাঁধান; চারিদিক বেড়িয়া বেড়িয়া বাঁধান সিঁড়ি। জল স্থির স্বচ্ছ, গভীর।

এদিক ওদিক ঘুরিয়া মানুষের সাড়া না পাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইলাম। মনে সন্দেহ হইল তবে বোধ হয় শিরোমণির বাসা এখানে নয়, আর কোনখানে; নইলে শৈলেনেরও ত এখন এখানে থাকা সম্ভব ছিল। ফিরিব মনে করিতেছি, এমন সময় কতকগুলো শর গাছের পিছনে ঝোপের পাশ হইতে মনুষ্য-কণ্ঠ শোনা গেল—'আমি তোমায় সুখী করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছি। কতদিন আর এ অবস্থায় দেখিব? বল লক্ষ্মী, না না তুমি আমায় কিছু সঙ্কোচ কর না। তুমি জান না লক্ষ্মী, আমি তোমায় সেই প্রথম দেখা থেকেই বড্ড ভালবেসেছি।"

এ কি শুনিলাম! এ যে শৈলেন্দ্রের গলা? সে লক্ষ্মীকে ভালবাসে? আমার

পিঠে কে যেন চাবুক মারিল। একি সত্যই আমি স্বকর্ণে শুনিলাম না আমার এ মিথ্যা কল্পনা? শৈলেন নিজের মুখে এই নির্জ্জন কানন মধ্যে অরক্ষিতা যুবতীকে বলিতেছে "তুমি জান লক্ষ্মি, আমি সেই প্রথম থেকেই তোমায় বড্ড ভালবেসেছি।" ছি ছি কি লজ্জার, কি পরিতাপের কথা! অমন দেবপ্রতিম শৈল, তার এই পরিণাম! এ শুধু তাহাদের আধুনিক শিক্ষা, সংসর্গ ও উচ্ছৃঙ্খলতারই ফল। তাহার দোষ কি?

কিন্তু সত্যই কি শৈলেন এমন হীন, এত নীচাশয় হইয়াছে! এ যে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না! সে যে পত্নীগত-প্রাণ! সেই অকৃত্রিম দাম্পত্য-প্রেমেও কি তাহার এত বড় চাতুরী থাকা সম্ভব? না, এ আমি কি ভাবিতেছি! সে সব কিছুই নয়। তবে এটাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শৈলেনের ন্যায় একজন যুবা পুরুষের পক্ষে এমন একাকী, নির্জ্জনে একজন তরুণীর কাণে ভালবাসার কথা শোনানটা ভাল দেখায় না।—তা সে ভালবাসা যেমনই হোক।

"কে মনু না?" বলিতে বলিতে শৈলেন সহাস্য মুখে সিঁড়ি নামিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল। বলিল "ওহে ও সব কাব্যের ভাবটাব আমার ঢেরজানা আছে। চলিত বাঙ্গালায় এরই নাম "পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ?"

তাহাকে একটুকুও অপ্রতিভ হইতে না দেখিয়া আমার কেমন বিরক্তি বোধ হইল, একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়া মানুষ তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইবে, আত্মগ্লানিতে মরিয়া যাইতে চাহিবে—তবেই সে ক্ষমার্হ; কিন্তু যে নিজের অপরাধ বুঝিতেও পারে না, সে অবিদ্যাগ্রস্থ, অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন-লোকে তাহার স্থান। আমি শৈলেনের জন্য মনে মনে কিছু দুঃখও অনুভব করিলাম। বলিলাম, দেখিতেছি আসিয়া ভাল করি নাই।"

"তা মন্দই বা কি করেছ? এসো, শিরোমণি মশাই কোথায় হঠাৎ এক প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণের ডাকে গিয়েচেন। তা তাঁর মেয়ে আছে; সে অতিথি সৎকারে কুণ্ঠিত হইবে না"—বলিয়া শৈল হাসিয়া ফেলিল।

অপর স্ত্রীলোক লইয়া যথেচ্ছ আলোচনার পোষকতা, আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। স্ত্রীলোক নিতান্ত কাঁচের ঠুন্‌কা বাসন; তাহা সন্তর্পণে তুলিয়া রাখিতে হয়; এ লইয়া সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করা কেন? রাগ করিয়া বলিলাম "যার যেমন রুচি। আমার মেয়েদের দোরে অতিথি হওয়া অভ্যাস নাই। চল্লাম।—"

"আপনি যেন না খেয়ে চলে যাবেন না, আমি দিদির কাছথেকে শিখে

আপনার জন্য সন্দেশ তৈরি করেচি।—" বৃক্ষান্তরাল হইতে যেন ভাস্কর-রচিত কনক-প্রতিমা এই কথা বলিতে বলিতে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূতা ও মূহূর্ত্তে আমার উপর দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তিরোহিতা হইয়া গেল।

সহসা অপ্রত্যাশিত আবেগে বিস্ময়ে, আর যে কিসে তা ঠিক বলিতে পারি না—আমার সর্ব্বশরীরে যেন রোমাঞ্চ হইয়া গেল। বুকের মধ্যে জোরে জোরে কে যেন নাড়া দিয়া দিল,—এমনই বেগে রক্তটা উছল পাছল করিতে লাগিল। মনে হইল যেন কোন অলৌকিক মূর্ত্তি যেন মানবী ভিন্ন আর কিছু এইমাত্র আমাদের সম্মুখে অকস্মাৎ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

এই সেই লক্ষ্মি! এই লক্ষ্মীকেই আমি সেদিনমাত্র প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম? তাহার বিবাহ জুটে নাই, সে বিধবা হয় নাই, বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলাম, ? না না বেশ হইয়াছে।—বিবাহের জন্য এ মেয়ের আবার ভাবনা কি? বলিলে আজই যে কত ভাল ভাল বর, সেকালের রাজাদের মত কাড়াকড়ি করিয়া, যুদ্ধে জিতিয়া একে নিজের করিতে সম্মত হইয়া যায়।

শৈল বোধ হয় আমার বিস্ময় বুঝিতে পারিল; সে মৃদু হাসিয়া কহিল "তুমি চাঁদার খাতায় কত সই করিতে রাজী আছ বল?"

চাঁদার খাতার কথায় আমার ভাল লাগিল না। অসন্তুষ্ট চিত্তে উত্তর দিলাম "এক টাকা।"

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

আশ্বাস

উৎসব আজি হয়ে গেছে শেষ—অতীত পূজার লগ্ন,
অতল গগন-সিন্ধুর তলে তরুণ ইন্দু মগ্ন।
অঞ্জলি ভরি' দেবতার পদে স'পিয়া পুষ্প অর্ঘ্য,
পূজা শেষ করে' একে একে ফিরে' গিয়াছে ভক্তবর্গ।
এখন নীরব শঙ্খের রব—প্রাঙ্গণ জনশূন্য,
এবে কোথা হ'তে মন্দির-পথে কে গো তুমি হীনপুণ্য!

২

"আশ্রয়হীন অক্ষম দীন চিরাগত আমি পান্থ,
দীর্ঘ দিবস বৃথা পথে পথে ঘুরিয়াছি পথ-ভ্রান্ত।
নাহি পূজিবার কোন উপচার—নির্ম্মল ফুলগুচ্ছ,
শুধু সম্বল নয়নের জল—ব্যর্থ বাসনা তুচ্ছ।
তাই এ নীরব নিশীথে যখন আঁধারে মিশিছে বিশ্ব,
বহু দূর হতে' মন্দির-দ্বারে আসিয়াছি আমি নিঃস্ব।

৩

"জানি, মোর তরে মন্দিরে তবু দ্বার হয় নাই বন্ধ,
ধূপের ধূম্র উঠেনা যদিও—এখনো ভাসিছে গন্ধ।
নাহি দীপাবলী, দেবালয় কোণে আছে ঘৃতদীপ দীপ্ত,
আছে দু'চারিটি শুষ্ক কুসুম—চন্দন অনুলিপ্ত।
নিদ্রিত ধরা; আশ্বাস-হারা নহে তবু মোর চিত্ত—
নিভৃত নিশায় দেবতা আমার জাগিয়া আছেন নিত্য।"

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

ফুলের কথা।

(চাগ্রন্থ)

ঊষার আকাশে বাষ্প সুকুমার আলোকের আভাস যখন চারিদিকে সঞ্চারিত হইতেছে, তখন বিহগকুলের অর্দ্ধোচ্চারিত রহস্যময় কাকলি শুনিয়া মনে হয় নাকি যে তাহারা আপন কুলায়-সঙ্গীদের নিকট ফুলের কথা আলোচনা করিতেছে? মানুষে যখন হইতে কাব্য-সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই ফুলের সমাদর আরম্ভ হইয়াছে। ফুলের নিয়ত আত্ম-বিস্মৃত মাধুর্য্য, বাক্য-হীন বলিয়াই সৌরভে যাহার পরিচয়, ইহা ভিন্ন বিকাশোন্মুখ তরুণী ষোড়শীর হৃদয়ের তুলনা আর কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়? আদিম মানব প্রথম যে দিন তাহার প্রেয়সীকে পুষ্প উপহার প্রদান করিল, সেই শুভ দিন হইতেই সে পশুত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। দৈনন্দিন তুচ্ছ ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নার ঊর্দ্ধে আপনাকে স্থাপনা করিয়া, হৃদয়বান মানবের শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত হইয়াছে। যে দিন হইতে মানুষে অনাবশ্যকীয়ের মর্য্যাদা বুঝিতে শিখিয়াছে,

সেইদিন হইতেই শিল্প-কলার সৌন্দর্য্য রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

আনন্দে কিম্বা বিষাদে ফুলই আমাদের চিরসুহৃৎ। আমাদের নিমন্ত্রণ-সভা, পানগোষ্ঠী, নৃত্যগীতের মজলিস, আমাদের প্রণয়-লীলার উৎসব কোন স্থানেই তাহাদিগকে ভিন্ন চলে না—তাহাদের দিব্য স্পর্শ ব্যতীত মরিতেও আমরা সাহসী হই না। স্নিগ্ধ সুরভি লিলি ফুলের সহায়তায় পূজা করিয়াছি, কমলের সাহায্যে ধ্যানতৎপর হইয়াছি—গোলাপ এবং চন্দ্র মল্লিকার (Chrysenthemum) গৌরব রক্ষার জন্য দুর্ব্বার সমরে অগ্রসর হইয়াছি। এমন কি আমরা ফুলের ভাষায় হৃদয়ের কথাও ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ফুল ছাড়া হইয়া কেহ কি কখনো বাঁচিতে পারে—ফুলের সৌন্দর্য্যবিহীন রিক্ত পৃথিবী যে আমাদের মনে শ্মশানের বিভীষিকা সঞ্চার করে। পীড়িতের শয্যা-পার্শ্বে সুকোমল সুরভি-পুষ্প কত না সান্ত্বনা বহন করিয়া আনে, সংসারজ্বালাদগ্ধ শ্রান্ত অন্ধকার হৃদয়ে, কেমন আনন্দের আলোক জাগ্রত করিয়া তোলে। তাহাদের প্রশান্ত করুণা, সুন্দর শিশুর অপলক দৃষ্টির ন্যায় বিশ্ব ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের মনের ক্ষীয়মান বিশ্বাসকে আবার উদ্বুদ্ধ করে। হারাণ আশাকে ফিরাইয়া আনে। আমরা যখন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া যাই, অশ্রু-শিশির-সিক্ত নত নেত্রে তাহারাই আমাদের সমাধির পার্শ্বে বিলাপ করিতে থাকে। বলিতে লজ্জা হয়, তবুও না বলিয়া উপায় নাই, এমন অতুলন সুন্দর নিত্য অনবদ্য ফুলের নিয়ত সঙ্গ লাভ করিয়াও, আমরা পশু স্বভাবের অধিক উর্দ্ধে উঠিতে পারি নাই। বাহিরের মৃগচর্ম্মে স্পর্শ করিতে না করিতে অন্তরের হিংস্র শার্দ্দূল হুঙ্কার করিয়া ওঠে। প্রবাদ আছে মানব শিশু দশম বর্ষে জন্তু, বিংশে বাতুল, ত্রিংশে উদ্‌ভ্রান্ত, চত্বারিংশতে প্রতারণার আকর এবং পঞ্চাশতে দোষী আসামী। আজীবন পশুত্বের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয়, পঞ্চাশতে দোষী আসামী হইয়া দাঁড়ায়! আমরা ত ক্ষুধা ভিন্ন আর কোন কিছুকেই বাস্তব বলিয়া জানি না, নিজের উচ্ছৃঙ্খল বাসনা ভিন্ন আর কিছুকেই পুণ্য পবিত্র মনে করি না। আমাদেরই চক্ষের উপরে কত মন্দিরের পর মন্দির ধূলিসাৎ হইয়া গেল, চিরস্থায়ী হইয়া আছে কেবল আমাদের অহঙ্কারের বেদিকা, সেই দেবাদিদেবের সম্মুখে আমরা নিয়ত ধূপ দীপ পুষ্পোপহারে পূজার্চ্চনা করিয়া থাকি। আমাদের বিগ্রহ ত বড় কম নহেন—ধন সম্পদ ইঁহারই অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ইঁহার

অবতার। ইঁহার নিকট বলি উপহার দিবার জন্য প্রকৃতিকে আমরা ধ্বংস করি। জড় পরমাণুকে জয় করিয়াছি বলিয়া, আমরা বৃথা গর্ব্ব করিয়া থাকি, কেন না তাহারাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরাভব করিয়া রাখিয়াছে; হায় সভ্যতা এবং সুকুমার রুচির দোহাই দিয়া আমরা কতই না পাশব অত্যাচার করিয়া থাকি! আকাশের নক্ষত্রের অশ্রু-বিন্দুর মত কোমল সুন্দর ফুলগুলি, আমাকে একবার বল দেখি, ধরণীর উদ্যানে দক্ষিণ সমীরণে গ্রীবা দোলাইয়া, যখন মধুপের মুখে স্নিগ্ধ শিশির ও আতপ্ত সূর্য্যকিরণের কথা শুনিতে থাক, তখন কি কখনও তোমাদের ভয়ানক পরিণামের কথা একবারও মনে কর? না, না, ভাবিয়া কাজ নাই,—মৃদুমন্দ বসন্ত পবনের আন্দোলনে যতক্ষণ সম্ভব খেলা কর, সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া থাক। কঠোর নিষ্ঠুর দুইখানি হাত কাল হয়ত, তোমাদের নিশ্বাস রোধ করিয়া দিবে; আশ্রয় বৃন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, পেলব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া কোথায় লইয়া যাইবে। এ নির্ম্মম কাজ যে করিবে, সে হয় ত নিরুপমা সুন্দরী, দেখিতে তোমাদেরই মত সুকুমার—তোমাদের তরুণ জীবনের পীড়িত রক্ত ধারায় তাহার কোমল হাতদুখানি যখনও আর্দ্র আছে, তখনও সে তোমাদের রূপের ব্যাখ্যান করিতে ভুলিবে না। হায় এই কি করুণা, স্নেহসিক্ত হৃদয়ের সহানুভূতি? অদৃষ্টবশতঃ তোমরা যে রমণীর চূর্ণ কুঞ্চিত কুন্তলের শোভাবর্দ্ধন করিবে, তাহার মত নির্ম্মায়িক হৃদয় অতি অল্পই দেখা যায়, যে পুরুষের উত্তরীয়াঞ্চলের সুরভি বর্দ্ধন করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিবে, যদি তোমরা মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিতে পারিতে, তাহা হইলে সে নরাধমের, তোমাদের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিবার সাহসও হই‌‌ত না। ভাগ্যবৈগুণ্যে কোনও দিন তোমাদিগকে সঙ্কীর্ণ পাত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, আসন্ন মৃত্যুর উদ্‌ভ্রান্ত অপরিসীম তৃষ্ণার যন্ত্রণা, বিরস, বহুদিনের পুরাতন, গলিত সলিলেই মিটাইতে হইবে। অতুলন সুন্দর ফুলগুলি, তোমরা যদি একবার আমাদের মিকাডোর দেশে আসিতে—তাহা হইলে কোনও সময়ে কাঁচি আর ক্ষুদ্র করাত হস্তে একটি ভয়ানক মানুষকে দেখিতে পাইতে—তিনি আপনাকে “ফুলের প্রভু” আখ্যা দিয়াছেন। তিনি একজন ভিষক্—তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্বতই তোমাদের মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত—কেন না তোমরা ত জানই, হস্তগত রোগীর যন্ত্রণা সমধিক দীর্ঘস্থায়ী করাই বৈদ্য এবং চিকিৎসকের বিশেষ ব্যবসায়। কাটিয়া বাঁকাইয়া, মোচড়াইয়া, যতপ্রকার অসম্ভব অবস্থায় নানা প্রকারে

বিপর্য্যস্ত করিয়াই, তিনি তোমাদের সম্যক্ উন্নতি সাধন করিতেছেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিবেন। অস্থি-বিদ্যাবিশারদ বৈজ্ঞানিকের ন্যায়, তিনি অতি সহজেই তোমাদের পেশী বিকৃত, অস্থি স্থানচ্যুত, ছিন্ন অঙ্গের শোণিত-স্রাব রোধ করিবার জন্য জলন্ত অঙ্গারে তোমাদিগকে দগ্ধ, সর্ব্বাঙ্গে রক্ত প্রবাহের স্ফূর্ত্তি বিধান করিবার জন্য দেহের সর্ব্বত্র তীক্ষ্ণ শলাকা প্রবেশ করাইয়া, কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন জ্ঞানে প্রীতি লাভ করিবেন। তোমাদের জন্য লবণ, ভিনিগার, ফটকিরি এমন কি Vitriol পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবেন। যদি দৈবাৎ মূর্চ্ছাপন্ন হও, তবে পাদদেশে ফুটন্ত উষ্ণ সলিল নিষেক করিয়া তোমাদের সঞ্জীবিত করিয়া দিবেন। তাঁহারই চিকিৎসার সাহায্যে তোমরা এক পক্ষ কাল অধিক জীবিত আছ, সর্ব্বত্রই তিনি এ কীর্ত্তি প্রচার করিয়া ফিরিবেন। এই চিকিৎসা-বিভীষিকার হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা, বহু পূর্ব্বে যে দিন তোমায় বন্দী করা হয়, সেই দিনই মৃত্যু কি শ্রেয়ঃ হইত না? হায়, জন্ম-জন্মান্তরের কতই না পাপের ফলে এ যন্ত্রণা তোমাদের ভোগ করিতে হইল?

আমাদের প্রাচ্য দেশে ফুলের প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করা হয়, তাহার তুলনায় পাশ্চাত্য অত্যাচার আরও ভয়ানক। ইউরোপ আমেরিকায় প্রতিদিন "খানা—কামরা" এবং নাচঘর (Ball-room) সাজাইবার জন্য, যে সংখ্যাতীত পুষ্প-জীবনের সর্ব্বনাশ করিয়া, পরদিন প্রভাতে তাহাদিগকে আবর্জ্জনা স্তূপে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, তাহা ভাবিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে—সেই ফুলগুলিকে একত্র গ্রথিত করিলে একটি সমগ্র মহাদেশকে মালার বাঁধনে বাঁধা যাইতে পারিত। এই নিতান্ত নির্ব্বিচার নির্ম্মম ব্যবহারের তুলনায় আমাদিগের পুষ্প-চিকিৎসকদিগের অপরাধ, দয়ার মতই প্রতিভাত হয়। তাঁহারা অন্ততঃ প্রকৃতির গৃহিণীপণার সম্মান রক্ষা করেন, অনেক বিচার বিবেচনা করিয়াই বলি সংগ্রহ করেন এবং পূজাশেষে মৃতের যথাযোগ্য সংকার করিতে বিমুখ হয়েন না। পাশ্চাত্য জগতে পুষ্পসজ্জার এই প্রাচুর্য্য, ঐশ্বর্য্যের বিকারগ্রস্ত আড়ম্বর মাত্র; লক্ষপতির এক লহমার খেয়াল। নিশীথের নৃত্যগীতোৎসবের পরে, এই সুকুমার ফুলগুলির কি দশা হয়! পথের প্রান্তে ধূলিধূসরিত দেহে তাহাদিগকে পড়িয়া থাকিতে দেখা, বড়ই ক্লেশকর দৃশ্য।

হায় ফুল কেন এমন সুন্দর অথচ এমন অসহায় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল! কীট পতঙ্গও দংশন করিতে জানে, মৃদুতম স্বভাবের জীবও বিপদের তাড়নায়

যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়। যে পাখীর পালক লইয়া পাশ্চাত্য সভ্য রমণী আপনার টুপি সাজাইয়া থাকেন, সেও উড়িয়া পলাইতে জানে, যে রোমশ জন্তুর মসৃণ অঙ্গচ্ছদটি তাঁহার বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সেও পদশব্দ শুনিবামাত্র পলাইতে পারে। একমাত্র ফুলের প্রতিরূপ পতঙ্গম, রেণু পরাগবর্ণ সুষমায় মনোহর প্রজাপতি, ফুলেরই মত সুকুমার হইয়াও সে উড়িতে জানে, পলাইবার উপায় তাহার আছে, কিন্তু আর সকল ফুলই নিরুপায়, একান্ত আত্মরক্ষা অসমর্থ। যদি তাহারা মৃত্যুমুহূর্ত্তে তীব্র আর্ত্ত চীৎকারও করে তবে নির্দ্দয় মানবের শ্রবণে সে বিলাপ প্রবেশ করে না। নীরবে নম্র হৃদয়ে যাহারা আমাদের স্নেহ সেবা করিতে অভ্যস্ত, চিরদিনই আমরা তাহাদের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করিতে দ্বিধা মাত্র করি না—কিন্তু হায় এমন দিন আসা বিচিত্র নয়, যে দুর্দ্দিনে সেই পরম বন্ধু সকল চিরদিনের মতই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

দেখ নাই কি বন্ধু, বনফুল দিন দিন দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে, হয়ত বা পুষ্পরাজ্যের কোনও সুদূরদৃষ্টি বিজ্ঞমন্ত্রী তাহাদিগকে বলিয়াছেন, মানব সমাজে যত দিন না স্নেহ, করুণা, সহানুভূতি প্রসর লাভ করে, ততদিন তোমরা আর আসিও না—দূরে চলিয়া যাও। তাই বুঝি তাহারা দেবতার নন্দন বনে উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়াছে। যে ব্যক্তি ফুলের চিকিৎসা করেন, তাঁহার অপেক্ষা যিনি তাহার উৎকর্ষ চর্চ্চা করেন তিনি যে শ্রেষ্ঠতর, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কত আগ্রহের সহিত তিনি আকাশে মেঘ সঞ্চার ও সূর্য্যালোকের প্রসার নিরীক্ষণ করেন, বিপ্লবকারী কীট পতঙ্গমের সহিত যুদ্ধরত হয়েন, তুষারপাত ও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কায় কতই না কাতর হইয়া উঠেন। আবার যখন কোমল কোরকাবলীর আবির্ভাব হয়, তখন কি স্নেহশঙ্কী-মন লইয়া দিনে দিনে তিনি তাহাদের পূর্ণবিকাশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, তরুণ কিশলয়ের অরুণ রাগ তাঁহাকে কতই না আনন্দবিহ্বল করে। আমাদের এই প্রাচ্যদেশে, "ফুলের ফসল" ফলাইবার শিল্প ও ব্যবসায় বহুপ্রাচীন; কবিও তাঁহার প্রিয় তরুলতার প্রেমকাহিনী, কত কবিতা কত না সঙ্গীতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সম্রাট বিশেষের সময়, চীনা মাটির কারু কার্য্য যখন উন্নতিলাভ করিতে আরম্ভ করে, তখন সখের গাছগুলিকে যত্নে রাখিবার জন্য কত সুন্দর আধারের সৃষ্টি হয়, অনেক সময়ে কাচ পাত্র যথেষ্ট মনে হইত না তখন বহুরত্নখচিত সুবর্ণ কিম্বা রজতাধারে

তাহাদিগকে রক্ষা করা হইত। পুষ্পসুন্দরীদিগের পরিচর্য্যার জন্য বিশেষ ভৃত্য নিয়োজিত থাকিত, তাহারা প্রহরে প্রহরে শশক রোমের অতি সুকোমল কূর্চ্চ দ্বারা প্রস্ফুটিত দলগুলিকে পরিষ্কার করিয়া দিত। লিখিত আছে, আজানুলম্বিত-সুকেশী, সুন্দরী, তরুণী, সুসজ্জিত হইয়া পিউনি peony ফুলের আলবালে জলসেচন করিলে, তবে তাহার সম্যক্ উৎকর্ষ সাধিত হয়, নিয়ম ক্ষাম-মুখ, কৃশতনু বৌদ্ধপুরোহিত প্লাম গাছের পরিচর্য্যা করিবেন ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। নবোদ্গত সুকুমার কোরকের রক্ষাকল্পে সবিশেষ যত্ন করা হইত। কোনও সম্রাট পক্ষীদিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য বাগানের গাছের ডালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণ-ঘন্টিকা টাঙাইয়া দিয়াছিলেন—বসন্ত ঋতু যখন আনন্দ সমারোহে দিগ্‌বিদিক উল্লসিত করিয়া তুলিত তখন তিনিও রাজসভার বীণকারের সঙ্গে প্রমোদ উদ্যানে যাইয়া, রাগিণীর সুমধুর আলাপে তাঁহার কুসুম-প্রেয়সীদিগের চিত্ত বিনোদন করিতেন। অতীতের অন্ধকার গর্ভ হইতে দু' একখনি তাম্রলিপির আবিষ্কার হইয়াছে—তাহার অনুশাসন পাঠ করিয়া হাসিব কি কাঁদিব বুঝিয়া ওঠা দায়। ফুলের অপরূপ রূপলাবণ্যের বর্ণন করিয়া, লেখক বলিয়াছেন যদি কোন নিষ্ঠুর ইহার একটি শাখা ভগ্ন করে, তবে তাহার পরিবর্ত্তে, আপনার একটি অঙ্গুলি কাটিয়া দিতে হইবে। আজকালকার এই নির্ব্বিচার অত্যাচারের দিনে, রাজা যদি ফুলের অপব্যবহার এবং চারু শিল্পের অবমাননার শাস্তিস্বরূপ, এমনি বিধান প্রচার করাইতেন তবে তাহা অবিধি মনে করিতাম না।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মায়ার খেলা

দয়াল আমার শুকন' শস্যক্ষেতে
তুমিই তো সেই বরুণ-আশীষ ঢালো,
আঁধার যবে বিশ্ব-কক্ষখানি
তুমিই তো তায় অরুণ-প্রদীপ জ্বালো

জীবন জোড়া বিরাট্ স্বপনখানি
আড়াল সম দিচ্ছ কেবল টানি'
ধরাই যদি না দাও, হে সাবধানি,
বুঝ্‌তে যে পাই—সেই তো আমার ভালো,
হোক্ না তিমির, আকাশ ভরা তারায়
ছিদ্র পথেই দেখ্‌ছি যে ওই আলো!

খেল্‌তে দিয়ে, খামখেয়ালী, হঠাৎ
আপন দানে আপনি লওগো ছিনে,
বজ্র সাড়ায় ভয় দেখিয়ে, আবার
জ্যো'স্না স্নেহে জীবন লওযে জিনে'!
ফুলের হাসে, পাখীর প্রণয় গানে
প্রভাত বায়ে, নদীর তরল তানে
সুখের প্লাবন জাগিয়ে সকল খানে
মাতিয়ে তোল ক্ষণেক হৃদয়হীনে।

দুঃখ কশায় আঘাত করে'ই নিঠুর,
তুমিই আবার কাঁদাও গো সেই দীনে!
এমনি করে'ই সারা জীবন সদাই
করছ তুমি রঙ্গরসের খেলা।
অভিমানের ধার ধারিনে ঠাকুর,—
সই না কেন যতই ছল কি হেলা!
যখন ডাক, এগিয়ে কাছেই আসি,
আঘাত কর, তা'ও সে ভালবাসি;
হাসাও হাসি; আবার দীর্ঘশ্বাসি'
কাঁদ্‌তে বসি স্মৃতির সন্ধ্যাবেলা।
এমনি করে নয়টি রসের রূপে
চলছে তোমার গোপন মায়ার খেলা!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

সংখ্যা-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা। *

সংখ্যা বলিলে আমাদের মনে প্রথমতঃ এক, দুই, তিন প্রভৃতির কথাই উদিত হয়। বস্তুতঃ সংখ্যা-শব্দে প্রথমতঃ এক, দুই, তিন প্রভৃতিকেই বুঝাইত। মানবের আদিম অবস্থাতে তাহার মনে প্রথমতঃ অন্য কোনও ভাব আসে নাই। যোগ বলিতে প্রথমতঃ এক, দুই প্রভৃতির ন্যায় একটি রাশির সহিত তদনুরূপ অন্য কোনও রাশির যোগ বুঝাইত। বিয়োগ বলিলে কেবল বড় রাশি হইতে ছোট রাশির বিয়োগ বুঝাইত। পূরণ কেবল যোগেরই একটি শাখামাত্র ছিল। ভাগ বলিতে কেবল বড় সংখ্যাকেই ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ বুঝাইত। এমন কি সকল সময়ে ভাগফলকে একটি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত করা যাইত না। ক্রমে, ছোট সংখ্যাকে বড় সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় কিনা অথবা বড় সংখ্যাকে ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ভাগ ফলকে সকল সময়ে একটি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত করা যায় কিনা, এই প্রশ্ন গণিতজ্ঞগণের মনে উদিত হইল। এই অনুসন্ধানের ফলে গণিতজ্ঞগণ ভগ্নাংশের (fraction) আবিষ্কার করিলেন। এবং তাঁহারা সংখ্যার এইরূপ সংজ্ঞা (defini ion) করিলেন যে তদ্দ্বারা অখণ্ড রাশি (whol3 number) এবং ভগ্নাংশ দুইই বুঝাইবে। ভগ্নাংশের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে এই লাভ হইল যে, এখন আমরা ছোট রাশিকে বড় রাশিদ্বারা ভাগ করিতে পারি এবং বড় রাশিকেও ছোট রাশি দ্বারা সকল সময়ে ভাগ করিতে পারি এবং উভয় স্থলেই ভাগফলকে ভগ্নাংশের সাহায্যে একটি রাশি দ্বারা প্রকাশিত করিতে পারি। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রহিয়া গেল। সেই প্রশ্নটি এই, ছোট রাশি হইতে আমরা বড় রাশি বিয়োগ করিতে পারি কিনা। ইহা নিশ্চিত যে, সংখ্যা দ্বারা যদি আমরা অখণ্ড রাশি এবং ভগ্নাংশ উভয়ই বুঝি তবে আমরা বড় রাশি হইতে ছোট রাশি বিয়োগ করিতে পারি। পূর্ব্বের ন্যায় এবারও গণিতজ্ঞগণ দেখিলেন সংখ্যার অর্থের সংস্কার আবশ্যক। তাঁহারা দেখিলেন এই সংস্কার এইরূপে করিতে হইবে যেন ছোট রাশি হইতে বড় রাশি বিয়োগ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা এখন গণিত-শাস্ত্রে নূতন এক প্রকার রাশির আনয়ন করিলেন। ইহাদিগকে আমরা এখন ঋণ সংখ্যা (negative number) বলি। অতএব দেখা যাই-

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত।

তেছে যে, সংখ্যা বলিতে প্রথমতঃ অখণ্ড ধন—সংখ্যা (positive integer) বুঝাইত। তাহার পর সংখ্যা বলিতে অখণ্ড ধন-সংখ্যা (positive integer) এবং খণ্ড ধন-সংখ্যা (positive fraction) বুঝাইত। তৎপর সংখ্যা-শব্দ অখণ্ড ধন-সংখ্যা, খণ্ড ধন-সংখ্যা, অখণ্ড ঋণ-সংখ্যা (negative integer), এবং খণ্ড ঋণ সংখ্যা (negative fraction) এই চতুর্ব্বিধ অর্থে গণিত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। অবশ্য প্রত্যেকবারই গণিতজ্ঞগণ পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংস্কার করিলেন। এই সংস্কারের পরও গণিতজ্ঞগণ আর একটি অভাব অনুভব করিলেন। তাহারা দেখিলেন কেবলমাত্র উপর্য্যুক্ত চতুর্ব্বিধ রাশির সাহায্যে সকল রাশির বর্গমূল (square root), ঘনমূল (cube root) প্রভৃতি বাহির করা যায় না। এবার তাঁহারা গণিত শাস্ত্রে অসমগুণনীয়ক (incommensurable or irrational) রাশির অবতারণ করিলেন। প্রাচীন হিন্দুগণ ও প্রাচীন গ্রীকগণ এই অসমগুণনীয়ক সংখ্যা-সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। এখানে মনে রাখিতে হইবে দশমিক ভগ্নাংশ (decimal fraction) তিন প্রকার :—

(১) সসীম দশমিক (terminating decimal) ; যথা—৩ ৪।

(২) পৌনঃপুনিক দশমিক (recurring decimal) ; যথা—৪ ৩৫·৭·৩।

(৩) আর এক প্রকার দশমিক ভগ্নাংশ আছে যাহা সসীমও নয় অথবা পৌনঃপুনিকও নয় ; যথা—২এর বর্গমূল অথবা কোনও বৃত্তের (circle) পরিধি (circumference) এবং ব্যাসের (diameter) অনুপাত (ratio).

বর্ত্তমান সময়ে অসমগুণনীয়ক সংখ্যার সমস্যা গণিতজ্ঞগণের নিকট আবার নূতন ভাবে উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীনগণ অসমগুণনীয়ক সংখ্যা গুলিকে প্রায় সমগুণনীয়ক (nearly commensurable) বলিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই প্রাচীন মতানুসারে একটি অসমগুণনীয়ক সংখ্যা বহু সমগুণনীয়ক সংখ্যার সমান বলা যাইতে পারে মনে করুন ২এর বর্গ মূলকে আমরা ১ ৪, ১·৪১, ১·৪১৪ প্রভৃতি বহু সমগুণনীয়ক সংখ্যা দ্বারা বর্ণনা করিতে পারি। তবে একটি অসমগুণনীয়ক সংখ্যা কি একটি সংখ্যা নহে ? একটি অসমগুণনীয়ক সংখ্যাকে বহুসংখ্যা বলিয়া স্বীকার করিলে $১ + \frac{১}{১} + \frac{১}{১ \times ২} + \frac{১}{১ \times ২ \times ৩} + \cdots\cdots$ প্রভৃতি অনন্তসংখ্যক রাশির (infinite series) যোগ ফলকে এক মূল্য (having one value) না বলিয়া বহুমূল্য (having many values) বলিতে হয়। অথচ বর্ত্তমান সীমা-তত্ত্ব (theory of limits) অনুসারে এগুলিকে একমূল্য না বলিলে

চলে না। এইরূপে গণিতজ্ঞগণ পদে পদে সংখ্যার প্রাচীন সংজ্ঞায় (old definition) দোষ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অতএব তাঁহারা এক্ষণে আবার সংখ্যার নূতন সংজ্ঞার আবশ্যকতা বুঝিলেন। এ বিষয়ে Richard Dedekind (রিচার্ড ডেডেকিণ্ড্) এবং গিয়র্গ্ কাণ্টর্ (Georg Cantor) নামক দুইজন জার্ম্মাণদেশীয় গণিতজ্ঞ বহু গবেষণা করিয়াছেন। এস্থলে আমরা কেবল Dedekindএর অধ্যাহার করিব। Dedekind বলেন সকল সমগুণনীয়ক সংখ্যাকেই আমরা বহু প্রকারে ক এবং খ নামক এরূপ দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি যেন খ শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক রাশিই ক-শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক রাশি অপেক্ষা বড়। এইরূপ শ্রেণী বিভাগ আবার দুই প্রকার। প্রথম প্রকারে ক এর মধ্যে একটি বৃহত্তম সংখ্যা আছে অথবা খএর মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আছে। যথা—ক শ্রেণীর সকল রাশিই ২এর কম এবং খ-শ্রেণীর সকল রাশিই ২এর বেশী। ২কে আমরা ক-শ্রেণী অবথা খ-শ্রেণী যাহার মধ্যে ইচ্ছা ধরিতে পারি। দ্বিতীয় প্রকারে কএর মধ্যে একটি বৃহত্তম সংখ্যা কিম্বা খ-এর মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নাই। যথা :—আমরা এরূপ একটি বিভাগ কল্পনা করিতে পারি যে, ক-শ্রেণীর মধ্যে সেই সকল রাশি আছে যাহাদের বর্গ ২ হইতে ছোট এবং খএর মধ্যে সেই সকল রাশি আছে যাহাদের বর্গ ২ অপেক্ষা বড়। Dedekind বলেন সকল স্থলেই ক-শ্রেণী এবং খ-শ্রেণীর মাঝখানে এমন একটিমাত্র জিনিস আছে যাহা ক শ্রেণীকে খ শ্রেণী হইতে হইতে পৃথক্ করিয়া দেয় অর্থাৎ যাহা ক এবং খএর সন্ধিস্থলে অবস্থিত। সেই জিনিসটিকে আমরা সংখ্যা বলিব। ক এবং খ প্রথম প্রকারের হইলে সংখ্যাটীকে আমরা সমগুণনীয়ক (rational) সংখ্যা বলিব আর ক এবং খ দ্বিতীয় প্রকারের হইলে সংখ্যাটিকে আমরা অসমগুণনীয়ক (irrational সংখ্যা বলিব।

অতএব এপর্য্যন্ত আমরা যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি তাহাতে দেখা যাইতেছে সংখ্যা দ্বিবিধ :—সমগুণনীয়ক (rational)এবং অসমগুণনীয়ক (irrational) সময়গুণনীয়ক সংখ্যাগুলি আবার দ্বিবিধ :—ধন(positive)এবং ঋণ(negative)। ধন এবং ঋণ—সংখ্যাগুলি আবার প্রত্যেকে দ্বিবিধ :—অখণ্ড(integral)এবং খণ্ড (fractional)অবশ্য ইহা এখন সহজেই বুঝা যাইবে যে অসমগুণনীয়ক (irrational) সংখ্যার মধ্যে অখণ্ড রাশি (integer) নাই, কিন্তু উহারা ধন (positive) এবং ঋণ (negative) উভয়ই হইতে পারে। উহারা সর্ব্বদাই খণ্ড (fractional)

এবং উহাদিগকে অসীম (non-terminating) অপৌনঃপুনিক (non-recurring) দশমিক দ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে।

কিন্তু এখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে সংখ্যার অর্থ নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই। গণিতের আরও একটি অভাব রহিয়াছে যাহা আমরা এখন পর্য্যন্ত সংখ্যার যেরূপ সংজ্ঞা (definition) করিয়াছি তদ্দ্বারা দূরীভূত হয় না। ঋণ সংখ্যার (negative number) বর্গমূল পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার সাহায্যে বাহির করা যায় না; কারণ কোনও সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা পূরণ করিলে ঋণ সংখ্যা পাওয়া যায় না। এইজন্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়া আর এক প্রকার সংখ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আমাদিগকে $\sqrt{-১}$ নামক একটি বস্তু মানিয়া লইতে হয়। ইহার সংজ্ঞা (definition) এই যে $\sqrt{-১}$ কে $\sqrt{-১}$ দ্বারা পূরণ করিলে পূরণ ফল $-$ ১ হয়। ইহাকে আমরা কাল্পনিক একক (imaginary unit) বলিতে পারি। যেমন ৪ বলিলে আমরা প্রকৃত এককের চতুর্গুণ বুঝিয়া থাকি, সেইরূপ ৪$\sqrt{-১}$ বলিলে আমরা $\sqrt{-১}$এর চতুর্গুণ বুঝিয়া থাকি। ২$\sqrt{-১}$ এবং তদনুরূপ রাশিকে আমরা কাল্পনিক রাশি (imaginary quantity) বলিয়া থাকি। ১, ২ ইত্যাদি কিংবা $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$ প্রভৃতি রাশিকে আমরা প্রকৃত রাশি (real quantity) বলিয়া থাকি। একটি প্রকৃত রাশির সহিত একটি কাল্পনিক রাশি যোগ করিলে আমরা আর এক প্রকার রাশি পাইয়া থাকি। ইহাদিগকে আমরা মিশ্ররাশি (complex number) বলি। কখনও কখনও আমরা এই মিশ্ররাশিগুলিকেও কাল্পনিক রাশি বলিয়া থাকি। ষোড়শ শতাব্দীর ইটালীয় (Italian) গণিতজ্ঞগণের গ্রন্থেই প্রথমতঃ কাল্পনিক রাশির উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুইজার্লেণ্ড দেশীয় গণিতজ্ঞ অয়লারই (Euler) প্রথমতঃ কাল্পনিক রাশির তত্ত্ব জগতের সমক্ষে পরিষ্কাররূপে প্রচারিত করেন। কশি (Cauchy) প্রভৃতি গণিতজ্ঞগণও এ বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার (reader) পণ্ডিত প্রবর আণ্ড্রু রাসেল্ ফোর্সাইথ (Andrew Russel Forsyth) এ বিষয়ে Theory of Functions of a complex variable নামক একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন এবং ১৯১৩ সনের প্রথমভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মন্দিরে এ বিষয়ে ষোলটি বক্তৃতা দেন।

এক্ষণে আমরা কাল্পনিক রাশির উপকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পূর্ব্বে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত-২,-৩ প্রভৃতি রাশির বর্গমূল কত তবে আমাদিগকে বলিতে হইত ইহাদের বর্গমূল নাই।

এখন আমরা বলিতে পারি ইহাদের বর্গমূল আছে কিন্তু উহারা কাল্পনিক রাশি। পূর্ব্বে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত ক−২ক+২=০ এই বার্গিক রমীকরণের (quadratic equation) মান (root) কত তবে আমাদিগকে বলিতে হইত এই সমীকরণের মান নাই। কিন্তু এখন আমরা বলিতে পারি ইহার মান দুইটি:— ১+√-১ এবং ১-√-১। পূর্ব্বে বলিতে হইত ১এর চতুর্থ মূল (fourth root) দুইটি :—+১ এবং—১! এখন বলি ৪টি :—+১, √১, + √-১, এবং—√-১। আরও বলিতে পারি প্রত্যেক রাশির পাঁচটি পঞ্চম মূল (fifth root,) ছয়টি ষষ্ঠ মূল (sixth root,) ইত্যাদি। প্রত্যেক rational integral equationএর degree যত, মান সংখ্যাও তত। এগুলি সামান্য উদাহরণ মাত্র। এইরূপে কাল্পনিক রাশির অস্তিত্ব স্বীকার করায় গণিত শাস্ত্রের যে কত উন্নতি হইয়াছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, সংখ্যা-শব্দ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ক্রমবিকাশের ফলে আমরা সংখ্যার বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। কে বলিতে পারে আবার নূতন অভাবের বোধ হইবে কি না এবং সেই অভাব সংখ্যার বর্ত্তমান সংজ্ঞাদ্বারা পূরণ হইবে কি না?

শ্রীহেমচন্দ্র সেনগুপ্ত।

অলঙ্কার।

আমি বৈয়াকরণিক নহি, স্বর্ণকার নহি, রমণীও নহি, সুতরাং অলঙ্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার আমার আদৌ অধিকার আছে কি না তাহাই প্রথম প্রতিপাদ্য। অলঙ্কারের প্রয়োগ, নির্ম্মাণ বা ব্যবহার না করিলেই যে তাহাতে অধিকার জন্মে না ইহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কোন্ অলঙ্কার কিরূপ, তাহার গঠনে কি কি বৈচিত্র্য আছে, তাহার সহিত অন্য কোন্ অলঙ্কারের ঠিক কতটুকু সাদৃশ্য আছে ইত্যাদি দুরূহ বিষয়ের নিরাকরণ করিতে না পারিলেও আমাকে যে, অলঙ্কার লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে হয় তাহা নিশ্চিত। তা ছাড়া অলঙ্কারের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিতে গেলে আমিও কিছু কিছু অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকি। আমার বেশভূষাই আমার অলঙ্কার। আর যদি অলঙ্কারকে তাহার সাধারণ সংকীর্ণ অর্থেই

গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও আমি নিরলঙ্কার হই না। আমিও কখন সুবর্ণাঙ্গুরীয়, কখন সুবর্ণের বোতাম, কখন সুবর্ণদণ্ডসংলগ্ন কাচযন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি এস্থলে সাধারণ পুরুষজাতির প্রতিরূপক, সুতরাং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন যুগে এই ভারতবর্ষেই আমি অঙ্গদ কুণ্ডল প্রভৃতি ধারণ করিয়া আসিয়াছি, আমার নিজের রুচি অনুসারে আমার দেবতাকেও কেয়ূরবান্, কনককুণ্ডলবান্, কিরীটী, হারী করিয়াছি এবং এখনও আমি উৎকলবাসিরূপে কটিদেশে চন্দ্রহার ও রাজপুতরূপে প্রকোষ্ঠদেশে বলয় ধারণ করিয়া থাকি। তা ছাড়া হার যে, আমার একটি কবিপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার তাহা "যূনামঙ্গেষু হারং" ইত্যাদি শ্লোকে সাহিত্য-দর্পণকার স্পষ্টই বলিয়াছেন।

তবে চিরদিনই রমণীর তুলনায় পুরুষের অলঙ্কার ব্যবহার করা স্বল্প ও ক্ষণিক। রমণীর অলঙ্কার-ব্যবহার বহুল, নিত্য ও চিরপ্রসিদ্ধ। রমণী যেরূপ অলঙ্কার দিয়া কথা বলিতে পারেন আমাদের কবি ও বৈয়াকরণিকও সেরূপ পারেন কি না সন্দেহ, রমণী যেরূপ অলঙ্কার ভালবাসেন ও গঠনতাৎপর্য্য বুঝেন স্বর্ণকারও বোধ হয় সেরূপ ভালবাসেন না বা বুঝেন না এবং রমণী যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকেন, কোন পুরুষই সেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া আপনাকে বিড়ম্বিত করিতে সাহসী হন না। অলঙ্কার সম্বন্ধে তাঁহাদিগের জ্ঞান স্বাভাবিক ও সংস্কারগত, আমাদিগের জ্ঞান তাঁহাদিগের আনুগত্যের ফল। তাঁহাদিগের আলঙ্কারিক জ্ঞান লোভমূলক ও ভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদিগের আলঙ্কারিক জ্ঞান ভীতিমূলক ও ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু যেরূপ ভাবেই তাহা উৎপন্ন হউক এবং যতই তাহা অসম্পূর্ণ হউক না কেন আমাদিগের যে, অলঙ্কার সম্বন্ধে একটা জ্ঞান আছে তাহা নিশ্চিত। সুতরাং অলঙ্কার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আমার অধিকারের বহির্ভূত নহে।

জগতের সকল যুগে ও সকল দেশেই রমণী পুরুষাপেক্ষা অলঙ্কারের অধিক পক্ষপাতিনী ইহার কারণ কি? রমণী বলিবেন "আমাদের কিছু সৌন্দর্য্য আছে বলিয়াই আমরা তাহার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করি; তোমাদের কিছুই সৌন্দর্য্য নাই, তোমরা কিসের উৎকর্ষ সাধন করিবে? যাহার কণ্ঠের স্বর স্বভাবতই মধুর সেই সঙ্গীত শিক্ষা করে, যাহার কিছু সম্মান আছে সেই সম্মান রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত।"

কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পুরুষের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে রমণীর অনেক স্বীকারোক্তি এখনও লিপিবদ্ধ আছে এবং সেই সকল স্বীকারোক্তি অলঙ্কার প্রদানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী নহে বলিয়া ইহাই অনুধেয় যে, রমণী পুরুষ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে সৌন্দর্য্যহীন এবং সেই নিমিত্ত অলঙ্কার ধারণে এত মনোযোগিনী। 'কিমিব হি মধুরানাং মণ্ডলং নাকৃতীনাম' এ কথাটি বড়ই সত্য। একটি উদাহরণ দিলে ইহা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। যতদিন দেহের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে ততদিন রমণী যেরূপ অলঙ্কার ব্যবহার করেন, দেহের সৌন্দর্য্য হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলে তদপেক্ষা ব্যবহার করেন, অর্থাৎ ভূষণ সাহায্যে নষ্ট-সৌন্দর্য্যের যতটা সম্ভব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। সুতরাং এই সত্যানুসারে ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যজাতির মধ্যে পুরুষ-ভাগ রমণীভাগ হইতে সুন্দরতর বলিয়াই রমণীভাগ কৃত্রিম উপায়ে ঋণকৃত সৌন্দর্য্য দ্বারা পুরুষের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

রমণীর অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যের আরও দুইটি কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ জগতের সর্ব্বত্র সকল সমাজেই রমণীকে অল্পাধিক মাত্রায় পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়। যাহার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহার মনোরঞ্জন করা আবশ্যক। কিন্তু রমণী আপনার মানসিক গুণের দ্বারা পুরুষের চিত্তাকর্ষণ করিতে ততটা সমর্থ হইবে না বুঝিয়া শারীরিক সৌন্দর্য্য দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবতী। দ্বিতীয়তঃ রমণীর কর্ম্মজীবন পুরুষের কর্ম্মজীবন অপেক্ষা অপ্রশস্ত; সুতরাং পুরুষদিগের অপেক্ষা অলঙ্কার পারিপাট্যে সময়ক্ষেপ করিবার তাঁহাদিগের অবসরও অধিক।

এক্ষণে দেখা যাউক অলঙ্কার জিনিষটা কি? যাহা দ্বারা কোন বস্তুকে সুশোভিত করা যায় অর্থাৎ যাহা দ্বারা একটি বস্তু স্বভাবতঃ যত সুন্দর তদপেক্ষা অধিক সুন্দর করা যায় তাহাই অলঙ্কার। যাহা আছে তাহা অলঙ্কার নয়, যাহা আহরণ করা অসম্ভব তাহাও অলঙ্কার নয়। কেশ-বেশও মনুষ্য-দেহের অলঙ্কার,—কিন্তু হস্তপদাদি নয়। বৃক্ষের অলঙ্কার পুষ্প, কারণ সকল সময় বৃক্ষে পুষ্প থাকে না, এবং পুষ্পিত বৃক্ষের সৌন্দর্য্য পুষ্পহীন বৃক্ষের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিক। এইরূপ নদীর অলঙ্কার জ্যোৎস্না, মেঘের অলঙ্কার বিদ্যুৎ, আকাশের অলঙ্কার তারকা—কিন্তু পৃথিবীর অলঙ্কার তারকা নয়, কারণ তারকা পৃথিবীর উপর ফুটিতে পারে না।

প্রকৃতি আপনার রাজ্যের সকল বস্তুকেই অল্পাধিক অলঙ্কারে বিভূষিত

করিয়া থাকেন কিন্তু মনুষ্য আপনার সকৃত বস্তুগুলিকে সেরূপভাবে অলঙ্কৃত করিতে শেখেন নাই। আমরা প্রাসাদকে কারুকার্য্য দ্বারা, কক্ষাভ্যন্তরকে চিত্র দ্বারা, ভাষাকে অনুপ্রাসাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া থাকি বটে কিন্তু এখনও আমাদের অনেক বস্তুই অনলঙ্কৃত আছে। আমাদিগের সৌন্দর্য্যদৃষ্টি যদি সেইরূপ প্রখর ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি সেইরূপ সুসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে আমাদিগের নির্ম্মিত, রচিত ও উদ্ভাবিত অনেক বস্তু অতি নীরস পত্তের ন্যায় ভয়াবহ হইত না, তাহা হইলে বোধ করি প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি দৃষ্টিপাতে আমাদের হৃদয় এত বিষণ্ণ ও নেত্র এত ব্যথিত হইত না এবং জীবন-যাত্রা অনেক অধিক পরিমাণে প্রীতিপ্রদ হইত।

আমাদিগের আর এক দোষ এই যে, আমরা অনেক অলঙ্কারকে অলঙ্কার নামেই অভিহিত করি না। যাহা ভাষার ও দেহের শ্রী সম্পাদন করে কেবল তাহাদিগকেই আমরা অলঙ্কার বলি, কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণকে মনের অলঙ্কার বলি না, ফল, পুষ্প, পক্ষী ও নবকিসলয়কে বৃক্ষের অলঙ্কার বলি না, সোপান, কমল ও বৃহৎ মৎস্যকে সরোবরের অলঙ্কার বলি না। শুধু কি তাই, হারকে কণ্ঠের অলঙ্কার বলিলেও সৌন্দর্য্যকে কণ্ঠের অলঙ্কার বলি না, যাহা সুন্দর করে তাহাই যদি অলঙ্কার হয় তবে কেবল দৃশ্য বস্তুই অলঙ্কার হইবে কেন? শ্রবণযোগ্য, দর্শনযোগ্য বা আঘ্রাণযোগ্য বস্তু অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হইবে না কেন? আমরা কি সুন্দর গন্ধ, সুন্দর রস, সুন্দর স্পর্শ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি না? যদি আমি কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতে আমার মুখমণ্ডলকে কমলসুরভি করিতে পারি বা ঐরূপ কোন উপায়ে আমার অঙ্গুলির অগ্রভাগে শর্করার মিষ্টত্ব আনয়ন করিতে পারি, তাহা হইলে সেই সুগন্ধ ও সেই মিষ্টত্ব কি আমার দেহের অলঙ্কার হইবে না?

যে অলঙ্কার ভাষায় ব্যবহৃত হয় সে অলঙ্কার সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে সে সব অলঙ্কারের মধ্যে কোন কোনটিতে কেবল অর্থের প্রাদ্ধ হয় বলিয়া বোধ হয় তাহাদিগকে অর্থালঙ্কার বলে এবং কোন কোনটিতে ধ্বনির তুলনায় অর্থ প্রায় থাকে না বলিয়াই তাহাদিগকে বোধ হয় ধ্বন্যালঙ্কার বা শব্দালঙ্কার বলে। অনুপ্রাস একটি ধ্বন্যালঙ্কার, উহা রূপার সিঞ্জিনীর মত 'রিণি ঝিনি' করিয়া বাজে বটে কিন্তু অলঙ্কার হিসাবে উহার মূল্য বড়ই কম এবং ভাব না থাকিলে সে 'রিণি ঝিনিতে' মন বড় ভোলে না; তবে কোন তরুণবয়স্ক ভাবুকের পক্ষে যদি সে ধ্বনির মধ্য হইতে স্বতঃই কোন ভাব

নির্গত হয়, তাহা বলিতে পারি না। তা ছাড়া প্রতি চরণে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার বড় ভালও শুনায় না। তখন 'রিণি ঝিনি'র পরিবর্ত্তে 'ঝমরঝমাৎ ঝম'ই বোধ হয় কর্ণে বেশী বাজে। উপমালঙ্কার একটি অর্থালঙ্কার, উহা মুক্তাহারের মত ধ্বনিশূন্য বটে কিন্তু অতিশয় মূল্যবান্ ও প্রভাযুক্ত। উহা শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ না করিয়া একেবারেই হৃদয়কে স্পর্শ করে। আবার কোন কোন অলঙ্কারের অর্থ ও ধ্বনি উভয়ই আছে বলিয়া বোধ হয় তাহাদিগকে ধ্বন্যার্থালঙ্কার কহে। যমকালঙ্কার একটি ঐ শ্রেণীর অলঙ্কার। উহা সোনার চুড়ীর মত মূল্যবানও বটে এবং মাঝে মাঝে হৃদয়াপহারি 'টিং টাং' শব্দও করিয়া থাকে। বুড়া কপিলও তাঁহার সাংখ্য-সূত্রে 'কুমারী-কঙ্কণবৎ' উদাহরণটি দিয়া সেই 'টিং টাং'এর মাধুর্য্যোপলব্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

যে অলঙ্কার মনুষ্যদেহে প্রযুক্ত হয় এক্ষণে তাহার সম্বন্ধে দু এক কথা বলিব। অলঙ্কার সাধারণ নাম। সামান্য সামান্য অর্থভেদে ইহা আভরণ, ভূষণ ও প্রসাধনের বস্তুকে বুঝাইয়া থাকে। অলঙ্কারের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহার প্রত্যেকটির নামোল্লেখ করা অসম্ভব, বিশেষতঃ পুরাতন ও প্রচলিত সকল অলঙ্কারের নাম করিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। তবে অলঙ্কার প্রধানতঃ যে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত তাহাই সম্প্রতি নির্দ্দেশ করিব।

প্রথমতঃ—দেহের দৈহিক অলঙ্কার

তাহার মধ্যে (১) সমগ্র দেহের অনায়াসসাধ্য অলঙ্কার, যৌবন, যাহাকে কালিদাস "অসম্ভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেঃ" বলিয়াছেন।

(২) দেহের কোন একটি বিশেষ অঙ্গের অলঙ্কার যথা—রমণীর কেশ। সুদীর্ঘ বিস্রস্ত কেশকলাপই একটি সুন্দর অলঙ্কার, নচেৎ পার্ব্বতীর আলুলায়িত কেশপাশ দেখিয়া চমরীরা আপনাদিগের পুচ্ছের প্রতি শিথিলস্নেহ হইত না।

তার পর ক্রমোন্নতির পর্য্যায়ে চূর্ণালক বেণী, কুণ্ডল প্রভৃতি সমস্তই এক একটি সুন্দর অলঙ্কার।

দ্বিতীয়তঃ—দেহের বহির্জাগতিক অলঙ্কার

তাহার মধ্যে (১) দেহের বর্ণোৎকর্ষবিধায়ক অলঙ্কার যথা অলক্ত, অঞ্জন, চন্দন, কুঙ্কুম, হরিদ্রাভস্ম, লোধ্র পুষ্পের পরাগ, রুজ, পাউডার, লাক্ষী, তানাধা প্রভৃতি।

প্রাচীন কালে চন্দন দ্বারা রমণীরা বক্ষস্থল ও পুরুষেরা প্রকোষ্ঠদেশ অনুলিপ্ত করিতেন। "ন লুপ্তং সখি চন্দন স্তনতটে" এবং "ততঃ প্রকোষ্ঠে হরিচন্দনাঙ্কিতে" প্রভৃতি শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

(২) দেহের চিত্রবৈচিত্র্যবিধায়ক অলঙ্কার যথা, অলকা-তিলকা, পত্রলেখা, ত্রিপুণ্ড্রক ও দেহলেখা (উল্কি)।

পত্রলেখা একটি প্রাচীন অলঙ্কার। কালিদাসের কবিতায় অনেক স্থলেই ইহার উল্লেখ আছে। "ভুজে শচীপত্র বিশেষকাঙ্কিতে স্বনাম চিহ্নং নিচখান শায়কম্" এবং "গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ্বাসিত পত্র-লেখকম্" প্রভৃতি শ্লোক ইহার অস্তিত্বের নিদর্শন।

(৩) প্রাণীদেহজ অলঙ্কার যথা—অস্থি, পশুলোম, পশুচর্ম্ম, পাখীর পালক প্রভৃতি।

এই অলঙ্কারগুলি প্রকারভেদে অসভ্য ও সুসভ্য উভয় সমাজেই প্রচলিত।

(৪) উদ্ভিদ্দেহজ অলঙ্কার যথা—পত্র ও পুষ্প।

পুষ্পের ন্যায় সুন্দর বস্তু জগতে অতি অল্পই আছে বলিয়া প্রাচীন যুগ হইতেই ইহার এত সমাদর। বিলাসীর পক্ষে এরূপ অলঙ্কার আর নাই। তাই কালিদাস তাঁহার আদর্শ সৌন্দর্য্য রাজ্য অলকায় আদর্শ সুন্দরী যক্ষ বধূদিগকে এইরূপভাবে সাজাইয়াছেন—

"হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্র প্রসব রজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাং।"

পুষ্পালঙ্কারের নিকট স্বর্ণ মুক্তা হীরকাদি খচিত অলঙ্কারও যে নিকৃষ্ট—তাহাও কালিদাস পার্ব্বতীর অঙ্গে নিম্নলিখিত অলঙ্কার দিয়া সূচিত করিয়াছেন :—

"অশোক নির্ভর্ৎসিত পদ্মরাগমাকৃষ্ট হেমদ্যুতি কর্ণিকারম্
মুক্তাকলাপীকৃত সিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী।"

(৫) সুবর্ণরজত মণিমুক্তাদি নির্ম্মিত অলঙ্কার।

(৬) বস্ত্রালঙ্কার বা বেশ।

উপরে যে সকল বিভিন্ন শ্রেণীর অলঙ্কারের কথা বলা হইল তাহাদিগের

মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌ সাময়িক স্তরে, কোন্‌ সভ্যতার যুগে ক্রমোদ্ভূত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা এখন দুঃসাধ্য। তবে ইহা নিশ্চয় যে মনুষ্যের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও অলঙ্করণেচ্ছা বাহ্য প্রকৃতি দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম উদ্বোধিত হয়। একদিকে যেমন বহির্জ্জগতের অতুলনীয় শোভা দ্বারা মনুষ্যের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, অপর দিকে সে তেমনি নিজের দীনতা অনুভব করিয়া নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যকে অপহরণ করিবার ও সেই অপহৃত সৌন্দর্য্য দ্বারা আপনাকে বিভূষিত করিবার পরিকল্পনা করিতে লাগিল। ঐ যে আপেলটি ঝুলিতেছে। ঐ যে গোলাপ ফুলটি ফুটিয়া রহিয়াছে, ঐ যে ময়ূর তাহার বিচিত্র বর্ণের পুচ্ছ বিস্তার করিয়াছে ইহাদিগের কোন্‌টি না সুন্দর? ইহাদিগকে আত্মসাৎ করিতে পারিলে বুঝি আমিও ঐরূপ সুন্দর দেখাইব, এইরূপ সে চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু সে কোন্‌ সুন্দর বস্তুটিকে অগ্রে আত্মসাৎ করিবে? যেটি তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ অর্থাৎ যেটি আহরণ করিতে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। সে দেখিল পুষ্প বৃন্তচ্যুত হইয়া খসিয়া পড়ে, ময়ূর তাহার বই পরিয়া যায়, নানা বর্ণের মৃত পতঙ্গ ও প্রস্তরাদি ভূমি হইতেই কুড়াইয়া লওয়া যায়। সে প্রথমতঃ সেই সমস্ত লইয়া আপনার দেহ অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। কারণ যত অল্প ক্লেশস্বীকারে যত অধিক তৃপ্তি বা সুখ অর্জ্জন করা যায় তাহাই আমাদিগের বাঞ্ছনীয়—এই মূল সূত্রটি অর্থনীতি ও সমাজ-নীতির পক্ষে যেরূপ সত্য, অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেইরূপ। তবে মনুষ্য অল্প ক্লেশ স্বীকারে যে পরিমাণ তৃপ্তি অর্জ্জন করিতে পারে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ তৃপ্তি অর্জ্জন করিবার জন্য তদধিক ক্লেশ স্বীকার করিতেও প্রস্তুত,—যদি ক্লেশ অপেক্ষা তৃপ্তির পরিমাণ অধিক হয়। এই নিমিত্ত মনুষ্য ক্রমশঃ প্রকৃতি রাজ্যের দুরধিগম্য প্রদেশসমূহ হইতে অতিমাত্র ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল সংগ্রহ করিতেছে যেরূপ হীরক, মুক্তা ইত্যাদি; এবং পূর্ব্বে যে পরিমাণ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে পরিমাণ তৃপ্তি অর্জ্জন করিতে পারিত না, এখন সভ্যতা বৃদ্ধির জন্য তদপেক্ষা অনেক অল্প ক্লেশস্বীকার করিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ তৃপ্তি অর্জ্জন করিতে পারিতেছে।

যাহা হউক কিছুকাল প্রাকৃতিক বস্তুকে অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করিতে করিতেই মনুষ্য ঐ সকল বস্তুর অনুকরণে কৃত্রিম অলঙ্কার সকলও নির্ম্মাণ করিতে শিখিল এবং আজকাল আমাদের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট অলঙ্কারই এই

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—যেমন তারাহার, বৃশ্চিক হার, কার্পেটের জুতা, লেস্ ইত্যাদি।

কিন্তু প্রকৃতিরাজ্য হইতে গৃহীত বা প্রাকৃতিক বস্তুর অনুকরণে নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদের দেহের কোন্ কোন্ অংশকে ঐ সকল অলঙ্কার ধারণের উপযোগী করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত ওঁরাও, কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়েরা অলঙ্কার ধারণের জন্য এইরূপ ভীষণভাবে কর্ণবেধ ও নাসিকাভেদ করিয়া থাকে যে, তাহা দেখিয়া আমাদের হাস্য সম্বরণ করা দুরূহ হইয়া উঠে। কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ ঐ সকল স্থলেও ক্লেশ স্বীকার অপেক্ষা তৃপ্তি লাভের পরিমাণ অধিক। সুসভ্য সমাজেও অলঙ্কারধারণের নিমিত্ত ক্লেশস্বীকারের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে অর্থাৎ শারীরিক ক্লেশস্বীকারের বিরুদ্ধ অনুপাতে। হিন্দুস্থানী রমণীরা এখনও যেরূপ পৈরী ধারণ করিয়া থাকেন, সেরূপ একখানি অলঙ্কার যদি কোন বঙ্গ ললনাকে ধারণ করিতে হয়, তবে তিনি বরং উদূখল ধারণ করিবেন, তথাপি অলঙ্কার ধারণ করিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ—প্রাকৃতিক অলঙ্কার ব্যবহার করিতে হইলে আমাদের দেহেরও কোন কোন অংশের উন্নতি-সাধন দ্বারা তাহাদিগকে অলঙ্কাররূপে পরিণত করা আবশ্যক, এবং সেই সকল শারীরিক অলঙ্কার ব্যতীত বাহ্যিক অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য সম্যক্ বিকসিত হয় না। রমণীর কবরী তাহার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সূচ্যগ্র কেশের উপরে গোলাপ পুষ্প সন্নিবেশিত করা অপেক্ষা রমণীর কবরীতে সন্নিবেশিত করিলে তাহা যে অনেক অধিক সুন্দর দেখায় তাহা রমণীদ্বেষী ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিবেন।

এইরূপে কেশদন্তাদি শারীরিক অলঙ্কারের সহিত পুষ্পমণিরত্নাদি বাহ্য অলঙ্কারের ব্যবহার চলিতে লাগিল। কিন্তু বহির্জাগতিক অলঙ্কারের মধ্যে বর্ণোৎকর্ষ-বিধায়ক এক প্রকার অলঙ্কার আছে। সৌন্দর্য্য বলিলে মনুষ্য প্রথমে দেহের বর্ণকেই বুঝিত। পরে দেহের গঠন ও অবশেষে সুগঠনের সহিত সুললিত অঙ্গভঙ্গীও সৌন্দর্য্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। পুষ্পালঙ্কার ও বস্ত্রালঙ্কার গঠনোৎকর্ষ-বিধায়ক অলঙ্কার—কিন্তু চন্দনানুলেপনাদি বর্ণোৎকর্ষ-বিধায়ক অলঙ্কার, এবং এই শেষোক্ত প্রকার অলঙ্কারই যে প্রথমোদ্ভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্য আপনার ত্বকের উপরিভাগ যে সকল বর্ণে রঞ্জিত করিত বা তাহাতে যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিত তাহাদিগকে চিরস্থায়ী করিবার

জন্যই বোধ হয় দেহলেখার উদ্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু এক প্রকার দেহ-লেখা যতই সুন্দর হউক না কেন তাহা কিছুকাল পরে অশোভন হইয়া পড়ে বলিয়াই বোধ হয় দেহলেখার প্রচলন বর্ত্তমান সুসভ্য সমাজে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। একণে চিরস্থায়ী অলঙ্কারের পক্ষপাতী আমরা কেহই নহি; যে প্রকারের অলঙ্কারকে শীঘ্রই ধারণ ও উন্মোচন করা যায় তাহাই উন্নত প্রণালীর অলঙ্কার বলিয়া বিবেচিত হয়।

অলঙ্কারের দ্বারা যে প্রয়োজনীয়তা সংসাধিত হয়, তাহা প্রথমতঃ কেবল সৌন্দর্য্য-নিবদ্ধই ছিল, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যসাধনই অলঙ্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে পরিবর্ত্তনীয়তাও ঐ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ক্রমে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতাও উহার অপর একটি উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। পরিচ্ছদ দ্বারা যে, কেবল সৌন্দর্য্য সংসাধিত হয় তাহা নহে, উহা স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতারও অনুকূল এবং উহাকে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করা যায়। এই নিমিত্ত আধুনিক সুসভ্য সমাজে ক্রমশঃ স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্ম্মিত অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে এই শেষোক্ত প্রকার অলঙ্কারেরই সমধিক প্রচলন হইতেছে।

অলঙ্কারের প্রথম প্রয়োজন সৌন্দর্য্য হইলেও এমন অলঙ্কার আছে যাহা সুন্দর হইলেও স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। ইউরোপীয় রমণীরা যে 'করসেট' পরিধান করেন তাহা এক প্রকার গঠনোৎকর্ষ-বিধায়ক অলঙ্কার কিন্তু তাহা যে স্বাস্থ্যের অনুকূল নয় তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। আবার অনেক অলঙ্কার আছে যাহা কেবল স্বাস্থ্যের জন্যই প্রথম ব্যবহৃত হইত, এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল বলিয়াই ক্রমশঃ অলঙ্কারের পদবী লাভ করিয়াছে। ভূটিয়া রমণীগণ মুখমণ্ডলে যে লাক্ষার প্রলেপ দিয়া থাকে, তাহার আদিম উদ্দেশ্য শীত নিবারণ এবং আন্দামানবাসিগণ সর্ব্বাঙ্গে যে লোহিতবর্ণ মৃত্তিকা লেপন করে তাহার আদিম উদ্দেশ্য মশকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ দেশবাসীদিগের চক্ষে ঐ উভয় বস্তুই অতি রমণীয় অলঙ্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ একদিকে রমণীগণ অতিশয় মূল্যবান্ ও দুষ্প্রাপ্য অলঙ্কার ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেইরূপ অপর দিকে তাঁহাদিগের ব্যবহৃত অলঙ্কারের সংখ্যা, আয়তন ও গুরুত্বের হ্রাস হইতেছে। ইহাতে আশঙ্কা হয় যে, পরিশেষে সুসভ্য সমাজে প্রায় অধিকাংশ রমণীকেই অলঙ্কারহীনা হইতে হইবে এবং বিবাহ-কালে আর কেহই 'সালঙ্কারা-কন্যা' পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহাতেও পুরুষ জাতির বিশেষ ক্ষতি নাই কারণ অনেক স্বামীই পত্নীকে অলঙ্কার দিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

নূরজাহান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ মেহেরের সেই চিরবিরহের দিন সমুপস্থিত। এ বিরহ ক্ষণিকের নয়,—যতদিন দেহ থাকিবে, অবশিষ্ট জীবনের প্রত্যেক দিনের প্রতি মুহূর্ত্ত প্রিয়তমের বিরহ-বেদনার ব্যাকুল অশ্রু তাহার দুই নয়ন অন্ধ করিয়াই রাখিবে। এ জীবনে প্রাণাধিক প্রিয়কে চির-সান্নিধ্যের মধ্যে পাওয়ার সৌভাগ্য সকলের হয় না; তাহাকে দিনান্তদর্শনের সৌভাগ্যটুকু যদি থাকে, তাহার প্রিয় মুখখানি দেখিয়া প্রাণপ্রিয় ধন আমার সুস্থ আছে, সুখে আছে জানিয়াও আমার বুভুক্ষিত প্রেমের মর্ম্মঘাতী বেদনার কথঞ্চিৎ উপশম হয়; কিন্তু এ জীবনের লীলা শেষ করিয়া প্রেমাশ্রিত জনকে চিরবিরহের দুঃসহ দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়-দয়িত যখন লোকান্তর যাত্রা করে, বিধবার সে দিনের বক্ষ-বেদনা কেবল দুঃসহ বলিলে যে তাহার যথাযথ বর্ণনা হয় না। নিঃশ্বাস চলে বটে, কিন্তু তাহাকে প্রাণধারণ বলা যায় না। শ্রবণ, নয়ন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহাদের কার্য্য হয় ত বা করিয়া যায়, কিন্তু সে কার্য্যের ফলভোগী মন কি তাহার সংবাদ সব সময়ে লইবার মত অবস্থায় থাকে ?

একজনের জীবিতকালে তাহার স্নেহ-ব্যাকুল বাহুর বেষ্টনের মধ্যে ফাল্গুন পূর্ণিমার রজত-কিরণধারায় স্নান-স্নিগ্ধা মেদিনীর অপরূপ সৌন্দর্য্য মালঞ্চ-বিতানোত্থিত মল্লিমালতীর মনোমদ গন্ধ, আম্রমঞ্জরীর সুধারসতৃপ্ত বসন্ত-বৈতালিকের মনোমোহন কণ্ঠ যেমন করিয়া দেহ মন-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান করে, সেই স্নেহ বাহুত্ত'টি যখন কালের অকরুণ হস্ত আসিয়া আমার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া দেয় তখনও চিরদিনের এই বসন্তবর্ষাশরদধিষ্ঠিতা প্রবীণা ধরণী বর্ষে বর্ষে তেমনি করিয়াই নবীনা হইয়া ওঠে, মলয়াচলসম্পৃক্ত মন্দানিল বর্ষে বর্ষে বসন্তের পুষ্পবাটিকায় তেমনি করিয়াই অতিথির বেশে উপস্থিত হয়, শ্যামকান্তি নবজলধরের স্নিগ্ধকান্ত মনোমোহন মূর্ত্তি আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নিদাঘের যজ্ঞানল তেমনি করিয়াই নির্ব্বাপিত করিবার জন্য পরিপূর্ণ শান্তি-কুম্ভ হস্তে গভীর মন্দ্রে অভয় মন্ত্র উচ্চারণ করে, কিন্তু হায় একজনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যাহার সবই ফুরাইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে প্রকৃতির এই আনন্দ আয়োজন যে ব্যর্থ অপেক্ষাও ব্যর্থ !

যাহার চক্ষে জগত দেখিতাম সে চক্ষু আজ নিমীলিত, যাহার মনের আনন্দ-আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া আমার অন্তরের সব অন্ধকার দূর করিয়া দিত, সে মন যে আজ তাহার দেহের সঙ্গে সঙ্গে ধূলী-ভস্মে পরিণত হইয়াছে, তাই প্রিয়বিরহদুঃখকাতরা প্রিয়ার অন্তর বাহির সব যে অমানিশার অন্ধ অন্ধকারে নিমগ্ন। সুখ, আনন্দ, শান্তি ও সান্ত্বনা সব সেই পরলোক প্রবাসীর পদপ্রান্তে যাইয়া বারম্বার লুণ্ঠিত হইতে থাকে, ইহলোকের কিছুই আর তাহার দেহ-মন-ইন্দ্রিয়কে ক্ষণিক তৃপ্তিও দিতে পারে না; দুনিয়ার মালিকের মুকুটমণি রাজরাজেশ্বরী সর্ব্বসম্পদের একাধিকারিণী আনন্দময়ী মেহেরুন্নিসা জীবন থাকিতেও আজ প্রাণহীনা—রাজকান্তের বিয়োগদুঃখবিধুরা, জগদালোকরূপিণী, রূপময়ী মেহের বৈধব্যের শুভ্রাবরণমণ্ডিতা পাষাণ-প্রতিমা হইয়া গিয়াছে—প্রাণ থাকিলেও সে প্রাণে আজ আনন্দস্পন্দনের একান্ত অভাব।

স্বামিসঙ্গময় দিনের অকৃতকার্য্য, অকথিত বাণী, অঙ্গ-সেবা ও সাহচর্য্যের শত ত্রুটীর কথা আজ মনে আসিয়া পতিহীনার অন্তর কি ব্যাকুল বেদনায় অধীর করিতেছে তাহা সেই সর্ব্বসৌভাগ্যবঞ্চিতা বিয়োগবিধুরা বিধবাই বলিতে পারে!

এত দুঃখের মধ্যেও স্বামীর শেষ আদেশ পালনের প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া নূরজাহান নীরবে থাকিতে পারেন নাই। ভ্রাতা আসফ কর্ত্তৃক বুলাকীর রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া সমস্ত অবস্থা বুঝিতে মেহেরের ন্যায় বুদ্ধিমতীর বিলম্ব হয় নাই।—স্বামীর আদেশ মাথায় লইয়া—নূরজাহান শারিয়ারকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং লাহোরের রাজধানী অধিকার করিয়া বুলাকীর অভিযানের প্রতিরোধমানসে লাহোর দুর্গে সৈন্য সমাবেশ করতঃ দুর্গ, নগর ও রাজ-সিংহাসন সুদৃঢ় করিবার চেষ্টায় কায়মনে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! অদৃষ্টনেমী কাহার অদৃশ্য হস্তে নিয়মিত হইয়া তাহার আবর্ত্তন পূর্ণ করে কে জানে! কিন্তু ইহা জানি যে, অসৌভাগ্যের দিনে সহস্র চেষ্টাতেও ভাগ্যদেবতার প্রসন্ন হাস্য লাভ করা যায় না। পর্ব্বত-শিখর হইতে অবতরণ আরম্ভ হইলে শিখরীর পাদমূলে আসিয়া পতন অনিবার্য্যই হয়,—তৃণ, গুল্ম, প্রস্তর, বৃক্ষ, বল্লরী যাহাই কেন আশ্রয় করিনা, কিছুতেই আর অধঃপতম নিবারিত হয় না, আশ্রয়কে লইয়াই ভূমিশায়ী হইতে হয়।—অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেব সহস্র করে আকাশ আশ্রয় করিয়াও ঊর্দ্ধে আসন রক্ষা করিতে পারেন না, দিক্‌চক্রবালের অন্তরালে পড়িয়া তাঁহাকে দুর্ভাগ্যে

আত্মগোপন করিতেই হয়,—ইহাই জগতের নিয়ম! কেবল নূরজাহানের ভাগ্যে অন্যরূপ হইবে—ইহা কি সম্ভব? কত ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ পাত হইয়া গিয়াছে, যে নিয়মে বিশ্বচক্র ভ্রাম্যমান্ তাহার অণু পরিমাণ ব্যতিক্রমও হয় নাই, হইবেও না। মেহেরউন্নিসাকে তবুও ভাগ্যবতী বলিব; জীবন থাকিতে সে তাহার জীবনাধিকের স্নেহ-সাহচর্য্য-সান্নিধ্য পাইয়াছে, তাহার প্রাণপ্রিয় দয়িতকে সেবা, সহানুভূতি, শান্তি, সুখ দিতে পারিয়া নিজে নারীজন্ম সার্থক করিয়া গিয়াছে। কিন্তু হায়, এমন দুরদৃষ্টের সৃষ্টি জগতে হইয়াছে যে, যে দিন হইতে জীবনের আনন্দ-স্পন্দন সে অনুভব করিয়াছে, জীবনের সাফল্য কিসে এবং কোথায় জানিতে পারিয়াছে, সেই দিন হইতেই ব্যর্থতার বিন্ধ্যগিরিভার তাহার বুকে চাপাইয়াছে, নিঃসঙ্গে দুর্ভাগার জীবনান্ত দিনের স্তিমিতনেত্রে অশ্রু-বিন্দুর মধ্যে তাহার জীবনের শেষ যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে, তখনও তাহার আরাধ্য সার্থকতা বহু—বহু দূরে!! স্পর্শমণির ক্ষণিক স্পর্শ জোড়করে যাচিয়া যাচিয়া জীবন শেষ হইয়া গেল, ভাগ্যদেবতার প্রসন্নতা লাভ অদৃষ্টে ঘটিল না, দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া কৃপার দানভিক্ষা মাগিয়া সমগ্র জীবন কাটিয়া গেল, অনন্ত পথের অনির্দ্দেশ যাত্রার দিনে রিক্তমুষ্টি লইয়াই বিদায় হইতে হইল—এমন দুঃখী জীবনের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। দিনেকের সার্থকতার দুঃখ ও আনন্দ ক্রয় করিতে অবশিষ্ট জীবনের সব পরমায়ু আনন্দে দিতে পারিত—তবুও সে ক্ষণিকের সাফল্য লাভ অদৃষ্টে ঘটিল না। এমন ভাগ্যহীনের সংখ্যা জগতে কম নয়। সেই সকলের তুলনায় মেহেরকে সুখী বলিতেই হইবে। সুখ দুঃখ যে আপেক্ষিক শব্দ, তুলনায় ইহার পরিমাপ হইয়া থাকে, মেহের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই পায় নাই,—সুখের মুখ দেখিয়া জীবন ধন্য করিবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল।

শাহরিয়ারের সিংহাসনারোহণের ঘোষণা বুলাকীর নিকট পঁহুছিলে সসৈন্যে বুলাকী কেমন করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছিল, কেমন করিয়া নৃশংসের কৃতকার্য্যে শারিয়ারের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে এই চির-পরিচিতা স্নেহময়ী ধরণীর শোভাসৌন্দর্য্য দর্শনের সুখ হইতে চিরবঞ্চিত করা হইয়াছিল, কেমন করিয়া বুলাকির দয়ার্দ্র হৃদয়ের করুণায় অন্ধ রাজকুমারের জীবন রক্ষা হয়—সে সব কথা মোগল ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। শারিয়ারের পরাজয়ের পর সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের শরীররক্ষী সেনা ভিন্ন আর সহায় ছিল না, প্রায় সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের জন্য উৎসুক হইয়া

নানা ইতিহাস হইতে দেওয়া যাইতে পারে। নূরজাহানের পিতা গিয়াসবেগ কন্যাকে পরম যত্নে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন—সে কথা সকলেই জানেন এবং নানা দেশ হইতে কবিগণ বেগম নূরজাহানের নিকট সমস্যা পূরণের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আসিতেন—এই একটি মাত্র ঘটনায় বোঝা যায় যে, নূরজাহান কেবলমাত্র শিক্ষিতা ছিলেন না—তিনি সুকবিও ছিলেন। তাঁহার সূচী ও চিত্র শিল্পে নৈপুণ্য সর্ব্বজন-বিদিত, রঙ্গমহলের দাসীবৃত্তির দুঃখময় সময়ে ঐ শিল্পনৈপুণ্যই তাঁহার জীবনোপায় ছিল। নৃত্য, গীত ইত্যাদি কলাবিদ্যায় তিনি বিলক্ষণ পারদর্শিণী ছিলেন—কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, পারসিকদিগের প্রথানুসারে গিয়াসভবনে আমন্ত্রিত রাজকুমার সেলিম যে, মেহেরের নৃত্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এই সংবাদ নানা অসম্ভব কাহিনীতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যশাসনকালে নূরজাহান সর্ব্ববিষয়ে কি পরিমাণ দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইতি-পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, তাঁহার কার্য্যকুশলতায় রাজস্ব ও সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য তথ্য। স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার জন্য জাহাঙ্গীরের পানাসক্তি তিনি কত পরিমাণে কম করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ জাহাঙ্গীরের স্বরচিত জীবনচরিতেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। আপদ্‌গত স্বামীর উদ্ধারকল্পে অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়াও অস্ত্রধারণাপূর্ব্বক সৈন্যচালনার ভার স্বীয় হস্তে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার সাহসিকতা ও পতিপ্রেমের অমর উদাহরণ।

সুখে-দুঃখে, উৎসবে-ব্যসনে যাঁহার পার্শ্বচরী হইয়াছি, যাঁহাকে জীবনের চিরসঙ্গীরূপে, জীবনদেবতারূপে, হৃদয়ের মধ্যে বরণ করিয়া স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি তাঁহার জীবিতকালের যাবতীয় কর্ম্মে ও নর্ম্মে, তাঁহার শয়নে ভোজনে ভ্রমণে, বিশ্রামে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রত্যেক তুচ্ছতম কার্য্যেও যদি আনন্দবিধান করিতে না পারিলাম তবে নারীত্ব, পত্নীত্ব দুইই ব্যর্থ—ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে মেহেরের নারীজীবন ও পত্নীজীবন কিছুই ব্যর্থ হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

সন্ধ্যা।

দিবসের শ্রান্ত আলো বিধবার হাসি সম ম্লান,
নীড়ে-ফেরা বিহগের বন্ধ হল আনন্দের গান,
মুমূর্ষুর আশা সম শেষ আলো পড়িয়াছে হেলি
সন্ধ্যাসতী নামে ধীরে অন্ধকার অঞ্চলটি মেলি,
বিরহীর দীর্ঘ-শ্বাস কাঁপাইল স্থির তরু শির
বহিল সমীর!

নেবু ফুল গন্ধ আসে, সন্ধ্যার সে অলকের বাস,
কুমুদ উঠেছে ফুটি পূর্ণিমার বাগ নব আশ;
কামিনীর ঝরা দলে পূর্ণ আজ শ্যাম তরুবীথি,
জীবনের অবসানে এ যেন গো শৈশবের স্মৃতি!
গোলাপ উঠেছে ফুটি শিশুর সে প্রাণখোলা হাসি
সৌরকররাশি।

পশ্চিমের লাল আলো—শিশু দেখে মার স্নেহ মুখ,
তারই তলে আছে যেন মায়েরই যতন ভরা বুক,
আকাশের তারা দেখে মানবেরে সোদরের স্নেহে,
অশরীরি স্পর্শ যেন বুলাইয়া দেয় সর্ব্ব দেহে!
কণা কণা স্নেহাশীষ ঝরিতেছে সাঁঝের আলোকে
দ্যুলোকে ভূলোকে!

যে কেঁদেছে সারাদিন সন্ধ্যাদেবী মুছাবে সে আঁখি
যাহার লেগেছে ধূলা সে ধূলা আপনি লবে মাখি,
শান্তিহারা হৃদয়েরে ঝিল্লীরবে বলিবেরে 'ঘুমা'—
শোক-পাণ্ডু অধরেতে দিবে আঁকি কি নিবিড় চুমা,
আশ্রয়-হীনেরে লবে কোলে তুলি, দিবে দোল ধীরে
স্নেহাঞ্চলে ঘিরে।

শ্রীনিরুপমা দেবী।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্যের পরিচয়। *

প্রখ্যাতনামা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহোদয়ের বংশধরগণের এবং এতদ্দেশীয় আরও বহুলোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহাশয় ন্যায় কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি ন্যায় গ্রন্থকার সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য। এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপে তাঁহারা বলেন যে—"ভাদুড়ীবংশের বংশাবলী" নামক গ্রন্থে আছে—

"বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ ভুবিবিখ্যাতমঙ্গলঃ
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধবিধ্বংস হেতবে।
বিখ্যাত উদয়নাচার্য্যো বভূব শঙ্করো যথা।
ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশায় চকরে কুসুমাঞ্জলিং।
সএবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংস কৌতুকী।
কুল্লুকং ভট্টমাশ্রিত্য ময়ূর ভট্টকং তথা।" ইত্যাদি

এই শ্লোকগুলিতে পাওয়া যায় যে, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহাশয় শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ। তিনি কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং বারেন্দ্র কুলগ্রন্থেও ঐ কথা আছে, এবং লালমোহন বিদ্যানিধির সুপ্রসিদ্ধ "সম্বন্ধনির্ণয়" গ্রন্থেও উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহাশয়কে ঐরূপে পরিচিত করা হইয়াছে। সুবিখ্যাত মহাকোষ "বিশ্বকোষে"ও প্রথমতঃ একটু সংশয়ের সূচনা করিয়া শেষে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহাশয়কেই কুসুমাঞ্জলিকার মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বলিয়া সমন্বয় করা হইয়াছে।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, প্রবাদমূলক বা স্বেচ্ছাকৃত কতিপয় আধুনিক সংস্কৃত কবিতার প্রতি নির্ভর করিয়াই ঐরূপ একটা সিদ্ধান্ত স্থির করা তত্ত্বনির্ণীষু-দিগের কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির মাহাত্ম্যেই যদি ঐরূপ করা যায়—তাহা হইলে "ভক্তিমাহাত্ম্য" গ্রন্থের—

"ভগবানপি তত্রৈব মিথিলায়াং জনার্দ্দনঃ
শ্রীমদুদয়নাচার্য্যরূপেণাবততারহ॥
বৌদ্ধসিদ্ধান্ত মুগ্ধানাং সুখায় হিতকারিণীং।
ব্যাতেনে বিদুষাং প্রীত্যৈ বিমলাং কিরণাবলীং॥
অদ্যাপি মিথিলায়াস্তু তদন্বয় ভবাদ্বিজাঃ।
বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রসম্পন্নাঃ পাঠয়ন্তি গৃহে গৃহে॥"

* রাজসাহী উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

এই শ্লোক গুলিকেই বা কি বলিয়া একেবারে উপেক্ষা করা যায় ? উদয়নাচার্য্য মিথিলায় অবতীর্ণ। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ মিথিলায় অধ্যাপনা করিতেছেন, একথা ঐ শ্লোক গুলিতে স্পষ্ট রহিয়াছে। কিম্বদন্তী ইতিহাস সংগ্রহের একটা প্রধান উপকরণ বটে, কিন্তু কিম্বদন্তীর নির্ব্বিচার-বিশ্বাস সত্য নির্ণয়ের অনুকূল নহে পরন্তু প্রতিকূল। পরন্তু কিম্বদন্তী সর্ব্বত্র একমূর্ত্তিতে স্থিরভাবে অবস্থান করিলে তাহার মূলটি সুদৃঢ়, ইহা মনে করা যাইতে পারে ; কিন্তু নানাস্থানে নানামূর্ত্তিতে অবস্থান করিলে তাহার মূলের দৃঢ়তা নাই ইহা সুনিশ্চিত। মিথিলামণ্ডলে কিম্বদন্তী আছে—উদয়নাচার্য্য মিথিলাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উদয়নাচার্য্য মিথিলার "করিয়ন্" নামক গ্রামে আবির্ভূত হইয়া ন্যায়কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; মৈথিল নৈয়ায়িকগণ সুচিরকাল হইতে ইহা সিদ্ধতত্ত্বের ন্যায় বলিয়া আসিতেছেন।

আমি কিন্তু এসব কথা আমার সিদ্ধান্তের প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতেছি না। কিম্বদন্তী বা ঐতিহ্য নিরপেক্ষ প্রমাণ নহে। প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইলে এবং কোন প্রামাণিক তত্ত্বের প্রতিপাদক না হইলে উহা অপ্রমাণ ইহাই প্রমাণতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গোতম প্রমাণ ঐতিহ্যকে শব্দ-প্রমাণের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ঐতিহ্যমাত্রই প্রমাণ নহে। সুতরাং এখন আমরা প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রমাণের অনুসন্ধান করিব। কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্য "লক্ষণাবলী" নামে একখানা গ্রন্থ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা পণ্ডিতগণের অবিদিত নাই। ঐ গ্রন্থ অনেকদিন মুদ্রিত হইয়াছে। উহার শেষে আছে—

"তর্কাম্বরাঙ্ক প্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীং ॥"

ইহার দ্বারা বুঝা যায় উদয়ন ৯০৬ শকাব্দ অতীত হইলেই "লক্ষণাবলী" নিৰ্ম্মাণ সমাপ্ত করিয়াছেন।

১৩১১ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় "গোতমের প্রতিভা" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্যের সময় স্থির করিতে না পারায় ঐ প্রবন্ধের সম্পাদকীয় মন্তব্যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাবলীর শেষ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্য ৯০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ৯৮৪ খৃষ্টাব্দ অতীত হইলেই লক্ষণাবলী রচনা করেন—এই কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্যের সময় সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা কেবল আমারই ব্যাখ্যা নহে।

সকলেই জানেন রাজা বল্লালসেন কর্তৃক কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার অনেক পরে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহাশয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করেন। বল্লালের পূর্ব্বে ভাদুড়ী উপাধির সৃষ্টিই হয় নাই। বল্লাল সেনের "দানসাগর" গ্রন্থের শেষে আছে—

"নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীবল্লালসেনদেবেন।

পূর্ণে নবশশিদশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ॥"

ইহার দ্বারা নিঃসংশয়ে বুঝা যায় বল্লালসেন ১০১৯ শকাব্দে দানসাগর গ্রন্থ রচনা করেন। বল্লালের সময় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তিনি ৯০৬ শকাব্দের পরবর্ত্তী এবিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। এখন এই বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী ৯০৬ শকাব্দের গ্রন্থকার উদয়নাচার্য্য কিরূপে বল্লালের অনেক পরবর্ত্তী উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী হইতে পারেন ইহা সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখুন।

অনেকে বলিতে পারেন লক্ষণাবলীর ঐ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কারণ এমন সহজ উত্তর আর নাই, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইলে তাহার প্রমাণ চাই। কিম্বদন্তী বা তন্মূলক কবিতাগুলি স্বতঃ প্রমাণ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং তাহা উভয়পক্ষেই আছে। বলবৎ প্রমাণের সহিত বিরোধ দেখাইতে না পারিলে কাহাকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। পূর্ব্ব-মীমাংসা দর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলেই স্মৃতির অপ্রমাণ্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কারণ সেখানে বলবৎ প্রমাণের সহিত বিরোধ হইয়াছে। পরন্তু প্রক্ষিপ্ত বলিতে গেলে সেখানে প্রক্ষেপকারীর একটা দুরভি সন্ধির কল্পনা করিতেই হইবে। উদয়ন ৯০৬ শকাব্দে লক্ষণাবলী রচনা করিয়াছেন, এই কথায় প্রক্ষেপ করিয়া কাহার কোন্ স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হয়। উদয়ন বাঙ্গালী ছিলেন না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিদেশীয় পণ্ডিত ঐরূপ প্রক্ষেপ করিলে তাহাকেই প্রক্ষিপ্ত বলিতে হয়। কারণ ঐ শ্লোকে আর কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই। কেবল তাহার রচনাকালই বিশেষতঃ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে তিনি উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী না হইতে পারিলেও ৯০৬ শকাব্দের উদয়ননামা কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত বলিয়া বসিলে—প্রক্ষেপকারীর ইষ্টসিদ্ধি হয় কৈ? ফলতঃ কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্যকে নিজের দেশের লোক বলিয়া পরিচিত করিবার এত ইচ্ছা হইলে প্রক্ষেপকারী এমন অনেক শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন, যাহাতে আর তাহার উপরে বঙ্গবাসী আর কোন তর্ক করিতে পারিত না। বলা বাহুল্য সত্যবাদী সরল অপেক্ষায়

কুটিল প্রবঞ্চকগণ অনেক বেশী সাবধান ও চিন্তাশীল। ফলতঃ লক্ষণাবলীর শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সংশয় করিলেও ঐ সংশয়ের প্রকৃত কারণ দেখাইতে হইবে। ঐরূপ সংশয় হইতে পারিলে উদয়নাচার্য্য ভাতুড়ীই কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্য কি না এইরূপ সংশয়ই বা কেন হইবে না। তাহার মৈথিলত্ব সম্বন্ধেও প্রবাদও সংস্কৃত শ্লোকে পাওয়া যায়। কুসুমাঞ্জলির প্রাচীন টীকাকার বাঙ্গালী রামভদ্র সার্ব্বভৌমও উদয়নাচার্য্যকে মৈথিল বলিয়া করিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপের নৈয়ায়িক গুরুমণ্ডলীও তাহাই বলিতেন। নবদ্বীপের হরিদাস তর্কাচার্য্য কুসুমাঞ্জলিকারিকার যে ব্যাখ্যা বা টীকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি একস্থানে উদয়নের নিজকৃত একটি মূলকারিকার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যান করিয়া ঐ কারিকাটিকে গ্রন্থান্তর হইতে সংকলিত প্রমাণের ন্যায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে বা তৎকালে নবদ্বীপে অন্য কাহারও নিকটে কুসুমাঞ্জলিকার মূল আদর্শ পুস্তক থাকিলে তাহার কখনই ঐরূপ ভ্রম বা বিস্মৃতি হওয়াও সম্ভব ছিল না। এজন্য নবদ্বীপাদি প্রদেশে সুচিরকাল হইতে প্রবাদ রহিয়াছে যে, হরিদাস তর্কাচার্য্য মিথিলা হইতে গুরুমুখে কুসুমাঞ্জলিকারিকা ও তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আসিয়া তাঁহার স্মৃতির সাহায্যে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার টীকা অন্যান্য বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণের টীকার ন্যায় সমীচীন ও পরিপূর্ণ হয় নাই এবং এই জন্যই কোন একস্থানে তাঁহার বিস্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বকোষ লিখিয়াছেন যে, উদয়নাচার্য্য ভাতুড়ীর "লীলাবতী" নামে এক অতি বিদুষী কন্যা ছিল। বল্লভাচার্য্যের সহিত তাহার বিবাহ হয়। ঐ কন্যা পতিশোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া এক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। উহার অনুলিপি অদ্যাপি থর্পীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের গৃহে আছে। ইহা সত্য হইলে উদয়নাচার্য্য ভাতুড়ী মহাশয়কৃত কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি নানাগ্রন্থ অথবা তাঁহার কোন একখানা গ্রন্থ অথবা তাঁহার কোন একটা চিহ্ন তাঁহার বংশধরদিগের গৃহে থাকে না কেন? সে ত বড় বেশী দিনের কথা নয়। তৎকালের হস্তলিখিত পুস্তক এখনও ত মিলিতেছে। আমি কিন্তু এ গুলিকে আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণরূপে উল্লেখ করিতেছিনা। আমি বলিতে চাই যে লক্ষণাবলীর শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া যাঁহারা সংশয় করিতেন তাঁহারা উদয়নাচার্য্য ভাতুড়ীই কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্য কিনা এ সংশয় কেন করেন না? সে বিষয় একেবারে দৃঢ় নিশ্চয় থাকার কারণ কি? সংশয়েরও প্রচুর কারণ উল্লেখ করিয়া দেখাইলাম। ফলতঃ এ

বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া কেবল লক্ষণাবলীর শ্লোকের প্রক্ষিপ্ততার সংশয় করা কোন্ বিচারের কথা, তাহা সুধীগণই বিচার করুন।

আমার দ্বিতীয় কথা—

নৈষধীয়চরিত ও খণ্ডনখাদ্যকার শ্রীহর্ষ তাঁহার খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থে উদয়নের কোন একটি কুসুমাঞ্জলিকারিকা উপহাস করিয়া তাহার খণ্ডন করিতে গিয়াছেন। সুতরাং কুসুমাঞ্জলিকার উদয়ন শ্রীহর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা সুনিশ্চিত। ঐ শ্রীহর্ষের কালসম্বন্ধে তিনটি মত আছে।

প্রথম মত এই যে কান্যকুব্জ হইতে গৌড় সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম শ্রীহর্ষই নৈষধীয়চরিতাদি গ্রন্থকার শ্রীহর্ষ। সম্বন্ধনির্ণয়কার প্রভৃতি অনেক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এই মতের গায়ক।

এই মতে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কোন মতেই কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্য হইতে পারেন না, ইহা আর বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না। কারণ বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের অনেক পরে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর জন্ম হইয়াছে। তিনি শ্রীহর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না।

দ্বিতীয় মত এই যে, নৈষধীয়চরিতকার শ্রীহর্ষ গৌড়সমাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম শ্রীহর্ষ নহেন। নৈষধীয় চরিতকার শ্রীহর্ষের পিতার নাম "শ্রীহীর", ইহা তিনি নৈষধীয়চরিতেই লিখিয়াছেন। কান্যকুব্জ হইতে গৌড়সমাগত ঋত্বিক্ শ্রীহর্ষের পিতার নাম "মেধাতিথি"; ইহা কুলগ্রন্থে লিখিত আছে। ঋত্বিক্ শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। নৈষধীয়চরিতকার শ্রীহর্ষ তদানীন্তন কান্যকুব্জাধিপতির সভায় প্রত্যহ উপস্থিত থাকিয়া দুইটি তাম্বুল ও একখানা আসন পাইতেন ইহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—

"তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ"

নৈষধীয়চরিতকার শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জাধিপতি জয়ন্তচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। জয়ন্তচন্দ্র খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। জৈনপণ্ডিত রাজশেখর সূরির "প্রবন্ধকোষে" তাহা বিশদ বর্ণিত রহিয়াছে। মূলকথা নৈষধীয়চরিতকার শ্রীহর্ষ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। তিনি গৌড় সমাগত শ্রীহর্ষ নহেন। এই মতের উদ্ভাবক এবং সমর্থক বুলার সাহেব।

তৃতীয় মতের উদ্ভাবক এবং বিশেষ সমর্থক আমাদিগের পরম প্রীতিভাজন শ্রীমান্ রমাপ্রসাদ চন্দ। ইনি বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন নৈষধীয় চরিতকার শ্রীহর্ষ খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীর লোক। তাঁহার মতের প্রমাণাদি

প্রদর্শন বাহুল্যভয়ে আমি পরিত্যাগ করিলাম। অনুসন্ধিৎসু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিবেন। এখন আমি বলিতেছি যে, শ্রীহর্ষ কাহারও মতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন; সে বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই; পরন্তু বিরুদ্ধ প্রমাণই প্রচুর আছে। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহাশয়ের অধস্তন পুরুষের হিসাব ধরিলে এবং কুলগ্রন্থের আলোচনা করিলে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহাশয় বড় জোর খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক হইবেন ইহা নিশ্চিত। বাহুল্যভয়ে ইহা বুঝাইয়া দিতে পারিলাম না। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সময় জানিতে গেলে কোন মতেই তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন না ইহা বিশেষ করিয়া জানিয়াছি। তাহা হইলে দেখুন, পূর্ব্বোক্ত শ্রীহর্ষ (অর্থাৎ যিনি দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন—ইহা সর্ব্বসম্মত), যাহার গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন তিনি উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কোন মতেই হইতেই পারেন না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে তবে কুলগ্রন্থে ঐরূপ নিশ্চিত আছে কেন, এদেশে ঐরূপ জনশ্রুতি আছে কেন? ঐ জনশ্রুতির কি কোন মূল নাই? 'নহ্য মূলাজনশ্রুতিঃ' এতদুত্তরে আমার এখন বক্তব্য এই যে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহাশয় মহাপণ্ডিত ও মহাশক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ এদেশে প্রচারিত হইলে তখন তাহা উদয়নাচার্য্যকৃত ইহা জানিয়া পরবর্ত্তী কুলজ্ঞগণ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহোদয়ের পাণ্ডিত্য ও শক্তির পরিচয় স্মরণ করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন। আবার অনেক সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বড় করিবার জন্য পূর্ব্বতন কুলজ্ঞগণ কাল্পনিক ইতিহাসও লিখিতেন, ইহা অসত্য কথা নহে। কাল্পনিক ইতিহাস কোন উদ্দেশ্য-মূলকই হইয়া থাকে। ভোজপ্রবন্ধ, শঙ্কর-দিগ্বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে যে সমস্ত কাল্পনিক ইতিহাস দেখা যায় তাহা সর্ব্বথা প্রমাণ-বিরুদ্ধ। তাহা কোন ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন না, করিতে পারেন না। উহা লেখকের কোন উদ্দেশ্যমূলক নবীন সৃষ্টি। কুলগ্রন্থের পর হইতে তদনুসারে ঐরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত হইয়াছে।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহাশয় বঙ্গদেশে কুসুমাঞ্জলিকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারেন। পাবনার অন্তর্গত শালিখা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বিচারক মহাপণ্ডিত গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে লঘুভারতগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই—

"স এবোদয়নাচার্য্যো বিদ্যকার কুসুমাঞ্জলিঃ
তীর্থ পর্য্যটনে ন বধং তস্মাদ্ গৌড়ে প্রকাশিতং।"

অর্থাৎ তিনি বলিয়াছেন যে উদয়নাচার্য্য তীর্থপর্য্যটন করিতে যাইয়া কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। তৎপূর্ব্বে তাহা গৌড়দেশে ছিল না; তিনি গৌড়দেশে তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। এখন সুধীগণ সব কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিয়া সিদ্ধান্ত করুন—আমি এইখানেই নিবৃত্ত হইলাম।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

প্রথম পাপ।

কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে আমরা বসুজা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতাম। তিনি যেমন সদুত্তর দিতে পারিতেন, অন্য কেহ তাহা পারিত না। তাঁহার কথাগুলি বেশ সরল। বসুজা মহাশয় খুব বৃদ্ধ, এবং তাঁহার আচার ব্যবহার খুব শুদ্ধ। তিনি প্রায় অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমের লোক। অনেক দেশের পুরাতন কাহিনী তাঁহার জানা ছিল।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "পাপপুণ্য জিনিসটা কি ?"

বসুজা মহাশয় বলিলেন যে পাপ পুণ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা ; কিন্তু ইহারও গল্প আছে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কিংবা পুরাণে কে প্রথমে পাপ করিয়াছিল তাহার কোন গল্প নাই, কিন্তু অন্যান্য দেশে কিঞ্চিৎ আছে। তাহার মধ্যে 'প্রথম পাপের' গল্পটা মন্দ নয়। আমাদের দেশেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

প্রথম পাপের গল্পের সার এই যে, বেশী বুদ্ধি হওয়া মহাপাপ। ছেলে পুলেদের যত বুদ্ধি বাড়িতে থাকে, ততই পাপ করিতে থাকে, ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া যখন বুদ্ধি পরিপক্ক হয়, তখন চুল পাকিয়া এবং দাঁত পড়িয়া তাহারা জীবন লীলা সংবরণ করে। সেই সময় তাহাদের দেহের উত্তাপ কমিয়া গিয়া অনুতাপ বাড়ে। উত্তাপ যেমন গরম, অনুতাপ তেমনি বরফের মত ঠাণ্ডা। যাহার শরীর খুব শীতল, সে সচরাচর বৃদ্ধ। জ্বর হইলেও তাহার ১০০ ডিগ্রীর বেশী থার্ম্মোমেটারে উঠে না। অনেকে মনে করে সেটা সামান্য জ্বর, কিন্তু তাহা নয়। তাহার পক্ষে ১০০ ডিগ্রীই ভয়ানক। মরিয়া ভূত হইলে এ উত্তাপটুকুও থাকে না।

বসুজা মহাশয় এইরূপে কথাটা পাড়িয়া নরেনকে প্রথম পাপের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বসুজা মহাশয় বলিলেন যে, এ গল্প সৃষ্টির প্রাক্কালের কথা। অতএব কিঞ্চিৎ দুরুহ। বিধাতা প্রথমে একটা ছেলে ও একটা মেয়ে সৃজন করিয়া নন্দন-কাননে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ছেলেটি পশুদিগকে চরাইত। মেয়েটি পক্ষী-গণকে দেখিত।

এটা কেবল নমুনার জন্য। তোমরা জান বোধ হয় যে, কোন জিনিসের

পেটেণ্ট লইতে হইলে প্রথমে একটা নমুনা কিংবা আদর্শ তৈয়ারি করিতে হয়। সেটা দশজনের পছন্দ হইলে সেই ছাঁচে পরে অনেক সংখ্যা বাহির হয়। এই যে প্রথম ছেলে ও মেয়ে তাহারা মানুষের ছাঁচে সৃষ্ট হইয়াছিল।

ছেলেটির নাম বৃষকেতু এবং মেয়েটির নাম সুচতুরা। এই রকম নাম দেওয়ার তৎপর্য্য এই যে, ছেলেটি বড় বোকা। কিন্তু মেয়েটি বড় চালাক্। একজনকে বোকা এবং অন্যটিকে চালাক করিবার তাৎপর্য্য এই যে, দুইজন বোকা কিংবা দুইজন চালাক কখন একস্থানে বাস করিতে পারে না। খুনাখুনি করে।

আবার মনে করিয়া দেখ, যদি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একজন বোকা হয়, এবং আর একজন যদি চালাক হয় তবে একজন তাহার মধ্যে নিশ্চয় স্বামী এবং আর একজন স্ত্রী। অনেকবার সৃষ্টি করিয়া বিধাতার এসব কথা জানা ছিল।

আমি যে গল্প বলিতেছি তাহাতে বৃষকেতু খুব বোকা এবং সুচতুরা খুব চালাক ছিল। কিন্তু চালাক হইলে কি হয়? তখনও তাহাদের বুদ্ধি হয় নাই। বুদ্ধি কাহাকে বলে? কথার মানে জানার নাম বুদ্ধি। প্রথম সৃষ্টির সময় কথার প্রচার হয় নাই। অভিধান ছিল না। এই সকল অভাববশতঃ ছেলেটি সেই মেয়েটির দিকে, এবং মেয়েটি সেই ছেলেটির দিকে চাহিয়া থাকিত। ছেলেটি ভাবিত 'কি সুন্দরী মেয়ে।' মেয়েটি ভাবিত "কি বোকা ছেলে!"

নন্দন-কানন অতিশয় মনোহর স্থান। সবুজ পত্রে পরিপূর্ণ বৃক্ষলতা। শীতগ্রীষ্ম সকলই মৃদুল, অতএব বসন্ত চিরবিরাজমান। একটু গ্রীষ্মের আতিশয্য হইলে ময়ূর এবং দর্দ্দুর মল্লার রাগিনী গাহিয়া মেঘের সঞ্চার করিত। একটু শীতের আতিশয্য হইলে সিংহ এবং গজ দীপক রাগিনী ভাঁজিয়া দিনকরকে প্রখরতর করিয়া তুলিত। সারা সৃষ্টির যৌবন-মদগর্ব্বিত রসাল ভাব। বোধ হইত সকলেরই এক বয়স। মানুষের, গাছের, পর্ব্বতের, ব্যাঘ্র ভল্লুকের, মশা এবং মক্ষিকার। সকলেই সমবয়সী এবং পরস্পরের মধ্যে খুব ভাব, কারণ কাহারও আত্মপর জ্ঞান ছিল না। ব্যাধি, জরা, মরণ ছিল না। অন্নচিন্তা ছিল না।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেলে, একদিন সুচতুরা বনভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্তা হইয়া একটা প্রকাণ্ড আঙ্গুর বৃক্ষের নীচে বসিয়া পড়িল। বৃষকেতু একটা অশ্বত্থবৃক্ষের নিচে ঘুমাইতেছিল।

সেই নন্দন-কাননে অনেক বৃক্ষ ছিল, তাহার মধ্যে এই আঙ্গুরবৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা লতানো এবং বিস্তৃত। সেই বৃক্ষের মধ্যে সৃষ্টির যত বুদ্ধি লুক্কায়িত ছিল। সেই জন্য তাহার ফল বড় রসাল। বিধাতা সেই ফল সকলকে খাইতে মানা করিয়া দিয়াছিলেন, কারণ, বেশী বুদ্ধি হওয়া মহাপাপ। সেই আঙ্গুর বৃক্ষের নাম শব্দার্থ-প্রকাশিকা!

১

সেই অভিশপ্ত পাদপের নিকট কোন জীব যাইত না। বৃক্ষের ডালে পাখী বসিত না। বৃক্ষের তলে ভ্রমেও কোন পশু বিচরণ করিত না। কিন্তু অদৃষ্ট এমন ভয়ানক জিনিষ যে, সেদিন সুচতুরা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে, সে বিচার পূর্ব্বক বৃক্ষের তলে অগ্রসর হইয়াছিল। বিচারটা এই রকম—

'যদি ফল খাইতে বারণ, তবে ইহাতে বিষ আছে। নন্দন কাননে বিষ নাই। অতএব এ ফলে বারণ থাকিতে পারে না।'

কিংবা 'হয়ত এই ফলে, বিষ আছে কিংবা নাই,
যদি বিষ নাই তবে খাইতে দোষ কি?

যদি বিষ থাকে তবুও খাওয়া উচিত, কেন না এ রকম একঘেয়ে জীবন দুঃসহ।'

নরেন বলিল—'এগুলা 'সিলজিস্‌ম্।'

বসুজা বলিলেন—'ঠিক'।

এই রকম নানা প্রকার 'হাইপথেটিকেল' কিংবা 'ডিস্‌জংকটিভ' সিলজিস্‌ম্, কিংবা একটা 'ডাইলেমা' মনের মধ্যে গঠন করিয়া সুচতুরা সেই গাছের দিকে তাকাইতে লাগিল।

ন্যায়শাস্ত্র বড় ভয়ানক জিনিষ। বিশেষতঃ ছেলেপুলেরা যত ন্যায়বাগীশ বৃদ্ধেরা তত নয়। বিধাতা-পুরুষ যখন তাঁহার নিষেধ প্রচার করেন তখন মানুষকে ন্যায় বিচারের স্বাধীনতা হইতে বর্জ্জিত করেন নাই। তোমরা কলেজের ছেলে শীঘ্র বুঝিতে পারিবে। অর্থাৎ ডিডক্‌টিভ্ সিলজিস্‌মের সূত্র মনের মধ্যে আওড়াইয়া সুচতুরার ইন্‌ডক্‌টিভের দিকে দৃষ্টি গিয়াছিল। কথাটা সত্য কি মিথ্যা তাহা পরীক্ষা করিবার ঘোর প্রবৃত্তি হইল।

এ প্রবৃত্তি সৎ কি অসৎ তাহা বলিবার দরকার নাই। গুরুজনের নিষেধ বাক্য অন্ধের মত বিশ্বাস করা কি মনুষ্যত্ব?

সুচতুরার মনের মধ্যে এই যে একটা মহাবিপ্লব ঘটিতেছিল, তাহা সেই বৃক্ষের গুণে। মলয়পবন সেই বৃক্ষের কচিপাতা যতই দোলাইতে লাগিল, সুচতুরার কৌতূহলও ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই বৃক্ষের পাতার ভিতর দিয়া সর্পের মত মুখ ও পক্ষীর মত দেহ সম্পন্ন একটি অদ্ভুত জীব বাহির হয়ই৷ সুচতুরাকে নমস্কার করিল।

সেটা মনুষ্য, কিংবা পশু কিংবা পক্ষী কিছুরই মত নয়। সুচতুরা চালাক মেয়ে হইলেও একটু ভীতা, এবং বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

সেই অদ্ভুত জীব বলিল "আমার নাম 'অভিধান'। কেহ কেহ বলে আমি 'মায়া', কিন্তু বাস্তবিক আমি তোমাদের ঠান্‌দিদি।"

ঠান্‌দিদি! কি মধুর নাম। ঠান্‌দিদির বিমর্ষ মুখ দেখিয়া সুচতুরার হৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল। সুচতুরা ঠান্‌দিদির নিকটে গিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিল "ঠান্‌দিদি! তুমি এত দুঃখিতা কেন?"

ঠান্‌দিদি বলিলেন "সে দুঃখের কথা শুনিয়া কি হইবে? তবে তোমাকে না বলিলে বলিব কাহাকে? তোমাদের পিতামহ (বিধাতা প্রজাপতি) আমাকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। ভালবাসেন না।"

সুচতুরা ভাবিল 'ভালবাসা কি?'

ঠান্‌দিদি বুঝাইয়া বলিলেন "বাছা, কোলে আয়। তোকে সব কথা বলি। ঐ যে বিধাতা, তিনি পুরুষ মানুষ। পুরুষ স্বভাবতঃ বড় নিষ্ঠুর। এই যে সৃষ্টি এ সব আমার মেহনত। তিনি কেবল চক্ষু উল্‌টাইয়া চিরকাল আরাম করেন এবং সৃষ্টিটা হইয়া গেলে আমাকে এই আঙ্গুর গাছে বাঁধিয়া রাখেন। ইহার নাম ভালবাসা।"

সুচতুরা বলিল 'এটা ভারি অন্যায়।'

বৃদ্ধা মায়াময়ী ঠান্‌দিদি বলিলেন "তাই বিচার করিয়া দেখ বাছা! এটা পুরুষ মানুষের ভালবাসা। আর, আমাদের ভালবাসা বুঝিয়া দেখ। এই সংসার ঠিক এক রকম থাকে না। প্রত্যহ মাসে মাসে, যুগে যুগে, বদলায়। আজ যে বাঁচিয়া আছে, কল্য সে মরিয়া যাইবে! তোমার ঠাকুরদা, রোজ একটা করিয়া রূপ ধরেন, আমি কাঁদিয়া সারা হই। আমার কত শত ছেলে-পুলে হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। তিনি সকলকে খাইয়া বসিয়া আছেন। কতবার নূতন সংসার, নূতন দেশ, নূতন গিরিসমুদ্র ও উপবন এবং নূতন ঘরে নূতন গান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই আমার দুঃখ মিটে নাই।"

সুচতুরা জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

ঠানদিদি বলিলেন "তাদের বুদ্ধি ছিল না। জড়-ভরতের মত সব খেলা করিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া যাইত। কেবল আমার দুঃখের জন্য।"

সুচতুরা। এ বুদ্ধি হয় কিসে?

ঠান্‌দিদি সুচতুরার মুখে এক গুচ্ছ রসাল আঙ্গুর দিয়া বলিলেন "খাইয়া দেখ।"

৩

সুচতুরা ইতস্ততঃ চাহিয়া একটি আঙ্গুর টপ্‌ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিল। তাহার আস্বাদ অতি চমৎকার! ক্রমে দুইটি, তিনটি, এবং বিশ পচিশটি আঙ্গুর খাইয়া তাহার বুদ্ধির ক্রমে বিকাশ হইতে লাগিল।

সুচতুরা দেখিল যে নন্দন-কানন, তাহা ঠিক এক রকম নয়। পশু এক রকম, পক্ষী এক রকম, গিরিনদী এক রকম, এবং বৃষকেতু আর এক রকম। সে নিজে কোন রকম নয়। সকলের বয়সও এক রকম নয়। কেহ ছোট, কেহ বড়! বৃষকেতু বড়, সে ছোট। তাহাতে তাহার একটু লজ্জা হইল। আবার দেখিল সে নিজে খুব বুদ্ধিমতী এবং বৃষকেতু বেয়াকুফ। তাহাতে তাহার একটু দুঃখ হইল। এই যে মর্ত বৃষকেতু, সে অমর নয়। তাহার জীবনের আধার কি? ছেলেবেলা হইতে সুচতুরা বৃষকেতুর সঙ্গিনী, অথচ কখন একথা ভাবে নাই।—কি আশ্চর্য্য! অশ্বত্থবৃক্ষতলে সুপ্ত বৃষকেতুকে দেখিয়া ক্রমে সুচতুরার মায়ার সঞ্চার হইতে লাগিল।

ঠানদিদি তাহার কানে কানে বলিলেন 'ইহাই প্রণয়।' সুচতুরা ঠানদিদিকে আর কোন ভাব গোপন না করিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইল। ঠান্‌দিদি বলিলেন "নাত্‌নি! তোর বিবাহের বয়স হইয়াছে।"

নন্দন-কাননের সে বিবাহ আমাদের দেশের বিবাহের মত নয়। কন্যা বরকে আবাহন করিয়া আঙ্গুর বৃক্ষের নীচে লইয়া আসিল, এবং আঙ্গুর খাইতে দিল।

বৃষকেতু শিহরিয়া উঠিলেন।

'সুচতুরে! এ কাজ্‌টা কি ভাল হ'চ্ছে?'

সুচতুরা। তুমি যদি আঙ্গুর না খাও, তবে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না।

বৃষকেতু ভাবিল কি ভয়ানক কথা! চিরসঙ্গিনীকে দেখিতে পাইব না! তাহা হইতে আঙ্গুর খাওয়াই ভাল। কিন্তু এ আঙ্গুরে যদি গরল থাকে?

সুচতুরা বলিল, 'তবে দুজনেই মরিব।'

বৃষকেতু। যদি দুইজনে এক সঙ্গে না মরিতে পারি?

ঠানদিদি বুঝাইয়া বলিলেন 'যাহাদের বুদ্ধি বেশী, তাহারা আগে মরে (যেমন স্ত্রীলোক)। যদি হঠাৎ পুরুষ অগ্রে মারা যায় তবে সহমরণ বলিয়া একটা প্রথা আছে।'

অতঃপর চিরসঙ্গিনীর প্রণয়বদ্ধ বৃষকেতু চন্দ্র, সূর্য্য এবং বনস্পতি, গিরি, নদ, নদী, পশু এবং পক্ষীর সমক্ষে একটি আঙ্গুর কম্পিতহস্তে গ্রহণ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন। বিধাতার প্রতি এই যে বিদ্রোহ, তাহার চিন্তায় আঙ্গুরটি গলায় বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু আঙ্গুর গলায় বাধিবার জিনিষ নয়। গলাধঃকরণ হইলে বৃষকেতু মহাশয় জলপানপূর্ব্বক একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

নন্দনকাননের যত পশু, বৃষকেতুর বরযাত্রী এবং যত পক্ষী, সুচতুরার পক্ষে কন্যাযাত্রী হইয়া বিবাহের আসর দীপ্ত এবং উন্নত করিয়াছিল।

কিন্তু সেদিন এবং তার পরদিন কি তফাৎ! তার পরদিন সূর্য্যের রশ্মি খরতর হইল, নিদাঘে পিপাসায় পশুপক্ষীকুল কাতর হইল। পরস্পরের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ করিল। ক্ষুধা বাড়িয়া রোগের সঞ্চার হইল। সেই মনোহর নন্দনকাননের মধ্যে একটা চিড়িয়াখানা এবং পশুশালার মত কোলাহল শ্রুত হইল।

বিধাতা-পুরুষ পূর্ব্বেই জানিতেন যে, এই রকম একটা কাণ্ড হইবে। তিনি ধীরে ধীরে লগুড় হস্তে একটি গিরিগুহার সম্মুখে আসিলেন। সেখানে বৃষকেতু সুচতুরার সঙ্গে প্রেমের অভিধান খুলিয়া নূতন নূতন কথাবার্ত্তায় মত্ত ছিলেন। বিধাতাকে দেখিয়া উভয়ে ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

বিধাতা বজ্রস্বরে বলিলেন 'তোরা আঙ্গুর খেয়েছিস্?'

সুচতুরা তড়িতের ন্যায় বৃষকেতুর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বুঝাইয়া দিল 'বল, যে খাই নাই।'

বৃষকেতু বলিল 'না।'

বিধাতাপুরুষ পুনর্ব্বার বজ্রনিনাদে বলিলে 'সত্য কথা বল্ মানব! সত্যের জন্য তোদের সৃষ্টি।'

বৃষকেতু বিধাতার অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে আবার বলিল, 'আমি খাইয়াছি, সুচতুরা খায় নাই।'

তখন সুচতুরা গলবস্ত্রে জানু পাতিয়া আর্ত্তস্বরে কহিল 'আমিই খাইয়াছি, উনি খান্ নাই।'

বিধাতা পুরুষ হাসিয়া বলিলেন 'হে দুর্ব্বল এবং দুর্ব্বলে ! তোরা উভয়ই মিথ্যাবাদী। স্বর্গ হইতে দূর হইয়া যা !'

নরেন এবং আমরা গল্প শুনিতে শুনিতে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম। এখন খানিকটা অবসর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'বসুজা মহাশয় ! পাপ কাহার হইয়াছিল।'

বসুজা বলিলেন 'সে কথা এখনও বলি নাই। মিথ্যা কথা বলার মত পাপ নাই, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু পাপের শাস্তি নহিলে, পাপ কি পুণ্য তাহা বুঝা যায় না। পরে যাহা হইল তাহাতে সেটা অনেকটা বুঝিতে পারিবে।'

গলা টিপিয়া যখন বিধাতাপুরুষ বৃষকেতু এবং তাঁহার স্ত্রী সুচতুরাকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিলেন, তখন তাহাদের বয়ঃক্রম পূর্ব্ব হইতে ঢের বেশী। যত বুদ্ধি বাড়ে তত বয়সও বাড়িতে থাকে। হয় ত তোমরা ভাবিতেছ যে ঠানদিদি গেল কোথায়। বলা বাহুল্য যে ঠানদিদি তাহার পুরাতন পুঁজিপাটা লইয়া সেই পেটেণ্ট মনুষ্য-দম্পতীর সহিত ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। অনেক জীবজন্তু যাহারা বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিল, তাহারাও ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে সন্তরণ করিয়া মনুষ্য-যাত্রীর নৌকার পশ্চাতে আসিতে লাগিল, কারণ শ্লোক আছে যে "মহাজন যেন গতঃ স পন্থা"। এই প্রকারে বহু যাত্রী সমুদ্রের পরপারে আসিয়া বিস্তীর্ণ দেশ স্থাপন করিল। তাহাদের সন্তান সন্ততি হইয়া পড়িল। তাহার কারণ, এখন বয়ঃক্রমের তারতম্য হওয়াতে, সকলে মিলিয়া মোটের উপর সমবয়স্ক হইবার উদ্যম বাড়িয়া গেল।

নরেন বলিল "এ কথাটা বুঝিলাম না।"

বসুজা মহাশয় বলিলেন, "ইহাই মাল্‌থস্ সাহেবের লোক-সংখ্যার সমস্যা।" যদি বুদ্ধি বাড়িয়া মানবের আয়ু কমিয়া যায়, তবে অনেক নিরেট মূর্খ জন্মগ্রহণ করিয়া সেটাকে 'ব্যালেন্স' করিয়া ফেলে। মনে কর কোন দেশে স্ত্রীলোকগণ যদি বোকা হয়, তবে তাহাদের আয়ু বাড়িয়া যাওয়াতে, বুদ্ধিমান পুরুষবর্গের সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং বহুবিবাহ প্রচলিত হইবে। যেমন সেকালের ভারতবর্ষ। আবার দেখ যদি স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধি বাড়িয়া আয়ু কমিয়া যায়, তবে হয় ত পুরুষের আয়ু কিংবা পুত্রসন্তানের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, যেমন এখনকার

ভারতবর্ষ। ফলে, বিশ্ব এমনই পদার্থ যে সকলকে একস্থানে জড় করিলে সংখ্যায় কাটাকাটি হইয়া কেবল ১ থাকিয়া যায় যেমন :—

$$\frac{৩০ \times ১৭ \times ২৫ \times ৮ \times ৯ \times ৪}{১৫ \times ৫১ \times ৭৫ \times ৬৪} = ১$$

কেবল কাটাকাটি মাত্র। পশু, পক্ষী, মানব, স্থাবর, জঙ্গম সকলে এইরূপ পরস্পরকে টুকটাক্‌পূর্ব্বক কাটিয়া একেকে সাব্যস্ত করে। এই জন্য শাস্ত্রে বলে—একমেবাদ্বিতীয়ং।

এই যে একত্বের 'সর্ব্বেসর্ব্বা' চিন্তা, তাহা সকলেরই আছে। সকলে মনে করে আমিই 'সর্ব্বেসর্ব্বা'।

এখন গল্পের অবশিষ্ট ভাগটুকু বলি। বৃষকেতু মর্ত্ত্যে আসিয়া ঠান্‌দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল 'জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কি?'

ঠান্‌দিদি বলিলেন 'লেখাপড়া শেখ। তুমি লিখিতে থাক, এবং সুচতুরা পড়িতে থাকুক।' সেই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বৃষকেতু কেরাণীগিরি আরম্ভ করিল, এবং সুচতুরা অভিধানের সাহায্যে নবেল নাটক প্রভৃতি যত রকম পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিল। যখন আফিস্ হইতে বৃষকেতু বাটী ফিরিয়া আসে, তখন সুচতুরা কথাগুলি আওড়াইতে থাকে এবং বৃষকেতু ঘাড় নাড়িয়া তাহা অনুমোদন করে। এই রকম, ছেলেপুলেরাও কেহ লিখিতে লাগিল, কেহ পড়িতে লাগিল। তাহাদের ছেলেপুলেরাও সেই ব্যবসা আরম্ভ করিল। অভিধানের বহু সংস্করণ বাহির হইল। সকলেরই বুদ্ধি প্রখর হইতে লাগিল।

একই কথা অনেক রকম করিয়া সকলে বলিতে আরম্ভ করিল। তাহা লইয়া কথায় কথায় কাটাকাটি হইতে লাগিল। যেমন, 'ভাই'কে অনেকে বলিল 'হারামজাদা', অনেকে তাহার নাম দিল "পাজি" এবং 'পাজি' কাটিয়া অনেকে সাধুভাষায় তাহাকে 'হতভাগা মূর্খ' বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। গুরু-জনের নাম হইল 'গোমূর্খ', কিংবা "অথগুমগুলাকারং"। 'আর্য্যপুত্র' সূত্রধর যুগের শব্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে চিঠিতে তাঁহার নাম হইল 'প্রাণেশ্বর' এবং রাশিনাম "ওগো"।

হাজার হউক সুচতুরা নন্দনকাননের আদিম স্ত্রীলোক। সেই গণ্ডগোলের মধ্যে সে একটা অমিত্রাক্ষর ছন্দের মত ঘর বাঁধিয়া সকলকে চালাইয়া লইয়া যাইত। সকলে বলিত 'গিন্নী বড় বুদ্ধিমতী; ঠান্‌দিদি ভাণ্ডার ঘরে বসিয়া চরখা কাটিতেন।

বংশ বৃদ্ধি হইলে ঘর সংসার খুব জমকালো হয়। খরচপত্র বাড়িলেও সে অভাবটুকু সহিয়া যায়। কারণ—আনন্দ লইয়াই সংসার। কিন্তু আনন্দ কমিয়া গেলে জীবন দুঃসহ হইয়া পড়ে।

বৃষকেতু একদিন আপিস্ হইতে আসিয়া একটা মন্তব্য প্রকাশ করিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, সংসার বড় জ্বালাযন্ত্রণাময়।

সুচতুরা। কিসের জ্বালা যন্ত্রণা?

বৃষকেতু ঠিক তাহার উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা সঙ্গীন ভাবের নিশ্চয় উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে রকম কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার, এবং নানাপ্রকার লক্ষণ চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতেছিল, তাহাতে সংসারে আনন্দের যে লেশমাত্র নাই, তাহা বৃষকেতু বুঝাইতে চেষ্টা করিল।

অতএব বৃষকেতু বলিল যে, বাটীর মধ্যে সন্ধ্যার পর বাসা না করিয়া, খানিকটা বাহিরে গিয়া রোজ বেড়াইয়া আসিলে ভাল হয়। নন্দনকাননে বরঞ্চ এ সম্বন্ধে স্বাধীনতা ছিল। নূতন সংসারে আসিয়া সে স্বাধীনতাটুকু হারানো যেন কেমন কেমন বলিয়া বোধ হইল।

সুচতুরা ইহাতে বাধা দেওয়াতে বৃষকেতুর আহার কমিয়া গেল। বৃষকেতু স্পষ্ট করিয়া একদিন বলিয়া বসিল যে, তাহার মনে সুখ নাই। এরকম আপদ বোধ হয় নন্দনকাননে থাকিয়া গেলে হইত না।

সুচতুরা। তোমাকে কেহই এ সংসারে আসিবার জন্য সাধে নাই।

বৃষকেতু। (হাস্যপূর্ব্বক) বোধ হয় আমি আঙ্গুর খাইতে স্বীকৃত হই নাই। কাণ্ডটার গোড়াই তুমি।

সুচতুরা। তোমার মতিভ্রম হইয়াছে। যদি তোমার মনে এত ছিল, তবে তুমি না খাইলেই পারিতে।

বৃষকেতু। কিন্তু তুমি বলিয়াছিলে যে অন্যথা তোমাকে দেখিতে পাইব না, সেই জন্য অনেকটা বাধ্য হইয়া খাইতে হইয়াছিল।

সুচতুরা বলিল, তাহা জানিলে সে তৎক্ষণাৎ সেখানেই প্রাণত্যাগ করিত, কিন্তু স্বামীর প্রবঞ্চনাবাক্যেও সে পথে যায় নাই।

এই রকম তর্ক বিতর্ক হওয়াতে অভিধানের নূতন নূতন কথা লইয়া সুচতুরা স্বামীকে পরাস্ত করিতে বসিল, এবং বৃষকেতু অনেক নূতন কথা লইয়া তাহাকে গালি পাড়িল।

সাহিত্যে বৃষকেতু এত দক্ষতা লাভ করিয়াছিল তাহা সুচতুরা জানিতে পারে নাই। সুচতুরা বলিল 'এ সব কথা কি ?'

বৃষকেতু। ঠিক জানি না, কিন্তু বোধ হয় কথার পৃষ্ঠে কথা জন্মিয়া যায়।

সুচতুরা। প্রথমে যে কথাগুলি বলিতে, সেগুলির মধুরতা বোধ হয় মনে নাই।

বৃষকেতু। তুমি বোধ হয় প্রথম প্রণয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তখনও যাহা ভাবিতাম, এখনও তাহাই ভাবি। কিন্তু বোধ হয় তোমার সম্বন্ধে যাহা এখন ভাবি, সে আর এক রকম। আমার বোধ হয় তুমি একটা প্রকাণ্ড হৃদয়হীন পদার্থ। চেতন, অচেতন, এবং উদ্ভিদ কোনটাই নও ?

বলা বাহুলা যে, এই নিদারুণ কথাতে সুচতুরার জ্বর হইল, এবং জ্বর হইতে বিকার হইল, এবং বিকার হইতে বাক্‌রোধ হইল। বাক্‌রোধ হইলে মানুষ আর বাঁচিতে চাহে না, কারণ কথা কহিতেই সকলে জগতে আসে।

ঠানদিদি বলিলেন 'বৃষকেতু, এ আর বুঝি বাঁচিবে না'। বৃষকেতু বলিল 'মরা বাঁচা কেবল সমসাময়িক ব্যাপার। একজন মরে, আর একজন বাঁচে। কিন্তু বাস্তবিক আত্মা মরে না, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রেই লেখে।'

বৃষকেতু ইদানীং গীতা পাঠ করিত, এবং বেশ বুঝিয়াছিল যে আত্মীয়-স্বজনের মরণে শোক প্রকাশ করা দুর্ব্বুদ্ধির লক্ষণ। সুতরাং সে চুপ করিয়া থাকিল।

প্রথম সংসার এই রকম করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সুচতুরা দেহ রক্ষা করিতে পারিল না। সকলে বলিল সে স্বামীর যন্ত্রণায় আত্মরক্ষা করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। জীবের আত্মরক্ষা করিবার এই অসাধারণ ক্ষমতা বিধাতা দিয়াছেন বলিয়াই সংসার প্রতিমুহূর্ত্তে নিশ্চল ও শূন্যে লীন হইয়া পড়ে না। দুঃখে শোকে, কষ্টে জীব দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে একের সহিত মিশাইয়া যায়। সুচতুরার মৃত্যুকালে সে জ্ঞানটুকু নিশ্চয় হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ না করিয়া কেবল শেষ অশ্রুবারির মধ্যে তাহা রাখিয়া গেল।

সেই সঙ্গে ঠানদিদিও অন্তর্হিত হইলেন।

৬

নরেন জিজ্ঞাসা করিল 'গল্প শেষ হইয়া গেল নাকি' ?

বসুন্ধরা বলিলেন 'না, এখনও দ্বিতীয় ভাগ বাকী আছে।'

একটা পুরাতন বস্তু অন্তর্হিত হইলেও তাহার চিহ্ন শীঘ্র যায় না। নিউ-জিলণ্ড প্রভৃতি স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া যে সকল প্রথম যুগের নরকপাল পাওয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে তখনকার মনুষ্যের তিনটি চক্ষু ছিল। তাহার মধ্যে একটা চক্ষু কপালের অভ্যন্তরে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে ইহাই আসল দিব্য চক্ষু, এবং পরবর্ত্তী যুগে মানুষের দৃষ্টি-ক্ষীণতার দোষে আরও দুইটি চক্ষুর উৎপত্তি হইয়াছিল, কারণ তখন চসমা প্রচলিত হয় নাই।

হঠাৎ স্ত্রী-বিয়োগের পর বৃষকেতু দিব্য-চক্ষুর দ্বারা বুঝিতে পারিল যে সংসারে সে একাকী। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজ এবং দেশ একের মধ্যে হইলেও, বাস্তবিক সে একাকী।

বৃষকেতু একটা ঘোর শূন্যতা অনুভব করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, সে ভাণ্ডার ঘরের মধ্যে গিয়া সুচতুরার জীবন-সঞ্চিত দ্রব্যগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিত। দ্রব্যগুলি বিশেষ যে বহুমূল্য তাহা নয়। গোটাকতক ছিন্ন কন্থা, জীর্ণ বস্ত্র, পূজা অর্চ্চনার পুঁথি, সিন্দূরের কৌটা এবং শাঁখা। হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র মতে ইহাই স্ত্রীধন, এবং স্ত্রীর অবর্ত্তমানে স্বামীই তাহার উত্তরাধিকারী।

চাঁদদিদি তাঁহার পেটরার মধ্যে যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা একটি শুষ্ক আঙ্গুর মাত্র। সেটা পাকিয়া 'মনক্কায়' পরিণত হইয়াছিল। সেটাতে একটা টিকিট মারা ছিল—"জ্ঞান"।

দশজন বন্ধুবান্ধব আসিয়া বৃষকেতুকে বলিল 'এই মনক্কা তোমার খাওয়া উচিত, কারণ তুমিই আইনমত ইহার উত্তরাধিকারী'।

বৃষকেতু বলিল 'একবার আঙ্গুর খাইয়া ঠকিয়াছি'।

সকলে বলিল, 'মুনক্কা খাইয়া দেখ। আঙ্গুর এবং মনক্কায় অনেক তফাৎ। মুনক্কার রস পরিপক্ক এবং ফল পুষ্টিকর।

বৃষকেতু মনে ভাবিল যে কথাটা মন্দ নয়। আঙ্গুর খাইয়া যে দোষ জন্মিয়াছিল তাহা হয় ত মুনক্কার গুণে খণ্ডিত হইতে পারে। অতএব সে ইতস্ততঃ দেখিয়া শুনিয়া সেই পুরাতন মুনক্কা গলাধঃকরণ করিল।

মুনক্কা খাইয়া বৃষকেতুর অদৃষ্ট খুলিয়া গেল। সে পূর্ব্বাপেক্ষা রোজগার বেশী করিতে লাগিল। ধন সম্পত্তি বাড়িয়া গেল। ছোট বাটী বড় এবং দ্বিতল হইয়া গেল। দ্বিতলের উপর বৃষকেতু বাস করিত। একতলে ছেলে-পুলে আত্মীয় স্বজন থাকিত।

নরেন বসুজা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল 'বৃষকেতুর বয়স তখন কত ?'

বসুজা মহাশয় বলিলেন 'তোমাদের একটা মস্ত ভ্রম আছে। নন্দনকাননের ফেরতা লোকের বয়সের কোন ইয়ত্তা নাই। মরণকাল পর্য্যন্ত সকলেই মনে করে যে সে 'চিরকুমার'।

তবে একটা কোন ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গেলে লোকের ধর্ম্মভাব হয়, যেমন একটা উৎকট রোগ কিংবা স্ত্রী বিয়োগ। এটা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বৃষকেতু পূজাপাঠের বহি লইয়া বসিত এবং গম্ভীর ভাবে চক্ষু মুদিয়া ভক্তিভরে মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া ফেলিত।

এটাকে সকলে কুলক্ষণ মনে করিয়া প্রতিবাসিগণ রটাইয়া দিল যে, তাহারা সন্ধ্যার পরে দ্বিতলের ছাতে ভূতের মত কিছু দেখিতে পাইত।

দশজনে একটা কথা বারংবার বলিলে সকলে তাহা বিশ্বাস করে। বাটীর লোকেও তাহা বিশ্বাস করিল। বৃষকেতুরও একদিন মনে হইল যে কথাটা অনেক সত্য। হোমযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করাতেও সেই ভূতের ভয় গেল না। ক্রমে আতঙ্ক বাড়িয়া যাওয়াতে একদিন বৃষকেতু কোন বন্ধুকে বলিল 'বাস্তবিক আমি যাহা দেখিতে পাই তাহা আমার ভূতপূর্ব্ব স্ত্রীর আবছায়ার মত।'

বন্ধুবর বলিলেন 'ভূতের ভয় কেবল ভবিষ্যতের সাহসে বিদূরিত হয়। আজকাল্‌কার শ্রাদ্ধাদিতে তেমন ফলোদয় হয় না। প্রথম পক্ষের স্ত্রী-ভূতকে তাড়াইতে দ্বিতীয় পক্ষে স্ত্রী-ওঝাই কেবল ভবধামে সক্ষম।'

(৭)

বৃষকেতু প্রথমে স্বীকার করিল না, কিন্তু ভূতের উৎপাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়াতে কেবল তাহারই নিবারণার্থ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিল।

বাসরঘরেই বৃষকেতু তাহার নবীনা স্ত্রীকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, বিপদে না পড়িলে কেহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না। স্বামীকে বিপদ হইতে রক্ষা করাই স্ত্রীর ধর্ম্ম, অতএব ভূতের উৎপাত হইতে যাহাতে সে সর্ব্বদা বাঁচিতে পারে, তাহাই কাত্যায়নীর (দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর) সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টব্য।

পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কাত্যায়নী সেই ব্রত গ্রহণ করিল।

তোমরা বোধ হয় জান যে, ধূমকেতুর একটা পদার্থ আছে, যাহা দ্বারা গৃহ মার্জ্জিত হয় এবং সময়মত ভূতও তাড়ানো যায়। কিন্তু সেকালের ভূতের সহিত একালের ভূতের অনেক পার্থক্য। সেকালের ভূত অনেকটা শরীরী ছিল, একালের ভূত সম্পূর্ণ অশরীরী, মনোময় সূক্ষ্ম পদার্থ, অতএব সম্মার্জ্জনীর প্রভৃতির দিকে না গিয়া কাত্যায়নী অন্য কতকগুলি সুবন্দোবস্ত করিল।

কাত্যা। তোমার অবসন্ন ভাব—ভূতের ভয়ে অবসন্নভাবটা কোন্ সময়ে বেশী হয়?

বৃষকেতু। সন্ধ্যার পর।

কাত্যায়নী কহিল যে, সেই সময় বন্ধুবান্ধবকে লইয়া একটু গান বাজনা করা উচিত, এবং দিনমানে আহার কমাইয়া দেওয়া উচিত। প্রথমতঃ, বেশী বয়সে অধিক আহার করা বৃথা, কারণ পরিপাক হয় না। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বকথা ক্রমাগত স্মরণ করিতে মানুষ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

পরিমিত আহারের দ্বারা ও মনসংযমের দ্বারা, এবং বন্ধুবান্ধব লইয়া গান করিয়া ভূতের উপদ্রব পূর্ব্বাপেক্ষা উপশম হওয়াতে বৃষকেতুর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তদন্তপূর্ব্বক স্থির হইয়াছিল যে, পুরাতন ভাণ্ডারঘরই ভূতের আবাস। বৃষকেতু সে ঘরে যাইত না। কাত্যায়নী তাহাতে তালা বন্ধ করিয়া দিল।

ভাণ্ডারগৃহের পার্শ্বেই শয়নগৃহ। একদিন পূর্ণিমার তিথির সময় বৃষকেতুর দ্বিপ্রহর রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সে দেখিল কাত্যায়নী ছাতের শেষ ভাগে বসিয়া কাঁদিতেছে।

গভীরা রজনী। পবনের সঞ্চার একেবারেই নাই। বৈশাখ মাস, অতিশয় গ্রীষ্ম। বৃষকেতু কাত্যায়নীর দুঃখের কারণ নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারিয়া বাহিরে আসিল।

কাত্যায়নী স্বামীর পদসঞ্চারের শব্দ শুনিয়া ত্রস্তভাবে ছাত হইতে ভাণ্ডার-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিল।

স্ত্রীর কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে স্বামীর সহানুভূতি স্বতঃই সঞ্চারিত হয়। বৃষকেতু দ্বারের পার্শ্বে গিয়া বলিল 'দুয়ার খুলিয়া দেও, তোমার দুঃখের কথা আমি শুনিতে চাই। আমি তোমাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি।'

কাত্যায়নী তাহা শুনিয়া সভয়ে বলিল 'আমি ভয় পাইয়াছি।

বৃষকেতু। কেন?

কাত্যা। তুমি তোমার স্ত্রীকে দেখিয়া যেমন ভয় পাইয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া ততোধিক ভয় পাইয়াছি। আমার বোধ হয় তুমি একটি বৃদ্ধ ভূত।

বৃষকেতু শপথ করিয়া জানাইল যে সে নিশ্চয়ই ভূত নহে, জিয়ন্ত মানুষ। কাত্যায়নী তাহা স্বীকার করিল না। সে বলিল 'তোমার মধ্যে জীবনের লেশ

মাত্র নাই। তোমার শরীর একেবারে শীতল। তোমার ভালবাসার কথা শুনিয়া বোধ হয় যে বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লুপ্ত। বোধ হয় তুমি ইতিপূর্ব্বে ধরা-ধাম ছাড়িয়া গিয়াছ। আমি না জানিতে পারিয়া তোমার ব্যাগার খাটিতেছি।

ইহা বলিয়া কাত্যায়নী তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। বৃষকেতু অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল 'চীৎকার করিও না, কথাটা ভাল করিয়া বুঝা উচিত।'

কাত্যায়নী বলিল, 'আমি ভাল করিয়া বুঝিয়াছি। এই ভাণ্ডারঘরে একখানা অভিধান দেখিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, ঘুণাক্ষরেও দ্বিতীয় পক্ষে দার পরিগ্রহ যে করে সে ভূত, এবং তোমার বাক্স খুলিয়া যে সকল চিঠিপত্র দেখিলাম, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে তুমি পূর্ব্বে যাহাকে 'প্রাণ' বলিয়া অভিষিক্ত করিয়াছিলে, সে নাই। তুমি প্রাণহীন জানোয়ার ভূত'।

বৃষকেতু ভাবিল কাত্যায়নীকে ভূতে পাইয়াছে। আবার ভাবিল ব্যাপারটা ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া লোকজনকে ডাকা লজ্জার কথা। অতএব শয়ন-গৃহেতে ফিরিয়া গিয়া বৃষকেতু নিজের চেহারা আর্সিতে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল।

কথাটা মিথ্যা নয়। দেহ রক্তহীন পাংশুবর্ণ, মস্তকের কেশ তুষারের মত ধবল, চর্ম্মলোল। চক্ষু জ্যোতিহীন।

থার্ম্মোমেটর দ্বারা স্বীয় দেহ পরীক্ষা করিয়া বৃষকেতু দেখিল যে তাপমান যন্ত্রের ৯৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পারদ উঠে না।

বৃষকেতুর একটা ঘোর অনুতাপ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়। দর্পণের মধ্যে তাকাইয়া দেখিল যে এই ধরাধামের পরই একটা সমুদ্র। তাহার পরপারে একটা বিস্তীর্ণ রম্য কানন। সেই কাননের এক প্রান্তে পরলোকগতা সুচতুরা একটা পর্ণকুটীরের সম্মুখে ঠানদিদির পার্শ্বে বসিয়া চরখা কাটিতেছে।

বৃষকেতু চেষ্টা করিয়া দেখিল যে, সে সমুদ্র পার হওয়া সুকঠিন। পথ রুদ্ধ তাহার দেহ নিঃসাড় অচল। বৃষকেতু কাঁদিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে তাহার বোধ হইল কে যেন বলিতেছে 'ভাল করিয়া অগ্নি দেও, উত্তাপ না পাইলে আত্মা দেহের মধ্যে ভূত হইয়া থাকিয়া যায়।'

এটা নিশ্চয় সৎকারের কথা। নিশ্চয় কোন শ্মশানে নরলোকে তাহার অগ্নি সংকার আরম্ভ হইয়াছিল, এবং নিশ্চয় তাহার হিতার্থী উত্তরাধিকারিগণ জগতের মঙ্গলার্থ বৃষকেতুর আত্মাকে পরলোকের পুণ্যময় পথে: অগ্রসর করিয়া দিতেছিল।

বৃষকেতু তাহাদিগকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিল। আবার সেই নন্দন-কানন। আবার একটা আদিম আত্মা কুমারবেশে এবং একটা আত্মা কুমারী বেশে। পরিশ্রান্ত পান্থদ্বয় জলপানার্থ নির্ঝরিণীর তটে উপবিষ্ট। সম্মুখে বিধাতা-পুরুষ।

বিধাতা পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা কোথাকার লোক হে?'

পান্থদ্বয় জানু গাড়িয়া বলিল 'নরলোকের'।

বিধাতা। সেখানকার খবর কি?

পান্থদ্বয়। একই রকম। নূতন কিছুই নাই।

বিধাতা। লড়াই ঝগড়ার খবর কি?

পান্থদ্বয়। খবরের কাগজে ঠিক কথা জানা যায় না, তবে এ যাত্রার সংগ্রাম কিছু ঘনতর।

বিধাতাপুরুষ তখন তাহাদিগকে পান্থনিবাসে পাঠাইয়া দিলেন।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল 'পাপ হইয়াছিল কাহার?'

বসুজা মহাশয় বলিলেন 'সেটা মতামতের উপর নির্ভর করে। যদি কর্ম্মের অবসানে অনুতাপ হয় তবে সেটা পাপ এবং যদি অনুতাপ না হয় তবে পাপ নয়। বিচারের ভার কর্ম্মীর উপর। একজনের ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া অত্যন্ত অনুতাপ হইয়াছিল, অতএব বেশী বুদ্ধি হওয়াও একটা পাপ।'

প্রথম পাপের এই গল্পটা করিয়া বসুজা মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমাদের বোধ হইল তিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন, কারণ ঘুমন্ত অবস্থাতেও তাঁহার আনন্দভাব মুখমণ্ডল ছাইয়া ছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বিশ্ব রূপ।

বিশ্ব গেছে লুপ্ত হয়ে তোমার ছায়ায়—
চন্দ্র তারা দিবা কর, পৃথ্বী আর নীলাম্বর,
চন্দ্রাতপ শিরোশোভা হীরক মালায়!
সকলি গিয়াছে ঢাকা শুধু তব চিত্র আঁকা
দূরে কাছে প্রকৃতির মোহন লীলায়।
শ্যামল পাদপ অঙ্গে, পক্ক লাল ফল রঙ্গে,
সমীরণ পরশিয়া আনন্দে দোলায়।

বৃক্ষ শাখে বসি' নিতি বিহগের মধুগীতি
প্রভাতের বৈতালিক,—সন্ধ্যারতি সব,
নিশীথের স্তব্ধতায় ধরণী ঘুমায়ে যায়,
আবার জাগিয়া ওঠে কল কল রব,
দিবসের জাগরণে চেতনায় সঞ্চারণে
পুরাতন দৃশ্যপটে হেরি অভিনব,
তোমার মাধুরী ঘিরে উদয় অচল শিরে
বিকাশিছে রবিকরে তব মূর্ত্তি ভব!
দূর সীমান্তের গায় রৌদ্ররূপ প্রতিভায়
তুমিই উঠিছ জাগি' বিশ্ব দরশিয়া,
পরিপূর্ণ চিত্রময় স্থাবরজঙ্গমচয়
সহস্র কিরণধারে আত্ম প্রকাশিয়া,
জল স্থল শূন্য দেশে 'নেহারি' অপূর্ব্ব বেশে,
জ্বলিয়া নিবিয়া যাও ; পরিতৃপ্ত হিয়া,
শুভ্র চন্দ্রমার কর সুষমায় চরাচর
জোৎস্না তরঙ্গে ছোটে ছবি বিভাসিয়া,
একি খেলা একি রঙ্গ, একি মোহ ভাব ভঙ্গ!
তুমি বিশ্ব, তুমি মায়া, তুমিই সংসার,
আলোকে তোমার হাসি তমসায় পরকাশি'
পূর্ণিমা নিশীথে যেন জীবন সঞ্চার,
কভু জলদের গায় ইন্দ্রধনু শোভা পায়
নানা বর্ণে উজলিয়া সৌন্দর্য্যে অপার,
এই নেত্রে সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ জ্যোতি অচঞ্চল
বিচিত্র বরণ ছটা নবীন আকার,
এতলীলা, এত প্রাণ, চারি ধারে মূর্ত্তিমান—
হরিয়া লয়েছ অঙ্গে জগতের সার।
যশোদার প্রাণ হরি' নবনীত চুরি করি'
পড়শীর ঘরে যবে তুলিল ক্রন্দন,
উদূখলে মাতা হায়! ক্রোধবশে শ্যাম রায়
একদিন করেছিল কঠোর বন্ধন,

হাতের বেদনা ভরে ব্রহ্মাণ্ডের রূপ হরে'
বদন মাঝারে রাখি' মাতারে দর্শন—
করাইয়া, ভগবান জননীরে দিব্য জ্ঞান
দিয়াছিল, শুনিয়াছি অতীত-ঘটন।
পুত্র মুখে হেরি বিশ্ব নব অপরূপ দৃশ্য
মাতা যশোমতী তাহে বুঝিল অন্তরে,
বাল-রূপী-নারায়ণ করিয়াছে আগমন
ভবার্ণবে তরাইতে অধমের ঘরে।
তেমতি কি গেহে মোর আবির্ভাব বাছা তোর
ত্রিভুবন লুপ্ত করি' বিশ্বরূপ ধরে?
উচ্চে নীচে আশে পাশে তোমারি মূরতি ভাসে
আমি তাহা নিরখিয়া বাঁচিয়াছি মরে!

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

সাহিত্যিক-সম্মিলনে।

পাবনা সম্মিলনে রবিবাবু বলিয়াছিলেন—"সাহিত্য-সম্মিলনগুলি যেন মেঘ—দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বারি বর্ষণ করে,—দেশ ফুলফলে হাসিয়া উঠে।" বন্ধুবর চন্দ সগর্জ্জনে চিঠির উপর চিঠিতে জানাইতেছিলেন যে খোদ হিমালয়ের পাদদেশস্থিত দেবমাতৃক দেশের নিজস্ব মেঘ এবার রাজসাহীতে বর্ষিবে। শুনিয়া মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। কাঁচাগোল্লা, পাকাদধি, কাটারী-ভোগের চাউল, নাটোর, রাণী ভবানী, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি, পাথরের মূর্ত্তি, পাব্‌লিক লাইব্রেরী, ধীমান বীতপাল, উমাপতি ধর, প্রদ্যুম্নেশ্বর, জগদিন্দ্রনাথ, শরৎকুমার ইত্যাদি প্রাচীন আধুনিক দৃশ্য অদৃশ্য ব্যাপারগুলি মস্তিষ্কের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া দিল।

শুনিলাম এখানকার এক মাননীয় অধ্যাপক একবার রাজসাহী যাইতে বিষম লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"এরোপ্লেন ছাড়া রাজসাহী সুগম্য হওয়া কঠিন।" তাই ভাবিলাম "বিহারে বিঘোরে যদি একা চড়িতেই হয়, তবে একা একায় চড়া কোন কাজের কথা নহে, সঙ্গী চাই।" তখন রবিবাবুর নির্ঝরের মত খুঁজিতে বাহির হইলাম—"কে কে যাবি, কে কে যাবি—কে তোরা যাইবি আয়।" দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে যাইবার জন্ত অনেকেই সাজিয়াছে।

রাজসাহীবাসিগণ ভয় না পায় তাই একান্ত বিনয়ভরে শুধু আটজনের নামমাত্র পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিষম আগ্রহভরে বর্ম্মচর্ম্ম পরিধান চলিতে লাগিল,—গোটা রাজসাহীটাই তুলিয়া লইয়া না আসি। ঘোষবংশাবতংস বন্ধুবর গি—তারস্বরে রাস্তার চৌমাথা হইতে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন যে তাহাকে যেন কিছুতেই ফেলিয়া না যাই। সান্যালবংশপাবন সম্পাদক অ—সবান্ধবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন বলিয়া শাসাইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণাগ্রনাসিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি কামিনীলাঞ্ছনকণ্ঠ শ্রদ্ধেয় সেনকুলধুরন্ধর সশস্ত্র সাজিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রবন্ধগন্ধর্ব্ববাণে রাজসাহী-সম্মিলনে গভীর সুষুপ্তি বিরাজ করিবে এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু যাইবার সময় দেখা গেল যে,—ঘোষ একেবারে নির্ঘোষ, সবান্ধবযাত্রী বান্ধবীর মায়াতে একান্ত আবদ্ধ, এবং কামিনীলাঞ্ছনকণ্ঠ সেনের কুন্তলাগ্রও দেখা গেল না! ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাই হতাশভরে বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম, মনটা মাতালের মত টলিতে লাগিল—একবার ষ্টেশনের বাহিরে বাসার দিকে—আর একবার প্লাটফর্ম্মস্থিত তৈয়ারী ট্রেণের দিকে। তার উপর আবার টিকিটবিক্রেতা বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মনটা আরও বিকল হইয়া গেল—উক্তবাবু সদর্পে রেলওয়ে গেজেট বাহির করিয়া দেখাইয়া দিল—নাটোর ষ্টেশনের টিকেট করিলে সম্মিলন কন্‌সেশন কিছুতেই সে দিবে না—কারণ কন্‌সেশন রাজসাহীর জন্য, নাটোরের জন্য নহে। আমি তাহাকে যথাসাধ্য বুঝাইয়াও যখন নাটোরে আনিতে পারিলাম না, সে রাজসাহী আঁকড়িয়াই পড়িয়া রহিল—এমন কি ষ্টেশন মাষ্টারকে পর্য্যন্ত সে গেজেট দেখাইয়া হাঁকাইয়া দিল—তখন অভ্যর্থনা সমিতির কর্ণধার বেচারা কেদারবাবুকে অভিসম্পাত দিয়াছিলাম একথা গোপন করিয়া কোন লাভ দেখিতেছি না। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম—সর্ব্বস্থানাগত প্রতিনিধিবর্গকেই এই উৎপাত ভোগ করিতে হইয়াছে। নাটোরে নামা যাহাদের সুবিধা, তাহারা কেহই নাটোরের কন্‌সেশন পান নাই।

তখন সঙ্গী অভাবে ম্রিয়মাণ হইয়া ধীরে ধীরে ট্রেণে গিয়া আরোহণ করিলাম। সহসা একি দেখি! গাড়ীর বেঞ্চ আলো করিয়া প্রতিভার "গায়কপাখী" পূর্ণচন্দ্র বসিয়া! অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইতেই দেখি দৈবদত্ত গুপ্ত অক্ষয় আনন্দের মত বাঙ্গালার অধ্যাপক অক্ষয়দত্ত গুপ্ত সুখে সমাসীন! একদিকে পূর্ণচন্দ্র অন্য দিকে অক্ষয়—আর ভাবনা কি? মুখোমুখী হইয়া বসিয়া মহা উৎসাহে আলাপ জুড়িয়া দিলাম—এমন কি যখন জানিতে পারিলাম যে পূর্ণ কয়েক ষ্টেশন পরেই কক্ষ রিক্ত করিয়া যাইবেন ও অক্ষয়ের জলপাইগুড়িতে প্রবেশ

মন্দিরেরই কাছাকাছি কি একটা বিশেষ অনুসন্ধেয় আছে তাই দোলের ছুটিতে তাড়াতাড়ি চলিয়াছেন—তখনও দমিয়া গেলাম না!

ময়মনসিংহে সন্ধ্যা হইল। প্লাটফর্ম্মে নামিয়া পায়চারি করিতেছি, এমন সময় "ধ্রুবতারার" নিপুণ শিল্পীর সহিত দেখা হইল যতীন্দ্রমোহন কিছুদিন পূর্ব্বে বদলি হইয়া ময়মনসিংহ আসিয়াছেন শুনিয়াছিলাম—সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে ষ্টেশনে এরূপ সাক্ষাৎ হওয়াতে ভারী আনন্দলাভ করিলাম। নববিবাহিতা রোরুদ্যমানা কন্যা স্বামীর সহিত চলিয়াছে তিনি ষ্টেশনে উঠাইয়া দিতে আসিয়াছেন। এই সুকরুণ বিদায়দৃশ্য রেলওয়ে ষ্টেশনের ইতর কর্ম্মব্যস্ততাকেও যেন কোমল করিয়া তুলিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

চন্দ্র উঠিয়াছে—নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় চারিদিক হাসিতেছে। ট্রেণ অবিশ্রাম ছুটিতেছে। দুইধারে স্তব্ধ গাছগুলি নিশ্চল দাঁড়াইয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত অজস্র জ্যোৎস্নাধারা মাথা পাতিয়া লইতেছে—তাহাদের তলায় আঁধারে যেন ধ্যানময়তা ঘুমাইয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে জ্যোৎস্নামণ্ডিত ব্রহ্মপুত্রবক্ষে দুইধারে অজস্র হীরকচূর্ণ ছড়াইয়া খেয়া জাহাজ আমাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইল। মুগ্ধনেত্রে জলের সেই জ্যোৎস্নালোকিত অনন্ত বিস্তারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। নদীবক্ষ হইতে পাতলা কুয়াসা উঠিতেছিল—দূরে তাহা একখানা পর্দ্দার মত পড়িয়া এক রহস্য-ময়তার আভাসে হৃদয়কে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

বাগচী দাদার কবিতা মনে পড়িতে লাগিল—

আজ, ফাগুনী চাঁদের জ্যোছনা জোয়ারে ভুবন ভাসিয়া যায়
ওরে স্বপন-দেশের পরী-বিহঙ্গী পাখা মেলে উড়ে আয়।

* * * *

নাটোর যখন পৌছিলাম তখন পূর্ব্বে উষার আলোক দেখা দিয়াছে এবং পশ্চিমে চন্দ্র-মুখ মলিন করিয়া কেমন এক রকম ফ্যাকাসে ভীতিজনক হাসি হাসিতেছে!

"রাজসাহী যাত্রী নাটোরে কে নামিবেন। শীঘ্র নামুন—চাহিয়া দেখি অক্লান্ত-কর্ম্মা বন্ধুবর সুরেন্দ্রবাবু। আমি শীঘ্রই নামিলাম; কিন্তু জলপাইগুড়ির ক্ষীণকায় সুরেন্দ্রবাবু ততটা শীঘ্র নামিতে পারিলেন না, কারণ রেলের অদ্ভুত বুদ্ধিশালী কর্ম্মচারিগণ প্লাটফর্ম্মের দিকের সমস্ত দরজা আটকাইয়া দিবা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। অনেক ডাকাডাকি করিয়াও যখন চাবিওয়ালাকে পাওয়া গেল না, তখন এক

ভারী বীররসের অভিনয় হইল। বন্ধুবর সুরেন্দ্রবাবু মালকোচা মারিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—'কুচ পরোয়া নেহি—নামুন আপনি আমার হাতের উপর পা দিয়া, তখন নং ১ সুরেন্দ্রবাবুর বিস্তৃত হস্তে নং ২ সুরেনবাবুর এক পাদক্ষেপ ও সম্পূর্ণ ভর দেওয়া, নূতন জুতা মণ্ডিত দ্বিতীয় পার হাটু গাড়ীর রুদ্ধ দরজায় প্রতিহত হইয়া রক্তাক্ত হওয়া ও টানানানিতে মুক্ত হইয়া ভীমবেগে নং ১ সুরেন্দ্রবাবুর ললাটের সহিত সম্বন্ধস্থাপন,—গাড়ীর মন্দগতিতে প্রস্থান, নং ২ সুরেন্দ্রবাবুর "আমার বিছানা রহিয়া গেল" বলিয়া বিষম করুণ আবেদন ইত্যাদি নিমেষে ঘটিয়া গেল।

গাড়ীর আড্ডায় যাইয়া দেখি রাজসাহী যাত্রী সাহিত্যিকবৃন্দ অনেকেই সেখানে সমবেত হইয়াছেন তাহার মধ্যে ও কে? পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—বরফমণ্ডিতমস্তক কাঞ্চনজঙ্ঘার মত প্রকাণ্ড শুভ্র পাগড়ী মাথায় ভীম লগুড় হস্তে দাঁড়াইয়া বগুড়ার বৈদ্যনাথ বাবু ঘন ঘন উড়িয়া চাকরের সজ্জিত তামাকে ধূম উদ্গীরণে আগ্নেয়গিরিবৎ প্রতিভাত হইতেছেন! আর একধারে ক্ষীণদেহ এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া; এমনি ক্ষীণ যে দেখিয়া ভ্রান্তি বা মায়া বলিয়া অনায়াসে উড়াইয়া দেওয়া যায়। গায়ে বিপুল কাশ্মিরী কোট দেখিয়া তখনই চেনা উচিত ছিল, কিন্তু চিনি নাই—পরে পরিচয় হওয়াতে জানিয়াছিলাম—ইনি সেই বিখ্যাত অধ্যাপক বনমালি বেদান্ততীর্থ।

পশ্চাতে চাহিয়া দেখি প্রসন্নবদন প্রভাস বাবু কোটপ্যাণ্ট পড়িয়া অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আনন্দে শীতে নাটোরের টমটমের রূপদর্শনে দাঁড়াইয়া শিহরিতে ও কাঁপিতে লাগিলাম।

কিঞ্চিৎ গাড়ী বিভ্রাটের পর মোটরকারে চড়িয়া আমরা সকলে রাজসাহী রওনা হইলাম এবং প্রায় ১২টার সময় যাইয়া রাজসাহী পৌঁছিলাম। বদান্য শরৎকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রকুমার বিদেশাগত প্রতিনিধিবর্গের বাসের জন্য তাঁহার অর্দ্ধসমাপ্ত প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সেইখানেই যাইয়া আমরা উঠিলাম, স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ধরাধরি করিয়া আমাদের জিনিসপত্র উপরে লইয়া গেল। আমরা কাপড়চোপড় ছাড়িয়া বিছানা যথাস্থানে রাখিয়া তাড়াতাড়ি গঙ্গায় যাইয়া স্নান করিয়া আসিলাম এবং আহার সমাপনান্তে (যদিও যত সংক্ষেপে লিখিয়া যাইতেছি শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর হেরম্ব বাবুর অত্যাচারে আহারব্যাপারটা তত সংক্ষিপ্ত হয় নাই) সভা অভিমুখে চলিলাম। রাজ-

সাহী রঙ্গগৃহে সম্মিলনের স্থান করা হইয়াছিল—যাইয়া দেখি রঙ্গগৃহ উৎসববেশে সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। প্রতিনিধিবর্গের স্থান রঙ্গমঞ্চে করা হইয়াছিল—আমরা সসম্ভ্রমে যাইয়া সেইখানে উপবেশন করিলাম।

১৬ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ণ ৩৮০ টার সময় সভা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের 'বরেন্দ্রমঙ্গল' নামক সঙ্গীতে সভার উদ্বোধন হইল। আচার্য্য মহাশয়কে সূর্য্যপূজার আসরে দেখিয়াছি—পূজারীরূপে সহসা তিনি চারণরূপে মৃদঙ্গনির্ঘোষে 'বরেন্দ্রমঙ্গল' গাহিয়া যে নূতন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন—তাহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। বরেন্দ্রমঙ্গলে বরেন্দ্রের অতীত গৌরবকাহিনী অনেকেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নাটোরাধিপতি ইন্দ্রপ্রতিম জগদিন্দ্রনাথ অতঃপর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। ভাষার সেই চিরপরিচিত হিল্লোলিত ললিত গতি, বর্ণনার সেই মধুর ভঙ্গী—সকলকে মুগ্ধ করিল। অধিক পরিচয় অনাবশ্যক পাঠকগণ সম্পূর্ণটাই পড়িয়া রসাস্বাদন করিতে পারিবেন।

সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলেন শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু। সদ্যঃ মাতৃহীন অশৌচগ্রস্ত মলিনবেশধারী নগ্নপদ পুরুষসিংহকে দেখিয়া আমার হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। গতবার এমনি দিনে মাতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে যাইয়া কলিকাতা সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলাম।—যাক্।

অক্ষয়বাবু তাঁহার চিরমধুর ভাষায় গম্ভীর স্বরে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই:—সমস্ত দেশের সাহিত্যিকবৃন্দ আজ রাজসাহীতে সমবেত হইয়াছে, বড়ই আনন্দের দিন। তাই অশৌচগ্রস্ত হইলেও তিনি বাণীপূজার আবাহনে উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। অশৌচগ্রস্ত শ্মশানবাসী, তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া হইয়াছে। চিরদিন শ্মশানই তাঁহার স্থান, বরেন্দ্রের লক্ষ শ্মশান হইতে পূর্ব্ব গৌরবের ভস্মাবশেষ ঘাঁটিয়া ধূলি, ভস্ম ও অস্থিকণা সংগ্রহ, দেশবাসীর ঘরে ঘরে সেই পূতকণিকা বিতরণ করাই তাঁহার কার্য্য। এমন চিরশ্মশানচারী যদি সভাপতি নির্ব্বাচন করেন, তবে শ্মশানেশ্বর প্রমথনাথ ভিন্ন আর কাহাকে করিবেন? ২২ বৎসর পূর্ব্বে রবিবাবুর পঞ্চভূতের ডায়েরী "সাধনা"য় বাহির হইয়াছিল; সেই পঞ্চভূতের সভায় সভ্য ছিল লোকেন্দ্র, জগদিন্দ্র, প্রমথ, অনাথ এবং বক্তা স্বয়ং আর রিপোর্টার স্বয়ং রবিবাবু। সেই যে সাহিত্য সাধনার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই আজ সবুজপত্র মেলিয়া কবিতাকুসুমে সুশোভিত হইয়া

রবির কিরণপাতে মনোহর রক্তিমাভা ধারণ করিয়া গগনতলে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাকে আজ সভাপতিরূপে পাইয়া উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ধন্য হইল।

অক্ষয়বাবুর প্রস্তাব শীতলাইর জমীদার যোগেন্দ্র বাবু ও কোহিনুর সম্পাদক সমর্থিত করিলেন। কোহিনুর সম্পাদক প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্গালী মুসলমানদের বাঙ্গালাভাষা চর্চ্চায় উদাসীনতা, আরবী পারসী গ্রন্থের বাঙ্গালায় অনুবাদের আবশ্যকতা, মুসলমান লেখকদিগকে উৎসাহদান ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলিলেন।

অতঃপর সভাপতির সুদীর্ঘ বিতর্কসঙ্কুল অভিভাষণ,—সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কাযেই বিবরণবাহুল্য নিষ্প্রয়োজন, বিচারবাহুল্যের স্থানাভাব। প্রমথবাবুর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার সহিত অভিভাষণে তিনি এত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়া এমন নিপুণ ভাবে বিচার করিয়াছেন, যে তাঁহার বিচারনৈপুণ্যে বিস্মিত হইতে হয়।

সভাপতির অভিভাষণের পরে অন্যান্য কার্য্যের পর ৬টায় সভাভঙ্গ হইল।

সন্ধ্যা ৭॥০টায় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন বসিল। বিশেষ বর্ণনা আর কি করিব, সে এক বিষম দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার ও তাণ্ডব নৃত্য—প্রবন্ধ নির্ব্বাচন অক্লান্তকর্ম্মা রমাপ্রসাদ বাবুই করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহা নিয়া কোন গোলমালই হইল না। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন পরিচালনের নিয়মাবলি নির্দ্দেশ লইয়াই যত গোলমাল। গত বৎসর পাবনা সম্মিলনেও এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু যথেষ্ট সময় বিবেচনার জন্য দেওয়া হয় নাই বলিয়া প্রস্তাবটি স্থগিত থাকে। এইবার সেই প্রস্তাব পুনরুত্থাপিত হইল। মধুর চাকে ঢিল ছুড়িলে যে অবস্থা হয়, এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইবামাত্র সেই অবস্থা হইল। কলিকাতা হইতে আগত এক দেশমান্য দার্শনিক প্রস্তাব করিলেন "উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের গঠনপ্রণালী বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন বর্ত্তমানে, উত্তরবঙ্গে আর একটা পৃথক সম্মিলন থাকা কর্ত্তব্য কিনা তাহার বিচার করুন।" তখন মহাকুরুক্ষেত্রের ব্যাপার বাধিয়া গেল। ব্যবহারজীবী সভাপতি ব্যবহারজীবী দার্শনিক প্রস্তাবকারীর সহিত আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে লাগিয়া গেলেন, যাদবেশ্বর জীমূতমন্দ্রে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সিরাজগঞ্জের এক উকিল তারস্বরে অধ্যবসায়ের সহিত চেঁচাইতে লাগিলেন, বালুরঘাটের বন্ধুবর নলিনীবাবু হুহুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, রাইগঞ্জের এক ভদ্রলোক

মৃগীরোগগ্রস্তের মত হাত পা ছুড়িতে লাগিলেন—চন্দ তাঁহার প্রবন্ধের ব্যাগ সামলাইতে লাগিলেন ইত্যাদি।

মোটকথা মীমাংসা কিছুই হইল না। এখন লেখকের বক্তব্য এই যে, উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক জেলা ও প্রত্যেক মহকুমা হইতে উত্তর বঙ্গ সম্মিলন-পরিচালন সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাদিগকে একস্থানে সম্মিলিত হইয়া হাতাহাতি করিবার অবসর না দিয়া পত্রযোগে তাহাদের মতামত লইয়া সম্মিলন পরিচালনের নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেই ত হয়। সর্ব্ববঙ্গের মতামত লইতে যাইয়া প্রত্যেক বৎসর এই বীভৎস ব্যাপারের পুনরাভিনয় করাইবার কিছু সার্থকতা আছে কি?

পরদিন ভোরে ৭টায় সভা বসিবার কথা ছিল, কিন্তু কর্ণধারগণ বিলম্ব করায় ৮টায় সভা আরম্ভ হইল। প্রথমে পড়া হইল মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বরের "অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মপালনের আবশ্যকতা।" মহামহোপাধ্যায় সমস্ত দেশবাসীর শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তিনি যদি যা' তা' লিখেন ও যা তা' বলিয়া নিজকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলেন, তবে আমাদের বড়ই দুঃখের কারণ হয়।

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য লিখিত পরবর্ত্তী প্রবন্ধ—"সংস্কৃত নাটকের জন্মকথা—" অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, মুখবন্ধটুকু বাদে সমস্তটাই মূল্যবান। পরবর্ত্তী প্রবন্ধ কথাসাহিত্য লেখক প্রসিদ্ধ জলধর দাদা। গল্পের নানা বিভাগ আছে—তাহার মধ্যে এক বিভাগে জলধর দাদার শ্রেষ্ঠ আসন, কাজেই গল্পের বিষয়ে তাহার বক্তব্য অত্যন্ত শ্রোতব্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধ "জ্ঞানদাসের পদাবলি"—লেখক: প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম এ। তিনি গত বৎসর পাবনাতে "নিমানন্দ দাসের পদরসসার পাঠ করিয়া পাবনা সম্মিলন রসিয়ে তুলেছিলেন।" এবারের প্রবন্ধে সেইরূপ রসাধিক্য না থাকিলেও সুশৃঙ্খল বিচারনৈপুণ্যে তাহার অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছিল।

অতঃপর ব্যোমকেশ বাবুর প্রাচীন পুঁথির বিবরণ দিয়া সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলি শেষ হইল ও সভাপতি মহাশয় সমস্তগুলির মোটামুটি একটা সমালোচনা করিলেন।

অতঃপর হৃৎকম্পকারী দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধাবলি পঠিত হইতে লাগিল ও জড়সড় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। প্রথমে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের "বৈষ্ণবদর্শন"—নিম্ন কণ্ঠস্বর বশতঃ কিছুই শুনা যায় নাই। তৎপরে সভা-

পতির অনুরোধে হীরেন্দ্রবাবু বেদান্তদর্শন বিষয়ে কিছু বলিলেন ও দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এই তিনের প্রভেদ বুঝাইবার জন্য বিস্তর বাদানুবাদ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু স্থূলবুদ্ধিপ্রযুক্ত আমাদের নিকট তিনটা এক রকমই বোধ হইতে লাগিল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে নিশ্চয়ই কতকগুলি দুষ্ট পণ্ডিত মিলিয়া এতগুলি বাদ সৃষ্টি করিয়া হীরেন্দ্রবাবুকে ফাঁকী দিয়া অনর্থক একটা পরিশ্রম করাইয়া লইতেছে। সভাপতিও উঠিয়া এই বিষয়ে কি যেন কি বলিলেন দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম! শ্রীযুক্ত পীতাম্বর তর্করত্ন মহাশয় "চার্ব্বাকদর্শন" শুনাইতে উঠিয়া আশ্বস্ত করিলেন—কিন্তু দর্শক এবং শ্রোতৃগণ চার্ব্বাকদর্শনে এত পণ্ডিত যে, তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ শুনিয়া সে জ্ঞানলাভ করা বাহুল্য মনে করিয়া কলরব করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহামায়া দেবী নাম্নী এক বিদুষী মহিলার সভার সহিত সহানুভূতি-জ্ঞাপক একখানা সংস্কৃত চিঠি পাঠান্তে তখনকার মত সভা ভঙ্গ হইল।

অপরাহ্ণ ২॥০টায় আবার সভা আরম্ভ হইল। নিম্নে পঠিত প্রবন্ধাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

১। আর্য্যদের আদি নিবাস নিরূপণ। লেখক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত এম এ, শ্রীযুক্ত তিলকের **Arctic Home in the Vedas** নামক বিখ্যাত গ্রন্থে প্রকাশিত মতের প্রতিবাদ। এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আঘাতে তিলকের মতবাদ ভূমিসাৎ হওয়া অসম্ভব। নলিনীবাবু পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষ বিচার বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ যদি তিনি রচনা করেন তবেই ভাল হয়।

২। সেনরাজগণের রাজ্য পরিমাণ—শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী লিখিত।

৩। গুপ্তরাজাদের সময়ে বাঙ্গালা দেশ—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক।

৪। কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা উদয়নাচার্য্যের কাল নিরূপণ। লেখক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র বাবু। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন।

৫। প্রাচীন যৌধেয় জাতী। লেখক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম এ, পি আর এস্। যৌধেয় জাতির মধ্যে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল তাহারই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রতিপাদন।

৬। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল। শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত মহাশয় এই বিষয়ে মৌখিক কিছু বলিয়াছিলেন।

৭। প্রাচীন ভারতে যুদ্ধপ্রসঙ্গ। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়।

৮। মহাস্থান ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল। বর্ত্তমান মহাস্থানই যে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তাহাই প্রতিপাদ্য। মহাস্থানের পক্ষে যাহা যাহা বলা যায়, প্রভাস বাবু নিপুণ উকিলের মত তাহা গুছাইয়া বলিয়াছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলির একটা মোটামুটি সমালোচনা করিয়া রাষ্ট্রনীতিসম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলিলেন। অতঃপর অক্ষয়বাবু, মহারাজা নাটোর, পাঁচকড়ি বাবু প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ নানা বিষয়ে কিছু কিছু বলিলেন। অতঃপর প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করিয়া মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর অক্ষয় বাবুকে পঞ্চানন না ষড়ানন অভিহিত একটা উপাধি দান করিলেন এবং অক্ষয় বাবু তাহা মাথা পাতিয়া লইলেন। গৌহাটির পদ্মনাথ বাবুও লক্ষ্মী না সরস্বতী নামে একটা উপাধি পাইলেন।

সন্ধ্যায় বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতির প্রাঙ্গনে সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক সমস্তকে মিঠাইমণ্ডা দিয়া অভ্যর্থনা করা হইল। কুমার শরৎকুমার মূর্ত্তিমান সৌজন্য ও বিনয়ের মত সকলের সুখ সুবিধা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শরৎবাবুর হাত ছাড়াইয়া বাহির হইয়াছি, এমন সময় স্থানীয় হরিসভার পাণ্ডাগণ আসিয়া পাকড়াও করিলেন, হরিসভায় কুলদাবাবুর বক্তৃতা হইবে তাহা শুনিতে যাইতে হইবে! কোন রকমে তাহাদের হাত কাটাইয়া আমরা পঞ্চবন্ধু যাইয়া গঙ্গার ধারে বসিলাম। তখন তিন দণ্ড রাত্রি হইয়াছে।

দোলপূর্ণিমা! ফাল্গুনী চাঁদের জ্যোৎস্না জোয়ারে ভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। সম্মুখে গঙ্গা তরল অমৃত স্রোতের মত প্রবাহিত। পরপারে দিগন্তবিস্তৃত শুভ্র বালুকারাশি স্তব্ধ হইয়া জ্যোৎস্না-স্নান করিতেছে, আর এপারে আমরা পঞ্চবন্ধু শুদ্ধপরিপূর্ণহৃদয়ে বসিয়া। স্নিগ্ধ মলয়-সমীরণ গাছের পাতায় যেন মধুর নূপুর বাজাইতে লাগিল—আমরা যেন হৃদয়মধ্যে দুইটি অনাদি কিশোর-কিশোরীর লীলান্দোলিত নূপুরঝঙ্কৃত মধুর পদক্ষেপ অনুভব করিতে লাগিলাম। সেই গঙ্গার ধারে ঘাসের উপর বসিয়া কি আনন্দই অনুভব করিয়াছিলাম—তাহা বর্ণনার অতীত।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় বন্ধুবর অধ্যাপক নৃপেন্দ্রবাবুর বাসায় আকণ্ঠ আহার করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পরদিন সকালবেলা ৭৷৷০টায় সভা বসিল। নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলি পঠিত হইল।

১। কলঙ্কভঞ্জন—শ্রীবিনোদবিহারী রায়। জ্যোতিষিক নিবন্ধ।

২। জড় ও অণু। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রভূষণ অধিকারী।

৩। স্বাস্থ্যতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু।

৪। চর্ব্বণ ও পোষণ। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বসু।

৫। পর্য্যায় রত্নশালা—শ্রীযতীশচন্দ্র সরস্বতী। মূল্যবান প্রবন্ধ।

৬। সার। বগুড়ার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল।

অতঃপর সভাপতির সমালোচনা। পরে পঞ্চাননবাবুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ে কিছু বক্তৃতা, পরে রমাপ্রসাদ বাবু বাকী প্রবন্ধগুলির সার পাঠ করিলেন। পরে অক্ষয়বাবু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ লিখিত রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব নামক এক কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। বঙ্গাক্ষরের উৎপত্তি বিষয়ক এক প্রবন্ধ পাঠ হইল ও রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় এই বিষয়ে কিছু বলিলেন। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বরও এই বিষয়ে কিছু বলিলেন।

অতঃপর সুরেন্দ্রবাবু কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। একটি মুসলমান ভদ্রলোক 'প্রণমামি তারে সেই বিশ্বপতি' বলিয়া মধুরকণ্ঠস্বরে বিশ্বপতির স্তোত্রগান করিলেন।

তারপর একেবারে বাসায় যাইয়া উঠিলাম।

অতঃপর বিজয়া দশমীর পালা বর্ণনা অনাবশ্যক। তবে শেষ করিবার পূর্ব্বে রাজসাহী সম্মিলনের পরিচালকদিগের আশ্চর্য্য সুবন্দোবস্ত কলেজের ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবকগণের আশ্চর্য্য কার্য্যতৎপরতা ও সহৃদয়তা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল এই কথা জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। উত্তরবঙ্গের এই বার্ষিক মহাযজ্ঞ বর্ষে বর্ষে নবীন সাফল্যে মণ্ডিত হইয়া উঠুক।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সবুজপত্র চৈত্র—

এবার সবুজপত্রে নূতনত্ব আছে—লেখক একা রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক মুখপত্রে নামাবশেষ হইয়াই আছেন। সেদিন একজন বন্ধু বলিতেছিলেন "সবুজ পত্রের এমন সম্পাদক আমিও হইতে পারি, কিন্তু মুখপত্রে নামটি ছাপিতে রাজী নই।" অনেক প্রশ্ন করিবার পরও বন্ধুবর কথাটার অর্থ আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইলেন না।

"বসন্তের পালা" নাম দিয়া যে কয়টি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন "এগুলি কাণে করিয়া লইলে খেয়াল নাটকের (অর্থাৎ পরে প্রকাশিত

'ফাল্গুনী' শীর্ষক নাটকের) চেহারাটি ধরিবার সুবিধা হইতে পারে।" যাহাতে আমাদের মত পাঠকেরা নাটকটি বুঝিতে পারি সেই জন্যই "বসন্তের পালা" লিখিত হইয়াছে কিংবা ইহা একটা স্বতন্ত্র রচনা তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন।

'বেণুবন' 'দখিন হাওয়া'য় মাতিয়া উঠিয়াছে। কুসুমের গন্ধে বর্ণে পাখীও মাতোয়ারা "ফুলন্ত" গাছ গন্ধভরে তন্দ্রা হারাইয়াছে। নদী পাগলের মত ছুটিয়া চলিয়াছে; কিন্তু "ফুলন্ত গাছ" বলিতে চায়—

আমি সদা অচল থাকি
গভীর চলা গোপন রাখি
আমার চলা নবীন পাতায়
আমার চলা ফুলের ধারা।
ওগো নদী, চলার বেগে
পাগল পারা
পথে পথে বাহির হয়ে
আপন হারা!
আমার চলা যায় না বলা
আলোর পানে প্রাণের চলা
আকাশ বোঝে আনন্দ তার
বোঝে নিশার নীরব তারা।

এইরূপে আত্মপ্রকাশের পর 'পাখীর গলায়' 'বকুল তলায়' নবীনের দুরন্ত প্রাণ জাগিয়া উঠিল। নবীন বসন্ত প্রবীণ শীতকে ছাড়িতে চাহিল না। নব যৌবন শীতকে বসন্তের বন্দীশালায় বন্দী করিতে চাহিল। শীত তাহার কথায় উদভ্রান্ত হইয়া উঠিল। বসন্ত তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে আসন্ন মিলনের গান জমিতে বিলম্ব হইল না। নবীন জিতিল। নবযৌবন শীতের হৃদয়দ্বারে ফিরিয়া আসিলে প্রবীণ শীতে নবীন রূপে নূতন আশা জাগিয়া উঠিল। প্রবীণে নবীনে বোঝাপড়া শেষ হইলে প্রবীণ নবীনের বিক্রমে বিস্মিত হইল। তারপর উৎসবের গান—

আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
পিছন পানের বাঁধন হতে
চল্ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে
আজ নবীন প্রাণের আনন্দে।

সকল বাঁধন ছিন্ন কর; যখন অকূল প্রাণের সাগরতীরে উপস্থিত হইবে তখন ক্ষয়ক্ষতি অগ্রাহ্য না করিয়া থাকিতে পারিবে না; অনন্ত তোমার সম্মুখীন হইবে

যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড় অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

"বসন্তের পালা"র কবি বাধাবন্ধনহীন অবুঝ দুরন্ত নবীনকে রাজটীকা দিয়াছেন। এ নবীন প্রবীণকে ত্যাগ করিতে চায় না, বরং তাহার জীর্ণ প্রাণ পল্লবিত করিয়া তুলিতে চায়। প্রবীণ তাহাকে প্রথমটা ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু তাহার ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিত না হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারে না।

আমাদের দেশ বেদাভ্যাসজড়; আধ্যাত্মিকতা ইহলৌকিক বিষয়ে আমাদের অনাস্থা আনিয়া দিয়াছে। আমরা প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিই। নবীন তারুণ্যকে পদদলিত করিয়া আমরা বার্দ্ধক্যকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া থাকি। সেই জন্য আমরা বৃদ্ধ; আমাদের দেশও বৃদ্ধ, অক্ষম; সেই জন্য রবীন্দ্র বাবু আমাদের মধ্যে নবীনতা অবিবেচনা প্রভৃতি কতকগুলি শিশুসুলভ শক্তির উদ্বোধন করিয়া অস্থিমজ্জাগত বার্দ্ধক্যকে দূরীভূত করিতে চান। তবে এই বার্দ্ধক্য জ্ঞানজনিত বলিয়া কবি ইহাকে একেবারে তাড়াইবার কথা না বলিয়া বলিতেছেন—নবীনতা ও প্রবীণতায় একটা সম্পর্ক আছে—নবীন আপনার মতে চলিয়া প্রবীণের পথেই আসিয়া পড়ে—নবীন প্রবীণে মিলন স্বাভাবিক; তাহারা পরস্পর বিরোধী নয়, বরং নবীন প্রবীণকে সাজাইয়া সুন্দর করিয়া তাহার মধ্যে প্রাণশক্তি জাগাইয়া তোলে।

"ফাল্গুনী" নাটকেও দেখিতে পাই—ঘরছাড়ার দল বসন্ত যাপন করিতে বাহির হইয়াছে। ইহাদের "দাদা" অকালবৃদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞানের মাত্রা তাঁহাতে কিছু অধিক। ঘরছাড়ার দল ইহাকে উপহাস করিয়া বেড়ায়। কিন্তু চন্দ্রহাস দাদার কথা শুনিতে রাজী। ঘরছাড়ার দলের এক সর্দ্দার আছে সে প্রকৃতির মত, সর্দ্দারি করেনা, অথচ ঘরছাড়ার দল তাহার মতে চলিয়া থাকে। সে গুহার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের মত 'যে মান্ধাতার আমলের বুড়ো লুকিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না' তাহাকে অবিশ্বাস করিতে চায়। একদিন তাহার অনুচরেরা সর্দ্দারের এই অবিশ্বাসটার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। সর্দ্দারের প্রতি যখন সন্দেহের সুত্রপাত হইল সর্দ্দার তখন একটা নূতন খেলা আবিষ্কার করিতে চাহিল। বুড়োকে লইয়া বসন্ত উৎসবের পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল।

সকলে বুড়োর সন্ধানে চলিল। কিন্তু কেহই তাহাকে ধরিতে পারিল না। শুক্লপক্ষে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া সে কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল। জ্ঞান ও বার্দ্ধক্যের পথ ধরিয়া তাহারা কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। তাহাদের ভয় বাড়িল, মনে হইল কেবলই তাহারা ভুল করিতেছে। হঠাৎ তাহাদের শ্রদ্ধা আসিল অকালবৃদ্ধ দাদার উপর। সর্দ্দারের উপর তাহাদের সন্দেহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিল। ফলে তাহারা যেখানে ছিল, সেইখানেই রহিয়া গেল; উন্নতি নাই, অবনতি নাই এমন একটা আড়ষ্ট অবস্থা বাছিয়া লইতে হইল।

এমন সময়ে চন্দ্রহাসের হাসি শোনা গেল। প্রকৃত মানুষ সে—ঘরছাড়ার দলের মত

সে কখনও প্রকৃতিকে অশ্রদ্ধা করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্যকে পদদলিত করে নাই। সে বুড়ার সন্ধান লাভ করিয়াছিল। তাহার পথপ্রদর্শক ছিল একটি অন্ধ বাউল।

সকলে চন্দ্রহাসের পিছনে পিছনে যন্ত্রের মত চলিল। কিন্তু চন্দ্রহাস অন্ধ বাউলকে লইয়া তাহাদের ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। ঘরছাড়ার দল এখন প্রকৃতির দিকে চাহিয়া তাহাতে মাতিয়া বুঝিল—শুধু বসন্তের হাসি নয়—সমুদ্রপারের দীর্ঘনিঃশ্বাসেও মজিতে পারা যায়। প্রকৃতির মতে চলিলে শুধু প্রকৃতি নয়, জ্ঞান ও সরস খেলার সামগ্রী হইয়া পড়ে। বাউল অন্ধ, গান করিয়া প্রাণের প্রেরণায় সে পথ ঠিক করিয়া লয়। ঘরছাড়ার দল হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া মাতিয়া উঠিল। বাউল অন্ধ প্রাণের মতই গান ধরিল।

সব যারে সব দিতেছে
তার কাছে সব দিয়ে ফেলি
কবার আগে চাবার আগে
আপনি আমায় দেব মেলি',
নেবার বেলা হলেম ঋণী
ভিড় করেছি, ভয় করিনি
এখনো ভয় করব নারে
দেবার খেলা এবার খেলি।
প্রভাত তারি সোণা নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে নেচেকুঁদে
সন্ধ্যা তারে প্রণাম করে
সব সোণা তার দেয়রে শুধে।
ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে
আপনাকে ভাই ফুরিয়ে দেওয়া
চুকিয়ে দে তুই বেলা বেলি।

চন্দ্রহাস ফিরিল না; সে বুড়াকে জয় করিয়া আনিতে গিয়াছিল। সকলে চন্দ্রহাসকে খুঁজিতে গেল। কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রহাস তাহাদের নিকটে আসিয়া বলিল "সে বুড়োকে ধরিয়াছে।" বুড়া যখন নিকটে আসিল তখন সকলে দেখিল সে সর্দ্দার। প্রকৃতি ও জ্ঞান এখন একই জিনিস বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। নবীনে প্রবীণে দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গেল।

ফাল্গুনীর কথাংশ আমারা প্রকাশিত করিলাম; পাঠকেরা এখন ইহার মূল তত্ত্বটি ধরিতে পারিবেন। পাছে ইহার কাব্যাংশের কিছু ক্ষতি হইয়া পড়ে সেই জন্য তত্ত্বটি বিশেষরূপে প্রকাশ করিতে আমরা রাজী নই।

এই হেঁয়ালি নাট্যে রবীন্দ্রবাবু একটা নূতন ধরণ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার কবিত্ব শক্তি কোথাও ক্ষুন্ন হয় নাই। কথোপকথন সংক্ষিপ্ত, অথচ সারবান। গানগুলি স্থানে স্থানে প্রাণস্পর্শী, জিনিসটিকে হেঁয়ালীর আকার দান করিলেও তাহা পরিস্ফুট।

কিন্তু তত্ত্বটি খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুদর্শন প্রকৃতিকে যে স্থান দিয়াছেন রবীন্দ্রবাবু তাহা উচ্চতর করিতে চান। তিনি আত্মা ও প্রকৃতির সম্পর্কটা খুব দৃঢ় প্রমাণ করিয়া ইউরোপের সভ্যতার স্রোত এদেশে আনিতে চান—যে আধ্যাত্মিকতা, তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রীয় বচন তাঁহার মতে আমাদের অকাল বার্দ্ধক্য আনিয়া দিয়াছে, তাহার সহিত ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা ও ইহলোকের মঙ্গলের বিরোধ নাই—স্বতন্ত্রতা ও প্রকৃতির অনুবর্ত্তিতা আমাদের আধ্যাত্মিকতায় আনয়ন করে ইহাই রবীন্দ্র বাবুর বক্তব্য। অকালবৃদ্ধ হইয়া আমরা যে সমাজকে বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছি তাহা সত্য। রবীন্দ্রবাবুর যাহা বক্তব্য তাহাও অযৌক্তিক নয়। হিন্দুদর্শন প্রকৃতিকে নিম্ন স্থান দেয় নাই। কবি হিন্দুদর্শনের উপর আপনার কথা প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ইংরাজী দর্শনের একটা পুরাতন জীর্ণ শাখাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। যাহা নিজের কাছে প্রচুর তাহার জন্য পরের কাছে হাত পাতিতে কি জানি কেন বাঙ্গালী এমন একটু নারাজ। কেহ কেহ রবীন্দ্রবাবুর কথা বিদেশীর কশাঘাত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহা বন্ধুর তিরস্কার বলিয়া মানিয়া লইলাম।

তারপর রবীন্দ্রবাবু যাহা কবিকল্পনায় গড়িয়া তুলিয়াছেন, যেমন ভাবে চলিলে প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য না করিয়া জ্ঞানে পৌঁছিতে পারা যায় ও প্রকৃতি ও জ্ঞানে কোন বিরোধ অনুভূত হয় না, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে কতটা সম্ভব এখনও প্রমাণিত হয় নাই।

প্রবাসী বৈশাখ—

"বিবিধ প্রসঙ্গে" প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন "জীবিত লেখকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করিতে সাহস হয় না; যদিও তাঁহার অনেক গদ্যরচনা খুব মূল্যবান, অনুবাদেও সমজদার বিদেশীরাও তাহার মূল্য বুঝিয়াছে। কেননা, বঙ্গদেশে রবিবাবুকে তুচ্ছজ্ঞান না করিলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না।" লেখকের এ উক্তির সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলাম না। রবিবাবুকে বোধ হয় এবার চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে "আমার বন্ধুদের নিকট হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর।" বঙ্গদেশের লোক রবিবাবুকে বুঝেন নাই, বুঝিয়াছেন কেবল প্রবাসী সম্পাদক! আমরা সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি—বঙ্গদেশের কোন গ্রন্থকার জীবিতাবস্থায় রবীন্দ্রবাবুর মত এ দেশে সম্মান লাভ করিয়াছেন কি?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পল্লীর উন্নতি প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"পুণ্য আমরা বুঝি, এমন কি গ্রাম্য আত্মীয়তার ভাবও আমাদের বেশিকম থাকতে পারে কিন্তু সাধারণ হিত আমরা বুঝিনে এবং এইটে বুঝিনে যে সকলের শক্তির মধ্যে আমার নিজের অজেয় শক্তি আছে।"

"আমার প্রস্তাব এই যে বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমার হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘর বাড়ির পারিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চ্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগী-পরিচর্য্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা একাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত

করবার জন্যে আপাততঃ কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরীপ ও রাস্তাঘাট ড্রেন পুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমত চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে। পল্লীগ্রামে নানা স্থানেই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর এণ্ট্রান্স স্কুল আছে। যাঁরা পল্লী-গঠনের ভার গ্রহণ করবেন, তাঁরা যদি এই রকম একটা কাজ নিয়ে পল্লীর চিত্ত ক্রমে উদ্বোধিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন, তবে পল্লীসম্বন্ধে যে সমস্ত সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে একদল যুবক প্রস্তুত হতে থাকুন, তাঁদের প্রতি এই আমার অনুরোধ।" রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব যোগ্য তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বুঝিতেছি. ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশে গ্রাম্য-পঞ্চাইতি প্রভৃতি বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়া নানাবিধ গ্রাম-হিতকর প্রস্তাব হইয়াছে কিন্তু কার্য্যতঃ বেশী দূরে আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই—আশা করি এখন এমন সময় আসিয়াছে যখন বাক্য ও কার্য্য সমপাদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারিবে।

"স্বাস্থ্যের উন্নতি"র লেখক শ্রীনীলরতন সরকার। ডাক্তার মহাশয় এই প্রবন্ধে সহজ সরল ভাষায় অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। বাংলার সাহিত্য সরকার মহাশয়কে লাভ করিলে পরিপুষ্ট হইবে আশা করি।

শ্রীযদুনাথ সরকার ইতিহাসচর্চ্চার প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা ইতিহাস চর্চ্চা করিতেছেন তাঁহাদের নিকট এ প্রবন্ধ আদরণীয় হইবে। ঐতিহাসিক সত্যনির্দ্ধারণ করিতে হইলে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানা আবশ্যক (১) সর্ব্বাগ্রে কে এজাহার দিয়াছে (২) এই সাক্ষীটি ঘটনা জানিবার কি সুযোগ পাইয়াছে (৩) এই এজাহারে তাহার কোন স্বার্থ আছে কি না। আসল গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিতে অনুবাদের উপর নির্ভর করা ভুল। যেখানে অনুবাদ ব্যবহার না করিলে চলে না, সেখানে সর্ব্বশেষে রচিত অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদটি অবলম্বন করিতে হইবে। ভিন্ন মত উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে অতি কৌশলে সত্য বাছিয়া লইতে হয়। শুধু রাজা, রাজ্যপরিবর্ত্তন, যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ইতিহাস নহে। ইতিহাস দর্পণ নামের যোগ্য; অতীত যুগের হৃদয়টি দেখাইতে না পারিলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না। ইতিহাসের জ্ঞান জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। যদুবাবু নানা উদাহরণ দিয়া তাঁহার বক্তব্যগুলি প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সংখ্যায় বৃন্দাবন ও দাক্ষিণাত্যের মূর্ত্তিশিল্পের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে চিত্রগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক। অজন্তা গুহার কতকগুলি চিত্রও এ সংখ্যায় সংগৃহিত হইয়াছে। 'ফরাসীর অর্ঘ্যে' ফরাসী ঐতিহাসিক জুল মিশলের বিশ্বমানবের গীতার (Bible of Humanity)

সামান্য আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। মুসলমানগণ ভারতকে কি প্রকার চোখে দেখিয়াছিলেন তাহা এই প্রবন্ধটি পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। লেখকের প্রবন্ধ আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল।

"যাত্রাগান" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ;

"পাগল তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশীতে"

অনেকবার শুনিয়াছি, কবিতায় ভাবের নূতনত্ব নাই। তবে ছন্দ ও কবিত্ব মুগ্ধকর।

"হৃদয়ের আকাঙ্খিত দেশ" ডব্লিউ, বি ইয়েটস প্রণীত একটি নাট্যরচনার অনুবাদ। এই হৃদয়ের আকাঙ্খিত দেশে কেউ বৃদ্ধ, ধূর্ত্ত অথবা জ্ঞানী হয় না—বৃদ্ধা এবং মুখরাও সেখানে কেউ নেই—সেখানে সৌন্দর্য্যের জোয়ারে ভাটা পড়ে না। ধ্বংসের বন্যা সেখানে নাই, আর আনন্দই সেখানে আনন্দ, কাল অফুরন্ত গানের মত। অপদেবতা একটিবধূকে দেববিগ্রহে ভক্তিমান পবিত্রধর্ম্মে দীক্ষিত ও শাস্ত্রজ্ঞ গুরুদেব, প্রেমিক স্বামী ও কর্ম্মিষ্ঠা গৃহিণীর প্রসারিত জাল হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া গেল। অপদেবতাটি গুরুর মতে নরকের ভবিষ্যৎ অধিবাসী হইতে পারে, চক্ষের নিমেষে তাদের মনের উপর দিয়ে যেসব চিন্তা বয়ে যায় তারা শুধু তারই দাস। গুরুদেব বলেন—পরমেশ্বর তাদের ধ্বংস করবেন, কিন্তু কে জানে হয়ত ভগবান তাদের দেখে হাসবেন আর তাদের জন্যে বড় দরজা খুলে দেবেন।' অপদেবতা বলে "নদীর বাঁশীতে এই সুর শুনিতে পাই বাতাস যদি হেসে মর্ম্মর শব্দে গান গায় তবে উদাসীন হৃদয় যাদের তারা শুকিয়ে যাবে, আর বাতাস হেসে মর্ম্মরশব্দ করে সেই দেশের গান গায় যে দেশে বৃদ্ধেরাও সুন্দর এবং এমন কি জ্ঞানীরাও মজার কথা বলে, তখন পরীরাও (অপদেবতারাও) শুনতে পায়।" অনুবাদ সর্ব্বত্র স্পষ্ট নয়। তবুও রচনা সুখপাঠ্য। রচয়িতা প্রচলিত জীর্ণ সমাজ পদ্ধতির উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপে এ ভাবের অভাব নাই। আমাদের দেশেও রবীন্দ্রবাবু সে ভাবটা আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। সমাজের প্রতি এখন সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে—শত্রুর পড়িয়াছে সমস্ত ধ্বংস করিবার জন্য,মিত্রের দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য। এখন সমাজের অগ্নিপরীক্ষার দিন আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

"অগ্রণী" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ; পাগল চাঁপা ও উন্মত্ত বকুল বসন্তের প্রতীক্ষা না করিয়াই "সবার মাঝে উঠে হেসে ঠেলাঠেলি করে" ফুটিয়া উঠিল আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝরিয়া পড়িল। ইহাও যে অর্থহীন নয় তাহা কবি তাঁহারই উপযুক্ত কবিত্বের প্রভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত "ভারতীয় দর্শনে দর্শনশব্দের নিরুক্ত নিরূপণ করা দুঃসাধ্য তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন দর্শন বিভিন্নবাদী হইলেও তাহারা এক সত্যের নানা দিক দেখাইয়া দেয়। প্রাচীন যুগে নানা মতের সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। আমরা যদি এই সমন্বয়ের ভাবে ভাবিত হইয়া সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে অনায়াসে অসম্বিতত্ত্বর কণ্টকিত ক্ষেত্র পরিহার করিয়া সামঞ্জস্যের উজ্জ্বল চূড়ায় আরূঢ় হইতে পারিব।

তত্ত্বদর্শনের কারণ বুদ্ধি নয়—বোধি, মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা তর্কবিচার নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু বোধি ভিন্ন তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না। এখন বিচার তর্কে না মজিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে অভেদে ভেদ না দেখিয়া ভেদে অভেদ দেখিতে হইবে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দর্শন শিক্ষা চলিতেছে তাহা সন্তোষজনক নয়, সেই জন্য লেখক বলিয়াছেন—যাঁহার আগমনে ভারতবর্ষের প্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যিনি ভারতবাসীর স্থগিত ভাবধারা এবং স্তম্ভিত চিন্তাস্রোতকে আবার গতি দান করিবেন, এমন শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আশাপথ আমরা চাহিয়া আছি। পরিভাষা সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন—মুদ্রাব্যতীত যেমন বাণিজ্য নিষ্পন্ন হওয়া দুষ্কর, পরিভাষা ভিন্ন সেইরূপ দর্শনচর্চ্চা অসম্ভব। সংস্কৃতভাষা দর্শনপরিভাষা সম্বন্ধে সাতিশয় সমৃদ্ধ। অথচ আমরা সেই খনির রত্নরাজির সন্ধান না করিয়া মনগড়া কিম্ভূতকিমাকার শব্দের প্রয়োগ করিতেছি।

লেখক আরও বলিয়াছেন পরিভাষা রচনা ও শব্দসূচী সংগ্রহ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের প্রাচ্য প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ করিতে হইবে। মৌলিক গ্রন্থও আবশ্যক।

তারপর লেখক দেখাইয়াছেন—দর্শন ক্ষেত্রে researchএর জিনিস অনেক আছে। প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার বিশেষ আবশ্যক।

হীরেনবাবুর এই কথাগুলি বিশেষ আলোচনার জিনিস। প্রবন্ধটি ভাবিবার অনেক জিনিস উপস্থাপিত করে। বিশেষজ্ঞের নিকট যাহা আশা করা যায় এপ্রবন্ধে তাহা আছে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া কিছু হতাশ হইয়াছেন। এই হতাশার কারণ—

(১) বঙ্গ-সাহিত্যে চুটকির প্রাচুর্য্য। চুটকি মন্দ জিনিস নয়, তবে তাহাই যথাসর্ব্বস্ব হওয়া উচিত নয়। চুটকির চেয়ে কিছু বড় জিনিস চাই। চুটকি যখনকার তখনই, বেশী দিন থাকে না।

শেষের কথাটা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নয়। অনেক চুটকি যে বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ দিতে অধিক বিলম্ব হয় না।

(২) চিন্তাপূর্ণ রচনা ও জীবন-চরিতের অভাব।

(৩) কাব্যের দোষগুণ পরীক্ষার অভাব।

(৪) সংস্কৃত ও ইংরেজীর হাতে পড়িয়া বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্যনাশ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় দেশে বিজ্ঞান বিস্তারের কতকগুলি অন্তরায় নিরূপণ করিয়াছেন। প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। সব কথা সংক্ষেপে বলা চলে না। আমরা পাঠকগণকে এ প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যোগেশবাবুর একটা কথা আমরা উদ্ধৃত করিব—"এই যে অভাব বোধ হইতে গবেষণা তাহাই প্রকৃত; অন্যের দেখাদেখি যাহা তাহা কৃত্রিম। আরও দেখিতেছি কৃষি ধরিয়া প্রায় যাবতীয় বিজ্ঞান শিখাইতে পারা যায়। বিজ্ঞানের এমন শাখা মনে হইতেছে না যাহা ইহাতে কিছু না কিছু লাগে। ইহাই ত প্রজাসাধারণের আবশ্যক। বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব প্রকাশিত হউক পরিচিত কৃষিবার্ত্তার দৃষ্টান্তে প্রচারিত হউক।"

উপসংহারে লেখক বিজ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে একটু বিবেচক হইতে উপদেশ দিতেছেন। সে কালের একার অসির পরিবর্ত্তে এই যে ইউরোপে শতঘ্নী বাণ নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভে ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ভোগ-প্রবৃত্তির আস্ফালনে দিগন্ত কম্পিত হইতেছে, তাহা হইতে বিরত হইতে হইবে। * * আমাদের প্রাচীনেরা এ কথা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা বিজ্ঞান ও দর্শন এক করিয়াছিলেন।"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গলা দেশের কতকগুলি প্রাচীন গৌরবের কথা বলিয়াছেন। তাহা সংখ্যায় বিশটি :—(১) হস্তি-চিকিৎসা (২) নানা ধর্ম্ম-মত (৩) রেশম (৪) বাকলের কাপড় (৫) থিয়েটার (৬) নৌকা ও জাহাজ (৭) বৌদ্ধ শীলভদ্র (৮) বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব (৯) নাথ পন্থ (১০) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (১১) জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র (১২) লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ (১৩) ভাস্করের কাজ (১৪) বাঙ্গলায় সংস্কৃত-চর্চ্চা (১৫) বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন (১৬) ন্যায়শাস্ত্র (১৭) চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর (১৮) তান্ত্রিকগণ (১৯) বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ (২০) কায়স্থ ও রাজা।

দেশের অতীতের আলোচনা যে কত প্রয়োজনীয় তাহা আজকাল বুঝাইয়া বলিতে হয় না। অনেক কথা শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন তাহা বঙ্গবাসী এতদিন জানিতে পারে নাই। গৌরব বৃদ্ধি করিতে হইলে অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিতে হইবে। যিনি অতীতের গৌরব সম্মুখে ধরিয়া দেন, তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ অস্বীকার করা মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়।

শাস্ত্রী মহাশয় "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের গতি" শীর্ষক রচনায় গত সাহিত্য-সম্মিলনে ভাষায় চুটকির প্রাচুর্য্যের জন্য একটু হতাশের ভাব দেখাইয়াছিলেন, তাই কবি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি অতি দীর্ঘ শব্দবহুল কবিতায় কতকটা ব্যঙ্গ প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাটিতে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় থাক আর না থাক, তাঁহার প্রগল্ভতার পরিচয় যথেষ্ট আছে।

ভারতী, বৈশাখ—

মাতৃপৃষ্ঠের উপরে সুখাসীন শিশুমূর্ত্তি যে "কলঙ্কের বোঝা" ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। যদি মাতা বা তাহার শিশু কিংবা দুইজনের মিলিত ছবিতে এমন কিছু থাকিত, ছবির রেখাপাতের মধ্যে কলঙ্কের রেখার কোন আভাস যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে চিত্রের প্রশংসা করি বা নাই করি চিত্রকরের নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে পারিতাম। চিত্রকরের মনের ভাব যদি চিত্রে আপনি ফুটিয়া ওঠে তবে সেই খানেই তাহার বাহাদুরি, তাহা না হইয়া যদি চিত্রের বিষয় ছাপার অক্ষরে লিখিয়া দর্শককে বুঝাইয়া দিতে হয়, তবে সে চিত্রকরের জন্য শোক প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না। যে কলঙ্ক অমনি বোঝা গেল না "কলঙ্কের বোঝা" লিখিয়া তাহা না বুঝাইলে চিত্র, চিত্রকর এবং ভারতী সকলেরই উপকার হইত। বর্ত্তমান চিত্র দেখিয়া ও তাহার কয়টি ছাপার অক্ষর পড়িয়া মনে হয় যে ঐ কয়টি অক্ষর লিখিবার জন্যই চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে। আমাদের অনুমান সত্য হইলে বড়ই পরিতাপের কথা!

সম্পাদিকা এই মাসে ভারতীর ভার আত্মীয় শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সে ভার টা নিতে অক্ষম; সেই জন্য বন্ধু শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কেও বাছিয়া লইয়াছেন। এখন এই দুই বন্ধুই ভারতীর সম্পাদক।

এ সংখ্যায় শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় রুস ঔপন্যাসিক লিওনিডাশ আণ্ড্রিভের একটি গল্প অনুবাদ করিয়াছেন। এক ভদ্রলোক একটি রমণীকে বিবাহ করিতে চায়। রমণী তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় সে তাহার উপর প্রতিশোধ লইতে চাহিল। তাহার এক বন্ধুকে সে দেখিতে পারিত না, তাহার সহিত বিবাহ হইলে রমণী খুব অসুখে কাল কাটাইবে মনে করিয়া সে দুইজনকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিল। যখন তাহাদের বিবাহজীবন খুব সুখকর হইল, তখন সে প্রতিশোধ চেষ্টার বিফলতায় আকুল হইয়া এক দিন রমণীর স্বামীকে পাগলামীর ভান করিয়া হত্যা করিল। অনুবাদ মন্দ হয় নাই। লেখককে আমরা উৎসাহ দান করি।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন "টিকিমঙ্গল" লিখিয়াছেন। লেখক যিনিই হউন, তাঁহাকে হঠাৎ শিক্ষা ছাড়িয়া শিক্ষকের আসনে লম্ফ প্রদান করিতে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। রচনায় কবিত্ব নাই সংযম নাই। লেখক হয় ত মনে করিতেছেন খুব একটা বাহাদুরি দেখানো হইতেছে। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণও তাঁহাকে যে অকালপক্ক বলিবেন, তাহা আমরা তাঁহাকে মনে করাইয়া দিতেছি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবরের কন্যা গুলবদনের কতকটা ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। হুমায়ুন-নামার রচয়িতার কথা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের ইতিহাসের যে অংশগুলি এখনও অবছায়ে পড়িয়া আছে তাহাদের আলোকিত করিবার চেষ্টা লেখকের আছে।

"অকূলে" একটি ছোট গল্প; লেখক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ছোট গল্প লেখকেরা আজকাল নূতন প্লট খুঁজিয়া পান না বলিয়া দুঃখ করেন; কিন্তু এই লেখকটি এক পতিতা নারীর কাহিনী লিখিয়া প্লটে নূতনত্ব আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নারীটির প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করাই বোধ হয় লেখকের উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে স্বামী যে নারীটির প্রতি কি দুর্ব্যহার করিত তাহা পরিস্ফুট করা উচিত ছিল। দেশের একটুও রুচি যখন দূষিত হয়, লেখকেরা যখন শক্তিহীন হইয়া বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসটিতে আসিয়াই থামিয়া যান, অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন না, তখনই খুন, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচারিতা প্রভৃতি গল্পের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালায় যদি কখনও সে দিন আসে, আমাদের এই লেখক তখন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। রচনাটি পড়িলে ভাবে, ভাষায় এমন কিছুই পাওয়া যায় না, যাহাতে মানব-মনের উচ্চবৃত্তি একটুও উদ্বুদ্ধ হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের এক একটি মূল মন্ত্র লইয়া গল্প রচনা করিতে হইবে এবং সেই রচনার প্রতি পঙক্তিতে শ্রীদুর্গা এবং শ্রীহরি স্মরণ করিতে হইবেই এমন কথা আমরা বলি না। দুই চারি জন ফরাসী লেখক চুরি ডাকাতি ব্যভি-

চারকে আখ্যানবস্তু করিয়া গল্প লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বটে তবে সে সমাজ স্বতন্ত্র এবং সে সকল লেখকও অলৌকিক ক্ষমতাশালী। রচনার মধ্যে শিল্প-চাতুর্য্য প্রভৃতি গুণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে, আখ্যান বস্তুতে সীমাবদ্ধ অভদ্রতা ও অশ্লীলতার অপরাধ কতক পরিমাণে মার্জ্জনীয় হইতে পারে; যে রচনায় সেরূপ কোন গুণই নাই কেবল পাপপঙ্কে পতনোন্মুখী রমণীর প্রতিপাদবিক্ষেপের বিস্তৃত বর্ণনাই রচনার একমাত্র প্রশংসাপত্র সেরূপ রচনা সাহিত্যে স্থান পাওয়া অতিশয় অন্যায়। নূতন সম্পাদকের হাতে আসিয়াই ভারতী মুখপত্রে 'কলঙ্কের বোঝা' বহন করিয়াছেন, ভিতরেও তাঁহার সে বোঝা যখন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন এই সহযোগিনীর জন্য শোকপ্রকাশের দিন বড় দূরে নয় বলিয়া চিন্তিত হইয়াছি।

ভারতবর্ষ, বৈশাখ—

"যোগ না বিয়োগ" শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরীর কবিতা প্রাঞ্জল, তেজঃসম্পন্ন। মহামতি গোখেলের উদ্দেশে কবি ভারতবর্ষের প্রাণের সুরে বলিতেছেন—

ঘুম নয়—ঘুম নয়—ও ব্রাহ্মণ! এ যে জাগরণ!
শুকতারা ঝরে যায়,—পুনরায় শীত-অবশেষে
ধরারে সাজায় আসি বসন্তের অভিরাম-বেশে;—
মৃত্যুর মঙ্গল-ঘটে জীবনের ধ্রুব সঞ্জীবন!

সকল জিনিসকে এমন কি মৃত্যুকেও মঙ্গলরূপে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা এ রচনায় দেখিতে পাই।

"এই যে ভারতব্যাপী কোটি কণ্ঠে এক হাহাকার
মহাভিষেকের বাদ্য ঘোষিছে না এই দীনপূজা?"

কবিতাটি আরও একটু ছোট হইলে অংশের মধ্যে উপযুক্ত সমতার অভাব ঘটিত না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, দু একটি বৌদ্ধ মূর্ত্তির ফটোও প্রকাশিত হইয়াছে। রচনায় কতটুকু জিনিস আছে, ইতিহাসের পাঠক তাহা বাছিয়া লইবেন সাহিত্য হিসাবে ইহার মূল্য কম।

শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের "সার্থকতা" কবিতাটিতে মাধুর্য্য আছে। ভাবও আছে তবে ভাব প্রকাশ করিবার নৈপুণ্য নাই। অনর্থক শব্দপ্রয়োগে অনেক স্থলে তাহা অস্পষ্ট হইয়াছে। শ্রীরসিকলাল রায় পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্টের বংশ, শিক্ষা, গৃহধর্ম্ম, সাহিত্য-সেবা, মত ও চরিত্রের বিবরণ লিখিয়াছেন। হিন্দী সাহিত্য ও সাহিত্যিকের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ বঙ্গভাষার একটা অভাব মিটাইতে চেষ্টা করিতেছেন সে বিষয় সন্দেহ নাই।" ভূদেব বাবু ও ছেলেদের শিক্ষা" প্রবন্ধটি আমরা পূর্ব্বে কোন সময়ে উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রবন্ধে শিক্ষকরূপী ভূদেবের একটি প্রাঞ্জল চিত্র পাওয়া যায়। রচনা স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক। শ্রীরামপ্রাণ গুপ্তের বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশে টাঙ্গাইল উপবিভাগের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোমের "মধুস্মৃতিতে কবির সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীকালিদাস মল্লিক "সীতারামের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" লিখিয়াছেন। প্রকৃতির সকল

নিয়মের শেষে সৃষ্টি ও কর্ম্মের অভ্যন্তরে যে নিয়মের গতিবিধি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আধ্যাত্মিক। গীতায় পারদর্শী কোন বিজ্ঞ গ্রন্থকার যদি একটি সুচিন্তিত উপন্যাস রচনা করেন তাহার মধ্যে সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে তিনি যে তত্ত্ব বিশ্বাস করেন তাহার ছাপ থাকিয়া যাইতে পারে। সুতরাং লেখকের ব্যাখ্যা রস রচনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য নয়। স্থানে স্থানে কষ্ট কল্পনা অবলম্বন করিয়াও লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনুধাবনের জিনিস।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ শ্রীচৈতন্য দেব ও হরিদাসের কাহিনী উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন শ্রীচৈতন্যের চিত্ত বজ্রের চেয়েও কঠোর কুসুমের চেয়েও কোমল ছিল! রচনা সুখপাঠ্য। শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তীর "মহতের আকিঞ্চন" শীর্ষক কবিতায় ভক্তের মহত্ত্ব টুকু বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

এবারে ভারতবর্ষ প্রবন্ধ-বৈচিত্র্য ও সারবান রচনায় মাসিক সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

সাহিত্য সমাচার

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব প্রকাশিত উপন্যাস "শশাঙ্ক" মারাটী ভাষায় অনুবাদ হইতেছে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর একখানি কাব্যগ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একখানি কাব্যগ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহতাবের যুরোপ-ভ্রমণ ১ম খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'রত্নদীপ' যাহা ধারাবাহিকভাবে মানসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। পুস্তক যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ষোড়শী' ও 'গল্পাঞ্জলি'র নূতন সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।



মানসী

৭ম বর্ষ ১ম খণ্ড	আষাঢ় ১৩২২ সাল	১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা।

প্রেমের পরশ

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

মোর প্রেম এল গান গেয়ে;
কি যে হল কানাকানি
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি।
মুগ্ধচক্ষে হেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েছে কিছু যা তোমার গোপন হৃদয়ে
তারার মালার মাঝে চিরদিন র'বে গাঁথা হয়ে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৺দ্বিজেন্দ্রলাল

মেঘলেশহীন স্বচ্ছনীলাম্বর হইতে অকস্মাৎ অশনিসম্পাত হইলে যেমন সর্ব্বতোভাবে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়, আজ দুই বৎসর পূর্ব্বে এই দিনের এমনি সময় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের মারাত্মক ভীষণ পীড়ার সংবাদ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই এই মহানগরীর সাহিত্যিক-সম্প্রদায়কে নিরুপায়ভাবে দুঃখাভিভূত করিয়াছিল। সুস্থকায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নিজের একটি রচনার ভ্রম সংশোধন করিতেছিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি অসাধ্য অপস্মার রোগে অকস্মাৎ আক্রান্ত হন; রোগের পূর্ব্বরূপে কিঞ্চিৎ অসুস্থ বোধ করায় তিনি পুত্রের নাম ধরিয়া একবার তাহাকে ডাকিয়াছিলেন,—সেই তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত শেষবাণী! যে কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতে তাঁহার বান্ধবসম্প্রদায় চিরমুগ্ধ ছিল, যে কণ্ঠের মধুরালাপ একবার শুনিলে শ্রোতামাত্রেই প্রীত হইত, যে কণ্ঠ হইতে রঙ্গরস আদর-আপ্যায়ন নির্ঝরের স্বচ্ছধারার মত অবারিতভাবে অবিরাম ঝরিয়া পড়িয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে নিয়ত এক আনন্দ বেষ্টনের সৃজন করিয়া রাখিত, সে কণ্ঠ সেইদিন চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে! সে মধুরকণ্ঠ "বঙ্গ আমার জননী আমার" বলিয়া দেশজননীকে অন্তরের অন্তস্তল হইতে আর ডাকিবে না। দুর্দ্দশার গভীর পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য "মানুষ আমরা নহি ত মেষ" বলিয়া সে কণ্ঠ পুরুষোচিত স্পর্দ্ধা আর প্রকাশ করিবে না, "মুরজমন্দ্রে"র তাললয়ের সহিত নিমাই কণ্ঠে যেখানে "রঘুমণি" "ন্যায়ের বিধান" দিয়া মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিল, রজকীর প্রেমে মনের মালিন্য ধৌত করিয়া চণ্ডীদাস যেখানে প্রেমসঙ্গীতের বলে বিদ্যাপতির বিদ্যাকে হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছিল, সে সকল পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া ও করাইয়া যাঁহার কণ্ঠ অপূর্ব্ব গীতলহরীর তালমূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত দেশের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টায় নিয়ত ব্যাকুল ছিল, তিনি আজ লোকান্তরপ্রবাসী। পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীকে যিনি "বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, জহ্নুতনয়া তাঁহার শঙ্কিত প্রাণে চিরশান্তির বিধান করিয়াছেন, তাঁহার নয়নে চিরসুপ্তি দান করিয়া সমস্ত দুঃখদহনজ্বালা নির্ব্বাণ করিয়া দিয়াছেন। "এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি" বলিয়া যিনি কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বিশ্ববিধাতার মহিমময় সিংহাসনতলে সে প্রার্থনা পঁহুছিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র আজ আর নাই, তাঁহার জীবন-সূর্য্য মধ্যাহ্ন-

গগনে না পহুঁছিতেই অস্তশিখরীর পরপারে চলিয়া গিয়াছে, আমাদের নয়নের অন্তরালে কোন্ অজ্ঞাত লোকে তাঁহার আজ বসতি হইয়াছে, তাহা সেই লোকেশ্বরই জানেন; জীবনের যাহা কিছু অপূর্ণতা, ব্যর্থতা, নিষ্ফলতার বেদনা তাঁহার ছিল, আজ একান্তভাবে কায়মনে প্রার্থনা করিতেছি সে সমস্তই বিদূরিত হইয়া যেন তিনি নবজীবনের নবীনানন্দে চিরানন্দময়ের সান্নিধ্যলাভের চিরসার্থকতার অধিকারী হন। যে যায় তাহার তো নিবৃত্তি হইয়াই যায়, যত কিছু দুঃখ দৈন্য অভাব অপূর্ণতার ব্যর্থতার নিষ্ফল জীবনের ভার বহন আর তাহাকে করিতে হয় না, কিন্তু তাহার জন্য শোক করিতে যাহারা থাকে তাহাদের দুঃখ যে বড় দুঃখ! বিশেষতঃ যে দুর্ভাগ দেশে দুই একটি মাত্র মহাপ্রাণের দিকে চাহিয়া দেশের লোকে বহু আশা-আকাঙ্ক্ষায় বুক ভরিয়া রাখে, সেই দুই একজনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই আশার স্বর্ণসৌধ ধূলিসাৎ হইয়া গেলে এক মুহূর্তে সমগ্র দেশ যে বড় নিঃস্ব, বড় নিঃসহায় হইয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলালের অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে বঙ্গের আট কোটি নরনারী তেমনি এক নিমেষে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বাল্যজীবনেই দ্বিজেন্দ্রের প্রতিভার প্রথমালোক দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণনগর স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার 'আর্য্যগাথা' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। তারপর কিছুদিন দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থ-রচনায় মনোনিবেশের সময় পান নাই, পাঠরত হইয়া একাগ্রমনে সরস্বতীর আরাধনায় নিপুণ হইতে হইয়াছে এবং সেই তপস্যার ফলে বাগ্দেবতার তপো-লভ্য করুণাধারার অজস্র সিঞ্চনে তাঁহার মানসভূমি কত যে উর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নিদর্শন তাঁহার পরিণত বয়সের রচিত বহুবিধ কাব্য, নাটক, প্রহসন, সঙ্গীত, গীতিকাব্য, প্রবন্ধ, নিবন্ধে পাওয়া যায়। সুকুমার কৈশোরে দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা আরম্ভ করেন, আর পঞ্চাশৎ বৎসরের প্রৌঢ় সীমায় তাঁহারি রচিত গ্রন্থের শব্দপারিপাট্য বিধান করিতে করিতে অকস্মাৎ দুরারোগ্য ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে দিব্যগতি লাভ করিয়াছেন। হাতের লেখনী হাতেই রহিয়া গেল, মনোনন্দনের প্রস্ফুট কুসুমাঞ্জলি বাণী-পদারবিন্দে দিতে দিতেই তাঁহার পার্থিব নয়নের শেষ নিমেষ-পাত হইয়া গিয়াছে, উদ্যান উজাড় করিয়া সবগুলি ফুল সরস্বতীর রাতুল চরণে নিঃশেষে দিবার অবসরও তাঁহার হইল না—ভাবিলে মনে হয় তাঁহার জীবন-ব্যাপী ঐকান্তিক আরাধনায় প্রীত হইয়া মানবের মানসবিহারিণী বীণাবাদন-পরায়ণা মানসী তাঁহার আজীবন ভক্তকে মূর্ত্তিমতী হইয়া গগনপথে দর্শন দিয়া

ছিলেন, তাঁহার মাধুর্য্যময় মধু-সঙ্গীতে তুষ্ট হইয়া বাহু বাড়াইয়া একনিষ্ঠ ভক্তকে কোলে তুলিয়া নিয়া গিয়াছেন, বুঝিবা এই দুঃখময় ধরার কণ্টকপথে আর তাঁহাকে বিচরণ করিতে না দিয়া তাঁহার স্নেহের পুত্তলীকে নন্দনের হরিচন্দন ছায়ায় তাঁহারি হস্তের বীণা বাজাইবার ভার দিয়া জীবনব্যাপী তপঃকৃচ্ছ্রতার চরমসাফল্যের অধিকারী করিয়াছেন। রোগের যন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই, বন্ধুবান্ধবকে রোগশয্যায় সেবার ক্লেশ তিনি দেন নাই, আত্মীয় স্বজনের উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করিবার অবসর হয় নাই, পরপারের আহ্বান দূরশ্রুত বংশীরবের মত তাঁহার কাণে আসিয়া যেমন পহুঁছিয়াছে, পারের নৌকা ঘাটে আসিয়া যেমন লাগিয়াছে, অমনি তিনি তরী আরোহণ করিয়াছেন, পারের নাবিক বিনাকড়িতেই তাঁহাকে বৈতরণীর পরপারে লইয়া গিয়াছে।

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা পাইবার মত তপস্যা করিয়া অতি অল্প লোকই ইহলোকে জন্মগ্রহণ করেন; যাহারা অসাধারণ প্রতিভা অনন্যসাধারণ ধীশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাও সকল বিষয়ে সমান মনোযোগ দিতে পারেন না, তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রতিভার রশ্মি সমস্ত বিষয়কে সমভাবে আলোকিত করে না, বিষয়বিশেষে তাঁহাদের অসামান্য মানসিক সম্পদ পরিপূর্ণ শোভা ও সৌন্দর্য্যে বিকসিত হইয়া উঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, উজ্জ্বল প্রতিভা, অসামান্য শব্দসম্পদ যেমন তাঁহার ব্যঙ্গ রচনায়, হাসির গানে প্রকাশিত হইয়া আছে, এমন আর কোথাও কোন বিষয়ে হইতে পারে নাই।

বঙ্গভাষায় শুচি শুভ্র নির্ম্মল হাস্যরসাত্মক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্বে আর কেহ সফলকাম হইয়াছেন কিনা জানিনা—দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য নিরাময়, নির্ম্মল, শুভ্র এবং শৈশব-সুলভ সারল্যে উজ্জ্বল ও মধুর। তাঁহার হাসির রচনায়, শিশুর সরলতা, প্রবীণের বিচার-বিবেচনা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচকের অভ্রান্ত দৃষ্টি, ন্যায়ের কশাঘাত ও করুণার অশ্রু সবই ছিল। সমাজ ও সমাজস্থের যথার্থ দোষ উদ্ঘাটন করিয়া যে সকল তীব্র বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গের রচনা তিনি করিতেন, তাহাতে উপরে হাসির আবরণ ছিল কিন্তু যৎসামান্য অন্তর্দৃষ্টি যাহার আছে তিনিই বুঝিবেন যে, সে হাসিতে আচ্ছাদন করিয়া তিনি অন্তরের গভীরশোক গাহিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার বিদ্রূপের লক্ষ্যের সঙ্গে অশ্রু মিশাইয়া তাঁহার বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ নিজেও বুক পাতিয়া নিয়াছেন—আক্রান্তের সহিত আক্রমণকারীর এ অশ্রু বিসর্জ্জন, এ সমবেদনা সাহিত্যজগতে দুর্লভ সামগ্রী!

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার আলোক সাহিত্যের প্রায় সকল অংশেই পড়িয়াছিল কিন্তু হাসির গানই তাঁহাকে সার্থক সাহিত্যিক বলিয়া বঙ্গবাণীর ধন্য সেবক বলিয়া, তাঁহার যশঃপুষ্পের মনোমদ সৌরভ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে। শেষ জীবনে অর্থাৎ তাঁহার অকস্মাৎ অকালমৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। সে সমস্ত গ্রন্থের উপযুক্ত সমালোচনার কাল আজও আসিয়াছে কিনা বলাও কঠিন, তবে আজ এই শোকবাসরে সে সময় আসে নাই ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এবং বর্ত্তমান বক্তার তদুপযোগী যোগ্যতা যে নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

আবহমানকাল প্রচলিত প্রথায় তিনি নাটক রচনা করেন নাই, নাট্যোক্ত পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া, তাহাদের স্বগত উক্তির ভিতর দিয়া, তিনি চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তিনি তাঁহার রচিত কোন কোন নাটকের মুখপত্রে স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহার বিচার বিবেচনা ভবিষ্যৎ সমালোচকেরা করিবেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেকেন্দর শাহের ভারত আক্রমণের কাল হইতে ঔরঙ্গজেব বাদসাহের সময় পর্য্যন্ত কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাকে মূল করিয়া তাহার সঙ্গে অপূর্ব্ব কল্পনা মিশাইয়া তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলির সৃজন করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার সময়ে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়ে জাজ্বল্যমান স্বদেশ-প্রীতির উজ্জ্বল চিত্র আমার মানস নয়নে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, অধঃপতিত দেশবাসীর দুর্দ্দশায় তাঁহার অকপট অশ্রু বিসর্জ্জন, তাহাদের চরিত্রের সংস্কারকল্পে কবির একান্ত আগ্রহ ও বিপুল বাসনা, তাঁহার রচনায় কোন দোষ থাকিলেও তাহা আমার চক্ষুর উপর হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিত, দেশ জননীর একান্ত ভক্তিপরায়ণ ভক্ত কবির নিকটে আমার মস্তক স্বতঃই অবনত হইয়া পড়িত।

দেশের আপামর সাধারণের মত তাঁহাকেও অর্থোপার্জ্জনের জন্য আধীন্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে আধীন্য তাঁহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চ স্থান হইতে অধঃপতিত করিতে পারে নাই, আজীবন তিনি আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াই তাঁহার পদোচিত কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু বলিয়া যাঁহাদের গৌরব করিবার সৌভাগ্য আছে, তাঁহারাই জানেন স্বর্গগত কবির হৃদয়ে বন্ধুপ্রীতি কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল,

আপদ্‌গত বন্ধুর উদ্ধারার্থ তাঁহার যেমন অকরণীয় কিছুই ছিল না, যথার্থ বন্ধুর নিকট নিরভিমান আত্মনিবেদনেও তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন বলিয়া আমি জানি না। তাঁহার পরিচ্ছদের পারিপাট্য আমি কখনও দেখি নাই, দ্বিজেন্দ্রলালের গতিবিধি দেখিলে অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাচীন কল্পের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের মাধুর্য্যময় কণ্ঠস্বরের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি সুগায়ক ছিলেন; এই সম্পদ তাঁহার স্বর্গীয় পিতা স্বনামধন্য দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের দান। ৺কার্ত্তিকচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন, তাঁহার মনোহর কণ্ঠের সঙ্গীত যে শুনিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে—দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত-পারদর্শিতা তাঁহার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিরূপে উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পাইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রের ব্যঙ্গ-সঙ্গীত অল্পাধিক পরিমাণে ইংরাজি Comic রচনার অনুকরণ, কিন্তু অনুকরণ হইয়াও প্রতিভাশালী কবির হস্তে উহা স্বকীয় নিজস্ব সম্পদই হইয়া উঠিয়াছে, ইংরাজির অনুকরণে রচিত সঙ্গীতে তিনি বাঙ্গলা সুর বড় নিপুণভাবে যোজনা করিয়াছেন—যেন বিলাতি ললনাকে চেলাঞ্চলে সমাবৃত করিয়া বঙ্গের পল্লীনিকেতনে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে সংসারধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল শিশুর মত সরল ছিলেন; মিথ্যা, চাটুবাদ, চাতুর্য্য, ছলনা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল; এই সকল দোষ তিনি যেখানে দেখিয়াছেন খড়্গ-হস্ত হইয়া তাহার নিবারণ-কল্পে প্রাণপণ করিয়াছেন। অনাচারী সমাজের বাহ্য আড়ম্বরশীল ভণ্ডকে মিথ্যার সেবা করিতে দেখিলে তাহার পৃষ্ঠে নির্ম্মম কশাঘাত করিতে তাঁহার দ্বিধা ছিল না; সত্যের সেবায় সর্ব্বত্র জয়লাভ হয়, সত্যকে আশ্রয় করিলে আকাঙ্ক্ষিত লাভে জন্ম ও জীবন ধন্য হয় একথা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন এবং সকলকে বিশ্বাস করাইতে স্বতঃপরতঃ চেষ্টার তাঁহার ত্রুটি ছিল না।

বঙ্গসাহিত্যের সকল অংশে, প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতিভার আলোক বিকীরিত হইয়া অল্পবিস্তর সাহিত্য-সৌধের সকলগুলি কক্ষই আলোকিত করিয়াছে এবং সকলগুলি রচনার মধ্য দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ-জননীর প্রতি অচলা ভক্তি দেশবাসীদিগের জন্য অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশিত হইয়া কবিবরের অনাবৃত অন্তরটিকে লোক-লোচনের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। "বঙ্গ আমার জননী আমার" বলিয়া এমন করিয়া আর কে গাহিয়াছে তাহা ত

জানি না! "সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি" বলিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলগত ভক্তি-মন্দাকিনীর উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গে দেশ জননীর রাতুল চরণখানি কে এমন প্রক্ষালিত করিয়া দিয়াছে বলিতে পারি না। "অতুলন চির বিমোহন তুমি সুন্দর সুরধাম, শত নির্ঝর-ঝর্ঝর-ঝঙ্কারিত অবিরাম" বলিয়া দেশজননীর অতুলন শোভা-সম্পদের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ মন হইয়া কে আর এমন করিয়া সকল অন্তর দিয়া গাহিয়া উঠিয়াছে জানি না ত!

হে দারিদ্র্য-পীড়িত দেশের দরিদ্র সাহিত্যের আনন্দ দুলাল, 'চাণক্যের উচ্চারিত মহাসিন্ধু' পারে যাইবার ইচ্ছা যে তোমারই হৃদ্গত ইচ্ছা ছিল তাহা কি আমরা জানি! "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে" বলিয়া জহ্নু-তনয়াকে এত শীঘ্র যে শঙ্কিত প্রাণে শান্তি বর্ষণ করিতে ডাকিয়াছিলে সে কথা যে আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। রাজকুমার মোরাদের ইন্দ্রিয় বিমোহনে নিযুক্ত নৃত্য-পরায়ণা নর্ত্তকীর মুখের "এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো" সঙ্গীত যে তোমারই অন্তরাত্মার ক্লেশহীন মৃত্যুযাচনা একথা কেহ ত জানিত না। 'সুরধাম' ভ্রমে! করিয়া তুমি ত আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছ, এ নিরানন্দ দেশলক্ষ্মী শূন্য ক্রোড় লইয়া আজ কেমন করিয়া বিলাপ করিতেছে তাহা দেখিবার ও কেহ নাই। যে গীত সকলেরই গীত, যে পরিণতি সকলেরই পরিণতি, তাহার জন্য খেদ, আক্ষেপ করিয়া ফল নাই, তবে -

"এ যেন কৌতুকনাট্যে প্রথমাঙ্কে যবনিকা টানি'
নিবাইল দীপালোক, শুনাইল অন্তিমের বাণী!
রঙ্গরসে সারা বঙ্গ মাতাইয়া যেন অর্দ্ধপথে--
বঙ্গ-বৃন্দাবন-চন্দ্র আরোহিলা অক্রূরের রথে!"

বলিয়া কবি যেমন রোদন করিয়াছেন আজ তাই বলিয়া আমাদেরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয় যে!

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

প্রণাম

সবাকার ভিড় হ'তে একধারে সরে',
চুপচাপ রয়েছিস্ মাথা নীচু করে',
করযোড়ে কোণটিতে ; মুখে নাই কথা—
নিতান্ত ব্যথিত যেন—কি তোর বারতা,
রে মোর কুণ্ঠিত ভৃত্য, কিবা তোর নাম ?
সে কহিল মৃদুকণ্ঠে, আমি সে 'প্রণাম' !
দেবতা কহিল পুনঃ—মোর রাজ্যমাঝে
সহস্র সেবক ফিরে নিত্য নানা কাজে
যার যাহা সাধ্য সাধ ; তোর কিসে মন ?
'শুধু নমস্কার আর পূজা নিবেদন,
আর কিছু নাহি জানি' সে কহিল কাঁদি',
শুনিয়া দেবতা তারে সঙ্গে নিল বাঁধি' ;
পথে শুধাইল হেসে—ভক্ত, কোথা ধাম ?
চরণ ছুঁয়ে সে শুধু করিল প্রণাম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

তত্ত্ব ও সাহিত্য

একজনের বা কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর সামগ্রী লইয়া সাহিত্য হয় না। আমার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার সহিত অন্যের সম্পর্ক নিশ্চয়ই থাকিবে এমন কথা না বলাই উচিত ; তবে কখন-কখন আমার মুখ দিয়া বিশ্বের সুখ-দুঃখ প্রকাশ পায়, আমার বিরহ বিশ্বের বিরহকে জাগাইয়া তোলে, আমার আনন্দে বিশ্বমানবের আনন্দ ধ্বনিত হয়, তখনই আমার সুখ-দুঃখ, বিরহ-আনন্দ সাহিত্যের জিনিস। টেনিসনের ইন্ মেমোরিয়ম্ যদি ব্যক্তিগত বিলাপ হইত, তাহা হইলে টেনিসন্ও হয়ত তাঁহার দু' একজন বন্ধু তাহা উপভোগ করিতে পারিতেন ; কিন্তু গ্রন্থখানি শুধু টেনিসনের নয়, সমগ্র বিশ্বের বন্ধু-বিরহ-দুঃখ ও তাহার সান্ত্বনার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

মানব-সংহতির সহিত যাহার সম্পর্ক নাই, তাহাকে সাহিত্য বলিতে পারি না। গণিতশাস্ত্র একজনের জিনিস নয়, অনেকে ইহার সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারেন, তবুও ইহাকে সাহিত্য বলিতে পারা যায় না, কেননা গণিতশাস্ত্রের সহিত সকলের সম্পর্ক নাই। আইন, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির সম্বন্ধে ঐ এক কথাই প্রযোজ্য।

প্রকৃত মানব-জীবন লইয়াই সাহিত্য। মানব জীবনের সামগ্রীই সকলের হইতে পারে। এই যে জীবনের নিস্তব্ধ নিস্পন্দ জলধি জগতের উপর প্রসারিত রহিয়াছে, তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় না এমন জিনিসের নাম করা সহজ নয়। আকাশ বাতাস, গ্রহ উপগ্রহ, কুসুম কানন, নদ-নদী, মহান্ মহীরূহ হইতে তুচ্ছ তৃণাংশ পর্য্যন্ত তাহার বুকে রেখাপাত করিয়া যায়।

এই যে বিশ্ব প্রকৃতি—মানুষ শুধু ইহাকে গ্রহণ করিয়াই তৃপ্ত হয় না। প্রকৃতি তাহার সহচর, তাহার সুখ-দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, তাহার একমাত্র গতি। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই সে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ইহাকেই আলিঙ্গন করে, আবার শেষ মুহূর্ত্তে তাহার পরম প্রিয় দেহটিকে ইহারই কোলে সঁপিয়া দেয়। প্রকৃতি তাহার “গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ,” প্রকৃতি তাহার জীবন দেবতা, তাহার মানস সুন্দরী, প্রকৃতি তাহার বাল্য সুহৃদ, যৌবনের সাথী, বার্দ্ধক্যের সান্ত্বনা, মরণের শেষশয্যা।

আর এক দিক দিয়া ভাবিলে দেখা যায় প্রকৃতি তাহার পরম মিত্র, পরম শত্রু। আজীবন তাহার সহিত প্রণয়, বন্ধুত্ব, আজীবন তাহার সহিত কলহ, বিরোধ।

মানুষ জন্মগ্রহণ করিল, শুধু রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, জন্মের পরমুহূর্ত্ত হইতেই তাহার অন্তরে একটা আকুলতা, একটা বেদনার সূত্রপাত করিয়া দিল; প্রকৃতি এক দিক হইতে তাহার অভাব মোচনে সযত্ন হইল, কিন্তু আর এক দিক হইতে তাহার বিরুদ্ধে শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিতে বিমুখ হইল না। আকাশ, বাতাস, ফুল, ফল উপহারসম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার সম্মুখে অযাচিতভাবে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু অনাবরণ, শৈত্য, বিলাসিতা ও রোগের কবল হইতে তাহাকে মুক্ত রাখিল না। প্রকৃতির দান গ্রহণ করিতেই হইবে, নচেৎ জীবন ধারণ অসম্ভব, তবে সেই দান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একটা সংগ্রামেরও আয়োজন করিতে হইবে; এ সংগ্রামের অন্ত নাই, দিবারাত্র নিরবচ্ছিন্ন রণশ্রমের মধ্যে একদিন নির্নিমেষ জ্যোতিঃহীন নয়ন

সম্মুখে মৃত্যুর পাদপীঠতলে সেই সংগ্রামের মীমাংসা শেষ হইয়া যাইবে,—এত কথা ভাল করিয়া না ভাবিয়াই মানুষ অমৃতের সন্ধানে যাত্রা আরম্ভ করিল।

আনন্দ সান্তে নয়, অনন্তে। অন্তরের আনন্দ মানুষকে অনন্তের পথে প্রেরণ করিল। দৃশ্যে আর সে মুগ্ধ হয় না, দৃশ্যের মধ্যে অদৃশ্যের পানে তাহার প্রাণ ছুটিয়া যায়, গন্ধের মধ্যে গন্ধাতীতের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়ে, স্পর্শের মধ্যে অস্পর্শ, শব্দের মধ্যে শব্দাতীত তাহাকে মাতাইয়া তোলে, রস তাহাকে অরসের আস্বাদ আনিয়া দেয়।

মায়ার নিবিড় অন্ধকার, ইন্দ্রিয়ের রসহীন বিষয়, জড়প্রকৃতির তমোময় নিদারুণ নিষ্পেষণের মধ্যে কবে কোন্ মানবপ্রাণ সহসা জাগিয়া উঠিয়া প্রভাতের সুরে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সসাগরা ধরিত্রীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আশার বীজ রোপণ করিয়াছিল বলিতে পারি না, তবে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আমরা দুঃখকে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি, মায়ার মোহ প্রণয়ের বন্ধনে পরিণত হইয়াছে, সূর্য্য-চন্দ্রে, গ্রহ উপগ্রহে, নদ নদী, শৈল কাননে, পর্ব্বত সাগরে দেবত্ব অনুভব করিয়াছি, বাহ্য জগৎ তাহার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপের অন্তরালে এক অনন্ত প্রাণকে জাগ্রত করিয়া আমাদের প্রাণকে আকর্ষণ করিয়াছে; আমরা কি এক আনন্দের সচেতন পরিবেষ্টনের মধ্যে একটা সজ্ঞান স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়াছি; এ স্বাতন্ত্র্য তোমার বা আমার ব্যক্তিগত নয়, আমাদের ব্যক্তিত্বের ছাপ ইহাতে আছে, কিন্তু এ স্বাতন্ত্র্য মানব জীবনের, কেননা মানব জীবনের নববিকাশের দ্বারাই ইহা অনুপ্রাণিত।

এই যে অন্তর্দৃষ্টি, এই যে বহিরাবরণের নিম্নে ইন্দ্রিয়াতীতের অনুভূতি, ইহা যে আমাদের আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আনিয়া দিয়াছে, তাহা নয়, তবে ইহা যে মানব-জীবনের চরম উন্নতির সোপান, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু অন্ধ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে অবলম্বন করিয়া সান্ত জড় প্রকৃতিকে অনুধাবন করা নয়, সজ্ঞান মনুষ্যজীবনের অন্তর্নিহিত স্বাতন্ত্র্যকে অবলম্বন করিয়া অনন্ত জ্ঞানানুরঞ্জিতা প্রকৃতির অনুসরণ করাই সাধারণের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই মানুষকে প্রকৃতির শত্রুতার অন্তরালে নিবিড় প্রণয়ের আভাস দেখাইয়াছে, এই ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের স্থায়িত্বের কারণ।

এই ধর্ম্ম মতে প্রথমতঃ আমরা প্রকৃতির মধ্যে একটা গভীর তত্ত্বের আভাস পাই, তার পর সেই তত্ত্ব আবার প্রকৃতির বর্ণে, গন্ধে, ঘ্রাণে, শব্দে, স্পর্শে নিত্য বিকশিত হইয়া উঠে।

প্রতি জিনিসেরই দুটি দিক আছে—একটি তত্ত্বের দিক, আর একটি প্রকাশের দিক। আনবিক আকর্ষণ (Molecular attraction) একটি তত্ত্ব, প্রস্তরখণ্ড তাহার প্রকাশ; "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" একটা তত্ত্ব; মহাভারতে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে; অভ্যাস কার্য্যকে সহজ করিয়া তোলে, এই তত্ত্বটি আমাদের কার্য্যেই পরিস্ফুট হয়। এইরূপ অসংখ্য তত্ত্বের সমন্বয় যদি কোন বিপুল মহান্ তত্ত্বে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বিরাট বিশ্ব প্রকৃতি দিন দিন সেই তত্ত্বকে প্রকাশ করিতেছে এ কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

প্রকৃতির মধ্যে যে তত্ত্বের আভাস পাই, তাহা স্থায়ী, নিত্য, সত্য, সারবান্; তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট তাহা সুন্দর সরস হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য জীবনের নিকট তাহা একরূপ নয়, মানুষ তাহার অতি ক্ষীণ আভাস মাত্র পাইয়াছে, অনেকে তাহা বুঝিয়া ওঠা অসম্ভব মনে করিয়া তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়াছে। সুতরাং সেই তত্ত্বটিকে সুন্দর সরস অনুভব করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য।

আমরা রূপরসাদিতে পরিতৃপ্ত না হইয়া তাহাদের মধ্যে এই মহান্ তত্ত্বের অতি ক্ষীণ আভাসটুকু লাভ করিয়াছি; যতটুকু ক্ষীণ আলো পাইয়াছি তাহার আভায় রঞ্জিত করিয়া বাহ্য প্রকৃতিতে আনন্দ লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; সে আনন্দে তৃপ্ত হইয়া কখনও আনন্দের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবার জন্য তত্ত্বের আলোক অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রাণ বাহ্য প্রকৃতিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভে সক্ষম হইয়াছে। এইভাবে রূপ হইতে আরম্ভ করিয়া অরূপের আভাস পাইয়া আবার রূপে নূতন আলোক লাভ করিয়াছি। সে আলোক সময়ে ম্লান হইয়া আবার অরূপকে উদ্বোধিত করিয়াছে, এই রূপ অপ্রতিহত গতির সঙ্গে সঙ্গে অসীম সসীমে, নিত্য অনিত্যে, জ্ঞান প্রকৃতিতে ধরা দিয়াছে, নীরস তত্ত্ব সৌন্দর্য্যে সরসতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

আমরা প্রকৃতি লইয়াই কারবার করি, তাহাকে ছাড়িলে আমাদের এক দণ্ডও চলে না। তত্ত্বজ্ঞানীরাও প্রকৃতিকে বাদ দিতে বলেন না, কেননা

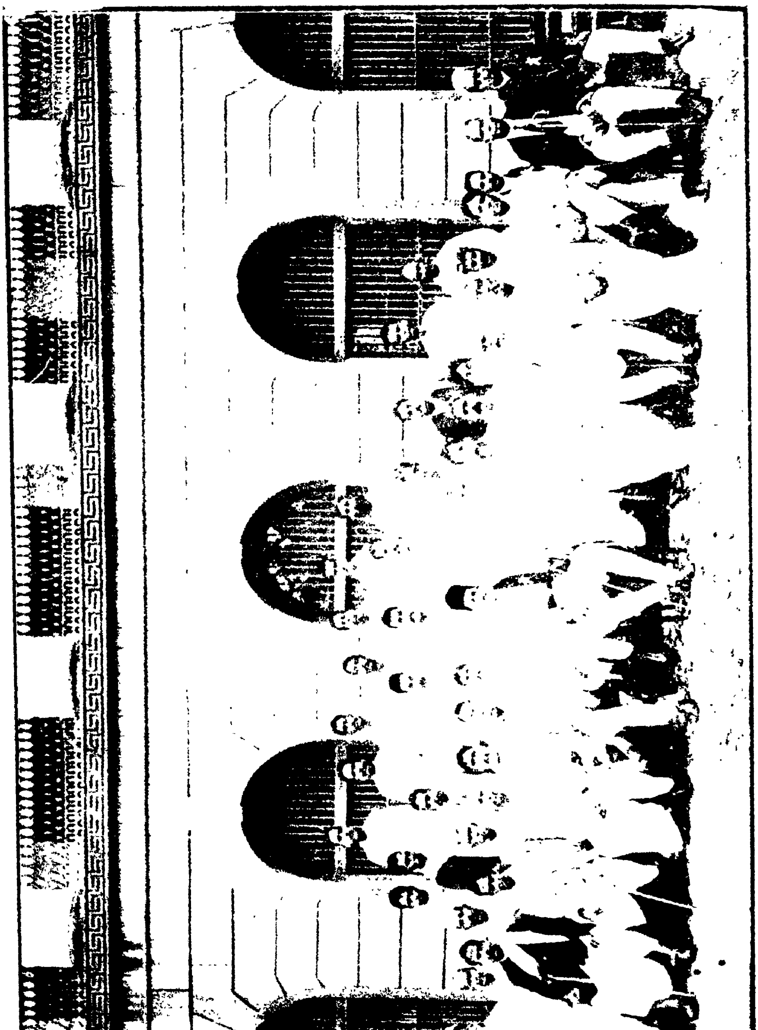
অনাত্ম প্রকৃতি ভিন্ন আত্মজ্ঞানও অসম্ভব। জড়-প্রকৃতি নয়, জ্ঞানানুরঞ্জিত প্রকৃতিই আমাদের ইহলোক পরলোক দু'য়েরই সিদ্ধি আনিয়া দিতে পারে।

তত্ত্বটি কি তাহা আমরা বলিতে পারি না, তাহাকে একটি সূত্রে অথবা একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা যায় না। যদি তাহা মুষ্টিগ্রাহ্য হইত, তাহা হইলে মনুষ্য-জীবন বড় আনন্দের হইত না। তাহা অসীম, অব্যক্ত, সেই জন্যই কোন্ স্মরণাতীত যুগ হইতে মানুষ তাহার অন্বেষণে ধাবমান, তাহার ঈষৎ আভাসে পুলকাঞ্চিত হইয়া সে নিরন্তর অক্লান্তভাবে দুঃখদৈন্যপীড়িত জীবন বহিয়া আনিতেছে, তাহাকে ধরিতে না পারিয়াও সে বিমুখ নয়, যে ভাবে ছুটিয়া আসিতেছে, দীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরিয়া সেই ভাবেই ছুটিবে। এই তত্ত্ব সুলভ নয় বলিয়াই মানুষ দীর্ঘ গতির অন্তে বাধাবন্ধনহীন অশেষ অশান্ত দীর্ঘতর দীর্ঘতম গতিকেই বিশ্রাম বলিয়া মানিয়া লইতে পারে।

এই তত্ত্ব সুদূর, অথচ অতি নিকটে ইহার আভাস পাই, সেই জন্য ইহা নিরাশা আনিয়া দেয় না, ইহা মরীচিকার মত আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে না, কেননা ইহা আংশিকভাবে আমাদের করায়ত্ত; ইহার সহিত আমাদের সখ্য নাই, আহার-বিহারে, শয়ন-স্বপনে ইহার সাহচর্য্য আমরা অনুভব করি না বটে, কিন্তু ইহাকে আমরা ভালবাসি, ভক্তি করি, ইহা আছে বলিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের কাছে আদরণীয়, কেননা ইহাই প্রকৃতিকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছে, ইহাই প্রকৃতিতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে।

আকাশের নীলিমায়, সমুদ্রের গর্জ্জনে, বসন্তের কুসুমসম্ভারে এই তত্ত্বের বিকাশ দেখিতে পাই; রমণীর মুখে, শিশুর হাস্যে, মাতার স্নেহে এই তত্ত্বই নিহিত আছে; ইহারই প্রেরণায় কালিদাস তপোবনে বিষয়বিমুখ তাপস সমাজে শকুন্তলার অনিন্দ্যসুন্দর চিরন্তন প্রতিমা সংসারের উপযোগী করিয়া বর্ণনা করিতে দ্বিধা করেন নাই; বিশ্বমাতৃকা গৌরীর কর্ম্মে ও চিন্তায় মানবী নায়িকার হাব-ভাব, আকার-ইঙ্গিত ও হৃদয়ের অখণ্ড পূত স্নেহধারা সিঞ্চন করিতে সে অকুণ্ঠিত; কোন পুরাতন নাটককার একটি পতিতা রমণীর হৃদয়ে অমৃত প্রণয়ের উৎসটিকে প্রকাশ করিয়া রমণীসমাজের উচ্চ সিংহাসনে তাহার আসন নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অমৃতময়ী কবিতা এই তত্ত্বেরই বলে আজও বাঁচিয়া আছে।

মানুষ প্রকৃতির মধ্যে এই তত্ত্বের যতটুকু আভাস পায় তাহাতেই সে



আপনাকে বেশ একটু নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে। এই তত্ত্ব তাহাকে অচেতনে চৈতন্য আরোপ করিয়া তাহার অন্তরের ভাবটিকে টানিয়া আনিতে সক্ষম করিয়াছে; ইহারই বলে আমরা নীচ জন্তুর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করি; দিগন্তের সান্ধ্যরক্তরাগে, নিদাঘের দিনান্তে, প্রভাতের অরুণিমায় প্রাণ মন তন্ময় হইয়া যায়; সুখের মধ্যে বেদনা, বেদনার মধ্যে আনন্দ, মৃতের মধ্যে প্রাণ, প্রাণের মধ্যে মরণ জাগ্রত হইয়া উঠে।

এই তত্ত্বই জীবনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হইয়া যখন প্রকাশ পায় তখন মানুষকে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত করে। সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার অধিকার করিয়াছেন বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানীদের উপহাস করেন করুন, তাঁহারাও যে একটা তত্ত্ব প্রচার করিতে বসিয়াছেন সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না।

এই তত্ত্ব যখন মানুষের অনুভবযোগ্য খণ্ড তত্ত্বে প্রকাশ পায়, তখন বিজ্ঞান, দর্শন, নীতি, অর্থশাস্ত্র, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি লিখিত হয়। তাহারা এক দিকে তত্ত্বের বিকাশ, আর এক দিকে তত্ত্বের সমষ্টি; সুতরাং তাহাদের নিঃসঙ্কোচে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তবে কখনও কখনও এই সব খণ্ড তত্ত্ব, এক জনের এক শ্রেণীর বা এক সম্প্রদায়ের সামগ্রী না হইয়া মনুষ্যজীবনের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলে, তখন সেই তত্ত্বগুলি সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

সাহিত্য তত্ত্ব নহে, তত্ত্বের প্রকাশ সাহিত্যে; সাহিত্য মানবজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট; সেই জন্য ইহার মধ্যে মানুষ জীবনের ক্ষুধার পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে; সাহিত্য শুধু একটা ক্ষণিক আনন্দ বা অন্তঃসার বিহীন উপভোগের সামগ্রী নয়, কেন না তাহার মধ্যে একটা মহান্ তত্ত্ব, একটা মহান্ সত্য বর্ত্তমান; সাহিত্য নীরস নয়, কেন না ইহার মধ্যে মানব জীবনের নিত্যরসরূপ সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান।

এই জন্য মানুষের কাছে তত্ত্ব অপেক্ষা সাহিত্যই চিত্তাকর্ষক হইয়া পড়ে। তত্ত্ব তাহার কাছে নীরস বলিয়া বোধ হইতে পারে, কেন না তাহার জীবনের সহিত ইহার নিত্যসম্পর্ক নাই। কথাটির দু'একটি উদাহরণ দিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানী বৃক্ষলতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ দুঃখসমন্বিতাঃ।" অনেকে তাহা শুনিল, কিন্তু প্রাণ দিয়া অনুভব করিল না, কেন না কথাটা তাহার জীবনের সহিত দৃঢ়সংশ্লিষ্ট থাকিতে অক্ষম।

কবি ঐ কথাটাই বলিল—এমন ভাবে বলিল যাহাতে সেটা মনুষ্যজীবনের কাছে অনাত্মীয় না হইয়া মানুষের অন্তরে একটা দীপ্তবর্ণের রেখা টানিয়া দিতে পারে, কবি বলিল—

পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ
স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপু
র্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি ॥

তত্ত্বজ্ঞ বলিলেন "হেমন্তে শিশির পতিত হইয়াছে।" কবি সেই কথাটাই মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া, তাহার প্রাণের ক্ষুধা মিটাইয়া একটা নূতন সুরে বলিয়া উঠে—

"* * হেমন্তের শিশির প্রভাতে
ছল ছল করে গ্রাম চূর্ণীনদীতীরে।"

তত্ত্বজ্ঞানী বিষবৃক্ষ রোপণ করিতে নিষেধ করিবেন; তাঁহার কথা, তাহার যুক্তিতর্ক অনেকে শুনিতে পারে, অনেকের নিকট তাহা নীরস; কিন্তু যে সাহিত্যস্রষ্টা মনুষ্যজীবনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করিয়া বিষবৃক্ষকে সযত্নে সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহার ফলাগমের কাল পর্য্যন্ত যিনি সচকিত থাকিয়া মনুষ্যসমাজের মধ্যে তাহার বিষময় ফল দেখাইতে একটুও যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, তিনি কল্পনার দ্বারা চালিত, শেষ পর্য্যন্ত তিনি তত্ত্বজ্ঞের মত একটিও উপদেশ দেন নাই, তবুও তিনি রচনার আনন্দের মধ্যে নির্ব্বাক মুখে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দিয়া যে অকথিত কথাটি প্রকাশ করিয়াছেন, মানুষের প্রাণে তাহা ধ্বনিত হইয়াছে, হইতেছে, দীর্ঘ ভবিষ্যতেও সে ধ্বনির বিরাম হইবে না।

কখন-কখন তত্ত্বগুলিও সাহিত্যের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়; তখন তাহারা নীরস নিষ্প্রাণ হইয়া থাকে না; কথাগুলি তখন এমন কৌশলে উপযুক্ত বক্তার মুখে উপযুক্ত দেশকালে প্রযুক্ত হয় যাহাতে তাহা অনায়াসে মানুষের প্রাণস্পর্শ করিতে পারে।

কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।

এই তত্ত্বটি বিরহী যক্ষের মুখে প্রবাসে ভবিষ্যৎপ্রত্যাশিত মিলনের সম্ভাবনার অনুকূল হইয়া মানবমনকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ

স ক্ষত্রিয়স্ত্রাণসহঃ সতাং য
স্তৎকার্ম্মুকং কর্ম্মসু যস্য শক্তিঃ।

এই তত্ত্বকথাটি বক্তার মুখে উপযুক্ত দেশকালে সপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছে, তাই মানবজীবনে ইহা যে অতি মৃদু আঘাত করিয়া যায় তাহা স্বীকার করা চলে না। সাংখ্য, বেদান্ত তত্ত্বকথায় পূর্ণ, কিন্তু গীতা সাংখ্য বেদান্তকে সাহিত্যের মত করিয়া তুলিয়াছে, কেন না গীতা উপযুক্ত বক্তার মুখে উপযুক্ত দেশকালে কথিত হইয়া প্রাণহীন হইয়া পড়ে নাই; মানবের প্রাণে সাংখ্য, বেদান্ত না পারুক, গীতা যে রেখাপাত করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কখন-কখন তত্ত্বগুলি উপযুক্ত দেশকালে প্রযুক্ত না হইয়াও অন্তর্নিহিত সত্যের সৌন্দর্য্যে মানবমনকে আকর্ষণ করে। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের উদাহরণ বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। "গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ" "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ" এই সব কথা শুনিলেই তাহার মধ্যে একটা সত্যের আলোক বিকশিত হইয়া আমাদের মুগ্ধ করে। তবে এ সব কথাগুলি উপযুক্ত দেশকালে প্রযুক্ত হইলে আরও সুন্দর, আরও চিত্তাকর্ষক হইয়া দাঁড়ায়।

শব্দে অলঙ্কারে রঞ্জিত করিয়া সাহিত্যস্রষ্টা সময়ে সময়ে তত্ত্বেও একটা চিরন্তন মর্য্যাদা দান করেন। দানশীলের দানজনিত তনিমা শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর এই কথাটিকে কবি কতকগুলি সহজ সুন্দর চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাকে সরস জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন—

মণিঃ শাণোল্লীঢ়ঃ সমরবিজয়ী হেতিদলিতো
মদক্ষীণো নাগঃ শরদি সরিদাশ্যানপুলিনা।
কলাশেষশ্চন্দ্রঃ সুরতমৃদিতা বালবনিতা
তনিম্না শোভন্তে গলিতবিভবাশ্চার্থিষু নৃপাঃ॥

দেশে বিজ্ঞান নাই, দর্শন নাই, অর্থশাস্ত্র, ভূবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব কিছুই বিশেষ ভাবে উন্নতিলাভ করিতেছে না; তবুও আমরা সময়ে সময়ে বলিয়া থাকি নীরসের আলোচনায় দেশের সরসতাটুকু লোপ পাইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালার শস্যশ্যামল ক্ষেত্র শীঘ্রই তত্ত্বের তপ্ত রৌদ্রে মরুভূমিতে পরিণত হইবে। এ দেশে একথার কোন অর্থ নাই, বরং বিংশ শতাব্দীতে এ কথা লইয়া যদি ইউরোপ আলোচনা করেন, তাহা হইলে কাজটা উপহাসাস্পদ হয় না। ইউরোপে কত তত্ত্ব, কত নিয়ম, কত সিদ্ধান্ত দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে।

বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনে, পার্থিবতার অদম্য মত্ততার মধ্যে, বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার পরিবেষ্টনের মধ্যে লালিত, পালিত, ও শিক্ষিত হইয়া সেদিন একজন কবি বীণার তারে যে আধ্যাত্মিকতার আকুল তান তুলিয়া গিয়াছেন, তাহার মূর্চ্ছনা শুধু ইংলণ্ড নয়, সমগ্র ইউরোপে কম্পিত হইয়া সাগরের পারে এই সুদূর ভারতবর্ষেও ভাসিয়া আসিয়াছে। তাঁহার বন্ধুবিয়োগের অনির্ভিন্ন গভীর অন্তর্গূঢ় করুণ রস বিজ্ঞানের তীব্র উত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায় নাই।

আজ এই ইউরোপের মহাসমরের দিনে অনেকে বিজ্ঞানের প্রতি একটু আধটু কটাক্ষ করিতেছেন না এমন নয়। তাহারা নিরস্ত হইলেই ভাল হয়, কেন না বিজ্ঞানের দোষ নাই। সে আমাদের অন্ধবিশ্বাস ঘুচাইয়াছে, অন্ধকারকে আলোকিত করিয়াছে, যাহার ভিত্তি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে আবার নূতন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিজ্ঞানের দিনে সাহিত্য নূতন উপকরণলাভ করিয়াছে, বিজ্ঞান হইতে গৃহীত নানা শব্দ, নানা অলঙ্কারে সে সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিতে চায়; তবে যদি তাহা সাহিত্যের পথে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দেয়, তাহা হইলে সেটা বিজ্ঞানের দোষ নয়, সে দোষটা আমাদের। বিজ্ঞানের চর্চ্চায় মাতিয়া উঠিয়া যদি আমরা পার্থিবতাকে আধ্যাত্মিকতার আসনে বসাইয়া দিই, সে কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করিতে হইবে।

সময়ে সময়ে অনেকে ঠিক বিজ্ঞানের কথাটা না বলিয়া বলিতে চান—তত্ত্বজ্ঞান আমাদের দেশে একটা উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। বাস্তবিক আমাদের দেশ তত্ত্বদর্শী। এই তত্ত্ব আমাদের কোন-না-কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারে একথা সত্য, কেন না ভাল-মন্দের সংমিশ্রণ সর্ব্বত্রই দেখা যায়; কিন্তু এই তত্ত্ব যে আজ পর্য্যন্ত এত বড় জাতিকে আপনার বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে শিখাইয়া জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী করিয়াই রাখিয়াছে, এই তত্ত্ব যে আমাদের জীবনের সরসতার জন্য সঙ্গীত, সাহিত্য, বিজ্ঞানের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই, এই তত্ত্ব যে বিশ্বসভ্যতার উন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত গতির মধ্যেও ভারতকে জাগ্রত সচেতন করিয়া রাখিয়াছে তাহা ত অস্বীকার করা চলে না।

এ তত্ত্ব তখনও ছিল যখন কালিদাস তাঁহার সরস কবিত্বের ঝঙ্কারে দেশ মুগ্ধ করিয়াছিল, যেদিন ভবভূতি পরিণত প্রণয়ের অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিয়াছিল, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের অব্যক্ত মধুর সুর কানের ভিতর দিয়া মরমে

পশিতে একটুও বাধা পায় নাই; এই তন্ত্র তখনও ছিল, যখন কবিরা ভোগবিলাসের বর্ণনায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত, যখন আদিরসাত্মক শ্লোকের পর শ্লোক শতকে শতকে দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই তন্ত্রের দিনে যে কবি ভোগী বিষয়নিরত পুরুষের বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিল

হেমন্তে দধিদুগ্ধসর্পিরশনা মাঞ্জিষ্ঠবাসোভৃতঃ
কাশ্মীরদ্রবসান্দ্রদিগ্ধবপুষশ্ছিন্না বিচিত্রৈ রতৈঃ
বৃত্তোরুস্তনকামিনীজনকৃতাশ্লেষা গৃহাভ্যন্তরে
তাম্বূলীদলপূগপূরিতমুখা ধন্যাঃ সুখং শেরতে ॥

সেই কবিই আবার বিষয়বিমুখ মুনির বর্ণনায় খুব উদার গম্ভীর স্বরে বলিয়াছে

মহাশয্যা পৃথ্বী বিপুলমুপধানং ভুজলতা
বিতানম্ আকাশং ব্যজনমনুকূলোঽয়মনিলঃ
শরচ্চন্দ্রো দীপো বিরতিবনিতাসঙ্গমুদিতঃ
সুখী শান্তঃ শেতে মুনিরতনুভূতির্নৃপ ইব ।

ভোগের চেয়ে মুনিকে উচ্চস্থান দেওয়ার জন্য তন্ত্র যদি আজ নিন্দিত হয়, তাহা হইলে সে নিন্দা মাথা পাতিয়া লইতে সে একটুও কুণ্ঠিত হইবে না।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ

পাচনি লইয়া গরুর পালের পিছনে যারা
চ'লেছে দূরের মাঠে।
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা,
মাথায় নাহিক আঁটে।
গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষানদী,
জুটেনা পারের কড়ি।
হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি
কাদায় কাঁটায় পড়ি'।
ক্ষুধার অন্ন, পরণের বাস, বাসের গেহ
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরোনা তাদের করগো স্নেহ
তারা মানুষেরই ছেলে।

জ্যৈষ্ঠ দুপ'রে গলদ্‌ঘর্ম্ম, বলদ ল'য়ে
চষে যারা রাঙা মাটি।
কতনা ঝঞ্ঝা, মুষলের ধারা মাথায় ব'য়ে
ক্ষেত করে পরিপাটি।
আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বুকে
ধরণীগর্ভে ধন।
বোকামি পড়েনা ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে
ধূলা-কাদা আভরণ।
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই,
ঘৃণা কি করুণা কোরোনা তাদের শ্রদ্ধা কর
তারা মানুষেরি ভাই।

শোভন করিয়া ঢাকিবে নারীর লজ্জাটুক্
জুটে নাই হেন বাস,—
তারি খুঁটে যারা পিঠে ছেলে বেঁধে, রক্ত মুখ,
তুলিছে মাটির রাশ।
মাঝ পথে যার শিরে নিজ বোঝা দিতেছে পতি,
থাক বা না থাক স্ত্রী,
ঘৃণা কি করুণা কোরোনা তাদের কর গো নতি
তারা মানুষেরি স্ত্রী।

নির্ব্বোধ যারা, অবোধ যারা পল্লীপারে
অশ্লীল যার ভাষ,
আধা শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে
চির নাবালক চাষা,
হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে করিয়া দান
ধনুসহ নৃপসুতে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া, প্রাণ
দেয় যারা আগে হ'তে,
বেতসের মত সভ্য শিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি'।
বটের মতন খোলা মাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য

(পর্ত্তুগীজ পাইসের কাহিনী)

Senhor Lopes, who has published these documents (Portuguese accounts) in the original Portuguese in a recent work (Chronica dos Reis de Bisnaga) writes in his introduction : Nothing that we know of in any language can compare with them, whether for their historical importance or for the description given of the country, and specially of the capital, its products, customs, and the like. The Italian travellers who visited and wrote about this country Nicolo de conti : Varthema, and Fedirici—are much less minute in the matter of the geography and customs of the land, and not one of them has left us a chronicle."

সমুদ্রতীর দিয়া ভারতবর্ষ * হইতে নরসিংহের রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলে প্রথমেই শৈলশ্রেণী অতিক্রম করিতে হয়। এই শৈলমালাই সমুদ্রতীরবর্ত্তী অন্যান্য রাজ্য হইতে উক্ত সাম্রাজ্যকে পৃথক করিয়াছে। এই শৈলরাজি ভারতবর্ষের সীমানায় বিস্তৃত রহিয়াছে। পর্ব্বতে স্থানে স্থানে যে সকল রন্ধ্র আছে তাহাদের ভিতর দিয়া রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। অন্যান্য স্থানে গিরিশ্রেণী ঘন অরণ্যে সমাকুল। এই সাম্রাজ্যের অধীনে সমুদ্রতীরে অনেকগুলি বন্দর আছে। সে সকল বন্দরের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই, বরং কতকগুলিতে আমাদের শিল্পশালা বর্ত্তমান আছে। †

এই শৈলমালা অতিক্রম করিলেই সম্মুখে সমতলক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। তথায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে। ভাটিকল্ হইতে সন্দর নগর পর্য্যন্ত যে রাজবর্ত্ম বিস্তৃত আছে তাহা সমতল বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে বনসমাকীর্ণ পর্ব্বত দেখা যায়। এই পথ ১২০ মাইল দীর্ঘ। পথের ধারে বহুস্থানে গিরিনদী আছে বলিয়াই প্রতিবর্ষে ভাটকলে ৫।৬ সহস্র ভারবাহী বণ্ড পণ্য বহিয়া আনে।

নরসিংহের রাজ্যের কথা বলি। পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত শৈল বনজঙ্গল আছে, অন্যত্র বনশ্রেণী বিরল। তবে এরূপ আছে যে, কোন কোন স্থানে এক সঙ্গে ৮।৯ মাইল পথও সারিবিন্যস্ত বৃক্ষের ছায়ায় গমন করিতে পারা যায়। প্রতি

* গোয়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান।

† Ancola, Mirgao, Honor, Batecalla, Mangalor, Bracalor and Bacanor.

নগর উপনগর বা গ্রামের পশ্চাদ্ভাগে বহু আম্র পনস তিন্তীড়ি প্রভৃতি এবং অন্যজাতীয় বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ কুঞ্জের আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল বৃক্ষকুঞ্জে বণিক্‌গণ পণ্যসম্ভার লইয়া বিশ্রাম করে। রেকালেম্ নগরে আমি একটি এত বড় বৃক্ষ দেখিয়াছিলাম যে, আমার তিন শত কুড়িটি অশ্ব তন্নিম্নে স্বচ্ছন্দে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। অশ্বগুলি অশ্বশালায় যেমন সারি বিন্যস্ত হইয়া অবস্থান করে, বৃক্ষ নিম্নেও তেমনই ছিল।

এই সাম্রাজ্যের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর এবং সুন্দররূপে কর্ষিত দেখিলাম। দেশে গোমহিষাদির অভাব নাই, পক্ষীর সংখ্যাও বৃহৎ। এই সকল পশুপক্ষীর কতক বা গৃহপালিত, কতক অরণ্য হইতে সমাহৃত। এ অঞ্চলে প্রচুর ধান্য, কলাই প্রভৃতি যত প্রকার শস্য দেখিলাম, সে সমুদয় আমাদের দেশে জন্মে না। শস্য এত অধিক হয় যে, মনুষ্যের ব্যবহারের জন্য ব্যয় করিয়াও অশ্বাদির খাদ্যের জন্য প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে। এদেশের গোধূম অতি সুন্দর। উহার আবাদও যথেষ্ট আছে।

এই সাম্রাজ্য বহু নগর উপনগর এবং গ্রামে সুশোভিত। সেই সকল নগর উপনগর এবং গ্রাম বহুজনাকীর্ণ। পাছে নগরগুলি শাসনের বাধা ঘটায়, সেই জন্য, নগর-প্রাকার প্রস্তরে গঠন করিবার আদেশ নাই। রাজাদেশে মৃন্ময় প্রাচীরে নগর বেষ্টিত। যে সকল উপনগর সীমান্তে অবস্থিত, সেগুলি শৈল প্রাচীরে পরিবেষ্টিত; কিন্তু নগরসম্বন্ধে রাজার আদেশ একরূপ নহে। কাজেই উপনগরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, নগরে সে সম্ভাবনা নাই।

* * * * *

অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে এই ভয়ে আমি এ সাম্রাজ্যের নগর, উপনগর এবং গ্রামগুলির অবস্থান কথা বর্ণনা করিব না। কেবল ধারোয়ার নগরের কথাই কহিতেছি। এখানে একটি মন্দির আছে, তাহার তুল্য মন্দির আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ‥ ‥ এই গোলাকার মন্দির একটি প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রস্তরের সহিত প্রস্তর জুড়িয়া সিংহদ্বার রচিত। তাহাতে ছায়া লোকেরই বা কি বিচিত্র লীলা পরিস্ফুট রহিয়াছে! মন্দিরগাত্র প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তিশিল্পে সুশোভিত। মূর্ত্তিগুলি মন্দির হইতে এক হস্ত পরিমিত উচ্চ। ইহা তক্ষণ শিল্পের এতই সুন্দর নিদর্শন যে, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদর্শন আর হইতে পারে কিনা সন্দেহ। যে দিক হইতেই দেখ না কেন, মূর্ত্তিগুলির মুখ

অবয়ব প্রভৃতি সুন্দররূপে দেখিতে পাইবে। প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি যেন পত্রাচ্ছাদিত কুঞ্জমধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি রোমক স্থাপত্যের উৎকৃষ্টতর নমুনা। মন্দিরের স্তম্ভগুলি যে পাদপীঠের উপর স্থাপিত, সেগুলি দেখিলে মনে হয় যেন ইটালীতে প্রস্তুত হইয়াছে। স্তম্ভগুলির শিরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের খিলান শোভা পাইতেছে। মন্দিরের বীম বর্গা প্রভৃতি সমস্তই প্রস্তরনির্ম্মিত, কোথাও কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয় নাই। কি বাহিরে, কি ভিতরে কি অঙ্গনে—সর্ব্বস্থানেই সেই এক প্রকারের প্রস্তর। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত জাফ্‌রি। উপনগরের প্রাকার অপেক্ষাও সুদৃঢ় প্রাকারে মন্দিরটি বেষ্টিত হইয়াছে।

মন্দিরের প্রবেশদ্বার তিনটি। দ্বারগুলি বৃহৎ এবং সুন্দর। একটি দ্বার মন্দিরের দ্বারের অভিমুখী। উহার সহিত বারান্দা সংলগ্ন রহিয়াছে। সন্ন্যাসিগণ এখানে অবস্থান করে। মন্দির প্রাকারের মধ্যে লোহিত বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটি দেবালয় আছে। একটি চতুষ্কোণ পাদপীঠের উপর অর্ণবপোতের গুণবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ একটি প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। উহা পাদপীঠের উপর হইতেই অষ্টকোণাকৃতি হইয়া উঠিয়াছে। আমি রোম নগরের "সেণ্টপিটার্সের গম্বুজ" দেখিয়াছি বলিয়া এই স্তম্ভ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম না; কিন্তু ইহা সেই গম্বুজটী অপেক্ষাও অধিক কিংবা তদ্রূপ উচ্চ।

এই মন্দির মধ্যে ইহারা দেবোপাসনা করে। দেবমূর্ত্তি নানা প্রকারের ...ইহারা প্রত্যহই দেবতার ভোগ দেয়, কারণ দেবতারা নাকি ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহার ভোজনকালে রমণীগণ নৃত্য করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই সেবাকারিণী। দেবতার যখন যাহা আবশ্যক, ইহারাই তাহা পরিবেশন করিয়া থাকে।

এই নগর হইতে বিজয়নগর ৫৪ মাইল দূরে। নরসিংহ সাম্রাজ্যের বিজয় নগরই রাজধানী। রাজা এইখানেই থাকেন। দ্বারোয়ার হইতে বিজয়নগরে যাইতে অনেক উপনগর এবং প্রাচীরবেষ্টিত গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়নগর হইতে ৬ মাইল দূরেই একটি পর্ব্বতমালা। তাহারই রন্ধ্রপথে নগরে প্রবেশ করিতে হয়। এই রন্ধ্রকেই দ্বার কহে। এই দ্বার ভিন্ন নগরপ্রবেশের আর অন্য উপায় নাই। পর্ব্বতমালা বৃত্তাকারে রাজধানীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সে বৃত্তের পরিধি ৭২ মাইল। এই বৃহৎ বৃত্তের অভ্যন্তরে যে সকল বৃত্ত আছে তাহারা ক্রমেই আয়তনে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে। এই সকল বৃত্তের মধ্যে যেখানেই সমতল ক্ষেত্র আছে, সেইখানেই সুদৃঢ় প্রাচীর

গাথিয়া এক শৈলবৃত্ত অপর শৈলবৃত্তের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শৈলবৃত্তের দ্বার হইতে যে প্রবেশপথ বহির্গত হইয়াছে কেবল তাহাই মুক্ত রহিয়াছে।

এই সকল দ্বারের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর কাটা রহিয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক লোক লইয়াই দ্বারগুলি রক্ষা করা যায়। শৈলমালা এইরূপে বৃত্তাকারে অগ্রসর হইয়া নগরের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই সকল শৈল-প্রাচীর মধ্যে বহু সমতল ক্ষেত্র আছে। তথায় ধান্যের আবাদ হয় এবং কমলালেবু ও অন্যান্য শাক-শব্জী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শষ্যক্ষেত্রে জল দিবার জন্য বহু জলাশয় বর্ত্তমান আছে। কোথাও বন-জঙ্গল নাই। পর্ব্বতমালা দেখিতে সুন্দর; মনে হয়, কে যেন শ্বেত প্রস্তরের উপর শ্বেত প্রস্তর গ্রথিত করিয়া আশ্চর্য্যরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে—যেন একের সহিত অন্যের সম্পর্ক নাই, সকলগুলিই শূন্যে ঝুলিতেছে। রাজধানী এই শ্বেত প্রস্তরমালার মধ্যস্থলে অবস্থিত।

যাহারা গোয়া হইতে বিজয়নগরে আগমন করে তাহারা যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে, তাহাই প্রথম শৈলপ্রাচীরের রন্ধ্রমুখ। উহা পশ্চিমদিকের সর্ব্বপ্রধান প্রবেশপথ। রাজার আদেশে এই স্থানে একটি নগর নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহা প্রাকারে এবং উচ্চ গম্বুজে সুরক্ষিত। তাহার প্রবেশপথ ও প্রাচীর সুদৃঢ়। অভ্যন্তরে সমতল ছাদবিশিষ্ট অতি সুন্দর হর্ম্ম্যশ্রেণী। বহু বণিক এই স্থানে বাস করে। নগরের জন সংখ্যা অতি বৃহৎ।* রাজার আদেশে ধনী মানী বণিক্‌গণ এই নগরে যাইয়া বাস করে।

নগরে পানীয় জলের অভাব নাই। রাজা এইখানে একটি সুদীর্ঘ জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন।† দুইটি পর্ব্বতের নিকটে এই জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছে

* এই নগরের নাম নাগলাপুর। ইহার বর্ত্তমান নাম হস্‌পেট। পর্ত্তুগীজ নুনিজ বলেন—এই নগরে যে রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ২২৪ ফিট।

† ইহার দৈর্ঘ্য Falcon shot বলিয়া কথিত। Falcon প্রাচীনকালের এক প্রকার কামান। তাহা হইতে গোলা নিক্ষেপ করিলে উহা যতদূর যাইত, এই জলাশয় দৈর্ঘ্যে ততদূর ছিল। নুনিজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এই জলাশয় খনন করিবার জন্য গোয়ার রাজপ্রতিনিধি একজন মিস্ত্রী পাঠাইয়াছিলেন। তাহার নাম জোয়াও-দেল্লা-পন্‌টে। তিনি স্থাপত্যে দক্ষ ছিলেন। আমরা যে পর্ত্তুগীজের কাহিনী লিখিতেছি তিনি এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই। নুনিজের কাহিনী পরে লিখিব।

বলিয়া উভয় পর্ব্বত হইতে জলস্রোত নামিয়া জলাশয় পূর্ণ করে। এতদ্ভিন্ন নলসংযোগেও জলাশয়ে জল আনা হয়। বহির্দ্দেশের শৈলরাজির তলদেশ দিয়া চালিত হইয়া এই নল একটি পরিপূর্ণ জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তথা হইতেই এই দীর্ঘিকায় জল আইসে।

দীর্ঘিকায় বৃহদাকারের তিনটি প্রস্তর স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগাত্রে নানারূপ মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। ইহাদের ঊর্দ্ধে কয়েকটি নল আছে। সেই নলগুলির সহিত স্তম্ভ তিনটি সংযুক্ত। ফলমূলের বাগান এবং ধান্যক্ষেত্র সিক্ত করিবার নিমিত্ত এই সকল নলের সাহায্যে জল লইয়া যাওয়া হয়।

একটি পর্ব্বত ধসাইয়া এই জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা খনন করিতে অনুমান ১৫।২০ সহস্র লোক একত্র কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। আমি এত লোককে কাজ করিতে দেখিয়াছি যে, তাহারা পিপীলিকাসারির ন্যায় ভূভাগ আচ্ছন্ন করিয়া আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। রাজার আদেশে জলাশয় নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া এক একজন সেনাপতির অধীনে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেকেই আপন আপন অংশ সম্পন্ন করিবার জন্য লোকজন লইয়া প্রস্তুত ছিলেন।

দীর্ঘিকা খনন কালে দুই তিনবার ভাঙ্গিয়া পড়ায় রাজা পুরোহিতদিগকে কারণ নির্দ্দেশ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, দেবতা অপ্রসন্ন হইয়াছেন; তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নর, অশ্ব এবং মহিষ বলির প্রয়োজন। তৎক্ষণাৎ রাজার আদেশে ষষ্টিসংখ্যক নর এবং কতকগুলি অশ্ব ও মহিষের রক্তে দেবমন্দির রঞ্জিত হইয়াছিল।*

কোনও প্রিয়তমা পত্নীর নামে রাজা এই নগরীর নামকরণ করিয়াছিলেন। নগরী সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত। নাগরিকগণ ইহার চতুর্দ্দিকে সুবিধা বুঝিয়া

* নুনিজ একটু বিভিন্ন আকারে এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া কহিয়াছেন—রাজার আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদিগকে এই কারণে বলিরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। নুনিজ অশ্ব বধের কোনও উল্লেখ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন পুরোহিতগণ বলিলেন, দেবতার প্রীতির জন্য, পুরুষ কিম্বা রমণী কিম্বা মহিষের রক্ত প্রয়োজন। রমণী বলির প্রসঙ্গ হইতেই অনুমান করা যায় যে নুনিজের বর্ণনা ঠিক নহে। আমরা যাঁহার কাহিনী লিখিতেছি, তিনি মুখবন্ধে কহিয়াছেন—"of the things which I saw and contrived to learn concerning the kingdom of Nursinga etc."—সুতরাং ইনি প্রত্যক্ষদর্শী।

স্বতন্ত্র উদ্যান রচনা করিয়াছে। নগরে একটি দেবমন্দির আছে। মন্দিরে অনেক শ্রীমূর্ত্তি বর্ত্তমান। মন্দিরটি সুগঠিত। মন্দিরে কতকগুলি কূপ আছে। সেগুলিও সুনির্ম্মিত। নগরের গৃহগুলি একতল। ছাদ সমতল। প্রতিগৃহেরই গম্বজ আছে। আমাদের দেশের ন্যায় এ নগরের গৃহগুলি দ্বিতল ত্রিতল নহে। প্রতি গৃহেই স্তম্ভাবলী বিরাজ করিতেছে। চতুর্দ্দিকই মুক্ত। ভিতরে এবং বাহিরে বারান্দা নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় লোকজন বাস করিতে পারে। গৃহগুলি দেখিতে যেন রাজ প্রাসাদতুল্য। এই সকল প্রাসাদ চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাকারাভ্যন্তরে গৃহের পর গৃহের সারি।

রাজপ্রাসাদের ৬টি প্রবেশদ্বার। অনেকগুলি রক্ষী দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। সৈনাধ্যক্ষগণ এবং রাজসন্নিধানে যাহাদের প্রয়োজন আছে তাহারা ভিন্ন রক্ষিগণ আর কাহাকেও রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই ৬টি দ্বারের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দরবারগৃহ আছে। তাহার চতুর্দ্দিকেই বারান্দা। সেনাপতিগণ এবং রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ রাজদর্শনে আসিয়া এইস্থানে অপেক্ষা করেন।

রাজা * দীর্ঘও নহেন খর্ব্বও নহেন তিনি মধ্যমাকৃতি। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল, গঠন সৌষ্ঠবসম্পন্ন। তাঁহাকে বরং স্থূলকায়ই বলা যায়; তিনি কৃশ নহেন; তাঁহার বদনমণ্ডলে বসন্তের দাগ আছে। সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করে। তিনি সর্ব্বতোভাবে রাজনাম ধারণের উপযুক্ত—সর্ব্বদাই প্রীতিপ্রফুল্ল এবং অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। বৈদেশিকদিগকে তিনি সম্মান করেন এবং তাহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করেন। তাঁহাদিগের অবস্থা যেরূপই কেন হউক না, সাক্ষাৎ হইলেই তিনি সকলের সকল তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইনি একজন শক্তিশালী ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা; তবে কখনও কখনও হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। ইঁহার নাম কৃষ্ণরায় মহাশাহ মহারাজ, ভারতের রাজপরমেশ্বর—ইনি সমুদ্রের অধিপতি। এই রাজার সৈন্য সংখ্যা এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার সকল নৃপতি অপেক্ষা অধিক বলিয়া তাঁহার এই নাম। তিনি সংসাহসী ও বীর এবং সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ; এত বিভব থাকিতেও মনে হয় তাঁহার যেন কিছুই নাই। তাঁহার মত নরপতির সেনা ও সাম্রাজ্য আরও অধিক হইলে ভাল হইত।

ইনি উড়িষ্যার রাজার সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন। ইঁহার

---

* রাজা কৃষ্ণদেব রায়। শাসন কাল—১৫০৯-১৫৩০

বিজয়ী সৈন্য উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়া অনেক নগর ও উপনগর অধিকার এবং ধ্বংস করিয়াছিল। উড়িষ্যার বহুসৈন্য এবং রণহস্তী দলিত করিয়া তিনি উড়িষ্যার রাজকুমারকে বন্দী করিয়াছিলেন। বন্দীকৃত রাজকুমার বিজয়নগরে আনীত হইয়াছিলেন। সেইখানেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। শান্তিপ্রয়াসী হইয়া উড়িষ্যার নরপতি তাহার সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং আপন কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণরায়ের দ্বাদশটি পত্নী। তন্মধ্যে তিনজন প্রধানা মহিষী। তাঁহাদের পুত্রগণই সিংহাসন লাভ করিবেন। সকল রাণীরই পুত্র থাকিলে এইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু যদি একটি মাত্রই রাজকুমার জীবিত থাকেন তাহা হইলে তিনি যে রাণীরই সন্তান হউন না কেন, সিংহাসন তাঁহার। উড়িষ্যার রাজকুমারী একজন প্রধানা মহিষী; অপরগুলির মধ্যে কয়েকজন শ্রীরঙ্গপত্তনের রাজার কুমারী। শ্রীরঙ্গপত্তন রাজ বিজয়নগর রাজ্যের অধীনে একজন সামন্ত। আর একজন রাণী রাজার যৌবনকালে তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হইয়াছিলেন। রাজা সেই সময়েই প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, সিংহাসন লাভ করিলে তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিবেন। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ রাজা এই নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার নামেই ইহার নামকরণ করিয়াছেন।

প্রত্যেক রাজমহিষীর স্বতন্ত্র আবাসগৃহ, সখী, দাসী, পরিচারিকা প্রভৃতি আছে। খোজা রক্ষী ভিন্ন তথায় অন্য কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। রাজার বিশেষ অনুগ্রহে সম্ভ্রান্ত কয়েকজন বৃদ্ধ ভিন্ন আর কোন পুরুষই রাণীদিগকে দেখিতে পায় না।

রাজমহিষীগণ চতুর্দ্দিকে আচ্ছাদিত শিবিকায় নগরে বাহির হন। তখন কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। তিন চারি শত খোজা প্রহরী তাঁহাদের সঙ্গে থাকে। তখন রাজপথে অন্যান্য লোক দূরে অবস্থান করে।

শুনিতে পাই প্রত্যেক রাণীরই বহু ধনসম্পত্তি এবং নানা রত্নাভরণ ও প্রচুর মতি মুক্তা হীরক প্রভৃতি আছে। আরও শুনিতে পাই যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের ৬ জন করিয়া যুবতী সখী আছে। তাহারা সকলেই বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে—নানা মণি মুক্তা হীরকে সজ্জিতা থাকে। ইঁহাদিগকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। সে কাহিনী পরে বলিতেছি। এই সখীবৃন্দ ভিন্ন রাজান্তঃপুরে দ্বাদশ সহস্র রমণী বাস করে। জানিও যে,

রমণীরা অসি চালনা করে, চর্ম্মধারণ করে, কেহবা মল্লযুদ্ধও করিতে পারে। কেহ কেহ তুরী, ভেরী, বংশী এবং অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র বাদন করিয়া থাকে। আমাদের দেশে সে সকল বাদ্য যন্ত্র নাই। রাজার যেমন নানা গৃহকর্ম্মের জন্য নানা কর্ম্মচারী আছে, রাণীদেরও তেমনই দূতী, বস্ত্রধৌতকারিণী প্রভৃতি নানা নারী-কর্ম্মচারী আছে। পাছে পরস্পরের মধ্যে কলহ হয় সেইজন্য তিন জন প্রধানা মহিষীর জন্যই সমান বন্দোবস্ত আছে। তাঁহারা স্বতন্ত্র ভাবে বাস করেন, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সখীর ন্যায় সম্প্রীতি বর্ত্তমান। যে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে এতগুলি নারী বাস করে, সে স্থান যে কত বড় তথায় যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ কত পথ আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

রাজা প্রাসাদের স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে বাস করেন। যখন যে পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হয় তখন তিনি খোজা প্রহরীর দ্বারা তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। খোজা রাণীর নিকটে গমন করে না, প্রতিহারিণীর দ্বারায় সংবাদ দেয় যে, রাজদূত আসিয়াছে। সংবাদ পাইয়াই রাণীর কোন সখী দূতের নিকট আসিয়া রাজাদেশ জানিয়া যায়। হয় রাণীই তখন রাজার নিকট গমন করেন, অথবা রাজাই রাণীর কাছে আসেন। সকলের অজ্ঞাতে তখন রাজা ও রাণী ইচ্ছামত কালাতিপাত করেন। এই সকল খোজা প্রহরীদিগের মধ্যে কেহ কেহ রাজার অত্যন্ত প্রিয়। তাহারা তাঁহার শয়নকক্ষেই নিদ্রা যায়। ইহাদিগের বেতন খুব বেশী।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজা প্রত্যহ অর্দ্ধ পাইন্ট জিঞ্জেলি তৈল (?) পান করেন এবং উহা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়া ক্ষুদ্র একখানি বস্ত্রে কটিদেশ আচ্ছাদনপূর্ব্বক একটি গদা লইয়া ব্যায়াম করেন। তার পর শরীর ঘর্ম্মাক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অসি চালনা করিতে থাকেন। এইরূপে পরিশ্রম করিবার পর তিনি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত মুক্ত প্রান্তরে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করেন।

সূর্য্যোদয় হইলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তিনি স্নান করিতে গমন করেন। একজন পুরোহিত তাঁহাকে স্নান করাইয়া থাকেন। রাজা ইঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। ইনি রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী। স্নানান্তে রাজা প্রাসাদসংলগ্ন মন্দির মধ্যে পূজা করিতে গমন করেন।

পূজা সমাপ্ত হইলে তিনি গৃহান্তরে আগমন করেন। উহা প্রাচীরহীন খিলানের ঘরের ন্যায় বহু স্তম্ভের উপর খিলান তুলিয়া নির্ম্মিত।

স্তম্ভগুলি বস্ত্রাচ্ছাদিত। কক্ষ প্রাচীর সুচারুরূপে চিত্রিত। উভয় পার্শ্বে দুইটি পরমা সুন্দরী নারী মূর্ত্তি অবস্থান করিতেছে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা এবং অন্য রাজামাত্যদিগের সহিত এই গৃহেই রাজা রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। রাজানুগৃহীতগণ এই স্থানে তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন। রাজমন্ত্রী তারেসিরা (শলুভটিম্ম বা টিম্মরাজা) রাজার বিশেষ অনুগ্রহভাজন। তিনিই রাজপ্রাসাদের কর্ত্তা। অন্যান্য সামন্ত রাজগণ ইঁহাকেই রাজার ন্যায় সম্মান করেন।

ইঁহাদিগের সহিত আলাপ আপ্যায়নের পর, রাজদর্শনার্থী সামন্তগণ এবং সেনাপতিকুল আহূত হন। রাজসমীপে উপস্থিত হইয়াই তাঁহারা অভিবাদন করেন এবং রাজার নিকট হইতে দূরে কক্ষপ্রাচীরের সন্নিকটে অবস্থান করেন। তখন তাঁহারা পরস্পরের সহিত গল্প করেন না বা পান খান না। তাঁহারা তখন অঙ্গরাখার অভ্যন্তরে করদ্বয় আবৃত করিয়া ভূমিলগ্নদৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। ইঁহাদিগকে রাজার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে অন্য ব্যক্তি সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ইঁহারা তখন ভূমি হইতে চক্ষু তুলিয়া প্রশ্নকারীকে উত্তর প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় স্বস্থানে যাইয়া অবস্থান করেন। রাজার আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে এইঅবস্থায় রাজসভায় থাকিতে হয়। আদেশ পাইলেই পুনরায় অভিবাদন করিয়া দর্শনার্থীরা প্রস্থান করেন। অভিবাদন করাই সম্মান প্রদর্শনের প্রধান উপায়। যুক্তকর যথাসম্ভব ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিলেই অভিবাদন করা হয়। ইঁহারা প্রত্যহই রাজাকে অভিবাদন করিতে আগমন করিয়া থাকেন।

আমরা যখন প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলাম রাজা তখন এই নূতন নগরেই ছিলেন। আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্রিষ্টোভাও দা ফিগেইরেদো রাজদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। আমরা সকলে সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া গিয়াছিলাম। রাজা তাঁহার সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতি এতই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মনে হইয়াছিল যেন, রাজা তাঁহার কোন আপন জনকেই আপ্যায়িত করিতেছেন। ক্রিষ্টোভাও-এর সহিত যাহারা গমন করিয়াছিল তাহাদের প্রতিও রাজা বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার এত নিকটে গিয়াছিলাম যে তিনি আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিলেন।

ক্রিষ্টোভাও তখন রাজাকে কাপ্তান-মেজরের পত্র ও উপঢৌকনাদি প্রদান করিলেন। দ্রব্যাদি দেখিয়া রাজা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। অর্গ্যান বাদ্য-

যন্ত্র দেখিয়া তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল। স্বর্ণ-নির্ম্মিত পুষ্পরাশিখচিত শ্বেত বস্ত্রে রাজা শোভা পাইতেছিলেন। বহুমূল্য হীরকহার তাঁহার কণ্ঠে দুলিতেছিল। গ্যালিসিয়ান্ মুকুটের ন্যায় স্বর্ণখচিত একটি উৎকৃষ্ট রেশম-মুকুট তিনি শিরে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরণযুগল অনাবৃত ছিল। রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইলেই নগ্ন চরণে যাইতে হয়। এ দেশের অধিকাংশ অথবা সকল লোকেই নগ্নপদে থাকে। এ দেশের পাদুকার অগ্রভাগ সেকালের পাদুকার ন্যায় সরু; কোন কোন পাদুকা আবার এরূপ যে শুধু তলা ভিন্ন আর কিছুই নাই। উপরিভাগে কয়েকটি ফিতা আছে। তাহাদের দ্বারাই পাদুকা চরণসংলগ্ন করা হয়। পুরাকালে রোমকগণ যেরূপ পাদুকা ব্যবহার করিত এগুলিও সেইরূপ। ইটালী হইতে যে সকল প্রাচীন কাগজ-পত্র আইসে তাহাতে অনেক মূর্ত্তির চরণে এইরূপ পাদুকা দেখা যায়। রাজদর্শন শেষ হইলে রাজা ফ্রিষ্টোভাওকে একটি স্বর্ণভূষিত কাবায়া (পরিচ্ছদ) এবং শিরোভূষণ প্রদান করিয়াছিলেন। এই শিরোভূষণ রাজার নিজের শিরোভূষণের ন্যায় ছিল। প্রত্যেক পর্ত্তুগীজকেই রাজা এক একখানি অতি সুন্দর কারুকার্য্যসমন্বিত স্বর্ণ-খচিত বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাই এদেশের রীতি। স্নেহ ও সৌখ্যের নিদর্শন স্বরূপ এইরূপ উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

সমস্যা ও সমাধান

ভাব্‌তাম আগে কাব্য লিখা শক্ত নয়ত মোটে,
কাব্যকলার উপযোগী দ্রব্য যদি জোটে।
চাঁদের আলো, হেনার গন্ধ, দখিণ হাওয়া মৃদু,
পদ্মপারা মুখটি প্রিয়ার রইবে ফুটে' শুধু;
বইবে জোয়ার হৃদয় গাঙে, কলম ছুট্‌বে জোরে
রং বিরঙে কবির খাতা ত্বরায় উঠ্‌বে ভ'রে।

উপকরণ জুট্‌লো যদি সময় হয়না আর,
সাত সাগরের ঢেউ লেগে যে মনটি তোলপাড় !
কভু সোহাগ, মানের পালা, কখন্ বিরহ ;
রঙিন্ নেশায় মত্ত, কভু দুঃখ দুঃসহ !
সাধ্য কি যে ক্ষণেক তরে চিত্ত করে স্থির
কল্পনাকে জমিয়ে নিয়ে করব কাব্য-ক্ষীর ।

৩

পার্শ্বে বসি' মুচ্‌কি হাসি' নীরব দৃষ্টি কর
প্রিয়া যখন আবেগভরে ডাক্‌বে "প্রাণেশ্বর,"
স্বর্গ যেন বাহিয়া উঠে ধূলির ধরার'পরে,
ইন্দ্রধনুর বর্ণবিভব আকাশ বেয়ে ঝরে !
ভাবসাগরে তলিয়ে গিয়ে আপ্‌না হারিয়ে সুখে,
— কাব্য লিখা যায় কি তখন, তোমরাই দেখ বুঝে !

৪

'বাঁকিয়ে আনন' আবার যখন প্রিয়া বসেন মানে,
একমুখে গম্ভীর রোষে বচনের বাণ হানে,
কাঁদিয়া বলে, "সোয়াস্তি তব আমার মরণ হ'লে,"
—যদিও জানে, মিথ্যা অমন নাই ধরণীতলে—
মানের ভয়ে পায়ের'পরে ছট্‌ফটিয়ে মরি,
কবিতা তখন কেমনে লিখি, দেখনা বিচার করি' ।

মাসের কাবারে :—গিন্নি এসে বলেন, "ওগো কবি,
দিয়েছিলে যা খরচ পত্তর ফুরিয়ে গেছে সবি ।"
কবির মাথায় বজ্রাঘাত, চক্ষে সর্ষে ফুল ;
"তিরিশ টঙ্কা চাই যে আরো,"—পায়না ভেবে কূল ।
কাব্য-জগৎ ঝাপ্‌সে আসে, স্বপ্ন যে যায় টুটে !—
তুহিন পাতে কোমল কুঁড়ি সাধ্য কি যে ফুটে !

৬

বুঝিবা যদি একেলা থাকি' সুবিধা হবে খুব,
কাব্য-গাঙ্গে যখন খুসি মারিতে পারি ডুব।
এই না ভেবে, যুক্তি করি' অশ্রুজলে ভিজে'
প্রিয়ায় দিনু ঘরে ঠেলে, প্রবাসে গেনু নিজে।
হায়রে মূর্খ অল্পদর্শী, বুদ্ধি কি তোর বল্,
সকল কাব্যের গোড়া কেটে আগায় ঢালিস্ জল!

৭

মেজাজ্‌টা যার বিগড়ে গেছে যুগ্মবাসের ফলে,
একলা থাকা পোষায় কি তার লক্ষ্মীছাড়ার দলে?
জগৎ ঠেকে বেবাক্ ফাঁকা, শূন্য দিক্ দশই,
শয্যা যেন কণ্টকিত, তপ্ত যেন শশী!
ইচ্ছা করে প্রাণটা জুড়াই গেঁথে মিলের রাশে
আপ্‌নি গরমিল—মিলের বাঁধন কোথা হ'তে আসে?

৮

ছাড়তে হ'ল কাজে কাজেই কবিতার চর্চ্চা।
ক্রমে, ছেলেপিলের আবির্ভাবে বেড়েও গেল খর্চ্চা;
সংসারেরি গণ্ডগোলে মুণ্ড গেল ঘুরে'
দণ্ডবিধির কূটতর্ক চব্বিশ ঘণ্টা জুড়ে'।
আহার করি, শয়ন করি আপিস করি রোজ;
—বিসর্জ্জিয়ে কাব্যচিন্তা রূপচাঁদেরি খোঁজ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

স্বগত

নূতন বৎসরে পুরাণ খাতার বুকে আঁচড় কেটে, কোনও নূতন কথা লিখ্‌তে পারব, এ কথা যদি আমি আশা করি, তাহলে নিরাশ হতে হবে।

নূতন আমায় মোটেই টানছে না, পুরাণর বাঁধনে আমি বাঁধা আছি, ছাড়াতেও চাইনে। স্বপ্ন, আমার স্মৃতি পুরাণকে নিয়েই, গেল বৎসরে যা আমার হারিয়ে গেল, তা কি সত্যই হারাল, তা কি চিরদিনের জন্য অন্তরে

সঞ্চিত রইল না? হারিয়ে যা পেলাম, তারি আনন্দ আমায় বিচ্ছেদের মধ্যেও সান্ত্বনা দিতেছে। আমি যে সান্নিধ্য নিরন্তর অনুভব করছি, যার আকর্ষণ সন্ধ্যায় আমায় আমার নির্জ্জন ঘরের দিকে টেনে আনে, অন্ধকারে নিস্তব্ধতার মধ্যে নিদ্রাহীন রাত্রিতে যে স্নেহস্পর্শ আমায় আচ্ছন্ন করে রাখে, সে যে সব চেয়ে সত্য, কেননা সে প্রমাণ নিরপেক্ষ, আমি তাকে সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়ে অনুভব করি। চোখে যা দেখি, হাত দিয়ে যা স্পর্শ করি তার মধ্যে অসম্পূর্ণতার অভাব থেকে যায়, কেন না দৃষ্টি আর স্পর্শ শক্তি দুইই সীমাবদ্ধ, মন দিয়ে যা পাই, তাই পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া। তবু এই শরীর ধারণ করে আছি বলেই শুধু মনের পাওয়ায় মন মানে না; চক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন, শরীর দিয়ে স্পর্শ, স্পর্শ অনুভূতির জন্য নিরন্তর একটি ব্যাকুলতা জেগে থাকে। সম্পূর্ণ পেয়েছি জেনেও অবিচ্ছেদ্য সঙ্গ অনুভব করেও, দেহবৃত্তি দৃষ্টি ও স্পর্শের সার্থকতা চায়!

হে বন্ধু, হে আমার সহৃদয়, তুমি অন্তরে আমার আশ্রয় নিয়েছ জানি, তবু একবার দৃষ্টির ব্যাকুলতাকে চরিতার্থ কর, একবার শ্রবণের পিপাসাকে পরিতৃপ্ত কর, স্নেহ-স্পর্শ তাও যদি দুর্লভ হয়, তবে চোখে একবার দৃষ্টি দাও, শ্রবণকে একবার প্রিয়সম্ভাষণে মুগ্ধ কর। সারাদিনরাত বীণাতন্ত্রীতে সঙ্গীতের মত আমি তোমায় এই দেহে অনুভব করি, দৃষ্টিতে আলোকের মত তুমি অপ্রত্যক্ষ হয়েও চিরদিন রয়েছ। এক মুহূর্ত্তও যে আমি তোমায় ভুলে থাকতে পারিনি, তোমার স্মৃতি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মত সহজভাবে আমার জীবনকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছে। আমি শুধু জানতে উৎসুক, তুমিও সেটা অনুভব কর কি না—তুমি আমায় সে কথা বুঝিয়ে দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে—আমি তন্ময় হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকলেই আকাঙ্ক্ষার সাফল্য অর্জ্জন করব।

আমাকে জানতে চাও বন্ধু, কেমন করে জানবে, অত দূর হতে? আমার পরিচয় আমি কেমন করে তোমায় জানাব? ভাষায় কেমন করে প্রকাশ করব মনে যা শুধু আভাসেই আছে। আত্মপ্রকাশ সে ত আপনার অলক্ষ্যে, "আমি"র অজ্ঞাতেই হয়ে থাকে। যাকে জানতে চাই, তার হাসি, তার কথা কহিবার ভঙ্গী, তার চোখের দৃষ্টি, তার বিবেচনারহিত তুচ্ছ-কথা, তার সহজ সরল ভাব, তাকে অকস্মাৎ কিম্বা সততই প্রচার করতে থাকে। মহাজ্ঞানী জ্যোতির্ব্বিদও দূরবীক্ষণের দ্বারা কেবল মাত্র সুদূর

নক্ষত্রের আকারটুকুই ধরতে পারেন, প্রাণের খবর কিছুই পান না। জানতে হলে, আয়ত্ত করতে হলে—নিরীক্ষণই প্রকৃষ্ট উপায়।

অপরে বানিয়ে বানিয়ে যা বলে, কিংবা জোড়াতাড়া দিয়ে যা গড়ে তোলে, তার চেয়ে নিজে যা আবিষ্কার করা যায় তাইত অধিক প্রীতি-কর ও তৃপ্তিজনক। কল কারখানার চেয়ে রহস্যময়ী প্রকৃতি, জীবন চঞ্চল মানুষের মন, আলোকদীপ্ত আত্মা কি অধিক জানবার মত নয়। আমি নিজের সম্বন্ধে যা বলবার চেষ্টা করব, তার মধ্যে ঐ চেষ্টার জন্যই একটা কৃত্রিমতা থাকবেই, তাই ভয় হয়, যে নিতান্তই মাটী দিয়ে গড়া, এই পৃথিবীর ধূলির সঙ্গিনী, তাকে দেবীপ্রতিমা বলে বা পরিচয় দি'—শিব দেখাতে শব যদি ধরা পড়ে তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

নিজেকে অপরের কাছে ব্যক্ত করব কেমন করে? আমি কি আপনাকে আপনি সম্পূর্ণ জানি? আমি শুধু কি অখণ্ড এক? মনের মধ্যে দেখতে পাই শুধু একটি "আমি" নয়—অনেকগুলি, মনের এ ঋতুসংহার করতে পারি কি? তাদের প্রত্যেক কালকে ফুটিয়ে তুলতে, সম্পূর্ণ করবার জন্যে যে আলো, যে বাতাস আবশ্যক, তা আমার আয়ত্তে কোথায়? তবু এক জনের যা' পরিচয় পেয়েছি তাদের কথা বলতে পারি—আমার মনের মধ্যে এখনও একটি বড় অবোধ পাগল চঞ্চল ছেলেমানুষ বসবাস করছে। কল্পনাকে সে একেবারে সত্য বলেই বিশ্বাস করে—সে কল্পনায় যা ভাঙে গড়ে, সেই তার বাস্তব জগৎ; যেতে যেতে কোন্ গোলোক' ধাঁধায় গিয়ে পড়বে, কোন্ আকাশতর্গ তার মাথায় ভেঙে পড়ে তাকে চেপে মারবে, অদূর-দৃষ্টি সেই শিশু তার কিছুই ধারণা করতে পারে না। ভাবে খেলায় যে ঘর পেতেছে, জীবন বুঝি তাই, বুঝি কেন, নিশ্চয়ই তাই। তার পর যখন গোলকধাঁধার পথ হারায়, সন্ধ্যার 'বাতি' জ্বালা, তার চিরদিনের আশ্রয় নিরালা ঘরখানি আর দেখতে পায় না, যখন আকাশকুসুম শুকিয়ে ঝরে যায়, আকাশতর্গ খসে পড়ে' চেপে মারতে চায়, তখন সে হাহাকার করে কেঁদে ওঠে, হাত বাড়িয়ে ডাকে ওগো তুমি বাঁচাও। মনের মধ্যে আবার একজন বড় বিজ্ঞ আছে, সে গম্ভীর স্থির হয়েই আছে, নিষেধ করা পর্য্যন্ত সে নিবিড় জ্ঞানী, আত্ম-অবমাননা মনে করে! তাই যখন অবোধ শিশু মরুদ্বীপভ্রমে মরীচিকার দিকে ছুটে চলে, অন্ধকূপে পদার্পণ করে, আবর্ত্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের অন্ধকার নিরাশ্রয়ে

প্রবেশ করে, তখন সে কিছুই বলে না, মানাও করে না উৎসাহও দেয়না। তাই বলে' সে উদাসীন নয়, বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে, উদ্ধারের পথ যখন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কট হয়ে ওঠে, তখন রক্ষা সেই করে, নিরাপদ সেই আনে। অথচ উপদেশ বাক্যের অপব্যয় করে না। ঠেকে শেখা যে সব-চেয়ে সেরা শেখা, মৌন থেকেও সেই চিরন্তন জ্ঞানই প্রচার করে। এ ছাড়া আরও কত জন আছে, কেউ কবি, কেউ চিত্রকর, কেউ বা সঙ্গীতানুরাগী, কেউ সাধক, কেউ প্রেমমুগ্ধ ভক্ত। কেউ বা লোভী, কেউ বা একটু কপটতাপ্রিয়, অহংজ্ঞানে ভরপুর; এ ক্ষণিক "আমি"গুলির সমাবেশে যে সমগ্র "আমি" গড়ে উঠেছে, তাকে প্রকাশ করা কি আমার সাধ্য, বিশেষতঃ ভাষায়! বহুদিনের একত্র বসবাসের ফলে অলক্ষ্যে যে অভি-ব্যক্তি হয়, সেই যথার্থ জানা, আর জানা যায় মহত্ত্বের মধ্যে ভালবাসার আলোতে। যে চোখে যে আমায় দেখবে, সে হয়ত জানবে! আমি কিন্তু যে কেমন করে আপনাকে ফুটিয়ে প্রত্যক্ষ করে তুলব, সে যাদুমন্ত্র ত আমার জানা নাই সে মায়াতুলিকাই বা আমার আয়ত্ত কই আছে!

মানসী

অচলালয়

তোমায় নিয়ে বাধব যে ঘর

ওগো আমার মানিক, তার সেই ঘর,
গিরির বুকে, এই বিজনে!
যেথায় ধরা ধরতে গিয়ে
উথ্‌লে ওঠে উল্লসিয়ে,
অন্তবিহীন হাত বাড়িয়ে
চায় যে তোমায় পরাণপণে,
তোমায় নিয়ে বাঁধ্‌তে বাসা
জাগ্‌ল আশা সেই গোপনে

আকাশভরা কেবল তোমার
মহিমার ওই দীপ্তি জ্বলে;
পুলকভরা বিজয়-গানে যেথায়
নির্ঝর উছ্‌লে চলে;

পাখীর মুখে ক্বচিত্ যেথায়
কান্না বুকে বাজিয়ে দে যায় ;
হাল্কা হাওয়া নিমেষ নেশায়
কেবল দু'চার খবর বলে,
শূন্য যেথায় পূর্ণ হ'য়ে
স্বরূপ রূপেই মর্ম্মে ফলে !

আনন্দের এই বিরাট্ আধার
নীল নভসেই আঁকড়ে ধরে ;
মেঘের মোহন ওই মেখলা
দিগঙ্গনা যেথায় পরে ;
কিরণ বাসে জড়িয়ে দেহ
হাসে যেথায় মায়ার স্নেহ ;
ডালিম-তলায় বাঁধতে গেহ
এই এ কোণে' এ অন্তরে—
সাধ জেগেছে আজ গো আমার
সান্ত করি অনন্তরে।

তৃণের যেমন নিবিড় বাঁধন
এই এ মহান অচল সনে,
তেমনি তোমার চরণ-তলায়
বাঁধব আমায় কুটীর-কোণে।
মিটিয়ে নিয়ে দায়ের ভোগে,
চুকিয়ে দিয়ে মোহের রোগে
মিল্‌ব আমি অচল যোগে
তেমনি করেই আপন মনে ;
তৃণের যেমন অটুট বাঁধন
গগনভেদী ভূধর সনে !

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

"লেড়্‌কী মর গেয়ী"

আশী বৎসর পূর্ব্বে মুরসিদাবাদ রাজধানীর এক ক্ষুদ্র প্রান্তে, ততোধিক ক্ষুদ্র এক দরিদ্র মুসলমান একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। তাহার নাম ছিল মোবারক আলি মিঞা। মোবারক অতি কষ্টে দিনপাত করিত। সে দরজীর কাজ করিত। বড়লোক আমীর ওমরাহদিগের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না, আর সে দরজীর কাযেও বিশেষ পারদর্শী ছিল না; সুতরাং সে সাধারণ মুসলমানের পিরিহান, পায়জামা প্রভৃতি সামান্য কায্য করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতেই কোন প্রকারে তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সংসারে ছিল তাহার এক ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী ও একটি কন্যা। কন্যাটি আমীর ওমরাহদিগের ঘরের পথ ভুলিয়া এই দরিদ্র দরজীর কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, পাড়ার সকলেই বলিত যে মেয়ে নয় যেন একটা পরী। নসিবনের আকর্ণবিস্তৃত চক্ষুদ্বয়ের শোভা অপার্থিব ছিল, সে চক্ষুর দিকে চাহিলে লোকে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না।

নসিবনের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়া তাহার মাতা পরলোকে চলিয়া গেলেন; মোবারক আলি মিঞা একেবারে অকূল পাথারে পড়িল। সে সাধারণ মুসলমানগণের মত বিলাসী ছিল না; সকলেই তাহাকে বিনীত, পরদুঃখকাতর, ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া জানিত। সে তাহার সেই ক্ষুদ্র কুটীরের দাবায় বসিয়া পিরিহান সেলাই করিত, আর মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখাইত; কত রাজা বাদসার গল্প বলিত, কত সাধু ফকিরের জীবন কথা বলিত। হজরতের পবিত্র জীবন-চরিত, পীর পয়গম্বরদিগের অতুলনীয় আত্মোৎসর্গের বিবরণ সে নসিবনকে বলিত; নমাজের সময় সে নসিবনকে সঙ্গে লইয়া বসিত, প্রতিদিন যথানিয়মে পিতা ও পুত্রী পবিত্র কোরাণ সরীফের স্বর্গীয় উপদেশাবলি পাঠ করিত। মেয়ে নসিবন কিন্তু ধর্ম্মকথা ও উপদেশ অপেক্ষা রাজা, বাদসাহ, আমীর, ওমরাহদিগের ধন, দৌলত, কোঠা, বালাখানা, আমোদ, আনন্দ, বিলাসিতার কথা শুনিতেই ভাল বাসিত; আর তাহার বালিকা-প্রাণের মধ্যে ঐ সকল পার্থিব সুখ সম্ভোগের জন্য একটা লালসা বাড়িয়া উঠিত। পিতার ক্ষুদ্র কুটীরের ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া সে নবাবজাদীর দুগ্ধফেননিভ শয্যা, আতর গুলাবের গন্ধ, বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিহিতা বিলাস-বিভ্রমময়ী বেগমদিগের সুখের ও আরামের কথা চিন্তা করিত;

কল্পনায় সে সেই সকল আরাম সম্ভোগ করিত। কুটীরের দাবায় বসিয়া সে সম্মুখস্থিত বন জঙ্গলপূর্ণ স্থানকে নবাবের প্রমোদোদ্যানে পরিণত করিয়া এক দৃষ্টিতে তাহাই দেখিত; সেই কল্পনার রাজ্যে ডুবিয়া যাইত। একটি দরিদ্র দরজীর চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তনয়ার এ সকল সাধ কেন হইত, ছেঁড়া চটে শয়ন করিয়া সে লাখ টাকার স্বপন কেন দেখিত, যাহার গৃহে কোন দিন পাঁচটি টাকা থাকিত না, সে আসরফী মোহরের গণনা কেন করিত, তাহা কেমন করিয়া বলিব? হয় ত গৃহের ভাঙ্গা দর্পণখানিতে সে যখন তাহার অতুলনীয় রূপ দেখিত, তখন তাহার মনে এই সকল কথা জাগিয়া উঠিত; সে হয় ত তাহার সেই সুন্দর মোহিনী রূপ দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইত, তাহার প্রায়োদ্ভিন্ন যৌবন-শোভা তাহাকে আর এক জগতের সংবাদ দিত, সেখানে মাটীর সান্‌কি, টিনের বদনা, মোটা আউস ধানের চাউল, পাকা বেগুনের কাবাব কিছুরই অস্তিত্ব থাকিত না; সেখানে সোনার থালায় পোলাও, কালিয়া থাকিত, সেখানে বাঁদীরা চামর ব্যজন করিত। গরীবের পরমাসুন্দরী মেয়ের মাথার মধ্যে এই সকল আজগুবি খেয়াল কি জানি কেমন করিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছিল! বাস্তব জীবনে যে সমস্ত দ্রব্য কোন দিন তাহার চর্ম্মচক্ষের গোচর হয় নাই, কল্পনায় সে সেই সমস্ত লইয়া এক নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

মেয়ের ভাবগতিক দেখিয়া মোবারক মিঞা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। মেয়ের বিবাহ দিবার কথা যখন তাহার মনে হইত, তখন সে ভাবিয়া কূল কিনারা পাইত না। এমন পরীর মত সুন্দরী, এমন শিক্ষিতা কন্যাকে সে যাহার তাহার হাতে কেমন করিয়া দিবে? আর নসিবন চলিয়া গেলে সে কাহার মুখ চাহিয়া ঘরে থাকিবে;—সেই মেয়েই যে এখন তাহার যথাসর্ব্বস্ব। সেই মেয়েকে সে ত ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। এক এক সময় সে মনে করিত, একটি শিক্ষিত সচ্চরিত্র ছেলে আনিয়া তাহাকে ঘরজামাই করিবে। কিন্তু তাহার মত অবস্থাপন্ন মুসলমানের গৃহে শিক্ষিত সচ্চরিত্র ছেলে কোথায় মিলিবে? মেয়ের বয়স যে ক্রমেই বাড়িতেছে, তাহার রূপ যে উথলিয়া উঠিতেছে, ইহা দেখিয়াও মোবারক মিঞা তাহার বিবাহের কোনই ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিল না। দুই চারিটা সম্বন্ধ যে আসে নাই, তাহা নহে; কিন্তু সে রকম ছেলের হাতে সে নসিবনকে কিছুতেই দিতে চাহিল না। তাহারা নসিবনের রূপ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা নসিবনকে সহধর্ম্মিণী না করিয়া বিলাস-সঙ্গিনী করিতে প্রয়াসী। সে সকল ছেলের হাতে সে প্রাণ থাকিতে নসিবনকে

সমর্পণ করিতে পারিবে না। নসিবনকে দেখিয়া পাড়ার কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল যুবক তাহাকে কু-পথে লইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। তাহারা পথে ঘাটে অনেক সময় তাহাকে নানা প্রলোভন দেখাইত; নসিবন ইহাদের অবস্থা জানিত, ইহাদের প্রকৃতিও জানিত। সে যে স্বর্গের কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে বিলাসিতার যে উচ্চ আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছিল, এ সকল যুবক তাহা কোথায় পাইবে? নসিবন কাহারও কোন প্রস্তাবে কর্ণপাত করিত না। মোবারক মিঞাও মেয়ের বিবাহ দিবার উপযুক্ত বর না পাইয়া আল্লার উপর নির্ভর করিয়া কিছুদিন সবুর করিবারই সঙ্কল্প করিয়াছিল।

নসিবনের পিতা সামান্য দরজী, তাহার দাসদাসী রাখিবার সঙ্গতি ছিল না; নসিবনই মায়ের মৃত্যুর পর হইতে ঘর গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ করিত; আর অবসর সময়ে আসমানে দৌলতখানা বানাইয়া তাহারই মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিত। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণের মধ্যে পর্দার খুব কড়াকড় তখনও ছিল, এখনও আছে। তাহাদের অন্তঃপুরিকাগণ কখনও কাহারও সাক্ষাতে বাহির হন না। কিন্তু যাহাদের অবস্থা মন্দ, যাহাদের দাসদাসী রাখিবার সঙ্গতি নাই, তাহাদের মেয়েরা অবশ্য হাটে বাজারে যান না, কিন্তু পাড়ার মধ্যে বেড়াইয়া থাকেন, গৃহের অদূরবর্ত্তী কূপ কি জলাশয় হইতে জলও লইয়া আসেন। নসিবনকেও এ সকল কার্য্য করিতে হইত। তাহাদের বাড়ী হইতে কয়েক রসি দূরে একটা কূপ ছিল; নসিবন সকাল সেই কূপ হইতে জল আনিত এবং সেই সময়ই পাড়ার যুবকেরা তাহাকে নানা কথা বলিত, নানা প্রলোভন দেখাইত। কিন্তু নসিবন সে সমস্ত প্রলোভনে মোটেই কর্ণপাত করিত না। সে সকল সামান্য প্রলোভন তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত। সে চাহে অতুল ঐশ্বর্য্য, সে চাহে বিপুল বিলাস; মুরসিদাবাদের সামান্য মুসলমান-যুবকেরা তাহা কোথায় পাইবে? তাহারা দুইশত পাঁচশত টাকার প্রলোভন দেখাইত; ভাল বাড়ী, অনেক পোষাক পত্র, দুই চারিটা দাসী বাঁদী বা কিঞ্চিৎ আতর গুলাবের কথাই বলিত; কিন্তু মণি মুক্তা হীরা জহরৎ রাজপ্রাসাদ তাহারা কোথায় পাইবে? বিলাসের সহস্র উৎকৃষ্ট উপকরণ তাহারা কেমন করিয়া এই সুন্দরীর চরণে ঢালিয়া দিতে পারিবে? সুতরাং তাহাদের অকিঞ্চিৎকর প্রলোভনে নসিবনের মন টলিত না।

এমনই ভাবে কিছু দিন যায়, এমন সময় নসিবন একদিন তাহার মনের মত একটি মানুষকে দেখিতে পাইল। তিনি মুসলমান নহেন, নসিবনের প্রতি-

বেশীও নহেন,—তিনি জাতিতে খৃষ্টান। তাঁহার নাম মিঃ ফ্রিম্যান। ফ্রিম্যান সাহেবের নাম তখন মুরসিদাবাদ অঞ্চলের সকলেই জানিত; তাঁহার মত ধনাঢ্য নীলকর তখন ওপ্রদেশে ছিল না। নীলের কাজ করিয়া ফ্রি-ম্যান সাহেব যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সে অর্থ যে কেমন করিয়া ব্যয় করিতে হয় তাহাও তিনি জানিতেন। তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তাঁহার বাগবাগিচা, তাঁহার গাড়ী ঘোড়া,—তাঁহার বহুমূল্য আসবাবপত্র মুরসিদাবাদ অঞ্চলের অনেক লোকেই দেখিত এবং এই স্কটল্যাণ্ড-দেশীয় সাহেবটিকে সকলেই বিশেষ খাতির করিত।

একদিন অপরাহ্ণকালে নসিবন যখন কূপ হইতে জল লইয়া আসিতেছিল, তখন সেই পথে ফ্রিম্যান সাহেব অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি হঠাৎ নসিবনের উপর পতিত হইল। তাঁহার মনে হইল এমন সুন্দরী তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। তিনি একদৃষ্টে নসিবনকে দেখিতে লাগিলেন। নসিবনও সাহেবকে আসিতে দেখিয়া পথের পার্শ্বে যাইয়া দাড়াইয়াছিল। সেও একবার সাহেবের দিকে চাহিল; চারি চক্ষুর মিলন হইল। নসিবনের মনে হইল এমন রূপ সে তাহার জীবনে কখনও দেখে নাই। ফ্রি-ম্যান সাহেব তখন সপ্তবিংশতি বর্ষীয় যুবক; তাঁহার চেহারাও অতি সুন্দর ছিল। সেই দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ের হৃদয়ের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। এমন ভাবে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকা অসঙ্গত মনে করিয়া ফ্রি-ম্যান সাহেব চলিয়া গেলেন, নসিবনও ধীরে ধীরে কুটীরে ফিরিয়া আসিল। কন্দর্পদেব আপনার কার্য্য শেষ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

তাহার পর কারণে অকারণে ফ্রি-ম্যান সাহেব প্রতিদিন সকালে বিকালে নসিবনের বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া যাতায়াত আরম্ভ করিল। নসিবনও গৃহের সমস্ত কার্য্যই করে, অথচ তাহার কাণ থাকে অশ্বপদশব্দের দিকে। দূরে অশ্ব পদশব্দ শুনিলে সে তাহাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়ায়। অপরাহ্ণে যখন সাহেব ঐ পথে আসিবে বলিয়া তাহার মনে হয়, তখন সে কলসী-ভরা জল উঠানের পার্শ্বে ছোট ছোট গাছগুলিতে ঢালিয়া দিয়া জল আনিবার জন্য অদূরবর্ত্তী কূপের দিকে যায়। যতক্ষণ সাহেবকে দেখিতে না পায় ততক্ষণ নানা অছিলায় কূপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকে। প্রথম প্রথম কেবল দৃষ্টি-বিনিময়, তাহার পর ঈষৎ হাস্য-বিনিময় চলিতে লাগিল। সাহেব অপ-

রাত্রি-ভ্রমণটা সান্ধ্য-ভ্রমণে লইয়া ফেলিলেন। নসিবনও তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে জল আনিতে যাওয়া আরম্ভ করিয়া দিল। যেদিন পথে লোকজন না থাকিত, সেদিন দুই চারিটি কথাও হইত। প্রণয়ীযুগলের মধ্যে সে সময় কি কথাবার্ত্তা হইত, তাহা বলিবার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন হইবে না; যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা যথেচ্ছা কথাগুলি ভাবিয়া লইতে পারেন।

এ সকল ব্যাপার কোন দিনই গোপন থাকে না। বিশেষতঃ নসিবনের প্রণয়প্রার্থী উপেক্ষিত যুবকের সংখ্যা কম ছিল না। তাহারা শীঘ্রই সমস্ত কথা জানিতে পারিল—পাড়ায় গোলযোগ উঠিল। কথাটা নসিবনের পিতা মোবারক মিঞারও কর্ণগোচর হইল—একটু অতিরঞ্জিত হইয়াই কথাটা তাহার কাণে গেল। এত দিনের মধ্যে সাহেব একদিনের জন্যও নসিবনের অঙ্গস্পর্শ করেন নাই। কিন্তু কুৎসাকারিগণের রসনা নসিবনের নৈশ অভিসারের নানাবিধ কল্পিত কাহিনী রচনা করিতে লাগিল। ভালমানুষ মোবারক আলি মিঞা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে জানিত না,—সংসারের সম্বল একমাত্র কন্যা কুপথ-গামিনী হইয়াছে শুনিয়া তাহার অতিশয় মর্ম্মপীড়া জন্মিল, তাহার হৃদয় অশান্তিতে পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু নসিবনকে শাসন করা—"ও আল্লা, তাহা ত আমি পারিব না।" মোবারক মিঞা কথাটা যেন শোনেই নাই, এমনই ভাবে কন্যাকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্য নানা উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল। কথা প্রসঙ্গে অসতী রমণীদিগের ভবিষ্যৎ দুর্গতির কথা বলিতে লাগিল।

স্নেহময় পিতার এ সকল উপদেশের কারণ বুঝিতে নসিবনের বিলম্ব হইল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, হায়, এ কি করিতেছি! কিসের জন্য এমন পিতার, এমন ক্ষমাশীল দেবতার হৃদয়ে বেদনা দিতেছি! আমার সমস্ত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া লইতে প্রস্তুত; এমন পিতা কি কাহারও হয়! না না! আমি এমন পিতার হৃদয়ে বেদনা দিতে পারিব না, আমি তাহার হৃদয় অশান্তিপূর্ণ করিতে পারিব না। কিন্তু পরক্ষণেই সাহেবের মোহন মূর্ত্তি তাহার হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল বিলাস-সামগ্রী, অশেষ সুখ সম্ভোগ তাহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিত। সে যে আসমানে সুখের বাসা বাঁধিয়াছিল, সেখান হইতে সে কেমন করিয়া বাহির হইবে। একদিকে পিতার স্নেহ, পিতার আদর, পিতার ক্ষমাশীলতা, পিতার ধর্ম্মপ্রাণতা তাহার চিত্তকে ব্যথিত করিতে

লাগিল,—আর একদিকে কে যেন বিলাস-মোহের তীব্র মদিরা তাহার শুষ্ককণ্ঠে ঢালিয়া দিতে লাগিল। কিশোরীর হৃদয়ে দেবাসুরের প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে অসুরেরই জয় হইল। নসিবন পিতার স্নেহ, তাঁহার আদর, তাঁহার মনোবেদনার কথা ভুলিয়া গেল।

একদিন রাত্রিকালে ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পাল্কী লইয়া পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে সাহেব আসিয়া দাড়াইলেন। নসিবন পিতার স্নেহ পাশ ছিন্ন করিয়া, ক্ষুদ্র কুটীর ত্যাগ করিয়া সাহেবের দৌলতখানায় সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইবার জন্য চলিয়া গেল। সাহেব পূর্ব্বেই মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ঘোড়া ও পাল্কীর ডাক বসাইয়াছিলেন। সেই রাত্রিতেই তাঁহারা কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

মিষ্টার ফ্রিম্যান যুবক হইলেও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। নসিবনকে তিনি রক্ষিতাভাবে রাখিবার অভিপ্রায়ে গৃহবহিস্কৃতা করেন নাই। পথে যাইতে যাইতে তিনি নসিবনকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি তাহাকে যথারীতি বিবাহ করিবার জন্যই লইয়া আসিয়াছেন। নসিবন যদি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে গৃহে রাখিয়া আসিতে প্রস্তুত আছেন। নসিবনের এত কথা ভাবিবার অবকাশ ছিল না—এসকল বিষয় চিন্তা করিয়াও সে গৃহত্যাগ করে নাই। সাহেবের এই প্রস্তাব শুনিয়া সে চিন্তিত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মপ্রাণ পিতার কথা তখন তাহার মনে হইল, পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের মহান্ উপদেশাবলী তাহার স্মরণ হইল। মুসলমান ধর্ম্মত্যাগ করিয়া খৃষ্টানের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে তাহার ইতস্ততঃ হইতে লাগিল। আবাল্য যে ধর্ম্ম সে যাজন করিয়া আসিয়াছে, সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে? কিন্তু উপায়ান্তর নাই, গৃহে ফিরিবার আর পথ নাই—সাহেবকেও সে ছাড়িতে পারে না। প্রেমের প্রাবল্যের নিকট তাহার চিরাচরিত ইস্‌লাম ধর্ম্ম ত্যাগের নিমিত্ত মনের ইতস্ততঃ ভাব অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিল না। কলিকাতায় আসিবার অব্যবহিত পরেই বাপ্টিষ্ট চ্যাপেলে নসিবন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হইল—তাহার পরেই তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। কুটীরবাসী দরিদ্র দরজী মোবারক আলি মিঞার দুহিতা নসিবন বিবি মিসেস ফ্রিম্যান হইলেন। সাহেব নবপরিণীতা পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য, তাঁহার বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য কয়েক সহস্র টাকা জলের মত ব্যয় করিলেন। মলিনবস্ত্র পরিহিতা দরজীকন্যা বহুমূল্য বিলাতী

পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইলেন। ইংরাজীভাষা ও বিলাতী আদব কায়দা শিক্ষা দিবার জন্য এক বর্ষিয়সী ইংরাজ-মহিলা নিযুক্ত হইল। কিছুদিন পরেই ফ্রিম্যান সাহেব মেম সাহেবকে লইয়া মুরসিদাবাদে গমন করিলেন।

মেম সাহেব মুরসিদাবাদে যাইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। ঘরের বাহির হইতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল---যদি পথে ঘাটে পরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইতিমধ্যে একদিন মেম সাহেব এক ভৃত্যকে পাঠাইয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া মেম সাহেবকে জানাইল যে, মোবারক আলি দরজী কোথায় চলিয়া গিয়াছে ;—তাহার গৃহ শূন্য পড়িয়া আছে। প্রতিবেশীরা বলিল, বেইমান মেয়ের শোকে পাগল হইয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। এই নিদারুণ বার্ত্তা শুনিয়া মেম সাহেবের চক্ষে জল আসিল—তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল---তাঁহার শুধু মনে হইতে লাগিল "হায় আল্লা, Oh God, কোন্ অপরাধে আমি অমূল্য পিতৃস্নেহে চিরবঞ্চিত হইলাম, আমার কি অপরাধ দেখিয়া পিতা আমায় চির দিনের জন্য ত্যাগ করিয়া গেলেন।" দুই চারিদিন কষ্ট হইল, দুই চারিদিন পিতার উন্মত্ততার কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া হৃদয় পীড়িত করিল—তারপর কালের প্রলেপে নসিবনের পিতৃ বিরহের শোক ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল, তিনি ধীরে ধীরে পূর্ব্ববৎ স্বামীর সহিত সংসার-ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। মিষ্টার ফ্রিম্যানের স্নেহে যত্নে আদরে তাঁহার হৃদয়ক্ষত শুষ্ক হইয়া গেল---নসিবন পুরা মেম সাহেব হইলেন।

এত সুখ এত সৌভাগ্য মেম সাহেবের অদৃষ্টে অধিক দিন স্থায়ী হইল না,—বিবাহের দেড় বৎসর পরেই সামান্য জ্বরে ফ্রিম্যান সাহেবের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মিসেস ফ্রিম্যানের নামে উইল করিয়া দিলেন,—দান বিক্রয়ের অধিকার পর্য্যন্ত দিয়া গেলেন।

বিবি ফ্রিম্যান স্বামীর মৃত্যুর পর নিজেই বিষয় রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবেন মনে করিয়াছিলেন ; কিন্তু দু' একমাসের পরেই তিনি নিজের অক্ষমতা বুঝিতে পারিলেন। সমস্ত বেচিয়া ফেলিতেও তাঁহার মন সরিল না। দেশীয় কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে পরামর্শ দিল—সাহেবের জমিদারী, সাহেবের ব্যবসায় বাণিজ্য সাহেব ছাড়া আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। মেম সাহেব তখন কর্ম্মচারীদিগের পরামর্শে মিষ্টার রজার্স নামক এক অজ্ঞাত-কুলশীল সাহেবকে তাঁহার ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন।

ম্যানেজার সাহেব কাজ কর্ম্ম তেমন কিছুই জানিতেন না—কিন্তু তাঁহার দুইটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি খুব সুপুরুষ লোক ছিলেন এবং গান বাজনা, আমোদ আনন্দ কথাবার্ত্তায় বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। বিপুল বিত্ত-শালিনী ঊনবিংশ বর্ষীয়া সংসারানভিজ্ঞা যুবতীর অনুগ্রহ লাভের জন্য যে যে গুণের প্রয়োজন, মিষ্টার রজার্সের তাহা সকলই ছিল। মেম সাহেবের পরম-বিশ্বাসভাজন হইতে তাঁহার মাসাধিক কালের অধিক লাগিল না। মিষ্টার রজার্স কাজকর্ম্ম অতি সামান্যই দেখেন; কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই বেশভূষা করিয়া মিসেস ফ্রিম্যানের কুঠিতে উপস্থিত হন এবং 'আজ অমুক মহলের বহুদিনের বিদ্রোহী প্রজাদিগকে দমন করিয়াছি,' 'আজ অমুক মহলের আয় বৃদ্ধি করিয়াছি,' 'আজ অমুকের সহিত বহুদিনের গোলযোগ সরকারের স্বপক্ষে মীমাংসা করিয়াছি'—ইত্যাদি ইত্যাদি মিথ্যা বাহাদুরি দেখাইয়া মেম সাহেবের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন; ক্রমে গান বাজনা, খানা পিনা বহুৎ চলিতে লাগিল।

এই সময়ে একদিন বিবি ফ্রিম্যানের মনে হইল, দূর ছাই এ বিবি-গিরী আর করিয়া কাজ নাই। যে পথে স্বামী গিয়াছেন, সেই পথে সব চলিয়া যাক। তখন তিনি আর একবার পিতার অনুসন্ধানের জন্য সেই দরিদ্র পল্লীতে লোক প্রেরণ করিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া মেম সাহেবকে জানাইল মোবারক মিঞার কুটীরখানি ভূমিসাৎ হইয়াছে, গৃহ প্রাঙ্গণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছে। সে বলিল যে, মোবারক মিঞা একদিন গ্রামে আসিয়াছিল; সারাদিন তাহার সেই শূন্য ভিটায় বসিয়া ছিল, কাহারও সহিত কোনও কথা বলে নাই; পরদিন হইতে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এ সংবাদ শুনিয়া মেম সাহেবের হৃদয় আকুল হইল। তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, ইচ্ছা হইল এ সব ছাড়িয়া দিয়া ফকিরী গ্রহণ করিয়া তিনি দেশে দেশে তাঁহার সেই পাগল পিতার অনুসন্ধান করিয়া ফেরেন, পিতার বেদনাপূর্ণ তপ্ত বুকে মাথা রাখিয়া, তাঁহার চরণে অবনত হইয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু আবার সেই মোহ, আবার সেই বিলাস-বিভ্রম, আবার সেই বিষয় বিভবের তীব্র মদিরা,—যুবতী কিছুতেই এ প্রলোভনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না। ভোগ-বাসনা একটা বিকট দানবের মত তাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছিল। উহারই মধ্যে কখনও কখনও তিনি একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেন। সেই সময়েই তাঁহার দেবোপম পিতা, তাঁহার

শান্তি ও পবিত্রতাপূর্ণ ক্ষুদ্র কুটীর তাঁহাকে ক্ষণেকের জন্য টানিয়া লইত; কিন্তু সে টান বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না; মেম সাহেব এই চতুর ইংরাজের জালে ক্রমেই জড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই মিসেস ক্রিম্যান যথাশাস্ত্র আচার অনুষ্ঠান করিয়া মিসেস রজার্স হইলেন। সাহেব তখন আর ম্যানেজার রহিলেন না; একেবারে এষ্টেটের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন।

এদিকে বিষয়ের আয় ক্রমেই কমিয়া যাইতে লাগিল। মেম সাহেব মধ্যে মধ্যে কর্ম্মচারীদিগকে তলব দিয়া দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহারা সাহেবের ভয়ে এবং নিজেদের অন্যায় উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইবার আশঙ্কায় সাহেবের গুণগান করিত। মেম সাহেব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না।

এই ভাবে কিছুদিন গেলে একদিন সাহেব মেম সাহেবকে বলিলেন যে, বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে একবার কলিকাতায় যাইতে হইবে—ফিরিতে দশ পনর দিন বিলম্ব হইতে পারে। মেম সাহেব সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি মেমসাহেবকে বুঝাইলেন যে, দুইজনেই কুঠি ছাড়িয়া গেলে কাজ কর্ম্মের ক্ষতি হইতে পারে; আর দশ পনর দিন পরেই যখন তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন তখন এই অল্প সময়ের জন্য মেম সাহেবের যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

মেম সাহেব কুঠিতেই থাকিলেন, সাহেব কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় গিয়া সাহেব পৌঁছা সংবাদ পর্য্যন্ত মেম সাহেবকে দিলেন না। দেখিতে দেখিতে পনর দিন চলিয়া গেল—সাহেবের সংবাদ নাই। মেম সাহেব চিন্তিতা হইলেন। আরও সাতদিন অপেক্ষা করিয়া দুইজন কর্ম্মচারীকে কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। তাহারা কলিকাতায় যাইয়া কি অনুসন্ধান করিল তাহারাই জানে—সপ্তাহাধিক পরে মুরসিদাবাদে ফিরিয়া গিয়া বলিল, "সাহেবের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।" সঙ্গে সঙ্গে সাত শত টাকা খরচখরচার হিসাব দাখিল করিল। মেম সাহেবের মনে এতদিন পরে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি সমস্ত কাগজপত্র তলব করিলেন। কর্ম্মচারীরা হিসাবপত্রে দেখাইয়া দিল সাহেবের নিকট প্রায় সওয়ালক্ষ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে। মেম সাহেবের তখন চক্ষুস্থির হইল—এত-

দিন তিনি কিছুই দেখেন নাই—টাকা কড়িরও হিসাব লন নাই, লোহার সিন্ধুকের চাবি সাহেবের নিকট থাকিত। তখন সিন্ধুক খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে তিন হাজারের বেশী টাকা নাই। তখন মেম সাহেবের কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন, কিন্তু সে বিজ্ঞাপনের কোনই ফল হইল না—রজার্স সাহেবের কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তিন চারি মাস অপেক্ষা করিয়া মেম সাহেব মিসেস রজার্স নাম ত্যাগ করিলেন—তাঁহার পূর্ব্বস্বামীর নামানুসারে তাঁহার নাম মিসেস ফ্রিম্যানই বাহাল করিলেন।

এইভাবে প্রতারিত হইয়া মেম সাহেব বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দ্বারা বিষয় রক্ষা হইতে পারে না। তিনি যখন সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিয়া এ দেশ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করিলেন, তখন কর্ম্মচারীরা অনেকেই তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি স্থির করিলেন বিলাতে গমন করিয়া সেখানেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন।

বিবি ফ্রিম্যান বিলাত গমনের জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। পাথেয় হিসাবে কিছু টাকা নিজের কাছে রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিলেন। কুক কোম্পানীর বাড়ীতে টাকা জমা দিয়া জাহাজের একটি প্রথম শ্রেণীর কেবিন ভাড়া করা হইল।

বুধবারে জাহাজ ছাড়িবার কথা, বিবি ফ্রিম্যান মঙ্গলবারে অপরাহ্ণকালে কেবিনটি দেখিবার জন্য জাহাজে গেলেন। দেখাশুনা শেষ করিয়া তিনি যখন হাই-কোর্টের সম্মুখে গঙ্গার তীরে উঠিয়া গাড়ীতে চড়িতে যাইবেন, সেই সময়ে দেখিতে পাইলেন অনতিদূরে এক চানাওয়ালার দোকানের সম্মুখে ছিন্নবেশ, রুক্ষকেশ, ধূলিধূসর একটি বৃদ্ধ দাড়াইয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধকে দেখিবামাত্রই মেম সাহেব স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইলেন—এ যে তাঁহারই হতভাগ্য পিতা। মেম সাহেব তখন আত্মবিস্মৃত হইলেন—তিনি যে একজন ভদ্র ইংরাজ-গৃহিণী, তিনি যে মেম সাহেব—তিনি যে অতুল বিষয়ের অধিকারিণী—সে সকল কথাই মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেলেন। মেম সাহেব দৌড়িয়া গিয়া বৃদ্ধের সেই ধূলিমলিন হস্ত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মেরা বাপ্‌জান!"

সহসা এইভাবে আক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধ একবার মেম সাহেবের মুখের

দিকে চাহিল, তাহার পরই সবলে হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া বিকটস্বরে বলিয়া উঠিল, "সেলাম, মেম সাহেব।" তাহার পরই সে উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া রাজ-পথের জনসঙ্ঘের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

মেম সাহেব তখন আত্মহারা হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন "পাক্‌ড়ো-বুড্‌ঢাকো। পঞ্চাশ রুপেয়া—শ রুপেয়া—নেহি নেহি পাঁচশো রুপেয়া বক্‌শিস।" মেম সাহেবের আকুলতা দেখিয়া পুরস্কার-প্রত্যাশী কয়েকজন লোক রাস্তায় ছুটিল, কিন্তু কেহই কোথাও বৃদ্ধকে দেখিতে পাইল না! যে চানাওয়ালার দোকানের সম্মুখে বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া ছিল, মেম সাহেবের আকুল আগ্রহ দর্শনে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া মেম সাহেবের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "ও বুড্‌ঢার জন্য হুজুর অমন করিতেছেন কেন? ও রোজ সন্ধ্যার সময় আমার এই দোকানের পাশে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন সূর্য্য দরিয়ার ও পাশে ডুবে যায়, আকাশের গা রাঙা হয়, তখন রোজই বুড্‌ঢা মাটীতে হাত ছোঁয়াইয়া তিনবার কাহাকে সেলাম করে—তারপর ঐ একটি কথাই রোজ বলে 'মেরি লেড়্‌কী!' মনে হয় বুড্‌ঢার লেড়্‌কি হয় ত মারা গিয়েছে, তারই শোকে সে পাগল হয়েছে। আহা বেচারীর বড় কষ্ট!"

চানাওয়ালার এই কাহিনী শুনিয়া মেম সাহেবের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তাঁহার বক্ষে যেন কে শেলাঘাত করিল। তিনি অতি কাতর স্বরে বলিলেন—"হাঁ, হাঁ, লেড়্‌কী মর গেয়ী।"

শ্রীজলধর সেন

পর-পার

গভীর রক্তিম রাগ দিগন্ত সীমায়,
তটিনীর পরপার দেখা নাহি যায়,
দীপ-দীপ্ত তটখানি দিব্য সমুজ্জ্বল,
লুব্ধ আঁখি তারি পানে ধায় অবিরল!

জীবনের পর-পার কত বহুদূরে,
আঁখিত যায় না কভু সে অজানা পুরে,
নাহিক আলোক-লেখা, পথ দূরান্তর
অচল আঁধার-রাশি নিবিড় দুস্তর!

শ্রীলীলা দেবী

অর্জ্জুন

(১)

দেবব্রত তাই প্রিয় অগণ্য দেবের
নিত্য তুমি, বীর্য্যমুগ্ধ কিরাত শিবের
লভিলে অজেয় অস্ত্র, অক্ষয় তূণীর
বরুণের, প্রভঞ্জন দিলা তোমা বীর
জয়শঙ্খ, অগ্নি দিল দীপ্ত স্বর্ণ-রথ,
সাধনায় অবারিত রুদ্ধ স্বর্গ-পথ
অকালে তোমার লাগি' দেবতা কৃপায়
দীর্ঘ পঞ্চবর্ষ ধরে লভিলে যেথায়
অমর শক্তির দীক্ষা, আপনি তপন
পুত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জানি তবু তুষ্ট মন
পরাইল রতন কিরীট মিত্ররূপে,
প্রহরী শিবিরদ্বারে জাগিলেন চুপে
শম্ভু শূলপাণি, প্রেমে আপনি সারথি
চতুর্ভুজ, চিরবন্ধু জগতের পতি !

(২)

ফাল্গুনী সহস্র আঁখি বাসবতনয়,
কীর্ত্তি তব অবারিত, যৌবন প্রণয়
বাঁধা নহে এক ঠাঁই, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী
দ্রৌপদীরে ছাড়ি তাই উলুপী মোহিনী
নাগপাশে বাঁধিল তোমারে কোন্ দূরে ;
নির্ব্বাসন—তাও ব্যর্থ নয়, মণিপুরে
চিত্রাঙ্গদা অঙ্কশায়ী, পুণ্য দ্বারকায়
মুগ্ধ করি হৃষিকেশে ভগ্নী সুভদ্রায়
হরিয়া আনিলে তুমি দীপ্ত দিবালোকে,
তব বাণ বিদ্ধ গুপ্ত ভোগবতী শোকে
উচ্ছ্বসিত, তৃষ্ণাতুর গঙ্গাসুত মুখে
ঢালি দিল অন্তিম অঞ্জলি, অগ্নি সুখে
দহিল খাণ্ডব, ক্ষুব্ধ ইন্দ্রপ্রস্থে ময়
বিরচিল মায়া-সভা অতুল অক্ষয়।

(৩)

সব্যসাচী হে কিরীটি, দেবেন্দ্রতনয়
যৌবন সম্ভোগে শুধু তব কীর্ত্তি নয়
মর্ত্তভূমে, স্বর্গে তুমি উর্ব্বশী বিমুখী
তরুণী বিরাটসুতা সঁপি দিয়া সুখী
অভিমন্যু করে, ভাল জান ধনঞ্জয়,
কেবলি গ্রহণে কভু মানব-হৃদয়
তৃপ্তি নাহি মানে, তাই যুদ্ধলব্ধ তব
মণি মুক্তা রত্নভার কাঞ্চন বিভব
মুক্ত হস্তে করি দান ভ্রাতৃ-অভিষেকে
সুখী তুমি বীর, দরিদ্রে বিপন্ন দেখে
সাধিয়া উদ্ধার-ব্রত নির্ব্বাসিত তুমি,
যে দুর্জ্জন দুর্য্যোধন সূচি অগ্রভূমি
নাহি দিয়া বাধাইল দুরন্ত সমর,
তারি মৃত্যু ভাবি তুমি করুণা কাতর।

গুপ্ত-যুগে বঙ্গদেশ।*

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বহুসংখ্যক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। যখন যে পরাক্রান্ত নরপতি—নিজের বাহুবীর্য্য, মন্ত্রিগণের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ—এই তিনটিকে অবলম্বন করিয়া, প্রকৃত দণ্ডধররূপে সেই খণ্ডরাজ্যগুলিকে ঐক্য-সূত্রে বন্ধন করিয়া, আত্মশাসনাধীনে রাখিতে পারিয়াছেন, তিনিই তখন সম্রাট হইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার বংশধরগণ যতদিন সেই প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রাখিতে পারিয়াছেন, ততদিন দেশ সর্ব্ববিষয়ে সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও গৌরবান্বিত থাকিয়াছে। তাহার পর, যখন প্রত্যেক বার সাম্রাজ্যের শেষ নরপাল নিজ আধিপত্য অপ্রতিহত রাখিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তখন শাসন-শৃঙ্খল শিথিল হইয়া, দেশকে পুনরায় স্ব-স্ব-প্রধান অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে পরিণত করিতে সহায়তা করিয়াছে। তখন দেশে অরাজকতা, বিপ্লব ও বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, দুর্ব্বল সবলের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। যথার্থ দণ্ড প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হইলেও, প্রভাব-উৎসাহ মন্ত্রণা শক্তিসম্পন্ন সার্ব্বভৌম নরপতির মর্য্যাদা লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্রের অভাবে, কিছুকালের জন্য দণ্ড অপ্রণীতই থাকিয়া গিয়াছে। কাজেই তখন

> "অপ্রণীতো হি দণ্ডো মাৎস্য ন্যায়মুদ্ভাবয়তি।
> বলীয়ান অবলং গ্রসতে, দণ্ডধরাভাবে।"

কৌটিল্যের এই দর্শন সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছে। (১)

আর্য্যাবর্ত্তে কণিষ্ক-প্রতিষ্ঠিত কুষাণ সাম্রাজ্যেরও এইরূপ সাধারণ পরিণতি ঘটিয়াছিল। প্রথম বাসুদেবের দীর্ঘ রাজত্বের অবসানে, সেই সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই সময়েই আবার দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজ্যও তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে ও তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তরাপথের ও দক্ষিণাপথের এই দুইটি প্রধান সাম্রাজ্যের তিরোভাবের মূল কারণ পারস্যের সেসেনীয় [Sessanian] রাজ-বংশের অভ্যুদয়। পারসীকগণের আক্রমণে কুষাণ-সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—ঐতিহাসিকগণের এই অনুমান, এখনও সত্য বলিয়া সপ্রমাণ

---

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে (১৭ই ফাল্গুন তারিখে) পঠিত।

(১) অর্থশাস্ত্র—১ অধিঃ। ৪র্থ অধ্যায়।

হইতে পারে নাই। তবে পুরাণের মত অনুসরণ করিলেও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে অনার্য্যগণের আক্রমণকেই ভারতের তদানীন্তন দুরবস্থার কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তৃতীয় শতাব্দীর শেষ তিন পাদের ও চতুর্থের প্রথমাংশের ভারতীয় ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন। পঞ্চনদ প্রদেশের কিঞ্চিৎ অবস্থা ব্যতীত, এই অন্ধকার যুগের আর কিছুই জানা যায় নাই। কুষাণ-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে:উপস্থিত প্রায় শতবর্ষব্যাপী বিপ্লব (বা মাৎস্য-ন্যায়)-যুগের পর, মগধে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান।

চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে পঞ্চমের তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত, সার্দ্ধ শত বৎসর গুপ্ত-সম্রাটগণ মগধ হইতে নিঃসপত্নভাবে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই একচ্ছত্রাধিপত্যের যুগকে পূর্ব্বভাগ ধরিয়া, এই যুগের সম্রাড্‌গণকে "প্রাচীন-গুপ্তরাজ"রূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। তৎপর বিদেশাগত আক্রমণকারিগণের প্রভাবে তাঁহাদের প্রবল প্রতিপত্তির হ্রাস হইলে পর, যে সকল গুপ্ত বংশীয় নরপতি, ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত,—এমন কি স্থানেশ্বরাধিপতি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য সময়ে ও তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মাৎস্য-ন্যায়-যুগেও—কেবল মগধে ও তৎসন্নিহিত দেশবিভাগে রাজত্ব অপ্রতিহত রাখিবার চেষ্টা চালাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে "অর্ব্বাচীন গুপ্তরাজ"রূপে আখ্যাত করা যাইতে পারে।

ঐতিহাসিক প্রাচীন লিপিমালা হইতে জানা গিয়াছে যে মগধের গুপ্ত-রাজবংশের প্রথম পুরুষের নাম মহারাজ গুপ্ত। তিনি পাটলীপুত্রের উত্তরে কোনও ভূ-খণ্ডে [অথবা মতান্তরে, পাটলিপুত্রেই স্থানীয় খণ্ডরাজ্যের নৃপতিরূপে] রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারীর নাম ঘটোৎকচ। তিনিও কেবল মহারাজ-পদ লাঞ্ছিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে, সর্ব্বত্রই সার্ব্বভৌমত্বসূচক "মহারাজাধিরাজ"-পদ বিভূষিত বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বৈশালী নগরীর প্রাচীন লিচ্ছবী-বংশীয়া কুমার-দেবী-নাম্নী এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুপ্ত-বংশীয় নরপতিগণ তাঁহাদের শাসনাদিতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে "লিচ্ছবি-দৌহিত্র" বলিয়া সগৌরবে বর্ণনা করিয়াছেন। বৈবাহিক-সম্বন্ধজনিত লিচ্ছবিগণের প্রভাবেই তাঁহার প্রতিপত্তির সূচনা হইয়াছিল,—কিম্বা তিনি নিজ নৃপগুণ-মাহাত্ম্যে নিকটবর্ত্তী বৈশালীরাজকে কন্যাদানে বাধ্য করিয়া, আত্মপ্রভাব বিস্তারের সূচনা নিজেই করিয়াছিলেন,—তাহা একটি তর্কসঙ্কুল বিষয়। কিন্তু, সমৃদ্ধি-সোপানে একবার

আরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহাকে আর বেশী দিন স্থানীয় খণ্ডরাজ্যের নরপতিরূপে বাজত্ব করিতে হয় নাই। গুপ্তবংশীয় প্রথম সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা নির্দ্ধারিত করিতে হইলে, তদীয় পুত্র সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-বর্ণনা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি প্রয়াগ হইতে পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত গঙ্গার উপত্যকা-প্রদেশ স্বশাসনাধীনে আনিতে পারিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের—

"অনুগঙ্গা-প্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি।" (২)

এই বাক্য এবং বায়ুপুরাণের

"অনুগঙ্গং প্রয়াগং চ সাকেতং মাগধাংস্তথা।
এতাঞ্জনপদান সর্ব্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ॥" (৩)

এই শ্লোকটি বোধ হয়, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-বিস্তার উদ্দেশ্য করিয়াই রচিত হইয়া থাকিবে। এক মতে ৩২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অভিষেক কাল হইতে, অপর মতে সেই বৎসর হইতেই তদীয় রাজত্বের প্রথম বৎসর ধার্য্য করিয়া, তিনি "গুপ্ত-সংবৎ" নামে যে নূতন সংবৎ প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরাধিকারী প্রাচীন গুপ্তরাজগণ তাঁহাদের রাজ্যকালও এই সংবৎসর ধরিয়াই গণনা করিতেন। সে যাহা হউক, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেকালের বাঙ্গালার প্রত্যক্ষভাবে কোনও রূপ সম্পর্ক ছিল কি না বলা যায় না।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত জীবিতাবস্থায় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছিলেন। এই উত্তরাধিকারী তদীয় অন্যতম পুত্র, ইতিহাস প্রসিদ্ধ জগদ্বিখ্যাত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। পিতা যে সাম্রাজ্য নিকেতনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে অপ্রতিরথ" পুত্র আত্মপরাক্রমে সেই ভিত্তির উপর স্ববংশীয়গণের ভোগের নিমিত্ত, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিপুল বিভব পূর্ণ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথিতকীর্ত্তি, দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী, মৌর্য্যরাজবংশাবতংস মহারাজ অশোক প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে, যে অত্যুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ প্রস্তুত করাইয়া তদগাত্রে তাঁহার নীতিবহুল অনুশাসন মালা নানারূপে পরাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, [প্রয়াগে অবস্থিত] সেই পাষাণস্তম্ভে "লিচ্ছবি দৌহিত্র চন্দ্রগুপ্তের" পুত্র সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় কাহিনীও উৎকীর্ণ হইয়াছিল। "সন্ধি বিগ্রহিক কুমারামত্য মহাদণ্ডনায়ক" প্রভৃতি রাজকীয়-পদ-বিভূষিত মহাকবি

(২) বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ। ২৪ অধ্যায়।
(৩) বায়ুপুরাণ। অঃ ৯৯। ৩৮৩ শ্লোক।

হরিষেণের বিরচিত সংস্কৃতে পত্ত-গত্তময় (৪) প্রশস্তিটি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উপাদানের মধ্যে একটি অতি মূল্যবান বস্তু। এযাবৎ আবিষ্কৃত প্রাচীনলিপিতে অন্য কোন সম্রাট বা রাজার দিগ্বিজয়-বার্ত্তা এইরূপ জ্বলন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। চতুর্থ শতাব্দীতে সংস্কৃত কাব্যকলা, ব্যাকরণ অলঙ্কার ও ছন্দঃ শাস্ত্র কতদূর উচ্চ পদবীতে পৌছিয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ-হরিষেণের বিখ্যাত প্রশস্তি। এই কারণে ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। "স্বভুজবল-পরাক্রমৈকবন্ধু" সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির সপ্তম শ্লোকে সম্রাটের উল্লিখিত "পুষ্পাহ্বয়-পুর অর্থাৎ পাটলিপুত্র নগর হইতে সম্রাটের রাজ্যশাসন করিবার কথা—অনুমিত হইতে পারে। প্রশস্তির চতুর্থ শ্লোকে মহারাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত:কিরূপ অবস্থায়, কি ভাবে, সমুদ্রগুপ্তকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহার এক অনুপম বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কবি নিজ শক্তিতে যেরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তৎপাঠে অভিষেক-চিত্রটি পাঠকের মানসপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। সভাস্থলে রাজপুত্রগণ সকলেই সমাগত, মন্ত্রিগণ উচ্ছ্বসিত—ভয়, কোন অনুপযুক্ত পুত্রের উপর যৌবরাজ্য না অর্পিত হয়,—এমন সময়ে চন্দ্রগুপ্ত তত্ত্ব-দর্শনপটু নেত্রদ্বারা অবলোকন করিয়া পুত্রগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তকেই আর্য্য গুণালঙ্কৃত মনে করিয়া "পাহ্যেবমুর্ব্বীমিতি" - তুমিই নিখিল ধরাকে পালন কর—এই বলিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিলেন। অন্যান্য পুত্রগণ ম্লানবদনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শ্লোকটি এই:—

"আর্য্যো হীত্যুপগুহ্য ভাবপিশুনৈরুৎকর্ণিতৈ রোমভিঃ
সভ্যেষূচ্ছ্বসিতেষু তুল্যকুলজম্লানাননোদ্বীক্ষিতঃ।
স্নেহব্যাকুলিতেন বাষ্পগুরুণা তত্ত্বেক্ষিণা চক্ষুষা
যঃ পিত্রাভিহিতো নিরীক্ষ্য নিখিলাং পাহ্যেবমুর্ব্বীমিতি।"

চন্দ্রগুপ্তের স্বর্গারোহণের পর সমুদ্রগুপ্ত যে ভাবে পৈতৃক সাম্রাজ্য অধিকতর বিস্তৃত করিয়া "আসমুদ্রক্ষিতীশ" হইতে পরিয়াছিলেন, হরিষেণ-প্রশস্তির গদ্যাংশে তাহার দেদীপ্যমান পরিচয় পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের সহিত তদানীন্তন বাঙ্গালা-দেশের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাও এই প্রশস্তির মর্ম্ম হইতে উদ্ঘাটিত হইতে পারিবে। মালব আভীর মাদ্রক প্রভৃতি স্বাধীন জাতিগণ ও "সমতট-ডবাক-কামরূপ—নেপাল—কর্ত্তৃপুরাদি-প্রত্যন্ত নৃপতি"গণকে তিনি স্বস্ব দেশে

(৪) Fleet's Gupta Inscription, vo 1.

স্বাধীন ভাবে থাকিতে দিয়া নিজকে তাঁহাদের সহিত মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও তাঁহার প্রচণ্ড-শাসনকে ভয় করিয়া, তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য চারিটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। (ক) সম্রাট-উদ্ভাবিত সর্ব্বপ্রকার করের দান, (খ) সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করণ, (গ) প্রণতি-বিজ্ঞাপন ও (ঘ) সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য আগমন।

এই প্রশস্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে সমতট, ডবাক, কামরূপ প্রভৃতিকে সমুদ্রগুপ্ত প্রত্যন্তদেশ বলিয়া গণ্য করিতেন। পূর্ব্বদিকে কতদূর পর্য্যন্ত গুপ্ত-সম্রাটের রাজ্য বিস্তৃত ছিল, ইহা হইতে তাহা প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত দেশ তাঁহার অপরোক্ষ শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সম্রাটের সহিত গৌণভাবে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া এই দেশসমূহের রাজগণ প্রত্যন্ত নৃপতি হইয়া, সীমারক্ষায় সম্রাটের সহায়তা সাধন করিতেন। সে যাহা হউক, সন্ধিসূত্রে মিত্ররূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাঁহারা সম্রাট বাবস্থাপিত সর্ব্বপ্রকার কর দান, তদীয় আজ্ঞা করণ, প্রণামাঞ্জলি ও সাক্ষাৎকারের জন্য আগমন প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া সম্রাটকে পরিতুষ্ট রাখিতেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরেই বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে হরিষেণের প্রশস্তিতে উল্লিখিত সেকালের সমতট, ডবাক ও কামরূপ বর্ত্তমান বাঙ্গালার কোন্ কোন্ বিভাগ? সপ্তম শতাব্দীর চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ইউয়ান্ চোয়াঙের ভারতভ্রমণ কাহিনী হইতে বাঙ্গালাদেশকে চারিটি বিভাগে বিভক্ত পাওয়া যায়, যথা পুণ্ড্রবর্দ্ধন কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি। গুপ্তযুগের [ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্য ভাগের] প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা নামক গ্রন্থ হইতেও সেকালের বাঙ্গলার কোন কোন প্রদেশের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই গ্রন্থে পূর্ব্ব দিকের প্রদেশ সমূহের মধ্যে মগধ, প্রাগ্জ্যোতিষ, পৌণ্ড্র, সমতট, বঙ্গ, উপবঙ্গ, সুহ্ম, অঙ্গ, তাম্রলিপ্তিকা, বর্দ্ধমান প্রভৃতির নাম উল্লিখিত পাওয়া যাইতেছে। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য কালের দুইশত বৎসর পরে, বরাহমিহির বাঙ্গালার যে ভৌগলিক বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন, তৎপর্য্যালোচনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সমুদ্রগুপ্তের সময়েও পৌণ্ড্র, সুহ্ম প্রভৃতি দেশ তত্তৎ নামেই অভিহিত হইত এবং তাহাদেরও হয়ত পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য ছিল। কিন্তু হরিষেণের প্রশস্তিতে পূর্ব্বদিকে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত দেশরূপে কেবল সমতট ডবাক ও কামরূপের উল্লেখ দেখিয়া এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে যে [তাম্রলিপ্তিসহ] সুহ্ম প্রদেশ, পৌণ্ড্র প্রদেশ ও অঙ্গ,

বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রদেশগুলি, সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া মগধের অপরোক্ষ শাসনের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক অগ্রজ-প্রতিম চন্দ মহাশয়ও তাঁহার (৫) "গৌড়রাজ মালায়" এইরূপ অনুমানেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীর কর্ণসুবর্ণ-নামধেয় প্রদেশ, সম্ভবতঃ গুপ্তযুগে বর্দ্ধমান বা অন্য কোন প্রদেশের অন্তঃপাতি ছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালার কতক অংশ মগধের অন্তর্ভুক্ত থাকায় সম্রাটের স্বশাসনে বর্ত্তমান ছিল, এবং সমতট ও ডবাক প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না থাকিয়া, অনেকটা স্বাধীনভাবে, গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ রূপে বর্ত্তমান ছিল। সমতটের সীমা লইয়া সবিশেষ গোলযোগ নাই। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ অর্থাৎ আধুনিক পশ্চিম বঙ্গের খুলনা যশোহর ও পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও ঢাকার অংশবিশেষ লইয়া সেকালের সমতট প্রদেশ বুঝিতে হইবে। কিন্তু প্রশস্তিতে উল্লিখিত ডবাক প্রদেশ যে কোন্ দেশ তাহা লইয়া পণ্ডিত সমাজে অনৈক্য আছে। সমতট ও কামরূপ এই দুই প্রদেশের নামের মধ্যস্থলে উল্লিখিত হওয়ায় ডবাক প্রদেশকে সাহচর্য্য-বলে এই দুই প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী কোন প্রদেশ বলিয়া ধরিতে হইবে বলিয়া বোধ হয়। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলয়িতা ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয় (৬) সংশয় সহকারে অনুমান করেন যে বর্ত্তমান সময়ের বগুড়া দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলাগুলিই গুপ্তযুগের ডবাক প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। এই অনুমান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না—কারণ এই তিন জেলা যে সেকালের পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তঃপাতী ছিল তাহাতে ঐতিহাসিক মাত্রেই আপত্তি করেন না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন সম্রাটের স্বশাসনভুক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। নচেৎ প্রয়াগস্তম্ভ-লিপিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সহিত মগধের সম্বন্ধ লিপিবদ্ধ থাকিত। প্রবীণ ঐতিহাসিক ডাঃ ফ্লিট্ মহোদয়ও সন্দেহ সহকারে মনে করিয়াছিলেন (৭) ডবাক নামটি বর্ত্তমান "ঢাকা" নামের পূর্ব্বরূপ হইতে পারে কি না? ডবাক "ঢাকা" নামের পূর্ব্ব-রূপ না হইলেও মনে হয়, কামরূপের দক্ষিণের ও সমতটের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের

(৫) গৌড়রাজ মালা—৪পৃষ্ঠা।

(৬) J. R. A. S. 1897

(৭) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. iii, introduction, p. 9. Foot-note.

ভূবিভাগই অর্থাৎ বর্ত্তমান ময়মনসিংহ, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার অংশবিশেষ লইয়াই সেকালে "ডবাক" প্রদেশের সীমা ধার্য্য করিতে হইবে। ইউয়ান্ চোয়াঙ্ কর্ত্তৃক উল্লিখিত শ্রীক্ষেত্র, কমলাঙ্ক প্রভৃতি দেশগুলিই বোধ হয় সমুদ্রগুপ্তের সময়ের ডবাক হইয়া থাকিবে। কামরূপের সীমাসম্বন্ধেও বড় মতভেদ নাই। এই তিনটি প্রত্যন্ত প্রদেশের মধ্যে গুপ্তযুগের সমতট ও ডবাক প্রদেশে যে কোন্ কোন্ রাজা সমুদ্রগুপ্তকে করদানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিয়াছেন তাঁহাদের নাম সম্প্রতি অপরিজ্ঞাত থাকিলেও ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। কারণ, এই সময়েরই কামরূপ নরপতির নাম কালে আবিষ্কৃত হইতে পারিবে, তাহার আশাও ত ছিল না। অথচ শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড গ্রামে আবিষ্কৃত সপ্তম-শতাব্দীর কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে আমরা গুপ্তযুগের কামরূপরাজগণের অন্ততঃ নামগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতিপুরুষের রাজ্য-কাল প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর-ব্যাপী ধরিয়া লইয়া অনুমান করিলে দেখা যায় যে, ভাস্করবর্ম্মার ঊর্দ্ধতন দশম বা একাদশ রাজা অর্থাৎ মহারাজ সমুদ্রবর্ম্মা বা পুষ্যবর্ম্মাই গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক প্রত্যন্ত-কামরূপ-প্রদেশের স্বাধীন নরপতি ছিলেন। এই কামরূপেশ্বর সমুদ্রবর্ম্মার যেরূপ বর্ণনা পঞ্চখণ্ড তাম্রশাসনে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি যে অকাতরে গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্তকে রত্নাদি দ্বারা তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন তাহার সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। তথায় সমুদ্রবর্ম্মা এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়া-ছেন—

মাৎস(ন্য) ন্যায় বিরহিত [ঃ] প্রকাশরত্নঃ স্বতো দ্বিজৈরর্থ-লভ্য [ঃ]।
পঞ্চম ইব হি সমুদ্রঃ, সমুদ্রবর্ম্মাভবত্ নৃ(পঃ)

সমুদ্র সংখ্যায় চারিটি—এই জন্য কবি সমুদ্রবর্ম্মাকে পঞ্চম সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সমুদ্রের ন্যায় তিনিও "প্রকাশ রত্ন"—অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। সুতরাং সম্রাটকে অর্থদ্বারা তুষ্ট করিবার রত্নের অভাব তাঁহার কখনও ছিল না। "সমুদ্র" হইলেও তিনি মাৎস্য-ন্যায়-বিরহিত—অর্থাৎ প্রজার প্রতি অত্যাচার-বিরহিত। বাঙ্গালার সমতট ও ডবাক প্রদেশের এবং কামরূপ প্রদেশের রাজন্য—"সর্ব্বকরদান—আজ্ঞাকরণ প্রণাম-আগমন" দ্বারা সম্রাটকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সমুদ্রগুপ্ত তাহাদের দেশ স্বসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া, প্রণামাঞ্জলি এবং

রত্নরাজি উপহাররূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বদিকে প্রত্যন্ত নৃপতি-রূপে স্বরাজ্য চালাইবার অনুমতি প্রদান করিয়া থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুতর প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে প্রয়াসী হইতেছি। মহাকবি কালিদাসের বর্ণিত রঘুর দিগ্বিজয়-কাহিনী কোন্ আদর্শে রচিত হইয়াছিল? প্রাচ্য—প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ যে যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কালিদাসের অভ্যুদয়-কাল সমুদ্রগুপ্ত-পুত্র-দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্তের সময়ে;—এমন কি তৎপুত্র কুমার-গুপ্তের ও তৎপুত্র স্কন্দগুপ্তের সময়েও নির্দ্দিষ্ট করিতে চাহিয়াছেন—তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে করা যাইবে না। কবি কালিদাস রামের পূর্ব্ব-পুরুষ রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায়, সমসাময়িক দেশের ও জাতির পরিচয় নিজ কাব্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কালিদাসের আবির্ভাবের বহু-পূর্ব্বে রচিত রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থে ভারতের নানা প্রদেশের যেরূপ ভৌগোলিক ও জাতিবিষয়ক বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কবি প্রয়োজন সত্ত্বেও সেই সকল প্রদেশের ও জাতির মধ্যে অনেক গুলির নাম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যে সকল দেশ ও জাতির সহিত রঘুর কোনরূপ সম্পর্ক থাকিবার কথা নাই, তাহাদের নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া মনে হয়, কবি নিজ কালের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও দিগ্বিজয়-কাহিনী (৮) অনুসরণ করিয়া রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিতে পারেন। সে নরপতি কোন্ নরপতি? (৯) ডাঃ হরণলির মতে সে নরপতি যশোধর্ম্ম-বিক্রমাদিত্য। (১০) ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে তিনি সম্রাট স্কন্দগুপ্ত। কিন্তু হরিষেণের প্রশস্তি ও রঘুবংশের চতুর্থসর্গ একত্র পাঠ করিলে উভয়ের মধ্যে ভাবের, ভাষার, অর্থের ও বিষয়ের আনুরূপ্য দেখিয়া মনে হয় কালিদাস বর্ণিত রঘুর দিগ্বিজয়, হরিষেণ-বর্ণিত সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের আদর্শে লিখিত হইয়া থাকিবে।

রঘু সর্ব্বপ্রথম প্রাচ্য ভারত জয় করিবার জন্য স্বরাজ্য হইতে পূর্ব্ব-সাগর-গামিনী সেনা লইয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয় পথও তিনটি কারণে পরিষ্কৃত হইয়াছিল। (১) তিনি কোন কোন দেশের নরপতিকে নিজ চরণপ্রান্তে ঐশ্বর্য্য পুরস্কার দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; (২) কোন

(৮) Dacca Review, june, 1913
(৯) J. R. A. S. 1909
(১০) Ibid

কোন দেশের নরপতিকে তিনি স্বস্থান হইতে উৎখাত করিয়াছিলেন, (৩) আবার কোন কোন দেশের নরপতিকে তিনি বহুধা রণে পরাভূত করিয়াছিলেন যথা—(১১)

"ত্যাজিতৈঃ ফলমুৎখাতৈঃ ভগ্নৈশ্চ বহুধা নৃপৈঃ।

তস্যাসীদুল্বণো মার্গঃ পাদপৈরিব দন্তিনঃ॥

হরিষেণ-প্রশস্তি হইতে, সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধেও আমরা প্রায় তদ্রূপ বর্ণনাই প্রাপ্ত হইয়াছি। তদীয় দিগ্বিজয়কেও রাজনীতিক সম্বন্ধ হিসাবে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) দক্ষিণাপথের কোসল-কেরল কাঞ্চী কুস্তলপুরক মহাকান্তার বেঙ্গী প্রভৃতি প্রদেশের রাজগণকে তিনি সংগ্রামে বন্দী করিয়াও তাঁহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে আত্মপ্রভাব অধিকতর বিস্তার করিয়াছিলেন। (২) আর্য্যাবর্ত্তের রুদ্রদেব-নাগদত্ত-নন্দি নাগসেন অচ্যুত বলবর্ম্ম প্রভৃতি রাজগণকে তিনি সমরে সমূলে উন্মূলিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য স্বসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং বিন্ধ্যাটবী প্রদেশস্থ রাজগণকেও নিজ পরিচারকরূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের উক্ত রাজগণের প্রদেশগুলিকে তিনি মগধের অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আপন অপরোক্ষ শাসনের অধীন করিয়া লইয়াছিলেন। (৩) অতিদূরবর্ত্তী সিংহলাদি দ্বীপের রাজগণকে এবং সাহি—সাহানুসাহি শক মুরুণ্ডাদি দূরদেশস্থিত অন্যান্য রাজগণকে সংগ্রামে পরাজিত না করিয়াও তাঁহাদিগকে আত্মনিবেদন, কন্যাদান অর্থদান, বা নিজ নিজ বিষয় ভোগের জন্য সম্রাট পাদমূলে "গরুত্মদঙ্ক" শাসনের ভিক্ষা প্রভৃতি তুষ্টি-সাধনোপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, এবং (৪) মালবাদি জাতি ও প্রাচ্যভারতের সমতটাদি দেশের রাজগণকে স্ব স্ব দেশে স্বাধীনভাবে থাকিতে দিয়া তাঁহাদের প্রণামাঞ্জলি ও অর্থদান লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রঘুও অনেক প্রাচ্য জনপদ আক্রমণ করিয়া তত্তৎ জনপদের নরপতিগণকে পরাভূত করিয়া তাঁহাদের শাসিত রাজ্য নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যে যে নরপাল উদ্ধত্য প্রকাশ করেন নাই তাঁহারা রঘুর অনুগ্রহে স্বরাজ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। অনম্রগণের মধ্যেও রঘুর নিকট সুহ্মদেশীয়গণ অর্থাৎ বাঙ্গালার রাঢ়দেশবাসিগণ) বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। নৌবল-

(১১) রঘুবংশ ৪।১৩

বলীয়ান বঙ্গদেশের রাজগণ নৌ-সাধন লইয়া রঘুর বিরুদ্ধে সন্নদ্ধ হইলেও রঘু প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে উৎখাত করিয়া গঙ্গার দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াও, পরে বঙ্গনৃপতিগণ [অর্থাৎ সমতট রাজগণ] বিজীগিষুর পাদপদ্ম-তলে প্রণতি বিজ্ঞাপন করিয়া অর্ঘদানে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করায়, তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন যথা (১২)

অনম্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুস্তস্মাং সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোত্থতান্।
নিচখানে জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥
আপাদ-পদ্ম-প্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ॥

এই ত রঘুর সহিত বঙ্গের ও সুহ্মের সম্বন্ধ। সমুদ্রগুপ্তের সহিত বঙ্গের বা সমতটের কি সম্বন্ধ ছিল তাহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সমতট-রাজ অর্ঘ-দান ও প্রণামাদি দ্বারা গুপ্তরাজকে তুষ্ট করিয়া গুপ্ত প্রভাব মান্য করিয়া চলিতেন। পূর্ব্বদিকের জয়ের পর রঘু উৎকল ও কলিঙ্গ জয় করিয়া দক্ষিণের ও পশ্চিমের রাজগণকে সমরে পরাজিত করিয়া উত্তর পশ্চিমস্থ হূণ্, কাম্বোজ, যবন প্রভৃতি অনার্য্য জাতির সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তৎপর উত্তর দিক দিয়া অগ্রসর হইয়া লৌহিত্য [ব্রহ্মপুত্র] নদ পার হইয়া, তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরেশ্বরকে আক্রমণ করেন। কিন্তু কামরূপাধিপতি যে গজঘটা লইয়া অন্যান্য নরপতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন, রঘুর পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি সেই গজঘটা তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া অন্যান্য রত্নরাজি দ্বারাও তাঁহার পাদার্চ্চন করিয়াছিলেন। যথা (১৩)

তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডল-বিক্রমম্।
ভেজে ভিন্ন-কটৈর্নাগৈরন্যানুপরুরোধ যৈঃ॥
কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্।
রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ্চ পাদয়োঃ॥

(১২) রঘুবংশ ৪।৩৫—৩৭

(১৩) রঘুবংশ—৪।৮৩—৮৪

সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি হইতে তাঁহার সময়ে কামরূপাধিপতির কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার কথাও পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি রত্নরাজির উপহার ও প্রণামাদির দ্বারা সমুদ্রগুপ্তের তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন।

ভুজবলে দিগ্বিজয় করিয়া সমুদ্রগুপ্ত যে বিপুল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইলে, কালিদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবি ভাসের রচিত নাটকাবলির ভরতবাক্যটি স্বতঃই মনে উদিত হয়। যথা (১৪)

"ইমাং সাগরপর্য্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাম্।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ॥"

পূর্ব্ব-পশ্চিম-সাগর-পর্য্যন্ত বিস্তৃত, হিমাচল বিন্ধ্যগিরির মধ্যস্থিত, আত্মপ্রতিষ্ঠিত আর্য্যাবর্ত্ত সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া, সমুদ্রগুপ্ত চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে পরলোক গমন করেন। তৎপরে, তদীয় পুত্র ইতিহাসে ও জনশ্রুতিতে বিক্রমাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতৃ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত বহু পুত্রমধ্যে পিতৃপ্রবর্ত্তিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া, চন্দ্রগুপ্তকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ের অনেকগুলি প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায়, তাঁহার রাজ্যকাল সম্যক ভাবেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তিনি ৪১৩ বা ৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুপ্তসংবৎ ৮২ অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪০১—৪০২ সংবৎসরে এই গুপ্ত সম্রাটের কোন সামন্ত নরপাল কর্ত্তৃক বিহিত "দেয়ধর্ম্মের" কথা, (১৫) মধ্যভারতের উদয়গিরির গুহাতে ক্ষোদিত পাওয়া গিয়াছে। ৯৩ গুপ্তাব্দ সম্বলিত (১৬) সাঁচিতে আবিষ্কৃত অপর একটি প্রস্তর-লিপি হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, "চন্দ্রগুপ্ত-পাদপ্রসাদে-আপ্যায়িত-জীবিত-সাধন" ও "অনেক সমরে অবাপ্ত-বিজয় যশঃ-পতাক" আম্রকার্দ্দব নামক কোনও উচ্চ শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী ঈশ্বরবাসক নামক একটি স্থান ও ভিক্ষুগণের ভোজনের ও রত্নগৃহের প্রদীপের জন্য পঞ্চবিংশতি দীনার মুদ্রা, এক মহাবিহারবাসী "আর্য্যসঙ্ঘকে" (১৭) প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ সিন্ধিয়ার রাজ্যে অবস্থিত সেই উদয়গিরির অপর একটি গুহা-লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে "অন্বয় প্রাপ্ত-সাচিব্য" অর্থাৎ বংশানুক্রমাগত-সচীব-পদ-

(১৪) ভাস-রচিত; "স্বপ্ন-বাসবদত্ত" নাটক। ষষ্ঠাঙ্ক।

(১৫) Fleet's Gupta Inscriptions, No 3

(১৬) Ibid, No 5.

(১৭) Ibid, No 6.

ধারী সান্ধিবিগ্রহিক পাটলিপুত্র-নিবাসী বীরসেন-নামা মন্ত্রী ভগবান শম্ভুর নামে সেই গুহাটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই লিপি পাঠে একটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্তও জানা যাইতে পারে। মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত "কৃৎস্ন-পৃথ্বী-জয়ার্থে" অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর বিজয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া; রাজধানী পাটলিপুত্র-নগর হইতে সেনা লইয়া বহির্গত হইবার সময়ে, মন্ত্রী বীরসেনকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তিনি যে পশ্চিম দিকে মালব, গুজরাট, ও সুরাষ্ট্র পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সেই সেই দেশে বহুকাল যাবৎ শাসন-পরিচালন ব্রতী সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রগণকে পরাভূত করিয়া সেই সেই দেশ স্বসাম্রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই তাহা সুবিদিত। তবে কি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই দিগ্বিজয় যাত্রার সময়েই প্রাচ্য ভারতেও অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং গুপ্ত-প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষায় উত্থিত বঙ্গবাসিগণকে সম্মুখ-সমরে পরাস্ত করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের মীমাংসায়ও অনেক গোলযোগ আছে—কারণ, মেহরৌলির লৌহস্তম্ভে (১৮) প্রাচীন গুপ্তাক্ষরে উৎকীর্ণ যে লিপি হইতে আমরা চন্দ্র-নামক কোনও নরপতির বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশ জয় করিবার কথা অবগত হইতে পারিয়াছি, সেই লিপিতে উল্লিখিত "চন্দ্রনরপতি" দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কি না, তদ্বিষয়ে পণ্ডিতসমাজে অদ্যাপি তর্কের অবসান হয় নাই। হরণ্লি স্মিথ-প্রমুখ প্রধান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেন যে এই চন্দ্রকে প্রথমতঃ বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তই মনে করিয়াছিলেন, কেনই বা সম্প্রতি স্মিথ সাহেব মহোদয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর, তৎপাঠে স্বমত পরিবর্ত্তন (১৯) করিয়া এই চন্দ্রকে গুপ্তযুগেরই প্রথমভাগে বর্ত্তমান রাজপুতনার পোকর্ণ [পুষ্করণ] নগরের চন্দ্রবর্ম্মরূপে ধার্য্য করিতে চাহেন, কেনই বা বৃদ্ধ ঐতিহাসিক ফ্লিট সাহেবের মতানুসরণ করিয়া, "ভারতীয় মুদ্রামালার" সংকলয়িতা এল্যান (২০) প্রভৃতি মনীষিগণ এই চন্দ্রকে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং কেনই বা শাস্ত্রী মহাশয় ও সিদ্ধান্তবারিধি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শুশুনিয়া পর্ব্বতের লিপিতে উল্লিখিত চন্দ্রবর্ম্মাকে ও এই লৌহস্তম্ভলিপির "চন্দ্রকে"

(১৮) Fleet's Gupta Inscriptions—no 32.

(১৯) Early history of India, 3rd. Edition

(২০) Catalogue of Indian Coins, Gupta Dynasties, Introduction, pp xxxvi-xxxviii

একই ব্যক্তি মনে করেন—তাহার বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে চলিতে পারে না। সে যাহা হউক, প্রাচীন গুপ্তযুগের বিষ্ণুভাবনা-পরায়ণ চন্দ্রনামক কোনও ভূমিপতি [তিনি মগধরাজই হউন বা গোকর্ণনগরের অধিপতিই হউন] ভগবান বিষ্ণুর ধ্বজারূপে এই লৌহস্তম্ভ উত্তোলিত করাইয়াছিলেন। "চন্দ্র" বঙ্গদেশে গেলে পর, তদ্দেশীয়গণ সমবেত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি আত্মপরাক্রমে তাহাদিগকে প্রতিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি,সিন্ধুর সপ্তমুখও উত্তীর্ণ হইয়া বাহ্লিকদেশবাসিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং দক্ষিণেও সমুদ্রকে নিজ পরাক্রম-বায়ুতে সৌগন্ধ যুক্ত করিয়াছিলেন। যথা,

যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্
বঙ্গেষ্বাহব-বর্ত্তিনো ভিলিখিতা খড্গেন কীর্ত্তির্ভুজে।
তীর্ত্বা সপ্ত মুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জ্জিতা বাহ্লিকা
যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্য্যানিলৈর্দ্দক্ষিণঃ॥

বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক শাসনাবলীতে "দীনার" নামক মুদ্রার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন রোম রাজ্যে ব্যবহৃত দিনেরিয়াস (Lat Denarius) মুদ্রার নামের সহিত, ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না তাহা বলা যায় না। কাত্যায়ন ও বৃহস্পতির মতে প্রতি "দীনার" মুদ্রার মূল্য ৪২ তাম্রকার্ষিক পণ অর্থাৎ প্রায় আধুনিক আড়াই টাকা। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে এই দীনার মুদ্রা ভারতবর্ষে প্রথমতঃ কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর মহাকবি ও আলঙ্কারিক দণ্ডী তাঁহার "দশকুমার চরিতে" দীনার মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—(২১)

"দীনারানসংখ্যান্ রাশীকৃত্য" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য সময়েই চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হায়েন [৪০৫-৪১১ খৃঃ অব্দ] প্রাচ্য ভারতে ভ্রমণ করিতে করিতে সুহ্ম দেশের রাজধানী, সেকালের প্রধান বন্দর তাম্রলিপি নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দণ্ডীর দশকুমার চরিতেও এই নগরটি উল্লিখিত আছে। যথা (২২)

"সুহ্মেষু দামলিপ্তাহ্বয়স্য নগরস্য" ইত্যাদি।

দামলিপ্ত ও তাম্রলিপ্ত একই স্থান বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। উড়িষ্যার-নাতিপূর্ব্বোত্তরে বাঙ্গালার সুহ্মদেশ। তাহারই রাজধানী ছিল

(২১) দশকুমার-চরিতম্—পূর্ব্ব-পীঠিকা, চতুর্থ উচ্ছ্বাস।
(২২) ঐ —পূর্ব্বপীঠিকা, ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী কপিলা-তীরে তাম্রলিপ্তি-নগর। বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যয়নে পরিব্রাজক এত নিবিষ্টমনা ছিলেন যে, তাম্রলিপ্তির রাজার নামোল্লেখের কথা দূরে থাকুক, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট মগধনাথ চন্দ্রগুপ্তের নাম পর্য্যন্ত, তিনি নিজ ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সংযোজিত করেন নাই। সমস্ত রাজ্য সর্ব্ব বিষয়ে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও সুশাসিত ছিল, এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ব্যতীত তাঁহার রচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে আর অধিক কিছু জানা যায় নাই। গুপ্তযুগের মুদ্রায় অঙ্কিত চিহ্নাদি ও শাসনাদিতে উল্লিখিত বিষয়ের মর্ম্ম হইতে, এই যুগে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব কমিয়া আসিতেছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্রাটগণও নিজকে 'পরম-ভাগবত' বলিয়া সর্ব্বত্র উল্লেখ করিয়াছেন—দুর্গা, শার্ঙ্গী, কার্ত্তিকেয়, শম্ভু প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার উদ্দেশে দানাদির উল্লেখ দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় যে, বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্মের যেরূপ প্রাধান্যের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বিনা পক্ষপাতে লিখেন নাই। সর্ব্বত্র তিনি বৌদ্ধ বিহারাদির পরিদর্শন করিয়াই সময়াতিপাত করিয়া থাকিবেন, সর্ব্ব-সাধারণের অবস্থার দিকে বড় একটা লক্ষ্য করেন নাই। রাজধানী পাটলি-পুত্র নগরের সমৃদ্ধি দেখিয়া, গয়ায় আসিয়া তিনি বৌদ্ধদের এই পরম পবিত্র স্থানকে জঙ্গলময় দেখিতে পাইয়াছিলেন। তৎপর গঙ্গার দক্ষিণ কূলবর্ত্তিনী অঙ্গরাজধানী চম্পানগরী পরিদর্শন করিয়া তিনি সুহ্মদেশের তাম্রলিপ্তিনামক বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই নগরে তিনি ভিক্ষুগণ পরিপূর্ণ ২১টি বৌদ্ধবিহার দেখিতে পান। তিনি লিখিয়াছেন, "বৌদ্ধধর্ম্মও এই স্থানে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল।" ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব থাকাও বুঝা যাইতে পারে। এই নগরে দুই বৎসর কাল বাস করিয়া তিনি বৌদ্ধ ত্রিপিটকের যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রতি-লিপি প্রস্তুত করণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রতিমার চিত্রাঙ্কণেও তিনি অনেক সময় কাটাইয়াছিলেন। এই "প্রতিমা" শব্দ হইতে আমরা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের দেবদেবীর মূর্ত্তি চিত্রই কেবল বুঝিব না। কারণ—পাটলিপুত্র নগরে প্রতি বৎসর দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে সুবর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্যাদি দ্বারা বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া জনসমাজ তাহা লইয়া এক উৎসব যাত্রা [মিছিল] বাহির করিত এই কথা পরিব্রাজকই (২৩) নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে

(২৩) Legge—Travels of Fa-Hien—Chap xxvii. p, 79.

উল্লেখ করিয়াছেন পূর্ব্ব-ভারতের বাণিজ্যের কেন্দ্র তাম্রলিপ্তি নগর হইতে চৈনিক পরিব্রাজক বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়া, রাত্রি দিন সমানভাবে জাহাজ চালাইয়া চতুর্দ্দশ দিবসের পর, সিংহল দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন। গুপ্তযুগে পশ্চিমে সুরাষ্ট্রের ভৃগু কচ্ছ নগর ও পূর্ব্বে সুহ্মের তাম্রলিপ্তি নগর—এই দুইটিই উত্তরাপথের প্রধান বন্দর ছিল। এবং সেকালে সমুদ্রযাত্রার এই দুইটিই প্রধান পথ ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গুপ্তযুগেরই কবি কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে "চীনাংশুক" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইতেও সেকালের সহিত বাঙ্গালার তাম্রলিপ্তি নগর দিয়া সুদূর চীন প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

বিক্রমাদিত্য—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর, মহেন্দ্রাদিত্য উপাধিক প্রথম-কুমারগুপ্ত ৪১৩।৪১৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১৭ গুপ্তাব্দ সংবলিত, ফৈজাবাদ জেলাতে অবস্থিত, একটি শিবলিঙ্গের গাত্রে ক্ষোদিত লিপি (২৪) হইতে জানা গিয়াছে যে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী "কুমারামাত্য" পদবীক শিখর-স্বামীর পুত্র, "কুমারামাত্য" পদবীক মন্ত্রী পৃথিবীসেন, মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক "মহাবলাধিকৃত" [সেনানায়ক] রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোন কোন বংশে যে মন্ত্রী প্রভৃতির পদও পুরুষানুক্রমে প্রচলিত থাকিত, তাহার প্রমাণ কেবল গুপ্তযুগে কেন পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালার পালরাজগণের সময়েও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। লাট [গুজরাট] দেশীয় পট্টতন্তুবায়গণের অবস্থা কিরূপ সমৃদ্ধযুক্ত ছিল, তাহার কিছু পরিচয় কুমারগুপ্তের ও তদীয় বন্ধ [সম্রাট নিযুক্ত মালবের দশপুর-নগরীর শাসনকর্ত্তা বন্ধুবর্ম্মার নামাঙ্কিত একটি দীর্ঘ প্রস্তর লিপি (২৫) হইতে জানিতে পারা গিয়াছে। ভৃগু-কচ্ছ বন্দর দিয়া লাট-দেশীয় পট্টবায়গণের প্রস্তুত পট্ট-বস্ত্রাদি সমুদ্রপথে দূরবর্ত্তী দেশে রপ্তানি হইয়া যাইত। তাম্রলিপ্তির বন্দর দিয়াও হয়ত, বঙ্গীয় তন্তুবায়গণের মসলিন ও অন্যান্য "স্নিগ্ধ দুকূলাদি" দেশ-দেশান্তরে রপ্তানি হইত।

ভারতের নানা স্থানে কুমার-গুপ্ত-নামাঙ্কিত মুদ্রার ও তদীয় রাজ্য-সংবৎ-সংবলিত তাম্রশাসনাদির আবিষ্কার হইতে অনুমিত হইতে পারে যে, তিনি পিতৃরাজ্য প্রথমতঃ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। তদীয়—নামাঙ্কিত

(২৪) Epigraphia Indica Vol X- p. 70 ff.
(২৫) Fleet's Gupta Inscriptions. No. 18.

অশ্বমেধ-যজ্ঞ-চিত্র সমন্বিত সুবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায়, বলা যাইতে পারে যে, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়াছিলেন। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমার-গুপ্তের [১১৩ গুপ্তাব্দের] বিজয়-রাজ্য-সংবৎ-সংবলিত একখণ্ড অতি জীর্ণ তাম্রশাসন উত্তরবঙ্গের এই রাজসাহী জেলায়ই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নাটোর মহকুমার অন্তর্গত খলিসাডাঙ্গা নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্ত্তী ধানাইদহ নামক গ্রামে প্রায় পনর শত বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন গুপ্তাক্ষরে উৎকীর্ণ এই লিপিখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই স্থানের জমীদার মৌলবী এর্সাদ আলি খাঁ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার এক প্রজার নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয়ের চেষ্টাতে এই তাম্রশাসনখানি বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির অধিকারে আসিয়াছে এবং ইহা সমিতির সংগৃহীত কীর্ত্তি-কলাপের অন্যতমরূপে সমিতির প্রতিমা-মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে। ভারতবর্ষে এযাবৎ আবিষ্কৃত ভূমিদান-বিষয়ক তাম্রশাসনাবলীর মধ্যে কুমারগুপ্তের সময়ের এই তাম্রশাসনখানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রত্নতত্ত্ব-পারদর্শী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় অক্ষয়বাবুর অনুমতি লইয়া এই তাম্রশাসনের একটি পাঠ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (২৬) ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ লেখা প্রসঙ্গে, মূল শাসনের সহিত বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠ মিলাইতে গিয়া দেখা গেল যে, তাঁহার পাঠ সর্ব্বাংশে মূলানুগত হয় নাই। বামদিক হইতে মূল শাসন-খণ্ডের প্রায় এক তৃতীয়াংশ খসিয়া পড়ায় এবং তাম্রপট্টখানির জীর্ণতা হেতু অক্ষরগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়া যাওয়ায়, পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যাকার্য্য কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যাহা হউক, তাহা প্রবন্ধান্তরে সমালোচিত হইতে পারিবে। বাঙ্গালার পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনে আবিষ্কৃত, গুপ্তযুগের এই প্রাচীন লিপি হইতে কি কি তথ্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহারই দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। যতদূর পাঠ উদ্ধৃত হইতে পারিয়াছে, তাহার মর্ম্ম হইতে এই অবগত হওয়া যায় যে, কোনও ব্যক্তি "মহাখুসপার বিষয়ের" মহত্তরদিগের নিকট হইতে সেই বিষয়-সম্বদ্ধ একখণ্ড ভূমি যাচ্ঞা করিয়া লইয়া কটক [রাজধানী বা সেনানিবাস]-বাস্তব্য "ছন্দোগ-ব্রাহ্মণ" বরাহ স্বামীকে প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতিগৃহীতা "ছন্দোগ" [অর্থাৎ

(২৬) J. A. S. B., 1909 (vol v)

সামবেদাধ্যায়ী) ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই শাসনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা প্রদত্তভূমির "নীবীধর্ম্ম ক্ষয়ের" কথা। কুমারগুপ্ত পুত্র স্কন্দগুপ্তের সময়ের একটি প্রস্তর-স্তম্ভ-লিপি হইতে (২৭) আমরা একটি গ্রামক্ষেত্র "অক্ষয়-নীবী" রূপে অর্থাৎ চিরস্থায়ী দানরূপে প্রদত্ত হইবার কথা পাইয়াছি এবং ১৩১ গুপ্তাব্দ-সংবলিত সাঁচিতে আবিষ্কৃত পাষাণলিপি হইতেও (২৮) আমরা "অক্ষয় নীবী"রূপে দ্বাদশ দীনার মুদ্রা দানের বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দ্বাদশ দীনার মুদ্রার বৃদ্ধি (সুদ) হইতে প্রতিদিন একটি একটি ভিক্ষুর ভোজনকার্য্য সম্পাদিত হইত। ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, মূলধনের নাশ হইতে পারিবে না—ইহাই দাতার ইচ্ছা। ভূমিদান সম্বন্ধে আমরা "অক্ষয় নীবী" শব্দে কি বুঝিব? প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণপ্রদত্ত ভূমির আয় প্রত্যায়ের যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারিবেন মাত্র; কিন্তু মূল ভূমিটী কোনরূপে হস্তান্তরিত বা তাহা বিক্রয় করিয়া "নীবী ধর্ম্মের" নাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ধানাইদহ তাম্রশাসনে ব্যবহৃত "নীবীধর্ম্মক্ষয় মালভ্য" এই শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে যে দাতা বা দাতৃগণপ্রদত্ত ভূমিখণ্ডের এইরূপ ধর্ম্মনষ্ট করিয়াই প্রদান করিয়া থাকিবেন, এবং প্রতিগ্রহীতা তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন। কুমারগুপ্তের সাম্রাজ্যের সীমা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহার প্রমাণরূপে আমরা মান্দাসোর লিপির প্রশস্তির নিম্নোক্ত শ্লোকটি হইতে অনুমান করিয়া লইতে পারি, যথা—

চতুঃসমুদ্রান্ত-বিলোল মেখলাং
সুমেরু কৈলাস বৃহৎ পয়োধরাম্।
বনান্ত-বান্তস্ফুট-পুষ্পহাসিনীং
কুমারগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি।

কুমার-গুপ্তের রাজ্য সময়ে ধ্রুবশর্ম্মনামক কোনও ব্যক্তি কার্ত্তিকেয়ের এক মন্দিরে প্রতলী-নির্ম্মাণ, সত্র স্থাপন ও প্রস্তর স্তম্ভোৎস্থাপন কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। সম্রাটের প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রায় গরুড়ের পরিবর্ত্তে কার্ত্তিকেয়-বাহন ময়ূরের চিত্রই অঙ্কিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে কুমার-গুপ্তের সময়ে কুমার-পূজার প্রচলন থাকা অনুমিত হইতে পারে। বুঝি বা সেই জন্যই মহারাজ-পুত্রের নামও "স্কন্দ-গুপ্ত" রাখা হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ প্রথম

---

(২৭) Fleet's Gupta Inscription, No 12.
(২৮) Fleet's Gupta Inscriptions No 62
(২৯) Fleet's Gupta Inscription - No 18

কুমারগুপ্ত দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগের পর শেষজীবনে রাজ্য-লক্ষ্মীকে বিচলিত অবস্থায় রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। তৎপর পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে [আনুমানিক ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে] তদীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী পিতৃ-পরিণত-পাদ-পদ্ম-বর্ত্তী প্রথিত-যশাঃ ভুজবলদৃপ্ত গুপ্তবংশৈকবীর মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্ত সমাজ্য প্রাপ্ত হন। "বংশলক্ষ্মীকে বিপ্লুত দেখিয়া তিনি ভুজবলে শত্রুগণের পরাজয়-সাধন করিবার জন্য রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। পরাক্রমে ও অর্থে বলীয়ান পুষ্যমিত্র নামক এক জাতির এবং পশ্চিমে হূনগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে সমরে পরাভূত করিয়া, তিনি বিনয়, বল, সুনীতি এবং বিক্রম অবলম্বন করিয়া পুনরায় পিতৃরাজ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জুনাগড়ের পর্ব্বতগাত্রক্ষোদিত লিপি (৩০) হইতে জানা যায় যে তিনি হূণ ম্লেচ্ছ-গণের দেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া রিপুকুলের দর্প আমূল ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। পিতৃরাজ্য "অনধিকৃত-বিলুপ্ত" না হয়—এই জন্য স্কন্দগুপ্ত "স্বস্থনিরভিলাষ" হইয়া "বিচলিতকুল লক্ষ্মীকে" দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চেষ্টার ত্রুটি করিয়া-ছিলেন না। শত্রুজয়ে বিনির্গত হইয়া তিনি কষ্ট সহিষ্ণুতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের সময়ে, তিনি এক নিশাথে ক্ষিতিতলে শয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যথা, (৩১)

"বিচলিত কুললক্ষ্মী-স্তম্ভনায়োদ্যতেন
ক্ষিতিতল-শয়নীয়ে যেন নীতা ত্রিযামা।"

শত্রুগণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তিনি, স্বরাজ্যের সুশাসনের জন্য----

"সর্ব্বেষু দেশেষু বিধায় গোপ্তৃন্। (৩২)

সকল প্রদেশে উপযুক্ত "গোপ্তা" বা শাসয়িতা নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। পশ্চিমে সুরাষ্ট্র দেশ পালনের জন্য তিনি বহু-গুণান্বিত মনে করিয়া পর্ণদত্ত-নামক এক রাজ্য-ভারোদ্বহন-সমর্থ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া সুস্থ হইতে পারিয়া-ছিলেন। অন্য একটি লিপিতে (৩৩) স্কন্দগুপ্ত "ক্ষিতিপ শত-পতি" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। পূর্ব্বদিকেও তাঁহাকে দেশ রক্ষার্থে, উপযুক্ত "গোপ্তার" নির্ব্বাচন করিয়া, কাহাকেও সামন্তরাজরূপে নিযুক্ত করিতে হইয়া ছিল কি না, তাহা

(৩০) Fleet's Gupta Inscriptions—No 14.

(৩১) Ibid—No 13.

(৩২) Fleet's Gupta Inscriptions—No 14.

(৩৩) Ibid—No 15

জানিতে পারা যায় নাই। কুমারগুপ্তের রাজ্যের শেষভাগে সাম্রাজ্যের যে দুঃসময়ের সূচনা হওয়ায়, পুত্রকে বিচলিত রাজ্যলক্ষ্মীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে বাঙ্গালার সহিত মগধের কিরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল তাহার প্রমাণাভাব। তবে ৪৬৫-৬৬ খৃঃ অব্দের (৩৪) এবং ৪৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের লিপি (৩৫) হইতে অবগত হওয়া যায় যে স্কন্দগুপ্তের বিজয় রাজ্য উত্তরোত্তর অভিবর্দ্ধমান ছিল। ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ষ্টেপলটন্ সাহেব মহোদয় ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড় নামক স্থানে স্কন্দগুপ্তের নামাঙ্কিত মুদ্রার ও ঢাকানগরে পিলখানার নিকটে ও ফরিদপুরের সেই কোটালি-পাড়াতেই গুপ্তরাজগণের সময়ে ব্যবহৃত ঢঙ্গের মুদ্রার ন্যায় মুদ্রার আবিষ্কারের সংবাদ প্রদান করিয়া (৩৬) বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। মনে হয় পূর্ব্বাঞ্চলের সামন্তগণের সহিত স্কন্দগুপ্তের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণই ছিল, অর্থাৎ বঙ্গের রাজগণ এই সময়েও গুপ্তপ্রভাব মানিয়া লইয়া স্বরাজ্যে স্বাধীন ছিলেন। আনুমানিক ৪৮০ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্ত দেবত্ব লাভ করেন। তিনি আত্ম পরাক্রমে হূণদিগের আক্রমণ হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেও তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম কুমার-গুপ্তের অপর পুত্র, পুরগুপ্তের সময় হইতে হয়ত বা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগ হইতেই পশ্চিমাঞ্চলে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের প্রতিপত্তির হ্রাস হইতে থাকে। কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলে কেবল মগধ ও তৎসন্নিহিত দেশসমূহ পুরগুপ্তের অপরোক্ষ শাসনের অধীন ছিল। পুরগুপ্তের পরেও মূলবংশের আরও দুই পুরুষ মগধ সাম্রাজ্য পূর্ব্ববৎ প্রচলিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম পুরগুপ্ত-পুত্র নালন্দ বিহারে ইষ্টকনির্ম্মিত ৩০০ ফুট উচ্চ বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নরসিংহ-গুপ্ত-বালাদিত্য ও তৎপর তদীয় পুত্র দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত। এই দ্বিতীয় কুমার গুপ্তই ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রাজ্য পরিচালন করিয়া প্রাচীন গুপ্তবংশীয়গণ কর্ত্তৃক মগধ-সাম্রাজ্য-শাসন-কার্য্যের অবসান আনয়ন করেন।

মগধরাজ নরসিংহ গুপ্ত-বালাদিত্য ও উজ্জয়িনীর যশোধর্ম্মনামা নরপতি তোরামানের পুত্র হূণাধিপ মিহিরকুলকে পরাভূত করিয়া হূণগণের দর্প খর্ব্ব করিয়া দিয়া, ভারতবর্ষকে তাহাদের অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বহুপূর্ব্বকাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্যতার সম্মুখে অসভ্য জাতির

(৩৪) Ibid --No 16.

(৩৫) Ibid --No 66.

(৩৬) J. A. S. B.--1910 (vol V).

প্রতিষ্ঠিত রাজ্য যে বহুকাল বর্ত্তমান থাকিতে পারে না তাহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। কাজেই তোরামান প্রতিষ্ঠিত হূণরাজ্য অচিরেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। নরসিংহগুপ্ত ও যশোধর্ম্মের সমবেত চেষ্টায়,বা বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকের পৃথক্ চেষ্টায় মিহিরকুল পরাভূত হইয়াছিলেন কি না ; এই বিষয়টি এবং এই বিষয়-সম্বন্ধীয় প্রাচীন লিপির অর্থ লইয়া পণ্ডিতগণ তর্কক্ষেত্র হইতে অদ্য পর্য্যন্তও অবসর লইতে পারেন নাই। ইউয়ান্ চোয়াঙের ও পরমার্থের বর্ণিত বৃত্তান্ত হইতে এইরূপ একটি মীমাংসা হইতে পারে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে, মগধরাজ বালাদিত্য-নরসিংহ, সম্ভবতঃ মিহিরকুলের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমতঃ তাহাকে অনেকটা পরাভূত করিয়া থাকিবেন ; এবং কিছুকাল পরে, মালবরাজ যশোধর্ম্ম মিহিরকুলকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া হূণরাজকে "চূড়াপুষ্পোহার" দ্বারা নিজ পাদযুগলের অর্চ্চনা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মন্দোসর প্রাপ্ত যশোধর্ম্মদেবের রণস্তম্ভে উৎকীর্ণ কবি বাসুলরচিত প্রশস্তিতে মালবরাজের বাহুবলে স্বরাজ্য বিস্তারের নিরতিশয় প্রশংসা পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রশস্তিতে (৩৭) উক্ত পরাক্রমের কথা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে কোন কোন মনীষী দ্বিধা বোধ করিয়াছেন ; কিন্তু যিনি তোরামান-সাহের পুত্র মিহিরকুলকে পদরেণু চুম্বনে বাধ্য করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে গুপ্ত নরনাথগণ ও হূণাধিপগণ যে যে স্থান অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে স্বপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন তাহাতে সবিশেষ সন্দেহ করিবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রশস্তিতে আরও বর্ণিত আছে যে যশোধর্ম্ম পূর্ব্বদিকে লৌহিত্য [ব্রহ্মপুত্র] নদ দক্ষিণে মহেন্দ্রগিরি, পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র ও উত্তরে হিমাচল—এই চতুঃসীমার মধ্যস্থিত সমস্ত সামন্ত নরপালদিগকে নিজ পদতলে আনত করাইয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে, বাঙ্গালার সামন্ত নৃপতিগণকেও কিছুকালের জন্য তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। মন্দোসরের অপর প্রস্তর লিপিতেও (৩৮) উল্লিখিত আছে যে বিষ্ণুবর্দ্ধন নামক মালব রাজ প্রাচ্য [পূর্ব্বদেশীয়] ও উদীচ্য [উত্তর দেশীয়] নরপতিগণকে সন্ধিসূত্রে ও যুদ্ধে বশীভূত করিয়াছিলেন। হরণ্লি সাহেব মহোদয় এই যশোধর্ম্ম ও বিষ্ণুবর্দ্ধনকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছেন কেন—ইহা লইয়া বাদানুবাদ প্রশমিত হয় নাই। আমরাও

(৩৭) Fleet's Gupta Inscriptions—No 33-34.
(৩৮) Ibid—No 35.

তদালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া প্রবন্ধ সংক্ষত করিবার চেষ্টা করিতেছি। দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পর, গুপ্তবংশীয় একাদশ জন নরপতি, মৌখরিগণসহ রাজ্যবিভাগ করিয়া লইয়া, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাংশ পর্য্যন্ত, এমন কি শ্রীহর্ষের সাম্রাজ্য-সময়েও, রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্তাক্ষরে লিখিত চারিখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (৩৯) ধর্ম্মাদিত্য নামক মহারাজাধিরাজ-পদ-লাঞ্ছিত সম্রাটের রাজ্যের তৃতীয় সংবৎসরে, বাতভোগ নামক এক ব্যক্তি বিষয়-মহত্তর [মাতব্বর] ও গ্রাম-মহত্তরগণের নিকট হইতে "ক্ষেত্রকুল্য-বাপত্রয়" পরিমিত ক্ষেত্রখণ্ড [প্রতিকুল্য-বাপ চারি দীনার মূল্য হিসাবে] ক্রয় করিয়া ভরদ্বাজ সগোত্র বাজসনের ষড়াঙ্গাধ্যায়ী চন্দ্রস্বামি নামক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন—ইহাই প্রথম তাম্রশাসনখানির উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্মাদিত্যের রাজ্য-কালে সম্পাদিত দ্বিতীয় তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, বাসুদেব স্বামি-নামক ব্যক্তি প্রতিকুল্যবাপ দুই দীনার মূল্য হিসাবে, এক ক্ষেত্রখণ্ড একটি মহত্তরের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, লৌহিত্য সগোত্র বাজসনেয় ব্রাহ্মণ সোম-স্বামীকে প্রদান করিয়াছিলেন। তৃতীয় তাম্রশাসন মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের একোনবিংশতি রাজ্য সংবৎসরে সম্পাদিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। বৎস-পালস্বামি-নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বাঞ্চলে প্রচলিত মূল্য হিসাবে কয়েকজন ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ভূখণ্ড ক্রয় করিয়া ভট্টগোমিদত্ত স্বামি নামক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন। চতুর্থ তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে যে সুপ্রতীক-স্বামি নামক কোনও ব্রাহ্মণ মহারাজাধিরাজ সমাচার দেবের রাজ্যের চতুর্দ্দশ সংবৎসরে ব্রাহ্মণের বিহিত বলি-চরু-সত্রাদি প্রবর্ত্তনের জন্য ক্ষেত্রকুল্যবাপত্রয়-পরিমিত ভূমি বিষয়-মহত্তর ও প্রধান প্রধান ব্যবহারীর [ব্যবসায়ীর] নিকট হইতে স্ববাসের জন্য যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর বাঙ্গালার "মণ্ডল" ও "বিষয়" কিরূপে শাসিত হইত, কত প্রকার উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, ব্যক্তিগত, পরিবার গত ও সমগ্র-গ্রামবাসিগত ভূমিস্বত্ব কিরূপে নির্দ্ধারিত হইত, কি রীতিতে কোন ভূখণ্ড হস্তান্তরিত বা বিক্রীত হইতে পারিত, কি ভাবে ভূমির মূল্য নির্দ্ধারিত হইত, কিরূপে ভূমির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইত এবং চতুর্থ তাম্রশাসনে উল্লিখিত শুচি-

(৩৯) Vide Indian Autiquary, 1910 and I. A. S. B, 1910 (vol Vi) and 1911 (vol vii).

পালিত, বিহিত-ঘোষ প্রিয়-দত্ত জনার্দ্দন-কুণ্ড প্রভৃতি নামের প্রয়োগ হইতে সেকালে জাতিবাচক উপাধির ব্যবহার প্রচলিত ছিল কিনা—ইত্যাদি নানা-বিষয়ক কথা এই তাম্রশাসন চতুষ্টয়ের মর্ম্ম হইতে বারান্তরে পর্য্যালোচিত হইতে পারিবে। এই সকল তাম্রশাসনে উল্লিখিত মহারাজত্রয় কোন্ সময়ে, কি অবস্থায়, বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাও একটি তর্কসঙ্কুল বিষয়। তবে অক্ষর হিসাবে তাঁহাদিগের কাল অর্ব্বাচীন গুপ্তরাজগণের সময়েই নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়।

মগধের অর্ব্বাচীন গুপ্তরাজগণের মধ্যে সম্রাট শ্রীহর্ষের সমসাময়িক রাজা মাধবগুপ্তের পিতা মহাসেনগুপ্ত, শ্রীহর্ষেরই সমসাময়িক কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মার পিতা সুস্থিতবর্ম্মাকে সমরে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই পৌত্র মগধরাজ আদিত্যসেনের আপসড় লিপিতে (৪০) উল্লিখিত পাওয়া যায়। উত্তরা পথের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের পরলোকগমনের পর এই আদিত্য-সেনই আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট-পদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ পর্য্যন্ত সম্পাদন করিয়াছিলেন। আদিত্যসেনের পর, তদীয় পুত্র দেবগুপ্ত ও তদনন্তর তৎপুত্র বিষ্ণুগুপ্ত এবং সর্ব্বশেষে তৎপুত্র দ্বিতীয়-জীবিতগুপ্ত নামক নরপতি মগধের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন—এই ঐতিহাসিক বিবরণ দ্বিতীয়-জীবিতগুপ্তের দেববরুণার্ক প্রশস্তি (৪১) হইতে অবগত হওয়া যায়।

শ্রীহর্ষের দেবত্বলাভের পর মগধের অর্ব্বাচীন গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের সময়ে, বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলের লোকনাথ নামক এক সামন্ত নরপালের ত্রিপুরায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে, বঙ্গদেশের যেরূপ অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, আমরা "সাহিত্য" পত্রের বর্ত্তমানসালের (১৩২১) জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক সংখ্যায় তাহার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। শ্রীহর্ষের পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই অর্ব্বাচীন গুপ্তবংশীয়গণের মগধরাজ্যেরও তিরোধানের সূত্রপাত হয়। এই সঙ্গেই বঙ্গেও পুনরায় মাৎস্য-ন্যায়-যুগ উপস্থিত হয়, বসুধা অনাথা হইয়া পড়ে এবং এই বিপ্লব-যুগের অন্ধকার ভেদ করিয়াই—

"সেকালে এদেশে জনম লভিয়া পাল-কুলরবি গোপাল বীর,
অনাথ বসুধা সনাথ করিয়া নমিত করিল সকল শির।"

তখন হইতেই প্রাচ্য ভারতে গৌড়ীয় পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়।

সময়াভাবে, গুপ্তযুগের বাঙ্গালার ধর্ম্ম, সমাজ, বাণিজ্য, কথিত ভাষা ও সংস্কৃত রচনায় গৌড়ীয় রীতি ও অন্যান্য কমনীয়-কলা-কলাপ সম্বন্ধে কোন কথাই আলোচিত হইতে পারিল না। আপনাদের আশীর্ব্বাদ পাইলে, তাহা পরে আলোচিত হইতে পারিবে। ইত্যলমতি প্রসঙ্গেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

(৪০) Fleet's Gupta Inscription—No 42.
(৪১) Ibid—No 46.

ব্যাপ্তি

শৈল শিখরের শুভ্র তুষারে,
কুন্দ কুসুম মাঝে,
দিগম্বর, তব গৌর অঙ্গের
দিব্য মাধুরী রাজে!

যে নীল সুষমা নভো নিলীমায়,
মহাসাগরের বুকে,
তেমনি সুনীল আঁচলে রাধার,
তনু ঘেরিয়াছে সুখে।

সুকুমার শ্যাম নব দুর্ব্বাদল
বসুধার কলেবরে,
শ্যাম অঙ্গের ললিত হরিত
নিখিলের মন হরে!

অসিত বরণ নবীন নীরদ
সুগভীর জল ধারা,
নীরদ বরণী শিবের উরসে
ত্রিতাপ হারিণী তারা!

অরুণ বসন ব্রহ্মা প্রজাপতি,
তরুণ উষার রবি,
অরুণ অম্বরা নব বিবাহিতা
নবীনা বধূর ছবি!

ভুবন গগন জলদ সাগর
দেবতা মানব আর,
প্রেমে সুষমায় স্নেহে করুণায়
মিলে মিশে একাকার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

বঞ্চিতা।

সে বৎসর অতিরিক্ত বর্ষা পড়িয়াছিল, ভাদ্রমাস ব্যাপিয়া অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আশ্বিন মাস হইতেই আকাশের মেঘ ও বাতাসের গুমট কাটিয়া গিয়াছে। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সুশীতল বায়ুর সুখময় স্পর্শ ও তরল সোণালী রৌদ্রের শোভা মন আনন্দে অধীর করিয়া তুলে এবং স্বচ্ছ নীল প্রশান্ত আকাশের দিকে চাহিলে একটা অব্যক্ত গভীর ভাব হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করে।

এখনও পূজার দিন দশ বার বাকি আছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে শক্তি-পুরের ন্যায় ক্ষুদ্র মফস্বল সহরেও চারিদিকে আয়োজনের ব্যস্ততা দেখা দিয়াছে। ব্যবসায়ী পসারীদের নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই, শশব্যস্তে নূতন আমদানী মালে দোকান সাজাইতেছে; এদিকে প্রত্যহ খরিদ্দারের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে, বাজারে ইহারই মধ্যে চতুস্পার্শের গ্রাম্য লোকদিগের সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। সহরে যে দুই চারিজন ভদ্রলোকের বাড়িতে পূজা হইবে তাহাদের তো কথাই নাই, কর্ত্তাগৃহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া সাত বৎসরের খুকিটি পর্য্যন্ত প্রত্যূষ হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ফরমাস খাটাইতে বা খাটিতে ব্যস্ত। আমাদের সাব্‌ডিভিশনাল কাছারিগুলিতে রাত্রি পর্য্যন্ত বাতি জ্বালাইয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কারণ, যে ছুটির পূর্ব্বে হাতনাগাদ কার্য্য তুলিয়া দিতে না পারিবে তাহার ছুটি পাওয়া দুষ্কর হইবে; আমলারা নিজ নিজ দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, হাকিমশ্রেণির যে দুই চারিজন এখানে আছেন তাঁহারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে "কি হে এবার ছুটিতে কোথা যাচ্ছ" "কবে যাওয়া ঠিক করলেন", "সাহেবের হুকুম এল" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এখানে আমি ও পরেশ এই দুইজন সাব্‌ডেপুটি। ছুটিতে এক সময়ে আমাদের দুইজনের কর্ম্মস্থল হইতে অনুপস্থিতি কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। পরেশ এবার পূজার ছুটিতে বাটি যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছে সুতরাং আমাকে থাকিতে হইবে; কিন্তু চারিদিকে ব্যস্ততা ও উৎসবের আয়োজন দেখিয়া বাটি যাইবার জন্য আমার মনটা বড়ই উতলা হইয়া উঠিয়াছে; স্থির করিয়াছি আমাদের সাব্‌ ডিভিশনাল অফিসার বিজয় বাবুকে অনুরোধ করিয়া যাহাতে পরেশ আটদিন ছুটি পায় এবং আমি বাকি চারদিন পাই,

তাহার চেষ্টা করিব। এই উদ্দেশ্যে একদিন রবিবার প্রাতে বিজয় বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম।

বিজয় বাবু তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসিয়া ক্ষৌরি হইতেছিলেন; আমাকে ভিতরে যাইয়া বসিতে বলিলেন। বিজয় বাবু লোকটি বড় ভাল, তাঁহার বেঁটে নাদুশ নুদুশ কাল চেহারা, ভারি ভারি মুখ ও ছোট চোখ দেখিলে তাঁহাকে নিরীহ ও স্থলবুদ্ধি বোধ হয়; কিন্তু তিনি বর্ণচোরা আম, প্রকৃত পক্ষে বিলক্ষণ তীক্ষবুদ্ধি, সরকারি কার্য্যে বিচক্ষণ, আইন কানুন ও নজির তাঁহার নখাগ্রে, ধীরে ধীরে কথা বলেন, কিন্তু তাহাতে মধ্যে মধ্যে রসিকতার বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়, এজলাসে বসিয়া গম্ভীর মুখে এমন একটি কথা বলেন যে, তাহাতে হাসির রোল উত্থিত হয়, গল্প বলিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিবার তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। আমরা তাঁহার কাছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ ও বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার পাই, তিনি যে আমাদের উপরওয়ালা তাহা তিনি জানিতেই দেন না।

ক্ষৌরকার্য্য সমাধা হইয়া গেলে বিজয় বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন, চাকরে গুড়গুড়ির উপর কলিকা বসাইয়া দিয়া গেল, তিনি গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে বলিলেন "আজকাল সকাল বেলাটা কেমন পূজো পূজো মনে হয়, দেখেছ?"

আমার বক্তব্য উত্থাপন করিবার সুবিধা পাইয়া বলিলাম "হাঁ, আর পূজো তো এসে পড়ল।"

"ভাল কথা, ছুটির ভিতর কোন্ কোন্ দিন ট্রেজরি খোলা থাকবে বল তো, আমি ভুলে গেছি। আমি সেই বুঝে—"

এমন সময় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সুরেন্দ্র সিংহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে বলিতে পরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই আমার ছুটির কথা বলিবার আশা অন্তর্হিত হইয়া গেল, কারণ তাহার সাক্ষাতে সে প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সে তো উড়াইয়া দিবেই, উপরন্তু আমাকে কটু কাটবা শুনাইয়া দিবে।

পরেশ ঘরে প্রবেশ করিয়াই কলরব করিয়া বলিল "দেখুন মশাই, পুলিশের জুলুম দেখুন, আপনি আমাদের উপরওয়ালা, আপনার কাছে আপীল করছি।"

বিজয় বাবু। বস বস, এস মিষ্টার লায়ন্ বস। ব্যাপার কি?

পরেশ। দেখুন দেখি মশাই, সিঙ্গি বলে কি না আজই জঙ্গমপুরের

মারপিঠের মামলার তদন্ত করতে যেতে হবে। এখনও রাস্তায় এক হাঁটু কাদা, আমি সেই কাদা ভেঙ্গে দশ ক্রোশ গিয়ে পঞ্চাশজন মিথ্যাবাদীর সঙ্গে বকাবকি করে রবিবারটা মাটি করব?

বিজয় বাবু হাসিতে হাসিতে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সুরেন্দ্র সিংহের দিকে চাহিলেন। সে চসমা মুছিতে মুছিতে বলিল "কয় দিন হতে কেস্‌টা পড়ে আছে, তুই পক্ষই পরস্পরের সাক্ষী ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছে, সে জন্য তিনিকে বলেছি যে আজ রবিবারটা আছে, হাঙ্গাম নিষ্পত্তি করে আসুন। এইতে তিনি পুলিস আর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে সমভাবে গালাগলি করছেন আর ফাল পাড়ছেন।" ইন্‌স্পেক্টার ফরিদপুর জেলার লোক, ভাষায় ও কথার টানে এখনও তার কিছু কিছু চিহ্ন আছে।

বিজয় বাবু। বাস্তবিক, কেস্‌টা আর ফেলে রেখ না পরেশ! জান ত কি রকম জেদের মামলা, শেষকালে সাহেবের কাছে হয়ত দেরি হচ্ছে বলে নালিশ করবে; তখন মুস্কিল হবে।

পরেশ হতাশের ভান করিয়া বলিয়া উঠিল "ভাল ভাল করে গেলুন কেলোর মার কাছে—"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। এমন সময় বিজয় বাবুর আরদালি পোষ্ট আফিস হইতে তাঁহার ডাক আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। বিজয় বাবু একবার চিঠিগুলার উপরটা দেখিয়া লইয়া আবার রাখিয়া দিলেন। তাহার মধ্যে একখানা পুস্তক দেখিয়া পরেশ জিজ্ঞাসা করিল "ওখানা কি ক্যাটালগ নাকি?" বিজয় বাবু বলিলেন "না, ওখানা মানসী।" "মানসী? একবার দেখতে পারি কি?"

উপরের মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মাসিকপত্রখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে পরেশ বলিল "এবার প্রভাত মুখুয্যের একটা গল্প আছে দেখছি।"

বিজয় বাবু। রত্নদীপ ছাড়া আর একটা গল্প?

পরেশ। হাঁ, "লেডি ডাক্তার" নামে একটা আস্ত গল্প।

বিজয় বাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন "বটে, তা পড় না হে, শোনা যাক।"

আমরা নিজ নিজ সুবিধা মত বসিলে পরেশ 'লেডি ডাক্তার' গল্পটি পড়িতে আরম্ভ করিল।

গল্পটি শেষ হইয়া গেলে সকলে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম, পরেশ তাহার স্বভাবসিদ্ধ কি একটা রসিকতা করিল; কিন্তু তাহাতে কেহ মনোযোগ করিল না। দেখি বিজয় বাবু অন্যমনস্ক ভাবে একদিকে তাকাইয়া আছেন, তাঁহার মুখে হাসির রেখা, গুড়গুড়ির নল মুখে তুলিতে অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছে। ক্ষণেক পরে তিনি নলটি মুখে লইয়া টানিতে টানিতে আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "দেখ, আমি যখন চাটগাঁয়ে ছিলুম তখন একজন লেডি ডাক্তার নিয়ে এক কাণ্ড হয়েছিল। সেও একটা বলবার মত ব্যাপার।"

পরেশ বলিল "ইস্, আজ লেডি ডাক্তারের জয় জয়কার দেখছি, আপনি বলুন, আমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করি। আজ আর শর্ম্মা উদস্তে যাচ্ছেন না, আপনি যাই বলুন।"

সুরেন্দ্র সিংহ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল "আমি তা হলে এখন যাই; অনেক কাজ আছে। বেলা ১০টা বাজে।" তাহার স্বভাবই এই; বেশ নিশ্চিন্ত চিত্তে পাঁচজনের সঙ্গে গল্প করিতেছে, এমন সময় যদি কেহ এমন কোন কথা উত্থাপন করে যাহা বলিয়া শেষ করিতে দশ পনর মিনিট সময় লাগিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার যত কাযের কথা মনে পড়িয়া যায়।

বিজয় বাবু বলিলেন "বস না হে, এত কি কাজ? না হয় তোমার ডায়ারিতে লিখো আজ সকালটা আমার এখানে কাটিয়ে গেছ।"

পরেশ গম্ভীরমুখে বলিল "ওকে ছেড়ে দিন মশাই। একজন আসামীর সঙ্গে ওর বন্দোবস্ত হয়েছে আজ সাড়ে দশটার সময় সে ওর ছেলেদের পাণ খাবার জন্যে কিছু দিয়ে যাবে। সময়ে না গেলে ফস্কে যেতে পারে।"

ইন্‌স্পেক্টার অপ্রসন্ন মুখে আবার বসিয়া পড়িল। পরেশ হাসিয়া বলিল "আপনি তাড়াতাড়ি আরম্ভ করুন বিজয় বাবু, লেডি ডাক্তারের কাহিনী শুনে পুণ্য অর্জ্জন করবার জন্যে মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

গুড়গুড়িতে দীর্ঘ টান দিয়া বিজয় বাবু বলিলেন "শোন তবে।"

(২)

আমি চাটগাঁয়ের দিনহাটা সাব্ ডিভিশনের চার্জ্জে ছিলাম জান ত? দিনহাটায় একটি ক্ষুদ্র জেনানা হাসপাতাল আছে। হাসপাতালটিতে এক-জন মাত্র লেডি ডাক্তার আছে—তাছাড়া অবশ্য ভাল দাই টাই আছে।

সেখানকার এসিষ্টাণ্ট সার্জন হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, প্রায়ই হাস-পাতালে গিয়ে দেখে শুনে আসে, আর সাব্‌ডিভিশনাল অফিসার হলেন হাসপাতাল কমিটির প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ জেনানা হাসপাতালের বড় কর্ত্তা।

আমি যখন দিনহাটায় যাই, তার মাস চারেক আগে একজন নতুন লেডি ডাক্তার এসেছে, তার নাম মিস্ ক্ষুদীবালা বিশ্বাস, জাতি ক্রিষ্টান, বাড়ি কলকাতার দক্ষিণে কোন্ গ্রামে। খোঁজ নিয়ে জানলুম ইনি ক্যাম্বেলের পাস; আগে অন্য দুচার জায়গায় কাজ করেছেন, দিনহাটায় ইতিমধ্যেই কাজে বেশ সুনাম কিনেছেন।

দিনকতক পর থেকেই কিন্তু লেডি ডাক্তারের সম্বন্ধে একটা কাণাঘুষা শুনতে লাগলুম। আমি প্রথমে কথাটায় বড় কাণ দিই নি, কারণ ব্রাহ্মিকা কি বাঙ্গালী ক্রিষ্টান স্ত্রীলোকের নামে মিথ্যা-কলঙ্ক রটান রোগ যে আমাদের ভিতর কি রকম প্রবল, তা আমি বিলক্ষণ জানতুম। কিন্তু যখন পাঁচ সাত জনের কাছে ঐ ভাবের কথা শুনলুম, তখন হাসপাতাল কমিটির প্রেসিডেণ্ট হয়ে আর কি করে চুপ করে থাকি? ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে একটু খোঁজ নিতে হল। তার ফলে এইটুকু জানতে পারলুম যে, মিস বিশ্বাস পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, এমন কি কেউ কেউ তাঁর বাসায় যাতায়াত করে, কিন্তু কি ভাবে আর কার সঙ্গে মেলামেশা করেন সেটা কেউ বলতে পারলে না। মোটের উপর সত্য সত্য কোন দষ্য ঘটনা কি অন্যায় আচরণের কথা শুনতে পেলুম না।

একদিন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রমথ বসুর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলুম "হাঁ প্রমথবাবু, আপনাদের লেডি ডাক্তারের নামে এসব কি শুনছি?"

ডাক্তার বল্লে "আপনিও যেমন, কতকগুলো লোক আছে অসহায় স্ত্রীলোকের নামে বদনাম দিতে ভারি মজবুৎ। আমি মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে চার পাঁচ মাস কায করছি, তাঁর বাসাতেও মাঝে মাঝে যাই, আমি বলতে পারি তিনি খুব ভাল লোক।"

প্রমথ বসু লেডি ডাক্তারের বাসায় যাতায়াত করেন শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, কারণ তিনি বেজায় গোঁড়া হিন্দু, আর স্ত্রী-শিক্ষা আর স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম শুনলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন, সে কথা লোকের মুখেও শুনেছি। আর একদিনের ঘটনায় নিজেও দেখেছি। আমি বলে উঠলুম "আপনি যে বড় 'স্বাধীন-জেনানা'র সঙ্গে মেশেন? এই না সে দিন আপনি স্ত্রীস্বাধীনতার ফল বিষময় হয় বলে বেচারাম বাবুর সঙ্গে ভয়ানক তর্ক করছিলেন?"

ডাক্তার প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন, তার পর বল্লেন, "আমার মত যা তাই আছে, কিন্তু সেটা এ ক্ষেত্রে খাটে না। মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে তাঁকে আর এখন পর বলে মনে হয় না। আমি তাঁকে দিদি বলে ডাকি। তা ছাড়া তিনি এক বুড়ি পিসির সঙ্গে এখানে থাকেন; বিশেষতঃ মিস্ বিশ্বাস বড়ই সরলা, দুই একজন এর মধ্যে তার advantage নেবার চেষ্টা করেছে। আমি না থাকলে তাঁকে বেগ পেতে হত।"

শেষ কথা কয়টি ডাক্তার বেশ গরম হয়ে বল্লে। তার কৈফিয়ৎ আর রকম সকম আমার মোটেই ভাল লাগল না। আমি মনে মনে ঠিক করলুম দুই এক দিনের মধ্যে জেনানা হাসপাতাল দেখতে গিয়ে সুবিধামত মিস্ বিশ্বাসকে একটু সাবধান করে দিয়ে আসব।

এই ভেবে একদিন হাসপাতাল দেখতে উপস্থিত হলুম। মিস্ বিশ্বাসের বিষয়ে গুজব শুনে তার চেহারা সম্বন্ধে আমার মনে একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে চোখে দেখে বড়ই নিরাশ হয়ে গেলুম। দেখলুম তার বয়স আন্দাজ ত্রিশ পয়ত্রিশ বছর হবে, শরীর দোহারা বলা যেতে পারে, রং ময়লা, মুখেরও কোন চটক নাই, বিশেষত্বের মধ্যে গরুর মত বড় বড় ভাবহীন চোখ। দেশী ক্রিষ্টান স্ত্রীলোকেরা যেমন সাড়ির সঙ্গে জুতো মোজা জ্যাকেট পরে, সেই রকমের পোষাক, তবে তাতে কোন রকম বাহারের চেষ্টা নেই, নিতান্ত সাদাসিধে ধরণের সাজসজ্জা।

পরেশ বলিয়া উঠিল "আরে রামঃ, আর আমার শোনবার ইচ্ছে নেই, আপনি তাড়াতাড়ি গল্প শেষ করুন।"

বিজয়বাবু বলিতে লাগিলেন "তাকে দেখে প্রথমটা আমার মনটাও কেমন দমে গিয়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলার পর আর সে ভাবটা রইল না। তখন আর মানুষটাকে নিতান্ত খারাপ লাগল না, তার চোখ মুখে একটা শান্ত মাধুর্য্যের ভাব দেখতে পেলুম, বোধ হল তার প্রকৃতিটি বেশ নরম, আর মনে মায়ামমতা বেশী।"

পরেশ বলিল "আমরা মনে করি আপনি Tenancy Rights এর চিট্টী আর Sericulture এর তত্ত্ব নিয়েই থাকেন, আপনি যে আবার physiognomyর চর্চ্চা করে থাকেন, তা ত জানি না।"

বিজয়বাবু বলিলেন "কেন, এ আর আশ্চর্য্য কি। কোন কোন লোকের সঙ্গে দু দণ্ড কথা বললে মনে হয় না যে এ লোকটি বড় ভাল মানুষ, কি এ

ভারি ফিচেল, কি মানুষটার নিশ্চয় নিষ্ঠুর স্বভাব। মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে খানিক কথাবার্ত্তা বলে আমার সেই রকম একটা ধারণা হ'ল। হাসপাতাল দেখা হয়ে গেলে বল্লুম 'চলুন না আপনার খাস কামরায় বসে একটু গল্প স্বল্প করা যাক।' তারপর সেই ঘরে গিয়ে নিরিবিলি পেয়ে ত চারটা বাজে কথার পর সাবধানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার বক্তব্যটি বলে ফেল্লুম।

আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ অধোবদনে থেকে আস্তে আস্তে সে বল্লে "মিষ্টার গাঙ্গুলি, আপনি আমাকে যে উপদেশ দিলেন, তার জন্যে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বুঝতে পারছি আমার ভালর জন্যেই বলছেন, কিন্তু আমি সত্যি সত্যি বলছি যে, আমার সাবধান হবার কিছু নেই। অপ-রাধের মধ্যে আমার পরিচিত ভদ্রলোকেরা মাঝে মাঝে আমার বাসায় গিয়ে অনুগ্রহ করে দেখাশুনা করেন। আপনিই বুঝে দেখুন, আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানশীন নয়; তার পর আমি যে কাজ করি, তাতে পর্দ্দানশীন হলে চলেও না। তা ছাড়া আমি একলা থাকি না, আমার পিসিমা সঙ্গে আছেন। এ অবস্থায় আমার বন্ধুরা আমার ওখানে গেলে কি দোষ হয় বুঝতে পারি না। ভদ্রলোক বাড়ীতে গেলে ত তাঁদের অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারি না।"

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বল্লুম, "অপমান করে তাড়িয়ে দিতে হবে কেন? এখানকার কোন লোক আপনার আত্মীয় কি আগেকার পরিচিত নয় ত, আপনি এখানে আসবার পর তাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তারা শুধু শুধু আপনার বাসায় যাতায়াত করে কেন, তার অবশ্যই কারণ আছে। তারা আর কারুর বাড়িতে এত ঘন ঘন যাতায়াত করে কি?"

কথাটা বড় রূঢ় হয়েছিল—হাকিমি মেজাজ কি না, তাঁবেদারের মুখে প্রতিবাদ শুনেই জ্বলে উঠেছিল। আমার কথা শুনে মিস্ বিশ্বাস উত্তেজিত হয়ে বল্লে "আপনি পাকে প্রকারে বলছেন যে, আমি তাঁদের আসতে বলি, কিম্বা গায়ে পড়ে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করি, তাই তাঁরা আসেন! আপনি ভুল বুঝেছেন মিঃ গাঙ্গুলি! আমি আস্কারা দেওয়া দূরে থাক, অনেক সময় তাঁদের আনাগোনায় বিব্রত হয়ে পড়ি।"

আমি বলে উঠলুম "এই না আপনি বলছিলেন তাঁরা অনুগ্রহ করে দেখাশুনা করতে আসেন, আবার এখন বলছেন তাঁদের আনাগোনায় আপনি বিব্রত হন!"

তার কথায় অবিশ্বাস করছি দেখে এবার মিস্ বিশ্বাসের সত্য সত্য ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল, বেশ গরম হয়ে বল্লে "যারা বলেন যে তাঁরা আমাদের খোঁজ খবর

নিতেই আসেন, তাঁদের কি বলা যায় 'আপনারা আর আসবেন না, আপনাদের আনাগোনায় আমরা বিব্রত হয়ে উঠেছি?' আমি কখনও কারুর মুখের উপর কিছু বলতে পারি না, বিশেষতঃ যখন কেউ ভাল উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়ে একটা অন্যায় করে ফেলেন, তখন ত আরও চুপ করে যাই। এই দেখুন না, আপনি ঘণ্টাখানেকের পরিচয়ে আমার সঙ্গে যে ভাবে কথা বলছেন, তাতে আমার আপত্তি করা উচিত, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য ভাল জেনে কি করে আপত্তি করি? আপনি আমার বিরক্ত হওয়ার কথাটা বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু সব কথা শুনে বিশ্বাস না করে থাকতে পারবেন না। কোন কোন ভদ্রলোক আছেন, দিন নেই দুপুর নেই আমার বাসায় উপস্থিত হন, কেউ কেউ আবার দিন দুবেলা তিনবেলা আসেন, একবার এলে সহজে যেতে চান না। বেশি কি বলব, দু একজন ভদ্রলোক আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পর্য্যন্ত করেছেন।" এই কথা বলতে বলতে মিস বিশ্বাসের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

আমি ত অপ্রস্তুতের একশেষ। শশব্যস্তে ক্ষমা চেয়ে তাকে সান্ত্বনা করতে প্রবৃত্ত হলুম। আমি মনে করলুম আমার কথাতেই বুঝি অপমান বোধ করে কেঁদে ফেলেছে, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলুম তা ছাড়া আরও একটা বড় কারণ ছিল। যাই হ'ক, মিস্ বিশ্বাস তখনই চোখ মুখে আমার কাছে মাপ চেয়ে অনুতপ্ত স্বরে বললে "ছি ছি, রাগের মাথায় এসব কি কথা বলে ফেলুম? আপনি দয়া করে এ কথাগুলি ভুলে যেতে চেষ্টা করবেন মিঃ গাঙ্গুলি!" দেখলুম সে সত্য সত্যই ভারি লজ্জিত হয়েছে।

আমার অপ্রস্তুতের ভাবটা কেটে গেলে মনে মনে তোলাপাড়া আরম্ভ হল। লোকের এর কাছে আসবার জন্যে এত লালায়িত হবার কারণ কি? এর না আছে রূপ, না আছে বয়স, গুণও যে তেমন বিশেষ কিছু আছে তা বোধ হল না। তবে কি দেখে লোকে এমন মোহিত হতে যাবে যে, একে দিনের মধ্যে দু-তিনবার না দেখে থাকতে পারে না, আর একে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠবে? আমি ভেবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে স্থির করলুম যে মিস্ বিশ্বাস হয় দারুণ মিথ্যাবাদী নয় তার পাগলামীর ছিট আছে।

তখন নতুন পথ ধরলুম। গভীর সহানুভূতি দেখিয়ে বল্লুম "তাই ত, বিনা অপরাধে আপনাকে আচ্ছা নিগ্রহ ভোগ করতে হচ্ছে ত? কে কে আপনাকে এ রকম করে বিরক্ত করে বলুন ত, আমি তাদের দেখে নিচ্ছি।"

মিস্ বিশ্বাসের মুখ শুকিয়ে গেল, সে কাতর স্বরে বলে উঠল "না না মিষ্টার গাঙ্গুলি, সে কিছুতেই হতে পারে না। দোহাই আপনার, এ কথা নিয়ে গোলযোগ করবেন না। আমি কারুর নাম বলতে পারব না, আমায় মাপ করুন।"

তার রকম দেখে আমার সন্দেহ হল, তার নির্দ্দোষীতার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, আসল কথাটা জানবার জন্যে আরও জেদ বেড়ে গেল। আমি বল্লুম "দেখুন মিস্ বিশ্বাস, আপনার নামে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে, তার উপর আপনি নিজে জ্বালাতন হয়ে উঠেছেন, এর একটা বিহিত করতেই হবে। আর যখন এখানে আপনার কেউ অভিভাবক নেই, তখন আমাকেই এ কাজের ভার নিতে হবে। আপনি যাতে লজ্জা কি কষ্ট পান তেমন ভাবে আমি কাজ করব না; আর আপনার মত না নিয়ে কাউকে কিছু বলব না, তা আমি প্রতিজ্ঞা করছি। কিন্তু কি ভাবে চলতে হবে তা ঠিক করতে হলে কি ধরণের লোক আপনাকে জ্বালাতন করে সেটা জানতে হবে তো? আপনি অন্ততঃ একজনের নাম বলুন না—কোন ভয় নেই, আমার দ্বারা তার কোন অনিষ্ট হবে না।"

একটু ইতস্ততঃ করে, তর্জ্জনী দিয়ে টেবিলের একটা জায়গা ঘস্‌তে ঘস্‌তে মিস্ বিশ্বাস আস্তে আস্তে বল্লে "এই আপনাদের ডাক্তার বাবু একজন।"

আমি তো অবাক। মিস্ বিশ্বাসের সম্বন্ধে প্রমথবাবুর সন্দেহজনক কথা-বার্ত্তা মনে পড়ায় ভাবলুম মিস্ বিশ্বাসের কথাটা তো তা হলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যতই ভাবি ততই আশ্চর্য্য বোধ হয়। প্রমথবাবুর মত লোক কিসের জন্য এর সঙ্গে ঘনিষ্টতা করবে। এ রহস্য ভেদ করবার জন্যে আমার ভারি ঝোঁক হল। সোজা ভাবে যখন হল না, তখন কৌশলে ভিতরকার কথাটা জেনে নেব ঠিক করে মিস্ বিশ্বাসের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলুম, বলে এলুম আমি এর পরে যা হয় একটা উপায় স্থির করব।

ভেবে চিন্তে এই মৎলব করলুম যে, কোন বিশ্বাসী লোককে মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে দুচারদিন ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে বলে দেব, তার পর কৌশলে তার কাছ থেকে এ ব্যাপারের আসল হাল জেনে নেব। একবার মনে হয়েছিল নিজেই মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে ব্যাপারখানা বুঝে নি; কিন্তু আমার সে সময়ও নেই, আর কাজটা আমার পদমর্য্যাদার উপযুক্ত হবে না বুঝে সে মৎলব তখনই ত্যাগ করলুম।

আমার আফিসে ইবন্ আহম্মদ বলে একজন আধাবয়সী মুসলমান ছিল। সে আফিসের কাজে যেমন অকর্ম্মণ্য ছিল, আয়েসের সখটুকু তার ষোল আনা

ছিল। যতক্ষণ আফিসে থাকত ততক্ষণ গজ গজ করত, সেরিস্তাদার খাটিয়ে জান নিলে, এই গরমে কি কাজ করা যায়, চেয়ারে ভয়ানক ছারপোকা, টিফিনের ঘরে পাখার দরকার ইত্যাদি। লোকটা কিন্তু বাজে ফরমাস খাটতে ভারি মজবুদ ; আর সেই গুণে উপরিওয়ালাদের সন্তুষ্ট রাখত, কোন হাকিম মুরগীর ডিম খান, ইবন্ আহম্মদ সস্তায় কিনে এনে দেবে ; কারুর বাড়িতে রুগীর জন্য সুরুয়া দরকার, ইবন্ আহম্মদকে বল্লেই হল ; কারুর গরহজম হয়েছে, ইবন্ আহম্মদ বাড়ি থেকে সরবতে নীলুফা আনতে ছুটল, এই রকম। তার আর একটা গুণ ছিল ; সব রকম লোকের সঙ্গে সহজে আলাপ করে লম্বাচৌড়া কথা বলে অল্প সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা করে নিতে পারত।

এই ইবন্ আহম্মদকে গোয়েন্দা করব ঠিক করে ডাকিয়ে বল্লুম "দেখ, মুন্সি সাহেব, একটা ভারি গোপনীয় ব্যাপারে ডিকেক্‌টিভগিরি করবার জন্যে একজন বুদ্ধিমান আর বিশ্বাসী লোক চাই। তা তুমি ছাড়া সে রকম লোক আর দেখতে পাচ্ছি না। কাজটা পারবে কি ?" সে তো অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই বলে উঠল "আলবৎ পারবো।" তখন আমি বল্লুম "আমাদের সন্দেহ হয়েছে লেডি ডাক্তার মিস বিশ্বাসের বাসায় জুটে জনকতক লোক পোলিটীকাল চক্রান্ত করছে। তোমাকে মিস্ বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ করে দেখে আসতে হবে সেখানে কে কে যায় আসে, তারা কি করে, কি রকম কথাবার্ত্তা বলে, আর মিস বিশ্বাস তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে। তিন দিন পরে এসে আমার কাছে রিপোর্ট করবে এ বিষয়ে তুমি কি সন্ধান পেলে। এ তিন দিন তোমাকে কাছারিতে আসতে হবে না।"

পরেশ বলিয়া উঠিল "আপনি ত বেশ লোক, একজন ভদ্রমহিলার উপর অনায়াসে চর লাগালেন ?"

বিজয় বাবু বলিলেন "তুমি ভুল বুঝেছ। আমি মিস বিশ্বাসের দোষ ধরব বলে এ কাজ করিনি, তাকে এই অত্যাচার আর বদনাম থেকে রক্ষা করব ভেবেই করেছিলুম। আমার ধারণা হয়েছিল সে কতক ভালমানুষীর জন্য আর কতক লজ্জার খাতিরে এই উপদ্রব সহ্য করছে। আমি সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে এই ভাবে তাকে উদ্ধার করব। অবশ্য কেবল এই সদিচ্ছার জন্য এতটা করতুম না। কিসের আকর্ষণে লোকে তার সঙ্গ চায় সেবিষয়ে খুব কৌতূহল হয়েছিল বলেই সদিচ্ছাটা কাজে পরিণত করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলুম, তা স্বীকার করছি। যাক ইবন্ আহম্মদ

একটা মস্ত কাজের ভার পেয়েছে মনে করে অহঙ্কারে বুক ফুলিয়ে বলে গেল যে তিন দিনেই সে কাম ফতে করে ফেলবে।

চারিদিন গেল, ইব্‌ন্ আহম্মদের দেখা নেই। পাঁচদিনের দিন সকাল বেলা আমি বাড়ির ভিতর থেকে আমার বৈঠকখানায় এসে দেখি ইব্‌ন্ আহম্মদ বসে আছে। খবর কি জিজ্ঞাসা করতেই সে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল "ভাগ্যে আমাকে পাঠিয়েছিলেন হুজুর, তা না হলে একজন বেকসুর আদমি মুস্কিলে পড়ে যেত। কোন্ সয়তান আপনাকে বলেছে যে বিশ্বাস-মেম সাহেবের কুঠিতে পোলিটিকাল বৈঠক হয়? তিনি কি যে সে আদমি, যে খারাব কামে হাত দেবে? তার কি মিঠা তবিয়ৎ, কি সরিফ্ দিল্, কি উম্‌দা সিফৎ! তিনি এক্কা ঔরৎ, ঔরৎ (রমণীরত্ন)।"

যে ইব্‌ন্ আহম্মদের মুখে কখনও কারো ভাল শুনিনি, তার মুখে এই প্রশংসার ফোয়ারা শুনে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দূরে থাক আরও দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠল। আমি বল্লুম "আচ্ছা মিস্ বিশ্বাস খুব ভাল লোক তা যেন বুঝলুম, কিন্তু তার বাসায় অনেকে আড্ডা দেয়, তা সত্য নয় কি?"

"অড্ডা দেওয়া কথাটা ঠিক নয় হুজুর, কতকগুলা নিকাম্মা আদমি মেমসাহেবকে সিধাসাধা পেয়ে তাঁর কুঠিতে চড়াও হয়ে দিনরাত বসে থাকে, তাদের নিয়ে মেমসাহেবের যে কত তকলিফ হয় তা বলবার যো নেই। কিন্তু তাঁর তাজ্জব সাবর, (সহ্যগুণ) হাসিমুখে সমস্ত বরদাস্ত করেন। এ সব বদমাসদের হাত থেকে মেমসাহেবকে বাঁচাবার জন্যে আমি এ কয় রোজ সারা রোজ তাঁর কুঠিতে থাকতাম, মনে করেছিলাম দু'চার রোজ এ রকম চেপে থাকলেই তারা ভাগবে। এই জন্যেই আমার রিপোর্ট করতে দু'রোজ দেরি হয়ে গেছে।"

ইব্‌ন্ আহম্মদের নিঃস্বার্থ পরোপকারের কথা শুনে হেসে উঠলুম, স্পষ্টই বুঝতে পারলুম এও মিস্ বিশ্বাসের গোলাম বনে গেছে। কে কে সেখানে যায় জিজ্ঞাসা করতে ইব্‌ন্ আহম্মদ বল্লে "ঐ সব বেয়াদবদের নাম পুছা দরকার মনে করিনি। ভাল কথা, আমাদের ডাক্তার বোস সাহেব সেখানে আনাগোনা করেন দেখলাম, তিনি ত আপনার দোস্ত বল্লেই হয়; আপনি তাঁকে সমঝিয়ে দিতে পারেন না কি যে, ওরকম করলে মেম-সাহেবের বদনাম হতে পারে।"

আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম "সেকথা তোমার ভাববার দরকার নেই, তুমি এখন যাও।" মনে মনে ভাবলুম এর মত লোককে এ রকম কাজে পাঠানই ভুল হয়েছিল।

চাটগাঁ সহরটা ফিঁকে, মেটে, কাল, হরেক রকম ফিরিঙ্গি আর দেশী ক্রিষ্টানের রাজ্য, প্রায় সব কাছারিতেই দু'চার জন ফিরিঙ্গি আছে, আমার আফিসেও ফেগ্রেডো নামে একজন বুড়ো কাল ফিরিঙ্গি ছিল। সে এ পর্য্যন্ত বিয়ে করেনি, তাই ভাবলুম এ কাজের পক্ষে এই উপযুক্ত লোক, কেন না যে এতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীর অভাব বোধ করেনি, সে বুড়ো বয়সে স্ত্রীলোকের মায়ায় বশীভূত হবে না। তাকে ডেকে পাঠিয়ে ইব্‌ন্ আহম্মদকে যে পোলিটিকাল চক্রান্তের তদন্তের কথা বলেছিলুম সেই কথা বলে, তিন দিন পরে রিপোর্ট করতে বল্লুম।

তিনদিন পরেই ফেগ্রেডো ফিরে এল বটে, কিন্তু তার মুখে একটা অপ্রস্তুতের ভাব দেখে আমার মনে আগে থাকতেই সন্দেহ হল। সে বল্লে যে, মিস্ বিশ্বাসের বাঙ্গলোতে পোলিটিকাল চক্রান্তের কথা যে কেবল সর্বৈব মিথ্যা শুধু তা নয়, মিস্ বিশ্বাসের charms এ (মোহিনী শক্তিতে) আকৃষ্ট হয়ে এক পাল বদমায়েস তার বাঙ্গলোতে জমায়েৎ হয় বটে (a pack of Scoundrels herd together) কিন্তু তার জন্যে মিস্ বিশ্বাসকে দায়ী করাও যা, আর একটি সুন্দর গোলাপ ফুলের চারিদিকে মৌমাছি জুটলে সেজন্যে গোলাপ ফুলকে দোষী করাও তাই; মিস্ বিশ্বাস একজন পরম গুণবতী মহিলা (a lady of the highest quality) এমন কি তাঁকে একটি এঞ্জেল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না!

আমি ভাবলুম "মরেছে রে, এটাও জালে পড়েছে দেখছি।" লোকটাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইলুম, ভাবলুম দূর হোক্ গে ছাই, এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে?

এই সকল কথা ভাবছি এমন সময় আফিসের ভিতর থেকে একটা চেঁচামেচি শুনতে পেলুম, একটু পরে সেরিস্তাদার এসে বল্লে ইব্‌ন্ আহম্মদ আর ফেগ্রেডো আফিসের ভিতর ঝগড়া করছে, তাদের থামাতে পারা যাচ্ছে না; ঝগড়ার কারণ দুজনের কেউ স্পষ্ট করে বলছে না, তবে তারা ঝগড়া করতে করতে মধ্যে মাঝে কে মিস্ বিশ্বাস আর মেমসাহেবের নাম করছে। আমি ভাবলুম আরে লোকে, শেষকালে আফিসের ভিতর

সুন্দ উপসুন্দের যুদ্ধ! দুজনকে ডাকিয়ে আচ্ছা করে ধমকে দিতে তবে তারা নিরস্ত হয়।

আমি মনে মনে মিস্ বিশ্বাসকে যথেষ্ট বাহাদুরী দিলাম; ভাবলাম যে স্ত্রীলোক কুশ্রী হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুজন পরিণত বয়সের লোককে তিন দিনে এমন বশ করতে পারে, তার ক্ষমতা বড় সাধারণ নয়—কিন্তু এ ক্ষমতার মূল কোথায় ঘুরে ফিরে সেই পুরাণ কথাতেই এসে উপস্থিত হলাম। মনে করেছিলাম এ ব্যাপার নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করব না; কিন্তু ফেগ্রেডোর আর ইরন্ আহম্মদের ঝগড়া দেখে আমার কৌতূহল দশগুণ বেড়ে উঠল, মনে হল এ রহস্য ভেদ না করতে পারলে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারব না।

এই সময় হঠাৎ মনে হল, বোধ হয় মিস্ বিশ্বাসের অনেক টাকাকড়ি আছে, আর বোধ হয় সেই সন্ধান পেয়েই গুড়ের গন্ধে মাছির ঝাঁকের মত চারিদিক থেকে তার অনুগত ভক্ত এসে জুটছে। অন্ধকার ঘরে ইলেক্ট্রিক আলো জ্বলে যেমন ঘরের সমস্ত জিনিসের চেহারা চোখে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তেমনি এই কথাটা মনে হওয়ায় এ ব্যাপারের যা কিছু রহস্য সমস্তই মুহূর্ত্তে পরিষ্কার হয়ে গেল, আর এই সোজা কথাটা এতদিন কেন মনে হয়নি তাই আশ্চর্য্য বোধ হতে লাগল। মনে একটা ভারি আরাম বোধ হতে লাগল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার থিওরিটা সত্য কিনা তার প্রমাণ পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কোন রকমেই কিছু বুঝতে না পেরে শেষে ঠিক করলাম যে নিজেই অনুসন্ধান করব। তারপর একদিন বৈকালে কাছারি থেকে ফিরে কাপড় চোপড় বদলে বেড়াতে বেড়াতে মিস বিশ্বাসের বাসায় উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখে মিস্ বিশ্বাস ভারি ব্যস্ত হয়ে যৎপরোনাস্তি আদর অভ্যর্থনা করে তার বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালে। তার আন্তরিক খাতির যত্নে আমি সত্য সত্যই খুসী হলাম।

মিস্ বিশ্বাসের বাঙ্গলা খানির সামনে একটা বারান্দার উপর দিয়ে বৈঠক-খানায় আসবার সময় দেখি সেখানে জন তিন চার লোক বসে চা খাচ্ছে। আমি বুঝলাম এরাই মিস্ বিশ্বাসের ভক্তবৃন্দ, কিন্তু বারান্দা দিয়ে চলে আস-বার সময় সন্ধ্যার আবছায়ায় তাদের কাউকে চিনতে পারলাম না। আমি বাইরের আলো থেকে আসছি বলেই বোধ হয় তাদের ভাল দেখতে পেলাম না, তারা কিন্তু সম্ভবত আমাকে চিনতে পেরেছিল, কারণ আমি বৈঠকখানায়

বসতেই দেখি তারা একটির পর একটি সুড় সুড় করে সরে পড়ল। তাদের চিনতে পারলাম না বলে ভারি আপশোষ হতে লাগল।

মিস্ বিশ্বাস তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর থেকে তার পিসিকে ডেকে নিয়ে এল, দেখলাম তাঁর ধরণ ধারণ ঠিক আমাদের ঘরের বিধবার মত। সমস্ত দিনের খাটুনির পর এতখানি হেঁটে আসতে আমার কত কষ্ট হয়েছে বলে আক্ষেপ করে তিনি আমার বারণ অগ্রাহ্য করে একখানা হাতপাখা এনে আমাকে বাতাস করতে করতে করুণামাখা স্বরে বল্লেন "তোমার মুখ যে শুকিয়ে গেছে বাবা! বলতে ভরসা হয় না, যদি কোন আপত্তি না থাকে একটু চা টা খাওনা।" তাঁর অকপট যত্ন আমার ভারি ভাল লাগল, বল্লাম "খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমার কোন কুসংস্কার নেই, তবে বাড়ি থেকে জলটল খেয়ে বেরিয়েছি, এখন আর কিছু খাব না।"

চাকরে আলো দিয়ে গেলে দেখলাম যে ঘরের আসবাবপত্রে বেখাপ্পা সাহেবিয়ানা কি বাহারের চেষ্টা নেই, অথচ আরাম সুবিধার হিসাবে যা কিছু দরকার সবই আছে। সমস্ত জিনিসপত্রের এমন পরিপাটি গোছগাছ আর চারিদিক এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘরটিতে বসে আমার বড়ই আরাম আর তৃপ্তি বোধ হতে লাগল, মনে মনে মিস্ বিশ্বাসের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না।

আমার উদ্দেশ্য, কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেখা, যদি কিছু খেই পাই সুতরাং মহা গল্প জুড়ে দিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে বাহিরে ভারি ঝড় উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। মনে করলাম বৈশাখী ঝড় একটু পরেই থেমে যাবে, কিন্তু যখন আধ ঘণ্টা কেটে গেল, তবু থামবার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, তখন মিস বিশ্বাস ধরে বসল সে রাত্রে সেখানেই খাওয়া দাওয়া করে যেতে হবে। এ অনুরোধ আমি প্রথমে উড়িয়ে দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার আগ্রহ দেখে শেষকালে রাজি হতে হল। মিস বিশ্বাস ভারি খুসী হয়ে বলে গেল "আপনি পিসিমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলুন, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আপনার খাবার তৈরি করে দেব।" আমি মনে করলাম মন্দ কি, যত বেশীক্ষণ থাকা যায়, যার জন্যে এসেছি তার মীমংসা হওয়ার সম্ভাবনা ততই বেশি। আমার অজ্ঞাতসারে সে মীমাংসার যে কত কাছে এসে পড়েছি তা বুঝতে পারিনি।

যথাসময়ে খাবার ডাক পড়তে ভিতরে গিয়ে দেখি ঠাঁইয়ের কি পরিপাটি বন্দোবস্ত! আরসির মত পরিষ্কার চক্‌চকে সিমেণ্ট করা মেজের উপর ছাঁটা

পশমের খুব পুরু একখানি আসন পাতা, তার সামনে সাদা পাথরের থালা বাটি, রেকাবি প্রভৃতি সাজান, পাতের চারিদিকে চারটি সামাদানে মোমবাতি জ্বলছে, দুধারে দুটি বেলোয়ারি ফুলদানে ফুলের তোড়া তার মাঝখানে আবার দুটি জ্বলন্ত ধূপ বসান, ঘরের এককোণে একটা টিপায়ের উপর টুং টাং করে একটা কলের অর্গান বাজছে, সামনের খোলা জানলা দিয়ে হাস্নু-নো-হানার গন্ধ এসে ঘরটি আমোদ করে তুলেছে। সাদা পাথরের আর তোড়ার পবিত্র শোভা, ধূপের আর ফুলের গন্ধ; আর অর্গানের মিঠা আওয়াজে মন একটা স্নিগ্ধ পবিত্র ফূর্ত্তিতে ভরে উঠল, আসনের অতি নরম স্পর্শ যেন কার আদরের স্পর্শ বলে মনে হতে লাগল। একসঙ্গে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ দিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির আয়োজন এই নতুন দেখলাম।

ফলমূলগুলি এমন সুন্দর কারিগরি করে সাজান, যে তাতে হাত দিতে মায়া হতে লাগল। বেদানার দানার পদ্মফুল, বাদামের নক্ষত্র, কিসমিসের পিরামিড্ আঙ্গুরের জসম, শসার ঘুঁড়ি, কলার থাম, আকের রেলিং, মাখনের ফুলদারকল্কা ইত্যাদি। আবার কতকগুলি ফলমূল নূতন কায়দায় অতি উপাদেয় ঠাণ্ডা করা, তালশাঁসের ভিতর কেওড়ার সরবৎ, লিচুর ভিতর আঁটির জায়গায় সুগন্ধি পাতলা ক্ষীর, গোলাপজামের ভিতর গোলাপী সিরাপ, কালজামের ভিতর ছানার ছোট ছোট গুলি আর চাক্তির ভিতর নেবুগন্ধ চিনি ভরা, এই রকম কত কি। এক একটি জিনিষ মুখে দিতে জিভ খাওয়া বন্ধ করে প্রশংসা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল!

খেতে খেতে ভাবতে লাগলাম ফলমূলগুলি এমন তরিবৎ করে তৈরি করতে যে রকম পরিশ্রম আর সময় লেগেছে, দেখছি তাতে বোধ হয় রান্না বান্না বিশেষ কিছু করতে পারে নি। পাতে প্রথম লুচি আর শাকভাজা দিতে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। কিন্তু ক্রমে দেখলাম তা নয়, সমস্ত জিনিসগুলি গরম গরম দেবে বলে এক একটি করে পরিবেশন করছে। জোয়ানের লুচি আর ভিনিগার না সস্ দেওয়া শাকভাজা এমন মুখরোচক লাগল যে, পেলে বোধ হয় তাই দিয়েই পেট ভরিয়ে ফেলতুম; তারপর ইঁচড়ের ডালনা, কপির ছোঁকা, মটর সুঁটির ঘুগনি, আরও কি কি—অতি তোফা রান্না—যেটা খাই সেইটাই মনে হয় আগের চেয়ে এইটাই ভাল। ক্রমে তিন রকম পোলাও, একটিতে জুঁই ফুলের গন্ধ, একটিতে চিড়ের মত কুচি কুচি মাছ দেওয়া, আর একটির প্রত্যেক দানা সোণালি অথবা রূপালি রঙ্গের; তার সঙ্গে রকম রকম মাছ আর মাংসের তরকারি,

বড়া ইত্যাদি ; কোনটা বাঙ্গলা, কোনটা মোগলাই, কোনটা বা সাহেবি, তার মধ্যে কতকগুলি জিনিস আগে কখনও খাই নি ; আর যেগুলি খেয়েছি তার প্রত্যেকটিতে এমন একটা কিছু নূতনত্ব বা বিশেষত্ব ছিল যার জন্য এতদিন পরেও সেগুলি ভুলিতে পারিনি। আমি সকাল বেলা কি দিয়ে ভাত খাই রাত্রে তা মনে থাকে না, কিন্তু সেদিন কি কি খেয়েছিলুম তা আজও মনে আছে, এই থেকেই বুঝতে পারবে সে কি রকম রান্না। বরফির আকার, ক্ষীরের তার, কমলা লেবুর গন্ধ আর মাখমের মত মোলায়েম দইএর, ফেণা ঢাকা খেজুর খোবানি জরদাআলু মেশান লাল রঙ্গের সরের মত জিনিসের ঠাণ্ডা পুডিংএর, আর অতি ফিকে টক রস আনারসের কালাকন্দের সূক্ষ্ম মাধুর্য্যকে যথাক্রমে মিষ্টান্ন রাজ্যের ললিত, সাহানা আর বেহাগ রাগিণী বলা যেতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতগুলি জিনিসের কোনটিকে ফাষ্টক্লাসের নীচে স্থান দেওয়া যায় না। আমি এই বয়সে অনেক বড়লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়েছি, পাকা রাঁধুনীর হাতের রান্না খেয়েছি, হোটেলেও বড় কম খাইনি, কিন্তু প্রত্যেক জিনিসটি এমন উৎরান, আর কি কি খাওয়াতে হবে, আর কোন্‌টার পর কোন্‌টা দিতে হবে তা ঠিক করতে এমন নিপুণ বিচারশক্তি আর কোথাও দেখিনি।

অক্ষরের মাথায় মাত্রা না দিলে যেমন সেটা সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি আমার মত চুরুট তামাকখোরদের সুখ বা আয়েসের সময় একটু ধোঁয়ামুখ না করলে পূরা তৃপ্তি হয় না। তাই আচাবার সময় লেডির ঘরে ধূমপান নিষেধ ভেবে মনে মনে দুঃখ হচ্ছিল যে, এমন খাওয়াটা অঙ্গহীন হল, আর ক্রিষ্টানের বাড়ি পানশুপারি পাওয়া যাবে না বলে মনটা খুঁত খুঁত করছিল ; কিন্তু বৈঠকখানায় এসে যখন দেখলুম আমার চেয়ারের পাশে একটি টিপায়ের উপর রেকাবিতে সাজা পান, ভাজা মসলা, চিকিশুপারি, চুরুট আর দেশলাই রয়েছে, তখন অবাক্ হয়ে গেলাম। আমি তখন তাঁর রান্নার ও অন্যান্য ব্যবহারের যথেষ্ট প্রশংসা করলাম।

আমার প্রশংসা শুনে তার মুখে একটা সলজ্জ আনন্দের ভাব ফুটে উঠল, সে বল্লে "আপনি কি বলছেন তার ঠিকানা নেই, আপনার মত লোক আমার রান্না খেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন এই আমার যথেষ্ট। আমার ত আর কিছু গুণ নেই, এই বিদ্যাটুকু দিয়ে যদি লোককে খুসি করতে পারি তা হলে বড় আনন্দ হয়।"

মিস্ বিশ্বাসের পিসি বল্লেন "হাঁ বাবা, ওর সখের মধ্যে ঐ এক লোক

খাওয়ান সখ আছে। ছেলেবেলা থেকে ওর রান্নার উপর ভারি ঝোঁক, বাবুর্চি-দের খোসামোদ করে নতুন নতুন রান্না শিখত, বড় হয়ে পয়সা দিয়ে শিখত; নানান রকম বাঙ্গলা আর মোগলাই রান্না শিখবে বলে দিনকতক সখ করে মিশনারিদের সঙ্গে মিশে জন কতক বাঙ্গালি বাবু আর মুসলমান ভদ্রলোকদের বাড়ি সেলাই শেখাতে যেত; আবার ইংরিজি বাংলা রান্নার বই কতকগুলো কিনেছে। এমন বাই কখন দেখেছ বাবা?"

আমি বল্লুম "তা যেন বুঝলুম, কিন্তু আমি যে খাব তা তো আপনারা জানতেন না, এরকম নানান রকম ফলমূল আর উপকরণ মায় অসময়ের কপি কড়াইসুটি এ সবই বা কোথা পেলেন আর এত অল্প সময়ের ভিতর এত জিনিসই বা কি করে তৈরি হল? এ তো আমার ভৌতিক ব্যাপার বোধ হচ্ছে।"

পিসি একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লেন "আশ্চর্য্য হবার কথা বটে, পাগল মেয়ের ধরণ ত জান না। বাড়িতে হঠাৎ কেউ এলে তাড়াতাড়ি পাঁচ রকম রেঁধে দিতে পারবে বলে সাহেবদের মত ছটা ফোকরওলা উনুন তৈরি করেছে, তা ছাড়া ঐ যে বুড়ো বেহারাটাকে দেখলে, ও এসব কাজে খুব তৈরি, সেই জন্যে আরও শিগ্‌গির হয়। আর জিনিসপত্রের কথা কি বলছ, মেয়ের ভাঁড়ারে দেখবে সব রকম মালমসলা মায় বিলিতি আমদানি টিনে ভরা মাছমাংস তরি তরকারি ফল সব সময় মজুদ থাকে, আবার সারা বছরের যত রকম তরকারি শুকিয়ে শুকিয়ে রেখে দেয়। ও যা কিছু রোজকার করে সমস্তই এইতে খরচ করে। বাড়িতে যে আসবে সে যদি নিষ্ঠাবান হিঁদু না হয় তা হলে তাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়বে না, সাহেবই হক, মুসলমানই হক, আর যে ইহক, যে যেমন, তাকে তেমনি রেঁধে খাওয়াবে, নিদেন চা কি জলখাবার খেয়ে যেতেই হবে।"

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। যে মিস্ বিশ্বাসের বাড়িতে আসে সেই কেন তার গোলাম হয়ে যায়, লোকে কেন এত ঘন ঘন এখানে যাতায়াত করে তা এইবার ভাল করে বুঝতে পারলাম।

কিন্তু এই রকম যাকে তাকে সেধে খাওয়ান আমার চোখে বড় ভাল ঠেকল না, মনে হল এটা বাহবা নেবার বড় বাড়াবাড়ি নেশা। তাই একটু না টুকে থাকতে পাল্লাম না, বল্লাম "আত্মীয়স্বজনকে খাইয়ে তৃপ্ত করা স্ত্রীলোকের পক্ষে খুব প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু এমন করে পাঁচ ভূতকে খাইয়ে পয়সা নষ্ট করা কি উচিত? এতে ভাল ত হয়ই না, উপরন্তু খুব খারাপ ফল হয়। আপনার উচিত নয় কি ওঁকে বুঝিয়ে নিরস্ত করা?"

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিস্ বিশ্বাসের পিসি বল্লেন "সে অনেক কথা বাবা। বাছা আমার বড় অভাগী। একটী ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম, অমন ছেলে হয় না, যেমন রাজপুত্রের মত চেহারা তেমনি ভাল স্বভাব, বেশ ভাল চাকরিও করত। বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে গেলে ক্ষুত্বর সঙ্গে চেনা পরিচয় করে দেবার জন্য তাকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করতাম। তাইতে দুজনের খুব ভাব হয়েছিল। সে বলত "পিসিমা, আপনার ভাইঝির মত পৃথিবীতে কেউ রাঁধতে পারেন না, আমার ইচ্ছা করে পৃথিবীশুদ্ধ লোককে ডেকে এনে ওর রান্না খাওয়াই।" মাসখানেক বাদে বিয়ে হবে, আমি এক এক করে ওদের ঘর-কন্নার জিনিস পত্র গোছাচ্চি, এমন সময় ছেলেটার গলায় ঘা হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল, তার বাপমা তিন মাস ধরে কত চিকিৎসা করালে, কিছুতে কিছু হল না। আমি মাঝে মাঝে ক্ষুত্বকে নিয়ে তাকে দেখতে যেতাম; একদিন বড় ছট ফট করছে দেখে জিজ্ঞাসা করলুম "কি কষ্ট হচ্ছে বাবা?' সে বল্লে "পেট জলে যাচ্ছে পিসিমা, অথচ কিছু খাবার জো নেই এ বড় যন্ত্রণা।" আর একদিন ক্ষুত্বকে বল্লে "দেখ, বড় ইচ্ছা করছে তোমার হাতের রান্না পেট ভরে খাই, আমি যদি ভাল হই একদিন ভাল করে বেঁধে খাইও।" বাছার সে সাধ আর মিটল না, না খেতে পেয়ে ধড়ফড় করে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।" বলতে বলতে বুড়ির চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। চেয়ে দেখি মিস্ বিশ্বাস উঠে গিয়ে জানলার কাছে আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে, ভাবে বোধ হল কাঁদছে।

একটু সামলে নিয়ে ভাঙ্গা গলায় পিসি বলতে লাগলেন "সে অনেক দিনের কথা। তারপর আমরা ওকে কত বুঝিয়েছি যে কত লোকের ও রকম হয়, তারা আবার সময়ে শোক ভুলে গিয়ে ঘরকন্না করে—আর মেয়েমানুষ, বিয়ে না করলেই বা চলবে কি করে? কিন্তু ও সেই থেকে সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে, চিরকাল স্বাধীন থাকতে পারবে বলে ডাক্তারি শিখে চাকরি করছে। এত কষ্টে রোজকার করা পয়সা পরকে খাইয়ে নষ্ট করে বলে আমি প্রথম প্রথম বুঝতে না পেরে ওকে বকতাম, কিন্তু যেদিন আমায় বল্লে তোমার পায়ে পড়ি পিসিমা আমার এ কাজটিতে বাধা দিও না, আমি তাঁর কথা ভেবে পাঁচজনকে খাইয়ে তৃপ্ত হই সেদিন থেকে ওকে তো কিছু বলিই না, বরং ও সুখী হয় জেনে ওকে এ বিষয়ে সাহায্য করি।"

আমার চোখ জলে ভরে গেল, এহেন সতীর সম্বন্ধে অন্যায় সন্দেহ করেছিলাম

বলে লজ্জায় আর ঘৃণায় মরমে মরে গেলাম, ইচ্ছা করতে লাগল মিস্ বিশ্বাসের পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে ধন্য হই।

*   *   *   *   *

বিজয়বাবুর গল্প শুনিয়া আমাদের মনে যে ভাবের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, পরেশ তাহা একেবারে মাটি করিয়া দিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল "মশাই একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ দিন ত।"

"কাগজ কি করবে হে?"

"চাটগাঁয়ে বদলি হবার দরখাস্ত করব।"

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

নির্ম্মল

(একটী ক্ষুদ্র শিশুর প্রতি)

হে নির্ম্মল! হে নিষ্পাপ! শুক্র তারকার রশ্মিজালে
ডুব দিয়া, চুপে চুপে, আনন্দের স্বপনের ঘোরে.
হইয়াছ বুঝি হেন অপরূপ! বাঁধি বাহু ডোরে,
রাঙা ঊষা খাইয়াছে চুমা বুঝি তোর কচি গালে?
অশোক-আবির ছিল মোহনীয়া বাসন্তীর থালে;—
তাই বুঝি মাখিয়াছ গালে মুখে? হেন ক্ষুদ্র চোরে,
কে আঁটিবে? ঝঙ্কারিয়া ক্ষুদ্র অলি মধু লয় হ'রে,—
'আরো লও' বলি পদ্ম সাধে সেই দুরন্ত দুলালে।
হে সরল! আঁখি দুটি, দুটি স্বচ্ছ মোহন মুকুর,
তুমি অন্তরালে আছ—তবু এই নির্ম্মল দর্পণে
তোমার বিমল রূপ প্রকাশ পাইছে ভরপুর!
নিকুঞ্জ-আরসী যথা অচঞ্চল সরসী বদনে
লাবণ্যের অঞ্চলের নিধিধনে পূর্ণিমার চাঁদে
গৌরবে প্রকাশ করে,—মুগ্ধ কবি যে বরেণ্য ছাঁদে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

তপঃসিদ্ধি

ছিন্ন শুষ্ক ধূলিম্লান বসন্তের বল্লরী-বিতান,
হিল্লোলিত মলয়ের কোথা কোনো নাহিক সন্ধান ;
কলকণ্ঠ কোকিলের বাণী
নাহি শুনি, ওগো ধরা রাণী,
মালঞ্চ অঞ্চল তলে,
সান্ধ্য, ঊষা শিশিরের জলে
মল্লিকা মালতী আর ফুটিয়া না ওঠে,
মধুলোভে অলি নাহি জোটে ;
বনশ্রীর,
নিকুঞ্জ-লক্ষ্মীর,
হৃদিস্থিত বেদনার মত
ফুটিয়া ওঠেনা আর অশোক কিংশুক আদি যত ;
নারী-মুখ-মদিরার বাস
করি উপহাস,
বৃন্ত হ'তে আপনি টুটিয়া
ছায়াচ্ছন্ন তরুমূলে বকুলতো পড়ে না লুটিয়া।

হে ধরণী-রাণি,
স্তব্ধ তব বিহঙ্গ-কূজন-বাণী,
পীত-শোভা বসন্তের সাজ
দূর করি আজ,
অনিন্দ্য-সুন্দর অভিনব,
যৌবনের পূর্ণ তনু তব
ঢাকিয়াছ খর-সূর্য্য-গৈরিক-কিরণে ;
একমনে
কি সিদ্ধির লাগি,
সুদূরে তেয়াগি
বসন্ত-বাসরে আজ
কুসুমের সাজ ?

হোমানল
জ্বালিয়া প্রবল,
কোন্ অভিলাষে
জপিতেছ ইষ্টমন্ত্র নির্নিমেষ রহি রুদ্ধশ্বাসে ?

কোন্ এক গতযুগে হিমশৈলনন্দিনী পার্ব্বতী,
মহেশে মাগিয়া পতি,
তাপসের অসাধ্য সাধন,
না শুনি বারণ
সেধেছিল, একাগ্র অন্তরে
ব্যগ্র আশা বহি বক্ষ'পরে।
স্ফুট চন্দ্র-গ্রহ-তারা,
সন্ধ্যাকাশে সূর্য্যোদয় পারা,
যৌবনের নব আগমনে
দূর করি ভূষণে রতনে,
বাকল বসন পরি,
চেলাঞ্চল দূরে পরিহরি।
ভ্রমরের পদভার
সহেনাকো যার,
পেলব শিরীষ ফুলে
পতত্রী পড়িলে
যে দারুণ বেদনা তাহার,
বাকল বসনে তাই ঘটেছিল নন্দিনী উমার।

বসন্তে সহায় করি
সাজাইয়া কুসুমে বল্লরী,
হিমাদ্রির যোগাশ্রমে,
বিলাসে বিভ্রমে,
বালসূর্য্যকর উপহাসে,
চীনাংশুক বাসে

আবরিয়া তনুলতাটিরে,
ধীরে ধীরে,
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতন
করিয়া যতন,
হরযোগভঙ্গ আশে,
মনোজের পাশে
চলেছিল পর্ব্বতকুমারী,
যৌবন-আনন্দ-বিভা চৌদিকে সঞ্চারি ;
মদনের ধনুগুণসম,
গতিলোল কান্তি অনুপম,
এক করে
যথাস্থানে বিনিবেশ তরে
করিয়া যতন
অনুক্ষণ,
অন্য করে
লীলা পদ্ম ধরে
মুখপদ্মভ্রমে ভ্রান্ত দূর করি ভ্রমরপঙ্‌ক্তিরে
চলেছিল ধীরে অতি ধীরে।
কোথা স্মর কোথা সম্মোহন !
হরনেত্র অনলের প্রলয়-দহন
মন্মথের সনে
ভস্মশেষ করেছিল পার্ব্বতীর সুখসাধ মনে।

ফাল্গুনের ফুলশয্যা পরিহরি, তুমি যার তরে,
একাগ্র আগ্রহ ভরে,
যোড় করে,
ব্যাকুল অন্তরে,
ঊর্দ্ধে চাহি জপিতেছ নাম,
অবিরাম,

রথচক্রধ্বনি যার
শুনিবার
একান্ত আশায়,
ব'সে আছ জড় প্রাণহীন পাষাণ-প্রতিমা প্রায়।
তোমার সে নব ঘন শ্যাম
অভিরাম,
স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর শোভন,
স্নেহাতুর নয়ন-লোভন,
আসিতেছে মিথুনের মাসে
তব পাশে।
শেষ করি বিশ্বজিৎ যাগে,
অনুরাগে,
সব তব কর সমর্পণ,
হৃদয় তর্পণ,
যাচিয়া স্নেহের ধার,
সার কর করুণা তাহার।

হে মেদিনি, ওগো মহামূক
কভু তুমি হবে না বিমুখ;
বসন্তের মালতী-মঞ্জরী
পড়িয়াছে ঝরি,
নাহি খেদ তার তরে,
আষাঢ়ে আগ্রহভরে,
ফুটিবে আবার
কুটজ কুন্দের ভার,
কদম্বের পুলক আকুলে,
যাবে ভুলে
বিগত বেদনা তব,
হবে অভিনব
যৌবন সঞ্চার,

অঞ্চল তোমার
ভরিবে আবার
অশ্রুধৌত শিশিরের সুধাগন্ধ শেফালি সম্ভার।
নিদাঘের সব নিষ্ফলতা,
মিটিবে তা,
সুন্দর সে শ্যাম শোভা জলদের স্নেহদান দানে
প্রাবৃটের বারি দিনমানে।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

বাঙ্গালার ইতিহাস।

(সমালোচনা।)

স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নব-প্রকাশিত "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রথম ভাগ অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ব সময়ের বাঙ্গালার ইতিহাসের সম্বন্ধে যে কিছু উপাদান এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। এই সঙ্কলন-কার্য্যে তিনি কিরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, "গুপ্তাধিকারকাল" নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তরাজগণের কোন্ মুদ্রাটি কোথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, কোথায় তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ও ঠাই ঠিকানা দেওয়া হইয়াছেহ, কোন্ সালে যে মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহারও যথাসম্ভব উল্লেখ করা হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রতি বাঙ্গালীর অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সময় এরূপ গ্রন্থ ইতিহাস-অনুরাগীর বিশেষ উপকার-সাধক হইবে। অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালী দরিদ্র। কলিকাতা ভিন্ন বাঙ্গালার অন্যান্য সহরে যে সকল পুস্তকালয় আছে, তাহা ততোধিক দরিদ্র। যে সকল দুর্ম্মূল্য এবং দুর্লভ গ্রন্থে বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান নিবদ্ধ আছে, কলিকাতার বাহিরে, (শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়ের প্রতিষ্ঠিত রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির পুস্তকাগারে ভিন্ন) আর কোথাও সেই সকল গ্রন্থ যে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া

যায়, তাহা মনে হয় না। কলিকাতায় গিয়া ঐ সকল গ্রন্থ দেখিয়া আসা যাইতে পারে। কিন্তু কলিকাতায় যাইয়া গবেষণা করিবার সময় ও সামর্থ্য কয় জনের আছে? আর থাকিলেও উপযুক্ত পথ-প্রদর্শক ভিন্ন সেই গ্রন্থারণ্যে পথ চিনিয়া লওয়া সুকঠিন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার "বিশ্বকোষে" এবং "বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে" মফঃস্বলবাসী ইতিবৃত্ত-সেবকের এই অভাব দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কুলশাস্ত্রের প্রতি অচলা ভক্তির ফলে, তাঁহার গ্রন্থসমূহে সমসাময়িক দলীল দস্তাবেজের গৌরব রক্ষিত হয় নাই; সমসময়ের প্রশস্তিকারকে এবং চরিতকারকে আধুনিক কুলজ্ঞের পাছে পাছে চলিতে হইয়াছে। রাখালবাবুর "বাঙ্গালার ইতিহাস" বাঙ্গালা-সাহিত্যের এই অভাবটি সুন্দররূপে পরিপূরণ করিয়াছে। শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, হস্তলিখিত গ্রন্থের পুষ্পিকা প্রভৃতি বাঙ্গালার ইতিহাসের যে কিছু উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, রাখালবাবু অতি যত্ন সহকারে এই ইতিহাসের মধ্যে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। খুব অল্পই বাদ পড়িয়াছে। অবশ্য সে পরিচয় অনেক স্থলেই সংক্ষিপ্ত। এই অল্পায়তন গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত পরিচয় ভিন্ন আর অধিক কিছু দেওয়া অসম্ভব। রাখালবাবুর ন্যায় যাঁহার সহায় সম্পদ আছে, এ কার্য্য তাঁহার পক্ষেই সম্ভব, অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। রাখালবাবু তাঁহার স্বদেশী বিদেশী সহায়কগণের সহায়তার এবং কলিকাতার মিউজিয়ামের এবং এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পদরাশির সমুচিত ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং ইতিহাসানুরাগী বাঙ্গালী মাত্রেরই চির আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই "বাঙ্গালার ইতিহাস" সঙ্কলনে রাখালবাবু যে সুধু শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, তিনি ইহার পত্রে পত্রে সত্যানুরাগের, নিরপেক্ষতার এবং উদারতারও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। স্বয়ং বন্দ্যঘটীয় কুলীন সন্তান হইয়াও, তিনি আদিশূরের এবং শ্যামল বর্ম্মার তথা কুলপঞ্জিকার ঐতিহাসিকতার আলোচনা করিতে গিয়া, আশ্চর্য্য সত্যনিষ্ঠা এবং উদারতা দেখাইয়াছেন। ঈশ্বর কৃত বৈদিক-কুলপঞ্জিকার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের ইতিহাস আলোচনার রীতির রহস্যোদ্ঘাটন রাখালবাবুর একটি স্মরণীয় কর্ম্ম। বটুভট্ট-রচিত "দেববংশ" প্রসঙ্গে তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের তীব্র সমালোচনা করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহার গ্রন্থে দেবপালের ইতিহাসে লাউসেনের কাহিনী

স্থান লাভ করে নাই, অথচ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ (শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুসরণ করিয়া) নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের উৎকলাধীশের এবং কামরূপাধীশের বিজয়ী বলিয়া কথিত জয়পালকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিদায় দিয়া, তাঁহার আসনে লাউসেনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই মূল্যবান গ্রন্থে যে সকল চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা ইহাকে অমূল্য করিয়া তুলিয়াছে। এই চিত্রনিচয় মধ্যে পালনরপালগণের সময়ে লিখিত এবং নেপাল হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তকের পুষ্পিকার প্রতিকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থপত্রের ক্ষুদ্র আয়তনের হিসাবে দেখিতে গেলে চিত্রগুলিকে সুসম্পাদিত বলিতে হয়। কিন্তু এই শ্রেণীর সচিত্র গ্রন্থের আয়তন আরও বড় হওয়া উচিত ছিল; অন্ততঃ ডিমাই ৮ পেজি হওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে চিত্রগুলি আরও সুস্পষ্ট হইতে পারিত।

রাখালবাবুর গ্রন্থে যে সুধু বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নহে, তিনি এই গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন 'ইতিহাস'। গ্রন্থকার যে আদর্শ লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, গ্রন্থ কি পরিমাণে সেই আদর্শের অনুরূপ হইয়াছে তাহা নিরূপণ করাই সমালোচকের প্রধান কর্ত্তব্য। যে দিকে গ্রন্থকারের লক্ষ্য ছিল না, সে দিক উপেক্ষা করা ন্যায় হউক আর অন্যায় হউক, সমালোচনা কালে তাহা লইয়া অনুযোগ বা "অভিযোগ" করিয়া কোন লাভ নাই। রাখাল বাবুর গ্রন্থের নাম "বাঙ্গালার ইতিহাস" হইলেও "বাঙ্গালীর ইতিহাসের" অনেক দিকই এই গ্রন্থে উপেক্ষিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যে ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ধারাবাহিক কথার আকারে নিবদ্ধ হয় নাই; গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রমাণের উল্লেখ আছে, পত্রে পত্রে বিচার আছে। এই বিচারে রাখাল বাবু ন্যায়পরতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার নিজের মত যাহাই হউক, তিনি পরের মতের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই, এবং পাঠকগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে মতগঠন করিতে পারেন, নিরপেক্ষভাবে তদুপযোগী উপকরণ উপস্থিত রাখিয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালাদেশে বা তাহার আশে পাশে পুরাতন প্রস্তর-যুগের, নব্য প্রস্তর-যুগের এবং তাম্রযুগের যে সকল অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে রাখালবাবু শ্রীযুক্ত কগিন্‌ ব্রাউনের এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্তের সাহায্যে তাহার একটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল মানুষ এই সকল অস্ত্র ব্যবহার

করিত, তাহারা কাহারা, বিভিন্ন প্রকারের শিলানির্ম্মিত অস্ত্রের স্থিতি-স্থানের স্তরভেদ পর্য্যালোচনা করিলে পুরাতন প্রস্তরযুগের মানবের কোনও সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, অর্থাৎ নব্য প্রস্তরযুগের মানবেরা পুরাতন প্রস্তরযুগের মানবের বংশধর না আগন্তুক,—আবার তাম্রযুগের মানবেরা নব্য প্রস্তরযুগের মানবের বংশধর না বিদেশাগত, পাঠকের এই সকল বিষয়ের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার কোন ব্যবস্থাই রাখালবাবু করেন নাই। এই সকল বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এখনও অসম্ভব। তথাপি বিশেষজ্ঞগণ এই সকল বিষয়ে কি মনে করেন, রাখালবাবু তাহার উল্লেখ করিলে পাঠকগণের এই প্রাচীন পাষাণের কথা বুঝিবার সুবিধা হইত।

রাখালবাবুর ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম, "বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আর্য্যবিজয়"। এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে তিনি লিখিয়াছেন,—"এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত **Bengal, Bengalees, Their Manners, Customs and Literature" নামক** প্রবন্ধ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তাই বলিয়া রাখালবাবুর এই পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব নাই এই কথা স্বীকার করিতে পারি না। ইতিহাসে প্রত্যক্ষ, অনুমান, এবং উপমান এই তিন প্রকার প্রমাণের স্থান আছে, "শব্দ" বা "আপ্তবাক্য" (ভ্রমপ্রমাদ রহিত পুরুষের বাক্য) রূপ প্রমাণের কোন স্থান নাই।

রাখাল বাবু শাস্ত্রী মহাশয়কে অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণের সাহিত্যে (৬১২—৬২৩) পৃঃ আমি তাহার আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। রাখাল বাবু দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া যে উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ন্যায় যদৃচ্ছা-কল্পিত রচনা দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের উদ্ভট জাতিতত্ত্বের প্রভাব তৃতীয় পরিচ্ছেদেও কথঞ্চিৎ লক্ষিত হয়। নন্দ মহাপদ্ম কর্ত্তৃক সাম্রাজ্য স্থাপন সম্বন্ধে রাখালবাবু লিখিয়াছেন, "মগধে শূদ্রবংশের অভ্যুত্থান, ও আর্য্যাবর্ত্ত পুনর্ব্বার নিঃক্ষত্রিয়করণের প্রকৃত অর্থবোধ হয় যে, এই সময়ে বিজিত অনার্য্যগণ অবসর পাইয়া পুনরায় মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন (২৯ পৃঃ)।" মহাপদ্মনন্দের সময়ে ক্ষত্রিয়-শূদ্র ভেদ অবশ্যই ছিল, কিন্তু আর্য্যের এবং অনার্য্যের মধ্যে যে জাতিগত ভেদবোধ এবং বিদ্বেষ ছিল তাহার প্রমাণ কি? পাণিনির মতে আর্য্যশব্দের অর্থ স্বামী (প্রভু)

এবং বৈশ্য। মহাপদ্মনন্দের সময়ে এই অর্থই বোধ হয় প্রচলিত ছিল। সুতরাং সেই সময় আর্য্যের এবং অনার্য্যের জাতিবোধের অবকাশ কোথায়? মহাপদ্মের অভ্যুত্থানকে শূদ্রজাতির (অতএব অনার্য্যের) জাতীয় অভ্যুত্থান মনে করিবার কোন কারণ নাই। মহাপদ্ম মগধরাজ মহানন্দীর ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহানন্দী শৈশুনাগবংশের শেষ রাজা। পুরাণে শিশুনাগবংশীয় নৃপতিগণকে "ক্ষত্রবন্ধবঃ" বা হীন ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। স্মৃতি-শাস্ত্র মতে শূদ্রাগর্ভজাত মহাপদ্ম অবশ্যই মাতৃজাতীয় অতএব শূদ্র। কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষত্রিয় পিতার সিংহাসনে অধিকারী মহাপদ্ম যে পিতার কুলমর্য্যাদার কিছুমাত্র দাবী না করিয়া নিখিল শূদ্রজাতির সহিত মিশিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? প্রবাদ অনুসারে মৌর্য্যরাজগণও শূদ্র ছিলেন। "মুদ্রারাক্ষস" নাটকে মৌর্য্যচন্দ্রগুপ্তকে বৃষল বা শূদ্র বলা হইয়াছে। দিব্যাবদানের একটী উপাখ্যানে অশোক বলিতেছেন, "অহং রাজা ক্ষত্রিয়ো মূর্দ্ধাভিষিক্তঃ (৩৭০ পৃঃ)।" সুতরাং মহাপদ্মও হয় ত নিজেকে "অহং ক্ষত্রিয়ো মূর্দ্ধাভিষিক্তঃ" মনে করিতেন। মহাপদ্মের অভ্যুত্থানকে মগধের শূদ্রগণের অভ্যুত্থান মনে না করিয়া সমগ্র মগধবাসীর অভ্যুত্থান মনে করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

মহাপদ্মের বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর সম সময়ের, পাশ্চাত্য জগতে গঙ্গারিডই নামে পরিচিত, বাঙ্গালার রাজ্যের কথা লইয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের সূত্রপাত। এইখান হইতে রাখালবাবুর ইতিহাসেও প্রত্যেক কথার প্রমাণ প্রয়োগ এবং প্রত্যেক মতের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে এই সকল মত গ্রহণ করিতে পারেন, কিম্বা নাও করিতে পারেন। রাখালবাবু কোন কোন স্থলে আমার মত গ্রহণ করিয়া আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন, আবার কোন কোন স্থলে আমার মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এইরূপ অধিকাংশ স্থলেই আমি তাঁহার প্রতিবাদের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু তাই বলিয়া রাখালবাবুর গ্রন্থের সমালোচনা করিতে বসিয়াছি বলিয়াই যে তাঁহার প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিতে হইবে তাহা আমি মনে করি না। মতামত বা সিদ্ধান্ত প্রমাণ সকল একত্র গাঁথিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিবার সূত্র মাত্র। আমি যদি আমার মতের অনুকূল এবং প্রতিকূল সকল প্রকার প্রমাণ উপস্থিত করিয়া থাকি, তবেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করিতে হইবে। কোন্ মতটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত সেই বিচার পাঠকগণ করিবেন। যেখানে মতভেদের অবকাশ আছে সেখানে

বাদ প্রতিবাদ বিফল। কিন্তু রাখালবাবু এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা প্রমাণ অনুযায়ী বা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। "বাঙ্গালার ইতিহাসে" নিবদ্ধ এই শ্রেণীর কয়েকটি সিদ্ধান্তের আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করি।

রাখালবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাণভট্ট কথিত গৌড়াধিপ এবং ইউয়ান চোয়াং কথিত কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক "মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন এবং মহাসেনগুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন (৮৩ পৃঃ)।" এই মতের অনুকূলে তাঁহার একটি যুক্তি, "শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত। হর্ষচরিতের একখানি পুঁথিতে নরেন্দ্রগুপ্ত নামের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত হর্ষচরিতের টীকাকার ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের টীকায় এই কথা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (৮২ পৃঃ)।" "হর্ষ চরিতের" একখানি পুথিতে শশাঙ্ককে নরেন্দ্র গুপ্ত বলা হইয়াছে, একথা বুলার লিখিয়া গিয়াছেন। তার পূর্ব্বে এবং পরে হর্ষচরিতের অনেক পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু অন্য কোন পুথিতে নরেন্দ্র গুপ্ত নাম দেখা যায় নাই কেন? ইহাতে কি মনে হয় না, লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ একখানি পুথিতে নরেন্দ্রগুপ্ত নামটি সংযোজিত হইয়াছিল। "শ্রীনরেন্দ্রাদিত্য" নামাঙ্কিত, শশাঙ্কের মুদ্রার অনুরূপ, একটি সুবর্ণ মুদ্রা শশাঙ্কের একটি মুদ্রার সহিত যশোহর জেলার মহম্মদপুরে পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত জন এলেন (John Allan) মনে করেন এই "শ্রীনরেন্দ্রাদিত্য" নামাঙ্কিত মুদ্রাটি ও শশাঙ্কের মুদ্রা এবং বুলারের পরীক্ষিত "হর্ষচরিতের" পুথির প্রকৃতপাঠ "নরেন্দ্রগুপ্ত" না হইয়া "নরেন্দ্রাদিত্য" হইবে। একখানি মাত্র পুথির "নরেন্দ্র গুপ্ত" লইয়া এত বাদ বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন। "হর্ষ চরিতের" টীকাকার ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের টীকায় কোথাও স্পষ্ট বা অস্পষ্টাক্ষরে গৌড়াধিপকে নরেন্দ্রগুপ্ত বলেন নাই। তিনি এইটুকুমাত্র বলিয়াছেন, "শশাঙ্ক নামা গৌড়াধিপতিঃ।" "হর্ষ-চরিতের" ইংরেজী অনুবাদক কাউয়েল এবং টমাস দেখাইয়াছেন, বাণভট্ট একস্থলে শ্লেষোপমার ছলে শশাঙ্কের নাম করিয়াছেন। শশাঙ্কের কানাকুব্জ আক্রমণের সময় গুপ্ত নামক কুলপুত্র কর্ত্তৃক কুশস্থল বা কান্যকুব্জ আবিষ্কৃত হওয়ার কথা আছে বলিয়াই বা শশাঙ্ককে গুপ্তবংশীয় মনে করিতে হইবে কেন? গুপ্তনামক কুলপুত্র হয়ত শশাঙ্কের একজন সেনানায়ক ছিলেন। সুতরাং শশাঙ্ককে গুপ্তবংশীয় মনে করিবার কোন কারণ নাই।

* John Allans' Catalogue of the coins of the Gupta Dynasties and of Sasanka, King of Gauda, London, 19 4, p lx'v.

পক্ষান্তরে শশাঙ্ককে গুপ্তবংশীয় মনে না করিবার কারণের অভাব নাই। কোনও গুপ্তরাজকে গৌড়াধিপ নামে কথিত হইতে দেখা যায় না। কর্ণসুবর্ণ যে কোনও কালে গুপ্তবংশের রাজধানী ছিল তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। মগধের কোনও নগর, হয়ত পাটলীপুত্র, বরাবর গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল। শশাঙ্ক আদৌ মহাসামন্ত ছিলেন, পশ্চাৎ মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন, একথা সকলেই স্বীকার করেন। তিনি যদি গুপ্তবংশীয় মগধবাসী হইতেন, তাহা হইলে গুপ্তবংশের প্রাচীন রাজধানী হাতছাড়া করিয়া কখনও বাঙ্গালায় আসিয়া কর্ণসুবর্ণে নূতন রাজধানী স্থাপন করিতেন না। মগধে শশাঙ্কের পূর্ণবর্ম্মা নামক মৌর্য্যবংশীয় একজন প্রতিদ্বন্দী ছিল, একথা ইউয়ান চোয়াং উল্লেখ করিয়াছেন। শশাঙ্ক মগধের গুপ্তবংশীয় হইলে তাঁহার শক্তির কেন্দ্র কখনও মগধ হইতে তুলিয়া আনিয়া গৌড়ে স্থাপন করিতেন না। এই যুক্তির প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে, শশাঙ্ক প্রতিদ্বন্দিগণের ভয়ে কর্ণসুবর্ণে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত অধিকার করিবার উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিতেন, তিনি মগধ ছাড়িয়া আরও পূর্ব্ব দিকে সরিয়া আসিবেন কেন? এই সকল কারণে অনুমান হয়, কর্ণসুবর্ণে যে প্রাচীন সামন্তরাজবংশ ছিল, শশাঙ্ক সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে সুযোগ বুঝিয়া সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন। রাখালবাবু লিখিয়াছেন, "তাঁহার (প্রভাকর বৰ্দ্ধনের) মৃত্যুর পরে, উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া, দক্ষিণে দেবগুপ্ত ও পূর্ব্বে শশাঙ্ক প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অতীত গৌরব উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের, স্থাম্বীশ্বর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অপর কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না" (৮৫ পৃঃ)। সমুদ্র গুপ্তের পক্ষে দিগ্বিজয়যাত্রার, ধর্ম্মপালের পক্ষে কাণ্যকুব্জ বিজয় যাত্রার প্রাচীন বংশগৌরব উদ্ধার করা ভিন্ন যদি অন্য কারণ থাকিয়া থাকে, তবে শশাঙ্কের পক্ষে অনুরূপ কারণ থাকা অসম্ভব বিবেচিত হইবে কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক ১৯০৮-৯ সালের আর্কিওলোজিকেল বিভাগের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশিত "বোধগয়া" নামক প্রবন্ধে মগধের তৎকালীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এবং শশাঙ্ক কর্তৃক বোধিবৃক্ষ ধ্বংস সম্বন্ধে যে সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, রাখালবাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ডাক্তার ব্লক লিখিয়াছেন, শশাঙ্কের বোধিবৃক্ষনাশের চেষ্টা বৌদ্ধবিদ্বেষমূলক নহে, পূর্ণ বর্ম্মার সহিত বিরোধমূলক (১৪১ পৃঃ)।

গৌড়াধিপতি ধর্ম্মপাল বঙ্গজননীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও বাঙ্গালাদেশে এতবড় লোক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রাখাল বাবু তাঁহার ইতিহাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে ধর্ম্মপালের সময় লইয়া সুদীর্ঘ বিচার করিয়াছেন, কিন্তু রাজা ধর্ম্মপালের ইতিহাসের যাহা প্রধান কথা এবং পালযুগের বাঙ্গালার ইতিহাসের যাহা প্রধান কথা, তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। ধর্ম্মপালের খালিমপুরের প্রাপ্ত তাম্রশাসনে প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন—

"সীমান্তদেশে গোপগণ কর্ত্তৃক, বনে বনচরগণ কর্ত্তৃক, গ্রামসমীপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক, [গৃহ] চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক, প্রত্যেক ক্রয় বিক্রয় স্থানে বণিক সমূহ (?) কর্ত্তৃক এবং বিলাসগৃহে পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্ত্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া, এই নরপতির ; বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়াছে (গৌড়লেখমালা, ২২ পৃঃ)।"

প্রশস্তিকারের এই স্তুতিবাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হউক ইহার মধ্যে ধর্ম্মপালের শাসননীতির মূল সূত্র সুন্দর প্রকটিত হইয়াছে। সেই মূল সূত্র প্রজারঞ্জন। দেব পালের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের আর একটি শ্লোকে ধর্ম্মপাল প্রবর্ত্তিত পালশাসন নীতির মূলসূত্র কথিত হইয়াছে ; যথা—

"যে রাজা শাস্ত্রার্থের অনুবর্ত্তী শাসন-কৌশলে ।শাস্ত্রশাসন হইতে। বিচলিত [ব্রাহ্মণাদি] বর্ণসমূহকে স্ব স্ব [শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট] ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মপাল নামক সেই রাজাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া, গোপালদেব পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন (গৌড়লেখমালা, ৪২ পৃঃ)।"

এই শ্লোকে দেখা যায়, ধর্ম্মপালাদি নরপালগণ বৌদ্ধ হইলেও এখনকার ভাষায় যাহাকে "অহিন্দু" বলে, তাহা ছিলেন না। তাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন, এবং বর্ণাশ্রম প্রতিপাদক শাস্ত্রানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন।

রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় গোবিন্দ ৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপাল তাহার ২।১ বৎসর পূর্ব্বে পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন "গৌড়রাজ-মালায় (২৩ পৃঃ)" এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। রাখালবাবু এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন (১৬২ পৃঃ)। এ ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ৮১৭ খ্রীষ্টাব্দকে তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুকাল এবং তৎপুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের রাজ্যারম্ভ কাল ধরিয়া লইয়া ভুল করিয়াছি। এই ভুলের কারণ প্রথম অমোঘবর্ষের

সিরুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্লিটের মত লক্ষ্য করিয়াছিলাম না। এই লিপি অমোঘবর্ষের রাজত্বের দ্বিপঞ্চাশৎ বৎসরে, (ফ্লিটের গণনা অনুসারে ৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন) সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং ফ্লিট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে এই লিপির কালানুসারে হিসাব করিলে ৮১৪ বা ৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম অমোঘবর্ষের রাজ্যারম্ভ স্থির করিতে হয় (Epigraphia Indica, vol. vii. p. 201)। প্রথম অমোঘবর্ষের একখানি তাম্রশাসনে যখন কথিত হইয়াছে ধর্ম্মপাল এবং চক্রায়ুধ তৃতীয় গোবিন্দের নিকট "উপনত" হইয়াছিলেন, তখন মনে করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক কান্যকুব্জের সিংহাসন হইতে ইন্দ্রায়ুধের বিচ্যুতি ও চক্রায়ুধের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। সুতরাং ধর্ম্মপালের রাজ্যারম্ভকাল ৮১৪ খৃষ্টাব্দেরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পিছাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া ৮২৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপালের মৃত্যু এবং ৮২৫ হইতে ৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেবপালের রাজত্ব স্বীকার করা অসম্ভব। যাহার পথারী স্তম্ভলিপি ৮৬১ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল সেই রাষ্ট্রকূট রাজ পরবলকে সকলেই দেবপালের মাতামহ বলিয়া স্বীকার করেন। মাতামহ জীবমানে দৌহিত্রের ৮২৫ হইতে ৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩৭ বৎসরকাল রাজত্ব অনুমান করা অসম্ভব, কেন না সচরাচর এরূপ দেখা যায় না। দেবপালের পিতা ধর্ম্মপাল অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ থাকিলে ন হয় রাখালবাবুর সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে পারিতাম। কিন্তু ধর্ম্মপাল যে অন্ততঃ ৩২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন খালিমপুরের তাম্রশাসনই তাহার প্রমাণ। সুতরাং দেবপাল ৮২৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাতামহ পরবলের সঙ্গে সঙ্গে ৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বার্দ্ধক্যে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, এ কথা অনুমান করা সুকঠিন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ সমসাময়িক লিপির সাক্ষ্য ভিন্ন এইরূপ একটা অসাধারণ ঘটনা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সুতরাং যতদিন না এই প্রকার কোন লিপি পাওয়া যায়, ততদিন আমরা অনুমান করিতে বাধ্য, ধর্ম্মপাল তাঁহার শ্বশুর পরবলের সমসময় অর্থাৎ ৮৬১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্ম্মপাল জীবিত থাকিতে প্রতিহাররাজ কান্যকুব্জ অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, একথা রাখালবাবু স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়াই বোধ হয় ৮২৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপালের মৃত্যু কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মপাল জীবনের শেষভাগে ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও, যে প্রবল শত্রুর সহিত

বিরোধে ব্যাপৃত ছিলেন, নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে তাহা কথিত হইয়াছে। যথা—

"তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈ র্জ্জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্য-সুখান্যনৈষীৎ॥"

এখানে শ্লেষোপমা আছে। জয়পাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—উপেন্দ্র [বিষ্ণু] যেমন অসুরবর্গের দমনকারী [ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা] এবং যুদ্ধে (অসুরগণকে পরাভূত করিয়া) অগ্রজ দেবরাজ [দেবপাল] ইন্দ্রকে ত্রিভুবনের রাজ্যসুখ ভোগ করাইয়াছিলেন, জয়পালও তেমনই ধর্ম্মদ্বেষিগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অগ্রজ দেবপালকে ভুবন রাজ্যসুখের অধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন। "গৌড়-লেখমালায়": এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদের টীকায় (৬৬ পৃঃ) শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "জয়পাল-পক্ষে কাহারা 'ধর্ম্মদ্বেষী' বলিয়া সূচিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হইতে পারে নাই।" তিনি এখন বলেন জয়পাল পক্ষে "ধর্ম্মদ্বেষী" অর্থ ধর্ম্মপালের শত্রুগণ। ধর্ম্মপাল জীবিত থাকিতেই জয়পাল ধর্ম্মপালের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর সেই শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া তিনি দেবপালের রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। জয়পাল-পক্ষে "ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা" বিশেষণের এই অর্থই যে সমীচীন সেই বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য, ধর্ম্মপালের এই শত্রুগণ কাহারা, যাহাদিগকে পরাভূত না করিতে পারিলে, ধর্ম্মপালের উত্তরাধিকারীর রাজ্যসুখ ভোগই ঘটিত না? এই প্রশ্নের একই মাত্র উত্তর সম্ভবে। সেই উত্তর এই—ধর্ম্মপাল শেষ বয়সে গুর্জ্জর-প্রতীহার-রাজ মিহিরভোজের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই যুদ্ধের উপক্রমেই হয় ত মিহিরভোজ কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন। তখন প্রতীহার-রাজের গতিরোধ করিবার জন্য জয়পাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে সারনাথ খনন কালে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, জয়পাল এক সময়ে পাল-প্রতীহার রাজ্যের সীমান্তে, বারাণসীতে, অবস্থান করিয়াছিলেন। এই লিপিখানির সম্বন্ধে রাখালবাবু কোন কথাই বলেন নাই। সুতরাং আর্কিয়োলজিকেল বিভাগের ১৯০৭-৮

সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী হইতে স্যার জন মার্সেল ও ডাক্তার ষ্টেন কনোদ্ধৃত পাঠ (৭৫ পৃঃ) প্রদান করিতেছি—

"বিশ্বপালঃ ॥*

দশ চৈত্যাংস্ত যৎপুণ্যং কারয়িত্বার্জ্জিতং ময়া [।]

সর্ব্বলোকো ভবেত্তেন সর্ব্বজ্ঞঃ করুণাময়ঃ ॥

শ্রীজয়পাল * * * এতান্নুদ্দিশ্য কারিতমমৃত পালে [ন]"

"বিশ্বপাল॥ আমি দশটি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছি তাহার ফলে সকল লোক সর্ব্বজ্ঞ এবং করুণাময় হউক। শ্রীজয়পাল এই চৈত্য উদ্দেশ্য করিয়া অমৃত পালের দ্বারা ... করাইয়াছেন।"

মার্সেল ও ষ্টেনকনো অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই লিপির অক্ষর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দের অক্ষরের মত, এবং এই জয়পাল সম্ভবতঃ পালরাজবংশীয় জয়পাল। এই অনুমান সত্য হইলে, মনে করিতে হইবে, জয়পাল ধর্ম্মপালের (পরে দেবপালের) শত্রুগণকে বাধা দিবার জন্য বারাণসীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; এবং সেইখানে অবস্থানকালে, সারনাথে দশটি চৈত্য এবং লিপিতে কথিত আরও একটা কিছু (যাহার নাম লিপিতে পড়া যায় না তাহা) অমৃতপালের দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কান্যকুব্জ যখন প্রতীহার-রাজ ভোজের হস্তগত হইয়াছিল, তখনই অবশ্য সীমান্ত রক্ষার জন্য বারাণসীতে বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ধর্ম্মপালের সময়েই কান্যকুব্জ প্রতীহার-রাজ ভোজের হস্তগত হইয়াছিল। আমাদের হাতে যে কিছু প্রমাণ আছে, তাহার বলে অন্য কোনরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। ধর্ম্মপালের রাজত্ব মোটামুটী ৮০৫ হইতে ৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে।

ধর্ম্মপালের সময়ে গৌড়, রাষ্ট্রকূট, এবং গুর্জ্জর-প্রতীহার এই তিনটি মহাশক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল রাখালবাবু তাহার রহস্য উদঘাটন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রাজপুতানার মাড়োয়ারের অন্তর্গত ভিনমল (ভিল্লমল) নগর গুর্জ্জর-প্রতীহার রাজ্যের আদিম রাজধানী ছিল। দক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র দেশ রাষ্ট্রকূট রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। গুর্জ্জর রাজ্য এবং রাষ্ট্রকূট রাজ্য এতদুভয়ের মধ্যে লাট ও মালব দেশ অবস্থিত ছিল। লাট এখন গুজরাট নামে পরিচিত; তৎকালে রাজপুতানাকে গুর্জ্জর বলিত। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে

* বোধ হয় কোন দেবতার নাম। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় মনে করেন "বিশ্বপাল" ক্ষেত্রপাল নামক দেবতাকে বুঝাইতে পারে।

বৎসরাজ গুর্জ্জরের অধীশ্বর ছিলেন, ধ্রুবরাজ রাষ্ট্রকূটরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন এবং ইন্দ্রায়ুধ কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গুর্জ্জরপতি বৎসরাজ গৌড়বঙ্গ আক্রমণ করিয়া গৌড়পতির এবং বঙ্গপতির রাজছত্রদ্বয় কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন, এ সময় পালকুলের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব গৌড়ের অধীশ্বর এবং বঙ্গের অধিরাজ। বৎসরাজের এই দিগ্বিজয় ব্যাপারে রাষ্ট্রকূটপতি ধ্রুবরাজ (৭৭৫ হইতে ৭৯৩ খৃঃ) ব্যস্ত হইয়া উঠেন এবং অতুল পরাক্রম সেনাবলের সাহায্যে বৎসরাজকে অচিরাৎ দুর্গম মরুমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। প্রশস্তিকারের এই উক্তি অমূলক না হইলেও ধ্রুবরাজ যে গুর্জ্জররাজ বৎসরাজকে একেবারে দমন করিতে পারিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। ধ্রুবরাজের উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোবিন্দ (রাজত্ব ৭৯৪ হইতে ৮১৫ খৃষ্টাব্দ) গুর্জ্জরপতির গতিরোধ করিবার জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে লাট দেশের (বর্ত্তমান গুজরাটের) মহাসামন্তের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জেজ্জের পুত্র কর্করাজ নাগাবলোক নামক নৃপতিকে পরাভূত করিয়া, তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। কর্করাজের পুত্র পরবলের সময়ে, ৮৬১ খৃষ্টাব্দে, পথারী স্তম্ভলিপি সম্পাদিত হইয়াছিল। ১৯১১ সালের ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী পত্রে প্রকাশিত (২৩৯—২৪০ পৃঃ) একটি প্রবন্ধে শ্রীযুত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, জেজ্জের এই অগৃহীতনামা লাটবিজয়ী অগ্রজ ইন্দ্ররাজ; এবং জেজ্জের পুত্র কর্করাজ যে নাগাবলোককে পরাভূত করিয়াছিলেন তিনি গুর্জ্জর প্রতীহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট (বা নাগভট্ট)। দ্বিতীয় নাগভট যে নাগাবলোক নামেও পরিচিত ছিলেন, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। রাখালবাবু ভাণ্ডারকারের এই প্রবন্ধের উল্লেখমাত্রও করেন নাই। আমার নিকট ভাণ্ডারকারের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জ্জরপতির গতিরোধ করিবার জন্য এক ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে লাট দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং আর এক ভ্রাতা জেজ্জকে মালবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পথারী প্রাচীন মালবের সীমার মধ্যে অবস্থিত। পরবলের পিতা কর্করাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহচর্য্য করিতে গিয়াই সম্ভবতঃ নাগাবলোক বা দ্বিতীয় নাগভটকে পরাভূত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নাগভট যখন রাষ্ট্রকূটরাজের সহিত বিরোধে ব্যাপৃত সেই সুযোগে ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া উত্তরাপথে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটের বংশের প্রশস্তিকারগণ

তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক গুর্জ্জরপতি দ্বিতীয় নাগভটের পরাজয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু তাঁহারা তৃতীয় গোবিন্দের উত্তরাপথ অভিযান সম্বন্ধে আর যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতিশয়োক্তি পরিপূর্ণ। যথা—

(১) রাষ্ট্রকূট মহাসামন্ত কর্কের বরোদায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে তৃতীয় গোবিন্দ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, তিনি গঙ্গা এবং যমুনানদী জয় করিয়া, এই দুই নদীর চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। (Indian Antiquary, XII. p. 159)

(২) প্রথম অমোঘবর্ষের নিলগুণ্ডে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে, তিনি কেরলের, মালবের, গৌড়ের, গুর্জ্জরের, চিত্রকূট নামক গিরিদুর্গের অধিবাসিগণকে এবং কাঞ্চীর অধিপতিগণকে বদ্ধ করিয়া কীর্ত্তি নারায়ণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন (Epigraphia Indica, Vol. VI. pp. 102-103)।

(৩) প্রথম অমোঘবর্ষের একখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে, গোবিন্দের অশ্বগণ হিমালয় পর্ব্বতের নির্ঝরের জলপান করিয়াছিল এবং ধর্ম্ম পাল এবং চক্রায়ুধ স্বয়ং তাঁহার নিকট নতশির হইয়াছিলেন (রাখালবাবুর "বাঙ্গলার ইতিহাস," ১৬৩ পৃঃ, ৬৭ নং টীকা)।

গৌড়বাসিগণকে বদ্ধ করার কথার সহিত গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের তৃতীয় গোবিন্দের নিকট স্বেচ্ছায় নতশির হওয়ার কথার নিতান্ত বিরোধ লক্ষিত হইবে। তৃতীয় গোবিন্দ যদি গৌড়গণকে বদ্ধ অর্থাৎ পদানত করিয়া থাকেন, তবে ত গৌড়াধিপ সেই সঙ্গে সঙ্গেই বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বয়ং উপনত হইবার অবকাশ ছিল না। প্রতীহার বংশের লিপিনিচয় পাঠে জানা যায় তৃতীয় গোবিন্দের আক্রমণের ফলে গুর্জ্জর প্রতীহার রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল না, বরং ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। রাষ্ট্রকূট প্রশস্তিকারগণ যেমন তৃতীয় গোবিন্দের পক্ষে গুর্জ্জর এবং গঙ্গাযমুনার তীরবর্ত্তী প্রদেশ জয় করিবার দাবী করিয়াছেন, মিহিরভোজের গোয়ালিয়রে প্রাপ্ত শিলালিপিতে প্রতিহার বংশের প্রশস্তিকারও দ্বিতীয় নাগভটের পক্ষে আনর্ত্ত (লাট—বর্ত্তমান গুজরাত) মালব, তুরস্ক, বৎস্য মৎস্য, প্রভৃতির দেশের রাজগণের গিরিদুর্গ অধিকার করিবার দাবী করিয়াছেন। পাল, প্রতীহার, এবং রাষ্ট্রকূট এই তিনপক্ষের প্রশস্তিকারগণের স্তুতিবাক্যের সমন্বয় করিতে গেলে, এই ইতিহাস পাওয়া যায়, —রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জ্জর-প্রতীহার-রাজ নাগভটকে পরাজিত করিয়া লাট এবং মালব হস্তগত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট-রাজও যেমন গুর্জ্জর-প্রতীহার-রাজের শত্রু ছিলেন, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালও তেমনি

গুর্জ্জরপ্রতীহার-রাজকে দমন করিবার জন্য পরস্পরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সন্ধির ফলেই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রামভদ্র বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পাল ও রাষ্ট্রকূটের এই সন্ধির অন্যতম ফল সম্ভবতঃ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক রাষ্ট্রকূট পরবলের দুহিতা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ। পাল-রাষ্ট্রকূটের এই সখ্য যে প্রথম অমোঘ-বর্ষের সময় পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল তাহারও প্রমাণ আছে। প্রথম অমোঘবর্ষের শিজয়ে প্রাপ্ত লিপিতে কথিত হইয়াছে,—

"বঙ্গাঙ্গমগধমালববেঙ্গিশৈরর্চ্চিতাতিশয়ধবলঃ।"

"অতিশয় ধবল" প্রথম অমোঘবর্ষের নামান্তর। মালবপতি এখানে রাষ্ট্রকূট পরবলকেই বলা হইয়াছে। পরবল অবশ্যই রাষ্ট্রকূট অধিরাজ অমোঘবর্ষকে অর্চ্চনা করিতেন। কিন্তু বঙ্গাঙ্গমগধপতি অর্থাৎ গৌড়পতি সম্বন্ধে "অর্চ্চনার" অর্থ "সখ্য" মাত্র বুঝিতে হইবে।

ধর্ম্মপাল এবং তাঁহার কাল সম্বন্ধে এই সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়া আমরা যে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলাম তাহার সার কথা এই—আনুমানিক ৮০৫ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপাল পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া, উত্তরাপথের সার্ব্বভৌম পদলাভের জন্য, কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং কান্যকুব্জ-পতি ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া, ভোজ মৎস্য কুরু যদু যবন অবন্তী গান্ধার কীর প্রভৃতি দেশের সামন্ত শ্রেণীর নরপালগণের সম্মতি অনুসারে, অনুগত চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে গুর্জ্জর প্রতীহার-রাজ দ্বিতীয় নাগভটের সহিত ধর্ম্মপালের এবং তাঁহার অনুগত চক্রায়ুধের বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রতীহার রাজের প্রশস্তিকার মতে এই বিরোধে দ্বিতীয় নাগভট জয়লাভ করেন। ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে দ্বিতীয় নাগভট হয়ত কান্য-কুব্জও অধিকার করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত সিদ্ধান্ত যে অসমীচীন তাহা "গৌড়রাজমালায়" প্রদর্শিত হইয়াছে (২৬-২৭ পৃঃ)। আর একদিকে লাট এবং মালব লইয়া প্রতীহার রাজ দ্বিতীয় নাগভটের সহিত রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দের বিরোধ উপস্থিত হয়। তৃতীয় গোবিন্দ ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে লাটে এবং কেক্কজকে মালবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন প্রতীহার রাজের সহিত বিরোধে ব্যাপৃত ধর্ম্মপাল তৃতীয় গোবিন্দের সহিত এই সখ্যের সূত্রে কালক্রমে পরবলের দুহিতা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। অনুমানিক ৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপাল একরূপ নির্ব্বিরোধে সার্ব্বভৌম পদ উপভোগ করিয়াছিলেন। তৎপর দ্বিতীয়

নাগভটের পৌত্র মিহির-ভোজ গুর্জ্জর সিংহাসন লাভ করিয়া গৌড়াধিপের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়েন এবং অল্পকালের মধ্যেই কান্যকুব্জ অধিকারে সমর্থ হয়েন। ধর্ম্মপাল তখন মিহির-ভোজের গতিরোধ করিবার জন্য অন্যতম পুত্র জয়পালকে বারণসীতে প্রেরণ করেন। কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠিত প্রতীহার রাজের সহিত বিরোধের অবসানের পূর্ব্বেই উত্তরাপথের শেষ সার্ব্বভৌম নরপাল, বঙ্গমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান, মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক পরমেশ্বর ধর্ম্মপাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

মেঘের প্রতি

'ওগো বরষার　　নীল নব ঘন
　　দূরদিগন্ত চারী
ধরণীর ধ্যান　　ধারণার ধন -
　　নিখিল চিত্ত হারী
স্নিগ্ধ শ্যামল　　মুরতি ধরিয়া
　　এস গো গগন ছেয়ে
আতপ-তাপিত　　এ ধরণী দেখ
　　আছে তব পথ চেয়ে।
শুনাও মন্দ্রে　　আশ্বাস বাণী—
　　যাবে গো দুঃসময়,
এত তপস্যা　　বিশ্বে কখন
　　ব্যর্থ নাহিক হয়।
শান্তি-সলিল　　ধারায় ধরার
　　সন্তাপ যাক্ ভাসি,'
ফুটিয়া উঠুক　　অধরে আবার
　　সুখ সোহাগের হাসি।

ওগো মেঘ, এই ধরণীর মত
যাহার হৃদয় তলে,
চিরদিন শুধু তৃপ্তি বিহীন
তীব্র তিয়াসা জলে,
কোথা আছে চির বাঞ্ছিত তা'র—
সন্ধান নাহি জানে।
চির প্রতীক্ষা লইয়া বক্ষে
চাহি' সুন্দরের পানে
হেথা ধূলিতলে বিরহ-শয়নে
আছে নিশিদিন জাগি,'
ওহে দূরাগত, আশার বারতা
এনেছ কি তার লাগি' ?
কোন্ বরষার বরষণে তার
জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
চির জনমের ব্যাকুল বিরহ
কবে হবে অবসান !

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

উল্কা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৬

সে দিন বাড়ী ফিরিয়া অবধি গীতাপাঠ, পূজা, জপ, ও সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধান-সকল পূর্ণ বেগে আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমি দেবদেবীর বড় ভক্ত ছিলাম না। আসল কথা মূর্ত্তি পূজারূপ প্রথমাবলম্বন আমার জন্য নয়। শিক্ষানবিশীর কাল আমার বিগত জন্মের সহিত গত হইয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে আমার আদৌ সন্দেহ ছিল না ; কিন্তু আজকাল স্ত্রী-দেবতার পূজা করিতে ভাল লাগিত। দেবীর মুখের পানে চাহিতে গিয়া দেখি—সেই লক্ষ্মী-মেয়েটিরই মুখ। বড়

বিপদেই পড়িয়া গেলাম। শেষে হঠাৎ একদিন মনে হইল যে, সে বোধ হয় কোন মানবী নয়—মানবী-রূপিণী অবিদ্যার বিকার। যেমন জগৎ-প্রপঞ্চ মায়ার বিকার, বস্তুত এই জগতের যথার্থ কোন সত্ত্বা নাই, তেমনি অলৌকিক লাবণ্যবতী লক্ষ্মীর বস্তুতঃ কোন সত্ত্বা নাই, সে কোন মায়ারূপিণী ছায়া মাত্র।

কিন্তু হায়রে মানুষের মোহভরা মন! মায়ার বিকার জানিয়া সে শিহরিয়া সরিয়া পলায়ন না করিয়া, বরং দুই বাহু মেলিয়া সেই মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ছুটিতেই চায়।

একদিন হঠাৎ শৈলেন খপ্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কি হয়েছে মনু?" আমি চকিত হইয়া উঠিলাম "কই, কি হয়েছে?"

"না সত্যি, যেন কেমন কেমন। আর ত সাংখ্য শরীরের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনাই কর না। যদি মনে কোন নূতন ভাব জেগে থাকে, আমায় কেন লুকোও, খুলেই বল না ভাই?"

আমি হাসিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর দিলাম "আমার মন সেই পুরাণকালে আদিম যুগের মতই আছে; নূতনত্বের ধার দিয়েও সে চলে না। সে জন্য তুমি কিছু ভেব না ভাই।"

শৈল যেন আমার কথাগুলা বিশ্বাস করিল না। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। আমি সে হাসি দেখিলাম, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না।—কেন, কি জানি ঈষৎ লজ্জা বোধ হইল। এ আবার কি নূতন বালাই! লজ্জার কি কাজ করিয়াছি যে, কাহারও কাছে লজ্জিত হইব। দোষীই ত লজ্জা পায় জানি; আমি ত কাহারও কাছে কোন দোষে দোষীই নই।

এমন সময় তড়িৎ আসিয়া সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের গল্পের মধ্যে আমার একটু স্থান হইবে? কিন্তু দোহাই তোমাদের, যদি আপাততঃ তোমরা 'ম্যাটার' 'ফোর্স' 'হিট' অথবা 'গ্র্যাভিটি' ইত্যাদি অবোধ্য কঠোর বিষয় সকলের আলোচনায় ব্যস্ত থাক,—তবে আমার কাজ নাই।"

শৈলেন স্ত্রীর দিকে অতি কোমল সপ্রেম চক্ষে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল; বলিল "না, না, যাবে কেন, এস। তোমার স্থান কোথায় নাই তড়িৎ? আমার সর্ব্বত্রই ত তুমি ভরিয়া আছ।"

কথাটা কি প্রকৃত? শৈলেনের উচ্চারণভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরে সে বিষয়ে একতিলও সন্দেহ মনের কোণে কে স্থান দিতে পারে? কিন্তু আমার কাণে আবার কেমন সহসা সেই সাগ্রহ অভিব্যক্তি বাজিয়া উঠিল—

"আমি তোমায় সেই প্রথম দিন হইতেই ভালবাসিয়াছি············।"

মুখ হইতে একটু ব্যঙ্গের বা অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া থাকিবে, কারণ আমার মুখের দিকে চাহিয়াই শৈলও তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিল "কেন মনু, কি এমন অন্যায় বলিলাম? আচ্ছা, ইলেকট্রিসিটির সর্ব্বব্যাপকত্ব জানিতে ত?"

বোধ হয় তাহার ঐ উচ্চারিত "ইলেকট্রিসিটির" নামটা শুনিতে পাইয়াই তাহার স্ত্রী ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন, কেন না তিনি যে রীতিমত একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সেটুকু ঠিক তাঁহার সেই মুহূর্ত্তে উচ্চারিত কণ্ঠস্বরেই বুঝিতে পারা গেল। আহা বেচারা বঙ্গবধূ! হাজারই তোমায় বিদেশী সাজনে সাজিয়া তুলিতে চেষ্টা করুক, তথাপি তোমার চিরভ্যস্ত ধর্ম্ম তুমি ত্যাগ করিবে কেমন করিয়া? শিক্ষা, সংসর্গ যেটুকু পারে, সেই টুকুই তুমি লাভ করিয়াছ! —এই যেমন পাউডার রুজ মাখা, একটুখানি টানা স্বরে কথা কহা, কেদারা পাতিয়া বসা এবং হিল-সু পায়ে দিয়া সামনে ঝুঁকিয়া চলা ইত্যাদি। যদি পড়া শুনা করিলে, ত বড় জোর দু পাতা টেনিসনের কবিতা, না হয় খানকয়েক "সোসাইটি নভেলস্।" যদি দেখিলে তাহাদের মধ্যে কোনখানায় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বা প্রজাপতি-জীবনের বিরুদ্ধে দুটো কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, অমনি সেখানা তোমাদের ত্যাজ্য হইয়া গেল। বিদ্যা ও ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞানত এই; কলাবিদ্যা সম্বন্ধে, কার্পেটে ফুল কাটা ও কাগজে রংএর দুইটা আঁচড় দিয়া নিজেকে র‍্যাফেলের সমক্ষ স্থানীয় অনুভব করা। কোন উচ্চ উদার অথবা জটিল ভাব সম্বন্ধে ইঁহাদের প্রায় অধিকাংশেরই প্রবেশ শক্তি একরূপ নাই বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না।'

ঐ দেখ! যাহা ভাবিতেছিলাম, ঠিক তাহাই কি না? আমার চিন্তাস্রোত কোন্ পথবাহিনী তাহা ধরিয়া ফেলিবার শক্তি কি আর এই সভাজগতের নব্য-নারীবৃন্দের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিতে পারে? যাঁহার সম্বন্ধে আমি এত বড় একটা অভাব অনুভব করিতে পারিয়া তাঁহার এবং তাঁহার জাতির আর আর সকলের জন্যই মনে মনে সহানুভূতি বোধ করিতেছিলাম, সেই তিনিই সহসা সেই আমা-কেই অত্যন্ত কৃপার্হ বোধ করিয়া বলিলেন "আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার কি হয়েচে, আমায় বলত? ক'দিন থেকে তোমায় যেন সদাসর্ব্বক্ষণ অন্যমনা দেখ্‌তে পাই।"

"ঐ শোন মনু! যার যার চোক আছে, সবাই এটা দেখতে পায়, একা তুমিই দেখতে পাচ্ছ না। আমায় ত তোমার আদিমকালের মনের গ্যারান্টি

দিয়ে সেরে দিলে, কিন্তু এইবার—কথা বা'র না করে নিয়ে ওকে তুমি কিছুতেই ছেড়ে দিও না তড়িৎ! নিশ্চয় নূতন কোন ভাবনা ওর মনের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে লজ্জার সঙ্গে কুণ্ঠি লাগিয়ে দিয়েছে। আবার বলা হয়, ওঁর আদিমযুগের মন নূতনের ধার ধারে না।"

শৈলেন ঝোপ বুঝিয়া কোপটা দিল মন্দ নয়। আমার মুখের চেহারাখানাত আমি স্বচক্ষে আর দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সেখানে যে খুব একটা সন্দেহজনক প্রমাণ আমার বিচারকগণ লিখিত দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আমার নিজের চোকই তাঁহাদের মুখে খুজিয়া পাইয়াছিল! দুজনে পরস্পরের সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিবার পর শৈল ব্যঙ্গ করিয়া বলিল "তোমার ঠাকুরপো যাজ্ঞবল্ক্যের কূটতত্ত্ব অথবা সূক্ষ্ম শরীরের 'প্রত্নতত্ত্ব' গবেষণায় দিন দিন অমন সূক্ষ্ম-শরীর লাভ করচেন, জান তড়িৎ!"

তড়িৎও তাহার হাস্যের সহিত যোগ দিয়া তাহার দিকে কৃত্রিম কোপ-কটাক্ষ করিয়া কহিয়া উঠিলেন "আহা কি সূক্ষ্ম-বিচারক গো! 'প্রত্নতত্ত্ব' না 'প্রেতিনি তত্ত্ব!' তোমরা ওঁর বিয়ে দিচ্চ না, তাতে আর ভাবনা হবে না!"

"হাঁগো সত্যি না কি? তবে যে বলেন, ভীষ্মের মত চিরকুমার থাকবেন। আমরা এখন কি করব বল? আমাদের কি আর অপরাধ! উনিই যে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছেন। দেখে শুনেই ত হাল ছেড়ে দেওয়া গেছে। কিছুতেই যখন বিয়ে করবে না, তখন আর উপায় কি? যাক, অভাগা এ জন্মের মত পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠতম সুখে বঞ্চিতই না হয় রয়ে গেল। একটা গান ওকে শুনিয়ে দাও ত তড়িৎ, বেচারী আজ যেন মুষড়ে পড়েচে।"

মনে মনে অকস্মাৎ তীব্র ক্রোধের উদ্রেক হইল। ইচ্ছা করিতেছিল সেই মুহূর্ত্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গলা ছাড়িয়া চেঁচাইয়া উঠি; বলি "ওরে নির্ব্বোধ! অর্ব্বাচীন! তোর মত বড় প্রকাণ্ড গাধা ভূভারতে আর কোথাও নাই!" কিন্তু কেনই বা রাগ করিব? কেনই বা গালি দিব? কিসের জন্য এমন একটা হেতু-ভিত্তিবিহীন আক্ষেপ চিত্তকে এমন অনর্থক ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে চাহিল? নিজেরই নিকট যেন ইহা একটা হেঁয়ালিরই মত আশ্চর্য্য ঠেকিতে লাগিল। সত্যই ত—বিবাহত করিবই না! কে বলিল আমার বিবাহে ইচ্ছা আছে? কখনও না—কিছুতেই না। এমন সুখের স্বাধীনতায় জলাঞ্জলী দিয়া স্বেচ্ছায় নিজেকে শৃঙ্খলিত করিব, এমন আহাম্মক আমি নই—তা হউক না কেন স্বর্ণশৃঙ্খল! তবে আবার

উল্‌টিয়া এ ক্রোধ কিসের ? বাস্তবিক, মানুষের মনকে চিনিয়া উঠা দুষ্কর—তা কি পরের আর কি নিজের ! এই মানসিক সূক্ষ্মতত্ত্ব বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। বিষয়টাও মন্দ নয় ! বেশ হইবে।—তাহাতে অতি সুন্দর সুন্দর সব জটিল তত্ত্বের কথা দেওয়া থাকিবে। বিস্তর দেশী বিদেশী মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, এবং পরের মনের মতই নিজের মনও যে মানুষের নিজেরই অবোধ্য, এই নূতন তত্ত্ব তাহাতে প্রমাণ প্রয়োগ সহিত প্রদত্ত হইবে। এর পূর্ব্বে বোধ হয় আর কোন ঋষি বা জর্ম্মন, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজ, আমেরিকান পণ্ডিত এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের আবিষ্কারে সমর্থ হ'ন নাই। এ আমারই প্রথম আবিষ্কার !

বৌদিদি কোন্ সময় পিয়ানোর নিকট উঠিয়া গিয়াছিলেন চাহিয়া দেখি নাই,—একেবারে গান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে জানিতে পারিলাম। গান ! তা গান জিনিসটা অপছন্দ জিনিস নয়। ওটা আমিও একটু একটু পছন্দ করি। কিন্তু মেয়েমানুষদের যেমন সকল তাতেই একটা তুচ্ছ করা স্বভাব, নষ্ট করিয়া ফেলা অভ্যাস, এখানেও সেই ন্যাতাজোবড়ান অপচয় নীতির ব্যতিক্রম ঘটিতে বড় দেখা যায় না। পুরাতন সঙ্গীতশাস্ত্র—সে যে কি গম্ভীর, কি গভীর—অতলস্পর্শ ভাব সমুদ্রের রত্নাকর—কি অপার নীরধী, যাঁহারা ভাল করিয়া এই শাস্ত্রের আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমি অবশ্য হাতেকলমে শিক্ষা করি নাই, কিন্তু যেটুকু ও একজন ভাল ভাল ওস্তাদের কাছে শুনিয়াছি তাহাতেই বুঝিতে পারি নারীহস্তে এই দেবারাধনার বস্তু প্রায় শিশুর ঘুম পাড়ানিয়া-ছড়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। যেমন চিত্রে তেমনি সঙ্গীতে এই নারী তানসেনগণ শ্রম, যত্ন ব্যতিরেকে খেয়ালানুসারে বর্ণপরিচয় মাত্র করিয়া থাকেন এবং সেই অল্প বিদ্যাই তাঁহাদের পক্ষে "ভয়ঙ্করী" হইয়া দাঁড়ায়। বাজনার উপর আঙ্গুলগুলি কেমনভাবে ক্রীড়া করিলে দর্শকের চোখে সুন্দর ঠেকিবে, এ ভিন্ন সেই মঢ় যন্ত্রটার চাইতে তাঁহাদের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। অবশ্য কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হয় না, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে সে কচিৎ !

আমার মনে হয় একমাত্র রন্ধন-কার্য্যটি ভিন্ন, মেয়েমানুষে ঠিক ভাল করিয়া আর কোন কাজই যথার্থতঃ করিতে পারে না। বাবুর্চ্চি, বা রসুইয়া বামুন অনেক স্থলে অবশ্য খুব ভাল রান্নার প্রশংসাপত্র পাইয়া থাকে, কিন্তু সেখানেও পুরুষের পক্ষে এটা ব্যতিক্রম মাত্র, সচরাচর নয়। প্রায়ই মেসের বাসায় বা নারীবর্জ্জিত গৃহস্থালীতে এই বামুন-ঠাকুরদের নিজস্ব প্রস্তুত

পেটেন্ট ঝোল চড়চড়িতে হতভাগা ভোক্তাগণের চক্ষের জল বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তাই আমার মনে হয়, যাহারা যে বিশেষ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে সেই ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া যাহার মধ্যে যে জিনিষ নাই তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে সেই জিনিসে পরিণত করিবার চেষ্টা করা মহা অপরাধ। যাহার মধ্যে যাহা নাই, সে কেমন করিয়া তাহা পাইতে পারে? কাজেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় না, বিকৃত হইয়া উঠে। মেয়েরা যখন অমন সুক্তানি, ঘণ্ট, চচ্চড়ি ও কালিয়া রাঁধিতে পারে, তখন দুখানা কালিঘাটের পট আঁকিতে অথবা তাল মানের সম্বন্ধ-বিহীন দুইটা কবিতা আওড়ানগোছ গান গায়িতে না জানিলেই কি আর তাঁহারা ক্ষমার্হ হইতে পারেন না। আমিতো বলি এক ভাঁড় জলো দুধ না লইয়া একটুখানি নির্জ্জলা খাঁটি দুধ হয় সেই ভাল।

আমি যদি কখনও বিবাহ করিতো মস্ত বড় রাঁধুনী দেখিয়া বিবাহ করিব। লক্ষ্মী হয়তো খুব ভাল রাঁধিতে পারে। কারণ সে পট আঁকিতে কবিতা পড়িতে এবং 'টেমটেমি' বাজাইতে জানে না। এই সকল গুলির জন্যই শুধু লক্ষ্মীকে আমার গৃহলক্ষ্মী করিতে লোভ হইতেছে। তা ছাড়া আর কোন কিছুই না।

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনেক উৎকট ব্যাধি পরজীবনে আমার হইয়াছে, সে সকল রোগমুক্তির পর পরমানন্দে আমার মন ভরিয়া গিয়াছে, হৃদয়ের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় পুলক সঞ্চার হইয়া জীবন বড় মিষ্ট লাগিয়াছে; কিন্তু অন্ধ বালক নয়ন পাইয়া যে আনন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিল, যে পুলকোচ্ছ্বাসের উন্মাদনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল তাহার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না; আমার শিশুদেহের শিরায় শিরায় তরল শোণিতের কি খরস্রোত তখন বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা এক মুখে কি বলা যায়? অকারণে কত কথাই তখন অনর্গল বলিয়া যাইতাম, অপ্রয়োজনে কতবার তখন ঘর বাহির করিতাম, ভবানীপুরের জীর্ণ বাসার, উপর নীচে অহেতু তখন কতই যে দৌড়িয়া বেড়াইতাম তার সীমাশেষ নাই। এক-

খানি শীর্ণ অপূর্ণ শিশুদেহের মধ্যে যেন লক্ষপ্রাণের জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, আমি তাহারই উন্মত্ততায় দিবারাত্রি অধীর হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতাম। ভবানীপুরের ক্ষুদ্র বাড়ীটি আর আমায় ধরিয়া রাখিতে পারে না—স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে চক্ষুর পীড়ার উপশম হইবে বলিয়া ডাক্তার সাহেবের অভিমত অনুসারে প্রতিদিন গঙ্গার ধারে এবং গড়ের মাঠের খোলা হাওয়ায় বেড়াইবার নিমিত্ত কুক কোম্পানীর আড়গড়া হইতে আমার জন্য ফিটন্ আর জুড়ি ভাড়া করা হইয়াছিল। একাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন বেড়াইতে গিয়াছি, গঙ্গা কেমন বা গড়ের মাঠই বা কেমন তাহার কোন ধারণাই এ অন্ধ বালকের হয় নাই; আজ যখন দৃষ্টি খুলিল তখন এই জন-কোলাহল-পরিপূর্ণ কলিকাতা নগরী আমার নিকট ইন্দ্রের অমরাপুরী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এতকাল ইডেন্ গার্ডেনের ইংরাজি বাদ্য কাণে শুনিয়াছি, বাগানের কিছুই দেখিতে পাই নাই, আজ যখন দীপ্ত আলোকমালায় উজ্জলিত ইংরাজ বালবৃদ্ধ যুবক-যুবতীর হাস্য কলরবে মুখরিত, বৃক্ষ লতা ফুলপল্লব-সজ্জিত ইডেন গার্ডেন দেখিলাম, সে যে কি অভিনব অপূর্ব দৃশ্যই দেখিলাম তাহা আমার বয়সের বালকের পক্ষে বর্ণন করা অসম্ভব। যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, চক্ষু আর ফিরাইতে পারি না জাহাজে জাহাজে গঙ্গা নদীর বুক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, সে কি প্রকাণ্ড জাহাজ! নৌকা অত বড় হইতে পারে, তাহা কি জানি? মাস্তুল রশা রশি আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। দুই বৎসরের ও অধিককালব্যাপি অন্ধতার পর চক্ষু পাইয়া এই বসুন্ধরার যে কোন বস্তুর উপরেই দৃষ্টি আমার পড়ে নয়ন আর ফেরে না, কলিকাতা সহরের অতি জীর্ণ ক্ষুদ্র খোলার বাড়ীর চালাখানার দিক হইতেও চক্ষু ফিরাইয়া নেওয়া দুঃসাধ্য। পরজীবনে দুর্ভিক্ষপীড়িতকে আহার করিতে দেখিয়াছি; সে যেমন একহাতে খাইয়া তৃপ্তি বোধ করে না আমিও, তেমনি আমার একটি চক্ষু দিয়া এ সহরের সব দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছিলাম না, মনে হইত আরও দুই চারি দশটি চক্ষু আমার থাকিলে এতদিনের দৃষ্টিহীন জীবনের ক্ষতিপূরণ করিয়া নিতে পারিতাম। আজ বুঝিতেছি যাহা দেখিতে চাই, যাহা আমার প্রিয়দর্শন, তাহা সহস্র চক্ষু দিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না, ধ্যানে, মননে, নয়নে যত প্রকারেই দেখি না কেন, আকাঙ্ক্ষা রহিয়াই যায়, তৃপ্তি আর হয় না—তখন ঠিক্ এমন করিয়া বুঝিবার বয়স ত নয়, তাই মনে হইত, একাধিক চক্ষু থাকিলে দেখিয়া বুঝি আশ মিটিত। সেই আশ মিটাইবার জন্য কলিকাতা সহরের

যতগুলি দর্শনীয় স্থান আছে, সব একে একে দেখিয়া নিলাম, তার পর আমার সেই চিরপরিচিত পল্লীভবনের জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দীর্ঘদিন হইয়া গিয়াছে মা, ভগিনী, দিদিমা, ঠাকুরমা প্রভৃতি কাহাকেও দেখি নাই, খেলার সঙ্গী, স্কুলের সহপাঠিদিগের সঙ্গে অনেক কাল সাক্ষাৎ নাই, যে মাঠে খেলা করিয়াছি, স্নানস্থলে ঝাঁপাই পাড়িয়া যে পুকুরের জল ঘোলা করিয়া দিয়াছি, যে গাছ হইতে আম, পেয়ারা, জাম প্রভৃতি ফল পাড়িয়া খাইয়াছি সেই সমস্ত আশৈশব পরিচিত বাল্যলীলার রঙ্গভূমি মাঠ ঘাট পুকুর পুষ্করণীর সঙ্গে, ফিরিয়া পাওয়া নূতন চক্ষু দিয়া নূতন পরিচয় স্থাপন করিবার জন্য মন বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কবে বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া হইবে বলিয়া বৃদ্ধ দেওয়ানের নিকট সন্ধ্যা সকাল দরবার আরম্ভ করিয়া দিলাম। সঙ্গীয় লোকজনও বহুকাল বাড়ী ছাড়িয়াছে, প্রবাসীর মন গৃহস্থিত আপনার জনের জন্য যেমন করিয়া টানে তাহাদের মনও তেমনি করিয়াই বাড়ীর দিকে টানিতেছিল বোধ হয়, কারণ আমার অনেক প্রার্থনা পূর্ব্বে ইহারা বালকের অন্যায় আবদার বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু এই বাড়ী ফিরিবার প্রস্তাবটিকে তাঁহারা সকলেই (বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয়ও) তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকের ন্যায্য প্রস্তাব বলিয়া শিশুর প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বেশী বিলম্ব করিলেন না, অবিলম্বে বাড়ী যাওয়া হইবে ইহা স্থির হইয়া গেল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আসিবার সময়ে পাল্কী নৌকা প্রভৃতি নানা যান বাহনে রেল ধরিতে হইয়াছিল; যাইবার সময়ে সে সব আপদ বালাই ছিল না, কলিকাতায় রেল আরম্ভ, দামুকদিয়া গিয়া পদ্মাতীরে পারঘাটার ষ্টীমার, তারপর পদ্মা পার হইয়া সাঁড়া ঘাট হইতে রেল আরম্ভ, নাটোর ষ্টেশনে রেলগাড়ীর বিশ্রাম। ৪।৫ দিনের স্থানে ৫।৬ ঘণ্টায় তখন বাড়ী যাইবার সুবিধা হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আমার পাঠক পাঠিকাগণ অনুমান করিতে পারিবেন যে কতকাল আমাকে চক্ষু রোগের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল, রেলের রাস্তা প্রস্তুত হইয়া রেলগাড়ী যাত্রীসহ গমনাগমন করিতে কত দীর্ঘ সময় লাগে তাহা সকলেই জানেন, আমি আসিবার সময়ে যেখানে রেলগাড়ীর আবির্ভাব স্বপ্ন সমান ছিল সেখানে সত্যিকার এঞ্জিন ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে নিত্য দুই সন্ধ্যা গমনাগমন করিতেছে। এত সুদীর্ঘ প্রবাসের পর সঙ্গীয় লোকেরা যে গৃহ প্রত্যাগমনের জন্য ব্যাকুল হইয়া শিশুর

ব্যগ্রতাকে সঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? বালক বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবা সকলেরই যেখানে একমত সেখানে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে বিলম্ব হইল না—সঙ্গীয় লোকের মধ্যে কেবল দুইজনের বাড়ী ফিরিতে অমত হইয়াছিল—একজন আমার সেই রামলাল দাদা, আর অপরা আমার মার পুরাতন ঝি বামা দাসী ওরফে আমার "বামা দিদি।" ইহাদের অন্তরে আমার জন্য অপরিসীম স্নেহ সঞ্চিত ছিল, আমার একটা চক্ষু মাত্র তখন দৃষ্টিক্ষম হইয়াছে, অপরটাকেও যে কোন উপায়ে আরোগ্য করিয়া তাহাদের বড় স্নেহের "নিখুঁত কুবেরকে" নিখুঁত করিয়াই বাড়ী লইয়া যাইবার তাহাদের ইচ্ছা ছিল এবং সেই জন্য এই দুই স্নেহ পরায়ণ বৃদ্ধ বৃদ্ধা বিদ্রোহের সুর সুরু করিয়াছিল, কিন্তু দশচক্রে তাহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না, একচক্ষু লইয়াই আমার বাড়ী ফিরিতে হইল। সে চক্ষু আমার আজও আরোগ্য হয় নাই, সেটা দ্বারা আমার আলো এবং অন্ধকারের অল্প জ্ঞান হয় মাত্র, কোন কাজ তাহা দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। আমার ভ্রমণ ভোজন ধাবন উপবেশন পঠন পাঠন সবই এই একমাত্র বামচক্ষুদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে, এবং আমার শেষ অবসানের দিনে ঐ একটি চক্ষুর নিমেষ বন্ধ হইয়া গেলেই এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার পক্ষে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, দুই চক্ষু বুঁজিয়া যাইবার অপেক্ষা আমার করিতে হইবে না। জন্ম, দুঃখ, দৈন্য, জরা, মৃত্যু লইয়াই মানবের জীবন (যতটা আমরা দেখিতে ও বুঝিতে পারি) সুতরাং অল্পবিস্তর সকলেই মনে করে এ জীবন ব্যর্থই গেল, আমিও তাই ভাবি। এই ব্যর্থজীবনেও আর সকলের দর্শনীয় যাহা তাহা তাহারা দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া জীবনকে কথঞ্চিৎ সার্থক করিয়া নিতে পারে—আমার দেখিবার সামগ্রীটি দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিতে পাইলাম না সুতরাং অন্যের অপেক্ষা অৰ্দ্ধেক দেখিয়াই আমাকে তৃপ্ত থাকিতে হইতেছে। সে জন্য আক্ষেপ করি না, অন্ধতা যে আমার চিরস্থায়ী হয় নাই এক চক্ষু দিয়াও আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষার দর্শনীয় সামগ্রীর অসম্পূর্ণ দর্শনও পাইতেছি সেই কৃপাটুকুর জন্য জগতের কার্য্য কারণের নিয়ামক যদি কেহ থাকেন তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

বাড়ী ফিরিবার দিন স্থির হইয়া গেল, একটি চক্ষু যে ব্যাধিগ্রস্ত থাকিয়াই গেল তাহাতে আমার মনে কোনরূপ দুঃখই ছিলনা, একে তখন আমি বালক, সে বয়সে কোন রূপ দুঃখ কষ্টই মনের উপর কোন স্থায়ী ক্রিয়া করিতে পারেনা,

দ্বিতীয়তঃ বহুকাল অন্ধ হইয়াছিলাম, পরের সাহায্য ব্যতীত দিনের নিত্যকৃত্য গুলির কোনটাই নিজে নিষ্পন্ন করিতে পারিতাম না, সেইস্থলে অপরের বিনা সাহায্যে সব কাজই করিতে পারি, সুতরাং দক্ষিণ চক্ষুর অভাব আমার নিকট অভাবই নহে, সেজন্য তখন মনে কোন দুঃখই ছিলনা এবং বহুকাল পরে গৃহে ফিরিতেছি, জননী, ভগিনী, খেলার সঙ্গী সকলকেই আবার দেখিতে পাইব, চির-পুরাতন পল্লীনিকেতনের সুখস্মৃতি পরিপূর্ণ তুচ্ছতম জিনিস গুলির সঙ্গে আবার আমার মিলন সংঘটন হইবে সেই আনন্দেই আমার দেহমন পুলকিত, একটা চক্ষু যে দৃষ্টিহীন রহিয়া গেল সে কথা আমার বালকমনে তখন একবারও উদয় হয় নাই।

বাড়ী আসিলাম, বিদেশে যাইবার সময়ে যে সকল স্নেহশীল আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল তাহাদের সকলকেই আবার দেখিতে পাইলাম, কিন্তু আমার জনক যিনি সন্তানের প্রতি স্নেহাধিক্যপ্রযুক্ত জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলিয়া আমার চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত অনেকের মতের বিরুদ্ধে করিয়া দিয়াছিলেন, যাঁহার নিঃস্বার্থ চেষ্টা ব্যতীত নবমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে আজ পর্য্যন্ত চির-অন্ধতা লইয়া আমার এই জীবনভার আমাকে দুঃসহ দুঃখের মধ্যেই বহন করিতে হইত, একমাত্র যাঁহার প্রসাদাৎ এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য সম্ভারে ঐশ্বর্য্যশালিনী বসুন্ধরার অপরূপ রূপ আজ আমার চক্ষুগোচর হইতে পারিতেছে যাহার কৃপায় শৈল সাগর-সরিৎ শোভিত বনকাননকান্তারসমন্বিত ধরণীর অপূর্ব্ব শারদ-সৌন্দর্য্য ও বাসন্তীসুষমা আমার নয়নমনের তৃপ্তি বিধান করিতেছে সেই প্রত্যক্ষ ভূদেবতা স্বরূপ আমার স্নেহশীল পিতৃদেবকে আর দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার হতভাগ্য সন্তান বহুনাথ যখন তাঁহার পুনঃপ্রাপ্ত চক্ষুদ্বারা তাঁহার পাদপদ্মের সন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে তখন তাহার পরম স্নেহময়ী জননীর রিক্তপ্রকোষ্ঠ এবং সাশ্রুনেত্র বহুনাথকে বলিয়া দিল যে পিতৃপাদবন্দনার সৌভাগ্য তাহার চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

এতদিন পর্য্যন্ত বাড়ীতে যে সকল চাকরবাকর দাসদাসী ছিল, তাহাদের আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর কথা শুনিয়াছি কিন্তু সে সকল মৃত ব্যক্তিকে তাহাদের জীবিতকালে কখনও দেখি নাই, সুতরাং মানুষের মৃত্যু হইলে তাহার অভাব-জনিত ক্লেশ যে কি তাহার কোন ধারণাই আমার শিশুমনের ধারে কাছেও ছিল না, এই প্রথম চিরপরিচিত আপনার জনের মৃত্যু-সংবাদের ব্যথা আমার অন্তরে আসিয়া বাজিল। পিতৃদেবকে প্রতিনিয়তই যে দেখিতে পাইতাম

তাহা নহে, যখন দেখিতাম, তখনও কতক ভয়ে কতক সঙ্কোচে অধিককাল তাঁহার সাহচর্য্য ইচ্ছা করিয়াই করি নাই, তাঁহার মৃত্যুর সময়েও উপস্থিত ছিলাম না। মানুষ কেমন করিয়া মরে, মরিলে তাহার দেহাবশিষ্ট লইয়া জীবিতেরা কি করে, যে গৃহে মরণ-দেবতা আসিয়া গৃহস্থ কাহাকেও হরণ করিয়া নিয়া যায়, তাহার পরে সে গৃহের অবশিষ্ট লোকদিগের চিত্তে শ্মশান-বৈরাগ্য, কিরূপ বিবেকের কতখানি সঞ্চার করিয়া দিয়া সংসারে কি প্রকার বীতস্পৃহা জন্মাইয়া দেয়, সে সকলের কোন ধারণাই আমার তখন হয় নাই, কিন্তু পিতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার পর জননী যখন আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিলেন তখন আমার শিশু-মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আজ বর্ণন করিতে পারিব না; কিন্তু শোকাতুরা জননীর অন্তর-বেদনা হৃদয়ের অলক্ষ্য-তাড়িত প্রভাবে আমার বক্ষে সঞ্চারিত হইয়া আমার শিশু-মনে অননুভূতপূর্ব্ব এক শোকের শূন্যতা জন্মাইয়া দিল, এবং সম্যক্ উপলব্ধি না হইলেও সেই দিন বুঝিলাম মৃত্যু কেবল যাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় তাহারই পক্ষে ভীষণ নহে, তাহার জীবিত স্বজনগণের পক্ষেও উহার মূর্ত্তি ভয়ানক এবং বেদনা সুদুঃসহ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগদীন্দ্রনাথ রায়

গ্রন্থ সমালোচনা

প্রাচীন ভারতে লৌহ—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি নানা উপায়ে দেশমধ্যে বিজ্ঞানালোচনার প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মৌলিক গবেষণা-সূচক তাঁহার একাধিক প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল তিনি Iron in Ancient India নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই পুস্তকখানি Indian Association for the Cultivation of Science কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে; এই পুস্তকখানির সমালোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পুস্তকখানির মূল্য ২।০ ও ইহার পত্র-সংখ্যা ৭৮। লেখক ভূমিকাতে জানাইয়াছেন যে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী Indian Association for the Cultivation of Science গৃহে এক সভা হয়; সেই সভাতে এই প্রবন্ধ পঠিত হয় ও এই পুস্তক সেই প্রবন্ধের বিস্তৃতাকার (in an enlarged form)। পঞ্চাননবাবুর পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক লেখক ভারতবর্ষের লৌহ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন; সেই হেতু এই পুস্তকে

সেই অনুসন্ধিৎসুদের গবেষণার ফলেরও উল্লেখ থাকা সম্ভবপর ও বাঞ্ছনীয়। পঞ্চাননবাবু রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষভাবে পারদর্শী, সুতরাং এই পুস্তকে তাঁহার নিজের গবেষণার ফলও অনেক লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া আমরা স্বভাবতঃই আশা করিতে পারি।

গ্রন্থখানি ৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে লৌহের প্রত্নতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে ও শেষ ৪ অধ্যায়ে লৌহের রাসায়নিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করা হইয়াছে। পঞ্চাননবাবু কোনও দিন প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না সুতরাং এই তিন অধ্যায়ে তাঁহার নিজস্ব কিছু না থাকিবারই কথা। এই তিন অধ্যায় মুখ্যতঃ সঙ্কলন, কিন্তু তথাপি তিনি যে যে স্থলে নিজ মত প্রকাশ করিতে গিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশ স্থলেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

'Ethnographists usually divide the age of using implements of warfare into principally three divisions, viz stone age, bronze age and iron age. Such a division might be tenable in the case of European countries but hardly applicable in the case of India which was colonized by the Aryans possesing a very high order of civilization at a very early age' (পৃঃ ২)।

এই কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারা গেল না। যে বর্ণের লোক প্রস্তরের অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত তাহারা আর্য্য না হইতে পারে—কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষেই বাস করিত ও তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ এখনও ভারতবর্ষেই আছে। সুতরাং পঞ্চাননবাবুর এই মত যাঁহারা সমর্থন করিবেন তাঁহাদের তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে। বৈদিক সাহিত্যে লৌহ প্রভৃতি ধাতুর উল্লেখ আছে—এই সংবাদ নূতন নহে। কতকগুলি বৈদিক বাক্যের ইংরেজী অর্থ পঞ্চাননবাবু তাঁহার পুস্তকের পাদটীকাতে দিয়াছেন। এই সমস্ত টীকা কাহার, তাহা উল্লিখিত থাকা উচিত ছিল। অনধিকার-চর্চ্চাতে অনেক আশঙ্কা আছে। পঞ্চাননবাবুর পুস্তক সমালোচনা করিতে করিতে Vincent Smith বলিয়াছেন :—

'His (পঞ্চাননবাবুর) essay, as it stands, gives an impression of rather hasty production. It is not permissible to assume that the so called "Somenath gates" stored in the Fort at Agra may be "authentic" (p 32). They are purely Muhammedan work, and bear an Arabic inscription in the Kufic character relating to the family of Sabuktigin, for whom prayers are offered by the writer (Ann. Rep. Arch Surv, Ind. 1913-4, p. 17; Horovitz, Epigraphica Indo Moslemica, no 3. p. 38, Calcutta, 1912)."

টিনেভেলিতে অনেক লৌহায়ুধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিঃ Rea ইহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত আয়ুধ সম্বন্ধে পঞ্চাননবাবু লিখিয়াছেন :—

"The nature of the iron has not been determined. Southeran India was famous from remote times for its steel called 'wootz," and it would not be a surprise if this very remarkable collection of ancient weapons and implements turns out on examination to be specimens of steel, though the chances are that these weapons were made of wrought iron" (পৃঃ ১৩)।

পঞ্চাননবাবুর নিকট হইতে এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর আশা করা যায় না। তাঁহার

কর্ত্তব্য ছিল এই সমস্ত লৌহ পরীক্ষা করা কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

আবুর লৌহস্তম্ভ সম্বন্ধে পঞ্চাননবাবু বলেন ঃ—

The iron of the pillar has not yet been under examination, but I have little hesitation in concluding that the pillar is made of wrought iron in a similar manner as the Delhi and Dhar pillars." (পৃঃ—২১)।

আবুর ও ধারের লৌহস্তম্ভের লৌহের কোনই বিশ্লেষণ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সুতরাং উদ্ধৃত মত বিজ্ঞানানুমোদিত কি না তাহা বিবেচ্য।

এই পুস্তকের অপর স্থানে পঞ্চাননবাবু বলেন ঃ—

"However, the Asoka foundation of the stupa, on excavation, has yielded a piece of iron slag, which has been preserved in the Calcutta museum. This piece of iron slag is, I believe, the most ancient archaeological evidence of a historical nature of the manufacture of iron in India as early as the third century B. C." (পৃঃ ১৫)।

ভারতবর্ষে লৌহমলের অভাব নাই। সেগুলির সহিত তুলনা না করিয়া হঠাৎ এত বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

দিল্লীর লৌহস্তম্ভের উল্লেখ করা হইয়াছে ও Johnston Hoffmann কর্ত্তৃক সংগৃহীত এক আলোকচিত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই লৌহস্তম্ভের বর্ণনাতে কিছুই নূতনত্ব নাই। পঞ্চাননবাবু Sir Robert Hadfieldএর রাসায়নিক বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন ঃ—

"The low proportion of sulphur shows that the fuel employed must have been charcoal and that the ores must also have been pure" (পৃঃ ১৯)।

এই মতটীতে নূতনত্ব কিছুই নাই। ইহা Hadfieldএর লেখনীপ্রসূত। এই লৌহস্তম্ভ সম্বন্ধে পঞ্চাননবাবু ভূমিকাতে লিখিয়াছেন ঃ—

"As regards the solution of the problem how these pillars have so long withstood the rusting influence of wind and rain, my idea is that "low manganese with low sulphur and high phosphorus" in the composition of the iron has something to do with the "corrosion-resitance" capacity of wrought iron" (পৃঃ vi)।

পঞ্চাননবাবু যে বড় কথাটিকে my idea বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজস্ব কিছুই নাই। Sir Robert Hadfieldএর প্রবন্ধ পাঠের পর সেই প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে Dr. Cushman এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।—পুস্তকের মধ্যে পঞ্চাননবাবু Dr. Cushmanএর উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

The author agrees with Dr. Cushman when he suggests that probably "low manganese with low sulphur and high phosphorus would lead to high corrosion resistance" in iron (পৃঃ ৫০)।

ভূমিকাতে তিনি এই কথাটি যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহা বোধ হয় ঠিক হয় নাই—কারণ এই ভূমিকা পাঠ করিলে সাধারণের মনে এক ভুল ধারণা থাকিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। পঞ্চানন বাবুর কখনই এরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে না।

পঞ্চানন বাবু বলেন যে Dr. Cushman বর্ণিত কারণ ব্যতীত আরও এক কারণে এই সমস্ত লৌহ এত কাল ঠিক ভাবেই আছে।

"I also suspect that the pillars and beams were originally painted' (পৃঃvi)

এই মত সম্বন্ধে পঞ্চানন বাবু কোনও প্রমাণ দেন নাই। এই লৌহের যে বিশ্লেষণ Sir R. Hadfield কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও কোনও প্রকারের রং (paint) আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে এইরূপ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে কিনা তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এই পুস্তকে যে যে বৈজ্ঞানিক কথা আছে সে গুলির অধিকাংশই Sir Robert Hadfield এর প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত; অথচ পঞ্চানন বাবুর প্রবন্ধ যখন প্রথম পঠিত হয় তখন পঞ্চানন বাবু Sir R bert Hadfield এর প্রবন্ধের কথা জানিতেন না। এইরূপ অজ্ঞতা মার্জ্জনীয় কিনা তাহা বিবেচ্য। এই প্রসঙ্গে V Smith বলেন :—

It would have been better if the author had deferred publication until he could have made full use of Sir Robert Hadfield's Tr atise on Sinhalese Iron and Steel of Ancient origin in the Journal of the Iron and Steel Instituted, 1912, and had studied more thoroughly the hi-to-y of the ancient use of metals in Egypt, Babylonia and other countries. He has merely incorporated Hadfield's analysis of Ceylon iron and obviously is not deeply re d about the archeaological subjects on which he touches.

এই পুস্তকে একটী বিষয়ানুক্রমিক সূচী থাকা উচিত ছিল। মুদ্রাকর প্রমাদ যে নাই তাহাও নহে। আরও অনেক অনেক বিষয়ে পুস্তকখানা অসম্পূর্ণ।

এই পুস্তক ইংরেজীতে লিখিয়া বিশেষ কিছু ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজী ভাষাতে অভিজ্ঞ যে সমস্ত পাঠকের জন্য এই পুস্তক লিখিত তাঁহাদের নিকট ভবচক্রের পাটের ও কোনারকের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত লৌহের বিশ্লেষণ ব্যতীত পঞ্চানন বাবুর সঙ্কলনের মধ্যে নূতন কিছুই নাই। পঞ্চাননবাবু বাঙ্গালা বেশ ভাল লিখিতে পারেন। তিনি যদি এই পুস্তকখানা বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিতেন তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যে একখানা নূতন ধরনের পুস্তক হইত। কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যেন তাঁহার পরিশ্রমই সার হইয়াছে।

স্পষ্টবাদী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নারায়ণ, বৈশাখ—

বঙ্কিমচন্দ্র চৈত্রমাসে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই জন্য 'নারায়ণের এই সংখ্যার নাম "বঙ্কিম স্মৃতি-সংখ্যা"। এই সংখ্যার সব প্রবন্ধগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে লিখিত। সম্পাদক মহাশয় কাগজের প্রবন্ধবৈচিত্র্য নষ্ট করিয়াও মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন।

"বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায়" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিতেছেন :—"বাঙ্গালায় তিনি কীর্ত্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন * * * গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদুভট্টের নিকট গান শিখিতেন। * * বাল্যকালের কবিতাগুলি একত্র করিয়া ছাপাইয়াও ছিলেন। * * কাব্যের চেয়ে ইতিহাসেই তাঁহার বেশী সখ ছিল। * * * তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল তিনি বাঙ্গলার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যে তিনি "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। * * * বঙ্গদেশে আর্য্য ও অনার্য্যগণের বাস সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তার চেয়ে এখনও কেহ বেশী কিছুই লিখিতে পারেন নাই।" প্রবন্ধটি সুলিখিত, তবে লেখক নিজের কথায় ও অনাবশ্যক বাহুল্যে ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামকে "বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী" বলিয়াছেন। লেখক বলিতে চান্ এই তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। লেখক আরও বলেন—"তিনি সমাজকে ইউরোপের আদর্শে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে কখনই চেষ্টা করেন নাই। * * বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্ঘাতে বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজে আচার-ব্যবহারগত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই পরিবর্ত্তনকে দেশের ও জাতির প্রকৃতির অনুকূল করিয়া পরিচালিত করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীরই কর্ত্তব্য। তিনি প্রায়ই বলিতেন * * * আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা ইংরেজি শিক্ষা এবং সভ্যতা সত্ত্বেও অক্ষুন্ন থাকিবে। সুতরাং যে উপায়ে জাতিকে ধরিতে পারি, জাতির নিম্ন স্তরগুলিকে টানিয়া সঙ্গে করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি, সেই উপায়ই আমাদের অবলম্বনযোগ্য।"

"বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় প্রাদেশিকতার ভাবটা সর্ব্বপ্রথমে ফুটাইয়া তোলেন * * * "বন্দেমাতরম্" বাঙ্গালার গান, সমগ্র ভারতবর্ষের নহে। এই তিনখানা উপন্যাসে কেবল বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কথা আছে। * * * এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলনপদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টি বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; দেবীচৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; সীতারামে সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা state বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে তাহার পর্য্যায় দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত, জাতিগত এবং সংস্কারগত দোষে বা চ্যুতির ফলে কেমন করিয়া আদর্শ সৃষ্ট হইল না, তাহাও তিনি অপূর্ব্ব চরিত্রোন্মেষ সাহায্যে দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই।"

বঙ্কিমবাবুর তিনখানি উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া পাঁচকড়িবাবু দেখাইয়াছেন বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলীর উপযুক্ত সমালোচনা এখনও হয় নাই এবং সে সমালোচনার ভার তিনি যে গ্রহণ করিতে সক্ষম তাহাও আমরা বুঝিয়াছি। নারায়ণের এ প্রবন্ধটি পাঠ করিতে আমরা সকলকেই অনুরোধ করি।

শ্রীসুরেশ সমাজপতির "সেকালের কথা" হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি-

লাম :—খুব গরীব, অথচ পড়িতে জানে, পড়িতে চায় ; এমন লোকের সংখ্যা এখনও এ দেশে অত্যন্ত অল্প। আমাদের দেশে সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই ; তাই শিক্ষিতের সংখ্যা বড় অল্প, Cheap literature এর এখনও সময় হয় নাই। ইহার অন্য কারণও আছে। সকল জিনিষ সকলের হাতে দেওয়া উচিত নয়। সকল বই সাধারণে না পড়িলেও ক্ষতি নাই। কতকটা পড়াশুনা থাকিলে যে সব জিনিস পড়া চলে, খুব অল্পশিক্ষিতের পক্ষে সে সব বই পড়িলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। দেশের অবস্থার সঙ্গে Cheap Literature এর সম্বন্ধ আছে।"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা" সুখপাঠ্য। প্রবন্ধে বালক বঙ্কিমের একটি সুন্দর চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। কয়েকটি কথা আমরা উদ্ধৃত করিলাম—

(১) "বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাঁড়গরু ইত্যাদি দেখিলে সরিয়া যাইতেন ; মই দ্বারা ছাদে উঠিতে পারিতেন না, সাঁতার জানিতেন না, একজন ভাল Executive Officer ছিলেন, তথাপি ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না। . . . . আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইনিই বাল্যকালে একদিন ডাকাতদের ভয় করেন নাই, কৈশোরে নদীবক্ষে ঝড়তুফানে ভয় করিতেন না, আর যৌবনে গুলিভরা পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া একজন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।"

ইহাতে আশ্চর্য্যের কারণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ উদাহরণও বিরল নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভীরুতা ও নির্ভীকতার সামঞ্জস্য বিধান করা লেখকের উচিত ছিল, কেননা একাজ তাঁহার পক্ষে সহজ, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক খবরই ত জানেন।

(২) একবার বঙ্কিমচন্দ্রের নৌকা কুয়াসার মধ্যে মাঝির দিক্ ভ্রম হওয়ায় বিপথে ভাসিয়া যায়। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই কপালকুণ্ডলার আরম্ভ। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্র শুনিয়াছিলেন যে উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুতকুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদিগের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই দুর্গেশনন্দিনী রচিত হয়। কোন দরিদ্র গৃহস্থের বধূ যৌবনারম্ভে কুলত্যাগিনী হইয়া কোন ধনাঢ্য যুবকের রক্ষিতা হয়। পাঁচ ছয় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন স্বামীকে দেখিয়া সে পাপপথ ত্যাগ করিতে সংকল্প করিল। যুবার ধনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া সে এমন স্থানে বাসা লইল, যাহাতে প্রতিদিন সে স্বামীর দর্শন লাভ করিতে পারে। দিবানিশি কাঁদিয়া অভাগিনী যৌবনেই প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনাটি বঙ্কিমচন্দ্রকে মতিবিবির চরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

"ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র" শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। যখন ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আরম্ভ হয় নাই, তখনও বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করাই লেখকের উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে ইতিহাস-সম্বন্ধীয় অনেক ভ্রমকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, সেই জন্য ইতিহাসে যে তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না এ কথা অনুমান করা উচিত নয়। রাখালবাবু এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন —বঙ্কিমবাবু ইতিহাসে সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত না থাকিলেও অদ্ভুত প্রতিভাবলে তিনি সুপণ্ডিতের মতই আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত" বঙ্কিমবাবুর উত্তরচরিতের সমালোচনা। বঙ্কিমবাবু উত্তরচরিতের যে কয়টি দোষ দেখাইয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহা খণ্ডন করিতে লেখক বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি গ্রহণ করিয়াও আমরা বলিব, রামের ক্রন্দনে বাহুল্য আছে—তাঁহাকে কুসুমের চেয়েও মৃদু করিয়া আঁকিতে কবি যতটা যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তকে বজ্রের মত কঠোর করিয়া আঁকিতে ততটা যত্নের পরিচয় পাওয়া যায় না। রামচন্দ্রকে যতটা কাঁদানো হইয়াছে, তাহা না করিলেও তাঁহার অন্তর্গূঢ় করুণরসের মাত্রা অক্ষুণ্ণই থাকিত। লেখক উত্তরচরিত সম্বন্ধে দু একটি নূতন কথাও বলিয়াছেন।

"বঙ্কিম-প্রসঙ্গে" শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত গীতাসম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম—"বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, তাঁহার ধারণা এই যে গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্ত্তী কালের যোজনা। উহারা মৌলিক গীতার অন্তর্গত নহে। * * * শেষ ছয় অধ্যায়ের ভাষার ভঙ্গী দেখিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না; বিশেষতঃ বিশ্বরূপদর্শনেই গীতার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। * * * তদানীন্তন ভারতীয় সুধীসমাজে কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ নামে যে বিভিন্ন সাধনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, গীতাকার অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন।"

বঙ্কিমবাবুর এই উক্তির সহিত লেখকের মতসাদৃশ্য প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। লেখক এক স্থলে বলিতেছেন "বঙ্কিমবাবুর মুখে এই আমি প্রথম গীতার সমন্বয়বাদের সন্ধান পাইলাম। পরবর্ত্তী কালে আমি ইহার যথেষ্ট সম্প্রসারণ করিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার আদিম উপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।"

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল বঙ্কিমচন্দ্রের চরিতচিত্র লিখিয়াছেন। চরিতচিত্রটি যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা উপভোগ্য; চরিতচিত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে লেখক বলিতেছেন—"প্রকাশের ভিতরে বস্তুর বাহিরটাই দেখা যায়। * * * বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টি দেখিয়া তাঁর সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। * * * অনুমানের উপর একান্তভাবে নির্ভর করা যায় না। * * * বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ লোকে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকেই কেবল একটু একটু চিনে, মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনে না। অথচ সেটিকে না চিনিলে, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির নিগূঢ় এবং যথার্থ মর্ম্মও গ্রহণ করা সম্ভব নয়।"

আমরা বলি—প্রকাশের ভিতরে যদি বস্তুর বাহিরটাই দেখা যায় তাহা হইলে সংসারের বহুবিধ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কখন্ কোন্ মূর্ত্তি ধারণ করিতেন তাহা অবগত হইলেও প্রকৃত বঙ্কিমচন্দ্রকে জানিতে পারা যায় না। সংসারে বা বন্ধুসমাজে মানুষের বিকাশ সম্পূর্ণ নয়; সাহিত্যক্ষেত্র প্রশস্ত—সেখানে সমাজ বা সংসারের বন্ধন ছিঁড়িয়া মানুষ যখন সমগ্র দেশ বা পৃথিবীর নিকট আত্ম-প্রকাশ করে, তখনই তাহাকে পূর্ণভাবে দেখিতে পাই। সেই বিকাশই মানুষকে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে মোহিত করিয়া রাখিতে পারে। অনেক অমর লেখকের দৈনিক জীবনের কথা আলোচনা করিতে গেলে নিরাশ হইতে হয়।

সাহিত্যিকের চরিত-কথা সাহিত্য বুঝিতে সহায়তা করে সত্য, কিন্তু তাহা না জানিলে সাহিত্য বোঝা সম্ভব নয়, এ কথা আমরা মানিতে পারিলাম না।

শেষ কয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপি চিত্তাকর্ষক।

'নারায়ণে'র বঙ্কিম-স্মৃতিসংখ্যা সুন্দর, সুখপাঠ্য। প্রবন্ধ-গৌরবেও ইহা মনোজ্ঞ। বঙ্কিম সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা এ সংখ্যায় সংগৃহীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ—

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্তের "বর্ত্তমান দর্শন ও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধটি সুলিখিত; আমাদের সাহিত্যে দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব কিরূপ, তাহা আলোচনা করিয়া লেখক দর্শন ও বিজ্ঞানের দ্বারা কিরূপে আমাদের সাহিত্য পরিপুষ্ট হইতে পারে তাহার দুটি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষায় লিখিত দর্শন ও বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের প্রবর্ত্তন। (২) বাঙ্গালার মাসিক ও সাময়িক পত্রসমূহে দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা বর্দ্ধন। উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন—"বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে নূতনভাবে সঞ্জীবিত, নূতন পথে প্রধাবিত এবং জগতের বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও দীক্ষার উপযোগী করিতে হইলে, বঙ্গসাহিত্যকে বর্ত্তমান দর্শন ও বিজ্ঞানানুপ্রাণিত করিতে হইবে।" কথাটা অযৌক্তিক নয়। তবে দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধ আমাদের দেশে এত অল্প লিখিত হয় যে মাসিক-পত্রের সম্পাদকেরা অনেক সময়ে তাঁহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না; বিশ্ব-বিদ্যালয়কেও দোষ দেওয়া যায় না, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠোপযোগী গ্রন্থের সংখ্যা খুবই অল্প।

সেখ আবদুল করিম "বঙ্গসাহিত্যে চট্টগ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিতেছেন—"চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীন তুলট কাগজে লিখিত অসংখ্য পুঁথি বিরাজ করিতেছে * * * বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকল্পে চট্টগ্রামে অদ্যাপি রীতিমত কোন চেষ্টাই হয় নাই।" লেখক এই প্রবন্ধে নিজে যে সব প্রাচীন পুঁথি আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে ৭৭ জন হিন্দু ও ৯০ জন মুসলমান কবি ও তাঁহাদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের প্রাচীন পুঁথির উদ্ধারের জন্য লেখক যে চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। যে সব হিন্দু ও মুসলমান কবির ও গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা লেখকের নিকট তাহাদের বিশেষ বিবরণ আশা করি।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার গুপ্তিপাড়ার কয়েকজন প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে অনেক প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন দুঃখের বিষয় তাঁহাদের কথা অনেকেই জানেন না। তাঁহাদের জীবনী সংগৃহীত হইলে বঙ্গসাহিত্যের একটা অভাব যে পূর্ণ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"প্রাণীর সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য বিচার" শ্রীপার্ব্বতীমোহন দেববর্ম্মার প্রবন্ধ; রচনা বাঙ্গালায় লিখিত, কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী প্রাণীতত্ত্ব না জানেন তাঁহারা কখনই এ প্রবন্ধ বুঝিতে পারিবেন না। প্রবন্ধে লেখকের নিজস্ব কিছুই নাই। কতকগুলি ইংরাজি গ্রন্থ হইতে তিনি রচনার বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয় পাঠকের উপযোগী করিয়া তাহা গুছাইতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্তের "স্ত্রীশিক্ষার কথা"য় সামাজিক সমস্যার কথা আছে। সামাজিক কথার আলোচনার সময় আসিয়াছে। আজকাল অনেক শিক্ষিত লোক এমন সব সমস্যার পূরণ করিতে যান্ যাহা আমাদের সমাজে এখনও আবির্ভূত হয় নাই। লেখক কিন্তু তাঁহাদের পথ অবলম্বন করিয়া শুধু একটা পাণ্ডিত্য প্রকাশের অবসর খুঁজিয়া লন নাই। তাঁহার লেখায় একটা সারল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, একটা সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টাও সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। আরও একটি প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি নিজে যাহা অন্তরে অন্তরে

অনুভব করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করিতে গিয়াছেন, কাহারও দ্বারা সবলে পরিচালিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীজলধর সেনের ভ্রমণ-কাহিনী লিখিবার নৈপুণ্য "সাগরসঙ্গমে শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে। সরস বর্ণনা ও রচনা-চাতুর্য্য এই প্রবন্ধটিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। তবে লেখক উপসংহার কিছু তাড়াতাড়ি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

অন্যান্য প্রবন্ধে চিত্তাকর্ষক বিষয় আছে, কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় এমন কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ—

শ্রীসুকুমার রায়ের "ভাষার অত্যাচার" প্রবন্ধটি কিছু নীরস হইলেও আমরা সানন্দে ইহা পাঠ করিয়াছি। লেখকের রচনা সুন্দর, ভাষায় সহজ গতি আছে, চিন্তাশীলতার পরিচয়ও অনেক স্থলে পাওয়া যায়।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার বাঙ্গালার শিল্পসম্বন্ধে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কতকগুলি কথা বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য মনে করিয়া আমরা উদ্ধৃত করিলাম— "আমাদের প্রাচীন কাঠের পাটায় আঁকা পোটোদের চিত্র দেখ্‌লে দেখা যায় যে তাতে মোগল প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের শিল্পীদের মত বর্ণযোজনা বা রেখার সহজ ও সরল গতির অভাব নেই। * * * আধুনিক যুগেও আমাদের দেশে এই রূপ অঙ্কনরীতির প্রচলন একেবারেই নেই বললে ভুল বলা হয়। কেন না বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষার গৌরবাভিমানীদের চক্ষুর অন্তরালে কলকাতা সহরের এক প্রান্তে কালিঘাটে এখনও সেইরূপ পদ্ধতিতে আঁকার প্রচলন আছে। * * * * আমাদের শিল্পের অবনতির কারণ বিদেশী শিক্ষা। * * * আমাদের যদি অজন্তা প্রভৃতি প্রাচীন চিত্র, বরভুধরের মূর্ত্তি প্রভৃতি দেশীয় শিল্পের সঙ্গে * * * পাঠ্য পুস্তক প্রভৃতির মারফতে শৈশবাবধি পরিচয় থাকৃত তবে আমরা ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা বিদেশীর চোখ নিয়ে স্বদেশের শিল্পের বিচার করতে যেতুম না।" ইহার পর বঙ্গশিল্পের প্রকৃতি, বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করিয়া লেখক বলিতেছেন— "আমাদের দেশে সামান্য ক্রিয়াকর্ম্মে, উৎসবে গৃহস্থালির মধ্যে যে সকল শিল্প এবং সৌন্দর্য্য বোধের পরিচয় গৃহস্থের ঘরে ঘরে দেখা যেত, আজকাল তারও লোপ হবার সূচনা দেখা দিয়েছে * * * কার্পেট যদি বুন্‌তে হয় তবে দেশী নক্সায় হওয়া চাই। * * * গৌড়ের যে সব অতিনিম্নতা রক্ষা করে গঠিত (low relief) প্রাচীন খোদিত চিত্র পাওয়া যায় সেগুলির ভঙ্গী ও গঠন-সৌন্দর্য্য ভারতের যে কোন মূর্ত্তির চেয়ে হীন ত নয়ই বরং বেশী সুন্দর। দুঃখের বিষয় এই ভাস্কর্য্যের চর্চ্চা বাঙলায় নেই। অবশ্য কৃষ্ণনগরের কাছে ঘূর্ণিতে মাটীর মূর্ত্তি এবং প্রতিকৃতি গঠনের চেষ্টা কুমোর-পরিবারের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে, কিন্তু তারা তাদের প্রাচীনতা একেবারে হারিয়ে ফেলেছে এবং আজকাল বিলিতির অনুকরণে প্রকৃতির হুবহু নকল করার প্রাণপণ চেষ্টায় আছে। * * * আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পীদের গোড়া থেকেই ধ্যানধারণা হয় র‍্যাফেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর মত শিল্পী হয়ে ওঠ্‌বার; তাঁদের পোটো বল্‌লে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হন—আর্টিষ্ট বলে তাঁদের অভিহিত কর্‌তে হয়। এটা যে ভারতশিল্পীদের কতদূর অগৌরব ও মানহানিকর বিষয় তা বোঝবার শক্তি আমরা হারিয়েছি। অবশ্য আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন কালটাকে আঁকড়ে ধরে চিরকাল কূপমণ্ডুকবৎ একভাবে বসে থাকতে বলছি না। আমাদের দেশের বিশেষ রীতিটাকে অবলম্বন করে অবাধে অগ্রসর হতে হবে।" লেখক শিল্পের দিক দিয়া দেখাইয়াছেন ইউরোপীয় শিক্ষার গর্ব্বে আমাদের দেশ কতটা অনুচিকীর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন করিয়াছে। আমরা যে সর্ব্বতোভাবে বিদেশীয়তার নিকট নিজেদের যাচিয়া বিকাইয়াছি, তাহা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মের দিক দিয়াও দেখানো যায়।

এখন এই রূপ প্রবন্ধের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়া উচিত, তবে হয় ত কিছুদিন পরে আমাদের মতি গতি ফিরিতে পারে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর "অবশেষ" নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম—

"সকল আকাশ ভাঙি যে বরষা এল নামি
দুরন্ত দুর্ব্বার,
স্মরণে জাগাতে তারে নাই কোথা একেবারে
কোন চিহ্ন তার;
কেবল কমল-দলে দুই চারি বিন্দু জলে
কাঁপিছে করুণ স্মৃতি মুকুতা আকার।"

এটি এবারকার প্রবাসীর কাব্যসম্পদ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রকৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে সব কথাই প্রায় সংকলিত, তবে বঙ্গভাষায় ইহার আদর হইবে; রচনার একটি গুণ এই যে ইহাকে যতটা সরল করা সম্ভব লেখক তাহা করিতে যত্নের একটুও ত্রুটি করেন নাই।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "শিক্ষকের আশা ও আশঙ্কা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে বাঙ্গালার সাহিত্যিকের মধ্যে অনেকেই শিক্ষক। শিক্ষকের সাহিত্যচর্চ্চার পথে কত বিঘ্ন তাহার মোটামুটি একটা হিসাব করিয়া তিনি বলিতেছেন—"যদি প্রকৃতপক্ষে দেশে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক গবেষণা ও সাহিত্যসৃষ্টির পথ সুগম করিতে হয়, তবে শিক্ষকশ্রেণীর মধ্যে এক সম্প্রদায়কে leisured classএ অর্থাৎ অবকাশভোগী সম্প্রদায়ে পরিণত করিতে হইবে। * * দেশে প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে Endowed Research chairs অর্থাৎ গবেষণা-বৃত্তি স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অবশ্য এগুলি যে শিক্ষকশ্রেণীর একচেটিয়া হইবে এমন কথা বলিতেছি না।" আমরাও ললিতবাবুর সহিত একমত হইয়াই বলিতেছি প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন করিলে মোটের উপর বেশী কাজই হইবে।

হিন্দুর মুখে আরঙ্গজেবের কথায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন—হিন্দুরাও ইতিহাস লিখিতে উদাসীন নয়; হিন্দুর দিক হইতে মালমসলা সংগ্রহ করিয়া আরঙ্গজেবের একটা ইতিহাস লেখা যায়। প্রবন্ধটি ইতিহাসজিজ্ঞাসুর আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

"হারামণি" শীর্ষক বিভাগে যে গান দুটি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার রস বুঝাইবার নয় বুঝিবার, তাহাতে শব্দাড়ম্বর বা কৃত্রিমতা নাই, তাহা প্রাণের সরল উচ্ছ্বাস।

সবুজপত্র, বৈশাখ—

"ঘরে বাইরে" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস; এই সংখ্যায় ইহার আরম্ভ। যে ভাবে লেখক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা হইতে অনেক জিনিস অনুমান করা যায়, কিন্তু বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা সাগ্রহে উপাখ্যানটি পড়িতে আরম্ভ করিলাম—সময়ে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। এই আরম্ভভাগ ভাবে, ভাষায় কবিত্বে অপূর্ব্ব, স্থানে স্থানে এমন এক একটি স্বল্পাক্ষর অসন্দিগ্ধ বাক্য আছে, যাহা পাঠমাত্র অন্তরে রেখাপাত করিয়া যায়।

এ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা আছে। "আমার গান" শীর্ষক কবিতাটি পড়িয়া বুঝিলাম—লেখকের গান অচল নয়।

"মূল নাই ফুল আছে শুধু পাতা আছে
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।"

বর্ষার দিনে তাহা উদ্দাম, চঞ্চল হইয়া, বন্যার ধারার পথ হারাইয়া "দেশে দেশে দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।" এই শেষের কথাটা বড়ই অস্পষ্ট, ভাবটা ফুটিয়াছে কি?

"তুমি আমি" কবিতাটিতে লেখক বুঝাইয়াছেন 'আমি'কে লইয়াই "তুমি"র আত্মজ্ঞান, কবিতাটি আমরা বুঝিয়াছি, তবে ইহার রসের মধ্যে তত্ত্বের আভাস নাই, তত্ত্বের মধ্যে রসের আভাস আছে। কবিতার মধ্যে রসকে নিম্নস্থান দেওয়ায় কবির একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু কবিতা লেখা হয় বলিয়াত মনে হয় না।

"ডায়ারি"র ভূমিকায় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন "আমাদের চাঞ্চল্যই যে যৌবনের একমাত্র লক্ষণ তাহা নহে, তাহার সঙ্গে বিষাদের গাঢ়তাও আছে। * * * নব-যৌবনের প্রথম আবেগে কিছু একটা করিবার জন্য যখন আমাদের মধ্যে বেদনা জাগে, অথচ যখন কিছু একটা করিবার অভিজ্ঞতাও নাই উপকরণও নাই, কেবলমাত্র করিবার উদ্যম আছে—সেই সময়ে নূতন সাঁতার শেখার হাত পা ছোঁড়ার মত আমাদের কথা এবং কাজে আতিশয্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। * * আমাদের দেশে যৌবনের উদ্যম বিধাতা দিয়াছেন, কিন্তু কাজের পন্থা মানুষে তৈরি করে নাই।" একটি পুরাতন ডায়েরীর কয়েক পাতা লেখা প্রকাশ করিয়া লেখক দেখাইতে চান—যে শক্তি স্বভাবতই বাহিরের দিকে সার্থকতা খোঁজে, তাহা প্রতিহত হইয়া নিজের মধ্যে পাক খাইয়া বেড়ায়। আমাদের দেশের যুবকদের এই দুঃখ এবং এই বিপদ। উদ্ধৃত ডায়েরীর অংশে লেখকের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর "সম্বন্ধে" শীর্ষক প্রবন্ধটির রচনারীতি সুন্দর, কোথাও অনর্থক বাহুল্য বা অনাবশ্যক আড়ম্বরের উদাহরণ নাই। যে কথা তিনি বলিয়াছেন তাহাতে সত্য আছে, লেখিকার দার্শনিকতার পরিচয়ও অনেক স্থলে পাওয়া যায়।

"অন্নপূর্ণা"র টাইপ ছোট, আমাদেরও দৃষ্টিশক্তি কিছু কম-সেই জন্য ইহার ভাষা ও তত্ত্ব বুঝিতে পারিব না স্থির করিয়াই প্রবন্ধটি পাঠ করি নাই।

সাহিত্য-সমাচার।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'রত্ন-দীপ' পুস্তকাকারে এই সপ্তাহের মধ্যেই বাহির হইবে। "রত্নদীপ" এবং প্রভাতবাবুর "গল্পাঞ্জলি" এই দুইখানি পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ অধিকার, এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস্ গ্রন্থকারের নিকট ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'ডকাত-ডাক্তার' নামক রহস্য-লহরীর নবম উপন্যাস যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গলার বেগমের' ইংরাজী অনুবাদ সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের 'কিশোর' আগামী ১লা জুলাই বহুচিত্র শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পরিকথা' ছাপা শেষ হইয়াছে, দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।



মানসী

৭ম বর্ষ ১ম খণ্ড	শ্রাবণ ১৩২২ সাল	১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সন্ধান

তোরা আমায় বলিসনে কেউ
বলিসনে তার নাম,
তারে আমি আপনি নেব খুঁজে' —
কোন্‌খানে তার বেলা কাটে
কোথায় বসত গ্রাম,
অমন করে' দিসনে কানে গুঁজে!
যেমন করে' তন্দ্রা-ঘোরে
স্বপ্নে পেয়ে ভয়,
জননী তা'র ব্যাকুল বাহু মেলে',
অন্ধকারে শয্যা' পরে
বক্ষে টেনে লয়,
হাত্‌ড়ে-পাওয়া, হারিয়ে যাওয়া ছেলে —
তেমনি ক'রে খুঁজব তারে
অন্ধ অনুরাগে,
মুগ্ধ মনের গভীর নাড়ীর টানে,
তন্দ্রা-ঘেরা অন্ধকারে
শঙ্কা যদি জাগে
খুঁজব তারে অন্তর মাঝখানে ;

খুঁজব আমি আপন চোখে,
বুঝব আপন কাণে,
পরখ করে' পরশ করে' হাতে,
বুঝ্‌ব আলো অন্ধকারে
বুঝ্‌ব আপন প্রাণে
সুখের মোহে দুঃখের বেদনাতে।
বারেক যখন পেয়েছি তার
গোপন পরিচয়
বারেক যখন ভুলিয়েছে মোর মন,
তখন আমি যাবই কাছে
যেমন করেই হয়,
জীবন মরণ রইল আমার পণ!
দেখি কেমন ঠেকিয়ে রাখে
কি দিয়ে আজ মোরে,
ভুলিয়ে কেমন দেয় সে আমায় ফাঁকি,
কেমন করে' লুকিয়ে থাকে
দেখি কেমন করে'
মনোবনের পালিয়ে-যাওয়া পাখী।
কিন্তু তোরা বলিস্ নাক
কি সে পাখীর নাম,
তারে আমি আপনি লব খুঁজে—
সেই ত আমার গর্ব্ব, তাহার
কোথায় গোপন ধাম
আপনি যদি চিনতে পারি বুঝে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বার্হস্পত্য-দর্শন বা নাস্তিবাদ। *

যদিও শাস্ত্রসমূহের মিলন অথবা মিলিত শাস্ত্রসমষ্টি, সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ, তথাপি, দীর্ঘকাল হইতে কাব্য তাৎপর্য্যেই সাহিত্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। "সাহিত্যরহিতঃ পশুঃ" "সাহিত্য সুকুমারবস্তুনি দৃঢ়শ্রায় গ্রন্থিলে" ইত্যাদি শ্লোকাংশে সাহিত্য শব্দ কাব্যার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, কাব্যগ্রন্থে সকল শাস্ত্রেরই সন্নিবেশ থাকে, তন্নিবন্ধন কাব্যকেই সাহিত্য বলে। অথবা "সাহিত্য" একটী পারিভাষিক শব্দ মনে করিয়া, কেবল কাব্যই সাহিত্য নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্য শব্দের যোগার্থানুসারে পুরাণাদিও সাহিত্য শব্দবাচ্য হয়; কিন্তু সাধারণতঃ, লোকে পুরাণাদিকে সাহিত্য বলে না। মহাকবি শ্রীহর্ষ, সাহিত্য ও পুরাণকে বিভিন্ন শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি, নৈষধ চরিতের দশম সর্গে সরস্বতীর বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "ধ্রুবীমরী ভূতবলী বিভঙ্গা, সাহিত্যানির্ব্বর্ত্তিত দৃক্তরঙ্গা।" "সপল্লবং ব্যাসপরাশরাভ্যাং প্রণীত ভাবাত্তভবীভবদ্ভূঃ। তদ্বংশ্যপদ্মাত্ত্যপলক্ষ্যমাণং যং পাণিযুগ্মং বহতে পুরাণম্‌"। এই শ্লিষ্ট বাক্যে প্রতীত হইতেছে যে, শ্রীহর্ষের মতে পুরাণ সাহিত্য নহে। অনেক টীকাকারও "সাহিত্যানির্ব্বর্ত্তিতদৃক্তরঙ্গ" এই শব্দের "সাহিত্যেন কাব্যেন" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাহিত্য শব্দের অর্থ মিলিত শাস্ত্রসমষ্টি হউক, আর কেবল কাব্যই হউক, সম্যক্ রূপে সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভের চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অনুশীলনই তাহার একমাত্র উপায়। কাব্যশাস্ত্রের চতুর্ব্বর্গ সাধনত্ব বিষয়ে দর্পণকার বিশ্বনাথ, প্রদর্শন করিয়াছেন যে, "চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি। কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিগদ্যতে।" "ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ। করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণং।" এই চতুর্ব্বর্গ মধ্যে অপবর্গাপর-নামধেয় মোক্ষরূপ ফলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না। সর্ব্বধর্ম্মদ্রোহী চার্ব্বাক হইতে একদণ্ডী, বেদান্তী পর্য্যন্ত, কি শ্বেতাম্বর, কি দিগম্বর, কি যোগাচার, কি সৌত্রান্তিক, কি বৈভাষিক, কি মাধ্যমিক, সমস্ত দর্শনকারই সমস্বরে বলিয়াছেন, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।

* উত্তর বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের রাজসাহী অধিবেশনে পঠিত।

আত্মা দুই প্রকার; পরমাত্মা ও জীবাত্মা। পরমাত্মাই ঈশ্বর। এতদ্বিষয়ে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে,

"বেদাহ মেতং পুরুষং প্রধানং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেত্র বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

জীবাত্মজ্ঞান বিষয়েও "আত্মা জ্ঞাতব্যো ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদি বহুতর শ্রুতি পরিলক্ষিত হয়। লোকে যাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া থাকে, তাহার অর্থও ঐ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান। সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানোদয়েই মিথ্যা জ্ঞানের অপায় হয়, মিথ্যা জ্ঞানের অপায়ে রাগ-দ্বেষ-মোহাত্মক দোষের নিবৃত্তি, দোষের নিবৃত্তিতেই প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তি-সাধন-ধর্ম্মাধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিলোপে পুনর্জন্মের নিবৃত্তি, পুনর্জন্মের নিবৃত্তিতে সর্ব্বদুঃখের অবসান হয়; এই দুঃখের অবসানই অপবর্গ নামে অভিহিত।

এতদ্বিষয়ে অক্ষপাদ-দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রে লিখিত আছে যে, "দুঃখ 'জন্ম' প্রবৃত্তি 'দোষ' মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।" শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যে সমন্বয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথমেই "তথাচাচার্য্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং বাক্যং" এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ন্যায়সূত্রটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিশেষ এই যে, দেহাত্মবাদিত্ব নিবন্ধন পুনর্জন্মাভাববাদী চার্ব্বাকাদির মতে তত্ত্বজ্ঞানের পর, কারণক্রমে মিথ্যাজ্ঞানাদির অভাব বশতঃ ইহ জন্মেই দুষ্প্রবৃত্তির অভাব নিবন্ধন স্বাতন্ত্র্যরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সকল দুঃখ নিবারণের নিদানীভূত মুক্তি লাভ হয়। এ মতে, দুঃখনিবৃত্তি মুক্তির অবান্তর ফল। পারতন্ত্র্য নিবৃত্তি ও স্বাতন্ত্র্যই মোক্ষের মুখ্য ফল। অন্যান্য মতে দেহপাতের পর অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি রূপ পরমমুক্তি লাভ হয়। কোন কোন মতে দুঃখাভাবের পরও আনন্দাভিব্যক্তিরূপ মুক্তি লাভ হয়। সকল মতেই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ তত্ত্বজ্ঞান।

দর্পণকার বিশ্বনাথ, কাব্যশাস্ত্রের মোক্ষোপযোগিতা বিষয়ে দেখাইয়াছেন যে, "মোক্ষপ্রাপ্তিশ্চৈতজ্জন্যধর্ম্মফলানন্বুসন্ধানাৎ, মোক্ষোপযোগিবাক্যে ব্যুৎপত্ত্যাধায়কত্বাচ্চ। যদিও ভগবদ্গীতাতে "যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তি মাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।" 'যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে' ইত্যাদি বাক্য আছে, তথাপি বিশ্বনাথ-প্রদর্শিত প্রথম হেতুটী গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ, কাব্যশাস্ত্র পাঠে রামাদির চরিত্রজ্ঞান প্রভাবে, তদনুকরণে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তজ্জনিত পুণ্যে চিত্তশুদ্ধি হইবে, তৎপরে বেদান্তাদি

শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার জন্মিবে, তারপর যোগাভ্যাসাদির অনন্তর মোক্ষ হইবে; এত দূরবর্ত্তী ফল শাস্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে না। দ্বিতীয় হেতুটী কথঞ্চিৎ গৃহীত হইতে পারে বটে, কিন্তু কাব্যশাস্ত্র পাঠ, মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের উপায় বলিয়া মোক্ষের হেতু, ও কাব্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ, এ কথাও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। "কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে। সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে" ইত্যাদি বাক্যে কাব্যের সাক্ষাৎমুক্তি কারণতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে; অতএব, কাব্যশাস্ত্র পাঠানন্তরই জীবাত্ম-পরমাত্মতত্ত্বের শাব্দজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা বলিলে বাক্য অসত্য হয় না। যদি প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটক ও বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ, কাব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়, তবে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কাব্যাধীন আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইবে। কালিদাসের কুমারসম্ভব, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, তন্মধ্যেও গূঢ়রূপে আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; এই জন্য ন্যায়াচার্য্য জগদীশ তর্কালঙ্কার "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।" এই বাক্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, স্বতন্ত্রপ্রমাণশব্দবোধক শ্রুতিশব্দ এখানে প্রমাণ শব্দরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; অন্যথা নিয়মাদৃষ্ট কল্পনাপত্তি দোষ হয়। অর্থাৎ, যে কোন শব্দদ্বারা আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলেই, তাহা তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপযোগী হয়। কাব্যশাস্ত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে; তবে আত্মতত্ত্ববোধক কাব্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য দর্শনশাস্ত্রের সহায়তা আবশ্যক।

কাব্যচন্দ্রিকার টীকাকার রাজসাহী পুটিয়ার স্বর্গগত ৺ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আভাসে এই বিষয়ের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

দর্শনশাস্ত্রের কথা, কোন দিন বঙ্গভাষাতে স্থান পাইবে, আমাদের এরূপ বিশ্বাস ছিল না। ২৪ পরগণার এঁড়েদহ নিবাসী ৺কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়, বহু বৎসর পূর্ব্বে, বিশ্বনাথকৃত ভাষাপরিচ্ছেদের বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রসঙ্গে সংস্কৃতদর্শনের নানাবিধ কথার উল্লেখ করিয়া "পদার্থকৌমুদী" নামে বঙ্গভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন; ঐ গ্রন্থ মুদ্রিতও হইয়াছিল। গ্রন্থের মুখবন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন;—

"ভাবিলে ভাবনা যাবে   অন্ধকারে আলো হবে
দৃষ্টিমাত্র পদার্থ কৌমুদী।

"পরম ঈশ্বরে ভাবি কহে কাশীনাথ কবি
উপনাম তর্কপঞ্চানন ॥"

গ্রন্থখানি পর্য্যালোচনা করিলে কবির বাক্য সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। তিনি যেরূপে পারিভাষিক জটিল শব্দময় ন্যায়শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, তৎকালের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত তাহা অসম্ভব। পদার্থ-কৌমুদী দৃষ্টিমাত্রেই যে ন্যায়শাস্ত্রের পদার্থ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, ঈদৃশ উপাদেয় গ্রন্থও বঙ্গ-সাহিত্যসমাজে সমাদর লাভ না করিয়া বহুল প্রচার প্রাপ্ত হয় নাই, এবং বর্ত্তমানেও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পুস্তক খানি একবার মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল; এক্ষণে ঐ পুস্তক কোন কোন স্থানে পাওয়া যাইতে পারে।

তৎপর, রাজসাহী বাসুদেবপুরের ৺হরিকিশোর তর্কবাগীশ মহাশয়, "ন্যায় পদার্থতত্ত্ব" নামে একখানি ন্যায়দর্শনের সোপপত্তিক বঙ্গানুবাদ বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় প্রচার করেন, সে গ্রন্থেরও বঙ্গসাহিত্যসমাজে সমাদর লক্ষিত হয় না। ন্যায় পদার্থ তত্ত্বে জাতি-সাঙ্কর্য্য প্রভৃতি অতি দুরূহ বিষয়ের অতি সরল ব্যাখ্যা ও সোপপত্তিক উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে; তথাপি সে গ্রন্থের সমাদর হইল না দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছিলাম; কিন্তু গত বৎসর কলিকাতা নগরীর সাহিত্য সম্মিলনীতে, মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট্ বারেন্দ্র পণ্ডিত কুলচূড়ামণি শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় লিখিত প্রবন্ধে কাব্যশাস্ত্র পড়িতে হইলে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞান আবশ্যক, ভূতত্ব, মূর্ত্তত্ব উপাধি বা জাতি এবং অভিহিতান্বয়বাদী মীমাংসক ও অন্বিতাভিধানবাদী মীমাংসক ইত্যাদি শব্দ উল্লিখিত হইয়াছিল। সুযোগ্য "মানসী"-সম্পাদক মহাশয় নিরতিশয় আগ্রহের সহিত ঐ প্রবন্ধটি স্বসম্পাদিত পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। ভূতত্ব, মূর্ত্তত্বের জাতিত্ব, সাঙ্কর্য্য দোষপ্রযুক্ত নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন না। ন্যায়ের ভাষায় সাঙ্কর্য্য দোষের উল্লেখ করিতে হইলে স্বসামানাধিকরণ্য, স্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব, স্বসমানাধিকরণাভাব প্রতিযোগিত্ব, এতন্ত্রিতয় সম্বন্ধে জাতিবিশিষ্টত্ব এইরূপ বলিতে হয়। একথাটী ন্যায়শাস্ত্রের প্রথমপাঠীর ভাষায় বলা হইল। বিশুদ্ধ ন্যায়ের ভাষায় বলিতে হইলে, যাহাদের ন্যায়শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান আছে, তাঁহারা ব্যতীত কেহ এই সাঙ্কর্য্য দোষ বুঝিতে পারেন না। সাঙ্কর্য্যদোষ প্রযুক্ত ভূতত্ব, মূর্ত্তত্ব এই উভয়কে উপাধি স্বীকার না করিয়া একটীকে জাতি ও অপরটীকে উপাধি স্বীকার করিলেই হইতে পারে, এই পূর্ব্বপক্ষ দীর্ঘকাল হইতে নৈয়ায়িক-সমাজে প্রচলিত

আছে। গদাধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুমিতি গ্রন্থে ঐ ভূতত্ব মূর্ত্তত্বের সাঙ্কর্য্যবিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত তর্কবাগীশ মহাশয় ন্যায়-পদার্থতত্ত্বে সাঙ্কর্য্যের জাতিবাধকতা বিষয়ে সরল যুক্তি ও মানচিত্র দ্বারা সাঙ্কর্য্যের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। নৈয়ায়িকচূড়ামণি সর্ব্বলোকপূজ্য মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বরচিত "বিবিধ বিচার" নামক গ্রন্থে সোপপত্তিক সপ্রমাণ ভূতত্বের উপাধিত্ব ও মূর্ত্তত্বের জাতিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তথাপি নৈয়ায়িক-সমাজে উহা লইয়া বিচার বিতর্কের অভাব নাই। যে সকল ব্যক্তি নিয়ত দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই প্রভাকরের অন্বিতাভিধান বোধশক্তির অভাবে, পুস্তকের যে যে অংশে অন্বিতাভিধানবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তদ্দংশ বাদ দিয়া অধ্যাপনা করান। এক্ষণে বিবেচনা করুন, যে সকল বিষয় কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, প্রচলিত বঙ্গভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা করিলেও এবং তর্কবাগীশ মহাশয় সমগ্র বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা করিলেও, আর রাখালদাস ন্যায়রত্নের মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত মীমাংসা করিলেও অবোধ্য ও অমীমাংস্য বলিয়া লোকের ধারণা আছে, সেই বিলুপ্তকল্প অন্বিতাভিধানবাদের ও তর্কশাস্ত্রে জাতিসাঙ্কর্য্যের নামও উল্লেখমাত্র করিয়া তর্করত্ন মহাশয় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি যে, এখন আমাদের এমন শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে যে, দার্শনিক পারিভাষিক শব্দগুলি ক্রমশঃ বঙ্গভাষায় প্রবেশাধিকার লাভ করিবে, সুতরাং হিন্দুদর্শন শাস্ত্র মাত্রই বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাত হইতে পারে, এই সাহসেই আমরা অদ্য বিলুপ্তকল্প বার্হস্পত্য-দর্শনের কঠিন তাৎপর্য্য বঙ্গভাষায় বিবৃত করিতে সম্মিলনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।

বার্হস্পত্য দর্শনের কোন বিশেষ পুস্তক আর দেখা যায় না। মাধবাচার্য্যের "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" চার্ব্বাকদর্শন নামে যে বিকৃত সংগ্রহ আছে, তাহাই এখন বার্হস্পত্য দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ। বার্হস্পত্য মতাবলম্বী দার্শনিকদিগকে চার্ব্বাক, লোকায়ত বা লোকায়তিক শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ, চার্ব্বাক শব্দের দ্বিবিধ অর্থ করিয়া থাকেন। চারু বাক যাহাদের এই বহুব্রীহি সমাসে পৃষোদরাদি প্রযুক্ত চার্ব্বাক পদসিদ্ধ। এইরূপ ব্যুৎপত্তিবাদীরা বলেন যে, বার্হস্পত্য মতাবলম্বিগণের বাক্য অতি সুন্দর। পারলৌকিক অদৃশ্য সুখের জন্য দৃশ্য কষ্টের কারণীভূত উপবাসাদি করিও না, অহিংসারূপ পরমধর্ম্ম আচরণ কর, আত্মনির্ভরতা অবলম্বন কর। কাপুরুষায়মান অকর্ম্মদিগের "আমি

কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় কিছুই নহি, আমার উপরে অদৃশ্য ঈশ্বরনামে এক কর্ত্তা আছেন ও কর্ত্তার অনুচর বহুবিধ দেবতা আছেন, সেই কর্ত্তা বা কর্ত্তার অনুচর-বর্গ, আমাকে যে পথে প্রেরণ করেন, আমি সেই পথেই প্রেরিত হই ; আমি কিছুই নহি" ইত্যাদি আত্মানাদরসূচক উপদেশের বশবর্ত্তী হইও না। স্বয়ং স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন কর, স্বাতন্ত্র্যই পরমসুখ, পরমশান্তি, চরম দুঃখাভাবের কারণ। এই জন্য স্বাতন্ত্র্যই মুক্তি বা পরমপুরুষার্থ বলিয়া অভিহিত হয়, ঈদৃশ শ্রুতিমধুর অমৃতায়মান সুন্দর বাক্যের উপদেষ্টা বলিয়া 'চার্ব্বাক" এই নাম হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, অর্ব্বাচ্ শব্দের আদিতে চকারাগম ও অন্তে অকারাগম ও চকারস্থানে ক করিয়া পৃষোদরাদিপ্রযুক্ত চার্ব্বাক পদ সিদ্ধ। ইহাদের মতে চার্ব্বাক শব্দের অর্থ অর্ব্বাক্‌দর্শী; অর্থাৎ ইহাঁরা ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানমাত্র স্বীকার করেন, অথবা ইহাদের তাদৃশজ্ঞানমাত্র আছে। ইহারা প্রত্যগাত্মা ও প্রত্যগ্‌দর্শন স্বীকার করেন না। করেন না। শ্রুতিতে ও 'পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণাৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। এইরূপে ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান মাত্রের প্রামাণ্যবাদিগণের নিন্দা পরিলক্ষিত হয়। এই পরিদৃশ্যমান লোকে যাহা আয়ত অর্থাৎ বিস্তৃত বা বিদ্যমান আছে, কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞানবান্ ব্যক্তি-রাই লোকায়ত বা লৌকায়তিক নামে আখ্যাত। চার্ব্বাকগণ কেবল প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য ব্যতীত অনুমানাদির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না।

মহাভারতেও চার্ব্বাকের কথা উল্লিখিত আছে। মহাভারতকার, চার্ব্বাক কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যও "বৃহস্পতি মতানুসারিণা নাস্তিক শিরোমণিনা চার্ব্বাকেন" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার এই লিপিভঙ্গিতেও চার্ব্বাক ব্যক্তি বিশেষের নাম বলিয়াই বোধ হয়। মহাভারতের চার্ব্বাক ও মাধবাচার্য্যের চার্ব্বাক এক ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কেহ কেহ চেষ্টা করেন, কিন্তু অপক্ষপাতে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, মহাভারতের চার্ব্বাক ও দার্শনিক চার্ব্বাক সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি।

বার্হস্পত্য-দর্শনের এতাদৃশ ক্ষীণপ্রচারের কারণ কিছুই উপলব্ধ হয় না। কেহ কেহ বলেন, বার্হস্পত্য দর্শনে নাস্তিকতা, বেদনিন্দা ও পশ্বাচার প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ বিদ্যমান থাকাতেই ঐ শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে ; একথা সম্যক্ বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না। কারণ, বৌদ্ধেরাও বেদনিন্দক, জৈনগণও বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধী। হিন্দুর পুরাণাদিতে ও সংহিতায় বৌদ্ধ ও জৈনগণের অনেক প্রকার নিন্দা আছে এবং তাহাদিগের ধর্ম্মকে পাষণ্ড ও তাহাদিগকে পাষণ্ডী

বা পাষণ্ড প্রভৃতি ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। তবে, স্বমতের অনুকূল ২।১টী শ্রুতি যেমন বৌদ্ধ ও জৈনগণ গ্রহণ করিয়াছেন, চার্ব্বাক দর্শনেও তদ্রূপ অনুকূল শ্রুতি পরিগৃহীত হইয়াছে।

এই আপত্তিতে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ত্তমানযুগে কিছু দিবস পূর্ব্বে, যেরূপ, ইংরেজী পড়িলেই বালকগণ খৃষ্টান হইবে, এই দৃষ্টির বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাম্যলোকে সন্তানগণকে ইংরেজী পড়িতে দিত না, ক্রমে শিক্ষার আলোকে লোকের হৃদয় উদ্ভাসিত হইলে, সেই ভ্রম অপনীত হইয়াছে; তদ্রূপ, শিক্ষার স্বল্পপ্রচার সময়ে বেদনিন্দাকল্পে বার্হস্পত্য-দর্শন প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা সকলে গ্রহণ করেন নাই। শিক্ষার স্রোত ভারতভূমিতে প্রবাহিত হইবার সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতির ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মগ্রন্থাদির প্রণয়ন হইয়াছিল; তজ্জন্য বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম এবং তদীয় ধর্ম্মগ্রন্থের বহুলপ্রচার দেখিতে পাওয়া যায় এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

বার্হস্পত্যদর্শনের মতাবলম্বি-পণ্ডিতগণ নাস্তিক নামে অভিহিত হয়। মনু প্রভৃতি সংহিতাকারগণ নাস্তিকতাকে উপপাতকমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। "পাতকেভ্যঃ পরং নাস্তি পাতকং নাস্তিক্যাদিত্যাদি" বচনে চরক সংহিতাতেও নাস্তিকতার নিন্দা থাকায় এবং বৈদিক-ধর্ম্মপ্রচুর দেশে বার্হস্পত্য মতাবলম্বিগণ নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করায় তাহাদের ধর্ম্ম ও গ্রন্থ সুপ্রচারিত হয় নাই; যাহা কিছু ছিল, তাহাও বিলুপ্তকল্প হইয়াছে। এই কথার উপরও সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না! "যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং। সজীবন্নেব শূদ্রত্ব মাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।" এই মনুবচনের ব্যাখ্যায় অনেক টীকাকার বলিয়াছেন, যাহারা বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ডাদি (বৌদ্ধাদি) শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, উহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়; সুতরাং কেবল বার্হস্পত্য মতাবলম্বিগণকেই, বৈদিক সম্প্রদায় ঘৃণা করিত এমন নহে; বৌদ্ধাদিকেও ঘৃণা করিত।

নাস্তিক শব্দের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করিতে গেলে, মাধ্যমিক শ্রেণীর বৌদ্ধই প্রকৃত নাস্তিক হইয়া পড়ে। অমরসিংহ বলিয়াছেন, "মিথ্যাদৃষ্টির্নাস্তিকতা" তাঁহার এই বাক্যানুসারে যদি, যৎকিঞ্চিৎ মিথ্যাদৃষ্টিকে নাস্তিকতা বলা যায়, তবে এক প্রভাকর-মতাবলম্বী পণ্ডিত ব্যতীত অন্য সকলকেই নাস্তিক বলিতে হয়। নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন, 'মিথ্যাজ্ঞানাহিতা বাসনাই সংসারের মূল' সুতরাং তাঁহাদের মতে মিথ্যাজ্ঞান-স্বীকার আছে। সাংখ্যপাতঞ্জলও অবি-

দ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ স্বীকার করিয়া "অবিদ্যাক্ষেত্র মুত্তরেষাং" ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে সংসারের অবিদ্যামূলকত্বই স্বীকার করিয়াছেন। অবিদ্যাশব্দের অর্থ ধরিলে মিথ্যাজ্ঞানই পর্য্যবসিত হয়। বৌদ্ধদর্শনেও সংবৃতি নামক পদার্থ স্বীকৃত আছে। সংবৃতি শব্দের অর্থ করিতে গেলেও মিথ্যাজ্ঞানই উপলব্ধ হয়। বেদান্তদর্শনে অধ্যাস বা অবিদ্যা বলিয়া যে পদার্থ স্বীকৃত আছে, তাহার অর্থও মিথ্যাজ্ঞান। জৈন-দর্শনে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, "মিথ্যাজ্ঞানাবিরতি প্রমাদকষায় যোগাঃ পঞ্চ বন্ধহেতবঃ।"

জৈমিনিদর্শনের ব্যাখ্যাতৃগণ, বিশেষতঃ প্রভাকর, ভ্রান্তিজ্ঞান স্বীকার করেন না, সুতরাং তাঁহাকে আস্তিক বলিতে হয়; কিন্তু অন্যান্য দর্শনকারগণ, প্রভাকরকে নাস্তিক বলিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে ক্রটী করেন নাই. এমন কি কুমারিল ভট্টকেও অনেকে নাস্তিক বলিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন।

তবে যদি নাস্তিক শব্দের এরূপ অর্থ ধরিয়া লওয়া যায় যে, যাহারা সর্ব্বথা মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ যাহাদের মতে কোন বস্তুবিষয়ক জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান নহে, তবে মাধ্যমিক বৌদ্ধই নাস্তিক পদবাচ্য হয়। কারণ, মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা জগতের কোন বস্তুরই পরমার্থসত্তা স্বীকার করেন না। তঁহারা বলেন, "শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি, বস্তুধর্ম্মত্বাদ্ বিনাশস্য।" কাদম্বরী গ্রন্থে উজ্জয়িনী বর্ণন-প্রস্তাবে মহাকবি বাণভট্ট, "বৌদ্ধেনেব সর্ব্বদানাস্তিবাদশূরঃ" এই শ্লিষ্ট প্রয়োগ দ্বারা অর্থাৎ বৌদ্ধবৎ সর্ব্বদা নাস্তিবাদশূর আর সর্ব্বদানে অস্তিবাদশূর, এতদর্থে বৌদ্ধকে নাস্তিক বলিয়াছেন।

বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীকার চিরঞ্জীব কবি, চার্ব্বাক এবং সকল শ্রেণীর বৌদ্ধ ও জৈনকে নাস্তিক বলিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন, "পাণিনির অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ" এই সূত্রের ব্যাখ্যাতৃগণের ব্যাখ্যা তাৎপর্য্যে নাস্তি পরলোকঃ ইত্যেবং মতির্যস্য স নাস্তিকঃ, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে, জৈনেরা যখন পরলোক স্বীকার করেন, তখন তাহারা নাস্তিক হইতে পারেন না।

বৌদ্ধগণ পরলোক স্বীকার করেন কি না করেন, ইহার একতর পক্ষের অদ্যাপি নিশ্চয় হয় নাই; তজ্জন্য তাহাদিগের সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। সুতরাং নাস্তিক শব্দের নিরপেক্ষ ভাবে একটা আলোচনা আবশ্যক। ন শব্দের অর্থ অভাব, আর অস্ ধাতুর অর্থ সত্তা, তি প্রত্যয়ের অর্থ আশ্রয়, ইহার মিলিত অর্থ এইরূপ হয় যে, অভাব রহিয়াছে আর কিছুই নাই।

নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, এরূপ একটা প্রতীতিই হইতে পারে না। অভাব-শব্দটা সাকাঙ্ক্ষ শব্দ, সুতরাং অভাব বলিলে কাহার অভাব, এইরূপ অপেক্ষা করে। অতএব অভাবজ্ঞান প্রতিযোগিসাপেক্ষ। যে বস্তু, আমি কখনও জানি না, তাহার অভাব বিষয়ে আমার জ্ঞান হইতে পারে না। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার ভূমিকাতেই ইহার সূচনা করিয়াছেন, যথা "সৎ সদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি। অসচ্চাসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি, কথমুত্তরস্য প্রমাণেনোপলব্ধিরিতি সত্যুপলভ্যমানে তদনুপলব্ধেঃ প্রদীপবৎ, যথা দর্শকেন দীপেন দৃশ্যে গৃহ্যমাণে তদিব যন্ন গৃহ্যতে তন্নাস্তি, যদ্যভবিষ্যৎ ইদমিব ব্যজ্ঞাস্যত, বিজ্ঞানাভাবান্নাস্তীতি।" সূত্রকার বলিয়াছেন, যে প্রমাণ দ্বারা যে বস্তুর উপলব্ধি হয়, তাহার অভাব সেই প্রমাণদ্বারাই গৃহীত হয়। "নানুমীয়মানস্য প্রত্যক্ষতোঽনুপলব্ধিরভাবহেতুঃ।" এতদনুসারে উদয়ন কুসুমাঞ্জলিতে বলিয়াছেন, "যোগ্যাদৃষ্টিঃ কুতোঽযোগ্যে প্রতিবন্ধিঃ কুতস্তরাং। ক্বাযোগ্যং বাধ্যতে শৃঙ্গং ক্বানুমানমনাশ্রয়ং।" এই কারিকার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যে বস্তু দর্শনের যোগ্য, তাহারই অজ্ঞান অধিকরণবিশেষে তাহার অভাব সাধক হয়। শশশৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতি পদার্থ, জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, সুতরাং তাহার অভাবজ্ঞানও হয় না। তবে যে শশশৃঙ্গ নাই, আকাশকুসুম নাই, ইত্যাদি বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থ শশকে শৃঙ্গের অভাব আছে এবং আকাশে কুসুমের অভাব আছে। ইহাই পাতঞ্জল দর্শনোক্ত "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" এই বিকল্পাত্মক চিত্তবৃত্তির উদাহরণ হইতে পারে। বিকল্প শব্দের অর্থ, শব্দ আছে, তাহার অর্থ নাই, অথচ লোকে তাহার ব্যবহার করিয়া থাকে। মাধ্যমিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ অলীক প্রতিযোগিক অভাব স্বীকার করিয়া, আকাশকুসুমের অভাব, জ্ঞানের বিষয় হয় এই কথা বলিয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে অনুভবই সাক্ষী, অনুভবের অপলাপ বা ব্যবহার-বিষয়ে অন্য প্রমাণ নাই। অনুভাবকের অন্তঃকরণই তাহার ব্যবস্থাপক ও প্রমাণ। তজ্জন্য আমরা এস্থানে আর এবিষয় বিবৃত না করিয়া নীরব রহিলাম। জৈনাচার্য্য বিদ্যানন্দ আপ্তপরীক্ষাগ্রন্থে "নাস্পৃষ্টঃ কর্ম্মভিঃ শশ্বদ্বিশ্বদৃশ্বাস্তি কশ্চন" এই উপক্রমে বৈশেষিকসিদ্ধ ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়া পরে "এতেনৈব প্রতিব্যূঢ়ঃ কপিলোঽপ্যুপদেশকঃ। জ্ঞানাদর্থান্তরত্বস্য বিশেষাৎ সর্বথা স্বতঃ।" এই উপক্রমে সাংখ্যসিদ্ধ কপিলের আদিবিদ্বত্ত ও তত্ত্বোপদেশকত্ব নিরাকরণ করিয়া "সুগতোঽপি ন নির্ব্বাণমার্গস্য প্রতিপাদকঃ। বিদ্বত্তত্ত্বতাপায়াৎ তত্ত্বতঃ কপিলাদিবৎ।"

এই উপকরণে বৌদ্ধেরা সর্ব্বজ্ঞত্ব নিরাকরণ পূর্ব্বক "যস্তু সংবেদানাদ্বৈত্বং পুরুষাদ্বৈতমেবতৎ। সিদ্ধে স্বতোঽন্যথাবাপি প্রমাণাৎ স্বেষ্টহানিতঃ।" এই উপক্রমে অদ্বৈতবাদী একদণ্ডীর মত খণ্ডন করিয়া পরিশেষে মীমাংসক, ভট্ট ও প্রভাকরের মত খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বাদিগণকে নাস্তিক শব্দে অভিহিত করেন নাই।

"নাস্তিকানাঞ্চ নৈবাস্তি প্রমাণং তন্নিরাকৃতৌ। প্রলাপমাত্রকং তেষাং না বচেয়ং মহাত্মনাম্।" এই কারিকার ব্যাখ্যায় "যেষাং প্রত্যক্ষমেবপ্রমাণং নাস্তিকানাং, এই কথা বার্হস্পত্য-মতাবলম্বী চার্ব্বাকদিগকে বিদ্যানন্দও নাস্তিক বলিয়াছেন। সে যাহাই হউক, নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি যেরূপই হউক, বার্হস্পত্যদর্শনের দেহাত্মবাদ, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত বিষয় না হইলেও তাহা যে প্রথম সোপান তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। "যথামুঞ্জাদিশিকৈবমাত্মাযুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ" ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ। বেদান্তের অনেক গ্রন্থকার বলিয়াছেন, বধূকে অরুন্ধতী দর্শন করাইতে হইলে প্রথমে তৎসমীপবর্ত্তী স্থূল নক্ষত্র দর্শন করাইয়া, ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম নক্ষত্র দর্শন করাইয়া পরে অতিসূক্ষ্মতম অরুন্ধতী দর্শন করাইবে; সেইরূপ আত্মানাত্মবিবেকশূন্য নিতান্ত জড়ভাবাপন্ন ব্যক্তির, দেহ ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিতে প্রথম আত্মবুদ্ধি উপস্থিত করাইয়া পরে দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যতিরিক্ত আত্মার উপলব্ধি করাইবে, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। দেহাত্মবাদ যদি অতি বাষ্পচ্ছেদ্য ও অপ্রয়োজনীয় হইত, তবে প্রত্যেক দর্শনকর্ত্তাই দেহাদির খণ্ডনের এত প্রয়াসী হইতেন না। ন্যায়দর্শনের প্রথমে "দর্শনস্পর্শনাভ্যা মেকার্থগ্রহণাৎ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ইন্দ্রিয়াত্মবাদ খণ্ডন করিয়া পরে দেহাত্মবাদ খণ্ডন ও তৎপরে মনের আত্মত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য ও বেদান্তসূত্রে প্রথমেই দেহাত্মবাদীর মত পরে ইন্দ্রিয়াত্মবাদীর, তৎপরে মন-আত্মবাদীর মত উদ্ধৃত করিয়া চার্ব্বাক-দর্শনের অস্তিত্ব ও কার্য্যকারিতার প্রমাণ দেখাইয়াছেন। সাংখ্যাদি দর্শনেও চার্ব্বাকদিগের দেহাত্মাদিবাদের উল্লেখ দেখা যায়। ঈদৃশ উপযোগী শাস্ত্রের বিলোপ একেবারে অভীষ্ট নহে।

দুঃখের বিষয় এই যে, মহাকবি শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতের সপ্তদশ সর্গে চার্ব্বাক মতের বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন, অথচ সরস্বতীর অঙ্গরূপে চার্ব্বাক মত গ্রহণ করেন নাই। বৌদ্ধদের শূন্যাত্মতাবাদ ক্ষণিকাত্মতাবাদ, সাকারজ্ঞানবাদ, সমস্তই সরস্বতীর অঙ্গরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে।

আমরা নানা স্থানের নানা গ্রন্থকারের উদ্ধৃত চার্ব্বাকমতের পাঠগুলি লইয়া চার্ব্বাক দর্শনের পুনঃপ্রচার বিষয়ে যত্ন করিতেছি, তাহারই কিয়দংশ পঠিত হইবে। আমরা চার্ব্বাকদর্শনের ও অন্যান্য দর্শনের তাৎপর্য্য যাহা অবগত হইয়া নাস্তিক ও আস্তিক শব্দের অর্থ এবং নাস্তিকতা ও আস্তিকতার উৎপত্তি হেতু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত করিতেছি।

আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? আমি পুরাতন সনাতন অথবা নূতন অধস্তন; আমি আকস্মিক, স্বাভাবিক, কি নৈমিত্তিক? আমার সহিত জগতের সম্বন্ধ নশ্বর কি স্থিরতর? এই পরিদৃশ্যমান জগদ্ব্যতীত আমার গন্তব্য অন্য কোন জগৎ আছে কি না, এই জগৎই আমার কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মফল ভোগের অধিকরণ? অথবা অন্য কোন স্থানে যাইয়া এই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে? আমার শুভাশুভের বিচারক ও নিয়ন্তা আমি? অথবা প্রত্যক্ষীভূত সমাজপতি ও রাজা বা রাজপুরুষ প্রভৃতি, কিংবা অপ্রত্যক্ষীভূত কোন অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন বস্তু আছে, যাহার শক্তিতে আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া দ্বিষ্ট বিষয়েও ইষ্টবৎ আচরণ করিতেছি; এইবারেই আমার লীলাখেলা সাঙ্গ হইবে; অথবা পুনঃ পুনঃ এই জড়জগতে আসিয়া জড়ের সহিত অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া আচার ব্যবহার করিতে হইবে? এই পরিদৃশ্যমান জগতের উপাদান প্রত্যক্ষভূত অণু অথবা অনুমেয় পরমাণু কিংবা তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তু? এই বিচিত্র জগৎ স্বভাবতঃ জড়ের শক্তিদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, অথবা কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তিসম্পন্ন সচেতন কারু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে? কোন মতে জীবমাত্রের, কোন মতে প্রাণীমাত্রের, কোনমতে মনুষ্যমাত্রের, কোন মতে তীক্ষ্ণধী মনুষ্য মাত্রের মন, স্বতঃই উক্ত প্রকার পর্য্যালোচনা প্রবণ হইয়া থাকে এবং স্বতই মনে মনে সে সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তও হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যাহাদের মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, আমি এই জগতে নূতন আসিলাম, কিছুদিনমাত্র এই নশ্বর জগতের সহিত আমার নশ্বরতর সম্বন্ধ। আমার কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মফল ভোগের ক্ষেত্র এই দৃশ্য-জগৎ, আমার প্রভু আমি, অথবা দৃশ্যমান রাজাদি, এই জগৎ পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টি। স্রোতকাষ্ঠিকাবৎ পরমাণুসমূহের যদৃচ্ছাক্রমে সংযোগজন্য ঘুণাক্ষরবৎ জগতের মধ্যে কোন বস্তু সুদৃশ্য ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, কোন বস্তু কুদৃশ্য ও কুৎসিতরূপে সৃষ্ট হইয়া থাকে; এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত ব্যক্তিগণকে সাধারণে নাস্তিক বলে। আর যাহারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, আমি সনাতন;

স্রোতস্বতীর আবর্ত্ত গতিতে কীটবং নানা যোনিতে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছি। আমার প্রভু আমি নহি বা দৃশ্যমান রাজাদি আমার কর্ত্তা নহে। প্রত্যক্ষ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন কোন মহাপুরুষ আছেন, তিনি আমার কর্ত্তা ও প্রভু। আমি দারুময় মূর্ত্তির ন্যায় সেই মহাপুরুষের অধীন; বিষ্টিগৃহীত দাসস্বরূপ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য। সেই মহাপুরুষই দুঃখের অমানিশার অন্ধকারময় জগতে আমার অন্তঃকরণে সময়ে সময়ে সুখখদ্যোতিকার আলোক প্রদান করিয়া থাকেন; এই সকল লোককে লোকে আস্তিক বলিয়া থাকে। আর যাঁহারা মনে করেন, পূর্ব্বোক্তরূপ আলোচিত বিষয়ের কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই বা হইতে পারে না, তাঁহারাও আস্তিক শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং আস্তিকতা ও নাস্তিকতা, উভয়ই লোকের স্বাভাবিক. উহা প্রকৃতির অনুযায়ী। কেহ কেহ বলেন, নাস্তিকতাই জীবের স্বাভাবিক, আস্তিকতা উপদেশ সাপেক্ষ। ইহাদের অভিপ্রায় এই যে, অস্ফুটবাক্য বালক, যে ভাষাভাষীদিগের মধ্যে বাস করে, বৃদ্ধব্যবহার দর্শন নিবন্ধন সেই বালকের সেই ভাষাতেই অধিকার জন্মে। এতদ্বিষয়ে শব্দশক্তি প্রকাশিকায় উল্লিখিত আছে যে, "সঙ্কেতস্য গ্রহঃপূর্ব্বং বৃদ্ধস্য ব্যবহারতঃ। পশ্চাদেবোপমানাদ্যৈঃ শক্তিধী পূর্ব্বকৈরসৌ।" এই ভাষাশিক্ষা, যেরূপ, উপদেশসাপেক্ষ হইলেও লোকে সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, উহা স্বাভাবিক মনে করে; সেইরূপ, অজ্ঞাতব্যবহারতত্ত্ব বালকে যে ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বাস করে, তাহাদের ব্যবহার দর্শনে সেই বালকে তদাচরিত ধর্ম্মই পরমার্থ সং বলিয়া বিবেচনা করে এবং অনালোচিততত্ত্ব ব্যক্তিগণ উহা স্বাভাবিক মনে করিয়া থাকে; বস্তুতঃ উহা সাহচর্য্যের অবিনাভব-উপদেশজনিত।

কেহ কেহ বলেন "অসদেবেদমগ্রআসীৎ" "সবা এষবৈ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ" বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি, ন তেষাং প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইত্যাদি নাস্তিবাদের মূলমন্ত্র, উপনিষদের মধ্যেই প্রকাশ্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বের মতে, অযোধ্যাধিপতি রজিরাজের পুত্রগণের চিত্তভ্রংশসম্পাদনার্থ দেবগুরু বৃহস্পতি প্রথমতঃ নাস্তিবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তেষাং সবুদ্ধিমোহার্থ মকরোদ্দ্বিজসত্তমঃ। নাস্তিবাদার্থশাস্ত্রং হি সতাং বিদ্বেষণং পরং।" ইহাই তাহার প্রমাণ। জৈনদিগের মতে বৃহস্পতি নামক কোন ব্রাহ্মণ নাস্তিবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা হরিবংশের আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য এইরূপে বর্ণন করেন যে, নাস্তিবাদাবলম্বী পণ্ডিতগণ সময়ে এতদূর প্রাধান্যলাভ

করিয়াছিলেন, ও নাস্তিবাদের এত সুক্ষ্মমীমাংসা হইয়াছিল যে, অন্যান্য মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সহিত বিচার বিতর্কে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইতেন না, হইলেও বিচারে পরাজিত হইয়া লজ্জিত ও অবাঙ্মুখ হইতেন এবং ভারতের প্রাচীন প্রথানুসারে নাস্তিবাদের পক্ষাবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন। „উপায়েন ন যচ্ছক্যং নতচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ” এই নীতিপথের অনুসরণে পৌরাণিকেরা ঐরূপ আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ দেবগুরু বৃহস্পতি রাজার পুত্রগণকে মুগ্ধ করিবার জন্য যে মত বিস্তার করিয়াছেন, সে মত ত অবশ্যই খণ্ডনীয় হইবে। যদি সে মত খণ্ডনীয় হয়, তবে সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী রাজার পুত্রগণসমক্ষে সে মতের উপন্যাস করিয়া বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে স্বীয়মতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইতেন না। এবং বৃহস্পতির উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইত না। পৌরাণিকগণ যে, এইরূপ কল্পিত আখ্যায়িকা দ্বারা স্বমত-বিরোধি মত প্রবর্ত্তক সম্প্রদায়কে নিরস্ত করিয়া থাকেন তাহার দ্বিতীয় তৃতীয় উদাহরণ বৌদ্ধ ও জৈনগণ। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে “ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাং। বুদ্ধোনাম্নাঞ্জনঃ সুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি। যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রোহয়জিহীর্ষয়া। তানি পাপস্য খণ্ডানি লিঙ্গং খণ্ডমিহোচ্যতে।

ধর্ম ইত্যুপধর্ম্মেষু নেপথ্যেষু বাগ্মিষু। পাষণ্ডেষু পাপ্মা নগ্নরক্তপটাদিষু। তদবস্তং হরেরূপং জগৃহুর্জ্ঞানদুর্ব্বলাঃ। ইত্যাদি। সেই সময়ে সমালোচনা ও প্রচারকার্য্য পৌরাণিকদিগের আয়ত্ত ছিল, সুতরাং বর্ত্তমান যুগে যেরূপ সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, শিক্ষানীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদক মহোদয়গণের আলোচনা ও উপদেশের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই বিষয়ে শৈথিল্য করিলে তাঁহারা কর্ত্তব্যের অননুষ্ঠান-জনিত প্রত্যবায়ভাগী বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হন, পূর্ব্বকালে পৌরাণিকদের নেতৃবর্গেরও সেইরূপ দায়িত্ব ছিল এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিও প্রভূত ছিল। বর্ত্তমানে যেরূপ, কি সাপ্তাহিক, কি দৈনিক, কি মাসিক, সকলপ্রকার পত্রের সম্পাদকের কথার একটা মূল্য আছে, তৎকালেও কি পুরাণ, কি উপপুরাণ কি অন্য প্রকারে, ঐরূপ আখ্যায়িকার প্রবর্ত্তকদিগের কথারও মূল্য ছিল; সুতরাং তাঁহারা যাহা বলিতেন, তাহা সমাজের অন্ততঃ কিয়দংশ লোকে গ্রহণ করিত এবং কিয়দংশলোকে তাহার প্রতিবাদও করিত। বৌদ্ধদেবাদির সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে পৌরাণিকদের মত অবিসংবাদিরূপে সমাজে গৃহীত হইত না; “নিন্দসি বেদবিধেরহহ শ্রুতিজাতং, সদয় হৃদয়দর্শিত পশুঘাতং” বৈষ্ণবকবি জয়দেবের এই বাক্যই

তাহার সাক্ষী। অধুনাতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই মত যে, শাস্ত্রসম্পদ, ধনসম্পদ, রাজ্যসম্পদ প্রভৃতি যে কোন সম্পদ বিষয়ে মনুষ্য চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সেই বিষয়ের অনুষ্ঠানে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া সেই সম্পদের অপব্যবহার করিয়া থাকে। রাজ্যের চরমোন্নতির অবস্থায় রাজ্যশাসন সংরক্ষণে শিথিল হইয়া রাজশক্তির অপব্যবহার করে। এইরূপ অন্যান্য সম্পদের অপ ব্যবহার হইয়া থাকে।

বৈদিকযুগের চরমোৎকর্ষ সময়ে ব্রাহ্মণগণও বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় শিথিলযত্ন হইলে বৈদিক বিধির অপব্যবহার আরব্ধ হইয়াছিল। বেদ, লুপ্তকল্প হইলে বেদের নামে অনেক কাল্পনিক স্মৃতি ও পুরাণ বেদার্থ-সংগ্রাহক বলিয়া প্রচারিত হইত।

বেদের নামে যে বৃথা স্মৃতি কল্পিত হইত, জৈমিনিদর্শনের ভাষ্যকার শবর-স্বামী তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। একটী শ্রৌতবিধি আছে যে, ঔড়ুম্বরীং স্পৃষ্ট্বা উদ্গায়েত” ইহার প্রকরণানুগত অর্থ, অগ্নিষ্টোমনামক যজ্ঞে সদোনামক বেদিসন্নিধানে ঔড়ুম্বরী স্পর্শপূর্ব্বক উদ্গাতা সামবেদ গান করিবে (ঔড়ুম্বরী তাম্রময়ী প্রতিমা অথবা যজ্ঞোড়ুম্বরের শাখা) অপর একটী স্মার্ত্তবিধি আছে যে, ঐড়ুম্বরী বৈ সর্ব্বা বাসনা বেষ্টয়িতব্যা ইহার অর্থ, সর্ব্বাবয়বচ্ছেদে বস্ত্রদ্বারা ঔড়ুম্বরী বেষ্টন করিবে। এক্ষণে শ্রৌতবিধির সহিত স্মার্ত্তবিধির বিরোধ ঘটিল। কারণ, সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদে ঔড়ুম্বরী স্পর্শ অসম্ভব হয়, সুতরাং শ্রুতির বিরোধিনী স্মৃতি অপ্রমাণ। কোন ঋত্বিক্ বস্ত্রলোভে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপ স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন, এইজন্য সূত্রকারও বলিয়াছেন “বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানং” ইতি।

শ্রুতিস্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী ইত্যাদি পুরাণবাক্যও বেদ-বিরোধী কল্পিত স্মৃতি রচনার সঙ্কেত প্রদান করিতেছে। এই কল্পিত স্মৃতি পুরাণানুসারে সমাজে বেদবিরুদ্ধ বহু কার্য্য আচরিত হইত। অথবা এক সময়ে যাহা অতি সভ্যতার পরিচায়ক ও ধর্ম্মের কারণ বলিয়া সমাজে গৃহীত ও প্রশংসিত হয়, কালচক্রের কঠোর আবর্ত্তনে মানবের মনোভাব পরিবর্ত্তনের সহিত সেই-গুলিই আবার অসভ্যতার পরিচায়ক ও নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত যজমান-পত্নীর স্বামীর সহিত যজ্ঞসভায় উপবেশন এবং যজমান-পত্নীর অঙ্গবিশেষে যজ্ঞাঙ্গ অশ্বের অবয়ব বিশেষের সংযোগরূপ ক্রিয়াকলাপ অতীব পুণ্যের ও প্রশংসার বিষয় ছিল। বৈদিক যুগের অতি সৌভাগ্যবতী কতিপয়

রাজপত্নীর ভাগ্যে, তাদৃশ পবিত্র কার্য্য সংঘটিত হইত ; কালক্রমে উক্তরূপ ইতি-কর্ত্তব্যতা নিতান্ত জুগুপ্সাব্যঞ্জক অশ্লীলতার পরিচায়ক হইয়া উঠিল, তখনই অশ্বমেধযজ্ঞের বিধান রহিল। সৌত্রামণিযাগে সোমলতার রসপান বিহিত থাকায় ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত পানাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এমন কি "যত্র যত্র সৌসাদৃশ্যং তত্র তত্র অবয়বানাং ভূয়স্ত্বেন ত্যাগাযোগাৎ" ইত্যাদি কল্পিত সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়া সোমলতারসের অভাবস্থলে অন্য প্রকার সুরার ব্যবহারও আরম্ভ করিলেন। বামদেবের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, যথেচ্ছ স্ত্রীসংসর্গ আরম্ভ করিলেন। শ্রাদ্ধে, অভ্যাগতের আগমনে ও গোমেধাদি যাগ উপলক্ষে পশুহত্যার বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন। অভ্যাগতের আগমনে প্রায়ই গোহত্যাতে গোকুল নির্ম্মূল হইতে আরম্ভ করিলে, ও সর্ব্বমেধযজ্ঞে আমাদিগের অতি বিগর্হিত ব্রহ্মহত্যা এবং সর্ব্বস্বার যজ্ঞে, আত্মহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিতে লাগিল। মহাব্রত নামক কার্য্যে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচারিগণ পর্য্যন্ত কুলটাসংসর্গে কলঙ্কিত হইতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে বেদের অপব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যাতার্থের অযথাচরণ আরব্ধ হইলে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের স্রোতে ভারত প্লাবিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন ঐ স্রোতের নিবারণকল্পে বৃহস্পতি নাস্তিবাদরূপ প্রস্তরপুঞ্জময় দৃঢ় বাঁধ দিয়াছিলেন।

বৈদিকধর্ম্মের ভিত্তি সনাতন আত্মা। বৈদিকেরা বলিতেন, আত্মা অনশ্বর, তাহার পুনর্জন্ম আছে ; সুকৃত দুস্কৃত কর্ম্মফলে আত্মা কখনও স্বর্গগামী, কখনও বা নিরয়গামী হয়। অতএব দুঃখানবচ্ছিন্ন সুখ স্বর্গ এবং যেস্থানে তাদৃশ সুখ পাওয়া যায়, তাহার নামও স্বর্গ, নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ স্বর্গ কামনায় ধর্ম্মানুষ্ঠান কর।

বৃহস্পতি নাস্তিবাদে সমর্থন করিলেন যে, অনাদি অনন্ত আত্মাই আদৌ নাই ; সুতরাং তাহার জন্মান্তরে সুখলাভের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান, বন্ধ্যাপুত্রের দীর্ঘায়ুষ্ট্ব কামনার ন্যায় উপহাসাস্পদ। আনুসঙ্গিক অস্তিবাদিগণের অন্যান্য মতও খণ্ডন করিয়াছেন। কেবল বৃহস্পতিই যে, সেই সময়ে বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধী হইয়াছিলেন, এমন নহে ; অন্যান্য ঋষিগণও আত্মার অনশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াও বলিয়াছিলেন, স্বর্গ কর্ম্মফল, কর্ম্মজনিত অদৃষ্টক্ষয়ের সহিত স্বর্গগত জীবের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে ; অতএব স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ, অনশ্বর অপবর্গ নামক এক পুরুষার্থ আছে, তাহার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রবৃত্তিধর্ম্ম দ্বারা অপবর্গ লাভ হয় না, নিবৃত্তি ধর্ম্মাবলম্বনে তাহার লাভ হইয়া থাকে। কোন কোন ঋষি, হিংসাদি দোষ বলিয়া, বৈদিক ধর্ম্মের নিন্দাও করিয়াছেন। পৌরাণিকেরাও

সময়ের বেগে সুর ফিরাইয়া বৈদিক ধর্ম্মকে অধর্ম্মসঙ্কুল বলিয়া বর্ণন বা পাপের কার্য্য মনে করেন নাই।

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ, তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তা-ব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ। এই ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকার টীকায় সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন, "হিংসাহি পুরুষদোষমাবিষ্করোতি ক্রতোশ্চোপকরিষ্যতি।" মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে, "তস্মাদ্ যাস্যামহং তাত! দৃষ্ট্বেমং দুঃখসন্নিভং। ত্রয়ীধর্ম্মমধর্ম্মাঢ্যং।" ইত্যাদি।

সেই যুগে, বেদের অপব্যাখ্যা বারণাদির জন্য কল্পসূত্র নামে এক প্রকার গ্রন্থ রচিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটীও প্রচারিত হয় যে, "বেদাদৃতেঽপি কর্ম্মাণি কল্পৈঃ কুর্ব্বন্তি যাজ্ঞিকাঃ। নতু কল্পৈর্বিনা কেচিন্মন্ত্র ব্রাহ্মণে মাত্রকাং।" ইহাদ্বারা বেদের বিষয়-সঙ্কোচ করা হইয়াছে। বেদের নাম দিয়া যদৃচ্ছাক্রমে স্মৃতি রচনার পথ রোধ করিবার জন্য "মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ণ প্রশস্যতে এই বাক্যটী রচিত হইয়াছিল। মনুসংহিতা সকল লোকেরই আয়ত্ত ছিল, মনুর মধ্যে কল্পিত বচন প্রক্ষেপ করা সহজ ছিল না; অন্যান্য সংহিতার নাম দিয়া বচন রচনার পথ, ইহাতে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ বা কৌশলে কেহ বা প্রকাশ্যভাবে, বৈদিক ধর্ম্মের স্বপ্রচারকরণের উপায় বিধান করিলেও, তাহা ভাষাতেই আলোচিত হইত, সভাসমিতিতে গগনভেদী শব্দে তাহার বিকাশ করিয়া দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করা হইত; সমাজে সে মত, কতদূর আদৃত হইয়াছিল, তাহা অনির্ণেয়। যদি সুধীসমাজের মতানুসারে সমাজ গঠিত হইতে পারিত, তবে সংসারের চিত্র অন্যরূপ দেখা যাইত। বোধ হয় পার্থিব সরল সমাজ-সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব দর্শনে অপার্থিব পুণ্যলোকবাসী জনগণও পার্থিব সামাজিক-সুখ কামনা করিত।

কেহ কেহ বলেন, বার্হস্পত্য নাস্তিবাদের গূঢ় তাৎপর্য্য অতি উপাদেয় হইলেও সাধারণে সে তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তদীয় অসদর্থ গ্রহণ করিয়া-ছিল; অর্থাৎ পরলোক নাই, অবিনশ্বর আত্মা নাই, জীবের পাপপুণ্যের একমাত্র শাস্তিকর্ত্তা ও পুণ্যের ফলদাতা ঈশ্বর নামে কোন পদার্থ নাই, সুতরাং পুণ্যাচরণে কোন ফল বা পাপাচরণে কোন দোষও নাই।

আর, "স্বদারপরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা" ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীস্থ তান্ত্রিক-দিগের মত বার্হস্পত্য-শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় বার্হস্পত্য-মতের আরও অপব্যবহার হইতে আরম্ভ হইল, তাহাতেই সামাজিকগণ বার্হস্পত্য দর্শনের প্রচার একেবারে

বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সামাজিকগণের যে প্রভূত ক্ষমতা ছিল ও আছে আমরা বক্ষ্যমাণ কয়েকটী কথাদ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিতেছি এবং সাহিত্য-প্রচারের সঙ্গে সমাজের যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ আছে, তাহা দেখাইবার জন্যই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধাংশের অবতারণা করিতেছি, কেহ যেন ধান ভানিতে মহীরাবণের গীত মনে করিয়া কথাগুলির প্রতি অমনোযোগ না করেন।

শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয়মতে বৈধ ও অবৈধ উভয়বিধ ভ্রূণ রক্ষার ব্যবস্থা এবং ভ্রূণ হত্যার নিষেধ থাকিতেও অনেক স্থলেই দেখা যায়, যাঁহারা গুপ্তভাবে ভ্রূণহত্যা করাইয়া দুশ্চারিণী ভ্রূণঘাতিনীকে সমাজে গ্রহণ করেন, তাঁহারাই সমাজের শিরোমণি বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হন, আর তদ্বিপরীতবাদিগণ নিন্দনীয় হইয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে, চিকিৎসা ব্যবসায়ী শল্যপ্রতিগ্রাহী, শূদ্রযাজক, ভৃতকাধ্যাপক প্রভৃতি কতকগুলি অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া, সমিতিগঠনপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় সনাতন সিদ্ধান্তের বিরোধে অহরহঃ মতপ্রকাশ করিতেছেন। অনেকেই ঐরূপ সমিতির নেতৃবর্গকে সাত্ত্বিক সাধু বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা বোধ হয় যে, সমাজের নেতৃবর্গের আজ্ঞার নিকট বেদের আদেশ অকিঞ্চিৎকর। পূর্ব্ব যুগেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। শাসকগণ যখন বৈদিক অত্যাচারের নিবারণে অক্ষম হইলেন, তখন সমাজের নেতৃগণ সম্মিলিত হইয়া নিরপেক্ষ নির্হেতুক এই মত প্রকাশ করিলেন যে, সমুদ্রযাত্রাদি কতকগুলি ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারিবে না।

কেহ কেহ বলেন যে, সমুদ্রযাত্রাদি নিষেধের ব্যবস্থাপক সমাজপতিগণ বর্ত্তমান সমিতি-বিশেষের নায়কদিগের ন্যায় কুবুদ্ধিযুক্ত ছিলেন না, তাঁহারা বিশুদ্ধ চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যবস্থাপক ছিলেন। সময়ের স্রোত লক্ষ্য করিয়া সবিশেষ হেতু পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাঁহারা ঐরূপ বিধান করিয়াছিলেন। তা তাঁহাদের ব্যবস্থা অব্যাহত ভাবে বেদের বিরোধেও অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে

শাস্ত্রবিধির বৈপরীত্যেও সমাজের নেতৃবর্গের আধিপত্য যে অব্যাহত ভাবে কার্য্যকারী হইত, কেবল তৎপ্রদর্শনার্থই এতদংশের অবতারণা করা হইল।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও আদিত্য পুরাণে সমুদ্রযাত্রাদি নিষেধের প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। যথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে "সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা। দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ মাংসদানং তথাশ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা। দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং বরস্য চ

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ। মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথামখং। ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহু মনীষিণঃ।

আদিত্য পুরাণে উক্ত আছে যে, দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ। দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যাপ্রদীয়তে। কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতি-ভিঃ। আততায়ি দ্বিজাগ্র্যাণাং যুদ্ধযুদ্ধেন হিংসনং। বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘ সঙ্কোচনং তথা। প্রায়শ্চিত্ত বিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং। সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ। দত্তৌরসেতরেষাম্ভ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। শূদ্রেষু দাসগোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাং। ভোতবান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতি দূরতঃ। ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদি ক্রিয়াপিচ। ভৃগ্বগ্নিপতনঞ্চৈব বৃদ্ধাদি মরণং তথা। এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণের "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ" এই অংশের কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, এই বচনবলে সর্ব্বপ্রকার সমুদ্রযাত্রাই নিষিদ্ধ। রঘুনন্দন-সংগ্রহের টীকাকার কাশীরাম বাচস্পতি প্রভৃতি কেহ কেহ বলেন—বচনের শেষাংশে "ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে" এইরূপ লিখিত থাকায়, আদিত্য পুরাণে ভৃগ্বগ্নিপতনের সাহচর্য্যপ্রযুক্ত সমুদ্রে ধর্ম্মার্থ আত্মবিসর্জ্জন নিষেধই বচনের তাৎপর্য্য।

কেহ কেহ আবার বলেন যে, "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ" এইটী সমস্ত পদ নহে, পৃথক্ পদ; সমুদ্রযাত্রা ও স্বীকার অর্থাৎ প্রতিগ্রহ উহার অর্থ। যেরূপ সহমরণ-পদ্ধতির প্রচলন সময়ে অনেক আর্য্যরমণী সতীত্বযশোলিপ্সায় ধর্ম্মবুদ্ধির অভাবেও মৃত পতির জলচ্চিতায় প্রবেশ করিত, সেইরূপ সমুদ্র-মরণ নিরতিশয় গৌরবের কারণ বলিয়া অনেকেই ধর্ম্মবুদ্ধির অসত্বেও সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করিত; তন্নি-বারণার্থ সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আধুনিক কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যাও করেন যে, "মুদ্রয়া সহ বর্ত্তমানঃ সমুদ্রঃ" মুদ্রা শব্দের অর্থ টাকা, সুতরাং মুদ্রার সহিত যাত্রা করিবে না। সধন বা ধনবান্ বলিলে যেরূপ সমধিক ধনশালীর প্রতীতি হয়, দাতা বলিলে যেরূপ প্রচুর দাতৃত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই বুঝায়; তদ্রূপ, সমুদ্রযাত্রা বলিলে, যৎকিঞ্চিৎ মুদ্রাসহকৃত যাত্রা নিষেধ বুঝায় না, কলিকালে দস্যু তস্করসঙ্কুল পথে প্রচুর ধন লইয়া যাত্রা করাই নিষিদ্ধ।

বচনের শেষে "মনীষিণঃ" এই কথা থাকাতে, "ধনবান্ সুখী" বলিলে যেরূপ ধন-প্রযোজ্যতা সুখ অনুভূত হয়, এস্থলেও এতাদৃশ ব্যবস্থা প্রকটনের প্রতি

শাস্ত্রাদেশ-নিরপেক্ষ মনীষা প্রযোজ্যতা বোধ হইতেছে। আদিত্য পুরাণের বচনে "কলেরাদৌ নিবর্ত্তিতানি" এই স্থলীয় কলির আদি পদার্থে, নিবৃত্তি বা নিবর্ত্তনে অন্বয়ের, মতদ্বৈধ আছে। কেহ বা বলেন যে, কলিযুগের প্রথমে এই ব্যবস্থাটী মহাত্মারা প্রকটিত করিয়াছেন; কিন্তু বাদী ভদন্ত প্রভৃতি, সুতরাং প্রতিবাদিগণ বলিয়া থাকেন, কলির আদিতে এই ব্যবস্থার প্রকটন হইয়াছে, যদি এরূপ অর্থ হয়, তবে তাঁহাদের ব্যবস্থা কোন্ সময়ে খাটিবে, সে কথার উল্লেখ না থাকায় বচনকর্ত্তার ন্যূনবাদিতা দোষ হয়; অতএব কলির সন্ধিতে এই সকল কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে ঐ সকল কার্য্য করিতে বাধা নাই।

বচনের শেষে লোকগুপ্ত্যর্থং এই হেতুনির্দ্দেশ থাকায় লৌকিক সাধুগণ, লোকাচার রক্ষার্থই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। এই ব্যবস্থায় ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

সাধু দুই প্রকারের হইয়া থাকে; লৌকিক ও বৈদিক। মহাকবি ভবভূতি লিখিয়াছেন, "লৌকিকানান্তু সাধূনাং অর্থং বাগনুধাবতি। ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কোন কোন ব্যাখ্যাতার মতে সমুদ্রযাত্রা ও স্বীকার পৃথক্ পদ। শাস্ত্রে যাচ্ঞাবৃত্তির নিষেধ থাকিলেও, এবং শ্রাদ্ধে পিতৃসন্নিধানে পাঠ্য "মাচ যাচিষ্ম কঞ্চন" ইত্যাদি মন্ত্রে স্পষ্টতঃ যাচ্ঞার অকর্ত্তব্যত্ব প্রতিপাদিত হইলেও ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠজীবিকা বলিয়া তাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, ইহাতে একদিকে কতকগুলি লোক বুদ্ধিমেধাদি সত্ত্বেও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল, অন্যদিকে আবার তাহারাই গৃহস্থদিগের এক মহোৎপাতস্বরূপ হইল, তজ্জন্য স্বীকার বা প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অস্বং স্বং কুর্ব্বন্ ব্যাপারঃ স্বীকারঃ এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে স্বীকার শব্দের প্রতিগ্রহরূপ অর্থই প্রশস্ত। অঙ্গীকারার্থেও স্বীকারশব্দে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কেবল লৌকিক ব্যবহার।

ব্রহ্মচারিবর্গ মহাব্রতে দীক্ষিত হইয়া কুলটা সংসর্গ করিত। ব্রহ্মচর্য্য অতি প্রশংসনীয় ছিল বলিয়া ব্রহ্মচারিগণ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইত না। অন্যদিকে আবার দশবর্ষ মধ্যে কন্যাদান না করিলে সমাজে কলঙ্কিত হইতে হইত বলিয়া কন্যাকর্ত্তাদিগের অশেষবিধ লাঞ্ছনা পরিলক্ষিত হইত। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্য নিবারণার্থ বিধান হইল যে, কেহ দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারিবে না, এমন কি ব্রহ্মচারীর ও ভিক্ষুকের লক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ ধারণ করিতে পারিবে না, এইজন্য কমণ্ডলুধারণও নিষিদ্ধ হইল।

অসবর্ণাবিবাহপ্রথা থাকাতে, সকলেই উৎকৃষ্ট জাতীয় পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান, স্বীয় গৌরবের ও পুণ্যের বিষয় মনে করিয়া, শ্রেষ্ঠ জাতীয় বরকে কন্যাদান করিতেন। ইহাতে উৎকৃষ্ট জাতীয়দিগের কন্যার বিবাহ ও নিকৃষ্ট জাতীয়দিগের বরের বিবাহ হওয়া কঠিন হইত; এইজন্য অসবর্ণাবিবাহপ্রথা রহিত করা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি; বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে, "কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিত তৎফলানি সন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মরূপে। অবাপ্যতাং কর্ম্মমহীমনন্তে" ইত্যাদি। "কর্ম্মমহীং ভারতবর্ষরূপং" ইতি স্মার্ত্তরঘুনন্দনঃ। এই কর্ম্মভূমি ভারতাদিরিক্ত দেশ ভোগভূমি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে; "যথা ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে হলায়ুধধৃতা স্মৃতিঃ—পৃথিব্যাং ভারতং বর্ষং কর্ম্মভূমি রুদাহৃতো। জম্বুদ্বীপে মহাপুণ্যে ততো-ঽন্যা ভোগভূময়ঃ।"

মানবগণ, এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষেই শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত পুণ্যপাপের ভাগী হয়। ভারতের বাহিরে যাইয়া বিধি-নিষেধ প্রতিপালন না করিলে কোন দোষ হয় না; শাস্ত্রের সনাতন সিদ্ধান্ত থাকায়, তৎকালের লোকে ভারতের বাহিরে যাইয়া অবাধ-বাণিজ্য করিতে পাইত, বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিত। "অর্থাৎ কৃত্বাতু শম্ভোন যঃ করোতি প্রদক্ষিণং। প্রদক্ষিণী কৃতাতেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।" ইত্যাদি প্রমাণলব্ধ পৃথিবী পরিভ্রমণরূপে মহাপুণ্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিত।

ভারতের কর্ম্মভূমিত্ব শাস্ত্রে প্রতিপাদিত থাকিলেও বর্ত্তমান যুগের অনেক ব্যক্তি লণ্ডনে শিবস্থাপন ও হিন্দু হোটেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া এবং তদ্দেশ-বাসকালীন নিষিদ্ধ ভোজনাদির দোষপ্রশমনার্থ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়া শাস্ত্রের অপব্যাখ্যাজনিত অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন কি না, তাহা সুধী-গণের সবিশেষ চিন্তার বিষয়।

"যএব হেতুভবতি পুরুষস্য জয়াবহঃ। পরাজয়ে সএবস্যাৎ" এই ঋষিবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। সময়ে যাহা জয়াবহ হয়, সমাজের পরিবর্ত্তনে তাহাই আবার পরাজয়ের হেতু হইয়া থাকে। সমুদ্রযাত্রা অতি মঙ্গলের ও পুণ্যের হইলেও সময়ে তাহার অপব্যবহার হওয়ায় অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইল। বর্ত্তমানে মফস্বলের ধনিগণ, স্ব স্ব আবাসভূমিতে ভোগ-সামগ্রীর অপ্রাচুর্য্যনিবন্ধন ও ব্যয়াধিক্য সম্ভাবনায় কুলধর্ম্ম প্রতিপালনের অনিচ্ছায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরে বাস করিয়া থাকেন, তাহাতে পল্লীর অবস্থা

শোচনীয়তর হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বকালেও ভারতের ধনিগণ, ভারতে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করা কষ্টকর বোধে ভোগভূমিতেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন, এবং কৃষীবল প্রভৃতি শ্রমজীবীর কষ্টার্জ্জিত অর্থ ভারতের বাহিরে লইয়া অপব্যয়িত করিতেন, তাহাতে তৎকালে ভারতের অবস্থাও বর্ত্তমান পল্লীর ন্যায় শোচনীয় হইয়াছিল। তাই বিদেশ-বাসের মূলীভূত সমুদ্রযানের অঙ্গে সামাজিকগণ কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের এমন এক সময় আসিয়াছিল যে, সে সময়ে ছলে, বলে, কলে কৌশলে বৈদিক ধর্ম্মের কতক কতক অংশ রহিত করিবার জন্য ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, অন্যান্য সকলে বেদান্ত ও উপনিষদের দোহাই দিয়া বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিষেধ প্রচার করিয়াছিলেন, কেহ বা রাজ আজ্ঞার ন্যায় বৈদিক ধর্ম্ম সঙ্কোচ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, আর বৃহস্পতি যুক্তিতর্কদ্বারা স্পষ্টভাবে বৈদিকবিধির অসৎফলত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।

নাস্তিবাদের সূক্ষ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে, ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে, যেরূপ গ্রীকদেশীয় দার্শনিকদিগের মতে দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য প্রকৃতমনুষ্যত্বলাভ, সেইরূপ নাস্তিবাদেরও উদ্দেশ্য প্রকৃতমনুষ্যত্বলাভ। বক্ষ্যমান নাস্তিবাদ, বার্হস্পত্য নাস্তিবাদের ও মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে সংগৃহীত বিকৃত চার্ব্বাক দর্শনের সম্পূর্ণ সংগ্রহানুবাদ বা প্রকরণ বলিয়া সভামহোদয়গণ বিবেচনা না করিলেই সুখী হইব।

তবে, বক্ষ্যমান নাস্তিবাদে, বার্হস্পত্য-নাস্তিবাদের ছায়া যে একেবারে পরিলক্ষিত না হইবে, এরূপ নহে। আস্তিবাদিগণ যেরূপ জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন এবং জীবন্মুক্ত কপিল, নারদ, শুকদেব প্রভৃতির যেরূপ চরিত্র বর্ণন করেন, তদ্রূপ সচ্চরিত্রতা লাভই নাস্তিবাদের উদ্দেশ্য।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, আমি কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক; আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। যাহার উন্নতি-সাধন করিব, সে বস্তুটি কি, তাহা জানা আবশ্যক। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি, যে কে চাত্মহনোজনাঃ। অন্যথা বর্ত্তমানং তং যোঽন্যথা প্রতিপদ্যতে! কিন্তেন নাকৃতং পাপং, চৌরেণাত্মাপহারিণা।"

সুতরাং প্রথমতঃ আমরা আত্মতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবৃত্ত হইব। অনধীত দর্শনশাস্ত্র ব্যক্তির আত্মতত্ত্ব বুঝিতে একটু বেগ পাইতে হইবে, সুতরাং আত্মতত্ত্ব

বিচারে সরল ও বিস্তৃতভাবে পর্য্যালোচন করা কর্ত্তব্য। একটি মাত্র প্রবন্ধে তাহা অসম্ভব। সাহিত্যিক মহোদয়গণের উৎসাহ পাইলে আমরা সময়ান্তরে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। মোটের উপর কথা এই যে, এই নাস্তিবাদ আস্তিবাদিগণেরও অরুচির বিষয় হইবে না।

পূর্ব্বকালেও ন্যায়াচার্য্য উদয়ন বলিয়া গিয়াছেন "প্রতিযোগি বিষয়াচানুযোগি বিষয়াচাত্মৈব তত্ত্বতোজ্ঞেয়ঃ।" "ইত্যেবং শ্রুতিনীতি সংপ্লবজলৈর্ভূয়োভিরাক্ষালিতে, যেষাং নাস্পদমাদধাসি হৃদয়ে তে শৌলসারাশয়াঃ।" কিন্তু "প্রস্তুত বিপ্রতীপ বিধয়ো? পুচ্চৈর্ভরচ্চিন্তকাঃ, কালে কারুণিক। ত্বয়ৈবকৃপয়া তে তারণীয়ানরাঃ।" এতদুভয় বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা নাই বলিয়া আলোচনা করিতে হইলেও প্রতিযোগিবিধায় আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, এবং ঈশ্বর নাই বলিয়া ঈশ্বরাভাববিষয়ের আলোচনা করিলেও, প্রতিযোগিবিধায় ভগবতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়; সুতরাং তাদৃশজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণও ভগবানের কৃপাপাত্র হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও অভিহিত আছে যে,—

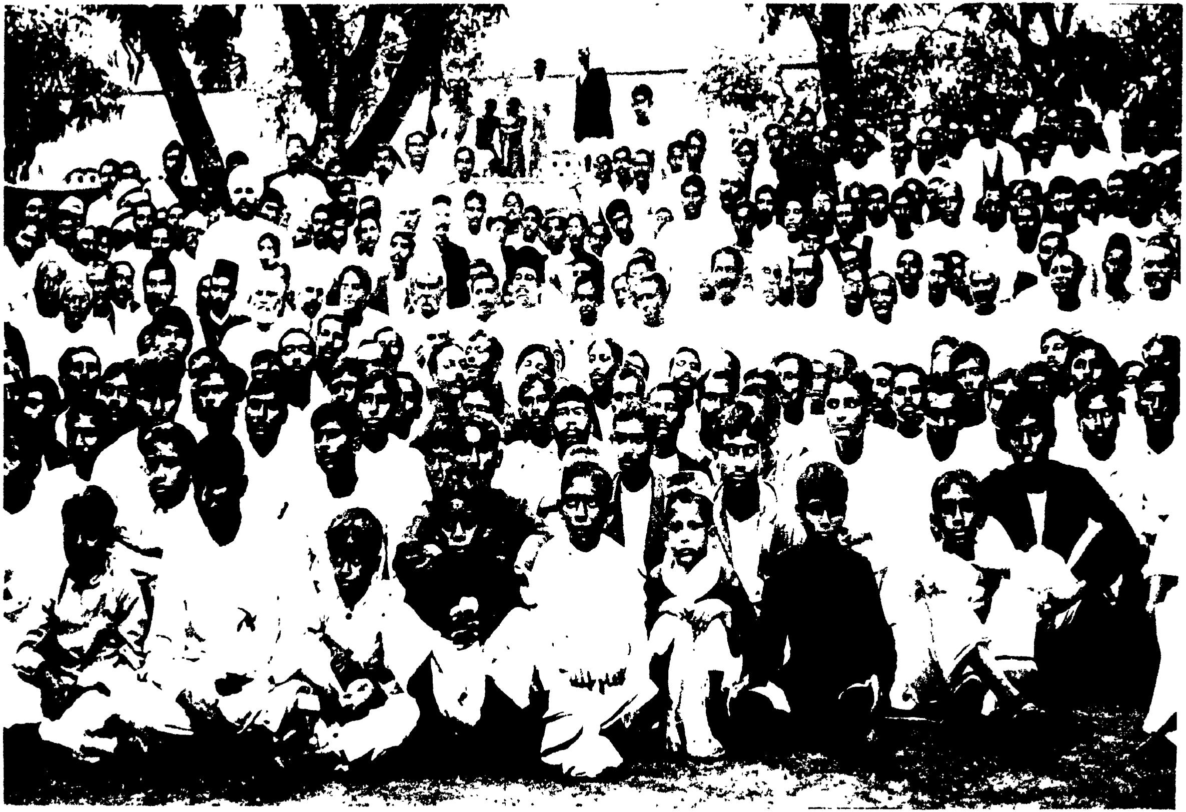
যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যাস্তন্ময়তামিয়াৎ।
নতথাভক্তিযোগেন ইতিমেনিশ্চিতামতিঃ॥
কীটঃ পেশস্কৃতারুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভরযোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মান স্তমাপুরনুচিন্তয়া॥

শ্রীপীতাম্বর তর্কালঙ্কার।

অভিসার

"রতিসুখসারে গতমভিসারে
মদনমনোহর বেশম্"—ইত্যাদি

রতি-সুখসার অভিসারে সখি, পরিয়া মদন-মোহন বেশ,
গিয়াছেন হরি, চল ত্বরা করি আছেন যেখানে সে হৃদয়েশ।
গুরুভার সখি তব নিতম্ব
অমনি চলিতে হবে বিলম্ব
আর কেন তবে, বৃথা বসি রবে, বাঁধি লও এবে চাঁচর-কেশ।



বর্দ্ধমান অষ্টম সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিনিধিবর্গ

বহে যেথা ধীর, মলয়সমীর, সেই যমুনার তীরে
পরি বনমালা, কুঞ্জে সে কালা, বাজাইছে অতি ধীরে
রাধা নাম ধরি সকলে পাসরি
সঙ্কেত করি মোহন বাঁশরী
ঐ শুন বুঝি আসে লো ভাসিয়া বাতাসে মৃদুল বাঁশরীর রেশ।
বাতাসে যে ধূলি কণা তব গায়
উড়ে পড়ে তিনি ভাবিছেন তায়
আপনার চেয়ে কত না ধন্য, হায় কত তাঁর বিরহ-ক্লেশ!
উড়ে যদি পাখী, পড়ে যদি পাতা, তুমি আসিতেছ মানি
সচকিত চিতে, চাহি চারিভিতে পাতেন শয়ন খানি
মুখর নুপুর যাও পরিহরি
গোপন মিলনে জেনো তারে অরি
পর নীলবাস, হবে না প্রকাশ, আঁধারেতে সখি মিশিবে বেশ।
গজমোতিহার শোভিত হরির বিশাল সুনীল বক্ষ
মনে হয় সারি দিয়া উড়িয়াছে মেঘে যেন বক লক্ষ
তদুপরি তব বিজলীর মত
হেম তনুলতা খেলিবে সতত
লভিবে চরম সুকৃতির ফল, পুণ্য পুঞ্জ সুখ অশেষ।
হরি অভিমানী, যেতেছে যামিনী
আর কেন দেরী করলো ভামিনী
কেন আনমনা, কৃষ্ণ কামনা পূরাও ত্যজিয়া ভাবনা লেশ।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

বৰ্দ্ধমান-সম্মিলনে।

সংখ্যাবাচক অষ্টম শব্দটি বড় যে সে শব্দ নয়। অষ্টমের সবই ভাল। লোকে বলে, অষ্টম গর্ভের সন্তান যদি বাঁচে তবে সে বহুভাগ্য লাভ করিয়া জনগণপ্রিয় হয় ও রাজ-সম্মান লাভ করে। দশাবতারের অষ্টমাবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আবার তিনিই দেবকীর অষ্টম-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, কেহ কেহ বলরামকে লইয়া একটু গোল করেন, তেমন গোল বরিশালের প্রথম অধিবেশনের কথা লইয়া এ সম্বন্ধে অল্প উঠিতে পারে, কিন্তু তাহা

কিছু নয়। শাস্ত্র-বাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবার আপনারা হাতে হাতে বলা অপেক্ষা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে বর্দ্ধমানে পাতে পাতে পাইয়াছেন। এবারকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনও অষ্টমগর্ভজাত। সুতরাং অধিবেশন হইবার পূর্ব্ব হইতে বহু শান্ত্যানুষ্ঠান, দৈব-কবচ প্রভৃতির রীতিমত আয়োজন চলিতেছিল। যাহাতে কোন প্রকার বিঘ্ন, অমঙ্গল বা অশুভ না ঘটিতে পারে, এজন্য অষ্টবসু, অষ্ট-দিক্‌পাল বর্দ্ধমানে বহু পূর্ব্ব হইতে গমনাগমন আরম্ভ করেন ও পাহারায় নিযুক্ত হন। তবে পশ্চিম দিকটি স্বয়ং জলধরদাদা নিজ এলাকাভুক্ত করিয়া দিবারাত্র ঘাটী আগুলিয়া ছিলেন। এবার অভিভাষণ ষষ্ঠাঙ্ক হইয়াছিল। মূল পুরোহিতের তিনটি ও অবশিষ্ট তিনটি বিভিন্ন শাখা-সভাপতির। মোট কথা, এবার সম্মিলনে অনেকেরই অষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়াছে। বর্দ্ধমানের সম্মিলন সম্বন্ধে কবিকথায় বলিলে বলিতে হয় "কাঠের সেঁউতী মোর হইল অষ্টপদ।"

গত বৎসর যখন বর্দ্ধমানের পক্ষ হইতে সম্মিলনকে বর্দ্ধমানে আহ্বান করা হয়, তখন যশোহর জেলা হইতেও সম্মিলনকে তথায় ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু কৈ মাছের লোভ অপেক্ষা সীতাভোগ, খাজা ও মিহিদানার প্রলোভনটা যে কত বড়—তাহা বলাই বাহুল্য। অন্যান্য বৎসর সম্মিলন কবে হইবে, তাহার সংবাদ অনেকেই রাখেন না, সেই সময় সময় একটা ক্ষণিক উৎসাহ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এবার যখন সম্মিলন রাজ-সম্মান লাভ করিয়া বর্দ্ধমানে আহূত হইল, তখন হইতে সকলেই সঠিক খবর রাখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে সম্মিলন কিরূপ ভাবে হইবে, তাহার অল্পবিস্তর সংবাদ সংবাদপত্রে যখন বাহির হইতে আরম্ভ হইল, চারিদিকে সাহিত্যিক-দলে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গেল। যাঁহারা কখনও কোন দিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করেন নাই, এবার বর্দ্ধমানে তাঁহাদের 'হাতে-খড়ী' হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর যখন নিমন্ত্রণ-পত্রের সহিত একখানি স্বতন্ত্র পোষ্ট-কার্ড আসিল এবং তাহাতে লিখিত আহারাদি সম্বন্ধে তিনটি প্রশ্ন যখন পর্য্যায়ক্রমে নয়নগোচর হইল, তখন পরীক্ষা-ভয়-ভীত, প্রশ্নোত্তর অপারক সকল সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক-কবি, অকবি, রসিক-অরসিক সকলেই নাকি উক্ত প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রদান করিয়া ব্রাকেটে কম্‌পিট করিয়াছিলেন। সকলেই 'ফুল-মার্ক' পাইয়াছিলেন—একজনও 'ফেল' হন নাই। কেবল তাহাই নয়—Easter holidayর চারি দিন ছুটি—অনর্থক কেন নষ্ট হয়—এক সঙ্গে ভ্রমণ ও সাহিত্য আলোচনা উভয়বিধ

পুণ্যসঞ্চয় করার সহজ সুযোগটি পরিত্যাগ করা কোন মতে সদ্বিবেচনার কাজ নয়, এ কথাটা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহার উপর অধুনা অনেকেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্; যেখানে একটুখানি পুরাতনের গন্ধ আছে, সেখানে গিয়া উপস্থিত হন—তাঁহাদেরও সুবিধা কেননা বর্দ্ধমান যে খাঁটি পুরাতত্ত্বে পরিপূর্ণ সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তার উপর বর্দ্ধমানের রাঙ্গামাটী, ইন্দ্রালয়তুল্য রাজপ্রাসাদ, মহাতাব্ মঞ্জিল, রাজোত্থান, গোলকধাঁধা, পশুশালা, শ্যামসায়র, কৃষ্ণসায়র, বিশ্ব-বিশ্রুত সুন্দরী সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের প্রথম স্বামী সের খাঁর কবর বর্দ্ধমানেই আছে। আর এই সেদিন যে খণ্ডপ্রলয়ের বিভীষিকাময় অভিনয় দামোদর প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই ভয়াবহ নদটিও বর্দ্ধমানের দুই ক্রোশ দূর দিয়াই প্রবাহিত। এত সব প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারা বড় সহজ নয়। ইহার উপর আবার শনিবার পড়ায় Week-ending Concession. সুতরাং সকলেই বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন, যাহারা কখনও কলিকাতার বাহিরে বসবাস করেন না, এমন লোকও অনেক গিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যার গাড়ীতে তাঁহারা কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনও করিয়াছিলেন।

সম্মিলন হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে সংবাদপত্রে সম্মিলনের বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ও আহার-বিহার-সংক্রান্ত নানাবিধ লোভনীয় সংবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন ২০শে চৈত্রের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

১৮ই চৈত্র বৃহস্পতিবার মানসী আফিসে আমাদের বর্দ্ধমান অভিযানের বৈঠক বসিল। স্বয়ং সম্পাদক মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তারপর কোন ট্রেণে, কে কে বর্দ্ধমান যাইবেন, তাহার আলোচনা আরম্ভ হইল। অবশেষে ঠিক হইল, যে সকালের 'এক্সপ্রেস ট্রেণে' যাওয়াই সুবিধা, তাহা হইলে সভার অধিবেশনের অনেক পূর্ব্বেই আমরা সভাস্থ হইতে পারিব। পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, ঐ ট্রেণেই নাকি অনেকেই যাইবেন। কথা রহিল, ষ্টেসনে সকলে একত্র মিলিব। মানসীর সহকারী সম্পাদক শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি হাওড়া হইতে যাইব, জ্ঞানবাবু বেলঘরিয়া হইতে আসিবেন, মানসীর কর্ম্মকর্ত্তা সুবোধবাবু, সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ মহারাজার প্রাসাদে গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দুইজনে একত্রে আসিবেন। সম্মিলনের প্রায় সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই মানসী আফিসে, এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে জলধর-দাদার দর্শন দুর্লভ হইয়াছিল। তিনি এই সম্মিলন ব্যাপারে প্রবীণ হইলে কি হয়, বীণাপাণির বরে নবযৌবন লাভ করিয়া বিপুল উৎসাহে, সাহিত্যিক

সমরের জন্য বলবিন্যাস ও সাহিত্যিকগণের নিমিত্ত বলস্থিতি করিতে বহু পূর্ব্ব হইতে বর্দ্ধমানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন "তোমরা আসিও; তোমাদের একসঙ্গে থাকিবার জন্য আমার নিজ ছাউনি ছাড়িয়া দিব।"

ঠিক দশটার সময় ট্রেণ ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া যাইবে। সুতরাং প্রভাত হইতে যাত্রার সরঞ্জাম চলিতে লাগিল। দীর্ঘ একবৎসর পরে হরমনমোহিনী উমার আগমনের মত, তিন দিনের জন্য বাঙ্গালা মুলুকের, বঙ্গবাণীর সেবক-বৃন্দ শ্বেতভূজার পূজামণ্ডপে নানাবিধ পুষ্প চয়ন করিয়া অঞ্জলি প্রদান করিতে আগ্রহভরে চলিয়াছেন,—দেখিয়া হর্ষে হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছিল। যাহারা বাধাধরা সময়ের সঙ্গে কাজ করা অভ্যাস করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাড়ী ধরিবার জন্য তত ব্যস্ত হইতে হয় নাই, কিন্তু যাঁহাদের নিকট সময় তাহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এখনও প্রমাণ করিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই, তাঁহাদের অনেকেই সময়মত ষ্টেশনে পৌছিতে পারেন নাই; কেহ কেহ ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তখন বংশীধ্বনি করিয়া যাত্রী ট্রেণ বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

বেলা আন্দাজ ৯টা ২০ মিনিটের সময় সুবোধবাবু ও আমি হাওড়া হইতে যাত্রা করিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর অশ্ব-যান ১৫ মিনিটের পথ অর্দ্ধঘণ্টায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা সঙ্গে কেবল একটি ব্যাগ লইয়াছিলাম, বিছানাপত্র বা মশারি সঙ্গে লই নাই। ষ্টেসনে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন দূর হইতে দেখিলাম যে, দশ নম্বর 'প্লাটফরম' সাহিত্যিকগণের যশোভাতিতে সমুজ্জ্বল। সুন্দর-অসুন্দর, যুবা-বৃদ্ধ, সূক্ষ্ম-স্থূল, বহু ব্যক্তি কুলীর মস্তকে তোরঙ্গ, ব্যাগ, বিছানা প্রভৃতি চাপাইয়া প্রতি কামরায় উঁকি মারিয়া ব্যস্ততা সহকারে ফিরিতেছিলেন। সাহিত্যিকগণের মধ্যে এতখানি সজীবতা অত্যন্ত আশ্চর্য্যকর বলিয়া মনে হইল। তখন ট্রেণ ছাড়িতে মাত্র ১৬ মিনিট বিলম্ব আছে। তাড়াতাড়ি স্থানসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমরা প্লাটফরমে গিয়া প্রবেশ করিলাম। এই ব্যস্ততার মধ্যে পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র চোখে চোখে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দক্ষিণে বামে মস্তক নাড়িয়া নমস্কার বিনিময় হইতেছিল। কথা কহিবার অবকাশ নাই। দলে দলে সাহিত্যিকগণ শুভাগমন করিতেছিলেন। সকলের মুখের উপর একটা আনন্দ-দীপ্তি ও উৎসাহ পরিদৃষ্ট হইতেছিল। রেল-কোম্পানী অনেকগুলি মধ্যমশ্রেণীর গাড়ী দিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইতিমধ্যেই সেগুলির

ভিতর তিল ধরিবার স্থান ছিল না। কিন্তু, সেদিন "যদি হও সুজন তবে তেঁতুল পাতায় বিশ জন," এই সাধারণ চলিত কথাটির অর্থ সাহিত্যিকগণ উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং একজনের স্থানে চারি জন উপবেশন করিয়াও এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে, যাহারা সামান্য উষ্ণ সমালোচনার আঁচ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহারা আজ অম্লানবদনে, যাঁহারা স্থানাভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া ডাকিয়া নিজ স্থানের মধ্যে স্থান করিয়া দিতেছিলেন। এই স্থানেই যে মিলন হইতেছিল, তাহা কিন্তু দিবসত্রয়ব্যাপী মিলন-মণ্ডপে ঘটিয়াছিল বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। সুবোধবাবুকে বলিলাম "আপনি ব্যাগটা লইয়া একটা গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসুন, যেরূপ ভীড় তাহাতে আর বিলম্ব করিলে স্থান পাওয়া যাইবে না; আমি শীঘ্র টিকিট কিনিয়া আনি।" ছুটিয়া টিকিট-ঘর অভিমুখে রওনা হইলাম। সহসা একটি কথা মনে পড়িল। সে আজ চারি বৎসরের কথা, আর একদিন ঠিক এমনই সময় হাওড়া ষ্টেসন সাহিত্যিকগণের শুভাগমনে এমনই উজ্জ্বল ও মুখর হইয়াছিল। সে দিন, সাধ করিয়া উদ্যোগ করিয়া কবিশ্রেষ্ঠ, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথকে সম্বৰ্দ্ধনা করিতে বোলপুরে যাত্রা করা হয়। টিকিট কালেক্টার, গার্ড, ড্রাইভার, লগেজ-পরীক্ষক, ষ্টেসন-মাষ্টার সকলেই সাহিত্যিকগণের গতিবিধি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পরিদর্শন করিয়া বোধ হয় অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে-ছিল। টিকিট কিনিতে যাইবার পথে বহু সাহিত্যিকবন্ধুগণের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা তখন টিকিট-কেনা-রূপ বিষম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সুতরাং বিজয়দর্পে পা ফেলিয়া চলিয়াছেন। সকলের মুখেই, দেখা হইবামাত্র সেই একই প্রশ্ন "এই যে আপনিও চলেছেন?" প্রত্যুত্তরে কেবল হাস্যোজ্জ্বল নয়নের বিনম্র দৃষ্টি আর বঙ্কিম ভাবে মস্তক হেলাইয়া টিকিট ক্রয়রূপ যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া। তাড়াতাড়ি যেখানে টিকিট কিনিতে গেলাম, সেখানে অত্যন্ত জনতা, বহুকষ্টে যদিও বা ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া তখনই ফিরিতে হইল। কারণ সেখানে কেবল সচরাচর যাতায়াতের টিকিট দেওয়া হইতেছিল—"সপ্তাহ-শেষ-সুবিধা-টিকিট অন্যত্র" বলিয়া বিক্রয়কারিণী বিড়ালাক্ষী বিরক্তিসূচক মিহিস্বরে চীৎকার করিয়া টাকা কয়টা কাউণ্টারের উপর ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। উপায় কি? তাহার মুখের দিকে একবার বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া অন্যত্র ছুটিলাম।

এই সময়, দেখি বন্ধুবর জ্ঞানবাবু একটি গ্লাডষ্টোন ব্যাগ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া—বলিলাম "টিকিট হইয়াছে ?" তিনি উত্তর করিলেন "না, আমার একখানা নিন" পশ্চাতে দেখা বীরের ধর্ম্ম নয়—সুতরাং চলিতে চলিতে বলিলাম, "আচ্ছা।"

বহু কষ্টে টিকিট ঘরের নিকট পৌছিলে "মহাশয় আমার একখানা, আমার একখানা" করিয়া আমার হস্তে তিন চারি জন ভদ্রলোক টাকা গুঁজিয়া দিলেন। অত্যন্ত কষ্টে টিকিট কিনিয়া ফিরিলাম সত্য, কিন্তু ঠিক হিসাব করিয়া বাকী পাওনা ফেরৎ লইতে পারিলাম না। এইখানে দেখি, মহারাজ নাটোরের আসবাবপত্র লইয়া পক্ককেশ আশুবাবু সাহেব সাজিয়া টিকিটঘরের একপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মহারাজ কই ?" তিনি উত্তর করিলেন—"আসিতেছেন—তিনি মোটরে যাইবেন।" প্লাটফরমে আসিয়া সুবোধবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। তখন স্থান সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত সকল গাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিয়া ফিরিলাম। সকলেই বলেন, 'আসুন, কিন্তু স্থান নাই।' দ্বিতীয়শ্রেণীর গাড়ীতে অল্পবিস্তর স্থান ছিল কিন্তু সেখানেও বাছা বাছা সাহিত্যিকের দল ধরিয়াছিল। তাহাতে যদিও তত ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আমার টিকিট যে মধ্যমশ্রেণীর! এই সময় একখানি মধ্যমশ্রেণীর কামরার দ্বারে আসিয়া দাড়াইবামাত্র ভিতর হইতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন—"উঠিয়া পড়ুন, ঘুরিলে ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক স্থান বোধ হয় পাইবেন না।" তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু সেই ন-স্থানের মধ্যে আমার মত একটু স্থান পাইলাম। তখন দেখি, অধ্যাপক সুরসিক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গাড়িতেই সাহিত্য-সম্মিলন জমকাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত রসবাক্যধারায় সকলে গাম্ভীর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা দূরে রাখিয়া হাসির তুফানে হাবুডুবু খাইতেছেন। হেমেন্দ্রবাবু সে রসসঙ্গীতে 'দোহারকি' করিতেছিলেন। মধ্যে একবার মুণীন্দ্রবাবুকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—"কি মহাশয়, আপনি কবি, ওরকম মৌন হ'য়ে থাকিলে চলিবে কেন ?" এইরূপ নানাবিধ হাস্যালাপ ও রসের ফোয়ারার মধ্য দিয়া দারুণ গ্রীষ্মের দুপুর বেলা কাটিতেছিল ভাল; অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ও সেদিন এই রস-সভায় ব্যক্ত হইয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছিলেন। কে বুঝি বলিল, বসুমতীর সম্পাদক শশিবাবু

আসেন নাই কেন—ললিতবাবু উত্তর করিলেন, "নূতন বিবাহ করিয়া তিনি এখন ব্যস্ত। তাঁর বিবাহে আমি যে 'প্রীতি-উপহার' লিখিয়াছি, তাহা কি আপনারা কেহ দেখেন নাই?" বিপিনবাবু বলিলেন একখানি আনিলে ভাল হইত সম্মিলনে পড়িলে চলিত। আমার নিকট একখানি ছিল বাহির করিয়া দিলাম। মহানন্দে উহা পঠিত হইল। গাড়ী একেবারে ব্যাণ্ডেলে আসিয়া থামিল। তখন সকলে জল অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। ব্যাণ্ডেলে মুঙ্গের কোর্টের সরকারি উকিল বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, "আর সব কৈ? মহারাজা কৈ?" বলিলাম, "তাঁহারা মোটরে আসিতেছেন, বৰ্দ্ধমানে সাক্ষাৎ হইবে।" ব্যাণ্ডেলে আমি গাড়ী বদল করিয়া অন্য গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। এই গাড়ীর মধ্যে সুবোধ বাবুর সন্ধান পাইলাম, কিন্তু জ্ঞানবাবুকে হারাইলাম। এখানে কবি অক্ষয়-কুমার বড়াল, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় ও অমল্যচরণ সেন মহা দরবার করিয়া বসিয়াছেন। এখানে পাণের 'দানসত্র' দেখিলাম। আন্দাজ বেলা ১২৷৷০ টার সময় আমরা বৰ্দ্ধমানে আসিয়া পৌছিলাম। গাড়ী থামিতে না থামিতেই সাহিত্যিকের বন্যা প্লাটফরমে নামিয়া পড়িল। সমবেত সাহিত্যিক মণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বৰ্দ্ধমানের বহু সম্রান্ত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং রাজা বনবিহারী কপূর মহাশয় সহাস্য মুখে সকলকে সাদরসম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্ন করিতেছিলেন। জলধরদাদা যুবকের মত সকলের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া আপ্যায়িত করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত ব্যোমকেশবাবু, ললিত বাবু, রামকমল বাবু ও অন্যান্য অনেকেই এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। স্বেচ্ছা সেবকগণ দলে দলে আসিয়া গাড়ী হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া লইতেছিলেন। সে এক অভিনব বিরাট ব্যাপার। স্বেচ্ছাসেবক, পল্লীযুবক সে দিন যেন কোন মহামন্ত্রে অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি লাভ করিয়াছে। ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান ভুলিয়া একপ্রাণ হইয়া গিয়াছে। এখানে কবি করুণানিধানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, "আপনারা কোথায় থাকিবেন?" বলিলাম "কি করিয়া বলিব—যেখানে রাখিবে, সেইখানেই থাকিব।" সহস্রদিক হইতে শত সহস্র নদী যেমন সাগরসঙ্গমে আসিয়া মিলিত হয়, তেমনই আজ বহু দিক হইতে বহু সাহিত্যিক এই মহাসম্মিলনে আসিয়া মিলিত হইতেছিল। প্রায় সকলে যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখনও আমরা কয়েক জন মাত্র প্লাটফরমে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। স্বেচ্ছাসেবকগণ আশ্বাস

দিয়া বলিতেছিলেন, "এইবার গাড়ী আসিলেই আপনাদের লইয়া যাইব। তাঁহাদের বিনয়, নম্রতা ও ব্যস্ততা দেখিয়া সত্যসত্যই আনন্দে অন্তর ভরিয়া উঠিল। স্বেচ্ছাসেবক বালকবৃন্দের অকলঙ্কমুখের উপর পরসেবার গৌরব, এমন মধুর ও উজ্জ্বল দীপ্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়া ছিল যে, সেই রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত বাতাসের মধ্যে পিপাসা-কাতর শুষ্ক রসনাও তাঁহাদের প্রশংসা করিবার নিমিত্ত সুমিষ্ট কথার রসধারায় ভরিয়া আসিতেছিল। এই সময় জলধরদাদা, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, আসিয়া ডাকিয়া বলিলেন "কৈ আপনারা এখনও যান নাই ?" তারপর একজন স্বেচ্ছাসেবককে ডাকিয়া তাঁহার 'জিম্মায়' আমাদের গচ্ছিত করিয়া বলিয়া দিলেন। সেদিন বৃদ্ধ জলধরবাবুর মধ্যে যে উৎসাহ, উদাম ও কর্ম্ম শক্তির অপূর্ব্ব পরিচয় দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

একটু পরেই আমার উইলবাড়ী অভিমুখে চলিলাম। পথে শুনিলাম, সেই বাড়ীতে সভাপতি চতুষ্টয়ের আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা গত কল্যই আসিয়াছেন। দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই "ডেলিগেট" আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। ভোরের গাড়ীতে অনেকে আসিয়াছেন। বৰ্দ্ধমান সহর, পশ্চিমের প্রাচীন সহরের মত দেখিতে। কলিকাতা হইতে বৰ্দ্ধমান তিন ঘণ্টার পথ হইলেও ইতিপূর্ব্বে এখানে আসিবার কোন সুযোগ হয় নাই। এখানকার পথের ধারের বাড়ীগুলিও কলিকাতার ব্যবসাদারের বিজ্ঞাপনের হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। এই সকল বাড়ীর গায়ে অসংখ্য প্লাকার্ড মারিয়া দিয়া গিয়াছে। এক জায়গায় দেখিলাম, পি এম্ বাগ্‌চীর কালীর বিজ্ঞাপনের পার্শ্বেই এণ্ড্রু ইউলের সীলেট চূণের বিজ্ঞাপন। চূণের পার্শে কালীকে দেখিয়া একটু আশঙ্কা হইল। যাহারা বিজ্ঞাপন লাগাইয়া বেড়ায় তাহারা যে এরূপ করিয়া একটা ঘোরতর অন্যায় অপরাধ করিবার উদ্যোগ করিয়া বসিয়াছে, বোধ হয় তাহারা এতটা ভাবিবার মত জ্ঞানী নয়। তাহা হইলে কখন এরূপ করিতে সাহস পাইত না। দুইধারে নানাবিধ দ্রব্যের দোকান। তখন বেলা আন্দাজ ১॥০টা ; ছোটছেলেরা বই বগলে লইয়া, ইস্কুল হইতে গৃহে ফিরিতেছে। তাঁহাদের নিত্যপরিচিত এই পল্লী-সহরটি আজ অকস্মাৎ অসংখ্য অপরিচিতের আগমনে ভরিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহারা বেশ একটু হর্ষান্বিত হইতেছিল। সকল ভাড়াটিয়া গাড়ীর গায়ের উপর লাগান বড় বড় লাল অক্ষরে কাগজে ছাপা সম্মিলন শব্দটি সকলের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিকে, অভূতপূর্ব্ব অনুষ্ঠানের চিন্তাকে

অধিক করিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। বৰ্দ্ধমানে ইহা অপেক্ষা অনেক বড় বড় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, ইহা অপেক্ষা বহু বৃহৎ জনতার অভিজ্ঞতা সহরবাসীর আছে, কিন্তু, এমন সমগ্র বঙ্গদেশবাসী ভদ্র, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের শুভাগমন বোধ হয় তাঁহারা এই প্রথম দেখিলেন। স্বয়ং বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহ্‌তাব্‌ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। তাঁহার পিতা পক্ককেশ বৃদ্ধ রাজা বনবিহারী কপূর স্বয়ং সেই প্রখর রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নে ষ্টেসনে উপস্থিত থাকিয়া সকলকে মহাসম্মান ও সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিতেছেন দেখিয়া অনেকের মনে, নবাগত নূতন উৎসবটি অভিনব আনন্দের সঞ্চার করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে, আমরা 'উইলবাড়ী'র নিকটবৰ্ত্তী হইলাম। সেই সময় দেখি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ বন্ধুবর রাখালবাবু ঘর্ম্মাক্তকলেবরে স্থূলদেহভার লইয়া কর্ম্মকর্ত্তার মত ব্যস্তসমস্ত হইয়া সেদিকে আসিতেছেন। পশ্চাতে একখানি খালি গাড়ি, তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। তিনি হাঁকিয়া বলিলেন, "গাড়ি ঘুরাও, 'উইলবাড়ী'তে তিল ধরিবার স্থান নাই।"

রাখালবাবু স্বেচ্ছাসেবককে বলিয়া দিলেন, "এদের ছোট-খণ্ডে" লইয়া যাও।" তাহাই হইল। সেখানেও সেই দশা। ব্যাপার কি? বঙ্গদেশের কি কোন সাহিত্যিক আসিতে বাকী নাই! তারপর গাড়ী একদম রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন মহ্‌তাব্‌ মঞ্জিলের সম্মুখ দিয়া গাড়ী চলিয়াছে, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া প্রশ্ন করিল।

"আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?"

উত্তর, "কলিকাতা হইতে।"

সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিল। স্বেচ্ছাসেবক মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "গাড়ী-বারান্দার নীচে মহারাজা দাঁড়াইয়া।" এই সময় আর একজন পদস্থ উচ্চকর্ম্মচারী আসিয়া বিনয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি "ডেলি ডেলিগেট" না, এখানে থাকিবেন?"

"আজ্ঞে আমরা থাকিব।" ঠিক সেই সময়ে, সেই দারুণ রৌদ্রের মধ্যে স্বয়ং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দুইটা বড় বড় মখমলের ছত্র যেন কলে ছুটিয়া আসিল। একটা তাঁহার মস্তকের উপর, অপরটি তাঁহার সঙ্গীগণের উপর ধৃত হইল। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "আপনাদের সঙ্গে

ভলেন্টিয়ার নাই?" উত্তর "আঁজ্ঞে আছে" তখন তিনি তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "তুমি ভদ্রলোকদের কেন এই রৌদ্রে কষ্ট দিচ্ছ? কোথায় লইয়া যাইতে হইবে, তাহা কি, কেহ তোমায় বলিয়া দেয় নাই? তুমি কোন ওয়ার্ডের ভলেন্টিয়ার?"

স্বেচ্ছাসেবক মহারাজের সহিত কথা কহিবার ভাগ্য বোধ হয় এই প্রথম লাভ করিলেন। তিনি সকল প্রশ্ন ভাল করিয়া শুনিয়াছিলেন, কি না, ঠিক বলা যায় না। তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, ভদ্রলোক একটু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন। তিনি তখন গাড়ী হইতে নামিয়া নীচে দাঁড়াইয়াছেন। ভয়জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "আমি এঁদের "উইলবাড়ী" "ছোট-খণ্ড" দুই জায়গায় লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে একটুকুও স্থান নাই।"

মহারাজা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ চাপড়াইয়া বলিলেন, "তুমি ভাই এঁদের বালিকা বিদ্যালয়ে লইয়া যাও। জান ত কোথায়? সেখানে স্থান না পাও, যেখানে হোক শীঘ্র একটা স্থান করিয়া দাও" কেবল ইহা বলিয়াই মহারাজা নিশ্চিন্ত হইলেন না। তাঁহার নিজের একজন আরদালীকে সঙ্গে দিলেন ও বলিয়া দিলেন, "বাবুদের স্থান হইয়াছে এ সংবাদ শীঘ্র লইয়া আসিয়া আমায় দিবে।" বালিকাবিদ্যালয়ে এত অধিক ভীড় হইয়াছিল যে, সেখানেও আমাদের স্থান হইল না। তারপর "বড়-খণ্ড" একটি স্বতন্ত্র ঘর অদৃষ্টে জুটিল, আমরা ত হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আরদালীও মহারাজকে এ সংবাদ দিয়া রক্ষা পাইল। আমরা উপবেশন করিবামাত্র দুই তিন জন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা আহার করিয়া আসিয়াছেন কি? না, এখানে আহার করিবেন?" একজন আমাদের নাম লিখিয়া লইলেন, অপর একজন চা, সরবৎ, সোডা, লেমোনেড, বরফজল কি আনিবেন, তাহার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। এই সময় গুরুতর উদ্গার তুলিতে তুলিতে, আমাদের ঘরের সম্মুখ দিয়া অনেকগুলি স্থূলকায় ব্যক্তি মন্থরগতিতে চলিয়া-গেলেন। তাঁহারাও সাহিত্যিক! সেই মাত্র মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিয়া নীচে হইতে উপরে আসিলেন। উদ্গারের বহর দেখিয়া আহারের আয়োজন বুঝিলাম। আমরা আহার করিয়া গিয়াছিলাম সুতরাং কিছু জলখাবার আনিতে বলিলাম। অল্পপরেই কচুরী সিংয়াড়া মিহিদানা সীতাভোগ সুশীতল বরফজল ও ডাব আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আমরা বলিলাম "এত খাবার কি হইবে? এ যে ছয় জনের আহার। কিছু ফেরৎ

লইয়া যান।” উত্তর “না, তাহা হইবার যো নাই।” ইতিমধ্যেই অনেকে সাজিয়া গুজিয়া সম্মিলনে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমরা একটা কম্মভোগের পর সীতাভোগের ব্যবস্থা সুতরাং তাড়াতাড়ি করিবার মোটেই প্রয়োজন অনুভব করিলাম না। যিনি “বড়খণ্ডের” তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি মহারাজার নিকট আত্মীয়। তিনি স্বয়ং আসিয়া আমাদের মধুরালাপে আপ্যায়িত করিলেন। কোন প্রকার কষ্ট হইয়াছে কি না; কোন প্রকার অসুবিধা হইতেছে কি না, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভদ্রলোক যেন বিনয়ের অবতার। মহারাজা যেমন সেদিন অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নিজে ছুটাছুটী করিয়া সকলের সুব্যবস্থা করিতে প্রাণপাত করিতেছিলেন, তাই বোধ হয় বাছিয়া বাছিয়া এই সকল স্থানে আপনার জন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অল্পক্ষণপরেই সেই সৌম্য, শান্ত, পক্ককেশ দীর্ঘপুরুষ সৌজন্য ও শিষ্টাচারের আদর্শমূর্ত্তি রাজা বনবিহারী কপূর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিলে, সত্য সত্যই ভক্তি হয়। আমরা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার, সদাহাস্যময় অক্লান্ত পরিশ্রমী রাজা অত্যন্ত মধুর সম্ভাষণে বলিলেন, “করেন কি, করেন কি, আপনারা রোদে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছেন, একটু বিশ্রাম করুন, আপনাদের কোনরূপ কষ্ট না হয় সেই ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছি।” “আমরা বেশ আছি কোনরূপ কষ্ট হয় নাই আমাদের জন্য ভাবিতে হইবে না।” তিনি বলিলেন “এ আপনাদের নিজের কাজ; ত্রুটী হইলে মার্জ্জনা করিতে হইবে।” নমস্কার করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমরাও সম্মিলনে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। আমাদের দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলেন, বলিলেন, “বেশ হইয়াছে, আপনারা এখানে আসিয়াছেন? তাহার সঙ্গী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরলাল সেনগুপ্তের সহিতও আলাপ পরিচয় হইল। এই সময় বড় বড় খামে তিন খানি পত্র আমাদের নামে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাতে যে একটু আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। পত্রে সে দিন সান্ধ্য-সম্মিলনে মহারাজা অভ্যাগত সাহিত্যিকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পত্রের ভিতর এক একটি করিয়া ব্যাজ ছিল। কি সুন্দর বন্দোবস্ত! প্রত্যেক বাড়ীতে একটি করিয়া আপিস স্থাপিত হইয়াছে। সেইখান হইতে প্রধান ভাঁড়ার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আদেশ প্রেরিত হইতেছে। বড়খণ্ডে ৭৫ জন সাহিত্যিকের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বেলা ২৷৷৹টার সময় সভায় উপস্থিত হইলাম। সভামণ্ডপ পূজার দালানের সম্মুখেই স্থাপিত হইয়াছিল। পূজার দালানের উপর সরবৎ, চা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। দালান অন্ধকার বলিয়া বহু ঝাড়ে দিনের বেলা বাতি জ্বলিতেছিল। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বীণাপাণির পূজামণ্ডপ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। আমরা যখন সভায় উপস্থিত হইলাম, তখন সভা প্রায় লোকে পরিপূর্ণ। প্রথমেই বাণীস্তোত্র গীত হইল, তারপর মহারাজ বৰ্দ্ধমান সভাপতি প্রস্তাব করিলেন। কার্য্যবিবরণীতে উল্লেখ ছিল যে নাটোরাধিপতি মহারাজা শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সভাপতির প্রস্তাব সমর্থন করিবেন। কিন্তু তিনি তখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই। অনুপস্থিতি লইয়া অনেকেই একটু আধটু কটাক্ষপাত যে না করিলেন, তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কই মহাশয় আপনাদের মহারাজা সম্পাদক কই?" আমি বলিলাম তিনি মোটরে আসিতেছেন বোধ হয়, পথে কোন রূপ কিছু ঘটিয়া থাকিবে। মহারাজার অনুপস্থিতি আমরা বিশেষরূপ অনুভব করিয়া লজ্জিত হইতেছিলাম। বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়, মহারাজের পরিবর্ত্তে সভাপতির প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তারপর শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ বি, এ, রচিত আবাহন-সঙ্গীত গীত হইল। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি মহারাজা বৰ্দ্ধমান বলিলেন, মহারাজা কাশিমবাজার ট্রেণ ফেল হইয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছেন তিনি আসিতেছেন; বোধ হয় কোন মাল গাড়ীতে চাপিয়াই আসিবেন। আর মহারাজা নাটোর মোটরে আসিতেছেন তার পাইয়াছি। এ কথায় তবু আমরা অনেকটা আশ্বাস পাইলাম। কিছু দিন পরে কলিকাতায় একদিন মহারাজা নাটোরের নিকট সভায় বিলম্বে যাওয়ার কথা যখন উত্থাপিত করি তখন তিনি সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কই, আমায় যে সভাপতির সমর্থন করিতে হইবে, এ কথা ত কেহই আমাকে বলে নাই, কার্য্যবিবরণীতে যে এরূপ একটা কাজের কথা ছাপা ছিল, তাও এই প্রথম আপনার মুখে শুনিতেছি। তাহাও আমি এখনও চক্ষে দেখি নাই। যদি আমি জানিতাম যে, আমার উপর এত বড় একটা গৌরবের কাজ দেওয়া হইয়াছে, বা নির্দ্ধারিত সময় সভায় আমার একটা কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা হইলে অবশ্য, যে কোন প্রকারে হউক, আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হইতাম, সে বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না।" "আপনাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া

একটা কাজের ভার আপনার উপর দেওয়া হইয়াছিল, তাহাত আর কেহ জানিতে পারিল না।" মহারাজা বলিলেন, "সেখানে একবার যদি একথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন বা আমি কার্য্যবিবরণীখানি দেখিবার সৌভাগ্য পাইতাম, তাহা হইলে আমার অজ্ঞানকৃত ত্রুটীর জন্য সভায় একটা কৈফিয়ৎ দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ পাইতাম।"

আবাহন-সঙ্গীতের পরই অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজা তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অল্প কথায় এত সুন্দর, মর্ম্মস্পর্শী খাঁটি কথা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে বলিয়াছেন, বলিয়া ত মনে হয় না। অবশ্য মহারাজার অভিভাষণ সকলেই সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন। এখানে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার রাজোচিত ও পুরুষোচিত কণ্ঠস্বর সমগ্র সভামণ্ডপ বিকম্পিত করিয়া সকলের কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। সকলেই তাঁহার এই ক্ষুদ্র ও শক্তিশালী অভিভাষণ অন্তরের সহিত অভিনন্দনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের পার্শ্বে "প্রবাসী"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দবাবু বসিয়াছিলেন, তিনিও বলিলেন, "বেশ সুন্দর ও ছোট হইয়াছে।" অনেকেই তাঁহার অভিভাষণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহার পর সুকবি শ্রীকালিদাস রায় বিরচিত অভিনন্দন সুকবি শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ করিলেন।

"এস সুধীগণ, মানসমোহন, এসে বাঙ্গালার পুণ্যক্ষেত্রে
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল নেত্রে।" ইত্যাদি

অভিনন্দন খুব সুন্দর হইয়াছিল। অতঃপর নানা কবিতা পাঠ হইলে, বৰ্দ্ধমানের পক্ষ হইতে বৰ্দ্ধমাননিবাসী সুকবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বিরচিত একটি সুন্দর "অভিনন্দন" ব্যোমকেশ বাবু পাঠ করেন। আমরা কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না

"স্বাগত, সব কোবিদবৃন্দ ধন্য কর এসে,
পঞ্চানন্দ, বন্যা, আর ম্যালেরিয়ার দেশে।
এসো সবে অমল ধবল বিমল বসন পরে,
বৰ্দ্ধমানের রাঙামাটী দেবে রঙিন করে।
স্নেহ প্রীতির কুঙ্কুম এ যে পরাগ উল্লাসেরি
সেথায় যাবে সাথে সাথে রইবে সবায় ঘেরি।
এসো আজি সুন্দর বেশে এসো মধুর হেসে,
'নরজা' এবং 'কর্জ্জনা' ও গন্ধাম-মারির দেশে।"

এখানে একটু গোল হইয়াছিল, যে বিদায়-সঙ্গীতটি সভায় গীত হইয়াছিল উহা শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ প্রণীত বলিয়া পুস্তকে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু উহা সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত। অতঃপর সভাপতির সুদীর্ঘ সম্বোধন তাঁহার মুখ হইতে বড় কেহ যখন শুনিতে পাইলেন না, তখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখাল-বাবুকে যদিও উহা পড়িতে দেওয়া হইল, তবুও সম্বোধন গৌরবের অগৌরব করিয়া 'পরে ছাপা হইলে পড়িব, বড় গরম, এখন চল' বলিয়া সভার অনেকেই প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় সভায় একটু গোল হইল। তারপর একদিক হইতে মহারাজা কাশিমবাজারকে অভ্যর্থনা করিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি সভায় লইয়া আসিলেন। পরমুহূর্ত্তেই পুনরায় সভা একটু চঞ্চল হইলে, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিল, অপর দিক হইতে নাটোরাধিপতিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া বর্দ্ধমান সভায় পুনঃ প্রবেশ করিলেন। ইহার অল্প পরেই সভা ভঙ্গ হইল। তখন বাহিরে আসিয়া পরস্পর আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। সেখান হইতে অনেকেই মহতাব্ মঞ্জিল পরিদর্শন করিতে গেলেন। অনেকেই সান্ধ্য-সম্মিলনে যোগদান করিতে চলিলেন। এই অবসরে রাজপ্রাসাদ দেখিয়া লইলাম। ইহা একটি দেখিবার সামগ্রী, অনেক পুরাতন দ্রব্য এখানে সংগ্রহ করা রহিয়াছে। বহুবিধ বহুমূল্য চিত্রে প্রত্যেক গৃহ সুসজ্জিত; একটি গৃহে পূর্ব্বপুরুষ ও মোগল সম্রাটগণের চিত্র সুশোভিত। কোন গৃহে মহারাজা দরবার করেন, কোন গৃহে মহারাজ বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ পরিচয় করেন। নাচ-গৃহ, অধ্যয়ন-গৃহ, ভোজন-গৃহ, সকল গৃহই অপূর্ব্বসুন্দর ও সুশোভিত। একটী কক্ষ কেবল বহুবিধ অস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত এবং সেই গৃহটির বিশেষত্ব এই যে গৃহের যাবতীয় দ্রব্য রক্তিম বর্ণ এমন কি, মহারাজার সিংহাসনখানি হইতে সামান্য দ্রব্যটি পর্য্যন্ত অরুণ বর্ণ, এই গৃহটি অত্যন্ত মনোরম। মহারাজার পাঠাগার খুব সুন্দর। সকল গৃহের দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত ছিল, কিন্তু তাঁহারা যেন নির্ব্বাক নিস্পন্দ। এই পরিদর্শন কার্য্যে তাহারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়া মহারাজার সৌজন্য ও ভদ্রতার পরিচয় দান করিতেছিল। এখান হইতে সান্ধ্য-সম্মিলনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সান্ধ্য-সম্মিলনে বহু পরিচিত, অপরিচিত, সাহিত্যিকের সহিত আলাপ হইল। এখানেও জলযোগের বিপুল আয়োজন। স্থানে স্থানে নানারূপ সঙ্গীত বাদ্যাদি চলিতেছিল। সোডা, লেমনেড, ডাব, সরবৎ, চা, বিস্কুট, খাজা, গজা, মিহিদানা, সীতাভোগ, পানতুয়া, নানাবিধ ফলমূল পর্য্যন্ত আয়োজন

করা হইয়াছিল। মহারাজা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তাঁহার সৌজন্য ও মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আলোকমালায় সমগ্র প্রাঙ্গণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। সন্ধ্যার পরই বাসায় ফিরিলাম। ফিরিয়াই শুনিলাম আবার প্রস্তুত হইতে হইবে কারণ ৯টার সময় থিয়েটার। সকলের সহিত আহার করা হইল। সে এক বিপুল ব্যাপার—পোলাও হইতে লুচি, মাচ, মাংস, দই, রাবড়ী, কিছুই বাদ যায় নাই। এই সময় জলধরদাদা আমাদের সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিলেন, আমরা বিছানাপত্র কিছুই সঙ্গে লইয়া যাই নাই। তখন তিনি আমাদের তিনটি বিছানার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বিছানার সমস্ত আসবাব মায় নেটের মশারিটি পর্য্যন্ত নূতন। অনেকেই থিয়েটার দেখিতে গেলেন। আমরা ও কৃষ্ণবাবু গল্প জুড়িয়া দিলাম। এই সময় একজন ডাক্তার আসিয়া 'কেমন আছি' অনুসন্ধান করিয়া লইয়া গেলেন। অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত "সম্বোধন" পড়া গেল, তারপর স্থির হইল যে, প্রভাতে দামোদর দেখিতে যাওয়া যাইবে, পরে ফিরিয়া আসিয়া সভায় যাওয়া হইবে। অধ্যাপক কৃষ্ণবাবু ও হরলাল বাবু আমাদের সঙ্গী হইবেন, কথা রহিল।

রবিবার প্রাতঃকালে উঠিয়া একজন স্বেচ্ছাসেবককে সঙ্গে লইয়া দামোদর দর্শনে যাত্রা করিলাম। এই স্বেচ্ছাসেবক যুবক যশোদানন্দ ঘোষ, অত্যন্ত উৎসাহ করিয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দামোদরের বাঁধে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দুর্গপ্রাকারের মত উচ্চ বাঁধ ভাঙ্গিয়া এই মন্দগতি ক্ষীণকায় শৃগাল-কুক্কুরের অনায়াস-অতিক্রম্য নদ, যে কেমন করিয়া একদিন বৰ্দ্ধমান ও বাঙ্গলার নানাগ্রাম জলমগ্ন করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বাঁধের ধারে ধারে এখনও সরকারী লোক রীতিমত বাঁধে মাটি দিয়া বাঁধ আরও দৃঢ় করিতেছে। দামোদরের তীরে দুই একখানি বাড়ীও দৃষ্ট হইল। বাঁধের একস্থানে একটি শিবমন্দির আছে। কিন্তু বাঁধের পরিসর বৃদ্ধি করিতে গিয়া বুড়া শিবের একরূপ জাতি নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অদৃষ্টে অচিরাৎ কবর লাভ ঘটিবে। ফিরিবার মুখে আমরা সের আফগানের সমাধি-মন্দির দর্শন করিলাম। রাজ-কলেজের অনতিদূরেই এই সমাধি-মন্দির। ভগ্ন উদ্যানের ভিতর দুইটি অত্যন্ত সামান্য সমাধি; দেখিলে দুঃখ হয়। আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং সেখানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম। সমাধির পার্শ্বেই একটি চাঁপা ফুলের গাছ, গাছ হইতে অনেকগুলি পুষ্প ঝরিয়া পড়িয়াছে, সেই গন্ধে স্থানটি

আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। উদ্যানের সংলগ্ন একটী সুন্দর পুষ্করিণী। এখানে আসিয়া যেন বেশ একটু তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিলাম। দূর অতীতের অনেক কথাই মনের মধ্যে যেন সজীব হইয়া উঠিতে লাগিল। কবরের সাধারণ পাথরগুলি অপসারিত করিয়া সম্প্রতি নূতন মার্ব্বেল পাথর দিয়া সমাধি দুইটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল।

বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সের আফগানের সমাধির উপর নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লেখা আছে।

"মেহের উন্নিসা অর্থাৎ পরে যিনি মোগল সম্রাজ্ঞী নুরজাহান্ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম স্বামী বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা সের আফগানের কবর। খৃষ্টাব্দ ১৬১০।" তাহার ঠিক পার্শ্বের কবরের উপর লেখা আছে—

"সম্রাট জাহাঙ্গীরের ধাত্রীপুত্র কুতুবুদ্দীন সের আফগানের পত্নী সুন্দরী মেহেরউন্নিসাকে প্রভুর করতলগত করিয়া দিবে,—এই সর্ত্তে সম্রাট তাঁহাকে বঙ্গদেশের সুবেদারের উচ্চপদে নিযুক্ত করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। বীর-প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে কুতুবুদ্দিন নিহত হইয়া এই স্থানেই সমাধিস্থ হইয়াছিলেন; ১৬১০ খৃষ্টাব্দ।" দুই কবর পাশাপাশি—দুই জনেই আজ সকল কলহ, সকল বিবাদের অন্তে, অনন্ত শান্তিশয্যায় চিরনিদ্রায় মগ্ন। সমাধি মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া, আমরা সভায় উপস্থিত হইলাম। তখন সভা চতুষ্টয়ের অধিবেশন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দর্শনশাখায় সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন; ভাঙ্গা-হাটের মত সভায় মাত্র জন কয়েক লোক; তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকেই কবি, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁহারা হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণ শ্রবণ করিতেছিলেন। উক্ত সভায় দেখিলাম, সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী প্রভৃতি; তারপর বাহিরে ইতিহাসশাখায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে সভাপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন, কেহ যে শুনিতেছিল বলিয়া মনে হইল না। সেখানে অনেক সাহিত্যিক জমায়েৎ হইয়াছেন। এই সভার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত বড় ভাল কাজ করিতেছিলেন। আমাদের সহিত তিনি অনেকের আলাপ করাইয়া দিলেন। ইহার পর আমরা সাহিত্য-শাখায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। এক হিসাবে এইটি সম্মিলনের বটবৃক্ষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না,

কারণ এখান হইতে অন্যান্য শাখা বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে প্রধান প্রবীণ যাজ্ঞিক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি, তাঁহার পার্শ্বে তন্ত্রধারকস্বরূপ প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বসিয়া ছিলেন। এখানেও লোকের ভীড় একরূপ ছিল না বলিলে অন্যায় হয় না। রাজপ্রাসাদের অল্পদূরে থিয়েটার-প্যাণ্ডেলে বিজ্ঞান-শাখার বৈঠক বসিয়াছিল। এখানকার সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়। এখানে দেখিলাম, জলধর দাদা, শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী প্রভৃতি বসিয়া আছেন এবং প্রবেশদ্বারের নিকট শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বোধ হয় বিশুদ্ধ বায়ুতে হাঁফ ছাড়িতেছিলেন। মহারাজা মাঝে মাঝে গাড়ি করিয়া সকলের নিকট হইতে তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া ফিরিতেছিলেন। এই সময় জলধর দাদা বলিলেন, "মহারাজ নাটোর প্রবন্ধ লিখিতেছেন, সেজন্য সভায় আসেন নাই, তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।" মহারাজা নাটোর, বর্দ্ধমানের মহ্‌তাব্‌ মঞ্জিলেই অবস্থান করিতেছিলেন। বেলা আন্দাজ ১১॥০টার সময় বাসায় ফিরিলাম। তখনও সভা পূরা দমে চলিতেছে। কিন্তু তখন আমাদের সকল সঙ্গী ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে তখন শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু সন্ধান করিয়া বাহির করা একরূপ অসাধ্য। জ্ঞানবাবু ও আমি দুইজনে বাসায় চলিলাম, সুবোধ বাবুকে সম্মিলনে হারাইয়া গেলাম। বাসায় উপস্থিত হইবার অল্পক্ষণ পরে সুবোধবাবু, বন্ধুবর সুকবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও কালিদাস রায় তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন আমাদের কক্ষে সম্মিলন বসিয়া গেল। যতীন্দ্রবাবুকে পাইয়া মহা আনন্দ হইতে লাগিল, কৃষ্ণবাবুও আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। যতীন্দ্রবাবু পূর্ব্ব দিন বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষ্যে দানাপুর গিয়াছিলেন। গাড়ীতে সারা রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রভাতে তিনি বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়াছেন। বস্তুস্থানে মহারাজের অনুসন্ধান করার পর তিনি রাজপ্রাসাদে তাঁহার দর্শন লাভ করেন। সেখানে সুবোধবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনেন। তারপর যে কি হাসির রোল ও আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল তাহার বর্ণনা করিলে একখানি গ্রন্থ হয়। তাঁহাদের জন্য তৎক্ষণাৎ জলখাবার, চা, সরবৎ প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। কালিদাস বলিল "আমি আর কোথাও যাইতেছি না, এখানেই আড্ডা নিলাম।" তখন তাঁহাদের নামও খাতায়

উঠিয়া গেল। অতঃপর কবিতাপাঠ আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনাও চলিতে লাগিল—সে কি আনন্দ, কি উৎসাহ! আমাদের ব্যাপার দেখিয়া অনেকেই পরিচয় করিতে আসিলেন। স্নান-পর্ব্বে, ভোজন-পর্ব্বে, আমরা সর্ব্বজনবিদিত হইয়া গেলাম। আহারের সময় যতীন্দ্রবাবু রসালাপে সকলকে হাসাইতেছিলেন। হাসির বেগ সামলাইবার নিমিত্ত বিশেষ ভাবে সংযত হইতে হইয়াছিল। আহারের পূর্ব্বে জলধরদাদা আসিয়া আমাদের সহিত একত্র ভোজন করিয়া মহা আনন্দ করিলেন।

বেলা ২টার সময় পুনরায় সভার অধিবেশন, সুতরাং সভায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সাহিত্যসভায় প্রবন্ধ পাঠ চলিতেছে। খুব সামান্য মাত্র লোক উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজা বাহাদুর যে প্রকার ঘন ঘন আহারের সম্মিলন করিয়াছিলেন, তাহাতে সাহিত্য-সম্মিলন করার শক্তি বড় কাহারও ছিল না। কাহারও কাহারও মধ্যে আহার-আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। বেলা তিনটার সময় নাটোরাধিপতি "সাহিত্যে মানব হৃদয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তখন মহারাজা বর্দ্ধমান, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি ও ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ শ্রীসারদাচরণ মিত্র রাজা বনবিহারী, বাবু বৈকুণ্ঠ সেন ও অন্যান্য বহু সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজার প্রবন্ধ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সকলেই শ্রবণ করিয়া যে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন তাহা সকলের মুখের ভাব হইতে এবং ঘন ঘন আনন্দ-প্রকাশ করতালি ধ্বনি হইতে উপলব্ধি করা যাইতেছিল। অনেকেই মহারাজার প্রবন্ধের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। মানসীর পাঠকগণ তাহা ইতিপূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন। মহারাজার প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে তিনি বর্দ্ধমানের নিকট বিদায় লইয়া মোটরে বেলা ৪॥০টার সময় কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ইহার পর বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির সভা হইল। সেখানকার কথা সংবাদপত্রেই সুবিদিত আছে। রাত্রে থিয়েটারে বর্দ্ধমান মহারাজার লিখিত নাটক অভিনীত হয়। যদিও আমরা থিয়েটার দেখিতে যাই নাই, শুনিলাম অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল। সমস্তক্ষণ মহারাজাও সকলের সহিত থিয়েটার দর্শন করেন। সম্মিলনের অনেকগুলি আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। আমরা তাহার মধ্যে এবারও কয়েকখানি দিলাম। সন্ধ্যার সময়—পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে পুরাতত্ত্ব আলোচনা করেন। উহা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

তৃতীয় দিন মহারাজা বর্দ্ধমান অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

“এই উৎসবে অতিথি-সৎকারে যাহা কিছু প্রশংসার বিষয় তাহা অভ্যর্থনা সমিতির প্রাপ্য এবং যাহা কিছু ত্রুটী তাহার জন্য আমিই নিন্দনীয় ও দায়ী। স্বেচ্ছাসেবকগণ স্কুলের কলেজের বালক ছাত্র—তাহাদের প্রতি আপনারা কৃপা-দৃষ্টিপাতে ক্ষমা করিবেন। উহারা যদি কিছু সেবা-গৌরব লাভ করিয়া থাকে, তাহা আপনারাই গতবার বন্যার সময় শিখাইয়া গিয়াছেন। আপনাদের বালকের নিকটই উহারা শিখিয়াছে।” তিনি আরও বলিলেন “আমাদের গর্ব্ব করিবার আর একটী বিষয় আছে যে, আমরা কুমারখালীর জলধরবাবুকে টানিয়া বর্দ্ধমানে আনিয়া বর্দ্ধমানবাসী করিয়া লইয়াছি।”

মহারাজার সরল, সুন্দর কথায় ও ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন যশোহরে আহূত হইয়াছে। সে এখন অনেক বিলম্ব।

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আষাঢ়ে

শ্যামা মা আমার নাচে !
নাচে শঙ্কর নাচে !
রিনিকি ঝিনিকি কনক নূপুর
সঘনে ডমরু বাজে !
ভালে উজ্জ্বল জ্বালা,
দুলিছে শঙ্খমালা,
বিভূতি-পরাগে রঞ্জিত দিশি,
অকাল সন্ধ্যা সাজে !
ধ্বনিছে রুদ্র তাল,
ব ব বম্—বাজে গাল,
নাদ পূরিত দিঙ্মুখভাগ
সমীর গভীর গাজে !
নাহি সম্বর, কাঁপে অম্বর
শ্যামা শঙ্কর নাচে,
আষাঢ়ের মেঘ মাঝে !

মত্তা রভস-রঙ্গে
শ্যামা কটাক্ষ হানে,
উন্মদ হর ছেলে কঙ্কর
মহামল্লার গানে!
গভীর অট্ট হাস্য,
চঞ্চল লীলা-লাস্য
জটা বিস্তারে গরজে গঙ্গা
উদ্দাম অভিমানে!
অঙ্গে অঙ্গ মিলে,
স্ফটিক ইন্দ্রনীলে
রোমকূপে ফুটে বিস্ফুলিঙ্গ
প্রেমালিঙ্গন দানে।
বম্ বব বব, চলে তাণ্ডব,
চণ্ড-আসব পানে!
শ্যামা কটাক্ষ হানে।

দুলিছে দীর্ঘ শূল
ধূসর চক্রবালে!
হরষে ঈশান বাজায় বিষাণ,
শ্যামা নাচে তালেতালে!
ভীম সুন্দর ছবি!
ললাটে রক্ত রবি,
বিলোল রসনা শিখরী দশনা
করালিনী করবালে।
কঙ্কণ কণ কণ,
হুঙ্কার ঘন ঘন,
রুধির পঙ্ক শোভিত অঙ্গ
মণ্ডিত কেশজালে!
নৃত্য ঠমকে, চন্দ্র চমকে
রজতগিরির ভালে!
শ্যামা নাচে তালে তালে!

ছায়া-নিমগ্ন বিশ্ব
রবি মূর্চ্ছিত লাজে,—
মেঘ অরণ্যে লীলা লাবণ্যে
চরণ-কমল রাজে।
জটা বিধূনিত জঙ্ঘা,
ঝরিছে ঝলিছে গঙ্গা,
নবদূর্ব্বায় পুলকাঞ্চিতা
ধরণী তরুণী সাজে।
কন্দরে গিরিকূটে
কোটী ওঙ্কার ফুটে
মত্ত পবন,— নতি করে বন,—
পাগল বাদল সাঁঝে ;
উথল অম্বু বাজিছে কম্বু
সিন্ধু চরণ যাচে !
শ্যামা শঙ্কর নাচে !

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ

বাঙ্গালার ইতিহাস

(সমালোচনা—শেষার্দ্ধ)

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দের উত্তরাপথের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মূলসূত্র, উত্তরাপথের প্রাধান্য লইয়া গৌড়জনের এবং গুর্জ্জরগণের অর্থাৎ বাঙ্গালীর এবং রাজপুতের মধ্যে বিরোধ। অষ্টম শতাব্দের শেষভাগে গুর্জ্জর-প্রতীহাররাজ বৎসরাজ গৌড়-বঙ্গ আক্রমণ করিয়া এই বিরোধের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট-রাজের সহিত বিরোধে লিপ্ত থাকায় অষ্টম শতাব্দের শেষ ভাগে এবং নবম শতাব্দের প্রথম ভাগে গুর্জ্জরগণ গৌড়সাম্রাজ্যের উন্নতির পথে বিশেষ বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে অনুগত চক্রায়ুধককে প্রতিষ্ঠিত করিবার অবসর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট-রাষ্ট্রীয় নীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তৃতীয় গোবিন্দের উত্তরাধিকারী প্রথম অমোঘ-

বর্ষ উত্তরাপথের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং গৌড়-গুর্জ্জর-দ্বন্দ্ব আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। গুর্জ্জর প্রতীহার-রাজগণের গোয়ালিয়রে (সাগরতালে) প্রাপ্ত শিলালিপিতে এবং তাঁহাদের সামন্তরাজগণের কয়েকখানি শিলালিপিতে গৌড়-গুর্জ্জর-দ্বন্দ্বের গুর্জ্জর পক্ষীয় বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গৌড় পক্ষের এইরূপ বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। পালরাজগণের তাম্রশাসননিচয়ের রাজকুলপ্রশস্তি রচয়িতৃগণ গৌড়-গুর্জ্জর-দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কোন কথাই স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপির একটি পংক্তিতে গৌড়-গুর্জ্জর দ্বন্দ্বসম্বন্ধে গৌড়-জনের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই পংক্তিতে দেবপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"খর্ব্বীকৃত-দ্রবিড়-গুর্জ্জর-নাথ-দর্পং" (গৌড়লেখমালা, ৭৪ পৃঃ)

"এই মন্ত্রীবরের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া গৌড়েশ্বর দেবপালদেব··· দ্রবিড় গুর্জ্জর-নাথ-দর্প-খর্ব্বীকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র-মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

রাখালবাবু গরুড়-স্তম্ভলিপির এই পংক্তির সহিত গুর্জ্জর পক্ষের প্রমাণের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরনাথ-দর্প-খর্ব্বকারী দেবপালের মৃত্যু কল্পনা করিয়া লইয়া গুর্জ্জরপ্রশস্তিনিচয়ের কথিত গৌড়জনের পরাজয় দেবপালের উত্তরাধিকারীগণের সময়ে ফেলিয়াছেন। রাখালবাবু দেবপাল কর্ত্তৃক এই গুর্জ্জরনাথ পরাজয়-প্রসঙ্গ অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "দ্বিতীয় নাগভট্টের পুত্র রামভদ্র বোধ হয়, দেবপালকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন (১৮৩ পৃঃ)।" তার পর আবার গুর্জ্জরনাথকর্ত্তৃক দেবপালের পরাজয় কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যথা, "অনুমান হয়, দেবপালদেব ৮২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের শেষভাগে প্রতীহাররাজ রামভদ্রের পুত্র প্রথম ভোজ মহোদয় বা কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন (১৮৯ পৃঃ)।" দেবপালের রাজ্যের এই "শেষভাগ" বলিতে ৮৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের কোন সময় বুঝিতে হইবে। গৌড়সেনা পরাজিত না করিয়া অবশ্যই প্রতীহার-রাজ ভোজ কান্যকুব্জ দখল করিতে এবং দখলে রাখিতে পারেন নাই। যেহেতু দেবপালের মৃত্যুর অন্যূন ২৩ বৎসর পূর্ব্বে কান্যকুব্জ দখল করিয়া গুর্জ্জর নাথই গৌড়াধিনাথ দেবপালের দর্প খর্ব্ব করিয়াছিলেন, সুতরাং নারায়ণ পালের

সময়ে রচিত গরুড়স্তম্ভলিপিতে দেবপালকে গুর্জ্জরনাথ-দর্প-খর্ব্বকারী বলায় সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে, রাখাল বাবুর মতানুসরণ করিতে গেলে একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। রাজকুলের প্রশস্তিকারের উক্তি এইরূপ সংশয়ের চক্ষে দেখা যে অসঙ্গত তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু গুর্জ্জর পক্ষের প্রশস্তিকারগণের উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া রাখালবাবু গৌড়-গুর্জ্জর-দ্বন্দ্বের এক তরফা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। আমি একে একে এই লিপিগুলির পরীক্ষা করিব।

(১) রাজপুতানার মাড়োয়ার রাজ্যের রাজধানী যোধপুর নগরের প্রাচীর-গাত্রে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে এবং যোধপুর হইতে পশ্চিমোত্তর দিকে ২২ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ঘটয়াল নামক স্থানে আবিষ্কৃত আর কয়েকখানি শিলালিপিতে একটি স্বতন্ত্র প্রতীহার-বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। যোধপুর লিপি প্রতীহার বাউকের প্রশস্তি। * ঘটয়ালের কয়েকখানি লিপিই প্রতীহার কক্কুকের প্রশস্তি। † বাউক এবং কক্কুক উভয়েই প্রতীহার কক্কের পুত্র। যথা—

প্রতীহার

পদ্মিনী — কক্ক — দুর্লভদেবী।

| |

বাউক   কক্কুক

কক্কুকের তিনখানি প্রশস্তিই একদিনে, "সম্বৎ ৯১৮ চৈত্রশুদি ২ বুধে হস্তনক্ষত্রে" সম্পাদিত হইয়াছিল। ডাক্তার কিলহর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে এখানে বারে এবং তারিখে ভুল আছে। ‡ ৯১৮ বিক্রম সম্বৎ = ৮৬১-৬২ খৃষ্টাব্দ। বাউকের প্রশস্তির তারিখসম্বন্ধে কিলহর্ণ লিখিয়াছেন,—

"If Munshi Deviprasad were right in reading the date of the Jodhpur inscription samvat 940, Kakkuka, whose present inscription contains a date of the year 918, would have to be considered as the predecessor of Bauka; bat. judging from the rubbing of the Jodhpur inscription, I still believe the date of that inscription to be

* J. R. A. S. 1904, pp. 1—9 E. R. A. S. 1905, pp. 513—521, Biographia Indica, Vol. ix p. p. 277—281.

‡ J. R. A. S 1905. p 515.

samvat 4, and it therefore remains doubtful which of the two chiefs was the elder brother."*

যোধপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত মুন্সী দেবীপ্রসাদ বাউকের যোধপুর লিপির এবং কক্কুকের ঘটয়ালের একখানি লিপির পাঠোদ্ধারাদি করিয়া লিপির ছাপসহ লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সোসাইটির সম্পাদক সেই সকল কাগজপত্র সংশোধন করিবার জন্য কিলহর্ণকে প্রদান করেন। কিলহর্ণকর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া মুন্সী দেবীপ্রসাদের প্রবন্ধ-দ্বয় সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত হইয়াছে। মুন্সী দেবীপ্রসাদ বাউকের যোধপুর-প্রশস্তির সংবৎ পাঠ করিয়াছিলেন ৯৪০। কিলহর্ণ লিপির ছাপ পরীক্ষা করিয়া সেই স্থলে পাঠ করিয়াছেন "সংবৎ ৪।" সুতরাং বাউকের এবং কক্কুকের মধ্যে কে যে জ্যেষ্ঠ এবং কে যে কনিষ্ঠ সেই সম্বন্ধে কিলহর্ণ কোনও অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানে ৮৯৪ সংবৎ: (৮৩৭ খৃষ্টাব্দ) লিপিকরের অভিপ্রেত ছিল। † কক্কুকের প্রশস্তিতে তাঁহার পিতা কক্ককে "শ্রীগুণান্বিতঃ" বলা হইয়াছে। কিন্তু বাউকের প্রশস্তিতে এই শ্লোকটি আছে—

> ততোপি শ্রীযুক্তঃ কক্কঃ পুত্রো জাতো মহামতিঃ।
> যশো মুদ্গগিরৌলব্ধং যেন গৌড়ৈঃ সমংরণে॥

"তাঁহার (ভিল্লাদিত্যের) শ্রীযুক্ত কক্কনামক মহামতি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি মুদ্গগিরিতে গৌড়গণের সহিত যুদ্ধে যশো-লাভ করিয়াছিলেন।"

মুদ্গগিরি অবশ্যই মুঙ্গের। বাউকের প্রশস্তির সময় আমরা জানি না। কক্কুকের প্রশস্তির লিপিকাল ৮৬১-৮৬২ খৃষ্টাব্দ। কক্কুক তখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। এই ৮৬১--৮৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই অবশ্য কক্কুকের পিতা কক্ক মুঙ্গেরে গৌড়সেনার সহিত যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রতীহারী কক্ক নিশ্চয়ই ভিন্নমলের এবং পরে কান্য-কুব্জের প্রতীহারনরপালের একজন সামন্ত ছিলেন। কক্ক খুব সম্ভব মিহির-ভোজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বা মিহির-ভোজের সহিত আসিয়া মুঙ্গেরের যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। বাউকের প্রশস্তিতে যে ভাবে মুঙ্গেরের যুদ্ধের কথা আছে, তাহাতে ইহা অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এই যুদ্ধে কোন্ পক্ষ যে জয়লাভ করিল তাহার আভাস নাই। সম্ভবতঃ মিহির-ভোজ কক্ককে লইয়া মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। গৌড়সেনার এবং গুর্জ্জরসেনার মুঙ্গেরে এক যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে হয়ত, প্রতীহার-সেনা পরাজিত হইয়াছিল।

* J. R. A. S. 1905, p. 514.

† J. R. A. S. 1909. p. 67.

তাই বাউকের প্রশস্তিকার এই যুদ্ধে কক্কের যশোলাভের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, সত্যের অনুরোধে জয়লাভের কথা বলিতে পারেন নাই। কক্কুকের প্রশস্তিকার এই ঘটনার উল্লেখমাত্রও করেন নাই। এই যুদ্ধ অবশ্যই ৮৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, আমাদের হিসাবে ধর্ম্মপালের সময়ে ঘটিয়াছিল। "বাঙ্গালার ইতিহাসে" রাখাল বাবু এই মুঙ্গেরের যুদ্ধসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সকল প্রকার প্রমাণেরই বিরোধী। যথা—

"প্রাচীন মাণ্ডব্যপুরের (বর্ত্তমান মাণ্ডোর যোধপুর রাজ্য) প্রতীহারবংশীয় অধিপতি কক্ক গৌড়-যুদ্ধে মুদ্গগিরিতে অর্থাৎ মুঙ্গেরে, যশোলাভ করিয়াছিলেন। কক্কের পুত্র বাউকের একখানি শিলালিপি যোধপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যোধপুরের শিলালিপি ডাঃ বুলারের মতানুসারে বাউকের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের মতানুসারে উহা ৯৪০ বিক্রমাব্দে (৮৮৩ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কক্কের অপর পুত্র কক্কুকের একখানি শিলালিপি যোধপুর রাজ্যে ঘটয়াল গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে কক্কের গৌড়-যুদ্ধের কোনই উল্লেখ নাই। এই শিলালিপি ৯১৮ বিক্রমাব্দে (৮৬১ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং ইহা স্থির যে, ৯১৮ হইতে ৯৪০ বিক্রমাব্দের মধ্যে কোন সময়ে কক্ক মুদ্গগিরিতে গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন (১৯৬—১৯৭ পৃঃ)।"

রাখালবাবু ভুলিয়া কিলহর্ণ স্থলে বুলার লিখিয়াছেন। তিনি যদি কিলহর্ণের সংশোধিত "সংব্বৎ ৪" পাঠ অগ্রাহ্য করিয়া মুন্সী দেবীপ্রসাদের পঠিত "সংব্বৎ ৯৪০" বহাল রাখিতে চাহেন তবে তাহা খুলিয়া বলা উচিত ছিল। কক্কুকের ২খানি লিপি ৯১৮ সংবতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই সকল লিপিতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে, কক্কক তখন একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। সুতরাং ৯১৮ সংবতে কক্কুকের পিতা কক্ক জীবিত ছিলেন, এবং তাহার পরে কোন সময়ে মুঙ্গেরের যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত। প্রতীহার কক্ক মুঙ্গেরের যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন সেই যুদ্ধ ৮৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব কোন সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান না করিয়া উপায় নাই।

(২) গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কহল নামক গ্রামে প্রাপ্ত, সরযুপারের জীবনস্বরূপ (সরযুপার-জীবিতম্) অর্থাৎ অধিপতি বলিয়া বর্ণিত কলচুরি বংশীয় সোঢ়দেবের ১১৩৪ বিক্রম সম্বতের (১০৭৭ খৃষ্টাব্দের) একখানি তাম্রশাসনে

কথিত হইয়াছে সোঢ় দেবের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ গুণাম্ভোধিদেব ভোজদেব নামক নরপতির আশ্রিত ছিলেন এবং যুদ্ধে "গৌড়লক্ষ্মী" হরণ করিয়াছিলেন। * রাখালবাবু অনুমান করেন এই ভোজদেব গুর্জ্জর-প্রতীহার-রাজ মিহির-ভোজ (১৯৭ পৃঃ)।

(৩) রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত, জয়পুর নগরের ২৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত, চাটস্থ নামক স্থানে, একটি পরিত্যক্ত মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে একটি সুদীর্ঘ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লিপির অক্ষরের হিসাবে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার অনুমান করেন, এই লিপি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। আমরা মিবারের গুহিল বা গিহ্লোট রাজবংশের ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত। উদয়পুরের মহারাণা এই বংশজাত। চাটসুর এই শিলালিপিতে স্বতন্ত্র একটি গুহিল রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাণ্ডারকার অনুমান করেন, জয়পুরের অন্তর্গত চাটসু হইতে উদয়পুরের অন্তর্গত ডবোক পর্য্যন্ত এই গুহিলরাজ্য বিস্তৃত ছিল, এবং মেবারের জহাজপুর জেলার অন্তর্গত ধোড়নগরে (ধবগর্ত্তায়) এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই বংশের ধনিক নামক সামন্ত নৃপতির ৪০৭ (গুপ্ত) সংবতের বা ৭২৫ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধনিকের পুত্র আউক। আউকের পুত্র কৃষ্ণরাজ। কৃষ্ণরাজের পুত্র শংকরগণ সম্বন্ধে শিলালিপিতে কথিত হইয়াছে,—

"প্রতিজ্ঞাং প্রাক্কৃত্বোদ্ভটকরিঘটাসংকটরণে
ভটং জিত্বা গৌড়ক্ষিতিপমবনিং সংগরহৃতাং
বলাদ্দাসীং চক্রে প্রভুচরণয়োর্যঃ প্রণয়িনীং
ততো ভূপঃ সো ভূজ্জিত বহুরণঃ শংকরগণঃ ॥ ১৪ ॥"

"তাহা হইতে (কৃষ্ণরাজ হইতে) বহুরণজয়ী শংকরগণনামক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া (পরে) দুর্জ্জয় করিঘটাসঙ্কুল রণক্ষেত্রে গৌড়ক্ষিতিপতি ভটকে পরাজিত করিয়া (তাঁহার) রণনির্জ্জিত রাজ্যকে বলপূর্ব্বক (স্বীয়) প্রভুর চরণের প্রণয়িনী দাসী করিয়াছিলেন।"

শঙ্করগণের পুত্র হর্ষরাজ। এই হর্ষসম্বন্ধে প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন—

বীরৈর্ব্বৈরিচমূবিনাশ [কুশলৈ র্ইত্রিবতো— ⌣ —
— —বারণ বংশজৈ] র্গিরিশিরস্তুংগৈর্ম্মদাঢ্যৈর্গজৈঃ।

* Epigraphia Indica, Vo, vii. p 89.

জিত্বা যঃ সকলানুদীচানৃপতীন্ ভোজায় ভক্ত্যা দদৌ
শঙ্কাসৈকতসিন্ধুলংঘনবিধৌ শ্রীবংশজান্ বাজিনঃ। ১৯॥

"যিনি শত্রুসেনাবিনাশকুশল বীরগণের.........এবং গিরিশিখরতুল্য উচ্চ মদান্ধ গজনিচয়ের সাহায্যে উত্তরদেশীয় সকল নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া ভক্তিসহকারে ভোজকে বালুকাময় স্থান এবং নদীলঙ্ঘনে সমর্থ শ্রীবংশীয় অশ্ব সকল উপহার দিয়াছিলেন।" *

হর্ষরাজের পুত্র দ্বিতীয় গুহিল। এই দ্বিতীয় গুহিলসম্বন্ধে প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন—

পীনোরস্কৈ রুদংচৎকুলিশখরখুরক্ষুণ্ণপূর্ব্বাব্ধিতীরৈঃ
সংগ্রামাম্ভোধি পোতৈ রুদধিভবমহাবাহবংশপ্রসূতৈঃ।
জিত্বা গৌড়াধিনাথং বিবুধজনবধুগীতসংকীর্ত্তি রাজৌ
প্রাচোভ্যঃ পার্থিবেভ্যঃ প্রচুরতরকরং যোগ্রহীং স্বামিনিষ্ঠঃ॥ ২০॥

"বিশালবক্ষা, উদ্ধোৎক্ষিপ্ত বজ্রকঠিন খুরের দ্বারা পূর্ব্বসাগরের তীর খনন-কারী, সমর-সাগরের নৌকাস্বরূপ সমুদ্রোত্থিত মহাতুরঙ্গ (উচ্চৈঃশ্রবার) বংশ প্রসূত অশ্বগণের সাহায্যে, প্রভুভক্ত, দেববধুগীতকীর্ত্তি সেই (গুহিল) যুদ্ধে গৌড়াধিনাথকে পরাজিত করিয়া প্রাচ্যদেশীয় নরপতিগণের নিকট হইতে প্রচুরতর কর গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

দ্বিতীয় গুহিলের পুত্র বালাদিত্যের সময়ে এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ভাণ্ডারকার যথার্থই অনুমান করিয়াছেন, এই লিপির হর্ষরাজ উদীচ্য নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া যে ভোজকে বাজি উপহার দিয়াছিলেন, তিনি প্রতীহারবংশীয় মিহিরভোজ (৮৪৩-৮৮৩ খৃঃ অঃ)। হর্ষরাজের পিতা শঙ্করগণ মিহিরভোজের পিতা রামভদ্রের বা পিতামহ দ্বিতীয় নাগভটের, হয়ত উভয়েরই সামন্ত ছিল। শঙ্করগণ যে "গৌড়ক্ষিতিপ" ভটকে জয় করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্যই ধর্ম্মপাল। ভট অর্থে যোদ্ধাও হইতে পারে, অথবা ধর্ম্মপালের নামান্তরও হইতে পারে। প্রশস্তিকার যে লিখিয়াছেন, শঙ্করগণ গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অবনী (রাজ্য) হরণ করিয়া প্রভুর পদানত করিয়াছিলেন ইহা অমূলক স্তুতি-বাক্য মাত্র। কেননা এই প্রশস্তিকার পরে শঙ্করগণের পৌত্র দ্বিতীয় গুহিলের গৌড় অভিযানসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত শঙ্করগণকর্ত্তৃক গৌড়পতির

* Epigraphia Indica, Vol. XII., pp. 10-17.

রাজ্য [অবনী] হরণ-বৃত্তান্তের সামঞ্জস্যবিধান অসম্ভব। দ্বিতীয় নাগভটের সহিত গৌড়-সেনার যে যুদ্ধ হইয়াছিল শঙ্করগণ হয়ত তাহাতে উপস্থিত ছিলেন, এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে। শঙ্করগণের পৌত্র দ্বিতীয় গুহিল যে গৌড়াধিনাথকে পরাজিত করিয়া স্বীয় প্রভুর জন্য প্রাচ্য নৃপতিগণের নিকট হইতে প্রচুরতর কর আদায় করিয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ দেবপাল। এই শ্লোকে আমরা গৌড়াধিনাথের প্রভাবের সম্যক্ পরিচয় পাইতেছি। গৌড়াধিনাথ প্রাচ্য পার্থিবগণের অধিরাজ বা সম্রাট ছিলেন; যিনি গৌড়াধিনাথকে পরাভূত করিতে পারিতেন তিনি প্রাচ্য পার্থিবগণের নিকট কর দাবী করিতে পারিতেন। প্রাচ্য নৃপতিগণ গৌড়াধিনাথকে কর প্রদান করিতেন। গৌড় সাম্রাজ্য বাহুবলে নির্জ্জিত হইয়াছিল না, স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচনের ফলে, যুক্তরাজ্যের আকারে আবির্ভূত হইয়াছিল। ভারতের অন্যান্য সাম্রাজ্য কতক পরিমাণে সম্রাটের ভৃত্যগণ শাসিত বৃহৎ রাজ্য ছিল, আর গৌড় সাম্রাজ্য আদৌ স্বেচ্ছায় করদ নৃপতিগণকর্ত্তৃক শাসিত রাজ্যসমষ্টি (federation) ছিল। দ্বিতীয় গুহিলের আক্রমণের সময় যদি দেবপালকে গৌড়াধিপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রশস্তিকার যে লিখিয়াছেন, গুহিল গৌড়াধিনাথকে পরাজিত করিয়া প্রাচ্য পার্থিবগণের নিকট হইতে প্রচুর কর আদায় করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

রাখালবাবু তাঁহার "ইতিহাসে" চাটসু লিপির উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় লিপির সহিত পালনরপালগণের প্রশস্তির সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য তিনি ৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দেবপালের মৃত্যু কল্পনা করিয়া লইয়া নারায়ণ পালের স্কন্ধে পরাজয়ের কলঙ্ক-ভার চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা, "অনুমান হয় ইহার(নারায়ণ পালের সপ্তদশ রাজ্যাঙ্কের) পরেই মগধ, তীরভুক্তি ও অঙ্গ ভোজদেবকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল (১৯৮ পৃঃ)।" গুর্জ্জর প্রতীহার-রাজ মিহিরভোজ যে ৮৪৩ হইতে ৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। ৮৮১ খৃষ্টাব্দের পরে মিহিরভোজ যে বেশী দিন জীবিত ছিলেন তাহা মনে হয় না। কিন্তু রাখালবাবুর মতানুসারে যদি স্বীকার করিতে হয় যে, নারায়ণপালের রাজ্যের ১৭ সম্বতের পরে মিহির ভোজ অঙ্গ মগধাদি জয় করিয়াছিলেন, তবে অনুমান করিতে হয় যে ৮৮১ খৃষ্টাব্দের কয়েক বৎসর পরে মিহির-ভোজ এই পূর্ব্ব দিগ্‌বিজয়ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কারণ ৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দেবপালের মৃত্যু; তারপর প্রথম বিগ্রহ

পাল বা প্রথম শূরপালের অন্যূন ৩ বৎসরব্যাপী রাজত্ব—; তার পর নারায়ণ পালের রাজত্বের প্রথম ১৭ বৎসর; তার পর মিহিরভোজকর্ত্তৃক মিথিলা, মগধ অঙ্গ অধিকার। মিহিরভোজের রাজত্বের আমাদের জানা শেষ তারিখের (৮৮১ খৃঃ অঃ) এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী মহেন্দ্র পালের রাজত্বের আমাদের জানা প্রথম তারিখের (৮৯৩ খৃঃ অঃ) মধ্যে ১২ বৎসরের ব্যবধান। তথাপি ৮৬৫ + ৩ + ১৭ = ৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পরে যে মিহিরভোজের মগধাদি প্রদেশ জয়ের অবসর ছিল, উপস্থিত প্রমাণের বলে তাহা অনুমান করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

রাখালবাবু কেন যে মিহিরভোজকর্ত্তৃক ৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পরে মগধাদি অধিকার কল্পনা করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ নিম্নোদ্ধৃত অংশে প্রদান করিয়াছেন—

"প্রথম ভোজদেবের পুত্র, মহেন্দ্রপাল, পিতার মৃত্যুর পরে প্রতীহার বংশের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রপাল দেবের রাজ্যকালে তীরভুক্তি ও মগধ পালরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া প্রতীহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই প্রদেশদ্বয়ে মহেন্দ্রপাল দেবের অধিকারসূচক একখানি তাম্রশাসন ও কয়েকখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহেন্দ্রপাল দেবের অষ্টম রাজ্যাঙ্কে গয়ার নিকট ফল্গুনদীর অপর পারে রামগয়ায় সহদেব নামক এক ব্যক্তি বিষ্ণুর দশাবতারের একটি প্রস্তরমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৯৫৫ বিক্রমাব্দে (৮৯৮ খৃঃ অঃ) মহেন্দ্রপাল দেব শ্রাবস্তিভুক্তির অন্তর্গত শ্রাবস্তি বিষয়ে একখানি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। গয়া জেলার গুণেরীয়া গ্রামে মহেন্দ্র পালের নবম ও উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত দুইটি প্রস্তর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে (২০০—২০১ পৃঃ)।"

প্রতীহার-রাজ মহেন্দ্র পালের সময়ে (+৮৯৩ - ৯০৭ খৃঃ অঃ) মগধ এবং মিথিলা (তীরভুক্তি) পালরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া প্রতীহার সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার প্রমাণস্বরূপ রাখালবাবু যে তাম্রশাসনখানির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সারণ জিলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জের দক্ষিণ পূর্ব্বে ৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দিঘোয়া—দুবৌলী গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মহোদয় বা কান্যকুব্জ নগরে এই তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল।

"শ্রীমহোদয় সমাবাসিতানেক গোহস্ত্যশ্বরথপত্তি সম্পন্ন স্কন্ধাবারাৎ।"

এই শাসনের দ্বারা যে ভূমি দান করা হইয়াছে তাহা শ্রাবস্তী ভুক্তিতে শ্রাবস্তী-মণ্ডলে অর্থাৎ বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডা জেলার সাহেত-মাহেতের সমীপবর্ত্তী কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল। যথা—

"শ্রাবস্তী ভুক্তৌ শ্রাবস্তী মণ্ডলান্তঃপাতী—বালয়িকা। বিষয় সম্বদ্ধ পালীয়ক গ্রামঃ।" *

এই তাম্রশাসন সপ্রমাণ করে, কান্যকুব্জ এবং শ্রাবস্তী প্রদেশ মহেন্দ্রপালের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু মগধ বা মিথিলা মহেন্দ্রপালের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এ কথার প্রমাণস্বরূপ কেন যে রাখালবাবু এই তাম্রশাসনখানির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। অবশ্যই তাম্রশাসনখানি সারণ জেলার দিঘোয়া দুবৌলি গ্রামে মহাবীর পাঁড়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি রাখালবাবু সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন এখন যে ভূভাগ সারণ জেলা নামে পরিচিত তাহা মহেন্দ্রপালের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল? কামরূপ-রাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন বারাণসীর নিকটে কমৌলি গ্রামে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কেহই মনে করেন না যে বারাণসী বৈদ্যদেবের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে (৮৯৮ খৃষ্টাব্দে) সম্পাদিত মহেন্দ্রপালের এই তাম্রশাসন শ্রাবস্তী হইতে সহস্র উপায়ে সারণ জিলায় আসিয়া থাকিতে পারে। আর যদি স্বীকারও করা যায়, বর্ত্তমান সারণ জিলা প্রতীহার রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, তাহাতে মিথিলা বা মগধ প্রতীহার-রাজ্যভুক্ত থাকা সূচিত হয় না। সারণ জেলা গণ্ডকনদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং ঘরঘরা (Gogra) নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সারণ জেলা যে তীরভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহারই বা প্রমাণ কি? সুতরাং দিঘোয়া দুবৌলির তাম্রশাসনের বলে মিথিলা এবং মগধ প্রতীহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

মগধ প্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের সাম্রাজ্যভুক্ত থাকার প্রমাণস্বরূপ রাখাল বাবু মহেন্দ্রপালের রাজ্য-সম্বৎ সম্বলিত গয়াজেলায় আবিষ্কৃত তিনখানি মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। এই মুর্ত্তিত্রয়ে উল্লিখিত মহেন্দ্রপাল যে প্রতীহারবংশীয় মহেন্দ্রপাল তাহার প্রমাণ কি? গৌড়াধিনাথের অধীনে প্রাচ্য ভারতে অনেক নরপতিই ছিলেন। এই মহেন্দ্রপাল তাঁহাদের অন্যতম হইতে পারেন। রাখাল বাবু তাঁহার "ইতিহাসে" মহেন্দ্রপালদেবের নাম সম্বলিত মগধে প্রাপ্ত কোন লিপিরই প্রতিকৃতি প্রদান করেন নাই এবং ঐ সকল লিপির অক্ষরের আকার প্রকার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। সুতরাং এই সকল লিপি যে মগধে গুর্জ্জারপ্রতীহাররাজ মহেন্দ্রপালের আধিপত্য সূচিত করে এমন কোন প্রমাণ আমাদের কাছে উপস্থিত করেন নাই। আমার হিসাবে, কান্যকুব্জে মিহির

* Indian Antiquary, Vol. XV. p. 113

ভোজের এবং গৌড়ে দেবপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গৌড় গুর্জ্জর-দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি, কেন না পরে যে গৌড়পতির এবং গুর্জ্জরপতির মধ্যে বিরোধ চলিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। রাখালবাবুর মতে খৃষ্টীয় দশমশতাব্দেও গৌড়গুর্জ্জর বিরোধ চলিয়াছিল। (নারায়ণ পালের পৌত্র) দ্বিতীয় গোপাল যখন গৌড়েশ্বর, তখন মহীপালদের (+৯১৩—৯৩১+খৃঃঅঃ) গুর্জ্জর-সাম্রাজ্যের অধিপতি। রাষ্ট্রকটবংশীয় তৃতীয় ইন্দ্র যখন (৯১৪—৯১৬ খৃঃঅঃ) উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বোধ হয়, গোপালদেবের অপহৃত পিতৃরাজ্যের কিয়দংশ (মগধ) উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (২০৪) পৃঃ। আবার গুর্জ্জররাজ মহীপাল বোধ হয়, এই সময়ে (দ্বিতীয় বিগ্রহপাল বরেন্দ্র হইতে কাম্বোজগণ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হইলে) চন্দেল্ল বংশীয় যশোবর্ম্মা দেবের সাহায্যে মগধ ও অঙ্গ পুনরধিকার করিয়াছিলেন (২০৬পৃঃ।)" কেন যে রাখালবাবুর এইরূপ"বোধ হইল"তিনি তাহার কোনও আভাস দেন নাই। জেজাভুক্তির (বুন্দেলখণ্ডের) চন্দেল্লরাজবংশের এবং (জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী) ত্রিপুরির কলচুরী (হৈহয়) রাজবংশের অভ্যুত্থানের ফলে দশমশতাব্দে উত্তর পথের বাদ-বিবাদ নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল। গৌড়নাথ এবং গুর্জ্জরনাথ এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীই উত্তরাপথে প্রাধান্য লাভের স্বপ্ন বিস্মৃত হইয়া চন্দেল্লরাজের এবং কলচুরি বা চেদিরাজের সহিত বিরোধে ব্যস্ত ছিলেন। চন্দেল্লরাজ ধঙ্গের ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের খজুরাহোর শিলালিপিতে ধঙ্গের পিতা চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে--

> গৌড়ক্রীড়ালতাসি স্তুলিতখসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং
> নশ্যৎকাশ্মীরবীরঃ শিথিলিত মিথিলঃ কালবন্মালবানাং
> সীদৎ সাবদ্যচেদিঃকুরুতরুষু মরুৎ সংজ্বরো গুর্জ্জরাণাং
> তস্মাৎ তস্যাং স জজ্ঞে নৃপকুলতিলকঃ শ্রীযশোবর্ম্মা রাজঃ॥ *

"কঙ্কুকার গর্ভে হর্ষের নৃপকুলতিলক শ্রীযশোবর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যশোবর্ম্ম গৌড়গণকে লতার ন্যায় হেলায় ছেদনের অসিস্বরূপ ছিলেন; খস-গণের তুল্য বলশালী ছিলেন; কোশলগণের ধন হরণ করিয়াছিলেন; কাশ্মীর-বীরগণ তাঁহার নিকট বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল; মৈথিলগণকে তিনি দুর্ব্বল

* Epigraphia Indica, vol I. p 126.

করিয়াছিলেন; মালব- গণের তিনি যমস্বরূপ ছিলেন; নির্লজ্জ চেদিগণকে তিনি বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন; তিনি কুরু তরুর ঝটিকাস্বরূপ ছিলেন; এবং গুর্জ্জরগণের দহনকারী অগ্নিস্বরূপ ছিলেন।"

"গৌড়-ক্রীড়া-লতাসি" বিশেষণ চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মার গৌড়সেনার সহিত যুদ্ধ সূচিত করিতে পারে, কিন্তু এই কথার বলে যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক গৌড়সাম্রাজ্যের অংশবিশেষের অধিকার অনুমিত হইতে পারে না। যশোবর্ম্মা যেমন "গৌড়-ক্রীড়া লতাসি" তেমন "সংজ্বরঃ গুর্জ্জরাণাং" ও ছিলেন। গুর্জ্জর বলিতে তৎকালে কান্যকুব্জের গুর্জ্জর-প্রতীহার রাজ্যের সেনাই বুঝাইত। সুতরাং যিনি গুর্জ্জরগণের সংজ্বর বা দহনকারী অগ্নি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি যে গুর্জ্জর-রাজ মহীপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মগধ ও অঙ্গ, গুর্জ্জর সাম্রাজ্যের সামিল করিয়া দিয়াছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত। এই প্রশস্তির আর একটি শ্লোকে (৪৩) কথিত হইয়াছে যশোবর্ম্মা গুর্জ্জররাজ হেরম্বপাল বা মহীপালের পুত্র দেবপালের নিকট হইতে লিপিতে বর্ণিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠ (বিষ্ণু) মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুর্জ্জরপতি মহীপালের সহিত যে চন্দেল্ল রাজের বিশেষ প্রণয় ছিল না রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণরাজের ৯৪০ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত কর্হাদ লিপি তাহা সপ্রমাণ করে। যথা—

যস্য পরুষেক্ষিতাখিল দক্ষিণদিগ্দূর্গবিজয়মাকর্ণ্য।
গলিতা গুর্জ্জরহৃদয়াৎ কালংজশচিত্রকূটাশা (৩০)॥ *

"তাঁহার (তৃতীয় কৃষ্ণরাজের) পরুষ (ক্রোধান্বিত) দৃষ্টির বলেই দক্ষিণ দিকের সমস্ত দুর্গ বিজিত হইয়াছে এই কথা শ্রবণ করায় গুর্জ্জরের হৃদয় হইতে কালংজর এবং চিত্রকূট [অধিকারের] আশা দূরীভূত হইয়াছিল!"

পূর্ব্বোদ্ধৃত খজুরহোর শিলালিপিতে কথিত হইয়াছে চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মা কালংজর পর্ব্বত অধিকার করিয়াছিলেন (৩১ শ্লোক)। গুর্জ্জররাজ মহীপাল বোধ হয় যশোবর্ম্মার অধিকৃত কালংজর এবং চিত্রকূট দখল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং রাষ্ট্রকূট তৃতীয় কৃষ্ণরাজ চন্দেল্ল রাজের পক্ষ অবলম্বন করায় সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে গুর্জ্জর, গৌড়, চন্দেল্ল, চেদি এবং রাষ্ট্রকূট এই পাচটি শক্তির প্রতিযোগিতার ফলে একটা সাম্যভাব উপস্থিত হইয়াছিল। কোন শক্তির পক্ষেই অপর শক্তিকে ধ্বংস করিবার অবকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং দশম শতাব্দে প্রতিযোগী

* Epographia Indica' Vol' IV p. 294.

রাজ্যনিচয়ের মধ্যে যে বিরোধ চলিয়াছিল, তাহার ফলে কেহ কাহারও বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের কহাদে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে তৃতীয় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক—

"জননীপত্নীগুরুরপি সহস্রার্জুনো বিজিতঃ (২৫)।

"জননী এবং পত্নীর গুরুজন সহস্রার্জ্জুন পরাজিত হইয়াছিলেন।" *

সহস্রার্জ্জুন এখানে সহস্রার্জ্জুনবংশীয় চেদিরাজ। তৃতীয় কৃষ্ণের পিতা তৃতীয় অমোঘবর্ষ ত্রিপুরির চেদিরাজ প্রথম যুবরাজের কন্যা কুন্দকদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তৃতীয় কৃষ্ণকর্ত্তৃক পরাজিত সহস্রার্জ্জুন প্রথম যুবরাজ বা তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণরাজও হইতে পারেন। চেদিরাজ লক্ষ্মণ [রাজ] কল্যাণির চালুক্যরাজ তৈলপের (৯৭৩-৯৯৭ খৃঃ অঃ) মাতামহ ছিলেন। (E) I. VIII. ap. p. II p 7.) পূর্ব্বোল্লিখিত ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের খজুরাহোর শিলালিপির একটি শ্লোকে (২৮) চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মাকর্ত্তৃক বিখ্যাত "ক্ষিতিপালমৌলিরচনাবিন্যস্তপাদাম্বুজ" "অসংখ্যবল" চেদিরাজের হঠাৎ পরাজয়ের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বৃত্তান্ত অন্ততঃ চেদিরাজের ও চন্দেল্লরাজের মধ্যে বিরোধ সূচিত করিতেছে। চেদীরাজ লক্ষ্মণরাজদেব সম্বন্ধে কর্ণদেবের গোহরোয়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে—

বঙ্গালভঙ্গনিপুণঃ পরিভূতপাণ্ড্যো
লাটেশলুণ্ঠনপটুর্জ্জিত গুর্জ্জরেন্দ্রঃ।
কাশ্মীর-বীর-মুকুটার্চ্চিত পাদপীঠ
স্তেষু ক্রমাদজনি লক্ষ্মণরাজদেবঃ॥

"চেদি বা হৈহয় বংশে ক্রমে লক্ষ্মণরাজদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গালরাজকে পরাজিত করিতে পটু ছিলেন, পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন, লাটরাজের (রাজ্য) লুণ্ঠনে পটু ছিলেন, গুর্জ্জর রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং কাশ্মীররাজের মুকুট তাঁহার পাদপীঠ অর্চ্চনা করিত।" যে শ্লোকে এক নিঃশ্বাসে ভারতবর্ষের উত্তর সীমাস্থিত কাশ্মীর, পশ্চিমসীমাস্থিত লাট, দক্ষিণসীমাস্থিত পাণ্ড্য এবং পূর্ব্বসীমাস্থিত বঙ্গালদেশ জয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ভিতরে বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে এই শ্লোকের বলে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যায়, যে

* Epagraphia Indica, vol. IV. p, 284.

+ Epigraphia Indica. vol, XI. p. 142.

চেদিরাজ লক্ষ্মণরাজ উচ্চাভিলাষী এবং প্রতিবেশী নৃপতিগণের সহিত বিরোধে লিপ্ত ছিলেন। রাখালবাবু কর্ণদেবের গোহরোয়া লিপি লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই লিপিতে কর্ণদেবের পিতা চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেব কর্ত্তৃক কীর, অঙ্গ, কুন্তল, এবং উৎকল আক্রমণ সূচিত হইয়াছে (১৭ শ্লোক)। পালনরপালগণের তাম্রশাসনে গৌড়াধিপ দেবপালের পরবর্ত্তী প্রথম বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল এবং দ্বিতীয় গোপালের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে গুর্জ্জরপতি বা দ্রবিড়পতির সহিত বিরোধের কথা দূরে থাকুক, চেদিপতির বা কালংজর-পতির সহিত বিরোধের কোনও ইঙ্গিত নাই। পক্ষান্তরে চেদিরাজের এবং রাষ্ট্রকূট রাজের সহিত পাল নরপালগণের যে আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। প্রথম বিগ্রহপাল হৈহয় বা চেদিরাজকুমারী লজ্জার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, নারায়ণপাল চেদিরাজের দৌহিত্র ছিলেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূট তুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবপালের ন্যায় দ্বিতীয় গোপালও রাষ্ট্রকূটবংশের দৌহিত্র ছিলেন। গুর্জ্জরগণের সহিত সাম্রাজ্যের জন্য শতাধিক বর্ষব্যাপী ব্যর্থ বিরোধের পর গৌড়জন বোধ হয় বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন। এই সুযোগে কাম্বোজগণ আসিয়া গৌড় সাম্রাজ্যের কেন্দ্র বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়া সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল।

কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতিকর্ত্তৃক বাণনগরে চন্দ্রমৌলির মন্দির নির্ম্মাণের সময় (৯৬৬ খৃঃ অঃ) আমরা জানি এবং মহীপালের সারনাথ লিপির সময়ও (১০২৬ খৃষ্টাব্দে) আমরা জানি। সুতরাং পরবর্ত্তী পাল নরপালগণের সময় লইয়া বেশী মতভেদের সম্ভাবনা নাই। বর্ম্মাবংশের এবং সেনবংশের কালসম্বন্ধে রাখাল বাবুর অভিমত আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির প্রথিতনামা ডিরেক্টর শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বাঙ্গালার ইতিহাসের এই যুগের সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক আহুত হইয়াছেন। বঙ্গবাসী শীঘ্রই তাঁহার নিকট হইতে পালসাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগের একটি জীবন্ত চিত্র প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং রাখালবাবুর ইতিহাসের নবম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদের আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান অতি অল্প। অন্য দেশের ঐতিহাসিকেরা যেখানে ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, সেখানে আমাদের অবলম্বন কতকগুলি ধূলিকণা

মাত্র। এইরূপ যৎসামান্য উপাদান লইয়া ইতিহাস গঠন অতি কঠিন কাজ। অনেক স্থলেই অনুমানের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বহু বিচার বিতর্ক ব্যতীত সর্ব্ববাদীসম্মত অনুমানে উপনীত হওয়া অসম্ভব। "বাঙ্গালার ইতিহাসে" রাখালবাবু দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যয়নের এবং চিন্তার ফলে বাঙ্গলার ইতিহাসের উৎকট সমস্যানিচয়ের সমাধানের জন্য বহুযুক্তিতর্কের অবতারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শত মতভেদসত্ত্বেও রাখালবাবুর গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি লাভবান হইয়াছি এবং আমার বিশ্বাস ইতিহাস-অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া লাভবান হইবেন।

ইতিহাস আলোচনার রীতি সম্বন্ধে গুটিকয়েক অত্যাবশ্যক কথার আবৃত্তি করিয়া এই সমালোচনার উপসংহার করিব। ইতিহাসের উপাদান বা আকর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, সমসময়ের বা নিকটবর্ত্তী সময়ের লোকের প্রদত্ত বিবরণ এবং দূরবর্ত্তী সময়ের লোকের সঙ্কলিত জনশ্রুতিমূলক বিবরণ। যে জনশ্রুতিমূলক বিবরণ সমসময়ের বিবরণের বিরোধী তাহা অগ্রাহ্য; যে জনশ্রুতিমূলক বিবরণ সমসময়ের বিবরণের বিরোধী নহে তাহাও ইতিহাসরূপে গ্রাহ্য নহে; ভবিষ্যতের অনুসন্ধানের ফলে উহার অনুকূল সমসাময়িক প্রমাণ পাওয়া গেলেও যাইতে পারে এই আশায় উল্লেখযোগ্য মাত্র। রাখালবাবু কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি দূরবর্ত্তীকালে সঙ্কলিত গ্রন্থবদ্ধ প্রমাণের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে সংশয় প্রকাশ করিয়া দেশের যথেষ্ট উপকারসাধন করিয়াছেন।

সমসময়জনের বিবরণও বিনা বিচারে ইতিহাসরূপে গ্রাহ্য নহে। এই শ্রেণীর উপাদানের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে জর্ম্মাণ ঐতিহাসিক রেঙ্কে প্রবর্ত্তিত এবং সর্ব্বজনাদৃত ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালী (critical method) অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই বিচার-প্রণালী সম্বন্ধে লর্ড একটন্ লিখিয়াছেন—

"For the critic is one who, when he lights on an interesting statement, begins by suspecting it. He remains in suspense until he has subjected it to three operations. First, he asks whether he has read the passage as the author wrote.........Next is the question where the writer got his information.. ....The responsible writer's character, his position, antecedents, and probable motives have to be examined into; and this is what, in a different and adopted sense of the word may be called the higher criticism, in comparison with too servile and

often mechanical work of pursuing statements to their root. For a historian has to be treated as a witness, and not believed unless his sincerity is established. The maxim that a man must be presumed to be innocent until his guilt is proved, was not made for him. (A Lecture on the study of History.")

অর্থাৎ বিচারশীল ঐতিহাসিক কোনও কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করিবেন না, সংশয়ারূঢ় হইবেন, এবং ঐ বিবরণের আকরকে তিন প্রকারে পরীক্ষা করিবেন। (১) তিনি অনুসন্ধান করিবেন পাঠোদ্ধার ঠিক হইয়াছে কিনা।......(২) লেখক কোথা হইতে সেই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, পরে তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে।......(৩) লেখকের চরিত্র, পদমর্যাদা, পূর্ব্বকথা, লেখার উদ্দেশ্য ও পরীক্ষা করিতে হইবে। ঐতিহাসিক বিবরণ-লেখককে সাক্ষীর ন্যায় জেরা করিতে হইবে, এবং যতক্ষণ না তাঁহার অকপটতা প্রমাণিত হয় ততক্ষণ তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে না। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি দোষী বলিয়া প্রমাণিত হয় ততক্ষণ তাঁহাকে নির্দ্দোষী মনে করিতে হইবে, ঐতিহাসিক বিবরণ-লেখকসম্বন্ধে এই নীতির অনুসরণ করা যাইতে পারে না। যতক্ষণ না কোন ঐতিহাসিক বিবরণ-লেখক মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হয়েন ততক্ষণ তাঁহাকে সত্যবাদী মনে করা হইবে না, পক্ষান্তরে যতক্ষণ না তিনি সত্যবাদী বলিয়া প্রমাণিত হন ততক্ষণ তাঁহার কোন কথা সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।

তাম্রফলকে বা শিলাফলকে উৎকীর্ণ রাজপ্রশস্তি, সমসময়ের কবি-রচিত চরিতকথা সম্বলিত কাব্য, এবং পর্য্যটকের বিবরণ এই সকল নিয়মানুসারে, সাবধানে বিচার করিয়া তবে ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই হিসাবে প্রশস্তিকারগণের বিজয়গাথা অনেক সময়ই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা সুকঠিন। দুই পক্ষের প্রশস্তিকারের কথা তুলনা করিয়া যাহা প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মনে হয় তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। যেখানে উভয় পক্ষের প্রশস্তিকারের কথা তুলনা করার সুযোগ ঘটে না, সেখানে অতি সাবধানে পূর্ব্বাপর ইতিহাস আলোচনা করিয়া প্রশস্তিকারের কথার যে অংশ যুক্তিযুক্ত মনে হয় তাহাই ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইবে।

এইরূপ বিচারপূর্ব্বক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতি (inductive method) অনুসারে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হইবে। সিদ্ধান্ত প্রমাণের ঠিক

অনুগামী হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মপ্রচারের, জন্য, নীতিপ্রচারের জন্য, সমাজ সংসারের জন্য বা পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের কথা শুনাইয়া স্বদেশ প্রেম জাগরিত করিবার জন্য ইতিহাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। ইতিহাসই ইতিহাস আলোচনার লক্ষণ জানিয়া নিষ্কামভাবে ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রেও রেঙ্কেই আমাদের গুরু। লর্ড একটন লিখিয়াছেন—

"For his most eminent pred e ssors, history w. s applied politics, fluid law, religion exemplifi d, or the school of patriotism. Ranke w•s the first German to pursue it for no purpose but its own " *

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

মিলন ও বিদায়

(Goethe)

তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনতর হয়ে
ঘিরিছে ধরণী ;
চলিনু কম্পিত বক্ষে—দূর গিরি হ'তে
নামিছে রজনী।
শত কৃষ্ণ চক্ষু মেলি' ঘন অন্ধকার
বনান্তর হ'তে
চেয়ে আছে ; তাল শ্রেণী—অটল প্রহরী
দাঁড়াইয়া পথে।

মেঘের শিখর হ'তে ম্লান শশিকলা
চাহে ধরাপানে,
শুষ্ক বায়ু-বিহঙ্গের মৃত পক্ষধ্বনি
পশে যেন কানে।
সৃজন করিছে নিশা সম্মুখে আমার
শত বিভীষিকা,
কি আগ্রহ—কি উল্লাস—তবুও অন্তরে
কি প্রদীপ্ত শিখা !

* Historical Essays and Studies London, 1907, p. 352.

অতিক্রমি দীর্ঘ পথ—উত্তরিনু যবে
তোমার দুয়ারে,
দৃষ্টি তব কি আনন্দ-অমৃত ধারায়
সিঞ্চিল আমারে।
ছুটিল হৃদয় যেন শত বাহু মেলি
বাঁধিতে তোমায়,
আমার সারাটি প্রাণ একটি নিমেষে
সঁপিলাম পায়।
বসন্ত-শোভায় ঘেরা হেরি মুখখানি
বিমুগ্ধ নয়নে,
একি পুণ্যফল—একি আশাতীত সুখ
আমার জীবনে!

প্রভাতের বায়ু, হায়, জাগাল হৃদয়ে
বিদায়ের ব্যথা,
চুম্বনে তোমার একি মদির আবেশ
নেত্রে আকুলতা।
বাহিরিনু পথে—দুটি বিষাদ-আনত
জলভরা চোখে
চাহিয়া রহিলে শুধু তুমি মোর পানে
প্রভাত-আলোকে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

তালাজার গুহা

আমি ঐতিহাসিক নহি এবং প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করার স্পর্দ্ধাও আমার নাই। কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল—যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। ভরসা করি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই অনধিকারীকে ক্ষমা করিবেন।

তালাজা ভবনগর রাজ্যের অন্তর্গত ও তালাজা নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদী সেত্রুঞ্জী নদীর অন্যতম করদ নদী। তালাজা সহরের কিছু দূরেই সেত্রুঞ্জী নদী সাগরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। অন্যান্য পাহাড়িয়া নদীর

ন্যায় এই নদীর স্রোতের বেগ খুব প্রবল ও সময়ে সময়ে এই নদীতে জল এত বেশী হয় যে, দুই তীর একেবারে ভাসিয়া যায়। কিছু বৃষ্টি হইলে কেহই এই নদীর এক পার হইতে অপর পারে যাইতে সাহস করে না। এই স্থানটি বেশ সমৃদ্ধিশালী এবং ভবনগর হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। ভবনগর সহর হইতে এইস্থানে গমন করিবার জন্য বেশ সুন্দর এক রাস্তা আছে ও ত্রাপাজ নামক আর এক সুন্দর স্থানও এই রাস্তার পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। ভবনগরের মহারাজা একজন সুপ্রসিদ্ধ শিকারী ও শিকারের উদ্দেশ্যে তিনি মাঝে মাঝে ত্রপাজে অবস্থান করেন।

তালাজা সহর পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই সহরের পাহাড়ের শৃঙ্গে এক অতি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে ও অনেক দূর হইতেই এই মন্দির পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় ও সে যে সহরে আগতপ্রায় সেই সংবাদ তাহাকে জ্ঞাপন করে। এই মন্দির জৈনমন্দির; ইহাতে পার্শ্বনাথের পূজা হইয়া থাকে। তালাজা জৈনদের এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। যে পাহাড়ের মস্তকে এই মন্দির স্থাপিত সেই পাহাড়ে কতকগুলি গুহা আছে। ইহাদের কয়েকটির আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়।

তালাজার প্রস্তরের নাম বসল্ট (basalt)। কলিকাতার রাস্তাতে যে পাথরের খোয়া দেওয়া হয় এ পাথরও তাহাই। এই পাথর বেশ শক্ত। সুতরাং ইহাতে গুহা প্রস্তুত করা যে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।—যে সমস্ত পাহাড়ের শিখরদেশে দেবমন্দির স্থাপিত, সেই সমস্ত পাহাড়ে উঠিবার জন্য যেরূপ সোপানশ্রেণী থাকে, এ পাহাড়েও ঠিক তাহা আছে। পাহাড়ের উচ্চতাও খুব কম, কয়েকশত ফিট মাত্র। সুতরাং এই পাহাড়ে আরোহণ মোটেই কষ্টদায়ক নহে। এই পাহাড়ের নানা দিকে কয়েকটি গুহা আছে। সমস্ত গুহা দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই, কারণ সময়ের অল্পতা।

এই সমস্ত গুহা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে যেগুলি আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি সেগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে Captain Fulljames সর্ব্বপ্রথম ইহাদের বিবরণ প্রকাশ করেন। (১) তাঁহার প্রবন্ধেরই সাহায্যে একটী বড় এবং আর কতকগুলি ছোট গুহার বিবরণ আমরা জানিতে পারি। তৎপরে Captain Watson কতিপয় গুহার

(১) Journ. Bomb. Asiat. Soc. vol I. পৃঃ ৩২—

বর্ণনা প্রকাশ করেন (২) ও বলেন যে আকার ও গঠন-প্রণালীভেদে গুহাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে তিনি ৭টী গুহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে গুহাসমূহ বৌদ্ধধর্ম্মী দ্বারা নির্ম্মিত। অতঃপর Captain Burgess কয়েকটী উহার বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। ৩

গুহাগুলি পাহাড়ের গায়ে, কোনটি উচ্চ বা অপর কোনটী নিম্নে খোদিত হইয়াছে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করিলেই দুইটী গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটীর মধ্যে যেটী বড় সেটী বামদিকে ও কিছু উচ্চে স্থাপিত। এইটিকে দেখিয়া মনে হয় যেন ইহা একটী বারান্দাওয়ালা বড় ঘর। ইহার অভ্যন্তরে বেশ বড় এক হল ও সেই হলের দুই দিকে ছোট ছোট কুটুরী। প্রত্যেক দিকে ৪টী করিয়া মোট ৮টী কুটুরী আছে এবং ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই বৃহৎ গুহার দক্ষিণ দিকেও একটী কুটুরীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুহা খুব বেশী উচ্চ নহে—৮।১০ ফিট মাত্র। এই গুহার ও তদভ্যন্তরস্থ হল প্রভৃতির আয়তন নিম্নে প্রদত্ত হইল। উভয় দিক দিয়া এই গুহাতে প্রবেশ করিতে হয়।

(ক)	বারান্দা		= ১৯৮´ × ১৩১´
(খ)	হল		= ৪৪২´ × ১৯৮´
(গ)	পূর্ব্বদিকের কুটুরী	(১)	= ১৩২´ × ১২৭´
(ঘ)	,, ,,	(২)	= ১২৩´ × ১২৭´
(ঙ)	,, ,,	(৩)	= ১৩১´ × ১২৭´
(চ)	,, ,,	(৪)	= ১২২´ × ১২৭´
(ছ)	দক্ষিণ-দিকের কুটুরী		= ১৭০´ × ৯৯´
(জ)	পশ্চিমদিকের কুটুরী	(১)	= ৯৯´ × ১২৮´
(ঝ)	,, ,,	(২)	= ১৩২´ × ১২৮´
(ঞ)	,, ,,	(৩)	= ১১৫´ × ১২৮´
(ট)	,, ,,	(৪)	= ৬৬´ × ১২৮´

(২) ,, ,, ,, vol IX. pp. XIX-XL,

(৩) Report on the Antiquities of Kathiawad and Kachh (1874-75) পৃঃ ১৪৭—১৪৯

এই গুহাতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইত প্রত্নতত্ত্ববিৎ তাহা স্থির করিবেন। এই গুহার নিম্নে যে গুহা আছে তাহার সম্মুখদেশে অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক স্থান ও উপরে ছাদ আছে। এই গুহাতে দুইটী কুটুরী আছে এবং ইহাদের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল তাহা এখনও বিদ্যমান আছে।

এই দ্বিতীয় গুহা বামদেশে রাখিয়া ও পাহাড়ের ধার দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে এই পৰ্ব্বতস্থ সর্ব্বাপেক্ষা বড় গুহাতে উপনীত হওয়া যায়। এই গুহাতে কোনও কুটুরী নাই এবং ইহার আয়তন ৭৮´ (পূ-প) × ৬৯´ (উ-দ)। এই গুহার নাম এভাল মন্দির বা এভাল-মণ্ডপ। প্রবাদ আছে যে, এই গুহার মধ্যদেশে এক সিংহাসন ছিল—কিন্তু পরে সেই সিংহাসনের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। এই বৃহৎ গুহার মুখ পশ্চিমদিকে এবং ইহার পুরোভাগে ৫টী বৃত্তখণ্ড (arch) ছিল, তন্মধ্যে ২টী এখনও অতি সুন্দর অবস্থাতেই আছে। এই গুহার ৫টী স্তম্ভ ছিল—ইহাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। এই বৃহৎ গুহার সম্মুখেই ৩টী কুটুরী ও একটী বড় গহ্বর খোদিত আছে এবং এই বৃহৎ গুহা হইতে নিম্নে পাহাড়ের পাদদেশে যাইবার জন্য একটী রাস্তার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রবাদ যে রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক এই গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল ও এই গুহাতে ওয়ালার (Wala) রাণা এভাল (Ebhal) ১৬০০ কুমারীর পরিণয় কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে যে কন্যার পরিণয় সম্পাদিত হয়, সেই কন্যার নাম মোবী। এতগুলি বিবাহ অবশ্য অত্যন্ত সমারোহের সহিত নিৰ্ব্বাহিত হইয়াছিল এবং উপরে যে বৃহৎ গহ্বরের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই গহ্বর এই সমস্ত বিবাহের ঘৃতকুণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল ও পার্শ্বস্থিত ৩টী কুটুরীতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহার্য্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ওয়াটসন ও বার্জেস এই গুহা সম্বন্ধে কিম্বদন্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু এই সমস্ত কিম্বদন্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ওয়াটসনের লিখিত প্রবাদ অনুসারে এই গুহাতে এক সহস্র কুমারীর পরিণয় কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। মিঃ বার্জেস বলেন যে, এই গুহাতে এভল রাজা কেবলমাত্র তাঁহার নিজ কন্যার পরিণয় কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। ওয়াট্সন এই মন্দিরের যে আয়তন দিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। এই মন্দির ১৭।১৮ ফিট উচ্চ হইবে।

এই মণ্ডপ দেখিয়া, সর্ব্বপ্রথমে যে গুহার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই গুহার নিকট ফিরিয়া আসিতে হয় ও তৎপরে সেই গুহা দক্ষিণে রাখিয়া কিছুদূর উঠিলে পর একটী ছোট গুহা পাওয়া যায়। প্রবাদ যে এই গুহাতে সৌরাষ্ট্র কবি নরসিং

মেটা বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাদান করিতেন। এই গুহা অতিক্রম করিলে অপর একটী গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুহাটি অনেকাংশে প্রথমোক্ত গুহার ন্যায়। ইহার ভিতরে ছোট ছোট কুটুরী আছে—কিন্তু সংখ্যাতে একদিকে ৩টী ও অপর দিকে ৪টী। এই গুহার দক্ষিণ দিকেও পূর্ব্বোক্ত গুহার ন্যায় এক বড় কুটুরীর চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই গুহার সম্মুখে দুইপার্শ্বে বাঁধান কূপ আছে। প্রবাদ যে দেরাণী জোঠানি নামক কোনও পরাক্রান্ত ব্যক্তির দুই স্ত্রী এই গুহাতে বাস করিতেন।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর দুইটী গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যেটী বৃহৎ সেটির অভ্যন্তরে ৭০"×৭০"×৩১" এক বেদী আছে। এই গুহার নাম "হাতিয়া (ড়) ঘড়" এবং প্রবাদ যে এই গুহাতে সিদ্ধিগণ তাহাদের হাতিয়াড় প্রভৃতি রক্ষা করিত। এই গুহার আয়তন ৪৬'৩"×৪১,"। এই গুহা অতিক্রম করিয়া আসিলে একটী ছোট গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত গুহা ব্যতীত আরও ২।৪টী গুহা এই পাহাড়ে আছে বলিয়া আমি অবগত হইয়াছি ; কিন্তু সময়াভাবে সেগুলি পরিদর্শনের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। এই সমস্ত গুহার উৎপত্তি ও কাল সম্বন্ধে বার্জেস যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বার্জেস বলেন "The...general arrangements of these caves are sufficient indications of their being Buddhist works, and though we have no very definite means of determining their antiquity, yet from the simplicity of their arrangements and—except that already mentioned on the fasade of the Ebhal mandap—from the entire absence of sculpture, such as is common in all later Buddhistic caves, we may relegate them to a very early age, probably before the Christian era, and possibly even to the age of Asoke or soon after."

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ-গুপ্ত।

সতীন-পো।

গল্প।

(১)

ঘটনাচক্রে তিনিই আমার পাণিগ্রহণ করিলেন ; কিন্তু কত ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর !

পূর্ব্বের একটু ইতিহাস আছে। জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছি। কতবার দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা কে করিবে ? তিনি দাদার সমবয়স্ক ও সহপাঠী। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের একটা বন্ধন ছিল। গ্রামের প্রতাপান্বিত জমীদার ব্রজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান, আদরের দুলাল হইলেও তিনি আমাদের পর্ণকুটীরে প্রায়ই আসিতেন। আমার পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বহু বিষয়ে জমীদার বাবুর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। শুনিয়াছি বৃদ্ধ ব্রজমোহন বাবুও বাবাকে স্নেহ করিতেন।

দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম বটে ; কিন্তু সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার দেহে রূপলাবণ্য না কি অজস্রধারে ঢালিয়া দিয়াছিলেন ; অন্ততঃ গ্রামের সকলে সেই কথাই বলিত। তখন রূপের মহিমা বুঝিবার বয়স হয় নাই। তবে গ্রামের লোক যখন আমার বর্ণরাগ ও অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রশংসা করিত, তখন লজ্জায় কুণ্ঠিত হইলেও মনের মধ্যে যে একটা গর্ব্বভাবের উদয় না হইত, এমন কথা বলিতে পারিব না। বালিকা বয়সে কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন বুঝিতেছি, উহা মানুষের স্বধর্ম্ম।

জমীদার মহাশয় একদিন আমাকে দেখিয়া অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন। তারপর বাবাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে রামগোপাল, তোমার মেয়েটি বড় চমৎকার ত ! ঠিক যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা ! ভারি সুন্দর ! আমার বিরুর সঙ্গে বেশ মানায়, কেমন নয় হে ?" অনেক দিন আগের কথা হইলেও সমস্তই আমার বেশ মনে আছে। সে প্রশ্নের বাবা কি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে পাই নাই। কারণ তখনই আমি ছুটিয়া পলাইয়াছিলাম। তখন আমার সবে আট বৎসর বয়স ; কিন্তু সেই বয়সেই আমার বুঝিবার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছিল।

এই ঘটনার পর আমি তাঁহার সম্মুখে পড়িলেই ছুটিয়া একদিকে পলায়ন করিতাম। বিবাহ জিনিসটা যে কি, সে বয়সে সম্পূর্ণরূপে তাহা বুঝি নাই।

তবে বিবাহের সঙ্গে যে লজ্জার ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে, কেহ না বুঝাইয়া দিলেও বাঙ্গালীর মেয়ে তাহা অল্প বয়সেই বুঝিয়া লয়; তজ্জন্য পরামর্শ দিবার প্রয়োজন হয় না।

সঙ্গিনীদিগের সহিত প্রত্যহই শিবপূজা করিতাম। ঠাকুরের মাথায় পুষ্পাঞ্জলি ও জলধারা অর্পণ করিবার সময় মনে মনে তাঁহার মূর্ত্তি ও নাম মনে করিয়া বলিতাম, "হে শিব ঠাকুর! ইহার সঙ্গেই যেন আমার বিয়ে হয়।" আট বৎসরের মেয়ে স্বামী কামনা করিয়া শিবপূজা করে, এ কথা শুনিয়া অনেক আধুনিক শিক্ষিত পুরুষ হয়ত চমকিয়া উঠিবেন, অবিশ্বাসভরে হাসিবেন; কিন্তু কোন বঙ্গরমণী, বিশেষতঃ পল্লিবাসিনী ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই পাইবেন না।

প্রত্যহ শিবপূজা করিতাম বটে; কিন্তু মাটীর ঠাকুর বালিকার প্রার্থনা শুনিলেন না। গরীব দুঃখীর কথা জগতে কেই বা শুনে? একদিন শুনিলাম, উনিশ বৎসরের ছেলের সঙ্গে আট বৎসরের মেয়ের বিবাহ হইলে মোটেই মানাইবে না। এত ছোট মেয়ে বধূ রূপে গ্রহণ করা আত্মীয় স্বজন কাহারও অভিপ্রেত নহে, বিশেষতঃ গৃহিনীশূণ্য জমীদার-ভবনে বয়স্থা কন্যাই প্রয়োজন। আসল কথা কি তাই? প্রবল প্রতাপশালী, ধনকুবের জমীদারের একমাত্র বংশধরের সহিত গরীব, হতভাগ্য রামগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ হইলে যে অবটন ঘটিবে! বোধ হয় সেইজন্যই প্রস্তাব উপেক্ষিত হইয়াছিল।

অবশ্য আমার পিতামাতা এ সংবাদে মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন; দাদারও মনে আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহাদের দীর্ঘশ্বাস ও ম্লানমুখ তাহা ব্যক্ত করিয়াছিল। আর আমার কথা? সে কথা শুনিয়া লাভ কি? আট বৎসরের মেয়ের মনে এরূপ সংবাদে যেরূপ চাঞ্চল্য হওয়া স্বাভাবিক তাহাত হইয়াছিলই!

যথাসময়ে অন্যত্র তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। সে বিবাহের নিমন্ত্রণে আমরাও গিয়াছিলাম। নববধূর বয়স চৌদ্দ বৎসর।

বিবাহের দুই বৎসর পরে জমীদার-গৃহে নবকুমারের জন্মোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে শোকের ছায়া ঘনীভূত হইল। পৌত্রমুখ দর্শন করিবার কয়েক দিবস পরে বিপত্নীক বৃদ্ধ জমীদার মহাশয় ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

দারিদ্র্যের সহস্র দুঃখ সহ্য করিয়াও আমাদের একরূপে চলিতেছিল। দাদা তখনও পাঠ্যাবস্থায়, আইন পরীক্ষার গুরুভারে নিপীড়িত। এইরূপে আরও ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। শোক কাহাকে বলে জানিতাম না; কিন্তু প্রলয় ঝটিকার ন্যায় প্রবলবেগে মহামারী গ্রামের মধ্যে যখন প্রবেশ করিল, তখন

শোকের দাহ কি ভীষণ তাহা বুঝিলাম। পিতৃবিয়োগ শোকে যখন আমরা কাতর, সেই সময় শুনিলাম জমীদার বাটীর নূতন গৃহিণীও একমাত্র পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মহামারী একমাস কাল প্রবল প্রতাপে গ্রামের মধ্যে রাজত্ব করিয়া অন্তর্হিত হইল। বহু গৃহ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল।

এতদিন আমার বিবাহের ফুল ফুটিয়াও ফুটে নাই। গরীবের মেয়ের অদৃষ্টে সুপাত্র প্রায়ই জুটে না। পিতার সংকল্প ছিল, আমাদের মত কোন হতভাগ্যের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবেন না। দুঃখী পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে তিনি আদৌ সম্মত ছিলেন না। গ্রামবাসীরা এজন্য প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষ-ভাবে কত তীব্র বিদ্রূপ ও কঠোর সমালোচনা করিত! মা কত কাঁদিতেন। বাবা বলিতেন, "কাঁদ কেন? আমরাই হতভাগা; আবার আজীবন নরকযন্ত্রণা ভোগের জন্য মেয়েটাকে আর এক হতভাগ্যের স্কন্ধে নিক্ষেপ করি কেন? অপাত্রে কন্যা-দান করিব না। জাত ইজ্জত যদি তাহাতে নাই থাকে, উপায় কি? একটা জীবনের উপর দিয়াই যাইবে। তাই বলিয়া জানিয়া শুনিয়া মেয়েটাকে জলে ফেলিয়া দিতে পারিব না।" কিন্তু কোন সুপাত্র আমার সীমন্তে নারীজাতির শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ আঁকিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইল না। সময় কাহারও মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না; মাতার অশ্রুজল, বাবার দীর্ঘশ্বাস, আত্মীয় স্বজনের আক্ষেপোক্তি কোনও বাধা না মানিয়া সে যথানিয়মে ষড় ঋতুর স্মৃতি লইয়া নির্দ্দিষ্ট রাজ্যে চলিতেছিল। আমার দেহও সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতেছিল। দাদাও বাবার চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম। গৃহকর্ম্মের অবসরে পড়াশুনা লইয়াই থাকিতাম। দাদা ভাল ভাল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আমার জন্য পাঠাইতেন। কাহারও সম্মুখে বড় একটা বাহির হইতাম না। দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে কন্যা হইয়া জন্মান যে কত দুর্ভাগ্য তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

পত্নী-বিয়োগের এক বৎসর পরে নবীন জমীদার আবার সংসারী হইবেন; শুনিলাম বয়স্থা কন্যার সন্ধান চলিতেছিল। শেষে একদিন শুনিলাম, আমাকেই তিনি গৃহলক্ষ্মীপদে মনোনীত করিয়াছেন। মা ও দাদা অবিলম্বেই সম্মতি দিলেন। এ সংবাদে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আছে কি?

(২)

প্রজাপতি উভয়ের হস্তে ফুলের বাধন দৃঢ় করিয়া দিলেন। সে দিনের, সে শুভ মুহূর্ত্তের স্মৃতি কি মধুর! আমার কম্পিত উষ্ণ করতল যখন তাঁহার কর-

পল্লবে সমর্পিত হইয়াছিল, তখন হৃদয়-সমুদ্রে কি আলোড়ন ঘটিয়াছিল তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না। তখন মনে হইয়াছিল, চন্দ্রমাশালিনী এই নিশীথিনী অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী, শ্যামা বসুন্ধরা শুধুই পুষ্পগন্ধময়ী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল আনন্দের মন্দাকিনীধারা অবিশ্রান্ত ছুটিতেছে। সারা রজনী শুধু সেই আনন্দস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিলাম।

উত্তেজনা, উদ্দীপনা এবং আনন্দকম্পন শান্ত হইতে না হইতেই শ্বশুরালয়ে নীত হইলাম। পিতৃগৃহ ত্যাগের সময় কন্যার নয়নে অশ্রুধারা শুকায় না; আজন্মের পরিচিত ঘর দুয়ার, স্নেহময়ী জননী, আত্মীয় স্বজন সকলকে ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত রাজ্যে যাইবার সময় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে; কিন্তু সত্য বলিতে কি আমার সে সব কিছুই হয় নাই। আমি যে আমার ইষ্টদেবতা, বাঞ্ছিতের কাছে চলিয়াছি! জ্ঞানসঞ্চারের সময় হইতে সপ্তদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহারই আরাধ্য মূর্ত্তি গোপনে মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছি। যদি তাঁহার সহিত আজ আমার পরিণয় না ঘটিয়া অন্যত্র হইত, বলিতে পারি না জীবন-স্রোত কোন্ পথে চলিত। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছিল আমি তাহাই বলিতেছি। মনের গতি রোধ করিতে পারে কে?

আর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে গৃহ আমার হইতে পারিত, এতদিন পরে ভগবান সেইখানেই আমায় পাঠাইয়া দিলেন। মনে মনে দেবতার চরণে সহস্র-বার প্রণাম করিলাম। আমার হারানিধি আজ ফিরিয়া পাইয়াছি। সাধনার ধন আজ আমার মুষ্টিমধ্যে! কে বলে বিধাতা নির্দ্দয়?

আজ পুষ্পবাসর। জমীদারগৃহে লোকজনের অভাব না থাকিলেও, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বড় কেহ ছিলেন না। মহামারীর প্রকোপে অনেকেই অন্তর্হিত হইয়া-ছিলেন। সুতরাং নববধূ হইলেও লজ্জা করিবার মত বড় একটা কাহাকেও দেখিলাম না। কিন্তু তথাপি সারাদিনের মধ্যে তাঁহার সহিত আমার তেমন করিয়া দেখা হয় নাই।

রাত্রিকালে আহার-শেষে জনৈক দূর আত্মীয়া আমাকে নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে রাখিয়া আসিলেন। আমার সমস্ত দেহ ঘন ঘন শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। অসহ্য আগ্রহভরে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। আজ তাঁহার সহিত নির্জ্জনে প্রথম সম্ভাষণ হইবে! একটা দুঃসহ সুখের বেদনা রহিয়া রহিয়া অন্তরে অনুভব করিতেছিলাম। পুষ্পবাসর!—কাব্যে উপন্যাসে, ইহার কত বর্ণনাই পড়িয়াছি!

অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া চৌকিতে শয়ন করিয়া কক্ষের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, দুগ্ধফেণনিভ শয্যার উপর পুষ্পমালা সযত্নে রক্ষিত। টেবিলের উপর একটি সুদৃশ্য, বৃহৎ ফুলদানীতে প্রকাণ্ড একটি ফুলের তোড়া। ঘরের বাতাস ফুলের ঘন সুগন্ধে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

একটু পরেই তিনি—আমার দেবতা আসিবেন। কি বলিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিব? পৃথিবীর সব লজ্জা নিঃশেষ করিয়া আমারই অন্তর মন্দিরে কে স্তূপীকৃত করিয়া দিয়াছে? মাথা তুলিয়া চাহিতে পারিতেছি না কেন?

সহসা মৃদুপদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দ্বার রুদ্ধ করিবার শব্দ কানে গেল। মুহূর্ত্তে রক্তস্রোতের দ্রুত সঞ্চারণ শরীর মধ্যে অনুভব করিলাম। হৃদয়ে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইল। মস্তক ধীরে ধীরে আরও অবনত হইয়া পড়িল।

অকস্মাৎ চিরবাঞ্ছিতের পুলকস্পর্শে শিহরিয়া উঠিলাম। ধ্বনিরই সুর আছে জানিতাম; কিন্তু স্পর্শেও সে সব থাকিতে পারে তাহা আজ বুঝিলাম। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সেই বিচিত্র স্পর্শে ও সুরে মোহাবিষ্ট হইল।

এক হস্তে আমার অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া অন্য হস্তে তিনি চিবুক তুলিয়া ধরিলেন। আমি দৃঢ়শক্তিতে নয়ন মুদ্রিত করিলাম। কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম জানি না। তাঁহার কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গিল। শুনিলাম তিনি বলিতেছেন, "আমার দিকে চাও।"

দুই চারিবার চেষ্টার পর চাহিলাম। তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে পারি কি? উজ্জ্বলালোকে তাঁহার নয়নের সহিত আমার দৃষ্টি মিলিত হইল। আবার লজ্জা আসিয়া আমাকে অভিভূত করিল। দেখিলাম, একদৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে চাহিয়া আছেন।

আমার কম্পিত করপুট গ্রহণ করিয়া তিনি মৃদুস্বরে, স্নেহকোমলকণ্ঠে বলিলেন, "সুষমা, আমাদের এই পবিত্র মিলনের দিনে, আমি তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাই। আমার বড় আদরের, বড় স্নেহের উপহার। লইবে কি?"

লজ্জায় আমি এতটুকু হইয়া গেলাম। তাঁহার প্রদত্ত উপহার আমি লইব না? তিনি যে আমার সর্ব্বস্ব! তাঁহার সামান্য দানও যে আমার মাথার মণি; সে কথা বুঝাইয়া বলিবার মত ভাষা ও শক্তি যে আমার নাই; কিন্তু তবু লজ্জায় আমার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল।

বোধ হয় তিনি আমার চকিত দৃষ্টিতে ও ব্যবহারে আমার অন্তরের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "একটু ব'স, আমি এখনই আসিতেছি।"

পদশব্দে বুঝিলাম তিনি বাহিরে যাইতেছেন। অবগুণ্ঠনের পরিসর বাড়াইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বক্ষস্পন্দন এখনও থামিতেছি না কেন?

আবার তাঁহার পদশব্দ শুনিলাম। নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, "এই লও, সুষমা! আমার বিশ্বাস, এ স্নেহোপহার তুমি সাদরে লইবে।"

সহসা চমকিয়া উঠিলাম। অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে দেখিলাম, একটি বালককে তিনি ক্রোড় হইতে নামাইতেছেন। এ কে?—বুঝিলাম, বালক তাঁহারই সন্তান, আমার সপত্নী-পুত্র!

হৃদয়মধ্যে, জানি না কেন, অকস্মাৎ একটা আঘাত অনুভব করিলাম। কিন্তু ছিঃ! আমি এত নীচ? মুহূর্ত্তে হৃদয়ের গতি রুদ্ধ করিলাম। এ যে তাঁহারই দান, শ্রেষ্ঠ উপহার। ভগবান! আমি যেন নারীর মর্য্যাদা, মাতৃত্বের গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারি!

সাত বৎসরের বালক বিস্মিত ভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কে বাবা? নতুন বউ?"

তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন। সহসা সমুদয় তুচ্ছ লজ্জা ঠেলিয়া ফেলিয়া, মৃদুস্বরে বলিলাম, "আমি তোর মা।"

বালক গর্ব্বিত ভাবে বলিল, "তুমি আমার মা কেন হবে? তিনি যে স্বর্গে গেছেন।"

হৃদয়ে একটা ব্যথা পাইলাম; কিন্তু সে আঘাত সহ্য করিয়া বলিলাম, "তিনি ত তোমার মা; কিন্তু আমিও তোমার মা।"

বালক সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি মার মত আমায় ভালবাস্‌তে পারবে না।"

মাতৃহারা সন্তানের কথা সেদিন ভাল করিয়া বুঝি নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম বটে। কিন্তু তখন তাহার কথায় বিরক্তি জন্মিল। তথাপি প্রসন্নহাস্যে বলিলাম, "তা বাস্‌বো। তুমি আমার কথা শুনবে?"

বালক বলিল, "কথা আমি কারও শুনি না। কেমন বাবা, না?"

তিনি দূরে বাতায়ন-সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছিলেন। ধীরে ধীরে বালকের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "রাত হয়েছে, চল, এবার গিয়া ঘুমাও।"

(৩)

জ্যোৎস্না-প্লাবনে শ্যামা মেদিনী হাসিতেছে। ভাদ্রের ভরানদীর ন্যায় আমারও হৃদয় আজ কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। বহু দুঃখের পর সুখের

আনন্দের সমুদ্রে অবগাহন করিতেছি ; অজস্রধারে বিধাতার আশীর্ব্বাদ আমার শিরে বর্ষিত হইয়াছে, কাজেই দিন দিন আনন্দের জোয়ার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। বিবাহের পর ছয়মাস কি সুখেই চলিয়া গিয়াছে! এখনও চলিতেছে।

পিতৃগৃহে, পর্ণকুটীরে কাজের অন্ত ছিল না, তাহাতেই মগ্ন থাকিতাম; স্বামীগৃহে আসিয়াও কাজ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। কিন্তু স্বামী অনেক সময় বহু গৃহকার্য্য হইতে আমায় বঞ্চিত রাখিতেন। দাস দাসী থাকিতে সকল কাজ করিবার প্রয়োজন কি? অনেক সময় তাঁহার সাহচর্য্যে যাপন করিতাম। নানাবিধ পুস্তক পাঠে দীর্ঘ অবসর চলিয়া যাইত।

স্নিগ্ধ মধুর সন্ধ্যায় নির্জ্জনে বসিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতেছি, সহসা পেচার মা আসিয়া বলিল, "বড় দস্যি ছেলে, বাবু! মা, পেমার সখের কাঁচের ফুলদানিটা ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেলেছে, দেখ্‌বে এসো।"

খোকার দৌরাত্ম্য রোজই বাড়িয়া চলিয়াছে। আদরের আতিশয্যে তাহার স্বভাব বিগড়াইয়া গিয়াছে। তাহাকে একটু শাসন করা দরকার।

তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নামিয়া নীচে আসিলাম। ঘরের মধ্যে খোকা তখনও ছুটাছুটি করিতেছিল, আমায় দেখিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। গৃহতলে ফুলদানীর চূর্ণখণ্ডগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সত্যই মনে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল।

"খোকা, এ কি করেছ?"

সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল,"হাত লেগে ভেঙ্গে গেছে, কি করবো?"

"তুমি দিন দিন বড় দুষ্ট হচ্ছো, খোকা। এখন থেকে ও রকম দুষ্টামি করতে পাবে না ; যা বারণ করে দেবো, তা করো না, বুঝেছ?"

কেন, না?"

বাস্তবিক এমন ভয়লেশশূন্য ছেলে আমি কোথায় দেখি নাই। এখন হইতে তাহার দোষ সংশোধন না করিয়া দিলে, পরিণাম ভাল হইবে না।

আমি বলিলাম,"যা বলি, মন দিয়ে, শোন। মন্দ কাজ আর কখনও করো না। যখন আমি যা বল্‌বো, তা তোমার শুনতে হবে।"

খোকা স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "ওসব আমার ভাল লাগে না।"

"তোমার ভাল লাগুক, আর নাই লাগুক, তোমায় যা বলবো তা করতেই হবে, বুঝেছ?"

বোধ হয় আমার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা ও মুখভঙ্গী দেখিয়া সে বিচলিত হইল। কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার আর সাহস রহিল না। মৃদুকণ্ঠে খোকা বলিল, "আচ্ছা, শুন্‌বো।"

আমি তখন খোকার হাত ধরিয়া বলিলাম, "এখন বাইরে যাও, বোধ হয় মাষ্টার মহাশয় এসেছেন। মন দিয়া পড়া শুনা করগে। পচার মা, খোকাকে সঙ্গে করে নিয়ে যা।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে স্বামী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। খোকা বিরস বদনে চলিয়া গেল। স্বামী বলিলেন, "কি হচ্ছিল?"

ফুলদানীর চূর্ণ খণ্ডগুলি তুলিতে তুলিতে বলিলাম, "দেখ না, খোকার কাণ্ড! বড় দুষ্ট হচ্ছে।"

কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ সুষমা, খোকা বেশী আদর পেয়ে সত্যই একটু দুষ্ট হয়েছে; কিন্তু আমার অনুরোধে তুমি তার প্রতি রূঢ় বা কর্কশ ব্যবহার করো না। কেউ খোকার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিলে আমি তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারি না।" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইল।

আমার হৃদয়ে কে যেন শেলাঘাত করিল। খোকাকে যে আমি সতীনপোর মত দেখি না, সে যে ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ে অধিকার বিস্তার করিতেছে, এ কথাটা তিনি বুঝিলেন না কেন? আমি ত ভ্রমেও তাহার প্রতি বিমাতার মত আচরণ করি না! তবে কেন তিনি আজ আমার হৃদয়ে এ আঘাত করিলেন? নারীর স্বাভাবিক দুর্জ্জয় অভিমান মুহূর্ত্তমধ্যে আমার হৃদয় ছাইয়া ফেলিল। এই ভরা যৌবনের বিচিত্র ফাঁসে, রূপের মোহনিগড়ে যাঁহাকে দাসানুদাস করিয়া রাখিবার অধিকার পাইয়াছি, তিনি কি না আজ আমার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন? ইচ্ছা হইল, তাঁহার সন্তানের উপর যথার্থই বিমাতার প্রভাব কিরূপ তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দেই, প্রতিশোধ লই। কিন্তু শয়তানের সে প্রলোভনে মুগ্ধ হইলাম না। যিনি আমার আরাধ্য দেবতা, আমার সর্ব্বস্ব, আমার ইহকাল ও পরকাল, তাঁহাকে নীচতার, ক্ষুদ্রতার পঙ্কিল হ্রদে ঠেলিয়া ফেলা সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য নহে। স্বামীর নৈতিক অধঃপতনে প্রশ্রয় দিবার অধিকার স্ত্রীর নাই। শয়তান! দূর হও, আমার হৃদয়ে তোমার স্থান নাই! মনের গতি রুদ্ধ করিয়া পাপ-কামনাকে হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলাম। শান্তভাবে বলিলাম, "খোকা কি আমার স্নেহের ধন নয়? পাছে সে খারাপ

হইয়া যায়, এজন্য তাহাকে একটু আদটু তিরস্কার করি। কিন্তু তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও তবে আর বলিব না।"

স্বামী বলিলেন "তুমি যে তার মঙ্গলের জন্যই তিরস্কার কর, তা কি জানি না, সুষমা? কিন্তু তবু—তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, ঐটুকুই তার শেষ চিহ্ন।"

বুঝিলাম, কোথায় তাঁহার ব্যথা। এতদিন একেবারেই যে না বুঝিয়াছিলাম তাহা নহে; কিন্তু আজ সব ঘোর কাটিয়া গেল। হৃদয়ে একটা সুখের বেদনা বাজিল। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় আরও ভরিয়া উঠিল। বড় পুণ্যবতী তিনি, তাই স্বামীর এমন প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমিও কি কেহ নহি?

স্বামী বলিলেন, "এখানে খোকার লেখাপড়ার সুবিধা হইতেছে না। আমার ইচ্ছা কলিকাতায় গিয়া উহার পড়াশুনার ভালরকম বন্দোবস্ত করিয়া দিই; তুমি কি বল?

আমি বলিলাম; "এ কথা আমি তোমাকেও বলিব ভাবিয়াছিলাম। সত্যই এখানে খোকার লেখাপড়ার সুবিধা হইতেছে না।"

(৪

সারারাত্রির ঘন বর্ষণেও আকাশের মেঘের ঘোর কাটে নাই। বেলা নয়টা বাজিয়া গেল, তখন বারিপাত হইতেছিল না বটে; কিন্তু আকাশে মেঘ থম্ থম্ করিতেছিল। বাদ্‌লা বাতাস হু হু করিয়া বহিতেছিল, তখনও শ্রান্ত হইয়া পড়ে নাই। স্বামী দ্বিতলে বসিয়া পড়িতেছিলেন। কলিকাতার রাজপথ, কর্দ্দমাক্ত, পিচ্ছিল, অপ্রিয়দর্শন।

খোকা তখনও মার্ব্বেল খেলিতেছে দেখিয়া বলিলাম, "বেলা হয়ে গেল, স্কুলে যাবে না?"

সে একবার আমার দিকে চাহিয়াই মস্তক নত করিল। মৃদুস্বরে বলিল, "আজ বড় বাদ্‌লা মা!"

"তা হোক্। স্নান করে খেয়ে নেও। স্কুল কামাই করা ভাল নয়।"

ইদানীং খোকা আমার বেশ বাধ্য হইয়াছিল। যাহা বলিতাম তাহাতে আপত্তি করিত না। তাহার একগুঁয়ে ভাবটা অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। লেখাপড়ায় বেশ মনোযোগ দেখা যাইতেছিল। কলিকাতায় আসিবার পর

হইতে আমি তাহাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। অধিকাংশ বিষয়ে সে আমার আদেশ নতশিরে পালন করিত। কিন্তু আজ সে কেবলই আপত্তি করিতে লাগিল। আমি নিজে তাহাকে স্নান করাইয়া দিলাম। আহারাদির পর কাপড় পরাইয়া দিলেও সে বাহানা ধরিল, আজ সে স্কুলে যাইবে না। তাহার ভাল লাগিতেছে না। পথে কাদা, দিনটা বিশ্রী ইত্যাদি। আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, স্কুল বেশী দূরে নয়, বিহারী চাকর তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবে। কিন্তু খোকার আজ যে কি হইয়াছে, কিছুতেই তাহাকে ঘরের বাহির করিতে পারিলাম না। নানা মিষ্ট কথা বলিলাম, আদর দেখাইলাম ; কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজী করিতে পারিলাম না।

এমন সময় স্বামী স্নান সারিয়া সেই ঘরে আসিলেন। আমি তাহাকে দেখিয়া একটু দৃঢ়স্বরে বলিলাম "তোমাকে স্কুলে যেতেই হবে। যাও, আর দেরী করো না।"

আমার দৃঢ়তা দেখিয়া এবার খোকা আর আপত্তি করিল না। ধীরে ধীরে বই খাতা তুলিয়া লইল। বিহারী চাকর তাহার সঙ্গে চলিল। খোকা নত মস্তকে স্কুলে চলিয়া গেল।

আহার শেষে স্বামী উপরে চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার পাতে প্রসাদ পাইতে যাইতেছি এমন সময় বাহিরে একটা গোল উঠিল। দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দ্বারপথে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন আবার বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, বাতাসের বেগও বাড়িয়াছে।

এ কি ? বিহারী খোকাকে কোলে করিয়া আনিতেছে ; দ্বারবানও তাহার সঙ্গে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি ছুটিয়া গেলাম, দেখিলাম, খোকার সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত, ললাটের একপ্রান্তে ও কি ? ক্ষীণ রক্তধারা !

খোকাকে বুকে তুলিয়া লইলাম। বিহারী বলিল, "খোকাবাবু হঠাৎ পা পিছলে ফুটপাতের উপর পড়ে গিয়েছিল। আমি পেছনে ছিলাম, ধরবার আগেই মাথাটা জোরে বাঁধান পাথরের উপর লেগে কপালের খানিকটা কেটে গিয়েছে !"

হায়, কেন বাছাকে জোর করে স্কুলে পাঠালেম। বেদনায় আমার শরীরের সমস্ত শিরা গুলি টন্ টন্ করিয়া উঠিল। খোকা বলিল, "মা হঠাৎ, পড়ে গিয়েছিলুম্, স্কুল কামাই হয়ে গেল। তুমি আমায় বক্‌বে না, মা ?"

পরম স্নেহে তাহাকে বুকে চাপিয়া বলিলাম, "কেন বক্‌বো বাবা ? তুই যে

আমার স্নেহের ধন।"

"মা, তুমি বড় ভাল। এমন করে কোন দিন তুমি আমায় ডাক নাই। বাবাকে তুমি যেমন করে রোজ আদর কর, আজ আমায় সেই রকম আদর কচ্ছো। বড় ভাল মা, তুমি।"

আমার বুকের মধ্যে ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিল। তাহার কর্দ্দমলাঞ্ছিত আনন আমি চুম্বনে ঢাকিয়া দিলাম। বালকের মস্তক ধীরে ধীরে আমার বক্ষে ঢলিয়া পড়িল।

বোধ হয় গোলযোগ স্বামীর কর্ণে পহুছিয়াছিল। তিনি দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিলেন। খোকাকে তদবস্থ দেখিয়া তিনি একবার আমার দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তারপর বাহু বাড়াইয়া বলিলেন, "ওকে আমার কোলে দাও।"

আমি বলিলাম, "তুমি উপরে চল। আমি খোকাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "না, আমায় দাও।" বলিয়াই তিনি আমার বাহু বন্ধন হইতে খোকাকে মুক্ত করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

আমি যেন এতটুকু হইয়া গেলাম।

৫

বৈকালে খোকার প্রবল জ্বর হইল। ডাক্তার আসিলেন। শুনিলাম বাহিরে কিছু দেখা না গেলেও মস্তিষ্কে গোলযোগ ঘটিয়াছে। রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে।

কাহারও কথা শুনিলাম না। রোগশয্যার পার্শ্বে স্থায়ী স্থান গ্রহণ করিলাম। আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—সে কি যন্ত্রণা, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। খোকা আমার কে ?—সতীন-পো। কিন্তু সে আমার অন্তরতম স্থানের কোন্ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, এতদিন আমিও তাহা জানিতে পারি নাই। সে যে তাঁহার নয়নের মণি, আমার ইষ্টদেবতার স্নেহের ধন, সুতরাং আমারও যে সে কত আদরের, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া অন্যে কি বুঝিবে ? সতীনের কাঁটা, তুলিয়া ফেলিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত হয়; এ কি হইল ? মাতৃত্বের সুধাসিন্ধু আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত, আলোড়িত হইতেছিল, বাহিরের কেহ তাহা জানে না। তিনিই কি জানেন ? আমার হৃদয়ের এ তীব্র যন্ত্রণা, নীরব ব্যথা লোকের কাছে প্রকাশ করিবার নয়। কে বিশ্বাস করিবে ?

দুই দিন দুইরাত্রি জ্বরের ঘোরে খোকা অচৈতন্য। তাহার নিকট হইতে আমাকে কেহ এক পাও নড়াইতে পারিল না,—তিনিও নহে।

তখন প্রথম কনকরশ্মি ঘরের মধ্যে খেলা করিতেছিল। খোকা ধীরে-ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "মা!"

"কি বাবা!"—বাষ্পভরে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। খোকা আমার হাতখানি লইয়া তাহার বুকের উপর রাখিল। আবার তাহার চেতনা অন্তর্হিত হইল। চোখের পাতা দুর্ব্বল। বন্যার স্রোতের বেগ ধারণ করিবার শক্তি কি তাহার আছে?

কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার আসিলেন। কিন্তু কেহই আশ্বাস দিতে পারিলেন না।

সামান্য আঘাতে রোগ এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে পারে, কে জানিত! সেদিন স্বামীর নয়নে যে দৃষ্টি দেখিয়াছিলাম, জীবনে তাহা ভুলিব না।

চারি দিন পরে খোকা, আমার সোনার যাদু, আমারই কোলের উপর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার জননীর ক্রোড় তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। স্বর্গের কুসুম তাহার নির্দ্দিষ্ট রাজ্যে ফিরিয়া গেল। কিন্তু বুকে যে সে কি দাগা দিয়া গেল তাহা কে বুঝিবে?

* * * * *

তার পর আরও পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমিও এখন দুইটি সন্তানের জননী। তিনি সন্তানদিগকে আদর করিতেন বটে, কিন্তু তেমন প্রসন্ন হাসি আর দেখি নাই। বিবাহের পর যেরূপ আবেগ ও প্রেমভরে তিনি আমার সহিত ব্যবহার করিতেন, খোকার মৃত্যুর পর হইতে তেমন ব্যবহার জীবনে আর কখনও পাই নাই। সংসারের যাবতীয় কার্য্য তিনি যথানিয়মে পালন করিতেন, তাহাতে কোন ত্রুটি ঘটিত না; সে শুধু শুষ্ক, নীরস কঠোর কর্ত্তব্য পালন, তাহাতে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের বিন্দুমাত্র অভিব্যক্তি ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, "এখন আমরা ক্রমশই বুড়া হইতে চলিলাম, ওসব আর এখন ভাল দেখায় না।"

বুঝিয়াছিলাম, তিনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করেন নাই; বোধ হয় কখনও করিবেন না। মর্ম্মভেদী এবং দুঃসহ হইলেও তাঁহার এই নীরব দণ্ড আমি বিনা প্রতিবাদে মাথা পাতিয়া লইয়াছিলাম। স্মৃতির পবিত্রতা তিনি রক্ষা করুন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমিও যেন অকুণ্ঠিতচিত্তে কর্ত্তব্যপালন করিতে পারি।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

লীলা

মনটি আমার রাতের মত আঁধার ;
সেই আঁধারে একটি গীতিই ওঠে,
তপন আবার লয়ে' প্রভাত আশার
—কোমল-কম, কমল সম সোণার,—
মানসরূপী তমস কোলেই ফোটে !

(২)

প্রভাত যখন হয়,
(সোণার) আশার আলোকময়,
তখন এ মন কেমন করে' একে
সংখ্যাবিহীন দেখে ;
কতই না রঙ্, কতই যে ঢঙ্, কতই রকম সে যে !
—বহুরূপী সেজে'
কাছে আসি' পরশ দিয়ে কতই না ভাব করে
—সারাটি দিন জুড়ে ;
হাসায় হাসে, কাঁদায় কাঁদে, বিরূপ হয়েই সাধে ;
ওরে, এম্নি ফাঁদে
নানান্ পাকে জড়িয়ে আমায় নানান্ ছলেই বাঁধে !

(৩)

তারপরে সেই সাঁঝে,—
সব কোলাহল যখন কেবল রঙীণ হ'য়েই রাজে,
নীরদরূপে রুধির রাগে স্বপ্ন-সাগর সাঁতরে ভাগে
ভাবের রাশি যখন গগন মাঝে,
ব্যাকুল বেগে অসীম পানে ধায়গো তা'রা অধীর টানে।
একতারাতে কি গান তখন বাজে ?

সে গান শুনে' ধরার বুকে যতেক বিরোধ যায় রে চুকে ;
গুটিয়ে আসে জালটি তখন ধীরে !
ঝাঁপিয়ে পড়ে সে গান শুনে', ক্রমে, কুহক-মন্ত্র-গুণে
অনেক এসে একের তিমির-নীরে !
আঁধার এ মোর মনটি তখন যাচে সাধের সাধনার ধন ;
—সে যে কেমন, কেমন করে' বলি ?
এমনি করে' আপনা ভুলে' আনন্দেরি তুফান তুলে'
আঁধার-পাথার মন্থি শুধুই চলি।
—কোথায় যে যাই, না পাই দিশা। এমনি করে' দিবস-নিশা
সুধার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়।
অন্তবিহীন, শ্রান্তিহারা এ রঙ্গ তা'র কেমন ধারা ?
ধরতে গেলেই মুচ্‌কে হেসে' পালায় !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কয়েক দিন পরে বাড়ী ফিরিবার নূতনত্ব মন হইতে ক্রমে অপসারিত হইয়া গেল, ঘটনাহীন দৈনিক বাল্যজীবনের নিত্যকৃত্যের মধ্যে আবার দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। যদিও ছাপার অক্ষর তখন পড়িতে পারি, কিন্তু একমাত্র চক্ষুদ্বারা সব কাজ করিতে হয় ; সেই জন্য বিবেচক বৃদ্ধ হিতৈষিগণ তখন সেই সদ্যরোগমুক্ত চক্ষুদ্বারা পড়াশুনা করার শ্রম অসঙ্গত হইবে ভাবিয়া আমাকে বিদ্যাশিক্ষার কষ্ট হইতে কিছুদিনের জন্য অব্যাহতি দিলেন। শৈশবে এমন জীবন মন্দ নয়—আহার, শয়ন, ক্রীড়া, কৌতুক সবই চলিতেছে, কেবল শিক্ষকের নিকট পড়িতে যাইতে হয় না, এমন সুখ বোধ করি খুব কম বালকের ভাগ্যেই ঘটে, নিজকে বড় ভাগ্যবান বলিয়াই তখন মনে হইয়াছিল। সুখের দিন চিরস্থায়ী ত হয় না, আমার শিশুভাগ্য এমন কি প্রসন্ন যে দায়িত্বহীন জীবন চিরকাল কাটাইতে পাইব। কিছু দিবস পরে আবার পূর্ব্ববৎ শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইল ;— সেই বেত, সেই বিছুটি, সেই ভীমরুল, সেই অগ্নিদাহ, বাকি বকেয়া এবং সুদ সমেত আমার ভাগ্যে আসিয়া জুটিল ! চিরজীবন যে বিছুটির

বিষ এবং অগ্নিদাহের জ্বালা লইয়া আমার দিন কাটাইতে হইবে, তাহা কি তখন জানি? আজ প্রত্নতাত্ত্বিকে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, কত পুরাতন শিলালিপি, কত তাম্রশাসন, কত যুগ যুগান্তের প্রস্তরফলক অনায়াসে পাঠ এবং তাহার অর্থ সংগ্রহ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এমন প্রত্নতাত্ত্বিক কেহ হন নাই, যিনি ষষ্ঠীবাসরে ললাটফলকে লিখিত বিধাতার অদৃষ্ট-শাসনের অক্ষরলিপি পাঠ করিয়া তার অর্থ উদ্ধার করিয়া দিতে পারেন, পারিলে অনেক ব্যর্থ আশার দুঃসহ দুঃখের হাত হইতে অনেক হতভাগ্য হয়ত উদ্ধার পাইয়া যাইত। থাক সে কথা এখন। বেত, বিছুটি হজম করিয়া, বেতন দিয়া, গুরুমহাশয়দের মন রক্ষা করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমার বিদ্যাশিক্ষার উদ্যমের খঞ্জ দিনগুলি কোনরূপে চলিতেছিল, ইতিমধ্যে আমার ভাগ্যে আর এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

আমাদের দেশ ম্যালেরিয়া-প্রধান, মাসে তিনবার জ্বর ত বাঁধা কথা, বর্ষার দিনে তারও বেশীবার লোকের জ্বর হয়; লঙ্ঘন প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধন কাহারই আর কষ্টকর মনে হয় না, কারণ মাসে বহুদিন লঙ্ঘনাবস্থায় থাকিয়া অনাহারের ক্লেশ সকলেরই একরূপ গা-সহা হইয়া যাইত।

দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে আমিও উদ্ধার পাই নাই; মাসের মধ্যে পনর দিন প্রায় বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম। দীর্ঘকাল এইরূপ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া আমার দুই পায়ে বাতে ধরিল, বসিলে উঠিতে পারি না, এবং দাঁড়াইলে তাড়াতাড়ি বসা আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টকর হইত। মা আমার এ নূতন ব্যাধির সূচনা আমার চলা ফেরা দেখিয়া কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি স্বীকার করিতাম না, পাছে আমাদের গৃহচিকিৎসক ঈশ্বরচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় আমার লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করেন, কিম্বা খেলাধূলা বন্ধ করিয়া দিয়া আমায় শয্যার আশ্রয় লইতে বলেন। স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়া মাতা যখন আমার নিকট সত্য উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি একদিন আমার সমস্ত খেলার সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া তাঁহার সম্মুখে এমন একটি খেলা করিতে আদেশ দিলেন যাহাতে প্রত্যেক বালককেই তাড়াতাড়ি বারংবার উঠা-বসা করিতে হয়; আমি তখন প্রমাদ গণিলাম! কি করি, উপায়ান্তর না দেখিয়া ঐ খেলাতেই সম্মত হইলাম, বুঝিলাম, শয্যা ও লঙ্ঘন এড়াইবার পথ আর আমার রহিল না। পায়ের সমস্ত গিরায় গিরায় যাহার বাতের বেদনা, সে উঠা-বসা করিবে কেমন করিয়া; দুই একবার চেষ্টা করিয়া বসিয়া পড়িলাম, আর আমার উত্থানশক্তি রহিল না।—মা সবই বুঝিলেন, দুই চক্ষু দিয়া তাঁহার অশ্রু

গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যে বালক অন্ধ হইয়া দুই বৎসর কাটাইল, আবার তাহাকে বাতব্যাধিতে বুঝি সমস্ত জীবন ভরিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, এই ভাবিয়া জননীর স্নেহবিগলিত অন্তর বুঝি কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। আমাকে কোলে করিয়া প্রাঙ্গন হইতে ঘরে নিয়া গেলেন—সেইদিন যে বিছানায় শুইলাম, একাদিক্রমে দুই বৎসর কাল আমার বিনা সাহায্যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার সাধ্যও ছিল না। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ, প্রলেপ, সেক নানাবিধ বিধানে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন; জ্বর, ব্যথা কিছুই যায় না, তার উপর পায়ের গুল্‌ফে প্রকাণ্ড ঘা হইয়া আমার যন্ত্রণার মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। ঠিক সেই সময়ে আমার বড়দিদি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আমার পিতামহীর নিতান্ত আদরের সামগ্রী ছিলেন, তাঁহার রোগ-মুক্তিকল্পে তখন সকলেই ব্যস্ত; কেবল আমার মা এই দুরন্ত ব্যাধিক্লিষ্ট, উত্থানশক্তিরহিত, মরণপথযাত্রী সন্তানকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া শ্রীহরির চরণকমলের কৃপাকণা ভিক্ষা করিতেন, আর তাঁহার অপত্যস্নেহসমন্বিত পবিত্র অশ্রু এ হতভাগ্যের মস্তকে বর্ষিত হইয়া শান্তিজলের ন্যায় আমার রোগ তাপ ক্রমে দূর করিয়া দিতে লাগিল। মাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ এবং তাঁহার প্রতি দেবতার যে কৃপা ছিল সেই দৈবকৃপার বলে সেবার আমি রোগমুক্ত হইলাম। আমার প্রতি কৃপা করিয়া দেবতা আমার আরোগ্য দান করেন নাই জানি, কারণ দৈবকৃপা লাভের যোগ্যতা আমার কিছুই ছিল না এবং নাই। দেবতার নিকট কৃপাভিক্ষা যাচনা জীবন ভরিয়াই করিতেছি, আমার দেবতা, আমার অদৃষ্ট বিধাতা, আমার অন্তরের চিরপ্রার্থনা পূরণ করিয়া আমায় কৃতার্থ ত করিলেন না! এই সুদীর্ঘ জীবনপথের নিঃসঙ্গ-যাত্রার দুঃসহ দুঃখ দূর করিবার জন্য গললগ্নীকৃতবাসে অন্তর দেবতার চরণতলে সকাতরে বার বার বহু মিনতি করিলাম, দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে এই নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ, নিরাশ্রয় আজও ত কৃতার্থ হইতে পারিল না। আর যে সময় নাই, সমাগত-সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আধিব্যাধিপূর্ণ জীর্ণ দেহমন যে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে, অবশিষ্ট কয়টা দিনের জন্য হাত ধরিয়া পথ দেখাইতে দেবতার কৃপা আজও ত স্বর্গ হইতে নামিল না; কবে আর নামিবে? অনেকদিন পূর্ব্বে একবার ঢপকীর্ত্তন শুনিয়াছিলাম, মধুসূদন কানের রচিত একটি গীতের প্রথম দুইটি পদ আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল, উহা আমি মুখস্ত করিয়াছিলাম, আজ সেই দুইটি পদ বার বার আমার মনে আসিতেছে; পদ দুইটি এই,—

"ব'লো তারে কারাগারে, আর কতদিন রইতে হবে,
সে দিনের আর ক'দিন বাকি, চিরদিন কি এমনি যাবে।"

রোগমুক্ত হইলাম বটে, তবে দীর্ঘদিন বাতে ভুগিবার জন্য এবং বিছানায় পড়িয়া থাকায় আমার দক্ষিণ পাখানি শীর্ণ হইয়া গেল এবং বাতের ক্ষত জন্য দুর্ব্বল হওয়ায় দেহভার বহিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। দক্ষিণ চক্ষু আমার দৃষ্টিহীন, দক্ষিণ পাখানিও শরীরের ভার বহন করিতে অক্ষম হইল। আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন দ্বাদশ বর্ষীয় বালক, জীবনের বহুবর্ষ যার সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে, সে এই অন্ধ নয়ন ও খঞ্জপদ লইয়া কেমন করিয়া জীবনপথের ঘোড়দৌড়ের বাজিতে দৌড়াইয়া মর্য্যাদার স্থান লাভ করিবে!

এই দৃষ্টিহীন চলৎশক্তিবিহীন সন্তানকে নিয়া মা আমার বড় বিপদেই পড়িলেন। পিতামহীর আদেশ ব্যতীত আমার চিকিৎসার কোনরূপ ভাল ব্যবস্থাই হইতে পারে না, কারণ পিতামহীই আমাদের বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, তার উপরে তিনি আবার আমার মাতার ইষ্টদেবতা; একে শাশুড়ী গুরুজন, তাহার উপর তিনিই আবার আমার মার বৈতরিণী-পারের নৌকার কর্ণধার; তাঁর আদেশ, অভিপ্রায়, অভিমত না হইলে মাতার নিজের ইচ্ছায় কিছু করিবার সাধ্য ছিল না। আমার পিতামহী তখন আমার বড়দিদির পীড়া লইয়া নিতান্ত ব্যস্ত ছিলেন, অন্য কাহারও প্রতি মনোযোগ দিবার তাঁহার সময় ছিল না। বড়দিদি আমার পিতামহীর নয়নমণি স্বরূপ ছিলেন, সেই তাঁহার আনন্দদুলাল রোগশয্যায় শুইয়া প্রতিদিন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, সে সময় বৃদ্ধার অন্য কাহারও প্রতি দৃষ্টি দিবার কি সময় হয়? দিদির চিকিৎসার জন্য স্বনামধন্য, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, মুরশিদাবাদের গঙ্গাধর কবিরাজকে আনান হইয়াছিল। আমার মাতা এই সুযোগ বুঝিয়া অশেষ মিনতি পূর্ব্বক বৃদ্ধ গঙ্গাধরকে আমার রোগের কথা জ্ঞাপন করাইয়া চিকিৎসার ভার তাঁহাকে লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধ কবিরাজ বালকের দুঃসহ দুঃখে বোধ করি দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি দুই প্রকার তেল ও কয়েক রকম ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, সেই ঔষধ সেবন ও তেল মালিশ করিতে করিতে প্রায় ছয় মাসে আমার পা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল, এবং ধীরে ধীরে যষ্টির উপর ভর দিয়া আমি দ্বিতীয়বার নূতন করিয়া পায়ে চলা শিক্ষা করিলাম। ক্ষতের চিহ্ন আজও আমার পায়ে আছে, দক্ষিণ পাখানি বোধ করি একটু খাট হইয়াছে, যদিও সামান্য বলিয়া তাহা লোকের দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করে না, তবে পা সবল হইয়াছে, এবং এক

সময়ে যে বালক গতিশক্তিহীন পঙ্গু হইয়া জীবন কাটাইবে ভাবিয়া স্নেহময়ী মাতা চিন্তায় অধীর হইয়াছিলেন, সেই বালক পরজীবনে ঐ পায়ের সাহায্যেই ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি নানা প্রকার খেলায় বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়াছিল এবং আজও তাহার রোগক্লিষ্ট এবং নানা কারণে দুর্ব্বহ দেহভার সেই পায়েই কোন মতে বহন করিতেছে ; কতদিন পারিবে, তাহা আমার দেবতারও যিনি দেবতা তিনিই জানেন।

কিছুদিন পরে আমার বড়দিদির অকালমৃত্যু ঘটিয়া গেল, সেই ঘটনায় আমাদের সমগ্র গৃহ শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ; আমার মা এবং পিতামহী দুর্ব্বহ শোকভারে শয্যায় আশ্রয় নিলেন, আমার প্রতি দৃষ্টি দিবার, আমার শিক্ষা দীক্ষার দিকে মনোযোগ করিবার কেহ ছিল না। আমাদের পরম হিতৈষী বৃদ্ধ দেওয়ান যাদবচন্দ্র মৈত্রেয় আমার ভাবি মঙ্গল কামনায় আমাকে বিদেশে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য পাঠাইতে সঙ্কল্প করিয়া আমার মার নিকটে সে প্রস্তাব করিলেন ; সদ্য শোকাভিভূতা জননী তাঁর সেই দুঃসময়ে আমাকে নয়নান্তরাল করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন ; হয়ত তাঁর মনে হইয়াছিল যে, যে বালককে দ্বাদশ বৎসর বয়সের মধ্যেই এরূপ সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি জন্য বৎসর বৎসর ধরিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া ও শয্যায় পড়িয়া দিন কাটাইতে হইয়াছে, না জানি ভবিষ্যতে তার ভাগ্যে আরও কত কি আছে। এমন দুরদৃষ্ট বালকের শিক্ষা দীক্ষা বিশেষ কিছু হইবার কোন সম্ভাবনা তাঁহার মনে আসিল না, বরং ভাবিলেন হয়ত নির্ব্বান্ধব দেশে, স্নেহহীন অপরিচিতের মধ্যে, রোগশয্যায় শুইয়া ব্যাধিক্লিষ্ট দীপ্তিহীন চক্ষু 'একমাত্র স্নেহশীলার' ব্যর্থ অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া হতাশ্বাসের মধ্যে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া যাইবে—কাজ কি ইহাকে দূরে পাঠাইয়া ; কাজ কি ইহাকে কাছ ছাড়া করিয়া ; যাহা হইবার তাহা আমার স্নেহাঞ্চল তলেই হইয়া যাউক।" বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মাতার সে সঙ্কল্প স্থির থাকিতে পারিল না, বাগ্দেবতা সন্তানকে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদেশে পাঠাইবার মতি তাঁহাকে দিলেন। আমি ফাল্গুন মাসের এক বসন্ত-প্রভাতে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের দ্বারা নূতন স্থাপিত রাজসাহী কলেজে বিদ্যা অর্জ্জনার্থ মাতার চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। জননীর স্নেহ-ব্যাকুল বেষ্টনের মধ্য হইতে সেই যে বিদায়গ্রহণ করিলাম আর সে পরম প্রার্থিত স্নেহতীর্থে তেমন করিয়া প্রবেশলাভ করিতে জীবনে পারি নাই—সম্ভবতঃ সে নিতান্ত ক্লেশকর দুঃখের জন্য আমিই দায়ী—সে ইতিহাস এ জীবন-কাহিনীর

যথাস্থানে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আর এক বর্ণ-বৈচিত্রময় পুষ্পৈশ্বর্য্য-সমাকুল বসন্তের দিবাবসানের রক্তিমালোকের মধ্যে আর একটি পুষ্পপেলব হৃদয়ের সমগ্র স্নেহ জন্মজন্মান্তের পুণ্যফলে নিঃশেষে পাইয়া এ চিরদুঃখী পরম ধন্য হইয়াছে, একের দ্বারাই তাহার বিশ্বভুবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; সে মাধুর্য্যময় পরম পবিত্র স্নেহসান্নিধ্যের মধ্যে আমার ব্যর্থ জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটিতে পারিবে কি না, আজ তাহা বলিবার কোন উপায় আমার নাই। শৈশবাবধি আজ পর্য্যন্ত কৃতকর্ম্মের বিচিত্র নৃত্যলীলা যাহা দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে আশা করিবার ভরসা আর হয় না; তবে আমার অদৃষ্ট যাঁহার দ্বারা নিয়মিত তাঁর অখণ্ড করুণার উপরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহারই ইঙ্গিতের আদেশ মস্তকে বহন করিয়া পরমায়ুর অবশিষ্ট কয়টা দিন কোন মতে বুক দিয়া ঠেলিয়া ফেলা ব্যতীত উপায়হীনের আর কি গতি আছে? অমানিশিথিনীর গাঢ় অন্ধকারের পর রাকা যামিনীর জ্যোৎস্নাপ্লাবন, বর্ষণম্লান দুর্দ্দিনের পর শরতের স্বর্ণাভ সন্ধ্যা নিসর্গের অখণ্ডনীয় নিয়ম; কিন্তু অবস্থাবিশেষে সে সান্ত্বনাও বড় ক্ষুদ্র সান্ত্বনা! দুঃসহ দুঃখে নয়নপথে যখন নদী বহিতে থাকে সে বেগের নিকটে সমস্ত বাঁধনই বালির বাধনের মত ধুইয়া চলিয়া যায়!

রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। যখন বাতের পীড়ায় দুই বৎসর কাল বিছানায় পড়িয়া ছিলাম, তখন মা আমার কল্যাণকল্পে রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া আমায় শুনাইতেন, এবং আমাকেও পড়িতে বলিতেন, তাঁহার বিশ্বাস ঈশ্বরাবতার শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির চরিতকথা পাঠে এবং শ্রবণে পাপ ক্ষয় হইয়া তাঁহার সন্তান রোগমুক্ত হইবে। আমিও আমার বালক মনের সবটুকু দিয়া সে কথা বিশ্বাস করিতাম এবং পরমাগ্রহে, পরম নিষ্ঠার সহিত, ঐ সকল গ্রন্থ প্রায় দিবারাত্রই পাঠ করিতাম। সেই পাঠের ফলেই রোগমুক্তি হইল কি না জানি না, তবে আমি ঐ বয়সেই রামায়ণ, মহাভারতের গল্পাংশ সব শিখিয়া নিলাম এবং আমার সমশ্রেণীর সতীর্থগণ বাঙ্গালাভাষা যতটা জানিত আমার তদপেক্ষা কিছু জ্ঞান বেশী হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস, অন্ততঃ পক্ষে অনেকগুলি শব্দ শিক্ষা করিয়াছিলাম যাহা রচনাদি লিখিবার সময়ে কাজে আসিত এবং যাহার বলে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে সাপ্তাহিক পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাইয়া পাশ হইয়া গর্ব্ব করিবার সুযোগ দিত।

রাজসাহী যাইবার পর ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইলাম। প্লীহা, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগাক্রান্ত দুর্ব্বল দেহে শোণিত সঞ্চয়ের লক্ষণ দেখা দিল এবং

বিদ্যালয়ের নূতন সহপাঠী সখাদিগের সঙ্গে হাস্য, কৌতুক, ক্রীড়া, পাঠ ইত্যাদিতে সময় আমার বেশ কাটিতে লাগিল। সহপাঠীদিগের অনেকেরই আমি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলাম, খেলাধূলার উদ্যোগ অনুষ্ঠানে আমি বিশেষ কৃতী, পল্লী-নিকেতনে প্রতিপালিত হওয়ায় বৃক্ষ, লতা, জল, স্থলের সঙ্গে আমার পরিচয় কিছু ঘনিষ্ঠতর ছিল, সহরে বর্দ্ধিত বালকদিগের মত আমি নিতান্ত নিরুপায় ছিলাম না; এই সকল কারণে আমি একরূপ 'সর্দ্দার' হইয়া গৌরবের মধ্যেই দিন কাটাইতাম।

পাঠদ্দশায় অশন বসনের ক্লেশ ছিল না, এ কথা বলিতে পারি না, রাজ-পুত্রের মত দিন কাটাইবার অর্থ বাড়ী হইতে আমাকে দেওয়া হইত না, মধ্যবিত্ত লোকের সন্তান যেরূপভাবে পাঠ্যাবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে, আমার জন্যও প্রায় তদ্রূপ ব্যবস্থাই ছিল। তাহার ফলে শরীর আমার কষ্টসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে; অনশন, অর্দ্ধাশন, শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, জল, ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্র, বিদ্যুৎ আমায় আজ বিভীষিকা দেখাইতে পারে না। যে বাড়ীতে আমি বাস করিতাম তাহা একটি ছাত্রনিবাসের মত ছিল, সেখানে আরও অনেক বালক বাস করিত, তাহাদিগের সহিত বাল্যজীবনের সুখ দুঃখ সমানাংশে ভাগ করিয়া ভোগ করিতাম, তাহাতে আমার দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতাও প্রচুর জন্মিয়াছে। আমি নিজে দরিদ্রের সন্তান, আমার যে বংশে জন্ম হইয়াছিল সে বংশ যে কতকাল ধরিয়া দরিদ্র তাহা কুলজ্ঞের কুলশাস্ত্রও বোধ করি বলিতে পারে না। বংশপরম্পরাগত দারিদ্র্যের দোষ গুণ আমার রক্তের সঙ্গে শিরায় শিরায় বহিতেছে সুতরাং দেহে মনে আমি দরিদ্রেরই একজন; রাজকীয় আহার, আচার আমার আফিসের চোগা চাপকানের মত, প্রয়োজনের সময়ে উহা পরিয়া লই; প্রয়োজন সাঙ্গ হইয়া গেলে আমি যে ব্রজনাথ সেই ব্রজনাথ। জগদিন্দ্র আমি নই, উহা আমার সংজ্ঞা মাত্র—যিনি সংজ্ঞা লইয়া সুখী তিনি সংজ্ঞাসুখে মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, সুরেন্দ্র, জগদিন্দ্র যাহা ইচ্ছা তাহাই হউন, আমি ব্রজনাথ থাকিয়াই চক্ষু মুদিতে পারিলে এবারের মত বাঁচিয়া যাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

জীবনের মূল্য।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নদর্শন—ভার্য্যাবিষয়ক।

"দাদা—দাদা—ভট্‌চায্‌ দাদা—"

চৈত্রমাস, সেইমাত্র ভোর হইয়াছে। ত্রিবেণী, ভট্টাচার্য্য পাড়ায় কোনও গৃহের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক উক্ত প্রকারে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। ভোর বেলাটা এখনও একটু শীত শীত করে—লোকটির গায়ে একখানি আসাম সিল্কের মোটা চাদর জড়ান রহিয়াছে। ইঁহার দেহখানি কিঞ্চিৎ স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ, আকৃতি খর্ব্ব, মস্তকের সম্মুখভাগে টাকপড়া, পশ্চাতে একটি সুপুষ্ট শিখা গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থায় দুলিতেছে। পরিধানে থান ধুতি, পায়ে চটিজুতা।

"ভট্‌চায্‌ দাদা—ও ভট্‌চায্‌ দাদা—" বলিয়া লোকটি বদ্ধদ্বারে সঘন কর-সম্তাড়ন করিতে লাগিলেন।

ভিতর হইতে শব্দ আসিল—"কে ও?"

"আমি গিরিশ।"

ভিতর হইতে আবার শব্দ আসিল—"আচ্ছা।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই দ্বারটি খুলিয়া গেল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোঁচার টেপ গায়ে দিয়া নগ্নপদে বাহির হইলেন। বলিলেন—"গিরিশ ভায়া—এস এস। এত ভোরে কি মনে করে হে?"

আগন্তুক নতদেহে ভট্টাচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"একটা বিশেষ কথা আছে।"

ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, আগন্তুকের মুখে চক্ষে কেমন যেন একটা বিহ্বলতার ভাব। শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়ীর সব মঙ্গল ত? কলকাতায় ছেলেরা ভাল আছে?"

"আজ্ঞে সে সমস্তই মঙ্গল। বৈঠকখানা খুলুন।"

"চাবিটে নিয়ে আসি।"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য ভিতরে চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই একজন ভৃত্য আসিয়া বৈঠকখানা খুলিয়া দিল। বলিল—"ঠাকুরমশাই এলেন বলে।" আগন্তুক, বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া, জানালাগুলা খুলিয়া দিয়া, তক্তপোষের উপরে বসিলেন।

ইহাঁর নাম গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পুরুষানুক্রমে ত্রিবেণী গ্রামে বাস করিতেছেন। বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ্ বৎসর। কিঞ্চিৎ জমিদারী আছে—টাকা কর্জ্জ দিবার ব্যবসায়ও করিয়া থাকেন। গ্রামের মধ্যে ইনি একজন সম্পন্ন ব্যক্তি। একে একে দুইবার সংসার করিয়াছিলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী দুইটি শিশুপুত্র রাখিয়া ভবধাম পরিত্যাগ করেন। ছেলে দুইটি এখন বড় হইয়াছে, কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, দুইটি ছোট ছোট মেয়ে রাখিয়া আজ প্রায় এক বৎসর হইল গত হইয়াছেন। গৃহে গিরিশচন্দ্রের পিসিমাতা আছেন—আর কেহ নাই—তিনিই কন্যা দুইটিকে লালনপালন করিতেছেন।

অল্পক্ষণ পরেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি ইতিমধ্যে মুখ চক্ষু ধৌত করিয়াছেন, একটি পিরিহান গায়ে দিয়াছেন। হাতে হুঁকা—কলিকা দিয়া ধূম নির্গত হইতেছে। তক্তপোষের উপর মুখোপাধ্যায়ের নিকট বসিয়া বলিলেন—“তারপর, ব্যাপার কি বল দেখি?”—বলিয়া তিনি হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিলেন।

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—“আচ্ছা ভট্‌চায্ দাদা, আমরা যে সকল স্বপ্ন দেখি, সেগুলো কি? আজকালকার কেতাবে যে লেখে অলীক কল্পনা মাত্র—তাই কি ঠিক?”

ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি কোনও দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছে—একটা শান্তিকার্য্য করাইতে হইবে। বলিলেন—“ক্ষেপেছ? স্বপ্ন অলীক কল্পনামাত্র বৈকি! একবার আমাদের শাস্ত্রগুলো খুলে দেখ দেখি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বড় বড় কয়েকটা স্বপ্নদর্শন অধ্যায় রয়েছে। তা ছাড়া তোমার গিয়ে দেবীপুরাণে রয়েছে—মৎস্যপুরাণে রয়েছে;—বল্লেই হল অমনি, স্বপ্ন অলীক কল্পনা মাত্র? ও সব খৃষ্টানী মত।”—ঘৃণায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া রহিল।

মুখোপাধ্যায় নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য আপন মনেই ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হুঁকাটি গিরিশের হাতে দিয়া বলিলেন—“কেন, কিছু স্বপ্ন টপ্ন দেখেছ নাকি?”

মুখোপাধ্যায় হুঁকার খোলের ছিদ্রপথে একটি সুদীর্ঘ ফুৎকার প্রেরণ করিলেন, তাহার পর সে স্থানটা হস্তদ্বারা মার্জ্জন করিয়া, ধূমপান করিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“কোনও দুঃস্বপ্ন দেখে থাক যদি, তার জন্যে আর চিন্ত

কি ? শাস্ত্রে বিধান আছে, উপযুক্ত শান্তিকার্য্য করালেই সব দোষ সব অমঙ্গল খণ্ডে যাবে।"

হুঁকা নামাইয়া মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"ভট্‌চায্‌ দাদা, একটা বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি।"

"কি রকম ?"

"বাবুপাড়ার জগদীশ বাড়ুয্যের মেয়ে প্রভাবতীকে দেখেছেন কি ? বছর তেরো চৌদ্দ বয়স ?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"কে, পটলি ? হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি। সেদিনও ত জগদীশ আমায় বলছিল, ভট্‌চায্যি মশাই, আপনি পাঁচ জায়গায় যান, আমার পট্‌লি বড় হয়ে উঠল, ওর জন্যে একটি পাত্তর খুঁজে দিন।"

গিরিশ আগ্রহের সহিত বলিলেন—"দাদা, তবে আমারই সঙ্গে মেয়েটির সম্বন্ধ করে দিন।"

এ কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য সকৌতুকে গিরিশের মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"তুমি আবার সংসার করবে ? তবে যে শুনেছিলাম—"

গিরিশ বলিলেন—"সাত পাঁচ ভেবেই প্রথমে ইতস্ততঃ করেছিলাম। প্রথমবার যখন গৃহশূন্য হলাম তখন ছেলে দুটি অতি শিশু। আমারও তখন বয়স অল্প। দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে আনলাম, তিনি ছেলে দুটিকে মানুষ করতে লাগলেন, বেশ মানিয়ে গেল, কোনও গোল হল না। কিন্তু এবার, ছেলে দুটি ধরুন বড় হয়েছে। আজ বাদে কাল তাদেরই বিয়ে দিতে হবে। তাদের ছেলে পিলে হবে। এ সময় যদি আবার বিবাহ করি তবে হয়ত সংসারে একটা অশান্তি উপস্থিত হতে পারে। তাই বিবাহ আর না করাই স্থির করেছিলাম। কিন্তু এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি দাদা !"

"কি স্বপ্ন ?"

"শেষরাত্রের দিকে স্বপ্ন দেখ্‌লাম যেন আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী—নরেন্‌ সুরেনের গর্ভধারিণী—এসে বিছানার পাশে বস্‌লেন। আমার চুলগুলির মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বল্লেন—'আজও আমি তোমায় ভুলতে পারিনি, তাই আবার এসেছি। আমিই জগদীশ বাড়ুয্যের মেয়ে প্রভাবতী হয়ে জন্মেছি। সে বারে আমার কোনও সাধই মেটেনি। আমায় আবার তুমি বিয়ে কর—আমি এসে নরেন সুরেনের বউ নিয়ে ঘরকন্না করি।'—বলেই অন্তর্দ্ধান হয়ে গেলেন।"

গিরিশের কণ্ঠস্বরে, তাঁহার মুখচক্ষুর ভাবে, এমন একটা সারল্য ফুটিয়া উঠিল যে, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে স্থান পাইল না। তাঁহার দেহ যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বলিলেন—"অ্যাঁ? বল কি হে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

উভয়েই নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আশ্চর্য্য ত!"

গিরিশ উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন—"আশ্চর্য্য নয়? হিসেব করে দেখুন, ঠিক পনেরো বৎসর হল নরেন সুরেনের গর্ভধারিণী গত হয়েছেন। ঠিক তার বছর খানেক পরেই প্রভাবতী জন্মগ্রহণ করেছে।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"দেখি দাঁড়াও। যে বছর আমি বৃন্দাবন গিয়েছিলাম, সেই বছরই তোমার স্ত্রী মারা যান। তুমি তখন শোকে বড় কাতর, তুমিও আমার সঙ্গে বৃন্দাবন যেতে চেয়েছিলে। কিন্তু কি একটা কারণে তোমার যাওয়া হল না।"

"পিসিমার ব্যারাম হয়েছিল।"

"তা হবে। আমি বৃন্দাবন গিয়েছিলাম কোন্ বৎসর?"—বলিয়া, মনে মনে হিসাব করিতে করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় অঙ্গুলি গণনা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"ঠিক ত। ঠিক পনেরো বছর' হয়েছে। তার পর, তোমার প্রভাবতী হল কবে? এগারো মাস আমি বৃন্দাবনে ছিলাম—একমাস কাশীতে—বাড়ী ফিরে শুন্‌লাম জগদীশের স্ত্রীর সূতিকার ব্যামো হয়েছে—আমার কাছে জলপড়া নিয়ে যেত। সেই বারই প্রভাবতী জন্মেছে। ভায়া, তোমার হিসাবে ত গোল হয় নি—ঠিকই বলেছ।—আশ্চর্য্য!"—বলিয়া চিবুকে অঙ্গুলি দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া রহিলেন।

গিরিশ ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলেন—"আরও একটা আশ্চর্য্য ঘটনা দেখুন, পুঁটু বুচির গর্ভধারিণী প্রায় একবৎসর কাল গত হয়েছেন ত? এর মধ্যে কতদিন পিসিমা আমায় বলেছেন—'বাবা, আমি বুড়ো হয়েছি, কবে আছি কবে নেই, তুমি আবার বিয়ে করে সংসারী হও।'—আমি বলেছি—'পিসিমা, এ বয়সে আর কেন? নরেন সুরেন তোমার আশীর্ব্বাদে বেঁচে থাকুক—আমায় আর বিয়ে করতে বোলোনা।'—পিসি মা বলেছেন—'আমার মাথার যত চুল, নরেন সুরেনের তত পের্‌মাই হোক—কিন্তু বাবা একবছর দুবছর পরে ওদের বিয়ে দিতে হবে ত? তখন যদি আমি না থাকি, বউ দুটিকে দেখ্‌বে শুন্‌বে কে? একটি ডাগর দেখে মেয়ে বিয়ে কর, তোমার সংসার বজায় হোক্।'—পিসিমা

কত করে বলেছেন, কিন্তু তখন তাঁর কথা আমি কাণেই তুলিনি। পশু দিন, বুঝেছেন দাদা, বেলা নটার সময় গঙ্গাস্নান করে বাবুপাড়ার মধ্যে দিয়ে ফিরছি, দেখি ঐ প্রভা তাদের বাড়ীর সামনের বেড়াঘেরা বাগানটিতে, একটি ডালা হাতে করে পাতিনেবু পেড়ে বেড়াচ্ছে। অনেক দিন দেখিনি—বেশ ডাগরটি হয়েছে দেখ্‌লাম। একখানি কোকিলপেড়ে শাড়ী পরে রয়েছে। স্নান করেছে—ভিজে চুলগুলি এলিয়ে পিঠের উপর দুলছে। তাকে দেখেই হঠাৎ কি রকম পিসিমার কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। 'এই ত একটি বেশ ডাগর মেয়ে রয়েছে, একে যদি ঘরে আনি তা হলে বোধ হয় পিসিমা খুসী হন'—এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাড়ী এলাম। তোমার কাছে লুকাবনা ভট্‌চায্‌ দাদা, সারাদিনটে মনটার ভিতর কেমন আঁচড় পাচড় করতে লাগল। আমি বরং মনে মনে একটু লজ্জিতই হয়েছিলাম—ভাবছিলাম, বুড়ো বয়সে এ আবার কি রোগে ধরল্‌? খালি তাকে মনে পড়ে, খালি তাকে মনে পড়ে। তার পর, ভোর রাত্রে ঐ স্বপ্ন। এখন না বুঝছি দাদা—হটাৎ কেন মনটা আমার ও রকম হয়ে গিয়েছিল। নরেন্‌ সুরেনের গর্ভধারিণীই যে প্রভাবতী হয়ে জন্মেছেন তা কি তখন জানি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া গিরিশের এ কাহিনী শুনিতেছিলেন। শেষ হইলেও কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গিরিশ বলিলেন—"এ অবস্থায় এখন আপনি কি পরামর্শ দেন?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"স্বপ্নতত্ত্ব বড় গূঢ়তত্ত্ব। একটা শ্লোক আমার মনে পড়ছে যেন—দেখি দাঁড়াও।"—বলিয়া তিনি উঠিলেন, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্রব্যাখ্যা।

এতক্ষণে বেশ ফর্সা হইল। রৌদ্র উঠিতে আর বিলম্ব নাই। রাস্তার ধারেই এই বৈঠকখানা—খোলা জানালা দিয়া গিরিশচন্দ্র পথের পানে চাহিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে এক আধজন লোক সে পথ দিয়া যাইতেছে। একজন রাখাল-বালক দুইটি গরু তাড়াইতে তাড়াইতে গাহিয়া গেল—

বউরে, মনে পড়ে রে-এ-এ

তোর আল্‌তা মাখা পা দুখানি
বউরে-এ-এ—

পথচারী কে একজন বলিল—"হতভাগা ছেলে!"

ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বামকক্ষতলে একখানি পুস্তক দক্ষিণ হস্তে হুঁকা। প্রবেশ করিয়া গিরিশের হস্তে হুঁকাটি দিয়া বলিলেন—"ধরাও।" —নিজে তক্তপোষের উপর বসিয়া, পিরিহাণের পকেট হইতে চশমাখানি বাহির করিয়া চোখে পরিলেন। বহিখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ক্রমে একটা স্থানে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিলেন।

গিরিশ তামাক খাইতে খাইতে সোৎসুক নয়নে ভট্টাচার্য্যের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা, স্বপ্নটি দেখ্‌বার কতক্ষণ পরে তুমি জেগেছ বল দেখি?"

"প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তিনিও অন্তর্দ্ধান হলেন আমিও জেগে উঠলাম। তার পর মুখ হাত ধুতে যা দেরী। তার পরই আপনার কাছে এসেছি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া ভাবিলেন, শেষে মুখখানি অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"গিরিশ—তুমি প্রতিশ্রুত হও।"

"কি প্রতিশ্রুত হব?"

"প্রতিশ্রুত হও যে, যদি আমি তোমার এ বিবাহ ঘটাতে পারি—আমায় তুমি ভুলবে না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্বর কাঁপিতেছিল। তাঁহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া গিরিশ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন; বলিলেন—"কেন দাদা, ও কথা কেন বল্‌ছেন? আপনাকে ভুলব কেন? আপনার সঙ্গে এতকালের বন্ধুত্ব, আপনাকে হঠাৎ ভুলে যাব কেমন করে?—বিয়ে হোক আর নাই হোক।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"সে ভোলার কথা বলছিনে গিরিশ। যদি এ বিবাহ আমি দেওয়াতে পারি, আর তার ফলটি যদি শুভ হয়, তুমি সে উপকার বিস্মরণ হবে না বল? আমাকেই এ বিবাহের মূলসূত্র জেনে, যথাসাধ্য আমার উপকার কর্‌বে?"

একথা শুনিয়া গিরিশের বুক দশহাত হইল। ভাবিলেন, এরূপ বিবাহে নিশ্চয়ই খুব শুভফল শাস্ত্রে লেখা আছে। বলিলেন—"আচ্ছা ভট্‌চায্যি দাদা, আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি—আপনাকে ভুলব না।"

ভট্টাচার্য্য গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—"কমলা যদি তোমার উপর সদয় হন—সদয় ত আছেনই, যদি আরও সদয় হন, এর চেয়ে দশগুণ বিশগুণ পঞ্চাশ-গুণ সদয় হন—তা হলে তুমি আমাকে দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করবে প্রতিশ্রুত হও।"

গিরিশের মাথা ঘুরিতে লাগিল। ইহার অপেক্ষা দশগুণ, বিশগুণ, পঞ্চাশ গুণ!—ব্যাপারখানা কি, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল?"

গিরিশ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া, নিজেকে নির্দ্দিষ্টভাবে বাগ্‌বদ্ধ না করিয়া বলিলেন—"দাদা, আপনি যে রকম বলছেন, যদি আমার উপর কমলার সেই রকম শুভদৃষ্টিই হয়, তবে আপনার উপকার আমি কখনও বিস্মরণ হব না। এখন ব্যাপার কি, খুলে বলুন।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"ব্যাপার গুরুতর। এ বিবাহ হলে তুমি রাজা হবে গিরিশ!"

গিরিশ প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"কি বল্লেন—রাজা হব?"

ভট্টাচার্য্য গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"রাজা হবে। তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।"

"এই কথা শাস্ত্রে লেখা আছে?"

"লেখা আছে।"—ভট্টাচার্য্য মহাশয় হস্তধৃত বহিখানি আন্দোলিত করিতে করিতে বলিলেন—"এখানি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—যে সে পুঁথি নয়। এতে কি লেখা আছে শোন।"—বলিয়া পাঠ করিলেন—

"দিব্যা স্ত্রী যং প্রবদতি মম স্বামী ভবান্ ভব।
স্বপ্নে দৃষ্ট্বা চ জাগর্ত্তি স চ রাজা ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

পাঠান্তে বইখানি তিনি গিরিশের হস্তে দিলেন।

গিরিশ, বহিখানি হস্তে করিয়া, চক্ষু হইতে অনেক দূরে সেখানি ধরিয়া, পড়িতে চেষ্টা করিলেন।

ভট্টাচার্য্য নিজ চশমাখানি চক্ষু হইতে খুলিয়া গিরিশকে দিলেন। চশমা চোখে দিয়া গিরিশ শ্লোকটি দুই তিনবার পাঠ করিলেন—কিঞ্চিৎ সংস্কৃত তিনি জানিতেন। পাঠ শেষে বলিলেন—"এর মানেটি কি দাদা?"

"এর মানে বুঝিতে পারলে না? কেন, বেশ ত স্পষ্ট। আচ্ছা ব্যাখ্যা করিতেছি।"—বলিয়া ভট্টাচার্য্য সজোরে দুই টিপ নস্য লইলেন। শেষে চশমাটি

চোখে দিয়া বহিখানি হাতে করিয়া বলিলেন—"দিব্ বলতে স্বর্গ বোঝায়। তার উত্তর ষ্টিয়ঁ প্রত্যয় করে হল দিব্য। দিব্যা স্ত্রী—কি না স্বর্গে গেছে এমন যে স্ত্রী, যংপ্রবদতি—যাকে বলে, মম স্বামী ভবান্ ভব—তুমি আমার স্বামী হও অর্থাৎ কি না আমায় বিয়ে কর, এই রকম স্বপ্নে দৃষ্ট্বা—স্বপ্ন দেখে, চ জাগর্ত্তি—জেগে ওঠে, তা হলে ধ্রুবং কি না নিশ্চিতং সঃ রাজা ভবেৎ—সে রাজা হবে। ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে সুস্বপ্নদর্শনাধ্যায়।"

গিরিশ পুস্তকখানির জন্য হাত বাড়াইলেন। সেখানি লইয়া শ্লোকটি আবার পাঠ করিলেন। অন্যদিকে মুখ করিয়া প্রায় এক মিনিট কাল ভাবিলেন। শেষে বলিলেন—"হাঁা ভট্‌চায্ দাদা, দিব্যা স্ত্রী মানে দেবকন্যা নয় ত?"

ভট্টাচার্য্য মাথা দুলাইয়া বলিলেন—"স্ত্রী মানে কন্যা?—কোথাকার টোলে পড়েছ হে?—পাপাত্মা!"—বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মুখোপাধ্যায়ের মাথা ঘুরিতে লাগিল। ঢোক গিলিয়া বলিলেন—"যা বলেছ, তা ঠিক হবে ত ভট্‌চায্ দাদা?"

ভট্টাচার্য্য দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"হবে না? হতেই হবে। পুঁথিখানা লিখেছে কে? রামা নয় শ্যামা নয় কেষ্টা নয়—স্বয়ং বেদব্যাস। এ কি আর মিথ্যা হবার যোটি আছে ভায়া? বেদব্যাসের কথা যে দিন মিথ্যা হবে সে দিন পৃথিবী উল্‌টে যাবে।"

অতঃপর দুইজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিশ্রুত হইলেন অদ্যই তিনি জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গিয়া কথাটা পাড়িবেন। গিরিশ ভক্তিভাবে তাঁহার পদধূলি গ্রহণান্তর বিদায় লইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতবর্ষ, আষাঢ়—

ভারতবর্ষের এ সংখ্যাটি সুদৃশ্য। কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, ছবিও—ভাল হোক, মন্দ হোক—সংখ্যায় অল্প নয়। ছাপিবার কালিও তিন চারি রংয়ের। কুরূপা কন্যাকে বেশ-ভূষায় সজ্জিত করিয়া অনেক বরকর্ত্তাকে ঠকানো যায়, কিন্তু সাহিত্যের হাটে এ সব কাজ চলে না। আমরা সাহিত্যের প্রকৃত মূল্য হিসাব করিতে চাই, তাহার বেশভূষার প্রতি আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে আকর্ষণের মূল্য সামান্য বলিয়াই আমরা

বিবেচনা করি। বঙ্গসাহিত্যকে যদি কেহ মনোরম বেশভূষায় সজ্জিত করেন, তাহা হইলে বঙ্গবাসী নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন, কিন্তু বেশভূষাই যদি একমাত্র প্রশংসার বিষয় হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে বড়ই দুঃখিত হইতে হয়। ভারতবর্ষের এ সংখ্যাখানি প্রাপ্তিমাত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ইহার প্রবন্ধ-গৌরব বেশভূষার অনুযায়ী হয় নাই। আমাদের দেশের বেশী লোকই সাহিত্য পড়ার চেয়ে সাহিত্য দেখিতে ভালবাসেন। তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে গেলে ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, দেশের কোন উপকার হয় বলিয়া মনে করি না। ভারতবর্ষের কর্তৃপক্ষেরা নিশ্চয়ই সাহিত্যকে শুধু দৃশ্য পদার্থ বলিয়াই ভাবেন না। এই সংখ্যাখানি তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা বলিয়া তাঁহারা ইহার বেশভূষায় যতটা মনোনিবেশ করিয়াছেন, ইহার প্রবন্ধনির্ব্বাচনে তাহার অর্দ্ধেক পরিস্ফুট হইলে তাঁহাদের শ্রমে অনর্থক বাহুল্য ঘটিত না।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি" শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙ্গালায় "নভেল" কথাটির পরিবর্ত্তে "আখ্যায়িকা" নাম প্রচলনের প্রস্তাব করিয়াছেন। "উপন্যাস" শব্দটি অপেক্ষা এ কথাটি গৃহীত হওয়া যে যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে কথার মূল অর্থ ধরিয়া বিচার করিতে গেলে 'নভেল' ও 'আখ্যায়িকা'য় অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইংরাজী ড্রামার সহিত সংস্কৃত নাটকের পার্থক্য অনেক, কিন্তু 'ড্রামা' ও 'নাটক' এই দুই কথার প্রকৃতিগত অর্থ এক; দৃশ্য কাব্য মাত্রেরই নাম নাটক দেওয়া যাইতে পারে। বাংলায় 'নাটক' কথাটি এই অর্থব্যাপ্তি লাভ করিয়াই ইংরাজী 'ড্রামা'র প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'আখ্যায়িকা' শব্দটি সংকীর্ণ; সংস্কৃত ভাষায় এই নামের সাহিত্য যথোচিত উন্নতিলাভ করে নাই। আজকাল যে সব নভেল রচিত হইতেছে, তাহা নূতন, পুরাতন আখ্যায়িকার সহিত তাহার প্রভেদ এত বেশী যে সাদৃশ্যটুকু আমাদের নজরে পড়ে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্য নভেলের পরিবর্ত্তে 'আখ্যায়িকা' কথাটি জোর করিয়া ব্যবহার করিলে ভাল হইবে না। ললিতবাবু যাহাতে জাতীয় আত্মসম্মান প্রকাশ পাইবে মনে করেন, তাহাই যদি জাতীয় গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়, তাহা হইলে তাঁহার ও আমাদের দুঃখের অবধি থাকিবে না।

শ্রীশশধর রায়ের "ব্যক্তিত্ব কি চিরস্থির" শীর্ষক প্রবন্ধের সারমর্ম শেষ অংশে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম—"ব্যক্তিত্ব এক থাকিলেও সময় সময় ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; এবং সময় সময় এক দেহে ব্যক্তিদ্বই পৃথক হইতে পারে। তখন অন্য জীবাত্মার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করা সম্ভব হয়।" লেখকের বক্তব্য বিষয় প্রবন্ধের আকারের তুলনায় অতি অল্প, তবুও ভাষাটি পুনরুক্তিদোষে দূষিত নয়। তবে ইহাতে আলোচনার জিনিসটি বড়ই সামান্য।

শ্রীসতীশচন্দ্র বাগ্‌চী একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ করিয়াছেন। গল্পটি সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে। এক অন্ধ কেমন করিয়া এক অন্ধ রমণীকে ভালবাসিয়াছিল এবং রমণী দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবার পর কেমন করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায় তাহার বর্ণনা বেশ চিত্তাকর্ষক। সর্ব্বত্র লেখকের বর্ণনাশক্তি, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে নিপুণতা ও শিল্পচাতুর্য্যের

পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদও মন্দ হয় নাই। ভাষাটি সুন্দর, তবে দুএক জায়গায় ভাবটি ঠিক প্রকাশ পায় নাই যেমন,—"স্বচ্ছ, বড় চোকদুটি স্থির, আলোহীন, ভাষাহীন—যেন জীবনের কোন আহ্বানে সাড়া দিতে জানে না", "পাহাড়ের মুক্ত বাতাস মানুষের হৃদয়কে ছোট ছোট ভাব থেকে মুক্ত করে দিয়েছে"—এখানের "জীবনে আহ্বান" কথাটি দুর্ব্বোধ্য, "ছোট ছোট ভাব" কথাটিও তাই।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর "য়ুরোপে তিন মাস" এ সংখ্যায় বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। লেখকের ভাষা সহজ, বিশুদ্ধ। কোথাও তিনি আপনার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া বিদেশীয় চিত্রগুলি একমনে আঁকিয়াছেন। প্রবন্ধের অনেক অংশ আমরা আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি।

অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে কতকগুলিতে কোন কোন বিশিষ্ট স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কতকগুলিতে বিস্তর হিসাবপত্রের কথা আছে, কতকগুলি গল্প, কোন কোন পাঠকের নিকট হয় ত তাহাদের আদর হইতে পারে।

ভারতবর্ষে ছবির সংখ্যা অন্যান্য কাগজের চেয়ে বেশী। আজকাল ছবি না দিলে গ্রাহকসংখ্যা বাড়ে না, গ্রাহকসংখ্যা না বাড়িলে মাসিকের সম্যক পরিচালনাও দুঃসাধ্য। পাঠকেরা চিত্র ভালবাসেন, তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিলে কাগজের অবস্থা ভাল হইবে, সেই জন্য চিত্র ছাপিতে পার। তবে অনেকের মুখে শুনিতে পাই—গ্রাহকেরা ছবি ভাল কি মন্দ তাহা গ্রাহ্য করেন না, যা তা ছবি ছাপিলেও ক্ষতি নাই, ছবির সংখ্যা বেশী হইলে গ্রাহকের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইবে। একথা অর্থলিপ্সু ব্যবসাদারেরা বলিতে পারে, মাসিকপত্রের কর্তৃপক্ষের মুখে এ কথা মোটেই শোভা পায় না। আমাদের মনে হয়—ভাল ছবি ছাপা উচিত, যাহাতে শিল্পচাতুর্য্য নাই গ্রাহকদিগকে তাহাই লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবার অবসর দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। তাঁহাদের রুচি যাহাতে উন্নত হয়, তাহার চেষ্টা করাও মাসিকপত্রের কর্তৃপক্ষগণের একান্ত কর্ত্তব্য। তারপর ভারতবর্ষে অনেক লেখকের ছবি এবার প্রকাশিত হইয়াছে, এই সব লেখকদের মধ্যে অনেকে হয়ত তাঁহাদের ছবি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে লজ্জিত বা দুঃখিত হইবেন। উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান দান করিলে ক্ষতি নাই, বরং লাভ আছে, কিন্তু অনুপযুক্ত লোকের ছবি প্রকাশ করিলে হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। হয় ত ব্যবসার দিক দিয়া ইহাতে কোন সুবিধা ঘটিতে পারে, কিন্তু—সৎসাহিত্য প্রচারের বা লোকশিক্ষার ভার লইয়া শুধু ব্যবসাদারের মত ব্যবহার করিলে ধনী হওয়া যায়, দায়িত্ববোধের পরিচয় যে একটুও দেওয়া হয় না এ কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

প্রবাসী, আষাঢ়—

"ইতিহাসের ক্রম" শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের কথা আলোচনা করিতে বসিয়া অক্ষমতার পরিচয় দেন নাই। প্রবন্ধটি উৎকল সাহিত্যসমাজে উড়িয়া ভাষায় পঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার অনেকগুলি কথা আমরা গত বর্দ্ধমান সাহিত্য

সম্মিলনে শ্রীযদুনাথ সরকারের মুখে শুনিয়াছি। প্রবন্ধটির রচনারীতি ভাল বলিয়া বোধ হয় না। বিষয়ের নূতনত্ব ভাষার মাধুর্য্য কিংবা ভাবের সরল সহজ প্রকাশ চিত্তকে আকর্ষণ করে না।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্তের "বাজার দর ও বর্ত্তমান সমস্যা" সুন্দর আলোচনা। এরূপ বর্ত্তমান সমস্যার মীমাংসা করা বিশেষ আবশ্যক। এই সব আলোচনাতে দেশের জীবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দৃষ্টি অতীতের দিকেই বেশী, বর্ত্তমানের কথাটা শুনিতে বা তাহার ভাবগতিক দেখিবার জন্য আমরা মোটেই উদ্গ্রীব নই। সেই কারণেই আমরা বর্ত্তমানে পদে পদে ঠকি, আর গর্ব্ব করি অতীতের। এমন শোচনীয় অবস্থায় এই সকল আলোচনা যে অত্যন্ত উপকারী সে বিষয়ের সন্দেহ নাই।

'হারামনি' হইতে একটি গান উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বাউলের গান

যেদিন জনম সেদিন আমি দীক্ষা পেয়েছি
এক অক্ষরের মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি।
দীক্ষা বিনা চলে না যে একটি প্রাণের শ্বাস
এই কথাতে গভীর আমার হয়েছে বিশ্বাস
আমি নীর পেয়েছি, ক্ষীর পেয়েছি পরাণ পেয়েছি
তারি সাথে সাথে মায়ের শিক্ষা পেয়েছি।

এই কথাগুলির ভিতর যে কি সরল অথচ গভীর ভাব নিহিত আছে তাহা বিশদ করিয়া লেখা দুঃসাধ্য। এই ছোট গানটির ভিতর বাঙ্গালার প্রাণ, বাঙ্গালার মর্ম্মভাব কয়েকটি সরল সহজ কথায় বড়ই মধুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এরূপ গান খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ফ্রান্সের কবি মিস্ত্রালের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করিয়াছেন। কবিতায় ছন্দ আছে, তবে ভাব সুন্দররূপে প্রকাশ পায় নাই। কয়েকটি নূতন কথা উদ্ধৃত করি—

"আমরা শুনি নিশ্চুপেরি বাণী"
"সময়-ঘোড়ারে হান চাবুক"
"তোমার পরশমধু মনের মিতা
কি যে বলিব কি তা?
বুঝি নিখিসবিতা"

উপরে 'নিশ্চুপেরি' কথাটি নূতন, 'সময়-ঘোড়া' রূপকটি নূতন; শেষের কথাগুলিও নূতন, কেননা তাহাদের অর্থ বোঝা দায়। এই সব সাহিত্যের কত অংশ ভবিষ্যতে টিকিবে বলিতে পারি না। পরবর্ত্তী যুগে যদি এই সাহিত্যের শুধু নূতনত্বটুকুই বাঁচিয়া থাকে ও পাঠকেরা তাহাকে অবলম্বন করিয়াই একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিবার অবকাশ পায়, তাহা হইলে আমাদের যুগের অনেক লেখকের বিপুল পরিশ্রমের ব্যর্থতায় আমাদের চক্ষু বেদনার অশ্রুতে নিশ্চই ভরিয়া উঠিবে।

ভারতী, আষাঢ়—

"ভারতবর্ষে অর্থনীতি-অধ্যয়ন" অধ্যাপক রাসেল ও সমাদ্দারের রচিত। লেখকগণ অর্থনীতির আলোচনায় দুই প্রকার প্রতিবন্ধকের কথা বলিয়াছেন—(১) অর্থনীতি সংক্রান্ত ঘটনাবলীর জটিলতা (২) পক্ষপাতিত্ব দোষ। তার পর কি উপায়ে কোন্ পথ ধরিয়া অর্থ-নীতির আলোচনা ভারতবর্ষে করিতে পারা যায় তাহাও তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন। রচনাটিতে চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় নাই তবে যাঁহারা ভারতের অর্থনীতিসংক্রান্ত কথাগুলি আলোচনা করিতে চান্, তাঁহাদের কেহ কেহ এ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হয়ত উপকার লাভ করিতে পারেন। দুই অধ্যাপক একত্র হইয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় এখানে শক্তির অপচয় ঘটিয়াছে। লেখকগণ অল্পের জন্য অধিক ব্যয় করিয়া অর্থনীতির নিয়ম নিজেরাই ভাঙ্গিয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আধুনিক ভারত" পূর্ব্বানুবৃত্তি। ভারতীর অন্যান্য প্রবন্ধে কিছু কিছু বৈচিত্র্য সংগ্রহ করা হইয়াছে মাত্র। উপভোগ করিবার জিনিষ অতি অল্প। ভারতী ভাষার নমুনা যাহা দেখাইতেছেন, তাহা আর কেহ দেখাইতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম—

"সে উদাসী হয়ে চলে গেল,—ঘর ছেড়ে চলে গেল—কত অনামা নদীর ধারে ধারে, কত অজানা দেশের পথে পথে—একা নির্ভয়।"

"গাছে গাছে ছাওয়াকরা পথ"

(নালক—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

"আমরা এরূপ ধরিয়া লইতে পারি যে, ভারতবর্ষের অবস্থা এমন নিয়মবিরহিত যে, সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ যুক্তিগুলির কোনই মূল্য নাই এবং তজ্জন্য অমানুসিক পদ্ধতিগুলিতেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকি।"

(অধ্যাপক রাসেল ও সমাদ্দার)

"মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন তাঁহার চিত্তের গভীর জ্ঞান, মনের সরলতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল।"

(স্রোতের ফুল—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়)

"ভিতরটা তাহার অশ্রুর সাগরে ডুবিয়া গেল।"

"নবাবের প্রাণখানা আশার উল্লাসে নাচিয়া উঠিল।"

(নবাব—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)

"আরও দেখিল সম্পাদকের চক্ষু কি নির্ম্মমভাবেই অন্যের হৃদয়ের আঁচরগুলিকে পরখ করিয়া থাকে।"

(চয়ন—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই। বিলাতী কাগজপত্রে এত ভুল দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা মাসিকপত্রে এত ভুল কেন? আমাদের বোধ হয় ভাষা না শিখিয়া লেখক হইবার সাধ নিকর্ম্মা বাঙ্গালীরই স্বভাবসিদ্ধ।

সবুজপত্র, আষাঢ়—

প্রথমেই শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কবির কৈফিয়ত"। লেখক যাহা প্রচার করিতে চান্ তাহা এই প্রবন্ধে পরিস্ফুট হইয়াছে। "জীবনের মধ্যে বাঁচিবার একটা অহেতুক ইচ্ছা আছে। * * সেইটে আছে বলিয়া আমরা লড়াই করি, দুঃখকে মানিয়া লই। সমস্ত জোর জবরদস্তির শেষে একটা খুসি আছে—তার ওদিকে আর যাইবার জো নাই, দরকারও নাই। সতরঞ্চ খেলার আগাগোড়াই খেলা,—মাঝখানে দাবাবড়ে চালাচালি এবং মহাভাবনা। সেই দুঃখ না থাকিলে খেলার কোন অর্থই থাকে না। অপরপক্ষে খেলার আনন্দ না থাকিলে দুঃখের মত এমন নিদারুণ নিরর্থকতা আর কিছুই নাই; এখন সতরঞ্চ খেলাকে আমি যদি বলি খেলা আর তুমি যদি বল দাবাবড়ের লড়াই তবে তুমি আমার চেয়ে কম বই বেশী বলিলে এমন কথা আমি মানিব না।" এইরূপে জীবনলীলা ও জীবন-সংগ্রামের প্রকৃত অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া লেখক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তিনি বলিতে চান বিজ্ঞানের সহিতও প্রাচ্য মতের বিরোধ নাই। এই কথাটি একটি সুন্দর উদাহরণের দ্বারা বিবৃত করা হইয়াছে।

"মানুষের বিজ্ঞান বলিতেছে জগৎ জুড়িয়া অণুতে পরমাণুতে লড়াই। কিন্তু আমরা সেই যুদ্ধের দিকে তাকাইয়া দেখি সেই যুদ্ধব্যাপার ফুল হইয়া ফোটে, তারা হইয়া জ্বলে, নদী হইয়া চলে, মেঘ হইয়া ওড়ে। সমস্তটার দিকে সমগ্রভাবে যখন দেখি তখন দেখি ভূমার ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গে সুরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের সঙ্গে রঙের মালা বদল। বিজ্ঞান সেই সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দলাদলি ঠেলাঠেলি হানাহানি দেখিতে পায়।"

লেখক আরও বলিয়াছেন "জগতে শক্তির লড়াইটাকেই প্রধান করিয়া দেখা অবিচ্ছিন্ন দেখা, * আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। * * * আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখ দ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ * * * আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না।"

এটা শুধু তত্ত্বজ্ঞানের কথা নয়, সংসারের কাজেও ইহার দাম আছে। তবে "সৃষ্টির সমগ্রতার ধারাটা মানুষের মধ্যে আসিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেছে। তার প্রধান কারণ মানুষের নিজের একটা ইচ্ছা আছে, জগতের লীলার সঙ্গে সে সমান তালে চলে না। ইহাতে মানুষের কাজে বোঝাবুঝিটাই সব চেয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে।

"মানুষের গলদটা এইখানে যে, পনেরো আনা লোক ঠিক নিজেকে প্রকাশ করিতে পায় না। অথচ নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ। গুণী, যেখানে গুণী সেখানে তার কাজ যত কঠিনই হোক্ সেইখানেই তার আনন্দ; মা যেখানে মা, সেখানে তার ঝঞ্ঝাট যত বেশীই হোক্ না সেইখানেই তার আনন্দ। যথার্থ আনন্দই সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মত অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে।"

কিন্তু মানুষ যে কাজ করে তার অধিকাংশই নিজেকে প্রকাশের জন্য নয়। সে হয়

নিজের মনিবকে, নয় কোন প্রবল পক্ষকে, নয় কোন বাঁধা দস্তুরের কর্ম্মপ্রণালীকে পেটের দায়ে বা পীঠের দায়ে প্রকাশ করে।" সর্ব্বশেষে কবি বলিতেছেন "আমরা স্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার মত লাগাম-বাঁধা, মরিবার জন্য জন্মাই নাই। * * আমাদের সব চেয়ে বড় প্রার্থনা এই যে আবিরাবির্ম্ম এধি—হে আবি তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ, তোমার রূপই আনন্দরূপ।"

এই কথাগুলি সারগর্ভ, রবীন্দ্রবাবু ইদানীং যাহা লিখিতেছেন এই কথাগুলি তাহা বুঝিতে অনেক সময় সহায়তা করিবে স্থির করিয়া আমরা এই প্রবন্ধটির সার সংকলন করিলাম।

"ঘরে বাইরে" উপন্যাসের যতটুকু এ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লেখকের মনস্তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সন্দীপ বাবু ও ছোটরাণীর দেখা সাক্ষাৎ বড়ই উপভোগ্য; এই বর্ণনাটুকুতে লেখকের অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মেজ জা'টির চিত্তের সংকীর্ণতা দু একটি কথায় এত উজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছে, যে তাহার এদিকটি আর ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। উপন্যাস অবসরের পাঠ্য ইহাই অধিক লোকের ধারণা, রবীন্দ্রবাবু এখন দেখাইতেছেন—উপন্যাসও দর্শন শাস্ত্রের মত সারকথায় পরিপূর্ণ হইতে পারে। উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে যখন কঠিন মনস্তত্ত্বের দুর্গম গুহার মধ্যে প্রবেশ করি, তখন কখন কখন পাঠ বন্ধ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ইচ্ছাটা আর কার্য্যে পরিণত হয় না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী "চুট্‌কি" প্রবন্ধে বীরবল নাম গ্রহণ করিয়াছেন। "৺দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতিসভায় কথিত" শীর্ষক প্রবন্ধে নিজের ঠিক নামটিই আছে। দুটি প্রবন্ধেই "বীরবল" নাম থাকিলে ভাল হইত, কেননা দুটি প্রবন্ধেই বীরবলের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। একটি প্রবন্ধে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আর একটিতে শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার বড়ই লাঞ্ছিত হইয়াছেন। সমালোচনার সমালোচনায় প্রবিষ্ট হইবার ইচ্ছা নাই। তবে একটা কথা মনে হয় বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রকে "আখড়া" মনে করিয়া বীরবল যদি কেবল "লকড়ী" খেলিতেই চান্ তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রশংসা আমরা কিছুতেই করিতে পারিব না।

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত সম্বন্ধে শ্রীপ্রমথ চৌধুরী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তাঁহার মত যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াই আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"আমার দেশ" এর সুর ঝিঁঝিট, কিন্তু এ ঝিঁঝিট এবং বাঙ্গলা ঝিঁঝিটে তফাৎ এত বেশি যে, প্রচলিত ঢঙে এ গান গাইতে গেলে এর সুর একেবারে এলিয়ে পড়বে। অথচ "আমার দেশ" এর ঝিঁঝিটের সকল সুর বজায় আছে এবং তার তালও পূরামাত্রায় একতালা। অতএব এ কথা সাহস ক'রে বলা যেতে পারে যে, আমাদের রাগরাগিণী ৺দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে বেঁকেচুরে গেলেও ভেঙ্গেচুরে যায় নি।

"সোনার কাঠি" প্রবন্ধে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন—"আমাদের সাহিত্যচিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌচেছে। কিন্তু সঙ্গীতে পৌছায় নি। সেইজন্য আজও সঙ্গীত জগতে দেরী করচে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে। সেই জন্য সঙ্গীতের

বেড়া টলমল করচে। একথা বলতে পারব না, আধুনিকের দল গান একেবারে বর্জ্জন করেচে। কিন্তু তারা যে গান ব্যবহার করচে, যে গানে আনন্দ পাচ্চে সে গান জাত-খোয়ানো গান। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নেই, কীর্ত্তনে বাউলে বৈঠকে মিলিয়ে যে জিনিষ আজ তৈরি হয়ে উঠচে, সে আচারভ্রষ্ট। তাকে ওস্তাদের দল নিন্দা করচে। তার মধ্যে নিন্দনীয়তা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিন্দনীয়তাই যে সব চেয়ে বড় গুণ তা নয়। প্রাণশক্তি শিবের মত অনেক বিষ হজম করে ফেলে। লোকের ভাল লাগচে; সবাই শুনতে চাচ্চে, শুনতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়চে না,—এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্গুতা ঘুচল, চলতে সুরু করল। প্রথম চালটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গী হাস্যকর এবং কুশ্রী—কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে চলতে আরম্ভ করেচে—সে বাঁধন মানচে না, প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধই যে তার সবচেয়ে বড় সম্বন্ধ, প্রথার সঙ্গে সম্বন্ধটা নয়, এই কথাটা এখনকার এই গোলমেলে হাওয়ার মধ্যে বেজে উঠেছে। ওস্তাদের কারদানিতে আর তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।"

এ কথার উত্তরে আমরা বলিতে চাই—আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি সোণার কাঠির স্পর্শে আমাদের জাগাইয়াছেন। তিনি আসিতেই তাঁহাকে আমরা বরণ করিয়াও লইয়াছি। প্রাণহীন সাহিত্য ও চিত্র লইয়া আমরা অসাড় ভাবে একটা গতির প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—যখনই তাহা আসিল, আমাদের সাহিত্য ও চিত্র উন্নতি পথে যাত্রা করিল। আমাদের দেশে গানের কথাটা কিন্তু স্বতন্ত্র। ওস্তাদ কালোয়াতের যুগ হইতে ইহা ক্রমশঃ উন্নতির পথেই চলিয়াছে। কীর্ত্তন, বাউল ও প্রতিভাবান্ গায়কের চাল গানের জীবনী-শক্তিকে কখনও স্তম্ভিত হইতে দেয় নাই, সুতরাং গানের ক্ষেত্রে আমরা বিদেশের রাজপুত্রকে বরণ করিতে চাই নাই, সেই জন্যই তাঁহার সোনার কাঠি এখানে আপনার অক্ষমতারই প্রমাণ দিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যে ইংরাজী চাল বাঙ্গালা গানে আনিয়াছেন, তাহাও অসময়ে আসিয়াছে, কেননা দেশ এখনও সে চালটাকে আয়ত্ত করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। আজকাল যে সব গান চলিয়াছে তাহা "আচারভ্রষ্ট" হইতে পারে, কিন্তু তাহারা জাতি খোয়ায় নাই। জাতির সহিত প্রাণের সম্পর্ক আছে। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গান যদি জাতি হারাইয়া পুরাদস্তুর ইংরাজি হইয়া যাইত তাহা হইলে সে গান শুনিবার জন্য বোধ হয় একটুও ইচ্ছা হইত না। আধুনিকের দল শুধু যে আচারভ্রষ্ট গান পছন্দ করে তাহা নয়, ওস্তাদি গানের প্রতি অনেকের ঝোঁক পড়িয়াছে। লেখক অনেক গানে ওস্তাদি গানের সুর, তাল, লয় অনুকরণ করিয়াছেন, সেগুলি শুনিতে চায় না এমন লোক বিরল। আধুনিকের দল যে গান পছন্দ করে তাহা সবই সমুদ্রপারের রাজপুত্রের কৃপায় হয় নাই; ওস্তাদি গানের আদর দেশে চিরকালই আছে। মধ্যে সে আদর কমিয়াছিল, এখন আবার বাড়িতেছে, সেই জন্য অল্পকাল পরেই গানের প্রাণশক্তি বাড়িয়া উঠিলে কেহ যদি সমুদ্রপারের রাজপুত্রের স্তুতি গান করিতে বসেন, তাহা হইলে তাঁহার কাজটা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

দেশে আচারভ্রষ্ট গানের আদর ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। "লেখকের ভাল লাগচে,

সবাই শুন্‌তে চাচ্ছে, শুন্‌তে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে না,"—এটা বড় কথা নয়, "চল্‌তে সুরু" করিলেই আশা হইতে পারে, কিন্তু সে আশার সাফল্য অনেক দূরে। সমুদ্রপারের রাজপুত্র গানে আসুন, এখানে তাঁহাকে সোনার কাঠি হাতে করিয়াই বসিয়া থাকিতে হইবে, হয় ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তঁহার লজ্জা বোধ হইতে পারে।

নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ—

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত-চিত্র ২ দফা প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় (১) "অতি সম্ভ্রান্তবংশে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়।" এই পরিবারে না জন্মিলে বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক বঙ্কিমচন্দ্র হইতেন কি না, বলা যায় না!" (?) (২) "বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চরিত্রের মূল সরঞ্জামগুলি তাঁহার পিতামাতার, তাঁহার বংশধারার এবং পরিবারবর্গের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন।" (৩) "বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিত্যনূতন জ্ঞানার্জ্জনে নিযুক্ত ছিলেন। (৪) "এখনকার সাহিত্যিকেরা প্রায় অনেকেই হয় স্বয়ংসিদ্ধ, না হয় কৃপা সিদ্ধ ......বঙ্কিমচন্দ্রকে কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল।" এই কয়েকটি সর্ব্বজন-পরিচিত সংবাদ বিপিনবাবু তাঁহার স্বাভাবিক শব্দ-সম্পদের বলে এক প্রকাণ্ড প্রবন্ধে পরিণত করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর জন্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে, তিনি তাঁহার পিতৃপিতামহের চরিত্রের এবং জীবনের বৈশিষ্টাগুলি আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারিতেন। অথবা বঙ্কিমবাবুর জ্ঞানার্জ্জনের প্রণালীর একটি বিশ্লেষণও তাঁহার পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিতেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাদের অন্ধকার ঘুচাইবার দিকে তিনি মোটেই যত্নবান নহেন। তিনি বঙ্কিমবাবুর জীবনে কারণ-পরম্পরার প্রভাব দেখাইতে গিয়া Evolution, Heredity, struggle for existence, Natural selection, B ogenesis. abiogenesis কর্ম্মবাদ science এবং artএর সম্বন্ধ এবং আত্মার নিত্যতা, মায়াবাদ প্রভৃতি অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের সাগর-মন্থন করিয়াছেন। জীবনচরিত এবং চরিত্র-চিত্রে আমরা চাই—ইতিহাস ঘটনার সমাবেশ, facts : পাল মহাশয় তাহার পরিবর্ত্তে দিয়াছেন—তাঁহার কল্পনা, জল্পনা, ও খিচুড়ি! এ অত্যাচার চলিবে কেন?

একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে সে আবার "ভোগ ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া এই সৃষ্টি প্রবাহের মধ্যে আপনাকে প্রাপ্ত হয়" ও "পূর্ণ করে" কি করিয়া? যে অপূর্ণ, যাহার ক্ষয় বৃদ্ধি ও লয় আছে, সে আবার 'নিত্য' কিসের? পাল মহাশয়ের দার্শনিক মত বিচিত্র! 'চক্র বা চড়ক' শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি সরস কবিতা। গিরিজাবাবুর হাত বড় মিঠে; তাই এই ভাব-পূর্ণ কবিতাটি, 'প্রেম বর্জ্জিত' হইলেও, আমরা 'সরস' বলিতে দ্বিধা করিব না। 'চড়কে' যে আধ্যাত্মিক কল্পনার বিকাশ দেখিতে পাই, তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত...শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি সরস রচনা। বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিতে গিয়া লেখক যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন তাহাই বেশ একটি সংযত শুদ্ধ হাস্যরসে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

"শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক জৈন মত খণ্ডন" একটি দর্শন বিষয়ক রচনা। লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত। রচনাটি নব্যভারতেও প্রকাশিত হইয়াছে। বাহ্লিক দেশে অবস্থান কালে শঙ্করাচার্য্যের সহিত কতিপয় জৈন পণ্ডিতের যে বিচার হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটি লিখিত। কিন্তু প্রবন্ধকার "সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ" হইতে আর্হত দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। পরিশেষে শারীরক ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে—যে স্থলে শঙ্কর মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধদিগের মতের নিরাস করিয়া মুক্তাম্বর জৈনদিগের মত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—সে স্থল হইতেও তিনি তাঁহার প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। জৈন-দর্শন আমাদের বেশী পরিচিত নহে। আমরা শুধু জানিয়া রাখিয়াছি যে জৈনদিগের নিকট অহিংসা পরম ধর্ম্ম। কিন্তু ইহা শুধু জৈনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন "মা হিংস্যাঃ সর্ব্ব-ভূতানি'। জৈনদিগের ইন্দ্রিয়জয়ে কঠোর সাধনা হিন্দুধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠ ফল। সার সত্যের আলোচনায়, আত্মতত্ত্বানুশীলনে জৈনগণ কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাই বিশেষভাবে অনুশীলনের বিষয়। অনেকে মনে করেন, যে জৈন-দর্শন বৌদ্ধ দর্শনের শাখাবিশেষ। প্রবন্ধলেখক শুধু এই ধারণার কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, ইহার প্রতিবাদ স্বরূপে তিনি বিশেষ কোনও যুক্তির অবতারণা না করিলেও, তিনি যে এই ধারণা অমূলক বলিয়া মনে করেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন মতের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, অনেক বিষয়ে উহারা পরস্পর বিরোধী। প্রবন্ধলেখক যদি সাম্য ও বিরোধিগুলিকে একত্র উপস্থাপিত করিতে পারিতেন, তবে প্রবন্ধের গৌরব অনেক বৃদ্ধি পাইত। জৈনেরা ক্ষণিকত্বে আস্থাবান নহেন। আত্মাকে জৈনেরা নিত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। জৈনেরা অশৌচপালনে জাতিভেদ মানেন। তীর্থঙ্করেরা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন; সেই জন্য ক্ষত্রিয়ের অশৌচকাল ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও অল্প। জৈনমতে শূদ্রেরা জিন পূজার অধিকারী নহে। দিগম্বরদিগের মতে স্ত্রীলোকেরা মোক্ষের অধিকারিণী হন না। বৌদ্ধেরা ঐকান্তিকত্ববাদী (absolutists) জৈনেরা অনৈকান্তিকত্ববাদী (non-absolutists) অর্থাৎ ইঁহারা কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। কোন বস্তু আছে বা নাই, ইহার কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

ঘটোঽস্তীতি ন বক্তব্যং সন্নেব হি যতো ঘটঃ
নাস্তীত্যপি ন বক্তব্যং বিরোধাৎ সদসত্ত্বয়োঃ।

ঘট হয়ত আছে; হয়ত নাই। ইহার নাম "স্যাৎ-বাদ।" স্যাৎ অর্থে "হয়ত"; অনেকান্তদ্যোতক বা অনিশ্চয়তা বোধক। সপ্তভঙ্গি ন্যায়ের দ্বারা এই অনিশ্চয়তা প্রতিপাদন করাই জৈন দর্শনের উদ্দেশ্য। জৈনেরা কর্ম্মফলে বিশ্বাস করেন, এবং সেই ফল-ভোগের জন্যই আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করেন, বৌদ্ধেরা করেন না। আমার বোধ হয় এইখানেই বৌদ্ধ ও আর্হত দর্শনের প্রকৃত প্রভেদ। জৈনদিগের নির্জ্জর মোক্ষ এবং বৌদ্ধ-দিগের সর্ব্বশূন্যময় নির্ব্বাণেও যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি সারবান হইত। তাহা না করিয়া নিতান্ত গতানুগতিকের ন্যায়

পরিভাষা-কণ্টকিত সর্ব্বদর্শনকারকৃত সার সংক্ষেপ দেওয়াতে প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য বা সহজ বোধ্য হইতে পারে নাই। লেখক পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ইচ্ছা করিলেই এ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বিশদভাবে বলিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর "বৈশাখীতে" ছন্দের ঝঙ্কার আছে, কল্পনার বাহার আছে, দুর্ব্বোধ্যতা আছে, বৈশাখের সাঁঝের বেলা, কুহুর তান, মেঘের মেলা, বরষার ধারা, আর কদম্ব রেণুর (?) ছড়া ছড়ি আছে! পরিশেষে নায়িকার সংহার (?) এবং "বঁধুয়া কাঁদিছে দুখে"র দ্বারা কবিতাটির উপসংহার হইয়াছে।

শ্রীমতী জগদম্বা দেবীর "আমার কথা" কিছুই বুঝা গেল না; যেন বুঝি বুঝি, অথচ বুঝি না। প্রথমে মনে হয় এটি বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম, আবার মনে হয় কাব্য; কোনও কোনও স্থলে অমিত্রাক্ষর কবিতা বলিয়াও ভ্রম হয়! দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

তবে যে
আমাদেরও মাঝে মাঝে,
মাথা নীচু,
কাঁচু মাচু
করতে দেখ, সে কেবল
যাদের বড় বড়াই
যাদের বড় চাই
তাদের দিকে যে চাই,
সমানে চাইতে
পারিনে তাইতে?

অথবা—

মধুমাখা বুলি আমার
ছিল যে তখন,
এখন কি বুলি
মধুমাখা নয় বল্‌তে চাও?

উদ্ধৃত বাক্যগুলি আমি পদ্যের আকারে বিন্যস্ত করিয়াছি মাত্র; দাড়ি, কমা পরিবর্ত্তন করি নাই। অনেকবার পড়িয়া শেষ স্থির করিয়াছি, ইহা হয়ত একটি স্বগতঃ উক্তির ছোট গল্প। কোনও এক নায়িকার "যৌবন যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল," তার পরে "তাঁহার 'সঙ্গী চোর' যৌবনের দশা দেখে, থতমত খেয়ে গেল।" নায়িকা ও কালে ভদ্রে এক আধ দিন প্রাণের দায়ে—যখন নিতান্ত চারা থাকে না,—তখন, চুরি করিয়া থাকেন। এই কবুল জবাবের সঙ্গে সঙ্গে, এই ক্ষুদ্র গল্পের বা খণ্ডকাব্যের উপসংহার হইলে ছিল ভাল। কিন্তু নায়িকা 'মরিয়া হইয়া' গেছেন, নামজাদা দাগা চোরকে পর্য্যন্ত চুরি শিখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই দাগাচোর যৌবনের-লোভে পড়িয়া আটক হইল। "আজ এঘরে যৌবন বাঁধা,—চোর আটক।" এইটুকু বোধ হয় গল্পের সারাংশ; কিন্তু আমি ইহা অতি কষ্টে সংকলন

করিয়াছি। জগদম্বাদেবীর উদ্দেশ্য অন্যরূপ হইলেও পারে। আসল কথা, সমস্ত জিনিষটাই একটা মস্ত ধাঁধাঁ বা প্রহেলিকা। "নারায়ণ" সম্পাদক এই সকল সেণ্টিমেণ্টাল রাবিশ পত্রস্থ করিয়া কেন যে যুগপৎ শিষ্টতার প্রেত-তর্পণ ও সাহিত্যের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতেছেন, তাহা কেহ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? সমস্ত প্রবন্ধটায় আছে কেবল বাচালতা, অসারতা আর শিষ্টতার শ্রাদ্ধ! জগদম্বাদেবীর কি এমন কোনও বন্ধু নাই, যিনি তাঁহাকে এই অসংযত, রমণীসুলভলজ্জাবর্জ্জিত, দুঃসাহসিক রচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন? "মরণে জয়" একখানি নাটক। লেখক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। "নারায়ণে"র নাট্যকার সত্যেন্দ্রকৃষ্ণের নামের সহিত পাঠকসমাজ বিশেষ পরিচিত নহেন। সাহিত্যের পাঠশালে তাঁহাকে আমরা মক্‌শো করিতে দেখি নাই। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে তিনি একেবারে নারায়ণ-সম্পাদকের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়াছেন। নারায়ণ সম্পাদক বোধ হয় সেই দলের লোক যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, কবি বা নাট্যকার 'জন্মে না, আকাশ থেকে পড়ে অথবা ভূমি হইতে ফুঁড়িয়া বাহির হয়। যাহা হউক, আমাদের এই নবীন নাট্যকার নারায়ণ শিলায় নবরসের যে ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন তাহাতে পাঠকের চিত্ত মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে কি না বলিতে পারি না, তবে অনেক গৃহ প্রাঙ্গন হইতে এই নাটকের বিশ্লিষ্ট পল্লব যে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি। কি গুণে যে এই আবর্জ্জনারাশি নারায়ণের পৃষ্ঠায় স্থান পায় তাহা বুঝি না। একদল লোক আছেন, যাঁহারা গড়িতে পারেন না, কিন্তু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধ্বংস করিয়া জগতে একপ্রকার কীর্ত্তি প্রচার করিতে চাহেন। নারায়ণ-সম্পাদক ত সে প্রকৃতির লোক নহেন! তার পরে সাহিত্যে কতকটা স্বেচ্ছাচারিতার আমদানী করিয়া বিকৃতরুচি-বিশিষ্টদিগের মধ্যে মাসিক-পত্রখানিকে চালাইয়া কিছু পয়সা করিয়া লওয়ার ইচ্ছাও তাঁহাতে সম্ভবে না। সুতরাং আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না যে, বিজ্ঞ সম্পাদক কি ছলনে ভুলিয়া ভাষার উপর, রুচির উপর, জনসাধারণের বিশ্বাসের উপর এমনভাবে ষ্টীমরোলার চালাইতেছেন! বক্ষ্যমাণ কথা-নাট্যে কিছুই ত নাই, তবে খুব মৌলিকতা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে originality পুনঃ পুনঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার রুচিতে। অশ্লীলতার সীমা লঙ্ঘনে তিনি বিশেষ নিপুণ কারিগর। সকলপ্রকার শিষ্টতার আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া কেমন করিয়া বীভৎসতার নগ্নমূর্ত্তি নির্লজ্জভাবে লোকসমক্ষে ধরিতে হয়, সে আর্টটুকু তিনি বেশ করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার আর এক মৌলিকতা চরিত্র-চিত্রণে। জ্যোৎস্না কুলবধূ—তাহার মুখে বারাঙ্গনার প্রগল্‌ভতা দেওয়া হইয়াছে, আর আঙুর বারাঙ্গনা,—তাহাকে গৃহস্থবধূর তেজস্বিতা দিয়া সাজানো হইয়াছে। এমন নহিলে মৌলিকতা হইবে কেন? আঙুর বলিতেছে—শশি, (হ্রস্ব ইকার বোধ হয় ঝি ঠাকুরাণীর সম্বোধনে?), তোকে মাইরি বল্‌ছি—যখন চুমু খায় ঠোঁট দুটা পুড়ে যায়...তারা কি শান্তি পায় তা আমি ত বুঝিনি। এক এক সময়ে মনে হয় ঠোঁটে হাত দিয়ে দেখি ঠোঁটে ফোসকা পড়্‌ল কি না..." অথচ পাঁচ বৎসর এই ভাবে কাটিতে কোনও বাধা হয় নাই। এবং সে দিনও রমেন্দ্র-আঙুরের জন্য স্ত্রীর গলা থেকে নেক্‌লেশ ছিনাইয়া আনিতে গিয়াছে। "নহিলে

যে আঙুর মদ খাবে না!" আঙুর পাঁচ পাঁচ বৎসর রমেন্দ্রের সঙ্গে থাকিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, নাঃ আমি ত তাকে ভালবাসি না। যেমনি সে কথা মনে হওয়া অমনি লেকচার—"তোমার টাকা চেয়েছি—তোমায় চাই নি, যাও, যাও আমার সামনে থেকে সরে যাও...অনেক...আজ অনেক বছরের ভুল ভেঙ্গেছে।" "আমি জানি কাকে ভালবাসা বলে —আমি ভালবাসি কিন্তু তোমাকে নয়—আমি ভালবাসারআগুনে জলে মরছি রমেন্! রমেন্! আমি আর তোমার রমণী নই।" আঙুর ভালবাসার আগুনে পুড়িয়া মরিয়াও অনুপ্রাসের মমতা কাটাইতে পারিল না। এ মৌলিকতা নয় ত কি? এর পরে রমেন্দ্রের ম্যাড্ সিন ও শোভনার মেলো ড্রাম্যাটিক উচ্ছাস। "তোমার জন্য বুকের লজ্জাবাস খুলে ফেলে এলাম... সর্ব্বকান্তি নগ্ন করে দিলাম" ইত্যাদি। ঋষ্যশৃঙ্গের অথবা শুকদেবের ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য বাসব প্রেরিত কোন উর্ব্বশী মেনকাও এমন নির্লজ্জভাবে আত্ম-নিবেদন করিতে পারিত না। কিন্তু রমেন্দ্রের মন ভুলিল না। সে রূপ, যৌবন, রস লেখকের ভাষার চটুলতায় রঞ্জিত হইয়াও রমেন্দ্রের নেশা টলাইতে পারিল না। তখন শোভনা আজকালকার রীতি অনুসারে কেরোসিন বস্ত্রে মাখিয়া নিজে জ্বলিয়া মরিল। কিন্তু স্নেহলতার পর হইতে সে ত আজকাল অনেকেই করে। লেখকের মৌলিকতা থাকে কোথায়? তাই লেখক শোভনার পিতাকেও ঐ সঙ্গে কেরোসিনসাৎ করিয়াছেন। বেচারা শোভনার খোঁজ লইতে আসিয়াছিল—এই অপরাধ; লেখকের কবলে পড়িয়া সেও সঙ্গে পুড়িয়া মরিল। এর মধ্যে একটি উড়িয়া চাকরকেও জুটানো হইয়াছে, সেইটাকেও অগ্নি-সৎকার করিয়া দিলে চমৎকার হইত। কেন না তাহার জাত বুলি সে লেখকের খপ্পরে পড়িয়া ভুলিয়া গিয়াছে। যাঁহারা উড়িয়া না জানেন, তাঁহাদের চোখে ধূলি দিয়া লেখক এখানেও অপূর্ব্ব মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

এই অপবিত্র, পঙ্কিল, অনিষ্টকর তৃতীয় বা চতুর্থশ্রেণীর রচনার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া মানসীর পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নারায়ণের এই অমার্জ্জনীয় স্বেচ্ছাচারিতা উপেক্ষা করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। ইবসেন প্রভৃতি প্রতিভাপন্ন নাট্যকার দুই একস্থলে যাহা করিয়াছেন, তাহার এমন জঘন্য অনুকরণ করিয়া বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গে আঘাত করিবার অধিকার কাহারও নাই।

প্রার্থনা

(ওগো) আধেক আঁচলে বসাইয়াছিলে
"নিভৃত কুটীর-তলে,
"তোমায় দুঃখ দিবনা বন্ধু"
ব'লেছ নয়ন-জলে;
মনে পড়ে কিগো প্রদোষ-আঁধারে
"প্রান্তর-তরু-মূলে"
জীবন জুড়ানো সুধারসোহাগ
ঢেলেছ পরাণ খুলে!

(আর) "জীবনে হবেনা বিরহ বেদনা"
এই না অভয় বাণী
শ্রবণের মূলে রাখিয়া অধর
শুনাতে জীবনরাণি ;
(আজি) গত দিবসের শত বাধাময়
ক্ষণিক মিলন তরে
(হায়) দিবস নিশায় প্রদোষে উষায়
কত না অশ্রু ঝরে !
(তুমি) জীবন মরণ যাহা দাও তাই
দিও হে প্রাণের প্রিয়,
(শুধু) শেষ দিনে মোর অবসান সাঝ
হয় যেন রমণীয়।

ডায়ারি

(প্রেরকের পত্র)

মাননীয় মানসী সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

আমি একজনকে চিনিতাম, তাহার নাম কেহই জানিত না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত তাহার নাম "পাগ্‌লু।" এ নাম তাহাকে কে দিয়াছিলেন তাহা সে ভিন্ন আর কেহ জানিত না, সে কাহাকেও সে বিষয়ে কিছুই বলিত না। তাহার চাল চলন ভাব ভঙ্গী দেখিয়া এবং দুই একটি কথার আভাসে মনে হইত, যিনি তাহাকে "পাগ্‌লু" নাম দিয়াছিলেন তিনি ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না। তাহার থাকিবারও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, যখন যেখানে সুবিধা সেই খানেই সে থাকিয়া যাইত। পরের কাজে সময়ক্ষেপ করা ব্যতীত নিজের জন্য তাহাকে কোন দিন কিছু করিতে কেহ দেখে নাই; সে একরূপ পাগলই ছিল বটে। এক দিন হঠাৎ সে কোথায় চলিয়া গেল, তদবধি আর কেহ তার কোন সন্ধান পায় নাই। আমি একদিন এক পুরাতন পুস্তকের দোকানে বই খুঁজিতে ছিলাম, হঠাৎ একখানি ছেঁড়া ডায়ারির মত খাতার দিকে আমার নজর পড়িল, হাতে নিয়া দেখিলাম—খাতাখানি হাতে লেখা

ডায়ারিই বটে। সব লেখাগুলি স্পষ্ট নহে, অনেক দিনের লেখা, কালির দাগ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে ; এক একটি অধ্যায়ের নিচে নাম লিখিবার স্থানে লেখা আছে "পাগ্‌লু।" আমার সেই পূর্ব্ব পরিচিত পাগ্‌লুর কথা মনে পড়িল—স্থানে স্থানে লেখা পড়িয়া দেখিলাম, পড়িতে পড়িতে আমার চক্ষু অনেকবার জলে ভরিয়া আসিয়াছে। "পাগ্‌লু"ত আর এখানে নাই, বাঁচিয়া আছে কিনা তাহাও আমি জানিনা; যিনি তাহাকে "পাগ্‌লু" বলিয়া ডাকিতেন তাঁহার কাছে এ লেখাগুলির মূল্য থাকিতেও পারে—তাঁহাকে যদি জানিতাম, এ খাতাখানি তাঁহাকে দিতাম। আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য ইহার কোন কোন অংশ পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া পাঠাইলাম, উপযুক্ত মনে হইলে অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন। আমার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কেহ খোঁজ করেন তবে তাঁহাকে এই খাতাখানি দিব—আমার নিরুদ্দিষ্ট বন্ধু "পাগ্‌লু"র প্রেতাত্মা তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারে—এই আমার বিশ্বাস। খাতার যে অংশ প্রকাশ করিবার জন্য লিখিয়া দিলাম উহা শেষের দিকের অংশ—লেখার ভাবে মনে হয় "পাগ্‌লু" নিরুদ্দেশ যাত্রার পূর্ব্বে এই অংশ গুলি লিখিয়া গিয়াছে। যিনি তাহাকে "পাগ্‌লু" নাম দিয়াছিলেন তিনি ইহা পড়িলে বুঝিতে পারিবেন, "পাগ্‌লু" কি দুঃখে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। ডায়ারিখানি বহির দোকানে কেমন করিয়া আসিল তাহা বলিতে পারি না, বোধ করি যাহার ত্রিসংসারে কেহ নাই, তাহার মনের কথা ধূলি কর্দ্দমের মধ্যেই লুটাইয়া এমনি করিয়াই নীরব হইয়া যায়।

বশংবদ

শ্রীকান্ত

কোথায় জীবনের আনন্দ, কাহার পদতলে জীবনের চরম সার্থকতা, তাহা বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু আমার জীবনোপবনের বসন্ত-লক্ষ্মী আমার ব্যাকুল বাহু প্রসারের মধ্যে ত নয়, তাই যে মালঞ্চ নন্দনের শোভা সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিত তাহা জীবনকাল ধরিয়া কাঁটায় ভরিয়াই রহিয়া গেল। মলয়ের মদির নিশ্বাসের মধ্যে এক বর্ণ বৈচিত্রময় বিহ্বল বসন্তের সুখ-বেদনাকুল সন্ধ্যায় জীবন-দেবতার সম্মুখে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম—সে কি মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত! বাতাস ভরিয়া সাহানার সুরে বাঁশরী বাজিয়া উঠিল, নীলাম্বরে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ, আর আমার সম্মুখে আমার হৃদয়াকাশের সুধাময় পরিপূর্ণ চন্দ্রমা! চির তৃষ্ণাতুর

আমার দুটি চক্ষু-চকোর কেমন করিয়া সে চাঁদের সুধা পান করিতেছিল তাহা কি বলিতে পারি? জন্মজন্মের আকাঙ্ক্ষা এক নিমেষে মিটাইবার জন্য যে আগ্রহের সুধা পান তাহা বলিবার ভাষা হয় নাই; বুঝি হইবেও না। তারপর পাষাণ দেবতার তীর্থ-মন্দিরের সোপান শিলায় শির নোয়াইয়া কতই আবেদন, আকাশভরা তেত্রিশকোটি অলীক স্বপ্নের কাছে কতই ব্যর্থ আরাধনা! তারপর নিয়তি-নির্দিষ্ট নিত্যনিয়তের ব্যথা বেদনার মধ্যে জীবনপাতের ইতিহাস বিদীর্ণ হিয়ার শোণিত বিন্দু দিয়া এই কয়টা পাতার মধ্যে লিখিয়া রাখিয়াছি। এখন বুঝি সে লেখারও শেষ হইয়া আসিল, কারণ জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টার মধ্যে লিখিয়া রাখিবার মত ঘটনা ঘটিবার আর সম্ভাবনা একরূপ নাই। বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রান্ত দেহ ভূশয়নে রাখিয়া চক্ষু মুদিবার পূর্ব্বে একান্ত মনে বিশ্বদেবতার চরণোপান্তে আর চক্ষু যেন উন্মীলন করিতে না হয় বলিয়া যাহাকে প্রতিদিন প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত কামনা করিতে হয়, ডায়ারি রাখিবার প্রয়োজন তাহার জীবনে হইবার কি সম্ভাবনা আর আছে?

"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।"

যে কবির রচনা সে এই বিশ্বলীলার গতি ভাল করিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল। আজ আমিও দেখিতে পাইলাম; সমগ্র প্রাণের সমস্ত কামনা দিয়া যাহা ঘটুক বলিয়া জীবনের সবগুলি দণ্ড পল মুহূর্ত, প্রার্থনায় ভরিয়া রাখি তাহা এক নিমেষে টুটিয়া লুটিয়া ধূলিতলে পড়িয়া যায়, আর যাহার কল্পনায় পর্য্যন্ত হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হইতে চাহে, তাহাই মূর্ত্তিমান হইয়া নিমেষার্দ্ধে জীবনের নন্দন বনকে দগ্ধ খাণ্ডবে পরিণত করিয়া দেয়। যে বিশ্ব-দেবতার ইচ্ছায় জগতের বিচিত্র লীলার সৃজন সে লীলার দুঃখ সুখের ভোক্তাও তিনি, ইহা ভাবিতে যদি পারিতাম তবে কোন আপদই ছিল না, তাহা হয় না। জীবনের সহিত জীবন জড়িত হইয়া মণিকাঞ্চনের সৌন্দর্য্য যখন বিকাশ করে সে সমস্তই আমাদের কৃত কর্ম্ম ভাবিয়া আনন্দের আবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সুখ কল্পনায় নিবিষ্ট হইবার যখন উদ্যোগ করিতেছি তখন মেঘ বিহীন নীলাম্বর হইতে অকস্মাৎ অশনি সম্পাৎ তুল্য দুঃখের বজ্রাঘাতে আমার সুখ আশার স্বর্ণ সৌধ-চূড়া ভূমিসাৎ হইয়া যায়, চক্ষের জলে তখন সব অন্ধকার হইয়া উঠে! ইহাই জগতের অতি প্রাচীন এবং অতিবড় দুঃখ! এই দুঃখের মধ্যেই এ জীবনের শেষ কিনা তাহা জানি না, কেহ সে কথা বলিয়া দিতে পারে না, তবে সুখের আশাটিকে একান্ত উপায়হীন শকুন্ত শাব-

কের মত হৃদ্‌পিণ্ডের কোমলাবরণের মধ্যে লুকাইয়া নিয়া এই অনন্ত ব সাঁতার দিয়া পার হইতে চেষ্টা করি, ঝড় ঝঞ্ঝায় পুনঃ পুনঃ বিধ্বস্ত হইতো প্রাণপণ উদ্যমের বিরতি নাই, হায়রে! ইহারই নাম জীবন যাত্রা। সে যাত্রা আমিও নির্ব্বাহ করিয়াছি, তুমিই করাইয়াছ। হে আমার জন্মজন্মা চির সুহৃদ্, অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া দিক্‌চক্রবালের অন্তরালে যে নবনন্দন সাজ্জ হইতে পারে, এ নিরাশ জীবনের অপরাহ্নে সন্ধ্যাদীপখানি জ্বালিবার লোকটি আজও আসিতে পারে, দিনান্তের শাকান্নের স্থালীখানি আমার কোলের কাছে আগু বাড়াইয়া দিবার স্নেহ-হস্তখানি আমার সেই জীবনাপরাহ্নের জন্য যে উৎসুক হইয়া আছে সে ইঙ্গিত তুমি করিয়াছ—সেই ইঙ্গিতের আদেশকে ঈশ্বরের অবশ্য সম্ভাব্য অভ্রান্ত দৈববাণী বলিয়া মাথায় নিয়া আমার বন্ধুর পথের সকল বাধা সমতল করিয়া রুদ্ধশ্বাসে যে ছুটিয়াছিলাম, সে আগ্রহের নিরলস যাত্রা আমার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আজ পথপার্শ্বের ধূলিতলে নিতান্ত উপায়হীন ভাবে বসিয়া ভাবিতেছি, এ কি হইল, কেন হইল? চিরান্ধকারে আবৃত অন্তরের মধ্যে মনিদীপখানি জ্বলিয়া কেন আবার নিবিয়া গেল, চিরাভিলষিতের রাগারুণস্পর্শে চিরমুদ্রিত হৃদয়-শতদল যদি বিকশিত হইয়াই উঠিল তবে চিরা-কাঙ্ক্ষিত দেবতার পাদপীঠ হইবার সৌভাগ্য তাহার হইল না কেন? প্রাণপাত্র খানি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব চিত সঞ্চিত অমৃতরসে পরিপূর্ণ করিয়া দেবতার ভোগের জন্য ধরিলাম, চির করুণার দেবতা আমার মুখ ফিরাইয়া নিলে কেন, জীবনভরা পূজায় কি ত্রুটী হইয়াছে হে জীবন দেবতা? আজ এই মৃন্ময়ী মূক ধরণীর জীর্ণ পথপার্শ্বের পাংশুস্তূপের উপর পড়িয়া চিরতৃষ্ণাতুর, চিরবুভুক্ষিত, অসহায় মানব-আত্মা যে বারবার যোড়করে বলিতেছে "লও, লও, আমায় লও, ওগো, আমায় লও" তাহার এই দুঃসহ বেদনাভারগ্রস্ত হৃদয়ের আর্ত্ত রোদন ব্যর্থ হইতেছে কি অমার্জ্জনীয় অপরাধে? নব নীরদের নীলাঞ্জন ছায়ায় আকাশ ছাইয়া গিয়াছিল, স্নিগ্ধ কান্ত সুন্দর সজল জলধর যে তৃষার্ত্ত চাতকীর কাণে বারবার করিয়া স্নেহ-গম্ভীরস্বরে আশ্বাসের অভয়বাণী শুনাইয়াছে, তারপর এ বজ্রাগ্নি, এ করকাভিঘাত, কোন ক্ষমাহীন পাপের গুরু শাস্তি তাহা আমায় কে বলিয়া দেয়?

জীবনারম্ভের একজন, জীবন শেষের একজন, আমার ত্রিভুবনের একমাত্র জনকে আশ্রয় করিয়া যে তরী ভাসাইলাম তাহাও কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না কেন? কেন?—এ ভারতবর্ষে মনুর পদতলে যুগ যু ধরিয়া মানব হৃদয়ের মিতা বলি চলিতেছে—সেই জন্য। নিজে মরিয়া,

স মারিয়া দুদিনের লৌকিক যশোলাভ করিব, সেই জন্য। সীতার জন্য অযোধ্যাবাসী একদিন মহা কোলাহল তুলিয়াছিল, যশোলিপ্সু এ অযোধ্যার সীমাবদ্ধ রাজত্বের লোভে সীতা হৃদয়ের আনন্দময় অপার স্বর্গ-বনে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন—সুপরিজ্ঞাত সত্যের অবমাননা করিয়া মিথ্যা জনাপবাদকে সম্মান দেখাইয়াছিলেন। তারপর জীবন ভরিয়া বিলাপ করিয়াছেন, "স্বয়ং গেহে লক্ষ্মী" বলিয়া যাহাকে কত আদর, কত সোহাগ দেখাইয়াছেন, তিনি যে অগ্নি পরীক্ষোত্তীর্ণা ও নিষ্পাপ এ সর্ব্বজন বিদিত সত্যকে প্রচার করিয়া একান্ত আশ্রিতা, স্নেহ-পরায়ণা, তাঁর "নয়নের অমৃতবর্ত্তি"কে হৃদয়ালয়ে রাখিতে সত্যসন্ধ রামচন্দ্রের সাহসে কুলায় নাই। আমরাও যে ঋষির সেই শিক্ষাই পাইয়াছি; অস্নেহ, স্বার্থপরতা এবং মিথ্যার সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য রামচন্দ্রের মতই আমরা দৃঢ় হস্তে মৃত্যুর বোঝা প্রিয়জনের মাথায় তুলিয়া দিতে পারি, নিজের তিল তিল করিয়া নিত্য মৃত্যুকে বরণ করিয়া নিতে পারি, তবুও এক মুহূর্ত্তের জন্য যে সত্যকে স্বীকার করিতে অন্তরাত্মা নিরন্তর আদেশ দিতেছে, তাহাতে বারংবার পরাঙ্মুখ হইয়া জীবনের আনন্দময় পরিণতিকে দূরে সরাইয়া দিই। হায় বৃদ্ধ ঋষি, তোমার অনুষ্টুপ ছন্দের প্রাণপণে লিখিত আইন বিশ্বদেবতার মানব-হৃদয়তলকে খোদিত পরম দাবীদণ্ড উপরে উঠিয়াছে!

জীর্ণ ঋষির শুষ্ক নীতিশাস্ত্রে রামচন্দ্র শিক্ষা করিয়াছিলেন যে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরের তুষ্টি সাধন করাই ধর্ম্ম। হায়, ঈশ্বরাবতার যিনি, তাঁরও অন্তরে উদয় হয় নাই, যে, সেচ্ছায় দুঃসহ দুঃখ তিনি বরণ করিয়া নিতে পারিলেও তার দুর্ব্বহ ভারে, তাঁহার একান্ত আশ্রিত প্রণয়শীলা জানকীকে মৃত্যুর পথে বিদায় দিবার তাঁহার কোন অধিকারই নাই। চির স্নেহের, অভয়-আশ্বাসের মধ্যে যে নিঃশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতেছিল সহসা তাহার চির-নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা কোন্ আর্যনীতির বলে রামচন্দ্র করিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু যে লোকরঞ্জনের প্রলোভনে উহা করিয়াছিলেন সে উদ্দেশ্যও তাঁহার সাধন হয় নাই—আজ তিন যুগ ভরিয়া জগতের যাবতীয় মানব আত্মা এ অবিচারের অনপনেয় কলঙ্ক ব্রহ্মস্বরূপ রামচন্দ্রেরও নামে দিতে দ্বিধা করিতেছেনা। অপরের মনস্তুষ্টি ও স্বার্থের জন্য একান্ত নির্ভর-পরায়ণ পরম স্নেহের জীবন-ব্যাপি নির্য্যাতন ঋষির শাস্ত্রে অনুমোদন করিলেও বিধাতার শাস্ত্র তাহার অনুকূল নয়—শ্রীরামচন্দ্রের ত্রিকাল-ব্যাপী অখ্যাতিই তাহার অকাট্য প্রমাণ। যে চির বিশ্বস্ত

নির্ভর-পরায়ণ পরম স্নেহশীল হৃদয় প্রিয় দয়িতের স্নেহ সান্নিধ্যটুকু লাভের জন্য তাঁহার সহিত চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস দুঃখ ভাগ করিয়া নিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই, দশানন কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া সমুদ্র পারে অসীম দুঃখ ও নির্য্যাতনের মধ্যে মনোভিরাম রামের অনুকূল বার্ত্তার পথ চাহিয়া সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছে, পর গৃহবাসের পর সর্ব্বজন সমক্ষে অগ্নিবিশুদ্ধা হইতে যে অনুমাত্র দ্বিধা করে নাই—বহু দুঃখের পরে আজি যখন সেই চির দুঃখিনী, সুখের প্রত্যাশায় বসিয়া আছে, নিরপরাধে তাহার নির্ব্বাসন যে কত বড় দুঃখ তাহা দেবাংশ সম্ভূত শ্রীরামচন্দ্রের মনেও আসিল না—অথবা আসিয়াও জনরঞ্জন ব্রতই তাঁহার বড় হইল, এ দুঃখ রাখিবার স্থান যথার্থই নাই। প্রজারঞ্জনই যদি একমাত্র জগতের ধর্ম্ম হয়, তবে জানকী কি প্রজা নয়, স্নেহের মনোরঞ্জন কি হৃদয়ের সকল বাড়া ধর্ম্ম নয়? চির দুঃখিনী জানকী যদি যোড়করে সত্যসন্ধ, জনধর্ম্মপরায়ণ, রামচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিত, "হে দণ্ডধর, হে আমার রাজাধিরাজ, হৃদয়ের বার্ত্তা সবই তোমার বিদিত, হে সত্য ধর্ম্মপরায়ণ দেবতা আমার, এ চিরদুঃখিনী দীনাতিদীনা আজ তোমার সিংহাসন তলে বিচার প্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সত্য ধর্ম্মের, ন্যায় ধর্ম্মের, স্নেহ ধর্ম্মের বিচার করিয়া আমার নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে হয় দাও কিন্তু বিচার কর প্রভু,—তখন রামচন্দ্র কি করিতেন? স্নেহের অমোঘ বলে যে সমস্ত আদেশ দ্বিধাবিহীন চিত্তে মাথায় করিয়া বহন করে, বিনাপরাধে তাহার আজীবন নির্ব্বাসন ও অরণ্যের মধ্যে অশরণ অবস্থায় অকরুণ মৃত্যুদণ্ড রাজধর্ম্মে, গণধর্ম্মে, স্বজনধর্ম্মে, কুলধর্ম্মে, মনুর ধর্ম্মে অনুমোদন করিতে পারে, কিন্তু স্নেহমমতা-পরিপ্লুত মানবের হৃদয়ধর্ম্ম যে তাহাতে হাহাকার করিয়া উঠে! স্নেহাশ্রিতের ন্যায়-সঙ্গত দাবীর প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া রাজ্যভার অপরকে দিয়া নী প্রাঙ্গনের, তৃণস্তীর্ণ তরুমূলে রাম জানকীর পরমায়ুর অবশিষ্ট কয়টা দিনের নি পাত কি হাসিয়া হইতে পারিত না? অযোধ্যার সীমাই পৃথিবীর সীমা নয়, এবং অযোধ্যার জন মণ্ডলীর সংখ্যাই ধরণীর মানব সংখ্যা নহে—একথা একদিন আমাদিগকে বুঝিতেই হয়, সময়ে বুঝিলে স্বর্গের নন্দনকে কেবল মানবের কল্পনার মধ্যেই পর্য্যবসিত হইতে হইত না।

"তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং
যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ"

বলিয়া প্রগাঢ় স্নেহের সহিত যাহার কথা ভাবিতে সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিত,

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে"

বলিয়া বারবার পরমাদরে যাহার প্রতি অঙ্গ সমাচ্ছন্ন ও যাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় বিমূঢ় করিয়া দিতে "ত্বয়া সহ নিবৎস্যামি বনেষু মধুগন্ধিষু" বলিয়া যাহাকে অবশিষ্ট জীবনকালের অবিচ্ছেদ মিলনের অপরিসীম আশ্বাস দিয়াছ অশিথিল পরিরম্ভের মধ্যে সংশ্লিষ্টকপোল হইয়া বিশ্রম্ভালাপে সুদীর্ঘ সময় মুহূর্ত্তের মত যাঁহার সাহচর্য্যে কাটিয়া যাইত, তাহাকে এক নিমেষে কেমন করিয়া ত্যাগ করিলে? একবার মনে চিন্তা কি আসিল না যে সেই অনন্যশরণ, নিরন্তর তোমারই প্রেমাশ্রিত, তোমারই স্নেহকণিকার একান্ত কাঙাল, তাহার প্রিয়-সঙ্গ-বিরহিত, নিরালম্ব দুর্ব্বহ জীবন ভার নির্ব্বান্ধব অরণ্যের মধ্যে কেমন করিয়া নামাইবে? স্নেহাশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়াই নিরপরাধিনীর দণ্ডের শেষ হয় নাই, জানকীর হৃদয় রাজ্যের একাধীশ্বর প্রজা-সামান্য রূপে ও তাহার কোন অনুসন্ধান লন নাই, সে জীবিত কি মৃত সে সংবাদটুকু পর্য্যন্ত রাখা রাজকর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই; আজীবনের একনিষ্ঠ প্রণয়ের কি এই পুরস্কার হে বিচারপতি? জনসাধারণ ও স্বজনবর্গের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে একান্ত স্নেহশীল, আশ্রয়হীনার প্রতি যে নিগ্রহ আচরিত হইয়াছিল তাহার সর্ব্বোত্তম খানি রচনার মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করায় তদবধি আজ পর্য্যন্ত কত লক্ষ লক্ষ হতভাগ্যের যে স্নেহাশ্রয় হইতে নির্ম্মম নিষ্কাসন ঘটিতেছে, সে অবিচারের জন্য একবিন্দু সমবেদনার অশ্রু বিসর্জ্জন করিবার সংসারে কেহ আছে কি? ভ্রমাত্মক ত্যাগমহিমায় কত লক্ষ শত স্নেহাকুল প্রাণের, অশ্রুর মধ্যে জ[illegible]ন ঘটিয়া যাইতেছে তাহার শেষ নাই, সীমা নাই! হায় রে অসহায় স্নেহ,

হায় তোমারই জন্ম সর্ব্বাপেক্ষা নিরর্থক, উপায়হীনের বুকে আসিয়া চির-তৃষার্ত্ত থাকিয়াই তোমার বিদায় লইতে হয়!

৩রা আষাঢ়,	পাগ্‌লু

সাহিত্য-সমাচার

সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের নূতন কবিতাপুস্তক 'নাগকেশর' যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম,এ বি, এল, সরস্বতী মহাশয়ের নূতন গল্পের বই 'বারুণী' প্রকাশিত হইয়াছে।

সুকবি শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত "বল্লরী" নামক কাব্যগ্রন্থ বাহির হইল। কবির 'কুন্দ' ও 'কিসলয়' নামক কাব্যদ্বয়ের কতকগুলি কবিতা ইহাতে আছে, বাকী সবই নূতন।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের রহস্য-লহরী উপন্যাস-মালার নবম খণ্ড 'ডাকাত ডাক্তার' নামক চমকপ্রদ গোয়েন্দা কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নূতন উপন্যাস "চিকিৎসা-সঙ্কট" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিখ্যাত গল্প লেখক ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "গল্পাঞ্জলি" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সুবিখ্যাত গল্প-লেখক ও প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের ছেলেদের গল্পের পুস্তক "কিশোর" বহুকাল পরে প্রকাশকের কবল মুক্ত হইয়া লোকলোচনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

নাটোরের মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় ও অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদকতায় "মর্ম্মবাণী" নামে একখানি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রসিদ্ধ গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মাতৃঋণ" উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাঙ্গলার বেগমের" ইংরাজী সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে; এবং বাঙ্গলা সংস্করণের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।